প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট
শ্রীশোভন সোম
পেনটিং বিভাগের প্রধান
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক
শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬-৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
শ্রীতুলসীচরণ বক্‌সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩-ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের

অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ

ডক্টর তারাশংকর ভট্টাচার্য, (এম. এ., ডি. লিট.)

অগ্রজ মহোদয়কে

ভূমিকা

লোকনাট্য সম্পর্কে আমার ঐকান্তিক কৌতূহল আছে। এই কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং ঐ সব অঞ্চলের লোকনাট্যের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যত অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে ততই এই কথাটি মনে হইয়াছে যে বাংলার লোকনাট্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার ও জানাইবার আছে।

এই সম্পর্কে একেবারেই কোন আলোচনা হয় নাই ইহা যেমন সত্য নহে তেমনি ইহা আরো সত্য যে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজো হয় নাই। বিশ্বকোষ গ্রন্থে যাত্রা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ, Popular Dramas of Bengal গ্রন্থে উনিশ শতকের কয়েকটি পালার আলোচনা (ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়), নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন ইতিহাস-গ্রন্থে যাত্রা সম্বন্ধে সামান্য সামান্য সাধারণ আলোচনা, মতি রায়ের যাত্রা সম্প্রদায় সম্পর্কে একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ (ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য), এবং যাত্রাওয়ালাদিগের কাহারো কাহারো সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা—ইহাদের মধ্যেই যাত্রা বা লোকনাট্যের আলোচনার পরিধি সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। লোকনাট্য সম্পর্কে এই আলোচনাকে যেমন যথেষ্ট তেমনি পরিপাটি বলা চলে না। লোকনাট্যকার ও লোকনাট্যের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং লোকনাট্যের বিষয়বস্তু ও রূপের বিবর্তন পর্যালোচনা করিয়া লোকনাট্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপস্থাপিত করিবার অবকাশ এখনো রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই আমি বিংশ শতকের বাংলা লোকনাট্যের ঐতিহাসিক বিবরণ ও শৈল্পিক মূল্য নির্ধারণকে মুখ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছি; এই আলোচনার ভিত্তি হিসাবে লোক শব্দটির তাৎপর্য, লোকনাট্যের সংজ্ঞা, বাংলা লোকনাট্য ও যাত্রা-নাটকের সম্পর্ক, লোকনাট্যের শ্রেণী বিভাগ—প্রাকৃত লোকনাট্য ও ঔপচারিক বা শিষ্ট লোকনাট্য, বাংলা-দেশের নাট্যরীতিক সংস্কৃত ও বাংলা রচনা এবং উনিশ শতক পর্যন্ত লোকনাট্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমার আলোচনার সম্মুখভূমিতে রহিয়াছে বিংশ শতকের লোকনাট্য এবং পশ্চাদভূমিতে রহিয়াছে লোকনাট্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপবিচার এবং ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা লোকনাট্যের ঐতিহাসিক বিবরণ ও শৈল্পিক মান নিরূপণ; ইহার ফলে এই নিবন্ধে বাংলা

লোকনাট্যের আলোচনার একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধরণের সামগ্রিক আলোচনা পূর্বে কেহ করেন নাই। এমত অবস্থায় আমি এ দাবি করিতে পারি যে বাংলা লোকনাট্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার এই প্রথম প্রচেষ্টা করা হইল।

প্রথম অধ্যায়ে প্রথমে লোক-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হইয়াছে। সংজ্ঞাটিকে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষমুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। লোক-এর সংজ্ঞা নির্ধারণে –আর্থনৈতিক কারণ কি ভাবে লোকস্তর গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, আর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কিভাবে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের একাংশকে লোকস্তরে পরিণত করিয়াছে সমাজ বিবর্তণের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে লোক উৎসবানুষ্ঠান, সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। যাত্রা সাধারণভাবে লোকনাট্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে মহাকাব্যের মত লোকনাট্যকে খাঁটি লোকনাট্য (Authentic Folk Drama) ও সাহিত্যিক লোকনাট্য (Literary Folk Drama) এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই আলোচনায় নাগরনাট্যের সঙ্গে লোকনাট্যের পার্থক্য এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের লোকনাট্যের কথাও উত্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লোকনাট্যের উপাদান সংযোজন ও প্রয়োগ রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। উপাদান প্রসঙ্গে প্রস্তাবনাগীতি, আখড়াই-বন্দী, জুড়ির গান, উক্তি গীতি, একানে বালকের গান, গণের গান, যাত্রাডুয়েট, যাত্রাব্যালেগীতি, বিবেকের গান, কোরাস প্রভৃতি, সংলাপ যোজনা, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক কাহিনী, বিপ্লবি-বিদ্রোহী ও রাজনৈতিক নেতৃকাহিনী, চলচ্চিত্রের প্রভাব, জীবনী নাট্য, কথা সাহিত্যের যাত্রারূপ, রূপক ও অন্যান্য চরিত্র সন্নিবেশ, লোক শিক্ষা প্রসঙ্গ ও রসসৃষ্টির বিষয় আলোচিত হইয়াছে, প্রয়োগরীতির দিক হইতে আসর, প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাগৃহ বিবর্জিত অভিনয়, নো-নাটকের মঞ্চ, আলোক, বেশবিন্যাস (অঙ্গরচনা ও অলংকরণ), মুড মিউজিক, এফেক্ট মিউজিক, এট্‌মসফিয়ার মিউজিক, গীতি, নৃত্য, ঐকতান প্রভৃতি ফলিত সংগীত ও অভিনয় পদ্ধতি আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ শতকের লোকনাট্যের পূর্বসূত্ররূপে অষ্টাদশ শতাব্দী

পর্যন্ত বাংলা লোকনাট্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারা জনজীবন ও মানসিকতা প্রভাবিত হয় বলিয়া লোকনাট্যের আলোচনায় বিভিন্ন সময়ের বাংলার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই অধ্যায়ে প্রথমে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করিয়া বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য—ভাষা, ধর্ম ধর্মোৎসবাদি এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও লৌকিক দেবতার কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরে লোকনাট্যের উদ্ভব ও বিভিন্ন স্থানের লোকনাট্য-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা-কাহিনী এবং 'গীতগোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' নাট্যপ্রকৃতি, শ্রীচৈতন্যের রাস-কৃষ্ণ-যাত্রাভিনয় ও প্রয়োগ রীতি, 'দানকেলিকৌমুদী' ও 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকদ্বয়ের সঙ্গে লোকনাট্যের সম্পর্ক-সম্ভাবনা, কৃষ্ণ-চৈতন্য যাত্রার প্রসার, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের পালাভিনয়, অষ্টাদশ শতকের যাত্রা, কীর্তন প্রসঙ্গ এবং সংগীত রীতির বিষয়ও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে নবজাগরণ প্রসঙ্গ, ঊনবিংশ শতকের যাত্রা, যাত্রা ও গীতাভিনয়, এই শতকের যাত্রায় হরিমোহন রায়, মনোমোহন বসু ও মদন মাষ্টারের দান এবং রচনা, পোষাক-পরিচ্ছদ, নৃত্যগীতি, ঐকতান, ব্যঙ্গোক্তি, প্যালা প্রভৃতির দিক হইতে যাত্রার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেই ব্রতকথা, পাঁচালি, সঙ, ঢপকীর্তন, রামায়ণ গান, মঙ্গলচণ্ডীর গান, মনসার ভাসান, কথকতা প্রভৃতি বিষয় আনুষঙ্গিকভাবে উত্থাপিত হইয়াছে।

পরে ঊনবিংশ শতকের বিশিষ্ট পেশাদার অধিকারী ও মহিলা-যাত্রার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ফরাসডাঙ্গা যাত্রাকেন্দ্র এবং উনিশ শতকের সৌখিন লোকনাট্য সম্প্রদায়ের আলোচনাও এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার পর্যালোচনা করিয়া বিংশ শতকের প্রথম হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন লোকনাট্যকারের পরিচয় এবং তাহাদের রচিত লোকনাট্যের সমালোচনামূলক সমীক্ষা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া থিয়েটারী নাট্যকার ও যাত্রানাট্য, বর্তমান শতকের পল্লীবাংলার প্রচলিত 'কৃষ্ণ-যাত্রা', 'গম্ভীরা' ও 'আলকাপ্'-এর নাট্যধর্ম, বাংলার কোন কোন অংশে প্রচলিত 'টনসা-যাত্রা', 'পালাটিয়া-যাত্রা', লেটোর পালা, কুশান যাত্রা, 'গুণাবিবির যাত্রা' পদ্ধতি, জাগের গান, খনের গান, আঞ্চলিক বিষয় লইয়া আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ও অঞ্চল-প্রচলিত

সামাজিক লোকনাট্য এবং পল্লীর নৃত্য-নাট্যের বিষয়বস্তু ও রীতি-বৈশিষ্ট্যের আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মিরাকল-মর্যালিটি প্লে, অপেরার সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ক, নাটক ও সংগীত, যাত্রানাটক ও থিয়েটারী নাটক, কাবুকি, মেলোড্রামা, মহৎ নাটক ও সু নাটক প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র নাট্য ও যাত্রা, যাত্রা বিবর্তণে আলো ও যান্ত্রিকতা, নাট্য আন্দোলনে যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে।

পরিশিষ্টে বিংশ শতকের উঠিয়া-যাওয়া প্রখ্যাত পেশাদার লোকনাট্য সম্প্রদায়, বর্তমানে চলিত বিশিষ্ট পেশাদার লোকনাট্য সংস্থা, কলিকাতার সৌখিন লোকনাট্য সংস্থা, এই শতকের খ্যাতিমান লোকনাট্য শিল্পীদের (অভিনেতা, পালা সম্পাদক, গায়ক, বাদক ও সুরকার) কথা, লোকনাট্য সম্প্রদায়ের পরিভাষা ও নিয়মাবলী এবং বাংলার বিভিন্ন জিলার লোকনাট্য পরিবেশনকারী সংস্থার বিষয় আলোচনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। পরিশেষে লোকনাট্যের বিশিষ্ট সুরকার ভূতনাথ দাস ও দেবকণ্ঠ বাগচী প্রমুখের গানের স্বরলিপি সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের সঙ্গে এই শতকের বিশিষ্ট যাত্রাভিনেতা, যাত্রা নাট্যকার, যাত্রা-গায়ক, গ্রামীণ যাত্রার অভিনীত দৃশ্য এবং যাত্রার আসরের চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে।

নিবন্ধের উপাদান সংগ্রহের জন্য যেমন বাংলার বিভিন্ন জিলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে এবং কলিকাতার বিভিন্ন প্রখ্যাত যাত্রা সংস্থার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে তেমন গ্রন্থাগার হইতেও সাহায্য লওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ এই নিবন্ধ রচনার কাজে field-work এবং library-work-এর সম্মিলন ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে,—সমাজের উপরতলায়-অখ্যাত লোকনাট্যকারদের মধ্যে অনেকে আজ স্মৃতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছেন। তাহাদের রচিত পালাও দুষ্পাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। লোকনাট্যকারদের রচিত নাটকের কপি রাইট প্রকাশকের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে হয়; ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই সকল নাটকের মুদ্রিত কপি অধিকাংশ স্থলেই জাতীয় পাঠাগারে জমা পড়ে না এবং বিভিন্ন পাঠাগার কর্তৃকও সাধারণত ইহা ক্রীত হয় না। প্রকাশকের মুদ্রিত কপি বিক্রীত হইয়া গেলে লোকনাট্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ লোকনাট্যের পুরাতন পালা অপেক্ষা

নূতন পালার প্রতি জনগণের আগ্রহ অধিক হওয়ায় পুরাতন পালা সংরক্ষণের প্রতি স্বাভাবিক তাচ্ছিল্য রহিয়াছে। লোকনাট্যের সাধারণ ক্রেতা পল্লীর সৌখিন লোকনাট্য-সংস্থা। এই সব সংস্থার সদস্যদের মধ্যে কোন কোন নাট্যরসিক নিজের পছন্দমত কোন কোন পুরাতন লোকনাট্য গৃহে রাখিয়া দেন। গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া এই সকল বয়োবৃদ্ধ রসিকদের সহযোগিতায় কিছু কিছু পুরাতন দুষ্প্রাপ্য লোকনাট্য পাঠ করিবার ও সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। কলিকাতার ও কলিকাতার বাহিরের পাঠাগার, প্রকাশক এবং লোকনাট্য সংস্থার অধিকারীদের সহযোগিতায়ও লোকনাট্যপাঠ সম্ভব হইয়াছে।

এই নিবন্ধ রচনায় বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাইয়াছেন নাট্য বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য। ইহা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে যাহাদের নিকট হইতে সহযোগিতা পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে কলিকাতা নিবাসী শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর, শ্রীশৈলেন মোহান্ত, শ্রীপ্রফুল্লকুমার ধর, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীসূর্যকুমার শীল, শ্রীরঞ্জিতকুমার শীল, শ্রীপঞ্চানন দে, ৺ফণিভূষণ মতিলাল, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীকিষাণ দাশ-গুপ্ত, শ্রীসূর্যকুমার দত্ত (কয়াডাঙ্গা, ২৪ পরগণা), ৺ নারায়ণচন্দ্র দত্ত (চক্রপুর-হুগলী), ৺গৌরচন্দ্র দাস (তালা-বন্তিপুর, হুগলী), ৺রজনীকান্ত মণ্ডল (পরশুয়া কালুয়া, বর্ধমান), শ্রীসাধনচন্দ্র ভাণ্ডারী (আমডোবা, হুগলী), ৺ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (সাঁতরাগাছি, হাওড়া), শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় (কল্যাণপুর, হাওড়া), শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে (ইছাপুর), শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র (হটুগঞ্জ একতারা, ২৪ পরগণা), শ্রীভূতনাথ চৌধুরী (রায়াণ, বর্ধমান), ৺হরিপদ বায়েন (গড়বেতা, মেদিনীপুর), শ্রীকেতকীরঞ্জন গোপ (পুরুলিয়া), শ্রীদেবেন্দ্র রায় (জলপাইগুড়ি), ৺উমেশচন্দ্র দাস (আলিপুর দুয়ার) ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (কুচবিহার) নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। উল্লিখিত নাট্যরসিকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। ইতি—

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,

কলিকাতা-৭

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা

প্রথম অধ্যায়

বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষাপ্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে প্রধানত লোক শব্দটির ও লোকনাট্যের সংজ্ঞানির্ধারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত লোক-অনুষ্ঠান-সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। কারণ লোক-কথাটি বুঝিতে হইলে উল্লিখিত লোকবৈশিষ্ট্য পূর্ণ বিষয়গুলির মোটামুটি পরিচয় লওয়া আবশ্যক। লোক কথাটির অর্থ নিরূপণ করিতে না পারিলে লোকশিল্পের তথা লোকনাট্যের সংজ্ঞানির্ধারণ করা সম্ভব হইবে না, এবং লোকবৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে না পারিলে নাটকে ঐ বৈশিষ্ট্য কোথায় কতখানি ব্যক্ত হইয়াছে না হইয়াছে তাহা পরিমাপ করিয়া লোকনাট্যের পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব হইবে। যে সমস্যাটির সম্মুখীন হইবার জন্য এই তত্ত্ব-আলোচনার আয়োজন করা হইতেছে তাহার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে যে লোক-আত্মা (flok-spirit) বা লোকবৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রয়োজন কত অপরিহার্য। আমাদের দেশে লোকনাট্য বলিতে সাধারণত যাত্রানাটককেই বুঝায় এবং এই অর্থেই শব্দটি আজও প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু আদিম পর্যায়ের লোকনাট্য এবং পরবর্তী-কালের যাত্রানাটকের মধ্যে বিশেষত শিক্ষিত ও নাগরিক নাট্যকার দ্বারা রচিত, পেশাদার যাত্রাদলকর্তৃক অভিনীত এবং অ-ধর্মমূলক ঐতিহাসিক বা সামাজিক যাত্রানাটকের মধ্যে লোকধর্মিতার মাত্রার দিক হইতে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। আদিম পর্যায়ের অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি দ্বারা রচিত ও অপেশাদার গ্রাম্য অভিনেতৃদলকর্তৃক অভিনীত নাটককে যথার্থ লোকনাট্য বলিয়া গণ্য করিলে পরবর্তীকালের যাত্রানাটকগুলিকে লোকনাট্যের পংক্তিতে স্থান দেওয়া সমীচান হইবে না। এমত অবস্থায় বর্তমানের যাত্রানাট্যকে লোকনাট্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে অবশ্যই লোকশিল্পের বিশেষত লোকনাট্যের সংজ্ঞাটিকে একটু ব্যাপক করিতে হইবে। তবে তাহা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে যাত্রানাটকের সঙ্গে থিয়েটারে অভিনীত নাটকের পার্থক্যটুকু অক্ষুণ্ণ থাকে। লোকনাট্যের সংজ্ঞা অব্যাপ্ত হইলে যেমন শিক্ষিত লোকদ্বারা রচিত ও পেশাদার যাত্রাদল কর্তৃক অভিনীত নাটক বাদ পড়িয়া যাইবে—অন্যদিকে সংজ্ঞা অতিব্যাপ্ত হইলে তেমনি যাত্রানাটক ছাড়াও অন্যান্য নাটক লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে। এই অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ এড়াইয়া লোকনাট্যের সংজ্ঞা

নিরূপণ করাই প্রধান সমস্যা ; এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই লোকশিল্পের আত্মাটি আবিষ্কার করা আবশ্যক এবং সকলের পূর্বে আবশ্যক লোকশব্দটির তাৎপর্য নির্ধারণ করা।

লোক-শব্দটির আভিধানিক যে অর্থ সেই সাধারণ 'ব্যক্তি' অর্থে ইহার প্রয়োগ করা হইতেছে না। [1]লোক-শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে সংকীর্ণ অর্থে নাগর শিক্ষা-সংস্কৃতি বহির্ভূত অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, বিশ্বাস-প্রবণ, প্রাচীন সংস্কার ও প্রথা চালিত মানুষের একটি পর্যায়কে বুঝায়। এক সময় সমস্ত মানুষ লোকপর্যায়ভুক্ত ছিল। বলা বাহুল্য, যে অবস্থায় সকলেই লোক সেখানে লোক বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। এই লোক কথাটি লোক-অলোক ভেদের সময় হইতে তাৎপর্য মণ্ডিত হইয়া উঠে। লোক-অলোক ভেদ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সৃষ্টি এবং সমাজের নিম্নস্তরের প্রতি উচ্চস্তরের সামাজিকদের বিশেষ মনোভাব হইতেই ইহার উদ্ভব। সমাজবিবর্তনের একবিশেষ পর্যায়ে জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশকে আর এক অংশ যেদিন লোক বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল সেইদিন হইতেই লোক-কথাটি চলিয়া আসিতেছে। সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে ঐ বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও আজও একটা অংশকে আর একটা অংশ লোক বলিয়া চিহ্নিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক, কোন বৈশেষিক লক্ষণের জন্য জনগোষ্ঠীর এক অংশ অন্য অংশকে লোক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। একথা সত্য যে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে নাগর সভ্যতার উদ্ভব হওয়ায় নাগরিক জীবনের ও গ্রাম্য জীবনের পার্থক্যের ভিত্তিতে নাগরিক মানসিকতায় ও গ্রাম্য মানসিকতায়, আচারে-বিচারে তথা সংস্কৃতিতে পার্থক্য দেখা দেয়। নাগরিকরা গ্রামের সব কিছুকেই গ্রাম্য আখ্যা দিয়া উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে থাকেন ; শিক্ষিতরা আবার নিজেদের শিষ্ট এবং নিজেদের আচারকে শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য করিয়া অশিক্ষিতদের অশিষ্ট ও তাহাদের আচারকে অশিষ্টাচার বলিয়া অবজ্ঞার

1. In a primitive community the whole body of persons composing it is the "Folk" and in the widest sense of the word it might equally be applied to the whole population of a civilized state. In its common application, however, to civilizations of western type (in such compounds as folke-lore, folk-music etc.) it is narrowed down to include only those who are mainly outside the currents of urban culture and systematic education, the unlettered or little-lettered inhabitants of village or country-side. p. 444-The Encyclopaedia Britannica (Vol.-IX—Lond., 1929).

দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে নাগরিক ও শিষ্ট সমার্থক হইয়া দাঁড়াইবার ফলে নাগরিক আচারই শিষ্টাচার বলিয়া স্বীকৃত হয়; এবং গ্রাম্য ও অশিষ্ট সমার্থক হইয়া পড়ায় গ্রাম্য ও অশিষ্ট জনগোষ্ঠীই নাগরিক শিষ্টদের কাছে 'লোক' আখ্যা পায়।

এই লোকমানসিকতা ও আচার যদি শুধু গ্রামের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু এই মানসিকতা ও আচার নাগরিক মানুষেরও আচার-আচরণের ভিত্তি হইয়া আছে। সমাজ বিজ্ঞানী William Graham Sumner তাহার Folkways গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে [1]সমস্ত যুগের এবং সমস্ত সাংস্কৃতিক পর্যায়ের মানুষের জীবন প্রধানত লোকরীতি সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, এই লোকরীতি বা সংস্কার মানবজাতির বা গোষ্ঠীর আদিমতম অবস্থা হইতে লোকপরম্পরার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এবং পশুর স্বাভাবিক আচরণের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সংস্কারের শুধু উপরিতলেই পরিবর্তন ঘটে এবং দর্শন, নীতি ও ধর্ম অথবা অন্যবিধ মননদ্বারা সামান্য পরিমাণে ইহা পরিবর্তিত হয়। এই উক্তির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে—মানব সমাজের আদিমতম স্তরে যে লোকমানসিকতা ও আচার অনুষ্ঠান দেখা দিয়াছিল তাহা সমস্ত যুগের ও সমস্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া লোক-অলোক সমস্ত মানুষের মানসিকতা ও আচার-বিচারের ভিতর দিয়া অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ইহা সত্য হইলে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে লোক মানসিকতার অস্তিত্ব শুধু তথাকথিত গ্রাম্য বা লোকশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। যাহারা উন্নত কৃষ্টির অধিকারী, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ধর্মদর্শন প্রভৃতি চর্চার ফলে যাহারা শিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন—যাহারা নাগরিক, তাহাদের মধ্যেও লোক মানসিকতা ও আচারবিচার প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে; সঙ্গে

1. ···all the life of human beings in all ages and stages of culture, is primarily controlled by a vast mass of folkways handed down from the earliest existence of the race, having the nature of the ways of other animals, only the topmost layers of which are subject to change and control and some what modified by human philosophy, ethics and religion or by other acts of intelligent reflection. Quoted in p. 19 of 'society'—R. M. Maciver & C. H. Page (Lond., 1955)

সঙ্গে এ কথাও অনস্বীকার্য হইয়া পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত লোকমানসিকতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই লোকত্ব নিহিত এবং লোকমানসিকতার প্রাধান্য হিসাব করিয়াই লোক-অলোক শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে।

লোকমানসিকতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে হইলে মানবসমাজের আদিমতম অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং যাহারা মানবসমাজের আদিম অবস্থা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তাহাদের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক। তাহাদের আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া আদিম লোকসমাজের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দওয়া যাইতেছে।

ইহা বলা যায়, যেখানে জীবন সেইখানেই সমাজের অস্তিত্ব রহিয়াছে। পশু এমন কি পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাদি নিম্নশ্রেণীর প্রাণিজগতেও ক্ষীণভাবে হইলেও সমাজ-চেতনা বর্তমান। তাই আদিম মানবজীবনেও স্বভাবতই সমাজ-চেতনা ছিল। এই চেতনার মূলে যৌনসম্পর্ক ও প্রজাতি সংরক্ষণের স্পৃহা ক্রিয়াশীল।[১] সামাজিক সম্পর্কাদির মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ আদিম ও অপরিহার্য বিষয়। সেই জন্যই মানুষ বনে জঙ্গলে একক ভাবে বাস না করিয়া [2]কোন-না-কোন প্রকারে পরিবারবদ্ধ জীবনযাপন করিতে থাকে; এইখানেই প্রথম সমাজের সূচনা। এই প্রসঙ্গে Maciver ও Page-এর একটি উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে,— [৩]" ..Sociey is not limited to human beings. There are animal societies of many degrees. The remarkable social organizations of the insects, such as the ant, the bee, the hornet, are known to most school children. It has been contended that wherever there is life there is society, because life means heredity, and so far as we know, can arise only out of and in the presence of other life. But in the lowest

1. It is certainly true that the sex relationship is a primary and essential type of social relationship. p-7, Society—R. M. Maciver & C. H. Page (Lond., 1955)

2. It is often said that the family in some form, was the first society. P. 7. Ibid.

3. Society—p. p. 6-7.

stages of life, social awareness, if it exists, is extremely dim and the social contact often extremely fleeting. Among all higher animals at least there is a very definite society, arising out of the requirements of their nature and the conditions involved in the perpetuation of their species"

(জীবনধারণের প্রধান সমস্যা আত্মরক্ষা ও জীবিকার্জন। একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান যেমন দুরূহ তেমনি সংঘবদ্ধ মানবশক্তির কাছে ইহা খুব সহজ হইয়া উঠে। সুতরাং সমাজবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে জীবিকার্জন ও প্রতিকূল অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার তাগিদে তথাকথিত পরিবার অন্য পরিবারের সঙ্গে মিলিত হইয়া গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে আদিম মানুষ কতগুলি gens এ পরিণত হয়। এই রকম কয়েকটি gens লইয়া এক একটি tribe গড়িয়া উঠে। এ সম্পর্কে অবশ্য ভিন্ন ধারণাও আছে। কাহারো কাহারো মতে আদিম মানব গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করিত; এই গোষ্ঠী বিশ্লিষ্ট হইলে পরবর্তীকালে পরিবারের উৎপত্তি হয়। গোষ্ঠীর পরিচয় [1]Illusion And Reality গ্রন্থে এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে,—
"Extrapolating into the past, Durkheim sees the primitive tribe as a homogeneous unit with a group consciousness, and Levy-Bruhl regards this group consciousness as 'prelogical'. Durkheim imagines such a primitive tribe to be almost entirely undifferentiated, so that one can consider the members as without character or individuality except the common impress of the tribe's collective representations, which are coercive and overcome the individual's free thoughts."

যাহা হউক, (আত্মরক্ষা ও জীবিকার উপযুক্ত আর্থ নৈতিক সমস্যা মিটাইবার জন্য যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। আদিম সমাজ প্রথমে আর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান করিত আহরণ ও শিকারের (food gathering and hunting) মধ্য দিয়া। নর-নারী সমানাধিকারে বনে বনে ফলমূল আহরণ করিয়া এবং প্রস্তরঅস্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত কাঁচা মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া

1. Illusion And Reality p. p. 7-8-C. Caudwell (Lond., 1937).

জীবিকা নির্বাহ করিত। ঐ সময় ভয়সূচক চীৎকার, ধ্বনি ও হস্তাদির নানাপ্রকার ইংগিত দ্বারা (shriek, sound and gesture language) তাহারা মনোভাব ব্যক্ত করিত। তাহারা প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল, এমন কি নিজেদেরও প্রকৃতির অঙ্গীভূত (man really Nature) বলিয়া মনে করিত এবং পশু-পাখীর অঙ্গভঙ্গি ও শব্দানুকরণে নাচ-গান (bird-and-animal mimicking dances and songs) করিত। মানবসমাজের এই অবস্থাকে বন্যস্তর (savagery—আঃ খ্রীঃ পূঃ ৫,০০০০০—৪,০০০০০) বলা হয়। এই উলঙ্গ ১ বন্য অবস্থায় বিভিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। ইহার কুফল বুঝিয়া আদিম সমাজ বনবাস পরিত্যাগ পূর্বক গ্রাম্য জীবনের সূচনা করে। এই স্তরে (দ্বিতীয় স্তর) আদিম সমাজ বেশ অগ্রগতি লাভ করে; প্রস্তর বা শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি আবিষ্কার করায় প্রকৃতির উপর আদিম মানবের প্রথম জয় বিঘোষিত হয়। ক্রমে তাহারা অগ্নিদগ্ধ বস্তু ভক্ষণ, তীরধনু আবিষ্কার, চর্মের ব্যবহার এবং উর্ধ্বতন মস্তিষ্কের (cerebral cortex) শক্তি বৃদ্ধির জন্য কথাদ্বারা (articulate language) মনোভাব প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া দ্বিতীয় স্তর—পুরাতন প্রস্তর যুগ (old stone age—আঃ খ্রীঃ পূঃ ১,২৫০০০—১,০০০০০) অতিক্রম করিয়া তৃতীয় স্তর—নূতন প্রস্তর যুগের (neo-palaeolithic age—আঃ খ্রীঃ পূঃ ১০,০০০—৩,০০০) প্রতিষ্ঠা করে। তৃতীয় স্তরে আদিম মানব গার্হস্থ্য জীবনযাপনে অধিকতর সচেষ্ট হয় এবং আর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে থাকে কৃষিকার্য ও গো-মহিষ, মেষ, শূকর, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু পালনের (crop-raising and herd-rearing) সাহায্যে। ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা গৃহ নির্মাণ, সাধারণ বাসনপত্র, রন্ধন, বস্ত্রবয়ন, অমার্জিত অলংকার প্রস্তুতি, ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার অস্ত্র ও লৌহ ব্যবহার এবং লিখিবার জন্য বর্ণের প্রচলন এই স্তরে সম্ভব হইয়া উঠে। মানুষ নিজেকে প্রকৃতির অঙ্গীভূত মনে না করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে তাহার পার্থক্য অনুভব করে এবং প্রকৃতিকে মানবগুণ সম্পন্ন (Nature really man) মনে করিতে থাকে। এই স্তরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দুইটি,—

1. In savagery there is a permanent state of war between tribe and tribe. p. 7. The Origin of the Family Private Property and the State, F. Engels (1943).

[1]কৃষিকার্য ও পশুপালনে অধিকতর শক্তিশালী নর কর্তৃক ঘরে-বাইরে নারী-প্রাধান্য হরণে পৃথিবীতে নারী-জাতির ঐতিহাসিক পরাজয়, এবং [2]কাষ্ঠনির্মিত যুদ্ধরথ প্রস্তুতি, কড়িকাঠ ও তক্তাসহযোগে জলযান নির্মিতি ও স্থাপত্য শিল্পের সূচনা। এই সকল কার্যে সাফল্যের জন্য আদিম মানব ধ্বনি ও সুরেলা শব্দে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে তাহারই মধ্যে লোকসংগীতের আদি-অবস্থার কল্পনা করা যাইতে পারে। [3]অনেকটা একই ধরণের অল্পসংখ্যক মানুষ লইয়া লোকসমাজ গঠিত হয়; জনসংখ্যা অল্প হওয়ায় এই সমাজের সকলেই পরস্পরের কাছে বিশেষ পরিচিত, এবং ইহারা দীর্ঘকাল একই সঙ্গে বসবাস করে। লোক সমাজের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে আহরণ-শিকারযুগ ও কৃষি-পশুপালন যুগের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও শিল্প প্রয়াসের দিক হইতে এই দুই যুগের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। কৃষি-পশুপালন যুগে আদিম মানব অনেকটা স্থিতিশীল গ্রাম্য-গার্হস্থ্য জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয় ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে আদিম মনের মূলভাবত্রয়—ভয়, ক্রোধ ও আনন্দ (feer, anger and pleasure) ছাড়াও আদিম মানুষ [4]স্নেহ-মমতা, করুণা প্রভৃতি নানা অনুভূতি, বহুবিষয়ে চিন্তাশক্তি ও কর্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। কাজেই শিল্প সৃষ্টির প্রয়াসও সম্ভব হয়।

আদিম মানবসমাজের মানসিকতা, সংস্কৃতির বিবরণ ও বিবর্তনের পরিচয় যাহারা দিয়াছেন তাহারা অন্য ক্ষেত্রের মুনিদের ন্যায় বিভিন্নমত পোষণ করিলেও তাহাদের মত পার্থক্যের ভিতর দিয়া আদিম সমাজের অনেক কিছুই আলোকিত হইয়াছে। আমাদের ভাগ্য ভাল, আজও পৃথিবীর নানাস্থানে আদিম পর্যায়ে বা আদিম স্তরের কাছাকাছি কোন পর্যায়ে মানবগোষ্ঠী বাস করিতেছে এবং

1. The over-throw of mother-right was the world historical defeat of the female sex. The man took command in home also. p. 48. The Origin of the Family Private Property and the State—Engels.

2. ...War-chariot, ship-building with beams and planks, the beginnings of architecture as art. p. 19.—Ibid.

3. The folk society is a small society. There are no more people in it than can come to know each other well, and they remain in long association with each other. p. 234—Human Nature and the Study of Society (Volume I) Robert Redfield (Chicago—1962).

4. Individual subjected himself unconditionally in feeling, thought and action. p. 86. The Origin of the Family Private Property and the State—F. Engels, 1948.

গবেষকদের গবেষণার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যাহা হউক, মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে মানুষকে পৃথক করিয়াছে তাহার উর্ধ্বতন মস্তিষ্কের উন্নত গঠন—বিশেষত association area অংশের বিশাল বিস্তার। এই বিস্তার থাকিবার ফলেই মানুষ বাগ্‌ভাষা প্রয়োগে সক্ষম হইয়াছে এবং মননের অধিকার লাভ করিয়া মননক্ষম জীবের মর্যাদা পাইয়াছে। তাই বলিয়া একথা সত্য নহে যে মানুষ প্রথমদিন হইতেই জটিল নৈয়ায়িক চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছে বা পরিণত বুদ্ধির অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আদিম পর্যায়ে এই শক্তি বা বৃত্তি অতি অপরিণত অবস্থায় ছিল। বহুকালের অনুশীলনের ফলে ইহা বর্তমানে পরিণত অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। একথা যেমন সত্য তেমনি ইহাও মিথ্যা নহে যে মানুষ কোন অবস্থাতেই একেবারে মননহীন হইয়া থাকে নাই। সত্য হউক মিথ্যা হউক একাধিক বিশ্বাস গড়িয়া তুলিয়া সেই বিশ্বাস অনুসারে সে আচরণ করিয়াছে। দলবদ্ধ প্রাণীদের সহিত সমাজবদ্ধ মানুষের নানা বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও একটি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল; তাহা এই যে প্রাণীরা যেখানে কেবল সহজাত প্রবৃত্তির আবেগে জীবন ধারণ করিয়াছে, মানুষ সেখানে মননজাত বিশ্বাসদ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তিকে জানিতে, বুঝিতে ও জয় করিতে তৎপর হইয়াছে। আদিম মানবের চিন্তাধারা ছিল অপরিণত। গভীর চিন্তাশক্তিতে অধিকার অর্জিত হয় নাই বলিয়া ঘটনা ও বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্কে তাহারা ধারণা করিতে পারিত না। কাজেই দুই একটি ঘটনা দেখিয়া অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত সামান্য-সিদ্ধান্ত (hasty generalization) গ্রহণ করিত। অনেক সময় আবার দুইটি ঘটনার মধ্যে হঠাৎ মিল দেখিয়া কাকতালীয় ন্যায়ের উপর নির্ভর করিয়া কার্যকারণের নিয়মানুবর্তিতার কথা না ভাবিয়া (post hoc ergo propter hoc) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন গৃহে অতিথি আসিবার পরে ঐ গৃহের কোন লোক অসুস্থ হইয়া পড়িলে অতিথি আগমনকেই অসুস্থতার কারণরূপে ধরা হইত। আদিম সমাজের এই ধরণের অপরিণত মানসিকতাকে Levy-Bruhl 'prelogical mind' বলিয়াছেন। আদিম মানব এই প্রাক্ নৈয়ায়িক মানসিকতাদ্বারা বস্তুসমূহের ধর্ম, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারে নাই। যাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই ও যাহা তাহার কল্পনা জাগ্রত করিয়াছে তাহাকেই আদিম মানব অলৌকিক ও দেবত্বমণ্ডিত (supernatural and

divine) বলিয়া মনে করিয়াছে। সহজেই পথ হারাইয়া ফেলিবার মত গভীর বনপ্রদেশ, অদ্ভুত আকারের সুউচ্চ পাহাড়, অন্ধকার গুহা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সূর্য-চন্দ্রগ্রহণ, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, মেঘ, ঝড়-বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, শিলাস্তূপাদির পতন প্রভৃতিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বলিয়া ধরিতে না পারিয়া ঐ সকলকে অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিয়াছে। চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা যেন অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির খেয়াল খুশি অনুসারে (capricious will of the invisible supernatural power) সংঘটিত হইতেছে। অদৃশ্য শক্তির পরিচয়ে তাহারা বিস্মিত হইয়াছে, ভীত হইয়াছে, শক্তিমান বস্তু সম্পর্কে তাহাদের মনে প্রশংসা-বোধ জাগরিত হইয়াছে এবং ঐ সকল অপ্রাণীবাচক প্রাকৃতিক বস্তুতে জীবন্ত আত্মার কল্পনা (animism) করিয়াছে। আদিমসমাজ প্রকৃতির যে কোন চলমান বস্তুকে জীবনী শক্তি সম্পন্ন (every thing that moves possesses life) বলিয়া মনে করিয়াছে। আবার নির্জীব কোন অদ্ভুত ধরণের বস্তুর সঙ্গে জীবিত বস্তুর সাদৃশ্য (resemblance) দেখিতে পাইলে তাহাকেও আশ্চর্য ধরণের জীবন্ত বস্তু ও অলৌকিকশক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিয়াছে। অলৌকিক শক্তিতে (supernatural power mana) বিশ্বাস অবলম্বনে আদিম সমাজে ধর্মের (religion) উদ্ভব হয়। Animistic বিশ্বাস, ভয়, বিস্ময়, প্রশংসাবোধ, রহস্যময়তা (sentiment of fear, awe, admiration and mystery) এবং ধর্মধারণা লইয়া আদিমমানব কল্পিত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করে। [1]মানুষের একটি সাধারণ প্রবৃত্তি হইতেছে এই যে সে পারিপার্শ্বিক জাগতিক বস্তুতে নিজের দেহগত জীবনশক্তি প্রক্ষেপিত করে। এই প্রবৃত্তি অনুযায়ী আদিম মানব দেবত্বমণ্ডিত বস্তুকে মানবিক গুণে ভূষিত করিয়া তুলিল। [2]প্রাকৃতিক বস্তুতে মানবীয়গুণ আরোপিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে কল্পনাবলে ইহার মানবিক রূপদানও সম্ভব হইয়া উঠিল। এইভাবে আদিম সমাজে দেবতার

1. ...in man there is an intrinsic tendency to project his own physical life upon the phenomena of surrounding world. p. 75, The Origins of Religion—R. Karsten (Lond.. 1935).

2. If the phenomena of nature are once endowed with human qualities, it is not hard to understand, why imagination should not also endow them with human from. p. 615, General Anthropology—F. Boas (Newyork—1938).

সৃষ্টি ও ক্রমে ক্রমে দেবমূর্তি-পরিকল্পনা প্রচলিত হয়। দেবতাকে আদিম মানব ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারক বলিয়া মনে করিয়াছে। দৈবশক্তি ভাল-মন্দ দুই শ্রেণীরই ছিল, কাজেই সাভাবিক আত্মরক্ষা বৃত্তির (instinct of self-preservation) জন্য শুভদৈবশক্তির করুণালাভ ও মন্দ দৈবশক্তিকৃত ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার তাগিদে আদিম সমাজে দেব-দেবী অবলম্বনে নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠানের প্রচলন হয়।

আদিম সমাজ মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া মনে করিত না। [1]জীবন্ত দেহে এক অদৃশ্য সত্তার বাস, সেই সত্তার দেহত্যাগের সঙ্গেই আসে মৃত্যু। এই অদৃশ্য সত্তাই আত্মা (soul)। আত্মার সচেতনতা ও ইচ্ছাশক্তি আছে। ইহা মানুষের অন্তরে আর এক প্রকার মানুষ (a kind of man within the man)। এই প্রসঙ্গে Tylor সাহেবের আত্মা সম্বন্ধীয় ধারণা সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য উদ্ধার করা যাইতে পারে,—[2] "It is a thin unsubstantial human image, in its nature a sort of vapour, film or shadow , the cause of life and thought in the individual it animates ; independently possessing the personal consciousness and volition of its corporeal owner, past or present ; capable of leaving the body far behind to flash swiftly from place to place ; mostly impalpable and invisible, yet also manifesting physical power, and especially appearing to men walking or asleep as a phantasm separate from the body of which it bears the likeness ; able to enter into, possess or act in the bodies of other men, of animals, and even of things".

আত্মা দেহকে ভালবাসে ; এই জন্য মৃত্যুর পরেও দেহের প্রতি ইহার আকর্ষণ থাকে মনে করিয়া আদিম কাল হইতে মানুষ নানা পদ্ধতিতে পূর্ণ বা আংশিকভাবে মৃত দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। ইজিপ্টে মৃতদেহে ঔষধ

1. ···the living body is inhibited by an invisible being which leaves it in the moment of death. p. 57, The Origins of Religion—Karsten (London, 1935).

2. Primitive Culture (I) p. 387—E. B. Tylor (Lond., 1871).

মাখাইয়া মমি (mummified) করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি (Maori) গোষ্ঠী মৃতদেহ কবরস্থ করিবার একবৎসর পরে [1]ইহাকে তুলিয়া ইহার ক্লেদ মুক্ত করিয়া কংকালটি রঙে চিত্রিত করিত এবং মাথার খুলি পালকে সজ্জিত করিত। এই রঞ্জিত ও সজ্জিত পূর্ণকংকাল কিছু কালের জন্য সাধারণের মধ্যে প্রদর্শিত হইবার পরে পুনরায় কবরস্থ করা হইত। ইহাই মাওরিদের অস্থিমার্জন উৎসব (bone scraping ceremony)। ব্রাজিলের Bororo সম্প্রদায়ের মধ্যেও কতকটা এই ধরণের রীতি প্রচলিত ছিল। Roucouyenne Indians পূর্বপেরুর Tauare গোষ্ঠী এবং আরো কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করিবার পরে একটি পাত্রে চিতাভস্ম রক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। মৃত্যুর পরে বিদেহী আত্মা ভৌতিক শক্তিসম্পন্ন হয় বলিয়া আদিম সমাজের ধারণা ছিল। তাই পূর্বপুরুষদের আত্মা সমূহকে 'Supreme Beings' বলিয়া মনে করা হইত। ২ মানবদেহে যেমন আত্মার বাস তেমনি পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ ও প্রকৃতির অচেতন বস্তুতে আত্মা থাকিতে পারে এবং এইরূপ আত্মাযুক্ত বস্তু রহস্যময় জাদুশক্তির অধিকারীও হইতে পারে। এই মনোভাব হইতে প্রকৃতির চেতন ও অচেতন বস্তু অলৌকিক জাদুশক্তির আধাররূপে গৃহীত হওয়ায় আদিম সমাজে যেমন প্রকৃতির চেতনবস্তুর পূজা প্রচলিত হয় তেমনি যষ্টি, প্রস্তর প্রভৃতি অচেতন বস্তুর অর্চনাও প্রবর্তিত হয়। ইহাই fetishism ; ইহার সঙ্গে animism-এর কিছু পার্থক্য থাকিলেও ইহাকে বিশেষধরণের animism বলা যাইতে পারে। Animism-এ প্রথম হইতেই বস্তুতে spirit থাকে এবং ইহার দেহত্যাগে বস্তুর মৃত্যু ঘটে। Fetishism-এ অল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য spirit অচেতন বস্তুতে প্রবেশ করিয়া ইহাকে রহস্যময় জাদুশক্তি সম্পন্ন করিয়া দেয় ; spirit ঐ বস্তুকে ত্যাগ করিলে ইহার সে শক্তি অবলুপ্ত হয়।

শরীরের বিশেষ কোন অংশের সঙ্গে প্রাণী বা প্রাকৃতিক কোন বস্তুর বিশেষ কোন অংশের বাহ্যিক হুবহু সাদৃশ্য (superficial and deceptive

1. The bones were then painted with red ochre, the skull decorated with valuable feathers and publicly exhibited for a time, after which they were re-buried. p. 282. The Origins of Religion—Karsten (1935)

2. The soul and the magical power proceeding from it may also occur out-side man, in animals, in plants and in inanimate objects of nature. p. 75. Ibid.

resemblance) লক্ষ্য করিয়া আদিম সমাজের কোন কোন গোষ্ঠী মনে করিত যে লোকের আত্মা দেহত্যাগের পরে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্বপর্যন্ত সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণী বা প্রাকৃতিক বস্তুতে অধিষ্ঠান করিতে পারে। কিছুকাল পরে তথা হইতে আত্মা দেহত্যাগের পূর্বে যে বংশে জন্ম লইয়াছিল আবার সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইভাবে জাত মানুষের শরীরের অংশবিশেষের সঙ্গে প্রাণী বা কোন প্রাকৃতিক বস্তুর বিশেষ কোন অংশের সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হওয়ায় বিষয়টি ধরা পড়ে। এই শ্রেণীর জাতকের বংশধরগণ সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণী বা প্রাকৃতিক বস্তুকে তাহাদের বংশের প্রতীক বলিয়া মনে করিত এবং অনেক সময় প্রতীকের নাম অনুযায়ী তাহারা বংশের নামকরণ করিত। ইহাই totemism ; totem কে (বংশপ্রতীক) আদিম মানব অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত ও ইহার পূজা করিত। প্রাণী totem হইলে আদিম সমাজে ইহার হত্যা একেবারেই নিষিদ্ধকরা হইত। সূর্য, চন্দ্র, হংস, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৎস্য, ঈগল, বৃক্ষ, প্রস্তর, পাহাড়, ঝরণা প্রভৃতি চেতন-অচেতনবস্তু আদিম সমাজে totem রূপে গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লালটিয়া (red macaw) ব্রাজিলের Baroro গোষ্ঠীর totem, নিগ্রোদের মধ্যে এক প্রকার কাল শকুন (black urubu vulture) এবং Guiana-র Arawak গোষ্ঠীর মধ্যে প্রস্তর totem রূপে গৃহীত ; মোঙ্গলদের totem ছিল ভালুক।

আদিম সমাজে রোগের কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তাই জনগণ রোগকে অশুভ আত্মার (evil spirit) খেয়াল বা ক্রোধের ফলস্বরূপ বলিয়া মনে করিত। অশুভ আত্মা কোন-না-কোন প্রকারে দেহে প্রবেশ করিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করে। কাজেই রোগমুক্তির জন্য অশুভ আত্মাকে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইত। বর্তমান কালেও সভ্য সমাজে এই ধরণের রীতির পরিচয় পাওয়া যায় ; ওলাদেবীর প্রভাবে ওলাউঠা ও শীতলাদেবীর প্রভাবে বসন্ত দেখা দেয় বলিয়া এই সকল রোগের প্রকোপ দূর করিবার জন্য রোগাধীশ্বরী শক্তির (দেবতার) পূজাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা পল্লীঅঞ্চলে প্রচলিত। আদিম সমাজের আর একটি বিশ্বাস ছিল এই যে মৃতের আত্মা সমাধিস্থলে বসবাস করে। সিদ্ধ পুরুষরা মন্ত্রশক্তি ও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই সব আত্মাদ্বারা ইচ্ছানুসারে মানুষের উপকার বা অপকার করিতে পারে ও নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে।

[1]জাদুশক্তিসম্পন্ন মানব জাদুশক্তিদ্বারাও বহুবিধ রোগ সৃষ্টি করিতে পারিত। এই সব রোগ সহজেই ঐন্দ্রজালিক কর্তৃক নরদেহে চালিত হইত। এরকম স্থলে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ (sorcerer) কর্তৃক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সাহায্যে দেহ হইতে রোগ বহিষ্কার করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। আশীর্বাদ এবং অভিশাপের ঐন্দ্রজালিক শক্তি (magical energy) থাকে বলিয়াও আদিম মানবের বিশ্বাস ছিল। ইহাদের শুভাশুভ ফল একদেহ হইতে অন্যদেহে চালান করা (transmit from one person to another) সম্ভব হইত। সিদ্ধপুরুষগণ ভৌতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অশুভ আত্মা, জাদু-শক্তি অথবা অভিশাপ সৃষ্ট রোগ আক্রান্ত দেহ হইতে শত্রুদেহে চালান করিয়া দিতে পারিতেন। কখনো আবার বৃক্ষাদিকে scapegoat করিয়া তাহাতেও রোগ চালান দিবার ব্যবস্থা করা হইত। ইঁদুরের উৎপাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ইঁদুরের মুখে দন্তরোগ চালানের রীতি আমাদের দেশে কোন কোন আদিবাসীর মধ্যে প্রচলিত আছে। ব্যথাহত দন্ত উৎপাটন পূর্বক ইহাকে মন্ত্রপূত করিয়া ইঁদুরের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়; ইহার ফলে ইঁদুর দন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় মানুষের ক্ষতি সাধন হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়। দেহে অশুভ আত্মা ভর করায় মূর্ছা রোগের উদ্ভব হয়, ওঝার ভৌতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই জাতীয় রোগ দূর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। আদিম সমাজের এই রীতি পল্লীবাংলায় এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। এইরূপ নানা সংস্কার আদিম সমাজে জনমানসে দেখা দিয়াছিল।

বিবর্তনের ধারাগুলি অনুসরণ করিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া গেলে আমরা এমন একটি স্তরে উপনীত হইব যেখানে মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে মানুষের ব্যবধান খুবই কম, যেখানে মানুষ পশুর মতই সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি ও বহিঃপ্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বন্যজীবন যাপন করিতেছে, ফলমূল আহরণ করিয়া অথবা বন্য পশুর কাঁচা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, অবাধে আত্মপ্রজনন করিয়া বংশ রক্ষা করিতেছে, এবং তাহার স্বল্পোন্মেষিত মনন-শক্তিকে আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রজননের কর্মের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই

---

1. There is a large and miscellaneous number of diseases that primitive man attributes to witch-craft, without at the same time necessarily ascribing them to the visitation of bad spirits. p. 28. The Threshold of Religion Dr. R. R. Marett, (Lond. 1909).

স্তর অধিকাল স্থায়ী হয় নাই; ইহার প্রমাণ—গবেষকরা এমন কোন আদিম গোষ্ঠীর সন্ধান পান নাই যাহার মধ্যে কিছুকাল পরে মননশক্তি বলে অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করে নাই। সমাজের আদিম অবস্থার কোন এক বিশেষ পর্যায়ে মানুষের মনে ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে যে অতিপ্রাকৃত কোন একটা শক্তি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সব কিছুর পিছনে থাকিয়া সকলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কে শাসন করিতেছে। এই অতিপ্রাকৃত সত্তার কল্পনা বা অনুমান তখনই সম্ভব হইয়াছিল যখন মন বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপণ ও হেতুনির্ধারণে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। উন্নত নৈয়ায়িক চিন্তার যুক্তি-পরামর্শে যে যুক্তি পারিপাট্য লক্ষিত হয় তাহা না থাকিলেও কার্যের সহিত কার্যের, ঘটনার সহিত ঘটনার, বস্তুর সহিত বস্তুর যোগ বা যুক্তি সন্ধান করিবার একটা প্রাথমিক প্রয়াস না দেখা দিলে অতিপ্রাকৃত নির্বিশেষ সত্তার বা শক্তির কল্পনা মনে আসিতে পারে না। যে মনে এই ধরণের কল্পনা জন্মিয়াছিল তাহাকে প্রাক্‌নৈয়ায়িক (prelogical) বলা গেলেও অনৈয়ায়িক (alogical) বলা চলে না। আদিম মন এই অর্থেই প্রাক্ নৈয়ায়িক ছিল যে উন্নত নৈয়ায়িক চিন্তার ক্ষমতা ইহার ছিলনা, কিন্তু একেবারেই চিন্তা করিতে পারিত না অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনৈয়ায়িক ছিল একথা মানিয়া লওয়া যায় না। আদিম সমাজের মানুষের প্রাক্ নৈয়ায়িক মনে প্রাথমিক পর্যায়ে যে 'animistic' ধারণা জন্মে তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া কালক্রমে দেবদেবী-চেতনা বা আধিদেবতা ধারণায় পরিণত হয়। এই ধারণা বা বিশ্বাস যেদিন উদ্ভূত হইয়াছিল সেদিন হইতেই ইহা একটি নিয়ামক শক্তিরূপে জীবন-যাপনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করে।

জীবনযাপন যেমন ধারণার সৃষ্টি ও পরিবর্তন করিয়া আসিতেছে, ধারণাও তেমনি জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানবসমাজের প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে; আজও ইহার বিরাম নাই এবং কোনদিনই ইহা বন্ধ হইবে না। আদিম সমাজের আর্থনৈতিক জীবন আহরণ-শিকার-পশুপালনের অতি নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ থাকায় মানবমনে পরিবেশের জ্ঞান গভীর এবং মানসিক ক্রিয়া জটিল হইতে পারে নাই। কিন্তু ক্রমে পরিবেশের জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় ও মনন শক্তির উন্নতি ঘটায় মানুষ কৃষি বা শস্যোৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল। ইহার ফলেই মানুষ যাযাবর জীবন হইতে স্থিতিশীল গ্রাম্য জীবন যাপনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। আহার সংগ্রহের রীতি পরিবর্তনের জন্য কেবল যে আর্থনৈতিক ও সমাজিক জীবনেই

রূপান্তর দেখা দিয়াছিল তাহা নহে,—পরিবেশ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে এবং অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধেও নূতন নূতন ধারণা-বিশ্বাস উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নানা অনুষ্ঠান-উৎসবও প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ সকল অনুষ্ঠানে সমগ্র গোষ্ঠী সমষ্টিগত ভাবে অংশ গ্রহণ করিত এবং নানা উপকরণে অতিপ্রাকৃত নিয়ামক শক্তিকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। শ্রেণীবিভাগ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া আদিম সমাজের মানুষ অনুষ্ঠান উৎসবাদিতে সমষ্টিগতভাবে আবেগ উপলব্ধি করিত। এমন কি কালক্রমে যখন উৎসবাদির রীতি জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিশেষ শ্রেণীর হস্তে উৎসব অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল তখনও সমগ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সামষ্টিক আবেগ জাগ্রত ও সঞ্চারিত করাই উৎসবাদির প্রধান উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে সমষ্টিগত ভাবে আবেগ-সম্ভোগ আদিম সমাজের মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে; কারণ যখন লোকনাট্যের সংজ্ঞা প্রস্তুতির চেষ্টা করা হইবে তখন বিশাল জনসমাজের মধ্যে ভাবাবেগ সঞ্চার করিবার অভিপ্রায় হইতে যে সকল রীতি প্রচলিত হইয়াছিল সেই সকল রীতি-বৈশিষ্ট্যের উপরই জোর দেওয়া হইবে। আর্থনৈতিক অবস্থার হীনতা, বলিতে গেলে শূন্যতা (negative) ও প্রাক্‌নৈয়ায়িক মন—এই দুইটি পরস্পর-সম্বন্ধ কারণের সংযোগে আদিম সামাজিক মানুষের আচরণ প্রধানত সামষ্টিক (collective) হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ দুইটিকে পরস্পর-সম্বন্ধ বলা হইল এই জন্য যে আর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতি ঘটিয়াছে অথচ মন প্রাক্‌নৈয়ায়িক স্তরে পড়িয়া আছে ইহা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি মনের শক্তি বাড়িয়াছে অথচ আর্থনৈতিক অবস্থা আদিম পর্যায়ে রহিয়াগিয়াছে ইহাও অসম্ভব। পরিবেশের সহিত বুঝাপড়া করিতে গিয়াই একদিকে যেমন মনের শক্তি বাড়িয়াছে অন্যদিকে তেমনি পরিবেশ চেতনার মাত্রা ও আর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। পরিবেশের সঙ্গে মনের পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার এই সম্পর্ক স্বীকার না করিলে ইহার নিরপেক্ষ সত্তাকে মানিয়া লইতে হয়; এই সঙ্গে ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে পরিবেশ বা আর্থনৈতিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন মন যে কোন যুগে যে কোন চিন্তা করিতে সক্ষম এবং পরিবেশ দ্বারা চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয় না। আর উল্লিখিত পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকার করিলে মনকে পরিবেশ-সাপেক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং চিন্তার অগ্রগতির ইতিহাসকে সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের

পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা শেষোক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছি এবং এই কথাই বলিয়াছি যে জীবন যেহেতু অভিযোজন (adaptation) প্রচেষ্টার সমষ্টি, অভিযোজন প্রচেষ্টা হইতেই চিন্তার জন্ম ও অভিযোজন ব্যাপারটি মূলত আর্থ,নৈতিক সেইহেতু আর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত ব্যক্তির মানসিক অবস্থার নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান ; এই জন্যই আর্থ নৈতিক অবস্থার আদিমস্তরে জীবনযাত্রা ছিল সামষ্টিক, ব্যক্তিমনও ছিল প্রাক্‌নৈয়ায়িক।

আদিম সমাজ আহরণ-শিকারযুগ অতিক্রম করিয়া পশুপালন ও কৃষিযুগে উন্নীত হওয়ায় কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া যেমন নূতন বিশ্বাস এবং উৎসবানুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তেমনি কৃষিযুগে স্থাবর জীবন যাপনের তাগিদে নানা বিধিনিষেধও রচিত হইয়াছিল। এই কৃষিস্তরকে সমাজের ভিত্তি-প্রস্তর রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ সমাজ যত শিল্প সমৃদ্ধই হউক না কেন আজও ঐ ভিত্তিটি বদলাইতে পারে নাই, আজও কৃষি আর্থ নৈতিক জীবনে একটি বড় জায়গা জুড়িয়া আছে। এই স্তরে সমাজে যে মানসিকতার বনিয়াদ পাকাপাকি-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই পরবর্তী স্তরের মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং নূতন মানসিকতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া আজও নিজেকে পরিবর্তিত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সচেতন বা অচেতন ভাবে অনুসৃত নানা প্রকার প্রথা, রীতি, আচরণ ও নিষেধ-নিয়মাদি অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞানীরা যাহাকে [1]mores and taboos বলিয়াছেন এই স্তরেই তাহা বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিল এবং পরিবর্তন-পরিমার্জনের ভিতর দিয়া আজও ইহা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সংলক্ষ্য বা অসংলক্ষ্যভাবে বিরাজ করিতেছে। একটি অতি আধুনিক সমাজের আচার-অনুষ্ঠানাদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে বাহিরের অতি আধুনিক খোলসটির মধ্যে প্রাচীন আচার ও বিশ্বাসের শাঁসটুকু রহিয়া গিয়াছে এবং আধুনিক মানসিকতার সামান্য একটি আবরণের তলে লোকমানসিকতার স্তরটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কিন্তু সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে লোক-মানসিকতার স্তরটি বিরাজ করা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে লোকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি কি?

---

1. The mores represent the living character of a group or community operative in conscious or unconscious control over its members. They both compel behaviour and forbid it; in their forbidding function we know them as taboos. p. 20, Society—Maciver & Page (1935).

নিশ্চয়ই আমরা তাহা করিতে চাহি না। কারণ তাহা হইলে সকলেই লোক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবে এবং যেখানে সকলেই 'লোক' সেখানে লোক বলিয়া পৃথক কোন শ্রেণী থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য, লোকশ্রেণী না থাকিলে—লোকবৈশিষ্ট্য বলিয়া পৃথক কিছু না থাকিলে—লোকশিল্প প্রকৃত প্রস্তাবে লোকনাট্য বলিয়াও কোন কিছু থাকিবে না। অতএব এখানেও আমাদের 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশঃ'—এই সূত্র প্রয়োগ করিয়া লোক-মানসিকতার প্রাধান্যের ভিত্তিতে লোক-অলোক বিভাগ কল্পনা করিতে এবং লোকশিল্পের মূলরীতির বা বৈশিষ্ট্যের সদ্‌ভাব যে শিল্পে থাকিবে সেই শিল্পকে লোক-শিল্প বলিয়া গণ্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

লোকমানসিকতার প্রাধান্য অপ্রাধান্য দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠিবে যে লোকমানসিকতার পরিবর্তন বা হ্রাস ঘটিয়াছে কি কারণে। কি কারণে জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে লোকমানসিকতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিয়া আছে এবং অপরাংশের মধ্যে অন্যরূপ মানসিকতার উদ্ভব ঘটিয়াছে—লোক-মানসিকতার মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে—এই প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর সমাজবিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষত সমাজে কিভাবে শ্রেণী বিভাগ ঘটিয়াছে, ক্রমে ক্রমে বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য ঘটিয়াছে, গ্রাম-সভ্যতার স্তরের পরে নাগর সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কিভাবে কৃষিযুগের পরে শিল্পযুগ দেখা দিয়াছে তাহার ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না। সকলে সমান অধিকার ভোগ করিত বলিয়া কাহাকেও 'লোক' বলিয়া উপেক্ষা করিবার মত সে সমাজে কেহ ছিল না। শ্রমবিভাগ তথা শ্রেণী-বিভাগ হইবার পরে শক্তির বা অধিকারের ও কৃষ্টির পার্থক্যের ভিত্তিতে সাম্যাবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ও বৈষম্য দেখা দিয়াছিল। শ্রমবিভাগ তথা শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে এই বৈষম্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

গৃহ-নির্মাণের পরে আদিম-মানবের মধ্যে কর্মবিভাগ সুরু হয়। অপেক্ষাকৃত কম শারীরিক শক্তির জন্য নারী রন্ধন, সীবন, বয়ন প্রভৃতি গৃহকর্মে নিযুক্ত হইত এবং অধিক শক্তিশালী নর খাদ্য সংগ্রহ, অস্ত্রনির্মাণ, শিকার ও যুদ্ধকর্মে লিপ্ত থাকিত। কেবল স্ত্রীপুরুষ ভেদে এই কর্মবিভাগ সাধিত হয়; ইহাতে কোন শ্রেণী চেতনা ছিল না। পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক লোক যখন ধাতু দ্রব্যের ব্যবহার, পাত্রনির্মাণ, নৌকাগঠন, যুদ্ধরথ প্রস্তুতকরণ এবং গৃহের জন্য ইষ্টকাদি

তৈরির কাজে মনোনিবেশ করিল তখন পশুচারিক জনগণ তাহাদের হইতে পৃথক হইয়া গেল। এইখানে প্রথম সামাজিক কর্মবিভাগের সূচনা। শ্রেণী-চেতনার বীজ ও ইহারই মধ্যে উপ্ত। এই সময় হইতে একবিষয়ের কর্মী কর্তৃক অন্য বিষয়ক কর্মীর উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিবার সুবিধা গ্রহণের জন্য দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত হয়। কর্মীরা সকলেই প্রধানত জমির চাষ করিত; কেবল অবসর সময় প্রবণতা অনুসারে অন্যকাজে লিপ্ত হইত। প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করিয়া নিপুণতা অর্জন করিবার পরে কিছু লোক চাষ ছাড়িয়া অন্য কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগী হইতে আরম্ভ করে। কাজেই [1]গোষ্ঠীর চাষের জমি গৃহপতিদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়; আবার একই গৃহের লোক প্রবণতা-অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করিতে থাকায় শেষপর্যন্ত চাষ-আবাদে মনোযোগী ব্যক্তির হাতেই জমি আসে, এবং এই ভাবে চাষবাসের ফলে জমির উপর চাষীর একপ্রকার দখলিস্বত্ব জন্মায়। এই স্বত্ব লইয়া কেহ কৃষিকাজে ও পশুপালনে, আবার কেহ বা শ্রমশিল্পে বিশেষভাবে নিযুক্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে।

এদিকে ক্রমে জনসংখ্যা বাড়িতে থাকায় যেমন কৃষিকর্ম তেমন শ্রমশিল্পেও অধিক লোক যোগদান করিতে থাকে। কাজের সুবিধার জন্য উভয় সম্প্রদায় কর্মস্থলের কাছাকাছি বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ফলে কৃষিকাজ ও শিল্প-কর্ম লইয়া দুইটি পৃথক অঞ্চল গড়িয়া উঠে এবং কৃষিজনপদে পল্লী ও শিল্পাঞ্চলে সহরের পত্তন হয়। অল্পায়াসলভ্য জীবিকাদ্বারা পল্লীতে সরল জীবন যাপন অভিপ্রেত হওয়ায় অনেকেই কৃষিকার্যে ব্যাপৃত হয়; এদিকে ক্রমে শ্রমশিল্পের অগ্রগতির ফলে শিল্পাঞ্চলে লোকাভাব দেখা দেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য সমাজে একটি প্রথা প্রবর্তিত হয়, ইহা ক্রীতদাস প্রথা। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহে বিজয়ী দল [2]যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া কর্মিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই ক্রীতদাসকর্মীদের প্রভুরা শাসন ও শোষণ করিত। প্রভু ও ক্রীতদাস প্রথার মধ্যে সমাজে শোষণবৃত্তির সূচনা হয়।

---

1. ......later by the gens to the house hold communities and finally to individuals for use, the users may have certain rights of possession, but nothing more. p. 148. The Origin of the Family Private Property and the State-F. Engels (Newyork-1943).

2. Prisoners of war were turned into slaves......masters and slaves, exploiters and exploited. p. 149—Ibid.

ক্রীতদাসগণ বহুবিধ কর্মের মধ্য দিয়া প্রভুদের খুশি করিতে চেষ্টা করিত। খুশি করিতে না পারিলে অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া দিন যাপন করাই হইত তাহাদের পরিণাম। এইভাবে স্বাধীন মানবের পাশে পরাধীন মানবরূপে আর একটি শ্রেণী গড়িয়া উঠে। ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত হওয়ায় উৎপাদন বর্ধিত হইল। ইহার ফলে ব্যবসার সাহায্যে অনেক শিল্পপতি অধিক সম্পদের অধিকারী হওয়ায় আর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য দেখা দেয়।

সহরাঞ্চলের জনগণ অধিকতর বুদ্ধি, শক্তি ও সম্পদশালী ব্যক্তিকে তাহাদের নেতারূপে নির্বাচন করে। এই নেতাদ্বারাই রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। রাজতন্ত্রের সঙ্গে অঞ্চল রক্ষার জন্য যুদ্ধনেতা ও আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভা গঠিত হয়। আবার যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা রাজ্য বিস্তৃত হওয়ায় শাসনের সুবিধার জন্য রাজতন্ত্রের অধীনে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হইল। রাজা বসবাস করেন সহরে, আর সামন্তগণ পল্লীঅঞ্চলে রাজদৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া ও নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খুশি মত গ্রাম শাসন করিতে থাকেন। এই সামন্তশ্রেণী আর্থনৈতিক কারণে সাধারণ পল্লীবাসী অপেক্ষা যেমন অধিকতর সুখসুবিধা ভোগ করিত তেমনি উন্নত কৃষ্টির ধারক বলিয়াও বিবেচিত হইত। ইহার পরে সহরে আবার আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়। উৎপাদনের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, কেবল পণ্য বিনিময় এই শ্রেণীর কর্ম। "[১]ইহারাও পরশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপন্ন শস্য সস্তায় লইয়া মুনাফা করে, শ্রমিককে তাহার শ্রমমূল্য ফাঁকি দেয়। তাহাদের এই মুনাফাই শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম, যাহার দর সে পায় না।" এই সম্প্রদায়ের নাম বণিক। ধাতু-নির্মিত মুদ্রা ইহাদের পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম। এই মধ্যস্বত্বভোগী বণিক সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হওয়ায় সামন্তগণকে আর মানিতে চাহিল না। দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে ও অভিজাত বুর্জোয়া পুঁজিদার বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই অভিজাত পুঁজিদার বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থের সহায়তায় কেবল যে উৎপাদক ও উৎপাদনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাহাই নহে, ইহা জমিকে পণ্য দ্রব্যে পরিণত করে ও বন্ধকি রীতির প্রচলন করে। ইহার ফলে আর্থিক সংকটে পড়িয়া অথবা আপাত অর্থের লোভের জন্য বহুলোক

১ সংস্কৃতির রূপান্তর—পৃ—৩৫—গোপাল হালদার, ১৩৪৮

জমির ব্যক্তিগত মালিকানা হারাইয়া ভূমিহীন হইতে থাকে। ভূমিহীনরা জীবিকার্জনের জন্য নানা কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে থাকে ; এই কর্মের ভিত্তিতেও সমাজে কতগুলি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এমনিভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যাহাদের আর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিক তাহারাই অধিক সুখ সুবিধার অধিকারী হইতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সুখসুবিধা ভোগ করিবার বাসনা বর্তমান। তাই আর্থনৈতিক কারণে সমাজে শ্রেণীসংঘাত ক্রমে তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে। এই সংঘাত প্রশমনের জন্য বহুবিধ আইনের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই আইনের ধারকরূপে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিল। রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কিন্তু শ্রেণীসংঘাত ঘুচিল না। কারণ আইন প্রণয়নে আর্থনৈতিক সম্পদে প্রবল অভিজাত বণিক সম্প্রদায়ের প্রভাব বহুলাংশে কার্যকরী হইতে লাগিল। কাজেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূলত অভিজাতদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হইল। এমনিভাবে আদিমযুগের স্বাভাবিক গণতন্ত্র নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া উৎকট অভিজাততন্ত্রে রূপান্তরিত হইল। এই সমাজ ব্যবস্থায় শক্তিশালী সংখ্যালঘুশ্রেণী স্বার্থপরতা, লোভ, পশুবৃত্তি, পরস্বাপহরণস্পৃহা, প্রবঞ্চনা, বলপ্রয়োগ ও দেশদ্রোহিতাদ্বারা সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণীকে বহুবিধপ্রকারে কুম্ভিপাকচক্রে ফেলিয়া নির্যাতিত ও শোষিত করিয়া নিজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে ব্যস্ত।

সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ও বৈষম্যের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে সমাজের আর্থনৈতিক সমানাধিকার ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া রাজার অধিকার-কেন্দ্রে গিয়া পৌঁছাইয়াছিল এবং সামন্তের উপকেন্দ্রে গিয়া সংহত হইয়াছিল। আর্থনৈতিক অধিকারের এই সংকোচন ও বৈষম্যকে ভিত্তি করিয়া এবং রাজা-রাজামাত্যদের বাসগৃহকে কেন্দ্র করিয়া নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয়ও উল্লেখ করিবার আছে ; তাহা এই যে কৃষ্টির আভিজাত্য, আর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক অধিকারকে অধিক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া সমাজের মধ্যে যেমন নগর-কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল তেমনি ধর্মাভিজ্ঞতা ও ধর্ম-শিহরণজাত (religious experience and religious thrill) দেব-তোষণী বিদ্যার অর্থাৎ মন্ত্র-তন্ত্রের উপর বিশেষ অধিকার দাবি করিয়া বিদ্যাভিজাত শ্রেণীরও উদ্ভব হইয়াছিল। এই শ্রেণীই পুরোহিত তন্ত্রের ধারক। দেবতা, অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে পুরোহিত সম্প্রদায়ের চিন্তাশীলতা হইতেই প্রণালীবদ্ধ ধর্মীয় রীতি ও উপাখ্যানাদির সৃষ্টি সম্ভব হয়। যাহা হউক, উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর শক্তি নিহিত ছিল ভূম্যৈশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে,

নিজেদের এবং অনুগতজনের দৈহিক ক্ষমতার মধ্যে—শৌর্যবীর্যের মধ্যে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায়ের শক্তি নিহিত ছিল দৈববিদ্যার মধ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে ও সকলের প্রভু রাজার উপরেও প্রভুত্ব থাকিবার মধ্যে। এই বিদ্যার আভিজাত্যকে সংক্ষেপে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য বলা যাইতে পারে। ইহা সত্য যে পুরোহিত যেখানে রাজা হইয়া বসেন নাই, যেখানে রাজবংশ ও পুরোহিত বংশ পৃথক ধারায় রহিয়া গিয়াছে, সেখানে আভিজাত্যের একাধিক কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, আর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক আভিজাত্যের কেন্দ্রের পাশাপাশি বিদ্যাভিজাত্যের কেন্দ্রও গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা হইলে মোট কথা এই যে অর্থশক্তি এবং বিদ্যাশক্তি বা কৃষ্টির বণ্টন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের লোক-আলোক বিভাগের ভিত্তি খুঁজিতে হইবে।

আদিম স্তর হইতে শুরু করিয়া নাগরিক সভ্যতার স্তরে পৌছান পর্যন্ত যে কোন একটি মানবগোষ্ঠীকে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে—আহরণ ও শিকার যুগে এবং পশুপালনযুগে মানবগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল যেমন অল্প তেমনি জীবন ছিল যাযাবর; গোষ্ঠীর মধ্যে সকলের অধিকারই প্রায় সমান ছিল এবং শ্রম-বিভাগ ছিলনা বলিয়া কোনরূপ শ্রেণীবিভাগও ছিল না। তবে অন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে বা বন্য পশুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অথবা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায় যে বা যাহারা অধিক দৈহিক বা মানসিক শক্তি দেখাইতে পারিয়াছিল সে বা তাহারাই যে গোষ্ঠীর অন্য ব্যক্তির কাছে নায়কের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল এ অনুমান খুবই স্বাভাবিক। এই নায়ক কালক্রমে গোষ্ঠীপতি এবং আরও পরে রাজা হইয়া বসিয়া ছিলেন।

কৃষি আবিষ্কৃত হইবার পরে নির্দিষ্ট ভূভাগ হইতে শস্য বা আহার্য সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় যেমন মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়াছিল তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ও পরিবার-চেতনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ অধিক পরিমাণে ভূমি অধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল এবং মূল-উপনিবেশ হইতে দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের দূর দূর ভূমিতে কৃষিকার্য করণ ও বাসস্থান নির্মাণ,—অন্যদিকে অপরের শ্রমলব্ধ শস্যের উপর নির্ভর করিয়া গোষ্ঠীপতি বা রাজা ও তাহার সহচরদিগের মূল উপনিবেশে সুদৃঢ় বাসগৃহে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান এবং মূল উপনিবেশটিকে সুদৃশ্য করিয়া তুলিবার জন্য প্রাচীর, রাস্তাঘাট, উপবন, দেবগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ—এই দুইটি প্রবৃত্তির প্রেরণায় ক্রমে জনগোষ্ঠী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মূল উপনিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল পরিবার দূরবর্তী ভূমিতে কৃষিকার্য করিত তাহারা গ্রাম্য বলিয়া পরিগণিত হইল। আর যাহারা রাজার বাসস্থানকে কেন্দ্র করিয়া রাজ-ঐশ্বর্যের অংশভাগী হইয়া বাস করিয়াছে তাহারা ক্রমে নাগরিক আখ্যা লাভ করিয়াছিল। বলা যাইতে পারে কেন্দ্রাতিগ প্রবৃত্তি হইতে গ্রামের এবং কেন্দ্রানুগ প্রবৃত্তি হইতে নগরের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেন্দ্রাতিগ প্রবৃত্তি বর্ধিত জনসংখ্যার একাংশকে দূরে অসংস্কৃত ভূমিতে বসবাস করিতে বাধ্য করিয়াছিল; এবং কেন্দ্রানুগ প্রবৃত্তি মূল উপনিবেশের চারিপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সুগম ও সুখকর পরিবেশে বাসস্থান নির্মাণে অন্যাংশকে—শক্তিমান অংশকে—আকৃষ্ট করিয়াছিল। এইভাবে জনপদে জনপদে গ্রাম্য ও নাগরিক এই দুই শ্রেণীতে জনগণ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কেন নগর গড়িয়া উঠে—এই বিষয় সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানের গ্রন্থে যে আলোচনা পাওয়া যায় তাহাতে এই কথাই বলা হইয়াছে যে ধন-সম্পদই নগরোৎপত্তির প্রধান কারণ এবং উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদ বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ শোষণ প্রক্রিয়াদ্বারা সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে Maciver এবং Page-এর গ্রন্থ হইতে একটি মন্তব্য উদ্ধার করিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে—[1]তখনই নগরের উৎপত্তি হয় যখন কোন সমাজ বা সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী জীবন ধারণের উপযোগী ধনসম্পদ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ধনসম্পদের অধিকারী হয়। প্রাচীন যুগে এই ধনসম্পদ অর্জিত হইত প্রধানত মানুষের উপর মানুষের আধিপত্যের মাধ্যমে। নাগরিক জীবনের মারাত্মক ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল দাসপ্রথা, বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং বিজেতা বা শাসক শ্রেণীদ্বারা কর আদায় করিবার উপরে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এক শ্রেণীর শ্রমলব্ধ ধনের একটি মোটা অংশ আর এক বিশেষ শ্রেণীর বিনাশ্রমে ভোগ করিবার অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত এবং ধনোৎপাদক কৃষক শ্রেণীকে ঐ বিশেষ শ্রেণীর বাসস্থান হইতে দূরবর্তী স্থানে বসবাস করিতে বাধ্য না করা পর্যন্ত নগরোৎপত্তি সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী শিল্প-বাণিজ্যের যুগে বাণিজ্য বা শিল্প

1. Cities grow wherever a society, or a group within it, gains control over resources greater than are necessary for the mere sustenance of life. In ancient civilizations these resources were mainly acquired through the power of man over man. The growth of city life rested on the precarious foundations of slavery, forced labour and taxation by the conquering or ruling class ; p. 314—Society—R. M. Maciver & C. H. Page (Lond. 1955).

কারখানাকে কেন্দ্র করিয়া নগর গড়িয়া উঠিলেও প্রথম নগরের পত্তন হইয়াছিল রাজার রাজ প্রাসাদ বা রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়াই। বলা বাহুল্য, কৃষকদিগের শস্য সম্পদ হইতে রাজার এবং রাজানুচরদের ভোগের জন্য একটি মোটা অংশ কর হিসাবে আদায় করিবার ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত জনপদের মধ্যে উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী 'গ্রাম্য'—এবং উৎপন্ন দ্রব্য ভোগকারী 'নাগরিক' এই দুই বিভাগ স্পষ্ট হইতে পারে নাই। যে মূল কারণে নগরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে সেই মূলকারণটির মধ্যেই যেমন নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনা নিহিত আছে, তেমনি যে কারণে জনগনের একাংশ নগর হইতে দূরে গ্রামে বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছে সেই কারণটির মধ্যেই গ্রাম্য জীবনের বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞানীরা যে এ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায়,—

(ক) গ্রাম্য জীবনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল গ্রামের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা (relative isolation—semi-isolation of the family and prominence of primary relations); নগর হইতে দূরে কতগুলি পরিবার কৃষিক্ষেত্র বা বনপ্রদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসবাস করে। এই সব বসতি যে শুধু নগর হইতে ব্যবহিত তাহা নহে অন্য বসতি হইতে কৃষিক্ষেত্র, বনপ্রদেশ বা নদীনালাদ্বারা বিচ্ছিন্ন। ইহার ফলে [1]অধিকাংশ আর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গ্রামসদস্যদের পরিবার-মণ্ডলের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। সমবেত জনশ্রম ও পারস্পরিক সহযোগিতা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধনও বিশেষভাবে দৃঢ় করিয়া দেয় এবং গৃহনির্মাণ স্থলের ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্য স্বভাবত পারিবারিক ঐক্য জোরদার হইয়া উঠে।

বাহিরের সহিত সংযোগস্থাপনের সুযোগ কম থাকায় গ্রাম্যদের মধ্যে পারিবারিক রীতি-নীতি বা প্রথা দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়া থাকে, পারিবারিক আচার-বিচারকে অভ্রান্ত এবং আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিবার গোঁড়ামি দেখা দেয় ও চিরাচরিত প্রথা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। তারপর বাহিরের

---

1. The family circle must supply the greater part of the economic and social needs of its members. The necessities of common toil and reciprocal services strongly corroborate the ties of family relationship. And the unity of the family itself is emphasized by the physical separation of the homestead. p. 317—Society—R. M. Maciver & C. H. Page (Lond. 1955)

সঙ্গে সম্পর্ক কম বলিয়াই পরিবারের লোকজনের প্রতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি আসক্তি বেশী হয়।

(খ) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় প্রধান বৃত্তি সংস্পর্শ (impact of predominent mode of occupation) হইতে। গ্রাম্য লোকের প্রধান বৃত্তি বিশেষ ক্ষেত্রে শিকার বা মাছধরা হইলেও সাধারণ ক্ষেত্রে কৃষি ও পশুপালন। বৃত্তি কি হইবে তাহা যদিও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারাই শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তথাপি একটি বিষয় লক্ষণীয় যে গ্রামের লোক প্রধানত শিকারী, জেলে, পশুপালক বা কৃষক যাহাই হউক না কেন প্রকৃতির সহিত তাহাদের যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতিকে তাহারা শিল্পীর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখে না বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতেও লক্ষ্য করে না। প্রকৃতির সহিত তাহাদের যোগ বিষয়ী মানুষের যোগ; প্রকৃতির নিকট হইতে ফলমূল শস্য আদায় করিবার মনোভাব লইয়া তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার করে। প্রকৃতি তাহাদের বন্ধু বা শত্রু। প্রকৃতির অনুকূল ব্যবহারের উপরে শস্যের সুফলন নির্ভর করে এবং প্রতিকূল আচরণে শস্যের বিনাশ ঘটে বলিয়া তাহারা প্রকৃতিতে জীবন্ত ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে। প্রকৃতির দুর্বার দুরধিগম্য ও রহস্যময় শক্তির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বাস করায় গ্রাম্য লোক ধর্মীয় আবেগে বেশী উদ্দীপিত হয় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে (grows imbued with religion and with superstition)। বারমাসে তের পার্বণ করিয়া তাহারা প্রতিকূল দৈবশক্তিকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে ও চিরাচরিত প্রথা অনুবর্তন করিয়া চলে। কৃষিপ্রধান বৃত্তি ও জমি জীবিকার্জনের প্রধান সহায় বলিয়া গ্রাম্য লোকে ভূমিকেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং মূলধন বলিয়া মনে করে; কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা তাহাদের কাছে প্রধান উৎসব। কৃষি জীবিকার্জনের মুখ্য উপায় হওয়ায় গ্রাম্যলোকের মানসিকতা নাগরিক শ্রমিকের মানসিকতা হইতে একটু স্বতন্ত্র না হইয়া পারে না। নাগরিক শ্রমিক যেখানে উর্ধ্বতন কোন কর্মচারীর অধীনে ও নির্দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজ করিতে বাধ্য, নিজের জমি চাষ করুক বা পরের জমিই চাষ করুক গ্রাম্য কৃষক সেখানে অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া থাকে।

(গ) গ্রাম্য সমাজের প্রধান বৃত্তি কৃষি বা আর যাহাই হউক ইহার মধ্যেও শ্রমবিভাগ বা কর্মবৈচিত্র্য থাকে এবং ঐ শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে নানা আনুষঙ্গিক বৃত্তি ও শ্রেণী উদ্ভূত হয়।

(ঘ) গ্রাম্যজীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য—ব্যয়সঙ্কোচ ও সরলতা (simplicity and frugality of living)। কৃষকদের অর্থোপার্জন কখনই পর্যাপ্ত হয় না বলিয়া সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে অতি সরলভাবে তাহাদের জীবন যাপন করিতে হয়।

(ঙ) গ্রাম্য জীবনে পরিবার-প্রাধান্য বেশী। পরিবার আবার অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া গ্রাম্য জীবনে যৌথদায়িত্ব-চেতনার (group responsibility) মাত্রা অধিক। পরিবারের কর্তাকে সকলেই মানিয়া চলে। সম্পত্তি সমগ্র পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। বিবাহাদি ব্যাপারও পারিবারিক প্রথানুসারে অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার-প্রাধান্য ও যৌথদায়িত্ব-চেতনার ফলে গ্রাম্যজীবনে সামাজিক শাসন সহজেই সকলে মানিয়া লয়। সমাজের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিলে সমাজের হাতে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে, সমাজে বসবাস অসম্ভব হইবে—এই ভয় প্রত্যেকের মনে কমবেশী থাকে।

(চ) সহরের লোক সমাজের অংশীদার হইয়াও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (associative individualism) বজায় রাখিতে পারে; কিন্তু গ্রাম্যজীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য নাই, সেখানে ধৈর্যসহকারে চিরাচরিত প্রথার (persistent traditionalism) অনুবর্তন করিতে হয়।

(ছ) গ্রামের মানুষের মধ্যে সামষ্টিক চেতনা (we feeling) প্রবল; যুগপ্রভাবে কিছু কিছু ব্যক্তি-সচেতনতা দেখা দিলেও সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে এখনো সমষ্টিচেতনা পক্ষবিস্তার করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সহরবাসীর মধ্যে এই মনোভাব দুর্বল; এখানে ব্যক্তিরই প্রাধান্য।

(জ) মানুষের রীতি-নীতি, চাল-চলন, ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, আনন্দ প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম, ভাব-ভাবনা ও মানসিক গঠন প্রভৃতি অবলম্বনে যে জীবনধারার প্রকাশ তাহার মধ্যেই সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত রহিয়াছে,—"[1]Culture says consider these people then, their ways of life, their habits, their manners, the tones of their voice; look at them attentively; observe the literature they read; the things which give them pleasur, the words which come-forth out of their mouths, the thoughts which make the furniture of their mind." বিভিন্ন দিক হইতে সামগ্রিকভাবে উন্নত সামাজিক

1 Culture And Anarchy—M. Arnold

অবস্থার সৃষ্টি ও মনুষ্যত্ববোধের পরম উৎকর্ষ সাধনই সংস্কৃতির লক্ষ্য,—[1]"Culture which is the study of perfection, leads us......to conceive of true human perfection as a hermonious perfection, developing all sides of our humanity ; and as a general perfection, developing all parts of our society." এই সংস্কৃতি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—নাগরিক সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতি।

গ্রামের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে অতি সরল লোকগাথা, লোক-উপকথা, লোক-সংগীত, লোক-নৃত্য (cultural expression in the country side tends to retain a relatively simple form as folk-lore, folk-legends, folk-songs, folk-dances)—লোকনাট্য, লোকশিল্প প্রভৃতির মধ্যে।

গ্রাম্যজীবন ও নাগরিক জীবনের তুলনামূলক আলোচনা হইতে সমাজ-বিজ্ঞানীদের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত সংগ্রহ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে সকলেই আলোচনার সময় সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও মানসিকতার আর্থ নৈতিক ভিত্তিটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং নগরোৎপত্তির মূলে যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের, শ্রেণীদ্বারা শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস রহিয়াছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। গ্রাম্য লোকের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ, চিরাচরিত প্রথানুবর্তনের প্রবৃত্তি, কুসংস্কারও যৌথ চেতনা কেন এত বেশী তাহার ব্যাখ্যাও তাহাদের আলোচনায় পাওয়া যায়। ঐ সব আলোচনা হইতে আরো একটি সত্যকে পাওয়া যায়, গ্রাম্য লোকের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার মূলে রহিয়াছে আর্থ নৈতিক অনগ্রসরতা—সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোক যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাহা পাইবার অধিকারে বঞ্চিত থাকিবার অবস্থা। সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে, যাহারা বা যে সব শ্রেণী আর্থ নৈতিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে, অপরের জমি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, পশুপালন করিয়া বা এই জাতীয় কোন স্বল্পার্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনরূপে প্রত্যন্তপ্রদেশে কোনঠাসা জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহারা সাংস্কৃতিক জীবনের অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষার সুযোগসুবিধা লাভ করিতে পারে নাই। ফলে অসংস্কৃত মতিবুদ্ধি লইয়া তাহারা চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তন করিয়া কুসংস্কারকে আদিম বিশ্বাসের ঐকান্তিকতায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া জীবন যাপন করিয়াছে এবং সমাজের তলানিতে পরিণত হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া

1 Culture and Anarchy—M, Arnold

সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে বা জনযোষ্ঠীকে সমাজের কেন্দ্র হইতে পরিধিতে, নগর হইতে গ্রামে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং নগরের ও গ্রামের গণ্ডীর মধ্যেও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে তলানিতে পরিণত করিয়াছে সেই প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যাইবে যে তাহা আসলে আর্থনৈতিক।

নগর সীমানায় বাসকরা সত্ত্বেও নগরের প্রত্যেক ব্যক্তি আর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার দিক হইতে তথা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে এক নহে অর্থাৎ নগরেও তলানি শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে। আবার গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ নাগরিকের তুলনায় অসংস্কৃত বা অশিক্ষিত নহে, আর্থনৈতিক মর্যাদার দিক দিয়াও একই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে; সেখানেও অধিকতর ক্ষমতাশালীরা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাশালীদের কোনঠাসা করিয়া রাখিয়া গ্রামের তলানিতে পরিণত করিয়াছে। যেখানে সমাজ অবাধে বিবর্তিত হইতে পারিয়াছে সেখানে একই নৃগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রমবিভাগ তথা শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে এই ক্রমবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়; দেখা যায় যে অর্থক্ষমতার ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের স্থল হইতে সরিতে সরিতে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী কেন্দ্র হইতে পরিধিতে পৌছাইয়া গিয়াছে এবং আর্থনৈতিক অধিকারহীন ও সংস্কৃতিবিহীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সমাজ অন্যজনগোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া পরাজিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে অথচ সমাজের এক কোনে শূদ্র জীবন যাপন করিবার অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকারই দেয় নাই সেখানে সমাজের তলদেশে পাওয়া যায়—সমাজের নিজেরই তলানি শ্রেণীকে এবং ঐ বিজিত অসংস্কৃত অধিকারবিহীন জনগোষ্ঠীকে। সেখানে এই দুই শ্রেণীকে লইয়া লোকস্তর গঠিত হইয়া থাকে। ভারতীয় সমাজের কথাই ধরা যাইতে পারে। এই সমাজের শাঁসরূপে যদি আর্যজনগোষ্ঠীকে ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে আর্যজনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিন্যাস ঘটিয়াছে অর্থাৎ কোন শ্রেণী আর্থনৈতিক সামর্থ্য ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে উপরিতলে স্থান করিয়া লইয়াছে কোন শ্রেণী বা ঐ সামর্থ্য ও শিক্ষাদীক্ষা লাভের সুযোগাভাবে সমাজের তলদেশে পড়িয়া আছে,—তাহা ছাড়াও সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে নানা বিজিত আদিম জাতি তাহাদের আদিম আচার-বিচার-অনুষ্ঠান লইয়া বসবাস করিতেছে। আর্যজাতির মধ্যে যাহাদের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে তাহারা এবং উল্লিখিত অন্তর্ভুক্ত আদিম শূদ্র জাতি—এই দুই শ্রেণী লইয়া আমাদের লোকস্তর গঠিত। ঐ সকল আদিবাসী বা আগন্তুক জাতি

নিজেদের আচার-বিচার পূজাপার্বণ এবং আমোদানুষ্ঠান লইয়া আজও বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করিতেছে। ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও ইহারা ভারতীয় সমাজ দেহের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হইতে পারে নাই। আর্থনৈতিক অধিকার বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ইহাদের নাই বলিয়া ইহারা এমন সব বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে যাহাদ্বারা দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন যোগান ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না; ফলে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া সংস্কৃতিসম্পন্ন হইবার সুযোগ হইতেও ইহাদের বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি হয়ত আর্য সংস্কৃতির দ্বারা সমীকৃত হওয়ায় গ্রাম্য সমাজদেহের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে ও আর্থনৈতিক শ্রেণীর অন্যতম শ্রেণী হইয়া শ্রেণীদ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করিতেছে। তৎসত্ত্বেও সুযোগসুবিধার অভাবে শিক্ষাদীক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে ইহারা লোক পর্য্যায়েই পড়িয়া আছে—আদিম মন, আদিম প্রথা, আদিম আমোদানুষ্ঠান লইয়া জীবন যাপন করিতেছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—

(ক) সমাজের আদিম পর্যায়ে লোকরীতির ভিত্তি (folk ways) গড়িয়া উঠিলেও আদিম পর্যায়ে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মান একরূপ বলিয়া, জনসংখ্যা অল্প ও বসতি অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়া সামাজিকদের মধ্যে সংস্কৃতিগত কোন পার্থক্য দেখা দিতে পারে নাই। সুতরাং সমাজও লোকস্তর এবং অলোকস্তর এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত হয় নাই।

(খ) বিবর্তনের ফলে সমাজ কৃষিস্তরে উন্নীত হইবার পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য লোকবসতি কেন্দ্রীয় বসতি হইতে নূতন নূতন ভূমিতে বা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ায় ও সামাজিকদিগের মধ্যে ক্রমে সাংস্কৃতিক মানের তারতম্য দেখা দেওয়ায় সমাজে শিষ্ট-অশিষ্ট, গ্রাম্য-নাগরিক, লোক-অলোক বিভাগের অবকাশ সৃষ্ট হইয়াছিল।

(গ) যে কারণে জনগোষ্ঠীর একাংশ লোকস্তরে নামিয়া যাইতে বা থাকিতে বাধ্য হইয়াছে সেই কারণটি আপাতদৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক বলিয়া মনে হইলেও আসলে তাহা আর্থনৈতিক! কেননা সাংস্কৃতিক মান বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা আর্থনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতার উপরেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে।

(ঘ) যতদিন সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থাকিবে, আর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন গ্রাম্যজীবন ও নাগরিক জীবনের ব্যবধান ঘুচিবে

না। ফলত সাংস্কৃতিক পার্থক্য প্রকট হইয়া থাকিবে বলিয়াই সমাজ হইতেও লোকস্তর বিলুপ্ত হইবে না।

(ঙ) গ্রাম্য হইলেই ব্যক্তি যেমন লোকস্তরের অন্তর্ভুক্ত হয় না তেমনি নাগরিক মাত্রেই শিষ্ট নহে। গ্রামের জনবিন্যাসে স্তরভেদ আছে; নাগরিক জীবনেও ইহা বর্তমান। গ্রামের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্রেণী গ্রামে বাস করিলেও এই শ্রেণী লোকস্তরের লোক নহে। তেমনি নগরের অর্থসঙ্গতিহীন ও অশিক্ষিত মুটে মজুর শ্রেণী নগরের বস্তিতে বা ফুটপাতে বাস করিলেও আসলে ইহা লোকস্তরেরই লোক। গ্রাম্য দিগের মধ্যে যাহারা আর্থনৈতিক সামর্থ্যের অভাবে সংস্কৃতিতে অনগ্রসর হইয়া প্রাচীন সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহারা যেমন লোকশ্রেণীর অন্তর্গত, তেমনি নাগরিকদের মধ্যে যাহারা ঐ একই কারণে আদিম মানসিকতার সংকীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারে নাই তাহারাও লোকস্তরেই পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে লোকস্তর কেবল গ্রামেই নাই, নগরেও ইহার অস্তিত্ব আছে। আদিমস্তরের লোকমানসিকতা ও আচার-বিচার বিবর্তনের ফলে ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া লোক-অলোক সকল মানুষের মানসিকতা ও আচার-বিচারের মধ্য দিয়া অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইলেও সংস্কৃতির মানের তারতম্যের ভিত্তিতেই কোন ব্যক্তিকে লোকশ্রেণীর এবং কোন ব্যক্তিকে অলোক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

(চ) জীবনে folk ways এর প্রাধান্য কতখানি থাকিলে ব্যক্তিকে লোক-পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে এবং কত কম থাকিলে অলোক বা সুসংস্কৃত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তাহার পরিমাণ কোন সমাজ-বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত সঠিক নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মোটামুটি আর্থনৈতিক অনগ্রসরতাজনিত সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা বা নঙ্‌ভাবকেই প্রধান ভিত্তি করিয়া লোক-অলোক পার্থক্য কল্পনা করা হইয়া থাকে।

লোক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ

লোক বলিতে কি বুঝায় ও আমরা কাহাদের বুঝি এতক্ষণ তাহার আলোচনা করা হইল। এখন লোক-অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাইতেছে। লোকালয়ে বাঘ আসিলে, ভূমিকম্প হইলে বা শত্রুর আক্রমণ সুরু হইলে স্বভাবতই মানুষ ত্রস্ত হরিণ-যূথের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হইয়া ইহাদের রোধ করিবার চেষ্টা করে। এই সব ক্ষেত্রে মানুষের সমষ্টিগত প্রচেষ্টাকে আর বাহির হইতে জাগাইয়া

তুলিতে হয় না, সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবেই সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা দেখা দেয়। কিন্তু জীবনে এমন বহু সমস্যা রহিয়াছে যাহাদের সমাধানে সহজাত সমবেত কর্মপ্রবণতা থাকে না; অথচ এই সব সমস্যা মোটেই অবহেলা করিবার নহে। উদাহরণ স্বরূপ আর্থনৈতিক সমস্যা, যুদ্ধ যাত্রা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে সমষ্টিগত উৎসবানুষ্ঠানের (group festival) মাধ্যমে বাহির হইতে জনচিত্তে আবেগ-প্রবণতাকে জাগ্রত করিয়া সেই জাগ্রত আবেগস্রোতকে ঐক্য-বদ্ধভাবে একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করাইতে হয়। উৎসবে প্রযুক্ত সংগীতের সুর, কথার ছন্দ ও নৃত্যের প্রচণ্ডতা (violence of dance) মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎসমুখ খুলিয়া দেয়। সমষ্টিগত অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়া এই আবেগ-উদ্দীপনা এমন একটি স্তরে উন্নীত হয় যে জীবন হইতে যেমন সহজে ইহার প্রভাব অন্তর্হিত হয় না, তেমনি ইহা মানুষের কর্মপ্রবণতাকেও বর্ধিত করিয়া দেয়। আবার সমষ্টিগত আবেগ তথা কর্ম প্রবণতা (collective emotion and activity) জাগরিত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত নৃত্য-গীতজাত শিল্পকলাযুক্ত উৎসবানুষ্ঠান মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে মাধুর্যমণ্ডিত করে, ইহার ভার লাঘব করিয়া দেয়। কাজেই উৎসবাদিদ্বারা জাগরিত সমষ্টিগত কর্মপ্রবণতাকে আদিমমানব ভূমিকর্ষণ, শস্যসংগ্রহ প্রভৃতি অতিপ্রয়োজনীয় আর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধানে নিয়োজিত করিত। আদিম সমাজের আর্থনৈতিক সমস্যা অতি সরল ছিল। সমবেত প্রচেষ্টাদ্বারা বিভিন্ন গোষ্ঠী ঐ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিত। অন্যান্য বিষয়েতেও আদিম মানব সমষ্টিচেতনাকে প্রাধান্য দিত। সামাজিকগণের আত্ম-সংরক্ষণের প্রবৃত্তিজাত জীবন-সংগ্রাম এবং আর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করিয়া আদিম সমাজে উৎসবানুষ্ঠানের উদ্ভব হয়। সমষ্টি-চেতনা এই উৎসবাদিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছিল। আদিম সমাজে ক্রমে ক্রমে নানাবিধ দৈববিশ্বাস, প্রথা, আচার, বিধি-নিষেধাদি প্রচলিত হয়।[১] "আচার এবং লৌকিক বিধি-নিষেধ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অবস্থাগতিকে সমাজ-রক্ষার, সামাজিকগণের সুখ সুবিধার জন্য গঠিত; ব্যবহারিক ভাবে এগুলিকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয়।" আদিম-মানবের দৈববিশ্বাস ও ধর্মপ্রবণতা প্রবল ছিল বলিয়াই বিভিন্ন উৎসবে ধর্মভাবের প্রাধান্য ছিল। তবে আদিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক অনুষ্ঠানের যে অস্তিত্ব একেবারে ছিল না একথা বলা যায় না। সেরকম স্থলেও কিন্তু সামষ্টিক আবেগজনকতার প্রতি জনগণের

১। ভারত-সংস্কৃতি—পৃঃ ৫৫, ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৪।

লক্ষ্য বজায় ছিল। পান-ভোজন, বাইচ-খেলা, ঘোড়-দৌড় প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ লোক-অনুষ্ঠান আদিম সমাজে অনুষ্ঠিত হইত। অনেক সময় ধর্মোৎসবের বা ঐন্দ্রজালিক উৎসবাদির পরিশিষ্ট রূপেও এই সব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইত। সে রকম স্থলে ইহাদের পূর্ণ লৌকিক (secular) না বলিয়া লৌকিক-কল্প (semi-secular) অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যায়,—ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে হয়ত মেলা বসিল এবং মেলার আকর্ষণ রূপে ঘোড়-দৌড়ের ব্যবস্থা হইল অথবা কোন ঐন্দ্রজালিক ধর্মোৎসব উপলক্ষে পান-ভোজনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইল। আদিম সমাজের উৎসবাদির মধ্যে অশুভ দৈবশক্তির রোষ হইতে আত্মরক্ষা এবং শুভদৈবশক্তির করুণা লাভের জন্য দেবতোষণ-উৎসব, রোগমুক্তি, পূর্বপুরুষদের অশুভ আত্মার সন্তুষ্টি-বিধান ও পূর্বপুরুষদের শুভ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান, বংশ প্রতীক সম্পর্কীয় নানাবিধ (totem) পূজা, আর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষি ও ঋতুতর্পণ, সামাজিক প্রথানুযায়ী জন্ম-বিবাহ-অনুষ্ঠান এবং মৃতের সমাধিদান, চিতাভস্ম সংরক্ষণ ও অস্থিমার্জনাদি অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান, ভূম্যধিকার বিস্তার করিয়া আর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যুদ্ধাদি প্রভৃতি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আদিম সমাজের অনুষ্ঠানাদির প্রকৃতি অনুযায়ী ইহাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বিশুদ্ধ ধর্মীয় (pure religious) (খ) ঐন্দ্রজালিক (magical) ও (গ) লৌকিক (secular) অনুষ্ঠান। পুরোহিত ধর্মীয়, সিদ্ধপুরুষ (sorcerer) ও মায়াবী (shaman) ঐন্দ্রজালিক এবং সাধারণলোক লৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত।

(ক) বিশুদ্ধ [1]ধর্মীয় অনুষ্ঠানেস্তোত্র, বন্দনাগীতি, অর্ঘ্যপ্রদান, প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের স্বাভাবিক উপায়ের মধ্য দিয়া অলৌকিক দৈবশক্তিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইত। ধর্মানুভূতি (religious thrill) বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠায় সেই সকল লোকের উপরই এই সকল উৎসবের হোতা হইবার ভার পড়িতে লাগিল। ইহারাই দেবতা ও মানবের মধ্যস্থরূপে এবং দেবতোষণ অনুষ্ঠানের উদ্‌গাতারূপে পুরোহিত হইয়া উঠিল।

---

1. In religion man is trying to influence the will of supernatural beings by natural means—by offering them gifts, by flattering them, by humiliating himself, and so on; p. 205. The Origins of Religion—R. Karsten (Lond. 1935.)

(খ) পূর্বপুরুষদের শুভ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অশুভ আত্মার সংযমন, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর রহস্যময় সত্তা এবং শস্যোৎপাদন ও রোগভোগের অদৃশ্য শক্তির উপর [1]অলৌকিক কৌশল অবলম্বনে প্রতিবন্ধকহীন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রচেষ্টা ঐন্দ্রজালিক উৎসবের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের জন্যও যথেষ্ট শিক্ষা-সাধনা প্রয়োজনীয়। কাজেই সিদ্ধগণ কোন্ শক্তির পূজা করিতে হইবে এবং কিভাবে করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিবার পরে মায়াবী ঐন্দ্রজালিক তাহার অলৌকিক ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া অদৃশ্য শক্তিকে বশীভূত করিত এবং এই ভাবে ঐশক্তি দ্বারা লোকসমাজের মঙ্গলবিধান করা সম্ভব হইত বলিয়া জনগণের বিশ্বাস ছিল। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানও ধর্মীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। বিশুদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে পার্থক্যের জন্য ইহাকে ব্যবহারিক ধর্মীয় (practical religious) অনুষ্ঠান রূপে অভিহিত করা যাইতে পারে।

(গ) লোকসমাজে আনন্দ পরিবেশন করিবার জন্য ধর্মাতিরিক্ত বিভিন্ন ঋতু-উৎসব, অসিনৃত্য, মাল্য-নৃত্য, কোলাহলময় পান-ভোজন উৎসব (carnival) প্রভৃতিও প্রতিপালিত হইত। এই উৎসবানুষ্ঠানে অনেক সময় মিছিলের ব্যবস্থা থাকিত। প্রসঙ্গত গ্রীকদের মেষশকট উৎসবের (sheep-cart ceremony) উল্লেখ করা যাইতে পারে। [2]আনন্দপূর্ণ দ্বন্দ্বাত্মক এই উৎসবে ভেলা-মিছিলেরও প্রচলন ছিল। পশ্চিমের লোকসমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে বিভিন্ন ঋতুতে নানা প্রকার উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন হইত। ইহাদের মধ্যে [3]মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি অবলম্বনে অনুষ্ঠিত মৃত্যু ও সঞ্জীবনী উৎসবের প্রাধান্য ছিল। এখনো ইউরোপের নানা অঞ্চলে এই উৎসব পালিত হয়। ফরাসীর দক্ষিণাঞ্চলে "Les Rouges and Les Noirs' নামক মুখোস অনুষ্ঠান, ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত তলোয়ার নাচ, মাল্য-নৃত্য, সেন্ট জর্জের পালা এবং দক্ষিণ

1. …in magic he is trying to influence them by supernatural meanss, by using mechanical powers which they cannot resist. p. 205,—The Origins of Religion—Karsten (Lond. 1935)

2. Gay, often riotus festival, usually with floats, processions. p. 85—Dictionary of World Literature—J. T. Shiplay (New York, 1943)

3. .. the seasonal customs still observed in many parts of the Continent in which a death and survival appear, and the masquerades of 'Les Rouges and Les Noirs' in parts of Southern France, the wide spread Continental sword dances and garland dances, the St. George plays, and the dramatic ceremonies of Haghios and Gheorgheos in the Southern Balkans. p. 226. Cassell's Encyclopaedia of Literature—S. H. Steinberg (Lond. 1953).

বলকানের (Haghios Gheorgheos) নাট্যানুষ্ঠানও এই শ্রেণীর ঋতু-উৎসবের অন্তর্গত। ইংলণ্ডের তলোয়ার নাচ (morris dance) এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার সঞ্জীবনী উৎসবও এই রীতির সাক্ষ্য বহন করে।

আদিম সমাজের উৎসবানুষ্ঠানের তিনটি অঙ্গ ছিল,—(ক) রূপসজ্জা, (খ) কথা ও সুর, এবং (গ) নৃত্য। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহারের প্রচলন থাকিলেও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের রূপসজ্জার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইত। অনুষ্ঠাতার শক্তি বৃদ্ধি ও কাজের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐন্দ্রজালিক উৎসবের পোষাক প্রস্তুত করা হইত। [1]ঐন্দ্রজালিক কর্মসাফল্যের জন্য সামগ্রিকভাবে পোষাকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইত। অদৃশ্য শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য বিশ্বাস ও ধারণামত অলৌকিক শক্তির পরিকল্পিত রূপ অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠাতারা দেহ-রূপ প্রস্তুত করিয়া তুলিত। আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা হেতু পোষাক পরিচ্ছদের পার্থক্য থাকিলেও শির-সজ্জা, গাত্র-সজ্জা ও পদ-সজ্জার ব্যবহার সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। শির সজ্জায় উষ্ণীষ, বস্ত্র, পাখীর পালক,—গাত্র-সজ্জায় উত্তরীয়, হরিণ-ব্যাঘ্রচর্মের লম্বা-ঢিলা দেহাবরণ (cloak), বন্য জন্তুর নখদন্তশৃঙ্গাদি ও ঘণ্টির মালা,— এবং পদ-সজ্জায় পাদুকা বা উপানহ ব্যবহৃত হইত। রূপসজ্জায় রঙ এর ব্যবহার লোকসমাজে অজানা ছিল না। ভারতীয় ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানে [2]অনেকক্ষেত্রে উরুকু উদ্ভিদের রস দিয়া লাল রঙে এবং কাঠ কয়লা দিয়া কালোরঙে মুখমণ্ডল, বাহুপদ ও বক্ষ চিত্রিত করা হইত। বিশেষ রূপায়ণে অদৃশ্য শক্তির কল্পিত মুখের অনুকরণে মুখোসও পরিধান করা হইত।

উৎসবানুষ্ঠানে মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য পদ্যবন্ধে যে কথার ব্যবহার করা হইত তাহাতে সুর সংযোজিত হইত। কারণ কেবল মানুষ নয়, সুরের মায়াজালে দেবতা, ভূতপ্রেত এমন কি জীবজন্তুকেও সহজে বশীভূত করা যাইতে পারে এই ছিল লোকসমাজের ধারণা। অনুষ্ঠানে সংযোজিত সুর দুই প্রকারের— (ক) কণ্ঠজাত, (খ) যন্ত্রজাত,। কণ্ঠজাত সুরের সঙ্গে অর্থাৎ গানের

---

1. In general, the whole dress was believed to be of decisive importance for the success of the operation of the Shaman. P. 227. The Origins of Religion—R. Karsten (Lond. 1935).

2. In some cases the face, as well as the arms, legs and breast are painted either red with a red paint obtained from the Urucu-plant (Bixa Orellana), or black with charcoal. P. 226 Ibid.

সঙ্গে বংশদণ্ড বা শৃঙ্গনির্মিত সুষির-যন্ত্র, তন্তুযুক্ত ধনুর্যন্ত্র, চর্ম-নির্মিত ড্রাম প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র এবং ঝুমঝুমি জাতীয় অলাবু (rattle gourds) যন্ত্র বাদিত হইত। এই সকল গানের সঙ্গে নানা প্রকার শব্দ ও প্রয়োগ করা হইত। প্রসঙ্গক্রমে [1]অষ্ট্রেলিয়া এবং ব্রাজিলের ষণ্ড-নাদীযন্ত্রের সাহায্যে ষণ্ডধ্বনি অথবা অন্য প্রকার গম্ভীর গর্জন বা বাঁশির শিস ধ্বনি দ্বারা অলৌকিক শক্তির শব্দানুকরণের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। উল্লেখিত ধ্বনিসমূহ সংগীতের অন্তর্গত। [২]বস্তুত ধ্বনির অনুকরণেই সংগীতের স্বরগুলি নির্দেশিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লোক-উৎসবাদিতে কণ্ঠ-যন্ত্র-ধ্বনি এই তিনপ্রকার সংগীতই প্রযুক্ত হইত। বর্তমান লোকনাট্যেও এই তিন শ্রেণীর সংগীত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্বের প্রয়োগ রীতির সঙ্গে ইহার পার্থক্য অনেক।

আদিম লোকসমাজের সাহিত্য-সংগীত-নৃত্য সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা করিয়াছেন তাহার সকলেই এই কথাটি স্বীকার করিয়াছেন যে আদিম সমাজের নৃত্য-গীত-কাব্য বিশ্লিষ্ট ছিল না। অর্থাৎ এমন নৃত্য ছিল না যাহা স্বর ও কথার সঙ্গে মিশিয়া থাকিত না বা এমন কোন গান ছিল না যাহা নৃত্যও কাব্যনিরপেক্ষ ছিল এবং এমন কোন কাব্য ছিল না যাহার সঙ্গে নৃত্য ও স্বর মিশিয়া থাকিত না। অধিকতর উন্নত সভ্য সমাজে ইহারা পৃথক হইয়া পড়ে এবং বর্তমান সভ্য সমাজে নৃত্য কেবল আনন্দ বিতরণের উপকরণরূপে গৃহীত, ইহার অন্য কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু পূর্বে লোকসমাজে ইহা উপাসনার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। নৃত্যকারগণ কখনো পংক্তিবদ্ধ হইয়া, কখনো বৃত্তাকারে, কখনো বা অগ্রপশ্চাৎ এবং ঊর্ধ্বনিম্ন গতিভঙ্গিময় নৃত্য উপাসনার সময় পরিবেশন করিত। ধরিত্রীর উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সঞ্জীবনী নামক ইন্দ্রজালানুষ্ঠানেও নৃত্যপ্রযুক্ত হইত। [3]লোকসমাজ মনে করিত প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তি কোন অলৌকিক

1. The roaring or booming sound produced by the bull-roarers in Australia and Brazil, or the piping sound produced by whistle...to imitate the sounds of the spirits...P. 230. The Origins of Religion

—R. Karsten (Lond. 1935)

২। ময়ূর বৃষভ শ্ছাগো ক্রৌঞ্চ, কোকিল বাজিনঃ।
মতঙ্গাশ্চক্র মেণাহুঃ স্বরাণেতান স্বদুর্গমান্॥ পৃঃ ৩০

সংগীত দামোদর—শ্রীশুভঙ্কর, সংস্কৃত কলেজ সংস্করণ—১৯৬০

3. Fertility in nature, according to primitive view, is bound up in a mysterious way with the fertility in the human world. P. 232. The Origins of Religion—R. Karsten. (Lond. 1935)

উপায়ে মানবজগতের উৎপাদন রীতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। সুতরাং শস্যোৎপাদনের জন্য যে ঐন্দ্রজালিক উৎসব হইত তাহাতেও অনেক সময় লিঙ্গনৃত্য (phallic dance) প্রয়োগ করা হইত। নৃত্যের সাহায্যে ভৌতিক শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি এই অদৃশ্য শক্তিকে বশীভূত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ—এই বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। শুভ-অশুভ অলৌকিক শক্তি বিশ্বাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রূপকল্পনাও সম্ভব হইল। এই রূপারোপে আদিম মানব তাহার চারিপাশের দৃশ্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইল। সুতরাং মানুষ পরিচিত অথচ শক্তিশালী পশু পক্ষীর পৃথক অথবা ইহাদের মিশ্ররূপের মধ্যে অলৌকিক দেবদেবী ভূতপ্রেত প্রভৃতিকে ধরিবার চেষ্টা করিল এবং এই সকল কল্পিত মূর্তির চালচলন সম্পর্কে যে ধারণা করিয়াছিল তাহাই নৃত্যে অনুসৃত হইতে লাগিল।

(পূর্ব-পুরুষদের বিদেহী আত্মা অনেক সময় পশু, পক্ষী, মৎস্য, বৃক্ষ এমন কি ঝরণাধারা, পাহাড় প্রভৃতিকে আশ্রয় করে—এই ধারণার জন্য লোকসমাজে ঐ সকল প্রাণী উদ্ভিদ ও জড়বস্তু গোষ্ঠির প্রতীক (totem) রূপে গৃহীত হইত। আবার লোকসমাজে এমন ধারণাও বর্তমান ছিল যে বিশেষ কোন জন্তু হইতেই বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্ভব। মোঙ্গলজাতির বিশ্বাস—ভালুকই ইহার পূর্বপুরুষ। [1]কোন এক সময় দুইজন খান্-এর মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয় এই যুদ্ধে একজন স্ত্রীলোক ছাড়া সমস্ত মানুষ নিহত হয়। জীবিত এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটি ভালুকের সাক্ষাৎ হয়। ইহারই ঔরসে স্ত্রীলোকটি দুইটি সন্তান লাভ করে; ইহাদের হইতেই মোঙ্গলজাতির উৎপত্তি। সুতরাং এই বিশ্বাস হইতে মোঙ্গলরা ভালুককে totem রূপে গ্রহণ করে। আদিম লোকসমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই ভাবে নানা প্রকার totem গৃহীত হইয়াছে; totem উৎসবেও নৃত্যের একান্ত প্রয়োজন ছিল। অতিলৌকিক শক্তির বাহ্যাকার, চাল-চলন ও অঙ্গ-ভঙ্গির নিখুঁত অনুকরণ করিবার সুবিধার জন্য নৃত্যকারগণ অদৃশ্য শক্তির রূপসজ্জা গ্রহণে মুখোস ব্যবহারের রীতি প্রচলন করে। এই রীতি হইতে মুখোসনৃত্যের উদ্ভব হয়। [2]টোটেম উৎসবে টোটেমের সঙ্গে সাদৃশ্য

---

1. ...two Khans made war on one another, slaying all the people but one woman. This woman met a bear by whom she had two children, and from these sprang the Moghols. P. 146. The Origins of Religion.

2. All participants are masked to resemble the totem animal, for instance by wearing its skin if it is a quadruped, and the aim of dance is to influence

রচনার জন্য সকলেই মুখোস পরিধান করিত, টোটেম চতুষ্পদ জন্তু হইলে ইহার চর্মও পরিধান করা হইত, এই নৃত্যের উদ্দেশ্য ছিল ঐ টোটেম অধ্যুষিত আত্মা বা ভৌতিকশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করা।

লোকসাহিত্য প্রসঙ্গ

লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে বলা যায়, সাহিত্যের দিক হইতে [1]আদিম জনসাধারণের অথবা অপেক্ষাকৃত সভ্য জনপদের কৃষ্টিহীন জনগণের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রথাগত ধর্মাদর্শ, রুচি ও রসবোধের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত জনপ্রিয় উপকথা, গল্প, গাথা, গান, প্রবচন, ধাঁধা ও পালা লোকস্তরের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন লোকসমাজের সম্পদ বা নিদর্শন বলিয়া পূর্বে ইহাদের 'Popular Antiquities' আখ্যা দেওয়া হইত। কিন্তু কেবল প্রাচীন সমাজেই নয়, পরবর্তী সমাজেও এই শ্রেণীর জনপ্রিয় রচনার অস্তিত্ব আছে। কাজেই ঐ নামে ইহাদের প্রকৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠে না বলিয়া popular ও antiquity শব্দ দুইটি বাতিল করিয়া ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ [2]William John Thomas ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণীর রচনার নূতন নামকরণ করেন folk-lore। Folk-Lore অর্থে "আদিম এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজের কৃষ্টিহীন জনগণ কর্তৃক সৃষ্ট প্রথাগত সকলপ্রকার রচনাই বুঝিতে হইবে। এই folk-lore নানাবিধ ভাবব্যঞ্জক ধ্বনি ও শব্দ সহযোগে পদ্যবন্ধে

the soul or spirit which inhabits it. p. 234. The Origins of Religion—R. Karsten.

1. Under this rather loose heading are to be included those traditional legends, tales, ballads, songs, proverbs, riddles, and plays which form the popular entertainments of primitive peoples or of the uncultured elements of more civilized peoples. p. 224 Cassell's Encyclopaedia of Literature—S. H. Steinberg (Lond. 1953).

2. The term Folk-lore was coined in 1846 by the English antiquirian William John Thomas to take the place of the awkward term "Popular Antiquities". p. 403—The Standard Dictionary of Folk-Lore (Vol. 1)—M. Leach (Newyork, 1949).

3. Folk-Lore comprises traditional creations of peoples, primitive and civilized. These are achieved by using sounds and words in metric form and prose, and include also folk beliefs or superstitions, customs and performances, dances and plays. p. 398. The Standard dictionary of Folk Lore (Vol. 1).

বা গদ্যে রচিত হইতে পারে ; জনজীবনের ভাবাবেগ, সংস্কার-বিশ্বাস, প্রচলিত রীতি-নীতি, অনুষ্ঠানাদি, নৃত্য ও অভিনয় সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। সভ্য সমাজের ([1]folk-loreকে মোটামুটি প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(ক) সংস্কার-বিশ্বাস ও রীতিমূলক, (খ) আখ্যানও প্রবচনমূলক (গ) কলামূলক। কলামূলক folk-lore-এর আবার দুইটি শাখা—গাথা ও গীতিসহ লোকসংগীত এবং লোকনাট্য।)

মানুষ সামাজিক জীব। [2]অধিকার ও পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রেণী-বিভাগ ও পৃথকীকরণ এবং মানুষের কর্মাবলীতে ও স্বাধীনতা সংযমের ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজের পরিচয় বলিয়া নানা কাজে সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ওতপ্রোত। মানুষের সামগ্রিক কর্ম প্রচেষ্টা যেমন সমাজকে রূপ দেয় তেমনি সমাজও মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। [3]শুক্তি ও মুক্তার সম্বন্ধের ন্যায় সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে সমাজ সম্পর্কান্বিত। সুতরাং সাহিত্য-শিল্প স্রষ্টা এমন কি ইহার সমালোচক পর্যন্ত সামাজিকতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আপন আপন কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার নানাদিক মানুষ সাহিত্যশিল্পে রূপায়িত করে। ইহা যেমন সত্য তেমনি কল্পনার মুক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া খেয়ালখুশি মত মানুষ আবার বহুবিধ অদ্ভুত আখ্যানাদিও রচনা করে।

[4]ইহা দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার হুবহু রূপায়ণ না হইলেও ইহা যে জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্জাত এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবের বাসনা-কামনা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অপূর্ণতাকে মানুষ আবেগ-অনুভূতি মিশ্রিত দিবা-স্বপ্ন

1. "Folk-lore of civilized people may be conveniently classified under three main heads (1) belief and custom (2) narrative and saying (3) art".—"The third head, Art, subdivides into (a) folk-music with ballads and songs, (b) folk-drama". p. 601. The Encylopaedia Britannica (Vol. X) Cambridge—1910.

2. Society is a system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties. p. 5. Society, Maciver & Page.

3. Art is the product of Society, as the pearl is the product of the oyster, and to stand out-side art is to stand in-side Society. p. 9. Illusion And Reality— C. Caudwell (Delhi, 1956).

4. The products of imagination are not simply reproduction of sense-experiences, although they are built of them. They are the result of day-dreams that play with them, and of their emotional tone. p. 610. General Anthropology—F. Boas. (Newyork, 1938)

স্বারা (day-dream) অথবা অদ্ভুত কল্পনার (phantasy) পক্ষিরাজ ঘোড়া উড়াইয়া পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায়। [1]দিবা স্বপ্নে সম্ভাব্যতার সম্ভাবনা থাকে; অদ্ভুত কল্পনায় সে সম্ভাবনার মাত্রা তেমন ভাবে রক্ষিত হয় না। তথাপি ইহারও মূলে থাকে জীবনের সংযোগ। বাস্তবের স্বাদযুক্ত রচনার সঙ্গে সমাজ ও জীবনের সম্পর্ক থাকেই; কল্পনাতিশয্য পূর্ণ রচনাও কিন্তু সমাজ-জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন হইতে পারে না। কল্পনা প্রধান রচনার বাস্তবতা সম্পর্কে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য,— [২]"কয়লা ও হীরকখণ্ড যেমন মূলতঃ অভিন্ন, তেমনি বাস্তবতামূলক করুণ উৎপীড়ন-কাহিনী ও রূপকথার অবাস্তব দৈবসংঘটন একই প্রতিবেশ-প্রভাব ও মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি।" কাজেই বাস্তবতা মূলক অথবা অবাস্তবতামূলক লোকসাহিত্যের সঙ্গেও লোকসমাজের সম্পর্ক রহিয়াছে। লোকসাহিত্য লোকসমাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গড়িয়া উঠিযাছে। লোকসমাজে ব্যক্তিচেতনা প্রবল নয় বলিয়া [3]ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। তাই সাধারণত লোক সাহিত্যের একক মূল রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না। সন্ধান পাওয়া না গেলেও মূল রচয়িতা ব্যক্তিটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নহে। ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়া সমষ্টি আপনার করিয়া লয়, এবং প্রবল ব্যক্তি চেতনাহীন ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাই লোক সাহিত্য কেবলমাত্র ব্যষ্টির রচনা নহে; ইহা ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত প্রচেষ্টার ফসল— [৪]"লোকসাহিত্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি; ব্যষ্টিমনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে পূর্ণ করিয়া লয়।" লোকসাহিত্যের ইহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষি-নির্ভর লোকসমাজের পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর। পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ

1. ......the day dream has more reality, it remains in the field of the possible, it does not contain the wild extravagances or abrupt transitions of the dream....The day-dream is characteristically a more 'civilized' form of phantasy. p.p. 209—210. Illusion And Reality – C Caudwell (Lond. 1937).

২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— পৃঃ ১১ (তৃতীয় সংস্করণ)

3 Submergence of the Individual into the large social unit p. 245. Encyclopaedia of the Social Sciences (Vol. II). E. R. A. Seligman (Newyork, 1930).

৪. বাংলার লোকসাহিত্য— পৃঃ ৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৭) ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

এই সামাজিকের নাই বলিলেও চলে। সকলে মিলিয়া যাহা উৎপাদন করে তাহা দ্বারাই জনগণ জীবনের সাধারণ প্রয়োজন মিটাইয়া লয়। কাজেই আর্থনৈতিক সমস্যা ইহাদের সহজে কণ্টকিত করিতে পারে না। [1]প্রচলিত রীতি, প্রথা, সংস্কার, সহজ সরল বুদ্ধি-বিবেক, সমষ্টিগত চেতনা জনজীবনকে প্রায় একভাবে একই পথে চালিত করে। ইহার ফলে লোক সমাজে মনের গভীরতা ও স্পষ্ট চিন্তার দৈন্য দেখা যায়। সর্বযুগেই সাহিত্য [2]সমাজের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; যে ভাবটি সমস্ত সমাজের দেহ-মন অধিকার করিয়া থাকে তাহাই সাহিত্যে বাণীরূপ পায়। এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, লোকসাহিত্যের লক্ষণ লোক সমাজের উল্লিখিত দিকগুলির মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সমষ্টিগত চেতনা ও কল্পনার সংকীর্ণতার জন্যই প্রধানত এই সাহিত্য সার্বভৌম এবং সর্বায়ত্তিগম্য। [৩]"কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারা সে আপন প্রতিবেশিবর্গকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে, কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।"

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে সমাজ স্থির হইয়া বসিয়া নাই। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহা ক্রমেই আগাইয়া চলিতেছে। ইহার ফলেই আদিম সমাজ নাগর সমাজ ও লোকসমাজে বিভক্ত হইয়া যায়। বিভক্ত নগর ও পল্লীর অবস্থান পাশাপাশি। কাজেই অবশ্য কারণে নগরের সঙ্গে পল্লীর অবিরাম যোগাযোগের জন্য নাগরিক সভ্যতা দ্বারা পল্লীজীবন নানা প্রকারে প্রভাবিত হইতে থাকে। ফলত লোক সমাজেও বহুবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়। তাই লোকসমাজে আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিন্তাধারা ও কর্মে নূতনত্ব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে।

1. In a primitive society where man is as yet undifferentiated, concience and consciousness are similarly simple, direct and homogeneous. P. 174. Illusion And Reality—C. Caudwell (Delhi, 1956).

2. But the forms of art are determined and its themes are largely conditioned by the social circumstances in which the artist works, the themes that preoccupy the public to which he addresses himself. p. 225. Encyclopaedia of Social Sciences (Vol. II) E. R. A. Seligman (Newyork, 1930).

৩. লোকসাহিত্য—পৃঃ ৮৭—রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪,

সামাজিক বিবর্তনের ফলে জীবনে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। [1]অভীষ্ট লাভের উপায়, উপকরণ ও কর্মপন্থা নির্বাচনের নির্দেশদানে উপযুক্ত ব্যষ্টি বা সমষ্টির স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট ধারণাই মূল্যবোধের পরিচায়ক। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সহরাঞ্চলেও মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ করে। ফলে পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-নীতি, করণীয়-অকরণীয় প্রভৃতির পরিবর্তিত ধারণা লইয়া জীবনেও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। যৌথ পরিবার প্রথা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকতা দেখা দেয়, বাহ্যাচার প্রাধান্য পাইতে থাকে এবং ধর্মভাব ও ধর্মোৎসবের গুরুত্ব কমিয়া যায়। উৎসবানুষ্ঠানও ধর্মধারণা মুক্ত হইয়া আমোদ-প্রমোদ বিতরণ ও আর্থনৈতিক আদান-প্রদানের উপলক্ষে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। এই ভাবে প্রাচীন প্রভুত্বব্যঞ্জক ঈশ্বরানুভূতি হইতে সহরের মানুষ নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে থাকায় নাগর সভ্যতায় ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি ক্রমবর্ধিত হইতে সুরু করে। ধর্ম কর্মের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতগণও জীবিকার জন্য ঐ সকল কাজে ব্রতী হইতে আরম্ভ করে। তাহাদের পারিশ্রমিকও প্রথানুকূল রীতির পরিবর্তে উঠতি-পড়তি আর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠে। নগরে ধর্মকর্মদ্বারা জীবিকার্জনের অসুবিধাও দেখা দিতে থাকে। এই অসুবিধা হইতে পরিত্রাণের জন্য আবার অনেক পুরোহিত সহর হইতে দূরে বসবাস করিতে আসিলে তাহাদের দ্বারা গ্রামীণ জীবনেও ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হইতে আরম্ভ করে। এদিকে যেখানেই নগর গড়িয়া উঠে সেখানেই আর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আচার-ব্যবহার ও পদমর্য্যাদার কারণে গ্রামকে নগরের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। ফলে সহরের সঙ্গে পল্লীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই যোগাযোগের ফলে যে সকল গ্রামবাসী অর্দ্ধশিক্ষিত বা সাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠিল তাহারাই জীবিকার জন্য গ্রামে কিছু কিছু পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। অনেক সময় পল্লীতে সহজ সরল জীবন যাপনের কতগুলি সুবিধা লাভের জন্যও কোন কোন শিক্ষিত লোক সহরের বাইরে বসবাস করিতে

1. A value is a conception, explicit or implicit distinctive of an individual or characteristic of a group of the desirable which influences the selection from available modes, means, and ends of action. p. 395. Towards a General Theory of Action—T. Parsons & E. A. Shils (Cambridge, 1935).

আরম্ভ করে। ইহাদের প্রচেষ্টায় গ্রামে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ায় কৃষিপ্রধান অঞ্চলেও ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিস্তার লাভ করিতে থাকে। ফলে লোকজীবনে মানসিক পরিবর্তন সূচিত হয়। মনস্তত্ত্বের ইতিহাসের দিক দিয়া বলা যায়—লোকসমাজের মানুষও ভাবাত্মক মন এবং সৃষ্টিধর্মী উদ্যমের অধিকারী। সুতরাং সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কিছু লোক নানাদিক হইতে সংস্কৃতির ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। [1]ইহাদের মধ্যে একদল বুদ্ধিমান নিজেদের সৃষ্ট জাতীয় সংস্কৃতিকে উন্নত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তাশক্তির মধ্যে বিধৃত করিয়া স্থায়িত্ব দান করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় তাহারা নানা সংস্কৃতিধারার উন্নতি করিয়া চলে। এইভাবে সংস্কৃতিকে অব্যাহত রাখিবার ও উন্নত করিবার কাজে কখনো কখনো তাহারা লেখার সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে পবিত্র ধর্ম গ্রন্থাবলী, প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি লইয়া নগরে ‘great tradition’ গড়িয়া উঠে, নাগর জীবন-কর্ম-ব্যবহারে যুক্তি ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আপনার পথ প্রস্তুত করিয়া লয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পল্লী ও নগরের দূরত্ব কমিয়া যাওয়ায় এই ‘great tradition’-এর তরঙ্গাঘাতে পূর্বের গ্রামীণ জীবনের ‘little tradition’-এর ভিত্তি কাঁপিয়া উঠে। পল্লী অঞ্চলেও ব্যক্তি সচেতনতা আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। গ্রামের একদল লোক কর্মব্যপদেশে সহর ও পল্লীর সঙ্গে নানা বিষয়ে সেতুবন্ধন করিয়া চলে। ইহার প্রভাবে কৃষিপ্রধান জনপদেও এক অর্ধগ্রামীণ সম্প্রদায়ের (quasifolk) উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায় দিনের পর দিন জ্ঞাতসারে অথবা মনের অগোচরে পরিবারে, পাড়ায় ও নিজ নিজ অঞ্চলে বহুবিধ বিষয়ে নাগরিক প্রভাব বিস্তার করিয়া চলে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বিশুদ্ধ লোকসমাজের যৌগিক লোকসমাজে

1. Some aspects of the cultural heritage of the folk have been developed by a self-perpetuating intellectual group into highly specialized and systematized thought......in many cases dependent upon writing or its continuance and development. p. 302. Human Nature and the Study of Society (Vol. I)—R. Redfield (Chicago, 1962).

(derivative folk) রূপান্তর গ্রহণ। [1]সহরও নগরের জীবন্ত প্রভাবে আদিম উপাদানে গঠিত চাষীর জীবনধারা মন্থর গতিতে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। আদিম লোকসমাজে সাহিত্য রচনায় ব্যক্তির নাম সংযোজিত না হইলে লোকসাহিত্য ব্যক্তি দ্বারাই রচিত হইত। [2]কাব্য কবির রচনা, সম্প্রদায় বা জনগণের যৌথ অধিকারে ইহা সৃষ্ট হয় না। শিল্প-সাহিত্য-নির্মিতি ব্যক্তিমানসানুভূতি ছাড়া কখনই সম্ভব নহে। জন্মগত পৃথক সত্তার ফলে দুইজনের কাব্য কল্পনা ঠিক একই পথে চলে না। স্বাভাবিক সরল অনুপ্রেরণা ও সহজ দৃষ্টি লইয়া আদিম সমাজেও প্রত্যেকেই পৃথক ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিত। কিন্তু [3]মূল স্রষ্টা হয়ত যথেষ্ট প্রকাশ ক্ষমতার অধিকারী হইত না, অথবা সাহিত্যোপকরণের উপযুক্ত ব্যবহারে কল্পিত বিষয়কে রূপের আধারে ঠিক তুলিয়া ধরিতে পারিত না। আবার এমনও হইতে পারে যে ব্যক্তির রচনা সমষ্টির সম্পূর্ণ মনঃপূত হইত না। তাই সমষ্টি সাম্প্রদায়িক (communal) আদর্শ অনুযায়ী নবসৃষ্ট সাহিত্যের মার্জন ও ইহার সঙ্গে নানা সংযোজন করিত; রচনাও আর ব্যক্তিনামাঙ্কিত হইত না। ব্যক্তি-সচেতনতা অপেক্ষা সমষ্টিচেতনা প্রবল ছিল বলিয়া মূল স্রষ্টা ইহাতে আপত্তি করিত না। কিন্তু পারবর্তিত লোকসমাজে কিছুটা শিক্ষা, যুক্তি ও ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যষ্টি-স্রষ্টা সমষ্টির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে রাজী হইল না। তবে কৃষি প্রধান সহজ সরল লোকসমাজে এইভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দিলেও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে মানসিক প্রবণতার আমূল পরিবর্তন ঘটে নাই। সুতরাং সাহিত্যে ব্যক্তি স্রষ্টারূপে গৃহীত হইলেও জীবন-বোধে নৈর্ব্যক্তিক সমষ্টিচেতনা (group feeling) বজায় রহিল।

1. The peasant is a type made out of primitive stuff but shaped into something different, slowly, by the presence and influence of town and city. p. 286. Human Nature and the Study of Society (Vol. I) R. Redfied (Chicago, 1962).

2. Poetry is the work of poets – not of peoples or communities ; artistic creation can never be anything but the product of an individual mind. p. 27, The Epic : An Essay—Abre Crombie.

3. The originator of the work either had insufficient means of expression at his disposal or else lacked the ability to use them in such a way as to express what he wanted to portray.' p. 31. Primitive Art—Leonhard Adam (Pelican books).

[1]মানুষ জন্মগত সৃষ্টি প্রেরণা বলে ভাবকে রূপের সীমায় বাঁধিতে চাহে, কিন্তু ইহার রূপনির্মিত সামাজিক কৃষ্টিদ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া ব্যক্তিরচনায় গোষ্ঠীচেতনা বিসর্জিত হইতে পারে নাই। লোকসমাজবাসী প্রচলিত ধর্ম, ন্যায়-নীতি, আদর্শ-সংস্কার, ভাল-মন্দের সাধারণ ধারণাযুক্ত জীবনবোধ লইয়া ব্যক্তি রচিত সাহিত্যে নিজেকে খুঁজিয়া পায়। কাজেই ব্যষ্টির সৃষ্টিকে সমষ্টি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। আবার লোকসমাজে রচনার যথোচিত সমাদর হওয়ায় রচয়িতাও প্রকৃত তৃপ্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনা হইতে বলা যায় যে ব্যক্তিচেতনাহীন প্রাচীন সমাজের প্রথার (traditional aspect) উপর ভিত্তি করিয়া সমষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট (multiple authorship) এবং নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত (perpetuating aspect) জনপ্রিয় (popular aspect) মৌখিক (oral aspect) রচনাই কেবল লোক সাহিত্য নহে। সমাজবিবর্তনের ফলে লিখন প্রণালী, শিক্ষাও ব্যক্তিসচেতনতা বিস্তারের জন্য সমষ্টিগত সৃষ্টি (multiple authorship), অবিস্মৃত ধারা (perpetuating aspect) ও মৌখিক রচনা-রীতি (oral composition) লোকসাহিত্যে বজায় থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং লোকসাহিত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন করিতে হইবে। লোকসাহিত্যের ধারা বহু যুগ অতিক্রান্ত হইয়া বহতানদীর মত আজও সম্মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এক অতি প্রাচীন যুগে ইহার উদ্ভব ও নাগর সভ্যতা বিস্তৃতির ফলে ইহার পরিসমাপ্তি—এরূপ কল্পনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। লোকসাহিত্য এখনো রচিত হইতেছে। নগরের great tradition সুদূর পল্লীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাহু বিস্তার করিয়া তাহার little tradition-এর সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ করিতে পারে নাই। পরিবর্তিত লোক জীবন প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথাগত সংস্কার-বিশ্বাস, ন্যায়-নীতিবোধ, কৃষিকর্মের প্রাধান্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকরণে সহর জীবনের সঙ্গে পার্থক্য, কিঞ্চিৎ অমার্জিত রুচি অথচ সরল আচার-ব্যবহার, উৎসবানুষ্ঠানে ও জীবনে লোকাচারের এবং ব্যক্তিসচেতনতা সত্ত্বেও সমষ্টির প্রাধান্য, অসংস্কৃত সহজ

1. It seems most reasonable to assume that there exists in man something of an inborn impulse to shape creatively, but the form which this shaping takes is determined culturally. p. 229. Encyclopaedia of Social Sciences (on Art)—E. R. A. Seligman (Newyork, 1930).

অথচ বিশেষ আকর্ষণীয় ঢঙের সংগীতনৃত্য প্রভৃতি লইয়া আজও পল্লী অঞ্চল ইহার শ্রীক্ষেত্র। সুতরাং এই লোকজীবন-বেদ লইয়া যে সাহিত্য রচিত হইবে তাহাকে লোকসাহিত্য বলিতে হইবে। [1]লোকসাহিত্য-বিচারে যুগের কথা বড় নহে, রূপ ও প্রকাশ প্রণালী লইয়া ইহার বিচার করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে লোকসংগীতের কথা উত্থাপিত হইতে পারে। এযুগেও অনেক সময় লোকসংগীতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, [2]সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন কোন কোন কবি এই সংগীত রচনার মাধ্যমে খ্যাতির অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। এই সকল কবিরা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নহে, সামষ্টিক চেতনা প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের সংগীতের কবিতাংশে দলগতজীবন ও অনুভূতিকে রূপ দিবার চেষ্টা করেন। সেই জন্যই এই রচনা লোক-গীতি বলিয়া পরিগণিত হয়।

লোকশিল্প প্রসঙ্গ

এখন লোকশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা উত্থাপন করা হইতেছে। বিশেষ কথা বলা হইল এই কারণে যে আমরা লোকশিল্পের ইতিহাস বা শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে, কোন আলোচনা করিতেছি না; লোকশিল্পের বিশেষত লোক-নাট্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ লইয়া যে মত পার্থক্যের সম্ভাবনা রহিয়াছে সেইদিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমরা জানি, জীবনের ভিত্তি হইতেছে কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বা ভাবাবেগ; সেই ভাবাবেগ চরিতার্থ হইলেই জীবন আনন্দিত হয়। মনুষ্যেতর জীবনেও সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা রহিয়াছে, সে চেষ্টা সফল হইলে আনন্দও আছে। কিন্তু যাহা নাই এবং যাহা আছে বলিয়া মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে পৃথক তাহা আত্মপ্রকাশের উন্নত ক্ষমতা —গৃহীত প্রতীতিকে শব্দসংকেতে বাঁধিবার, প্রতীতির মধ্যে সম্পর্ক নিধারণ করিবার, প্রতীতিকে স্মরণ রাখিবার ও পুনরুদ্বোধিত করিবার, প্রতীতির সহিত প্রতীতিকে মিশাইয়া নূতন নূতন প্রতীতি সৃষ্টি করিবার, প্রাকৃতিক

---

1. It should be judged not by its age but by its mode of expression. p. 4—Folk Art of Bengal—A. K. Mukherjee (C. U. 1939).

2. Now and then certain poets of literary standing are credited with the production of folk song, in that their lyrics seem to voice group feeling and group life, to exhibit mass rather than individual character. p. 245—Dictionary of World Literature—J. T. Shiplay (Newyork, 1943).

ঘটনা হইতে ছন্দ-সুষমা আবিষ্কার করিবার ও নব নব ছন্দ-সুষমা উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা।

এই ক্ষমতাবলেই মানুষ প্রকৃতিকে প্রাণময়ী বলিয়া মনে করিয়াছে, অতিপ্রাকৃত সর্বশক্তিমান ব্যক্তিপুরুষ বা দেবদেবীর অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছে, এবং দেবদেবীকে তুষ্ট করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন ও উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছে। ফলত আদিম পর্যায় হহতেই মানুষের জীবনযাত্রায় ধারণার সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইয়াছে; আহার্য সংগ্রহ, ভূমিকর্ষণাদি, বিবাহ, সন্তানের জন্ম, যুদ্ধ সকল ব্যাপারেই দৈবানুগ্রহলাভ প্রাথমিক কর্তব্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার উৎসব ও শিল্পকলার উদ্ভব ঘটিয়াছে। জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য ও শস্যের মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য সঞ্চার করিবার জন্য কত কাহিনীর কল্পনা কত জাদুকরী প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন এবং কত নৃত্য গীতে দেবতার আহ্বান ও তুষ্টি-করণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে! এমনিভাবে সামাজিক মানুষের বহুমুখী প্রবৃত্তির বৃন্তে বিচিত্র নৃত্য-গীত, চিত্র, মূর্তি, কাব্য, কাহিনী প্রভৃতি চারুশিল্পের ফুল ফুটিয়াছে। একদিকে আর্থ নৈতিক জীবনের তাগিদে মানুষের কারুকর্মের সঞ্চয় বাড়িয়া চলিযাছে, অন্য দিকে আধ্যাত্মিক ও মানসিক জীবনের তাগিদে চিন্তা ও কল্পনানুভূতির সঞ্চয় বর্দ্ধিত হইতেছে। দেহের স্বাভাবিক প্রেরণায় মানুষ যেমন খাদ্যোৎপাদন ও প্রজননে প্রবৃত্ত হইয়াছে তেমনি সে মনের সহজ প্রেরণায় মনন ও আবেগানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য নানা প্রকার রূপ কল্পনা তথা শিল্পসৃষ্টির কার্যে ব্রতী হইয়াছে। দেহমনের এই সহজ প্রেরণা কেবল যে সমাজের শিষ্টশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, লোক স্তরেও ইহা সক্রিয়। এই লোকস্তরে আদিম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যে সব শিল্প সৃষ্ট হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহাই সংক্ষেপে লোকশিল্প নামে পরিচিত। লোকশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা অশিক্ষিত, অসংস্কৃত ও আদিম ধারণার প্রেরণায় পরিচালিত বলিয়া লোক-শিল্পের আঙ্গিক যেমন সহজ ও সরল বিষয় বস্তুও তেমনি প্রাচীন সংস্কারবিশিষ্ট। শিক্ষিত দীক্ষিতের সৃষ্টিতে যেরূপ আঙ্গিক জটিলতা ও উচ্চকোটির নৈর্ব্যক্তিক ভাবুকতা দেখা যায় লোক সৃষ্টিতে সেরূপ গঠনগত জটিলতা ও উন্নত ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকশ্রেণীকে আনন্দ দিবার জন্য লোকস্তরের অশিক্ষিত পটু শিল্পীদ্বারা রচিত লোকশিল্পের মধ্যে এমন একটি অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা পাওয়া যায় যাহা শিক্ষিতের পরিশীলিত

রুচিসৃষ্ট রচনায় লক্ষিত হয় না। যথার্থ লোকশিল্প বলিতে পূর্বে সেই শিল্পকে বুঝাইত যাহা লোকস্তরের ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট, লোকস্তরের ব্যক্তি দ্বারা পরিবেশিত এবং লোকস্তরের ব্যক্তিকে আনন্দ দিবার জন্য রচিত হইত। [1]পূর্বে লোক-সমাজের শিল্পীরা তাহাদের ব্যক্তিগত কল্পনা অনুযায়ী শিল্পের বিষয়বস্তু ও রূপ নিধারণ করিতেন না ; যুগের সমষ্টিগত চেতনা দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইতেন। কিন্তু অধিকতর সভ্য সহরবাসীর সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগের ফলে শিল্প-রচনা-রীতি পরিবর্তিত হইতে থাকে। [2]যাহাদের সঙ্গে সহরের যোগ নাই তাহারা প্রচলিত বহুর রুচি অবলম্বনে আলাদাভাবে বস্তুর শিল্পরূপ দিতে থাকেন ; আর যাহাদের সঙ্গে সহরের যথেষ্ট যোগাযোগ সাধিত হয় তাহাদের শিল্পকৃতি উল্লেখযোগ্য রূপে সহুরে রীতির উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠে। ফলে লোকসমাজে নূতন যৌগিক রীতির শিল্প আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং অধিকতর সভ্য সমাজের রুচির প্রভাবে গ্রামাঞ্চলে দুইটি শিল্পরীতি দেখা দেয়, (ক) প্রচলিত বহুর রুচি অনুশীলনে গঠিত শিল্প (primitive art) ও (খ) যৌগিক রীতির শিল্প (derivative art)। ইহার পরে আর্থনৈতিক ও যুগরুচির কারণে প্রথম রীতি দ্বিতীয় রীতির প্রভাবে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। এই ভাবে বয়ন-মৃৎ-কাষ্ঠ প্রভৃতি শিল্পে, গৃহসজ্জায় এবং অলঙ্করণ প্রভৃতি বিষয়ে রূপান্তর ঘটে। সুতরাং বর্তমানে লোকশিল্পের উল্লিখিত প্রাচীন সংজ্ঞা পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। লোকশিল্পের ঐ প্রাচীন সংজ্ঞা মানিতে গেলে আবার দেখা যাইবে যে চৈতন্যদেব অভিনীত কৃষ্ণযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যত যাত্রা-নাটক রচিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই ঠিক লোকপর্যায়ের অর্থাৎ অশিক্ষিত লোক দ্বারা রচিত হয় নাই এবং সবক্ষেত্রে লোকস্তরের অভিনেতাদ্বারাও অভিনীত হয় নাই ; সুতরাং যাত্রা-নাটককে লোকনাট্য বলা সঙ্গত হইবে না। বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীদ্বারা রচিত এবং পেশাদার দল কর্তৃক অভিনীত আধুনিক যাত্রানাটকের

---

1. The artists were craftsmen......expressed not their own individual conceptions in either matter or form but through forms dictated to them revealed the 'corporate consciousness' of the age. p. 245—Encyclopaedia of the Social Sciences Vol. II)—Seligman.

2. Primitive arts growing up in isolation or in contact only with others of the same kind and derivative arts which are demonstrably more or less dependent on civilized ones.......essentially of latter category. p. 128 Ibid.

ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণই অপ্রযোজ্য হইবে। প্রশ্ন, তথাপি যাত্রা-নাটককে লোকনাট্য বলা হয় কেন বা লোকনাট্য বলিবার কোন যুক্তি আছে কিনা।

লোকনাট্য

যাত্রা-নাটককে লোকনাট্য বলা হয় এই কারণে যে ইহা সাধরণত অশিক্ষিত জনসাধারণকে আনন্দ দিবার এবং আনন্দের মাধ্যমে জনমানসে মূল্যবান সামাজিক আবেগ সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে মুখ্যত রচিত ও অভিনীত হয়; এই জন্যই যাত্রা-নাটকে আদিম পর্যায়ের সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষত সামষ্টিক আবেগ সঞ্চারণের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। এই মৌলিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া যেমন যাত্রা-নাটকের জন্য সার্বজনীন আবেগপূর্ণ বিষয়-বস্তু বা ঘটনা নির্বাচন করিতে হয় তেমনি সহজ সরল সর্বজনবোধ্য ভাষায় সংলাপ-রচনা এবং আবেগ সঞ্চারক কতগুলি রীতি প্রয়োগ করিতে হয়। এই বিশিষ্ট রীতিকেই যাত্রা-নাটকের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য বলিতে পারা যায় এবং এই রীতির মধ্যেই যে যাত্রা-নাটকের লোকধর্মিতা নিহিত রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার বিষয়। লোকপ্রিয় বিষয় বস্তু, সরল ভাষায় মোটাদাগের গাঢ়বর্ণের চরিত্র স্থষ্টি ও ভাবসঞ্চারণের বিশিষ্ট রীতিতে যাত্রা-নাটক যেমন লোকস্তরের অতি ঘনিষ্ঠ ইহয়া বহিয়াছে তেমনি অভিনয় রীতিতেও ইহা লোক-ঘনিষ্ঠ। থিয়েটারী অভিনয়ে অভিনেতা ও সামাজিকের মধ্যে যতখানি ব্যবধান থাকে যাত্রাভিনয়ে ততখানি ব্যবধান থাকে না। যাত্রার আসর গণ-বেষ্টিত, অভিনেতারা যেন জনসাধারণের একটি বিশেষ অংশ, আনন্দ বিতরণের জন্য জনগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিরূপে জনগোষ্ঠীর হৃদয় হইতে সমুত্থিত হইয়া তাহারা যেন জনসাধারণের মধ্যে বা সম্মুখে উপস্থিত। এই লোক ঘনিষ্ঠতার জন্যই যাত্রানাটককে লোক-নাট্যের পংক্তিতে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে এবং ইহা যুক্তিযুক্তও বটে।) কারণ অশিক্ষিত বা শিক্ষিত যিনিই যাত্রা নাটক লিখুন না কেন, অপেশাদার সৌখিন দল অথবা পেশাদার ব্যবসায়ী দল যাহারাই ইহা অভিনয় করুন লেখককে যেমন ইহাকে লোক-ভোগ্য, লোক-বোধ্য ও গণ-হৃদয়-সংবাদী করিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় অধিকারীদেরও তেমনি ইহার প্রযোজনায় গণচিত্তে রস সঞ্চারের জন্য সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতে হয়। সমবেত লোক মনে ভাবাবেগ সঞ্চার করিবার জন্য যাত্রানাট্যকারকে কয়েকটি বিলক্ষণ রীতি অবলম্বন করিতে হয়, অভিনেতাকেও তেমনি বিশি

রীতিতে অভিনয় করিতে হয়। ইংরাজীতে যাহাকে mass-communication সমস্যা বলে, আমরা যাহাকে গণচিত্তে ভাবসঞ্চারণ সমস্যা বলিতে পারি, যাত্রানাট্যকারকে বিশেষ ভাবে সেই সমস্যার সম্মুখীন হইতে ও সমাধান করিতে হয়। থিয়েটারের নাট্যকারকে যেখানে নাট্য রচনা করিতে হয় মুষ্টিমেয় নাগরিক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যাত্রানাট্যকারকে সেখানে নাটক লিখিতে হয় অগণিত অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত দর্শকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ইহার জন্য যাত্রা-নাট্যকার যেসব বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন সেইগুলিই যাত্রানাটককে এমন এক বিশিষ্টতা দান করিয়াছে যাহা ইহাকে থিয়েটারী নাটক হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র প্রজাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে এবং প্রাচীন লোকনাট্যের সমগোত্রীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন লোকনাট্যের সমগোত্রীয়তা বলিতে কি বুঝায় পূর্বের আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। 'লোকস্তরের লোক দ্বারা রচিত এবং লোক রঞ্জনের উদ্দেশ্যে অভিনীত হইবার ফলে প্রাচীন লোকনাট্যের মধ্যে যে ভাবের ও ভাষার সরলতা, অকৃত্রিমতা এবং অভিনয় রীতিতে যে লোক-ঘনিষ্ঠতার আধিক্য ছিল যাত্রানাটকের গঠনে ও অভিনয়ে আমরা সেই ধর্মগুলি পাইয়া থাকি; এই জন্যই শিক্ষিত লোকরচিত যাত্রানাটকেও লোক-আত্মার (folk spirit) অভিব্যক্তির অভাব লক্ষিত হয় না।'

সাহিত্য শাস্ত্রে খাঁটি মহাকাব্য (authentic epic) ও অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত মহাকাব্যের (literary epic) মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করা হইলেও উভয় প্রকার কাব্যকেই যেমন মহাকাব্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তেমনি আমরা খাঁটি লোকনাট্য (authentic folkdrama) ও রীতি সম্মত লোকনাট্য (literary folkdrama) এই দুই প্রকার লোকনাট্যের কল্পনা করিতে পারি। খাঁটি মহাকাব্যের মত খাঁটি লোকনাট্য স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি, অন্যপক্ষে সাহিত্যিক মহাকাব্যের মত সাহিত্যিক লোকনাট্য শিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প নাট্যকারের পরিকল্পনা প্রসূত অর্থাৎ লোক-উপভোগ্য এবং আসরে অভিনেয় নাটক লেখার উদ্দেশ্য লইয়া চেষ্টাকৃত রচনা। খাঁটি লোকনাট্যের অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা এই শ্রেণীর লোকনাট্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু লোকবোধ্য ভাব ও ভাষা থাকায় এবং জনগণ-বেষ্টিত আসরে অভিনয় করিবার উপযোগী আঙ্গিক প্রযুক্ত থাকায় সাহিত্যিক লোকনাট্য সাহিত্যিকসৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও লোকনাট্যই বটে। আমাদের যাত্রা-নাটকগুলি এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকনাট্য—সাহিত্যিক লোকনাট্য।

এই লোকনাটকগুলির রচয়িতারা যেমন লোকস্তরের লোকরূপে গৃহীত হইতে পারেন না তেমনি অভিনেতাদেরও লোকোৎসবে অংশগ্রহণকারী সমবেত জনতার একটি বিশেষ অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। রচয়িতারা শিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প এবং অভিনেতারা অপেশাদার সৌখিন সম্প্রদায় বা পেশাদার কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। এই দিক হইতে নাটকগুলি লোকরচিত ও লোকঅভিনীত নহে। কিন্তু রচয়িতা যখন সৃষ্টিকর্মে ব্যাপৃত থাকেন তখন লোকসভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁহার ভাব ও ভাবনা পরিচালিত হয়। সুতরাং মানসিকতার দিক হইতে পালাকার তখন লোকপর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়েন। তাই শিক্ষিত সচেতন লোকভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বারা লোক-জীবনাদর্শ ও লোক-রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত এবং লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হয় বলিয়া ইহারা অবশ্যই লোকনাট্য-ধর্মী। এই নাটকগুলির বৃত্ত, ভাব ও ভাষা অপেক্ষাকৃত জটিল ও অলংকৃত হইয়াছে, অভিনয়কালের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে—সারা রাত্রিব্যাপী অভিনয় তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি থিয়েটারী নাটকের আকৃতি-প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আছে। থিয়েটারী নাটককে আসরে অভিনয় করিলেই যেমন তাহা লোকনাট্য হইবে না, তেমনি যাত্রা-নাটককে মঞ্চের উপরে দৃশ্যসজ্জাসহ অভিনয় করিলেই তাহা থিয়েটারী নাটকে পরিণত হইবে না। মঞ্চে অভিনেয় নাটককে যাত্রানাটকে পরিণত করিতে হইলে ইহার আকৃতি-প্রকৃতিতে অনেক পরিবর্তন করিতে হইবে। বিশেষত বিরাট জনতাকল্প অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত দর্শকমণ্ডলীর কাছে কথাবস্তু, ভাবাবেগ ও চরিত্রভাষ্য সুষ্ঠুভাবে পৌঁছাইয়া দিয়া সামষ্টিক আবেগ জাগাইতে যে সমস্ত আঙ্গিকের প্রয়োজন ইহাতে সেই সব আঙ্গিক প্রয়োগ করিতে হইবে। আবার আসরে অভিনেয় নাটককে থিয়েটারী নাটকে পরিণত করিতে হইলেও ইহার আকৃতি-প্রকৃতি অনেকখানি বদলাইতে হইবে, লোক-ধর্মিতার পরিবর্তে শিষ্টরুচি-ভোগ্যতার মাত্রা বাড়াইতে হইবে এবং এতমাত্রায় বাড়াইতে হইবে যাহাতে ইহার মধ্যে একটি গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া যায়। সাহিত্যিক লোকনাট্যে শিষ্টরুচি-ভোগ্যতার মাত্রা না বাড়িতে পারে এমন নহে, কিন্তু ইহা এত মাত্রায় কখনই পৌঁছাইবে না যাহাতে ঐরূপ গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়া যাইবে। গুণগত পরিবর্তন ঘটিলে আর তাহাকে লোকনাট্য বলিতে পারা যাইবে না—তাহা থিয়েটারী নাটক হইয়া যাইবে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় যে আধুনিক শিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প সচেতন ব্যক্তি রচিত যাত্রা-নাটক সাহিত্যিক লোকনাট্য। শিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প ব্যক্তির উন্নত মানসিকতার প্রকাশ ইহার উপস্থাপ্য বস্তু নহে; ইহাতে গ্রাম্য জনের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার কথাই উপস্থাপিত হয়। নগরে বসিয়া যিনি এই লোকনাট্য রচনা করেন তিনিও নাগর সামাজিকের কথা মনে রাখিয়া বিষয়বস্তু নির্বাচন ও রচনারীতি নির্ধারণ করেন না। তিনি লেখেন গ্রামীণ সামষ্টিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার আধুনিক লোকনাট্যের কথা উত্থাপিত হইতে পারে। এই নাটকগুলিকেও সাহিত্যিক লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়; বর্তমান কালে আমেরিকায় এই শ্রেণীর লোকনাট্যই রচিত হইতেছে। অন্যান্য দেশের মত এই মহাদেশেও একই ভাবে লোকনাট্যের উদ্ভব হয়। ধর্মীয়, ঐন্দ্রজালিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক উৎসব অবলম্বন করিয়া ইহার যাত্রা সুরু। যন্ত্রযুগের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি আমেরিকায় লোকনাট্য পূর্বের বহুস্তর অতিক্রম করিয়া বর্তমানে নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আধুনিক জটিল সভ্যতা হইতে দূরে অবস্থিত লোকজীবনের উপাদান আহরণ করিয়া নাট্যকারগণ সচেতন ভাবেই আধুনিক কালে লোকনাট্য রচনা করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিন্ রিগ্‌স্ রচিত [1]গ্রীন্ গ্রো দি লিল্যাক্স্ লোকনাটকটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। পল্লীঅঞ্চলের একটি গোলা বাড়িতে Miss Laurey র সঙ্গে Curley এবং Jeeter-এর প্রণয়দ্বন্দ্ব নাটকটির মূল ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া লোকসমাজ ও লোক-জীবন বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়া লোকনাট্যখানি রচিত হইয়াছে। [2]বর্তমানে আমেরিকার লোকনাট্য এক একজন ব্যক্তিনাট্যকারের সচেতন রচনা। যাহারা বর্তমান যুগের জটিল সামাজিকতা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত

1. Green Grow the Lilacs—Lynn Riggs (New York, 1930).

2. Each of the American folk-plays is the work of a single author dealing consciously with his materials, the folk-ways of our less sophisticated people living simple lives not seriously affected by the present day complex social order. The plays present legends, superstitions, customs, environmental differences, the vernacular of the common people. For the most part they are realistic, tragic or with robustious comedy; sometimes they are imaginative and poetic. p. 234 Dictionary of World Literature—J. T. Shipley (New York, 1943).

নহে এবং কুটিল-কৃত্রিমতায়ও কম অভ্যস্ত সেই সকল সরল লোকের জীবন হইতে এই নাট্যকারগণ উপাদান সংগ্রহ করেন। প্রাচীন উপাখ্যান, লোকসংস্কার, প্রচলিত রীতি, নাগরিক জীবনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পার্থক্য, লোকভাষা, সমস্তই এই শ্রেণীর নাটকে উপস্থাপিত করা হয়। এই নাট্যরচনা অনেকাংশেই বাস্তবধর্মী, বিষাদান্ত অথবা সরল কোলাহলময় হাস্যরসাত্মক, কখনও কখনও এই শ্রেণীর নাটক আবার কল্পনামূলক ও কাব্যাশ্রয়ী হইয়া থাকে। লোকনাট্য সম্পর্কে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি হইতেছে এই যে [1]প্রকৃতি-জগতের উপভোগ এবং আত্মরক্ষার জন্য মানুষের শারীরিক অথবা মানসিক মরিয়া সংগ্রামের মধ্যে যাহার সমস্ত নাট্যক্রিয়ার চরম কারণ নিহিত তাহাকেই লোকনাট্যরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। আমেরিকায় দরিদ্র গ্রামীণ জীবন অবলম্বনে বস্তুতান্ত্রিক লোকনাট্য রচনার প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। বিংশ শতকের প্রথম পাদে [2]১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরোলিনা নাট্য সম্প্রদায়ের 'When Witches Ride' এবং 'The Return of Buck Gavin' নামাঙ্কিত লোকনাট্যদ্বয়ের প্রথম প্রয়োগের পর হইতে ইহার বৃদ্ধি সূচিত হয়।

আদিম মানব অভিজ্ঞতার ফলে প্রকৃতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য চলমান বস্তু সমূহের মধ্যে শুভ ও অশুভ শক্তির পরিচয় পাইয়া শুভকে দয়াশীল এবং অশুভকে নির্দয় রূপে গ্রহণ করিল। এই নির্দয় শত্রু-শক্তি দৈত্য, ভূত পিশাচ ও শয়তান বলিয়া কল্পিত হইল। ইহারা মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্যই বিশ্বে আবির্ভূত। তাই ইহাদের ভয় করাই স্বাভাবিক। প্রকৃতির বিরুদ্ধে উপায়হীন আদিম মানবের মধ্যে অশুভ শক্তি সম্পর্কে এমনিভাবে ভয়ের যৌক্তিকতা দেখা দিল। আত্মরক্ষার জন্য এই ভয় বিদূরিত করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। [3]শীতের হিম কঠিন প্রকোপে

---

1. The ultimate cause of all dramatic action we classify as folk, whether it be physical or spiritual, lies in men's desperate struggle for existence and his enjoyment of the world of nature. p. 243. Dictionary of World Literature, J. T. Shipley (New York, 1943)

2. Folk-drama in the sense of a realistic play about the poorer rural classes, has developed in the U. S. since the carolina Playmakers gave their first production of Carolina Folk-plays, March 14. 1919 (When Witches Ride —by Eliz. Lay, The Return of Buck Gavin—by Thos. Wolfe). p. 243, Ibid,

3. Nature provided a reminder in the annual triumph of spring over winter that the most malignant spirits would be banished or at least kept at a distance with the help of those more benevolently inclined. p.p. 156—157—Cassell's Encyclopaedia of Literature, S. H. Steinberg (Lond. 1953).

নির্জীব ধরণী প্রতিবৎসর বসন্তের আগমনে পত্রপুষ্পে জীবন্ত হইয়া উঠে। ইহা হইতে আদিম মানব বুঝিল, ঐ অশুভ শক্তি যেমন পৃথিবীতে মৃত্যু বর্ষণ করে তেমনি শুভ শক্তি পৃথিবীকে আবার জীবনীশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়। সুতরাং অলৌকিক উপায়ে শুভ শক্তির করুণা লাভ করিয়া লোকসমাজ অশুভ শক্তিকে দূরে সরাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল। এই প্রচেষ্টার মধ্যেই একদিকে দেবদেবী সৃষ্টির সূচনা হয়, অন্যদিকে তেমনি শুভ ও অশুভ শক্তি যথাক্রমে জীবন এবং মৃত্যুর প্রতীকরূপে গৃহীত হয়।

দৈবের প্রভাবে এবারে শয়তান পরাজিত। সে কেবল ক্ষণকালের জন্য ধরণীকে নিদ্রাভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু দেবতাও তাহার ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্যে ধরণীর এই মোহনিদ্রা ভাঙিয়া দিয়া ইহাকে উর্বরা শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার অধিকারী। এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া [1]আদিম মানবের দেব-ধর্ম-উৎসব ও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানে যে সংগীত ও নৃত্যের আয়োজন করা হইত তাহার মধ্যেই লোকনাট্যের সূত্রপাত হয়। নাট্যশিল্প অনুকরণাত্মক। আদিম সমাজে উৎসবের সঙ্গীত-নৃত্যে অনুকরণাত্মক নীতি (principle of imitation) অনুসৃত হইত। এই অনুকরণের মধ্যেই নাটকের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। দেব-উৎসবে দেবমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা হইত। এই ব্যাখ্যায় ক্রমে সংগীতের জন্য সৃষ্ট পদ্যাতিরিক্ত কথা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে ইহার সঙ্গে অনুকরণাত্মক মানসিক ক্রিয়াও সংযুক্ত হয়। এই সংযোগের ফলে সংগীত-নৃত্যানুষ্ঠান কালক্রমে নাটকে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে নাট্যোৎপত্তি সম্পর্কে কীথ সাহেবের মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে, [2]"...origin of drama in the sacred dance, a dance, of course accompanied by gesture of pantomic character, combined with song, and later enriched by dialogue, this would give rise to the drama."

আদিম লোকসমাজে সংগীত ও নৃত্যের আশ্রয়ে মনোভাব প্রকাশ করা হইত। লোকভাষা যখন ক্রমব্যবহারের ফলে সাহিত্য রচনার পক্ষে কিঞ্চিৎ উপযুক্ত হইয়া

1. Folk Drama began in primitive pagan rites and magic ceremonies of song and dance. p. 242, Dictionary of World Literature—Shipley (New York, 1943)

2. The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory & Practice p. 26, Dr. A. B. Keith (Oxford, 1951)

উঠিল তখনও সংগীত-নৃত্যকে এড়াইয়া এই ভাষায় স্বতন্ত্র সাহিত্য রচিত হইত না। লোকসমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য [1]কাব্যোপলব্ধি এমন কি গল্পও পদ্যবন্ধে রচিত হইত এবং সুর ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে এই সমস্ত লোকসমাজে পরিবেশিত হইত। সুতরাং লোকনাট্যেও স্বাভাবিক ভাবেই নাচ-গানের প্রাধান্য ছিল। গল্পকে প্রাধান্য দিয়া লোকনাট্য রচিত হইত না। ধর্মারাধনা, অলৌকিক শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য ইন্দ্রজাল অথবা সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানের সংগীত নৃত্যে যে সাধারণ নাটকীয়তা ছিল তাহার মধ্যে লোকনাট্যের প্রাথমিক অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। আদিম সমাজের mores অনুযায়ী জনগণের মনোভাব প্রকাশের জন্য গল্পনিরপেক্ষ কথা, সুর ও অঙ্গভঙ্গি এই ত্রয়ীর ভিত্তির উপরে লোকনাট্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। লোকসমাজে নাটক ও গল্প পৃথক ভাবে পরিবেশিত হইত। সংগীত-নৃত্য, দেবমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা, ভাবপ্রকাশের জন্য খণ্ড দৃশ্য অথবা উপদেশাত্মক টুকরা ঘটনা লইয়া লোকনাট্যের ধারা আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। [2]রেনেসাঁর পূর্বে অন্ধকার যুগের সমাপ্তি ভাগে কোন এক সময় নাটক ও গল্পকে লোকনাট্যে একত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত হয়। ঐ সময় হইতেই ইহা গল্প প্রধান হইতে সুরু করে। বর্তমানে লোকনাট্যে গল্পেরই প্রাধান্য। সংগীত, নৃত্য এবং অভিনয় দ্বারা আনুপূর্বিক কাহিনী রূপায়ণ ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক আদিম লোকসমাজেই ধর্মীয় নৃত্যগীত হইতে লোকনাটকের উদ্ভব হয়। এই লোকনাট্যের উদ্দেশ্য ছিল অদৃশ্য শক্তিকে খুশি করিয়া নানা বিষয়ে লোকের মঙ্গল বিধান করা। গ্রীক লোকসমাজে পূর্বপুরুষদের বিদেহী আত্মার (Supreme Beings) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং দেবতার করুণালাভমানসে অর্ঘ্যদান, স্তুতিসংগীত ও নৃত্য যোগে বিশুদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইত; মৃত ব্যক্তির আত্মার শুভাশুভ নির্ণয়, রোগভোগ দূরীকরণ, ভূত-প্রেত প্রভৃতি অশুভ এবং অলৌকিক শক্তিকে সংযত করিয়া নিজেদের মঙ্গলের জন্য বহু কৌশল অবলম্বনে ঐন্দ্রজালিক উৎসবাদিও

1. ...a story or poetical conception, is at one and the sametime versified, chanted and conveyed in gesture. p. 4. The Ancient Classical Drama—R. G. Moulton (Oxford, 1890)

2. Drama and Story had prevailed separately : and agency for bringing them two together was found in the popular Drama that arose towards the close of the Dark Ages. p. 429 Ibid.

অনুষ্ঠিত হইত। আবার আনন্দ পরিবেশনের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হইত। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতির অধিপতি দেবতা Dionysus-এর উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেবতা শরতে নির্জীব হইয়া পড়েন এবং বসন্তের আগমনে সজীব হইয়া উঠেন। এই বিশ্বাস লইয়া পল্লী-প্রকৃতি-দেবতার উৎসবে (village Dionusia) যে সংগীত-নৃত্য অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইতেই পরবর্তী কালে গ্রীক লোকনাট্যের উৎপত্তি। জনৈক [1]Thespis খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে Village Dionusia অনুষ্ঠানে কোরাস্ ও অধিনায়ক কর্তৃক প্রথানুযায়ী প্রচলিত সাংগীতিক আবৃত্তির সঙ্গে চরিত্রে অনুকরণাত্মক ব্যক্তিত্ব আরোপের রীতি প্রচলন করেন। এই রীতিই অভিনয়। এই অভিনয় অবলম্বনে সংগীত নৃত্যানুষ্ঠান পালানাটকে পরিণতি লাভ করে। অভিনয় ও মঞ্চ প্রসঙ্গে J. Gassner সাহেবের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে,—[2] "Thespis, a director of choruses, his face smeared with white lead perhaps in simulation of the dead god, stood on a table and addressed the leader of the chorus, dialogue was born in Greece With this inspired step Thespis also created the classic actor as distinct from the dancer. His table, which probably served as an alter for the animal sacrifice, was moreover the first inkling of a stage as distinguished from the primitive dancing circle." Thespis হইতে অভিনয়ের আরম্ভ বলিয়া গ্রীকগণ অভিনেতাকে সাধারণভাবে thespian রূপে অভিহিত করিতেন। Dionysus এর উৎসবে আদিম গ্রীকলোকনাট্য সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে বলা যায় যে [3]গ্রীক লোকনাট্যের উদ্দেশ্য ছিল ধরণীর উৎপাদনশক্তি সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত অথবা সুনিশ্চিত করা। যাহা হউক, [4]খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬০ অব্দে Thespis Athens নগরীতে অভিনয় দেখাইতে আসেন। Solan নামক গ্রীক আইনজ্ঞ তখন অন্যের চরিত্র সাজিয়া অভিনয় করাকে

1. To the conventional musical narration by a chorus and a leader, Thespis, the first actor, introduced impersonation. p. 3, Actors on Acting—T. Cole & H. K. Chiony (New York, 1949)

2. Masters of the Drama—p. 13, J Gassner (U. S. A.—1954)

3 The object of primitive drama was to encourage or ensure earth's fertility ; Greek was religious, social. p. 470. Dictionary of Mythology-Folk-lore and Symbols (Part I)—Gertrude (New York, 1961)

4 Actors on Acting, p. 3, Cole & Chinoy (New York, 1949)

'Dangerous Deception' নাম দেন। যাহা হউক, ইহার কিছুকাল পূর্বেই ৫৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্বৈরাচারী শাসনকর্তা Picistratus এথেন্স নগরীতে মদ্যাধিপতি Dionysus দেবতার উৎসবে (city Dionusia) নাট্য প্রতিযোগিতার প্রচলন করেন। এই প্রতিযোগিতায় পল্লীর লোকনাট্য সংস্কৃত হইয়া নাগরনাট্যে রূপান্তরিত হয়। ইহার ফলে খ্রীষ্টপূর্বযুগে গ্রীসে নাটকের স্বর্ণযুগ দেখা দেয়।

ইংলণ্ডে খ্রীষ্টীয়যুগে প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে হলকর্ষণ ও বীজবপন অবলম্বনে নানাপ্রকার উৎসব হইত। এইসব [1]উৎসবে শস্যোৎপাদন ও উর্বরা শক্তির দেবীগণ (Isis, Freya, Nehellenia) উৎসবাধীশ্বরী রূপে গৃহীত হইতেন। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানে সংগীত-নৃত্যের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গিযুক্ত নির্বাক অভিনয়-রীতি প্রচলিত হয়। এই সংগীত-নৃত্য যুক্ত নির্বাক অভিনয় ইংলণ্ডে 'mumming-play' (মূকাভিনয়) রূপে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের বসন্তোৎসব মূকাভিনয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অভিনয় এক প্রকার ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান। ধরিত্রীকে শীতরূপী মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা ইহার মূল ভাব। এই অভিনয়ে নায়কের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ দেখান হইত। এই শ্রেণীর পালা [2]দুই পংক্তির সমিল পদ্যবন্ধে, আদ্যোপান্ত বিবৃত হইত। ইহারই সঙ্গে নাচ, গান ও নির্বাক অভিনয় চলিত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত Christmas উৎসবে ইংলণ্ডের প্রায় সর্বত্রই এই মামিংপ্লে অভিনীত হইত। [3]অসি নৃত্য (ইংরেজদের তলোয়ার নাচ), ফরাসীর desbuffons এবং স্পেনের degollada নৃত্যানুষ্ঠান, ইটালীর mettaccino নৃত্যোৎসব এই একই মূকাভিনয় পালার ভাষান্তরিত রূপ। ইংলণ্ডের এই পালা অবলম্বন করিয়াই ইংরেজি ভাষাভাষী অঞ্চলে মূকাভিনয় পরিবেশিত হইত। অভিনয়ে সেন্ট জর্জ, ড্রাগন এবং ফাদার ক্রীষ্টমাস প্রধান চরিত্র রূপে গৃহীত হইতেন। এই মামিংপ্লের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। পালাভিনয়ে যাহারা

1. Goddesses of fruition and fertility (Isis, Freya, Nehellenia) presided. p. 242. Dictionary of World Literature, J. T. Shipley (New York, 1948)

2. The play is spoken through out in rhyming couplets. p. 548. Oxford Companion to the Theatre—P. Hartnoll (Oxford, 1951)

3. The Sword dance (Eng. Morris dance), the danse desbuffons in France ; the degollada in Spain ; the mettaccino of Italy were versions of the same drama transformed in the English speaking world into mummers play with St. George and the dragon and Father Christmas as principal characters. p. 243, Dictionary of world Literature—Shipley.

[1]অংশ গ্রহণ করিতেন জনগণের সংগে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইত। সর্বশেষে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হইতে অভিনেতৃগণ প্যালা (Quete) আদায় করিতেন অথবা উপহার-অর্থাদি সংগ্রহ করিতেন। এই রীতির মধ্যে ভূমিকা গ্রহণ কারীর প্রচার ও পেশাদার অভিনেতা সৃষ্টির সূচনার কথা অনুমান করা যাইতে পারে। মূকাভিনয়ের দল অনেক সময় পল্লীর বাড়িতে বাড়িতে ঘুরিয়া অভিনয় দেখাইত। ইহাদের সঙ্গে আমাদের দেশের নীল বা গাজনের দলের কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নীলের দলও বসন্তকালে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়া হর-পার্বতীর কাহিনী অভিনয় করে এবং নীল-উৎসবের জন্য অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের মামিংপ্লে সম্পর্কে বলা যায় যে [2]এই শ্রেণীর লোক-অভিনয় গ্রাম্য উৎসবে আনন্দ পরিবেশন করিবার জন্য পল্লীবাসীর উৎকর্ষহীন একপ্রকার উপস্থিত লোকনাট্য-প্রস্তুতি; ইহা লোক-উৎসবের অন্তর্নিহিত নাটকীয় ভাব হইতে নামে মাত্র সাহিত্যগুণ লইয়া উদ্ভূত। কাজেই লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সংগীতাদি পরিবেশন করিলেও পেশাদার চারণদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইহাকে সমপর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন হইবে না। পেশাদার চারণদের অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সুসংগঠিত। পরবর্তীকালে লোক-অভিনয়ে সংলাপ ও পশুপালক চরিত্র সংযুক্ত হওয়ায় ইংলণ্ডে 'pastorela' নাটকের উদ্ভব হয়। ইহার পরে খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থান গীর্জার প্রভাবে ইংলণ্ডের লোকনাট্যে নানাবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

1. ···the presentation in which the characters taking part are introduced; ...and finally the quete, or collection gifts or money from the audience by the players. p. 226. Cassell's Encyclopaedia of Literature.—S. H. Steinberg. (Lond, 1953)

2. ...rough-and-ready dramatic entertainments given at village festivals by the villagers themselves. These were derived with the minimum of literary intervention, from the dramatic tendencies inherent in primitive folk festivals, and should not be confused with the productions of professional ministrels. p. 269, The Oxford Companion to the Theatre—P. Hartnoll (Oxford, 1951)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেব-উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্য-গীত ও শোভাযাত্রা (going in a procession) হইতে যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং নৃত্য ও গীত ইহার দুইটি প্রাথমিক উপাদান। পূর্বে যাত্রাপালার সমস্ত চরিত্রের নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার ছিল। দশরথ, কৈকেয়ী, রাম, রাবণ, মন্দোদরী সকলেই লোকনাট্যের আসরে সময় সময় নৃত্য করিতেন। এই নৃত্য অনিয়ন্ত্রিত ছিল। কাজেই ইহা অনেকটা হাস্যকর হইয়া পড়িত। মনোমোহন বসু ও মদন মাষ্টারের প্রচেষ্টায় লোকনাট্যের সংস্কার হওয়ায় এই অনিয়ন্ত্রিত নৃত্য ক্রমে উঠিয়া গেল এবং নিয়ন্ত্রিত নৃত্য প্রবর্তিত হইতে লাগিত। ফলত সকল চরিত্রের নৃত্যে অংশ গ্রহণ করা বন্ধ হইল। চরিত্র বিশেষের জন্য কেবল নাচ থাকিল। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে যেমন নৃত্য-গীতযুক্ত সঙ উপস্থাপিত হইত যাত্রায়ও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। নানা বিষয় ও ভাব অবলম্বনে দাশরথির সঙ্‌ আসরে উপস্থাপিত হইত। কিন্তু লোকনাট্যের সঙ্‌ ছিল আদি ও হাস্যরসাত্মক। ক্রমে ক্রমে এই সঙ্‌ আদি রসাত্মক দ্বৈতগীতির চরিত্রে রূপান্তরিত হইল ; এই গানেও নৃত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এই নৃত্যও নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। কাজেই উনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য প্রচলিত হওয়ায় যাত্রায় ইহার প্রভাব কিঞ্চিৎ কমিতে থাকে।

উনিশ শতকের লোকনাট্যে সঙ্গীতের দিক হইতেও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। পুরুষ ও নারী চরিত্রাভিনেতৃগণের কণ্ঠ-স্বাভাবিকতা যথাসম্ভব বজায় রাখিবার জন্য এবং উপযুক্ত গায়ক-অভিনেতার অভাব দূর করিবার জন্য বয়স্ক অভিনেতা দ্বারা গীত গান বন্ধ করিয়া জুড়ির গানের প্রচলন হয়। বয়স্ক পুরুষ কণ্ঠের গানের জন্য প্রৌঢ় জুড়ির এবং বামাকণ্ঠানুসরণের জন্য বালকদের গান প্রবর্তিত হয়।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে যাত্রাদলগুলির প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা ও চন্দননগর-ফরাসডাঙ্গা। অধিকারীরা কলিকাতার মঞ্চাভিনয় দেখিতেন এবং ইহা দ্বারা প্রভাবিতও হইতেন। কাজেই থিয়েটারী নাটকের প্রভাবে তাহারা অভিনেতব্য অংশের উপর জোর দিতে আরম্ভ করেন। ইহার জন্য বড় বড় সংলাপ যাত্রা পালায় সংযোজিত হইতে থাকে। ফলে যাত্রা তিনটি শ্রেণীতে

বিভক্ত হইয়া যায়—(ক) নৃত্য-গীতি-প্রধান কৃষ্ণযাত্রা, (খ) গীতি ও অভিনয়-প্রধান পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক যাত্রা এবং (গ) অভিনয়-প্রধান গীতিযুক্ত যাত্রা। কৃষ্ণযাত্রায় রাধা-কৃষ্ণ কথা অবলম্বিত হইত। ইহাতে ছোট ছোট সংলাপ সংযোজিত হইত; এই যাত্রায় নাচগানেরই প্রাধান্য ছিল। এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ অধিকারী ও তাঁহার শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণযাত্রার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক যাত্রায় পুরাণ কাহিনী ও ভক্তিমূলক চণ্ডী-মনসা-ধর্মমঙ্গলের কাহিনী গৃহীত হইত। এই যাত্রায় অভিনয় ও গান দুইটি বিষয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপিত হইত। গীত ও অভিনয়কে প্রাধান্য দিয়া গীতাভিনয় রচনার মূলে মনোমোহন বসু ও হরিমোহন রায় কর্মকারের বিশেষ অবদান ছিল। মতিলাল রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকার এই শতকে অনেক গীতাভিনয় রচনা করেন। এই শতকের অনেক পালায় বহুগান ও অভিনয়ের উপযুক্ত সংলাপ থাকিলেও গীতাভিনয়রূপে নামাঙ্কিত হইত না; প্রকৃতির দিক হইতে গীতাভিনয়ের সংগে ইহাদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ঠাকুরদাস দত্তের 'লক্ষ্মণ বজন', কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইতে পারে। চৈতন্য-যাত্রা সাধারণত কৃষ্ণ-যাত্রার ঢঙ্-এ পরিবেশিত হইত; আবার কখনো কখনো গীতাভিনয় রূপেও অভিনীত হইত। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ছিল নৃত্য-গীতি প্রধান; ইহাতে অভিনয়েরও কিছু কিছু সুযোগ থাকিত। অভিনয়-প্রধান গীতিযুক্ত যাত্রায় বহুগান থাকিলেও ইহাতে মোটের উপর অভিনয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হইত। ধনকৃষ্ণ সেনের 'কর্ণবধ', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। শুধু কৃষ্ণ যাত্রা নহে, অন্য প্রকার যাত্রায়ও পূর্বে অনেক গীতি সংযোজিত হইত; তাহার কারণও রহিয়াছে। সংগীতের মধ্য দিয়া জনচিত্তে সার্থকরূপে ভাবাবেগ সঞ্চার করা সহজসাধ্য। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্যের একটি উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে,—[1]"নৃত্য-গীত-বাদ্যই সমাজের শৈশবে আনন্দ সম্ভোগের প্রধান উপায় ছিল। সামাজিক অনুষ্ঠানে আজও এদের সার্থকতা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। যাত্রানাটকের পরিবেশে সমাজের নতুন শৈশবের লক্ষণ বর্তমান। এ পরিবেশে না আছে মঞ্চে অভিনয়ের প্রসার, ব্যাপক ব্যবস্থা—না আছে রসাস্বাদনের সূক্ষ্ম ও জটিল অভ্যাস। তাই নৃত্য গীত বাদ্যই যাত্রার প্রধান উপাদান—বিশেষত গীতই যাত্রার প্রধান মাধ্যম।"

১ নাট্য তত্ত্বমীমাংসা—পৃঃ ৪৫০, কলিকাতা—১৯৬৩

বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করিবার জন্য এবং লোকশিক্ষার জন্য অধিকারীরা অনেক সময় যাত্রায় বক্তৃতার অবতারণা করিতেন। এ বিষয়ে উনবিংশ-বিংশ শতকের মতিলাল রায় ও বিংশ শতকের মুকুন্দদাসের খুব খ্যাতি ছিল। যাত্রা পালায় কাহিনীও চরিত্রের মধ্য দিয়া লোকশিক্ষার জন্য দর্শকচিত্তে ন্যায় ও ধর্মবোধ জাগরিত করিবার প্রথা অবশ্য পালনীয় ছিল। পালার ঘটনা ও চরিত্র এই উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হইত।

উনিশ শতকের যাত্রা ছিল সুর প্রধান। তাই ইহাতে পুনঃ পুনঃ ঐকতান বাদন, কণ্ঠসংগীতের আধিক্য, একটু সুরেলা ভঙ্গিতে সংলাপ পরিবেশন ও মাঝে মাঝে অনুরূপ ভঙ্গিতে বক্তৃতার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় ছিল।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও প্রযোজনা রীতি বিশ্লেষণ করিলে লোকনাট্য গঠনে কয়েকটি উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপাদানকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) সংগীত, (২) সংলাপ সংযোজন, (৩) কাহিনী ও ঘটনার উপস্থাপনা, (৪) চরিত্র সন্নিবেশ, (৫) লোকশিক্ষা, (৬) রসসৃষ্টির ব্যবস্থা।

সঙ্গীত :—বিস্তৃত আসরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত উপস্থিত শ্রোতৃ-মানসে ভাবাবেগ উদ্রেক করিবার জন্যই [1]"যাত্রানাটকে সংগীত সংলাপের অপরিহার্য পরিপূরক। আসরে অভিনেয় নাটকে সংগীত-যোজনা কেবল প্রাচীন প্রথার মাত্র অনুবর্তন নয়, রস-সঞ্চারের অপরিহার্য উপকরণ বা উপায়।" লোকনাট্যে নানাভাবে এই উপকরণ সংযোজিত হয়,—

(ক) প্রস্তাবনা গীতি—অনেক সময় পালার মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়া একখানি গানের মধ্য দিয়া লোকনাট্যে প্রস্তাবনা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'তুলসী লীলা' পালার প্রস্তাবনাগীতি উদ্ধার করা যাইতে পারে,—

ধন্য ধন্য সতীর পবিত্র সতীত্বধন।
সতী-মাহাত্ম্যে সিদ্ধ অসাধ্য সাধন॥
অমোঘ সতী-ভারতী সাক্ষী দক্ষ-প্রজাপতি,
সতীত্বে সাবিত্রী সতী, মৃত পতির দেন জীবন॥
সতীর মান রাখিলেন হরি, তুলসীরে শিরে ধরি,
শুন অপূর্ব মাধুরী, সেই তুলসী লীলা কীর্তন॥

১। নাট্য তত্ত্বমীমাংসা-পৃঃ ৪৫১ ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ১৯৬৩

প্রস্তাবনা-গীতিতে অনেক সময় আবার শ্বেতশতদলবাসিনী দেবী সরস্বতী বা অন্য কোন দেবতার বন্দনাও করা হইত। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সগর-যজ্ঞ' নাটকের প্রস্তাবনা গানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন কোন যাত্রার প্রথমে নান্দী বা গৌরচন্দ্রিকা গীত হইত। আবার কখনো বা স্বদেশ-কল্যাণে শক্তি সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবনায় মাতৃবন্দনা করা হইয়াছে। মুকুন্দদাসের 'কর্মক্ষেত্র' পালায় ধান্য ক্ষেত্রে কৃষক বালকদের প্রস্তাবনা গীতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়,—

মা মা বলে ডাক দেখি ভাই
ডাক দেখি ভাই সবেরে।
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী জাগিবে শক্তি জাগিবে রে।
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ স্বদেশ-কল্যাণ তরে রে॥
মায়ের শ্রীচরণ-তরী ভরসা করি ভাসাও দেহ তরী রে।
তবে মা হবে কাণ্ডারী সুখে যাবি তরি ভয় কি অকুল পাথারে রে॥
দেখ ভারতবাসী ঐ এলোকেশীর মাণিকহারে হাত কেঁপেছে রে।
এ মুকুন্দে কয় আর কারে ভয় জয় জয় ডঙ্কা বাজারে॥

যে নাটকে প্রস্তাবনা-গীতি নাই তাহাতে নাট্যারম্ভের পূর্বে দেব-বন্দনা গীত হইত। ইহা আখড়াই-বন্দী নামে খ্যাত ছিল। আখড়াইবন্দীতে প্রচলিত দেব-গীতি প্রয়োগ করা হইত। প্রস্তাবনায় ও সংলাপের মধ্য দিয়া নাটকের মূল বিষয়টি ধরাইয়া দেওয়া হইত। প্রসঙ্গত হারাধন রায়ের 'ধর্মের জয়' পৌরাণিক পালার প্রস্তাবনার উল্লেখ করা যাইতে যারে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ইহা জানাইয়া দেওয়া হয়,—

প্রস্তাবনা — গঙ্গাতীর

গীত কণ্ঠে ব্যাসের প্রবেশ

ব্যাস—নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরং, রসসাগরনাগর ভূপবরং।
শুভ বঙ্কিম চারুশিখণ্ডী শিখং ভজকৃষ্ণ নিধিং ব্রজরাজসুতং॥

* * *

সুরবৃন্দ সুবন্দ্য মুকুন্দ হরিং, সুরনাথ শিরোমণি সর্ব গুরুং।
গিরিধারী মুরারি পুরারি পরং, ভজ কৃষ্ণ নিধিং ব্রজরাজসুতং॥

(স্বগত) যে ভীষণ বিদ্বেষানল কুরুক্ষেত্রে প্রবলভাবে জ্বলে উঠেছে, দেখি দেখি তার পরিণাম কি! ধ্যানযোগে সঞ্জয়কে স্মরণ করি। (ধ্যান)

[সঞ্জয়ের প্রবেশ]

সঞ্জয়—প্রভু! দয়াময়! দাসকে স্মরণ মাত্রই বিদ্যুতের মত ছুটে এসেছি!

ব্যাস—আমার মহাভারত রচনার কল্পনা কার্যে পরিণত হতে বিলম্ব কত?

সঞ্জয়—যে বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করে ভারতে প্রবল বিষারণ্য উৎপন্ন হয়েছিল, সেই মূল বৃক্ষের স্কন্ধমাত্র অবশিষ্ট, আজ আপনার নির্দেশ মত অষ্টাদশ দিন পূর্ণ হবে।

ব্যাস—উঃ! আজই মহাধ্বংসের শেষ স্ফুলিঙ্গ দেখা যাবে। চল—চল, আমিও হস্তিনাপুরে যাব। [উভয়ের প্রস্থান]

সংস্কৃত নাটকে প্রস্তাবনারীতি প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—প্রসাদ্যরঙ্গং বিধিবৎ কবের্নাম চ কীর্তয়েৎ।

প্রস্তাবনাং ততঃ কুর্যাৎ কাব্য প্রখ্যাপনাশ্রয়ম্॥

পূর্বরঙ্গ প্রসঙ্গ—৫ম অধ্যায়।

সংস্কৃত নাটকে আবার পাঁচ প্রকার প্রস্তাবনা রীতি প্রচলিত ছিল,—

উদ্‌ঘাত্যকঃ কথোৎঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা।

প্রবর্তকাবলোগিতে পঞ্চপ্রস্তাবনাভেদাঃ॥ সাহিত্যদর্পণ, বিশ্বনাথ

নান্দীর [১]আশীর্বচন ও নমস্ক্রিয়াদি দ্বারা [২]দেবতাদের সন্তুষ্ট করিয়া বিঘ্ননাশ ও মঙ্গলাচরণের ব্যবস্থা সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে গৃহীত হইত। যাত্রার প্রস্তাবনা-গীতি ও আখড়াই-বন্দী ইহা দ্বারা প্রভাবিত।

(খ) জুড়ির গান—সমস্ত অভিনেতার পক্ষে গান গাওয়া সম্ভব নহে। কাজেই গান মনোগ্রাহী করিবার জন্য সুকণ্ঠ গায়কদ্বারা কোন কোন অভিনেতার সংগীতাংশ পরিবেশন করাইবার ব্যবস্থা যাত্রায় প্রচলিত হয়। ইহার জন্য সংলাপের ভাব বা অংশ বিশেষ অবলম্বনে চরিত্রের মনোভাব প্রকাশক গান যাত্রায় সংযোজিত হইত। চরিত্রের উক্তি দিয়া গান আরম্ভ হইত বলিয়া ইহাকে উক্তি-গীতিও বলা হইত। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে আসরে জুড়িদ্বারা এই গান গীত হইতে আরম্ভ করে। রাবণ-বধ পালার একটি প্রচলিত উক্তি-গীতি দ্বারা ইহার

১ আশীর্নমস্ক্রিয়ারূপঃ শ্লোককাব্যার্থ সূচকঃ (নান্দীতি কথ্যতে), নাট্যশাস্ত্র—ভরত

২। নন্দন্তি দেবতা যস্মান্নান্দীতি কীর্তিতা

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া অশোক বনে রাখিয়াছেন। রাণী মন্দোদরী বুঝিতে পারিয়াছেন যে নারী হরণের ফলে রাবণের ধ্বংস অনিবার্য। তাই সীতা-কান্ত রামের সীতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তিনি রাবণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাবণ কিছুতেই সীতাকে ফিরাইয়া দিবেন না। তিনি মন্দোদরীকে বলেন—"কান্তে, আমি কিছুতেই সীতা-কান্তের সীতাকে ফিরিয়ে দেব না"। অমনি তাঁহার এই উক্তি ধরিয়া জুড়িরা গান ধরিলেন—

একান্তে দিবনা কান্তে সীতা-কান্তের সীতা আমি।
যদি বল সে না মরে কেবলমাত্র সেনা মরে
কালেতে লয় সে না মরে জাননা তুমি॥
মম বিক্রম বিশালে যমকে রাখি অশ্বশালে
কৃতান্ত মম শাসনে হুতাশন বন্ধনশালে।
(হের) বৈকুণ্ঠনাথ হলেন এবে ভূলোক-গামী॥

স্থান বিশেষে করুণ রসাত্মক গান (উক্তি-গীতি) বালকদের দ্বারা গীত হইত; নারীচরিত্রের গানও বালকরা গাইত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জুড়ির গানের প্রভাব কমিতে আরম্ভ করে। মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রায় জুড়ির গান ব্যবহৃত হয় নাই। ভূমিকাভিনয়ে দোহারযোগে মুকুন্দদাসের একক গান পালার প্রধান আকর্ষণ ছিল। তাহার যাত্রাপালার বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনেতারা কখনো একক ভাবে কখনো বা সমবেত ভাবে গীত পরিবেশন করিতেন। এই শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, হারাধন রায়, প্রমুখ লেখক তাহাদের যাত্রাপালায় জুড়ি-গীতি সন্নিবেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় দশকের পরে ইহার ব্যবহার বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। তথাপি কোন কোন নাটকে যে ইহার ব্যবহার একেবারে ছিল না তাহা নহে। রামদুর্লভ কাব্যবিশারদের 'মহারণে রামানুজ', অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থের 'কুরুপরিণাম' (১৩২০), প্রভৃতি পালায় জুড়ি-গীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় দশকেই জুড়ি-গীতির প্রয়োগ বন্ধ হইয়া যায়। পূর্বে যাত্রায় যে বহুল জুড়ি-গীতি প্রয়োগ করা হইত তাহার কারণ এই যে পাত্র পাত্রী অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রোতার মনে যে ভাবটি উদ্রিক্ত করিতে চাহিত গানের সুর-বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া তাহাকে আরো গভীর করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত। যাত্রায় জুড়ি-গীতি বন্ধ হইবার পরেও উক্তি-গীতি রহিল। কিন্তু ইহার পরিবেশন রীতি পরিবর্তিত হয়। একক গায়ক-চরিত্র এই গীতি পরিবেশন করিতে থাকে।

(গ) একানে বালকের গান—পিতৃ-মাতৃভক্তি, দেব-ভক্তি, বীরত্ব, সারল্য, কর্তব্যবোধ,—আত্মত্যাগ ও হৃদয়ের নানা কোমল বৃত্তির অধিকারী বালক চরিত্র লোকনাট্যে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহাকে মন্দিরে বলি দেওয়া, যজ্ঞে আহুতি দেওয়া বা চক্রান্তের ফলে হত্যার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা যাত্রায় 'একানে বালক' চরিত্র নামে পরিচিত; এই চরিত্রে গান অপরিহার্য। ফণিভূষণের 'যযাতি' পালার কুশধ্বজ, নিতাইপদর 'শ্মশানে মিলন'-এর রোহিতাশ্ব, অহিভূষণের 'সুরথ উদ্ধার' পালার অধিরথ, ভোলানাথের 'আদিশূর'-এর ভানু, ব্রজেন্দ্র কুমারের 'রক্তের নেশা'-র রঞ্জন, সৌরীন্দ্রমোহনের 'মাটির-মায়া'-র শংকর প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত রূপে গৃহীত হইতে পারে।

(ঘ) গণের গান—বন্দিগণ, ঋষিকুমারগণ, বৈষ্ণবগণ, শাক্তগণ, কৃষ্ণ-সখাগণ, রাধাসখীগণ, বীরজায়াগণ, নারীসৈনিকগণ, সৈনিকগণ, ভিখারিণীগণ প্রভৃতির সমবেত সংগীতকে 'গণের গান' বলা হয়। পূর্বে যাত্রায় এই শ্রেণীর গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে ইহার প্রয়োগ কমিয়া যায়। বর্তমানে গণের গান একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। শ্রোতৃমণ্ডলী বর্তমানে মামুলি সুরের গণের গানে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছেন। দলপতিরাও কেবলমাত্র এই ধরণের গানের জন্য দশবারোজন লোক পোষণ করিতে চাহেন না। ফলত ইহার প্রচলন বন্ধ হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি কদাচিৎ এই গানের সন্নিবেশ বর্তমানের যাত্রায় যে দেখা যায় না তাহা নহে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রজেন্দ্রকুমারের 'রক্তের নেশা' (১৯৬৩) পালার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পালায় গণের গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(ঙ) যাত্রা-ডুয়েট্—আদিরসাত্মক দ্বৈত নৃত্য-গীত 'যাত্রা-ডুয়েট্' নামে পরিচিত। হাল্কা গান ও চটুল নৃত্য পরিবেশন ইহার উদ্দেশ্য। মূল কাহিনীর সঙ্গে এই ডুয়েটের কোন যোগ থাকে না। ঘেষড়া-ঘেষড়ানী, মেথর মেথরানী, সাপুড়ে-সাপুড়েনী, মালি-মালিনী, সাঁওতাল-সাঁওতালনী, ভিস্তিওয়ালা ও তৎপত্নী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর নরনারী-চরিত্র সাধারণত ইহা পরিবেশন করে। উনিশ শতক হইতে ইহা যাত্রায় চলিয়া আসিতে থাকে। দর্শকরুচির পরিবর্তনের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইহার প্রয়োগ বন্ধ হইতে আরম্ভ করে। বর্তমানে যাত্রা হইতে ইহা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

(চ) যাত্রা-ব্যালে—যাত্রায় নিয়ন্ত্রিত নৃত্য প্রদর্শিত হইবার পরে উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে ইহার প্রয়োগ কমিয়া যায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে

নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ইহার বিশেষ প্রচলনে উদ্যোগী হইলেন। তৎকালীন অন্যতম প্রধান অধিকারী মথুরানাথ সাহা এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চের নৃত্য শিক্ষকদের সহায়তায় যাত্রায় গীতযুক্ত এক প্রকার সমবেত নৃত্যের প্রচলন করেন। ইহা 'যাত্রা-ব্যালে' নামে পরিচিত হয়। নাট্য কাহিনীর সঙ্গে সাধারণত ইহার অনিবার্য যোগ থাকে না। নাচে গানে দর্শকদের আনন্দ পরিবেশন করা ইহার মূল উদ্দেশ্য। মূকাভিনয়, নৃত্য, সুর ও গীতি সহযোগে পাশ্চাত্যে প্রচলিত ব্যালের (ballet) সঙ্গে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। মথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের দলে অভিনীত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' পালা (১৩১১) হইতে যাত্রা-ব্যালের প্রবর্তন হয়। ইহার পরে ব্যালে যাত্রার একটি বিশেষ অঙ্গে পরিণত হয়। বাঈজীগণ, নর্তকীগণ, সখীগণ, ভীলরমণীগণ, বনদেবীগণ, তরঙ্গবালাগণ, অপ্সরাগণ প্রভৃতি চরিত্র যাত্রা-ব্যালে পরিবেশন করে। পূর্বে একটি পালায় চার পাঁচটি ব্যালে থাকিত। বর্তমানে ইহার প্রয়োগ কমিয়া গিয়াছে ; অনেক পালায় ইহা থাকে না।

(ছ) বিবেকের গান—ন্যায়-অন্যায় কর্মের সমালোচনা, ভবিষ্যদ্বাণী, ভক্তি-ধর্মপথের নির্দেশ ও দুঃখ-কষ্টে বল-ভরসা সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত পরিবেশনকারী এক প্রকার চরিত্র যাত্রায় প্রচলিত হয়। এই চরিত্রের গান 'বিবেকের গান' নামে খ্যাত হয়। জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম, দৈব, সুমতি প্রভৃতি বিবেকজাতীয় চরিত্র। অধর্ম, মোহ, কুমতি, কামনা, কাঞ্চনতৃষ্ণা প্রভৃতি রূপক চরিত্র বিবেকের বিপরীত। শুভ মানসিক প্রবণতা লইয়া বিবেক চরিত্রের সৃষ্টি। ইহাকে মানস বৃত্তির রূপক বলা যাইতে পারে। বিবেক যেমন সমাজনৈতিকতার পরিচায়ক 'নিয়তি' তেমনি দৈববিধানের পরিচায়ক। বিবেকের মত নিয়তিও রূপক চরিত্র। মানুষ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সামাজিক রীতি-নীতি ও দৈববিধানের বিরোধিতা করিলে পরিণামে তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়। মানুষের কামনা-বাসনা, সামাজিক নীতিবোধ এবং দৈববিধানের অধীনতা লইয়া লোকনাট্যে জীবনের ত্রৈমাণিক সত্তার পরিচয় দেওয়া হয়। বিবেক ও নিয়তি চরিত্র প্রবৃত্তির বশে মানুষের সমাজনৈতিক বিধি বা দৈববিধান লংঘন-প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ ফলাফলের ইংগিত দেয়। যাত্রায় কুমতি ইত্যাদি থাকিলে সুমতি প্রভৃতিও উপস্থাপিত হয়। অনেক সময় এই দুই বিপরীত বৃত্তির সমাবেশে নাটকের চরিত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হয়। আবার অনেক সময় বিপরীত মুখী দ্বিবিধ বৃত্তির পরিবর্তে কেবল সু-বৃত্তি অবলম্বনে বিবেক চরিত্র সৃষ্টি করা হয়।

ট্র্যাজেডির রস-নিষ্পত্তিতে গভীর শোচনীয় পরিণাম অপরিহার্য। কিন্তু পৌরাণিক পালায় মঙ্গলকর দৈবশক্তিতে বিশ্বাস ও গভীর শোচনার অভাব দেখা যায়। আবার পৌরাণিক পালার নায়ক অনেক সময় মৃত্যুর মধ্যদিয়া অভিশাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যায় অথবা একেবারেই মুক্তিলাভ করিয়া চির শান্তির কোলে আশ্রয় পায়। ইহার ফলে পৌরাণিক পালায় ট্র্যাজিক রস-সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া উঠে। পৌরাণিক পালায় নায়কের শোচনীয় পরিণাম যদি মঙ্গলবোধ ও দৈববিশ্বাস অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠে তবেই ট্র্যাজেডির সংবিদ বজায় থাকিতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক যাত্রাপালায় ইহার একান্ত অভাব। তাই পৌরাণিক লোকনাট্যে ট্র্যাজিক্‌রস সৃষ্ট হওয়া সম্ভব নহে।

এখন লোকনাট্যের প্রয়োগ পদ্ধতির আলোচনা করা যাইতেছে। (১) আসর-বৈশিষ্ট্য, (২) আলোক-বৈশিষ্ট্য, (৩) বেশবিন্যাস-বৈশিষ্ট্য, (৪) সংগীত বৈশিষ্ট্য ও (৫) অভিনয়-বৈশিষ্ট্য লইয়া লোকনাট্যের প্রয়োগ-পদ্ধতির পাঁচটি দিক রহিয়াছে।

আসর :—চতুষ্কোণাকৃতি উন্মুক্ত রঙ্গস্থলের চারদিকেই দর্শকদের বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার একদিকে থাকে দুইখানি চেয়ার। রাজসিংহাসন হইতে সুরু করিয়া সকল প্রকার আসনরূপেই এই চেয়ার দুইখানি ব্যবহৃত হয়। চেয়ারের পাশ দিয়া থাকে প্রবেশ ও প্রস্থানের একটি মাত্র নির্দিষ্ট পথ। এই পথ দিয়াই সাজঘর হইতে শিল্পীরা মুক্ত রঙ্গস্থলে আসা যাওয়া করেন। অনেক সময় দর্শকদের দেখিবার সুবিধার জন্য তক্তার সাহায্যে অভিনয়-স্থল একটু উঁচু করা হয়। এই রকম স্থলে যন্ত্রী ও স্মারকের জন্য আবার ঠিক রঙ্গস্থলের গা-ঘেঁষিয়া একটু নীচুতে বসিবার ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে তাহারা দর্শকের দৃষ্টি-পথে কোন প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করিতে না পারেন। রঙ্গস্থল ও বসিবার জায়গা সামিয়ানা দিয়া আচ্ছাদিত করা হয়। ইহার ফলে অভিনেতা ও গায়কের কণ্ঠস্বর হাওয়ার উপরে ভাসিয়া না গিয়া সামিয়ানায় বাধা পাইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। দর্শক বেষ্টিত রঙ্গস্থলকে আসর বলা হয়। থিয়েটারী অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার কিঞ্চিৎ বাস্তব সান্নিধ্য স্থাপিত হয় বটে ; কিন্তু লোকনাট্যের আসরে দর্শক-অভিনেতা-সন্নিধি সৃষ্ট হয় সর্বাপেক্ষা অধিক। এই সান্নিধ্যের ফলে অভিনয়ের দিক হইতে [১]"পরস্পরের

১। রঙ্গমঞ্চ—বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১৩০৯—রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।" লোকনাট্যের আসরে কিছু রাখা-ঢাকা নাই; চরিত্রগুলি যেন দর্শকদের মধ্য হইতেই রঙ্গস্থলে উঠিয়া অভিনয় করিতে থাকে। থিয়েটারী অভিনয়ে নাটককে মনোগ্রাহী করিবার জন্য নানা প্রকার যান্ত্রিকতার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। আসর-অভিনয়ের সঙ্গে যান্ত্রিকতার সম্পর্ক নাই। পাশ্চাত্ত্যে অভিনয়ে মঞ্চের প্রাধান্য থাকিলেও আসর-অভিনয় যে একেবারে ছিল না তাহা নহে। [1]ষোড়শ শতকে ইংলণ্ডের Interlude Play-তে আসর-অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়; এই অভিনয়ে রঙ্গস্থল ও দর্শকদের বসিবার স্থান বড় বড় হলের একই সমতলে নির্দিষ্ট থাকিত। এলিজাবেথান্ যুগের মঞ্চাভিনয় আসর-অভিনয়ের উন্নত সংস্করণ। ঐ যুগের মঞ্চাভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া নাট্যোপস্থাপনা করা হইত বলিয়া দৃশ্যপটাদির বাধামুক্ত ও দর্শক বেষ্টিত অভিনেতা সহজেই দর্শকমনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেন। এই প্রসঙ্গে J. B. Priestley র একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে,— [2]"The actor surrounded by his audience on a stage where he is not dwarfed and dimmed by the scene painter···can reach far more imaginative and intimate relationship with the audience."

সংস্কৃত নাট্যাভিনয় প্রথমে প্রেক্ষাগৃহ-বিবর্জিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রে [3]ইন্দ্রোৎসব উপলক্ষে 'দেবাসুরদ্বন্দ্ব' এবং পরে [4]শিবোৎসবে যে হিমালয়ের পাদদেশে 'ত্রিপুরদাহ' নাট্যাভিনয় উদ্‌যাপিত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে সে অভিনয় দুইটি প্রেক্ষাগৃহ-বিবর্জিত ছিল। বস্তুত সংস্কৃত নাট্যাভিনয় [5]প্রেক্ষাগৃহ-বিবর্জিত

1. Fortunate indeed were the Elizabethan actors in inheriting and in having the opportunity of improving upon the histrionic methods which had developed in the playing of sixteenth century interludes, when actors and audience occupied the same level floor of some great hall..." p. 28, The Theatre and Dramatic Theory—A. Nicoll (Lond. 1965)

২. Literature and westernman—p. 32-J. B. Priestley (1960)

৩. তত্তস্মিন্ ধ্বজোমহে নিহতাসুরদানবে। প্রহৃষ্টামর সংকীর্ণে মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে॥ ৫৫ শ্লোক হইতে ১ম অধ্যায় নাট্যশাস্ত্র (বরোদা)

৪। তথাত্রিপুরদাহশ্চ ডিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিতঃ। ৪র্থ অধ্যায়—ঐ

৫। অথবাহপ্রয়োগেতু প্রেক্ষাগৃহ-বিবর্জিত। বিদিক্ষপি ভবেদ্রঙ্গং কদাচিত্তু রাজ্ঞয়া॥ ৬৫ শ্লোক—১৩শ অধ্যায়—ঐ

রূপে অভিনীত হইত। কিন্তু ইহাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় দেখিয়া প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সমগ্র রঙ্গালয়টি চার ভাগে বিভক্ত হইত। পশ্চাদভাগে পর্দার অন্তরালে নেপথ্য, তাহার সম্মুখে রঙ্গশীর্ষ, ইহার অগ্রভাগে রঙ্গস্থল, বাকি অংশ প্রেক্ষাগৃহ নামে অভিহিত হইত। রঙ্গশীর্ষে কুতপবিন্যাস-এর অর্থাৎ যন্ত্রাদি রাখা ও যন্ত্রীদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইত। যাত্রা প্রেক্ষাগৃহ-বিবর্জিত অভিনয় এবং যাত্রার আসরে রঙ্গস্থলের দুইপার্শ্বে বিপরীত মুখীভাবে কুতপবিন্যাস করা হয়। ইহা যাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য। মন্দির হইতে উদ্ভূত ও চতুর্দশ শতকে বিশেষভাবে বর্ধিত জাপানের নো-নাটকের (Noh) মঞ্চব্যবস্থার সঙ্গে যাত্রার রঙ্গস্থলের কিছু সাদৃশ্য আছে। নো-নাট্যাভিনয়ে ১৮ বর্গফুট মঞ্চ ব্যবহার করা হয়। ইহার প্রায় চারদিকই দর্শকবেষ্টিত থাকে। পেশাদার অভিনয়ে যাত্রার রঙ্গস্থল সাধারণত দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট এবং প্রস্থে ১৫ ফুট; ইহারও প্রায় চারদিকই দর্শক পরিবেষ্টিত হয়। নো-নাটকের মঞ্চের মত যাত্রার রঙ্গস্থলেও প্রবেশ-প্রস্থানে একই মাত্র পথ ব্যবহৃত হয়। যাত্রার পৃথক সাজঘর ও উচ্চ মুক্তমঞ্চযুক্ত রঙ্গস্থলের মধ্যে একটি পুলদ্বারা সংযোগ রক্ষিত হয়। এই পুলটি প্রবেশ প্রস্থানের পথ। নো-নাট্যাভিনয়ের সাজঘর পৃথক। এই পৃথক সাজঘরকে একটি পুলের সাহায্যে মঞ্চের সংগে সংযুক্ত করা হয়। নো-নাটকের অর্কেষ্ট্রা ও কোরাসের জন্য মূল মঞ্চের সঙ্গে দুইটি সরু মঞ্চ যুক্ত করা হয়। যাত্রার অর্কেষ্ট্রার যন্ত্রিদলের জন্যও মূল রঙ্গস্থলের (মুক্ত মঞ্চ) সঙ্গে বিপরীতমুখী দুইটি সরু মঞ্চ সংযুক্ত থাকে। World Drama গ্রন্থে নো-মঞ্চ সম্পর্কে বলা হইয়াছে,— [1]"The stage used for these Nō productions is of the simplest. About eighteen feet square, it is almost surrounded by the audience; on the right a narrow platform is designed for a singing chorus, at the rear is another platform for an orchestra. The dressing-room is a separate structure on the left, connected with the main stage by a passage, called the hashigakari, or bridge, along which the players make their appearances."

আলোক :—পল্লী অঞ্চলে আলোর অসুবিধার জন্য পূর্বে দিবাভাগেই

---

1. World Drama—p. 650, A. Nicoll (London, 1964)

সাধারণত লোকনাট্যের আসর বসিত। কোন কোন পল্লীগ্রামে বা সহরাঞ্চলে আলোর অপেক্ষাকৃত সুব্যবস্থার জন্য রাত্রিকালে যাত্রাগান হইত। কেরোসিন তেলের প্রচলনের পরে আসরে বড় কেরোসিনের বাতি পরে সম্ভবস্থলে গ্যাস-বাতির ব্যবহার করা হইত। ক্রমে গ্যাসের পরিবর্তে আসিল পঞ্চ-লাইট ও ডে-লাইট; ইহার পর হইতে পল্লীর আসরেও এইসব আলোর ব্যবহার সুরু হইয়া যায়। বর্তমানেও গ্রামাঞ্চলে ডে-লাইটের ব্যবহার প্রচলিত। রঙ্গস্থলের চারকোনায় চারটি ডে-লাইট ঝুলানো হয়। ইহাতে আসরের কোন দিক হইতেই পাত্র-পাত্রীর উপরে ছায়া পড়িতে পারে না। ডে-লাইট খুব শক্তিশালী। কাজেই এই আলোর ব্যবহারে অভিনেতার ভাবভঙ্গি দেখিবার দিক হইতে দর্শকদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। লোকনাট্য উজ্জ্বল আলোতেই অভিনীত হয়। বর্তমানে স্থান বিশেষে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার সম্ভব হইতেছে। সে রকম স্থলেও যাত্রার আসরে high light acting-ই প্রচলিত। বর্তমানে কোন কোন দলে পালার দৃশ্য বিশেষে রঙিন বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার দেখা যাইতেছে। তথাপি আলোক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিবেশ, কালও ভাব (atmosphere, time and mood) নির্দেশের রীতি লোকনাট্যে অপ্রচলিত। ইহাতে পাত্র পাত্রীর সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশ, কাল এবং ভাব সমস্তই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয়। যাত্রার আসরে শ্রোতাকে নানাবিষয়ে অনুমান কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। থিয়েটারের মত পদে পদে মঞ্চমায়া সৃষ্টির ব্যবস্থা ইহাতে নাই। ইহা লোকনাট্যের একটি বৈশিষ্ট্য। সেই জন্যই বিশেষ একটি মন লইয়া শ্রোতাকে যাত্রাপালা শুনিতে যাইতে হয়। অভিনয় ছাড়া ইহাতে দর্শনীয় একমাত্র যুদ্ধ। থিয়েটারের যুদ্ধ নেপথ্যেও সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু আসর-অভিনয়ে ইহাকে রঙ্গস্থলেই উপস্থাপিত করা হয়। থিয়েটারী অভিনয় শ্রবণের সঙ্গে অনেক কিছু দর্শনীয় থাকে, কিন্তু যাত্রায় ও জাতীয় দর্শনীয় কিছু নাই। তাই লোকে বলে—'যাত্রা শুনতে যাই', 'থিয়েটার দেখতে যাই।'

বেশবিন্যাস:— [১]"বিংশ শতকের প্রথমে ত্রৈলোক্যতারিণী, ভবতারিণী ও কাঁগোলাগীর দলে স্ত্রী-ভূমিকায় নারী আসরে অবতীর্ণ হত।" তথাপি লোকনাট্যে নারী চরিত্রে রূপানুরূপা ভূমিকা গ্রহণের রীতিই প্রচলিত ছিল।

১। নারায়ণচন্দ্র দত্ত—পরিশিষ্ট—বাঁশি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত অভিনয়ে তিন প্রকার ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,— [১]অনুরূপ, বিরূপ ও রূপানুরূপ। চরিত্রের বয়সও দৈহিক গঠন অনুযায়ী স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় যথাক্রমে নারী ও নরের স্বাভাবিক রূপসজ্জা গ্রহণকে অনুরূপ, এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা না করিয়া ভূমিকা গ্রহণ করাকে বিরূপ এবং বয়স ও চেহারা অনুযায়ী নারীকে নর ও নরকে নারী সাজানোর রীতিকে রূপানুরূপ বলা হয়। প্রাচীনকালে সকল দেশেই পুরুষ কর্তৃক রূপানুরূপ ভূমিকা গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। যাত্রায়ও প্রাচীনকাল হইতেই এই রীতি প্রচলিত। চৈতন্যদেবও নারী চরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন।

পুরুষকে নারী সাজিতে হইলে দাড়ির কালো দাগ ঢাকিয়া দিবার জন্য স্বভাবতই মুখে চড়া রং মাখানো প্রয়োজন। পুরুষ চরিত্রে স্বাভাবিক মেক্-আপ থাকিলেও নারী ভূমিকাভিনেতা পুরুষের জন্য যাত্রায় high make-up ব্যবহৃত হয়। নারী-চরিত্রাভিনেতা নির্বাচনে অধিকারীরা অবশ্যই কণ্ঠ ও দৈহিক গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। অনেক সময় লোকনাট্যের আসরে এমনো দেখা যায় যে চেহারা, কণ্ঠ ও অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য স্ত্রী-চরিত্রাভিনেতা পুরুষ কি নারী তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। [২]"উনিশ শতকের যাত্রায় নারী-চরিত্রাভিনেতা পুরুষ অনেক সময় বেশবিন্যাসের জন্য নাক-কান ছেঁদা করত আর মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখত। বিশ শতকে এ রীতি বন্ধ হয়ে যায়। এতে এদের মেক্-আপের স্বাভাবিকতা অনেকটা বেড়ে যেত।" যাত্রার অভিনেতাদের অঙ্গ-রচনার (make-up) জন্য পৃথক make-up man-এর প্রয়োজন হয় না। ছোট ছেলে হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবীণ অভিনেতা পর্যন্ত সকলেই অঙ্গ-রচনার কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করেন। সাজঘরে প্রত্যেকের জন্য এক একটি make-up box সাজানো থাকে। সময় মত যে যাহার অঙ্গরচনা সমাপ্ত করিয়া অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই রীতি প্রচলনের ফলে অভিনেতাদের অঙ্গরচনা কর্ম অভিনয় সুরু হইবার আধ ঘণ্টা পূর্বে আরম্ভ করিলেও কোন অসুবিধা হয় না। নাট্যপ্রয়োগের দিক হইতে

১। অনুরূপা বিরূপা চ তথা রূপানুরূপিণী।
ত্রিপ্রকারেহপাত্রাণাং প্রকৃতিশ্চ বিভাবিতা॥ ১ শ্লোক-২৬ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র (বরোদা)
পুরুষ- স্ত্রীকৃতং ভাবং রূপাৎপ্রকুরুতেতুষঃ॥ ১৪ শ্লোক—ঐ।
রূপানুরূপা সাজ্ঞেয়া প্রয়োগে প্রকৃতির্বুধৈঃ। ১৫ শ্লোক—ঐ

২। সূর্যকুমার দত্ত—পরিশিষ্ট, নট্ট কোম্পানীও হাস্যরসাভিনয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

অলংকরণে (costume) [১]চরিত্রের বিভিন্ন ভাবরসের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে যুগবৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিকতা বজায় রাখা সম্পর্কে যে কোন প্রকার অবহেলা অনুচিত। কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদের দিক হইতে যাত্রায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালায় সাধারণত স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয় না। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত পালায় ও চুমকি লাগানো ঝকঝকে জামা, ব্লাউজ, নাগরা, ম্যাণ্টেল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। হিন্দু রাজাদের জামা ও মুসলমান সম্রাটের জামায় কোন পার্থক্য থাকে না। অশোক, বিক্রমাদিত্য, মহীপাল, শশাঙ্ক, পৃথ্বীরাজ, ও শিবাজীর পোষাক একই রকম। যাত্রার অধিকারীদের সকলে এ বিষয়ে এখনো সচেতনতা লাভ করেন নাই।

ফলিত সঙ্গীত :—গীত ও নৃত্য থিয়েটারী নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ নহে। গীতিনাট্য ও অপেরাকে বাদ দিলে একথা বলা যায় যে থিয়েটারী নাটক অভিনয় প্রধান। অভিনয়কে অধিকতর মনোগ্রাহী করিবার জন্য ইহাতে মঞ্চ পরিকল্পনা ও প্রয়োগ পদ্ধতির বহুবিধ আঙ্গিকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গীত-নৃত্য আসর-অভিনীত যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যাত্রায় আবার পূর্বরঙ্গ বিধানের রীতি প্রচলিত। ইহার সঙ্গেও সংগীতের বিশেষ সম্পর্কে রহিয়াছে। সংস্কৃত অভিনয়ে নাট্যারম্ভের পূর্বে [২]পূর্বরঙ্গ-বিধানের রীতি ছিল। প্রত্যাহার (কুতপ বিন্যাস), অবতরণ (গায়ক সন্নিবেশ), আরম্ভ, আশ্রাবণা (তত, শুষির, আনদ্ধ, ঘন যন্ত্রাদির স্বর মিলানো), দানবতোষক বক্তৃপাণি, রাক্ষসতোষক পরিবন্দনা, গুহ্যকতোষক সংখোদনা, যক্ষতোষক মার্গসারিত, কালজ্ঞাপক আসারিত, দেবতোষক গীতবিধি, রুদ্রতোষক বর্ধমান, তাণ্ডব, ব্রহ্মতোষক উত্থাপন, লোকপালতোষক পরিবর্তন বন্দনা, আশীর্বচনযুক্ত চন্দ্রমাতোষক নান্দী, নাগপিতৃগণের জন্য শুষ্কাবকৃষ্টা, বিষ্ণুতোষক রঙ্গদ্বার, শৃঙ্গাররসযুক্ত চারীপাঠ, রৌদ্ররসযুক্ত মহাচারীপাঠ, বিদূষক-সূত্রধার পারিপার্শ্বিকযুক্ত ত্রিগত উপস্থাপনা ও নাট্যহেতুযুক্ত প্ররোচনা এই একুশ প্রকার পূর্বরঙ্গের কথা নাট্য শাস্ত্রে (৫ম অধ্যায়) উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বরঙ্গের শেষে [৩]সূত্রধার প্রস্থান করিলে সূত্রধারগুণাকৃতি

১। অলংকারাস্তু ভাবরসাশ্রয়াঃ—৪ শ্লোক, ২২ অধ্যায় নাট্যশাস্ত্র (বরোদা)

২। যস্মাত্রঙ্গ প্রয়োগোঽয়ং পূর্বমেব প্রযুজ্যতে। তস্মাদয়ং পূর্বরঙ্গো বিজ্ঞেয়ো দ্বিজসত্তমা॥ ৫ম অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র (বরোদা)

৩। চতুরাতোদ্যনিষ্ণাতোঽনেক ভূষা সমাবৃতঃ। নানা ভাষণ তত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ॥ বেশ্যোপচার চতুরঃ পৌরুষের বিচক্ষণঃ। তত্তদ্গীতানুগানেক কলাতালাবধারণঃ॥ অবধার্য প্রয়োক্তা চ যোক্তৃণামুপদেশকঃ। এবং গুণগণোপেতঃ সূত্রধারঃ স উচ্যতে॥ আচার্য মাতৃগুপ্ত

[১]স্থাপক আসিয়া প্রস্তবনা সমাপ্ত করিলে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইবার কথা। কিন্তু বিস্তারিতভাবে পূর্বরঙ্গ প্রয়োগ করিলে বিরক্তিকর [২]ব্যাপারে পরিণত হইতে পারে বলিয়া তৎকালেও সংক্ষেপে পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠিত হইত। তাই সংস্কৃত নাটকে দেখা যায়—'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ'। [৩]বিঘ্ননাশের জন্য দেবদ্বিজ-নৃপদের স্তুতি এবং আশীর্বচন যুক্তনান্দী অনুষ্ঠিত হইবার সঙ্গেই সূত্রধার অভিনয় উপলক্ষ ও নাট্যকারের পরিচয় দিয়া অভিনয় আরম্ভ করাইয়া দেন। প্রত্যাহার, আশ্রাবণা, অবতরণ, নান্দী, দেবতোষক গীতবিধি পূর্বরঙ্গের এই পাঁচটি রীতি এবং প্রস্তাবনা যাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমে রঙ্গস্থলে যন্ত্রাদির বিন্যাস (প্রত্যাহার), ইহাদের সুর মিলানো (আশ্রাবণা), জুড়ির গান প্রচলিত থাকাকালীন জুড়িগায়ক ও বালক গায়কদের সন্নিবেশ (অবতরণ), এবং আখড়াইবন্দী গানের (নান্দী ও দেবতোষক গীতবিধি) ব্যবস্থা করা হইত। নাটকের মূল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবনা গীতি অথবা সংলাপময় প্রস্তাবনাংশে অবতারণা করিবার পরিচয়ও যাত্রাপালায় রহিয়াছে। বর্তমান-কালের যাত্রায় পূর্বরঙ্গের মধ্যে প্রত্যাহার ও আশ্রাবণা প্রচলিত আছে; ইহার পরেই ঐকতান বাদিত হয়। এই ঐকতানকেও পূর্বরঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

লোকনাট্যে সঙ্গীতের তিনটি অঙ্গেরই (নৃত্য, গীত, বাদ্য) বিশেষ বিশেষ ব্যবহার আছে। নৃত্য-শিল্প এক সময় ভারতে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রমাণ একদিকে নাট্যশাস্ত্র, অন্যদিকে অজন্তা, ইলোরার চিত্রাবলী এবং কণারক ও অন্যান্য স্থানের প্রসিদ্ধ মন্দির গাত্রে খোদিত সৌন্দর্যময় নৃত্যরত মূর্তি-সমূহ। কিন্তু মুসলমান রাজত্বে ইহার বিশেষ অবনতি ঘটে। ইংরেজ রাজত্বেও সুদীর্ঘ কাল সভ্য সমাজে নৃত্য তেমন সমাদৃত হয় নাই। সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত

১। ইত্থং রঙ্গং বিধায়াদৌ সূত্রধারে বিনির্গতে। তদ্বন্নটঃ প্রবিশ্যান্যঃ সূত্রধারগুণাকৃতিঃ॥ ভাবপ্রকাশ—শারদাতনয় (দ্বাদশশতক)

২। গীতবাদ্যেচনৃত্তেচ বিবুধেতি প্রসঙ্গতঃ। খেদোভবেৎ প্রযোক্তৃণাং প্রেক্ষকানাং তথৈবচ॥ ৫ম অধ্যায়—নাট্যশাস্ত্র।

৩। প্রত্যাহারাদিকান্যঙ্গান্যস্ত ভূয়াংসি যদ্যপি। তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যানান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে॥১০ আশীর্বচন সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে দেবদ্বিজনৃপাদিনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা॥ ১১।

৬ষ্ঠ অধ্যায়-সাহিত্য দর্পণ, বিশ্বনাথ।

তথানাট্য শাস্ত্রে—পূর্বংকৃতাময়ানান্দী আশীর্বচনসংযুতা।
অষ্টাঙ্গ পদসংযুক্তা প্রশস্তা বেদসম্মতা॥

নৃত্যের সঙ্গে সাধারাণের পরিচয় বন্ধ হইয়া যায় ; লোকনাট্যে ও নৃত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহার ব্যবহার থাকিল না। বিংশ শতকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে ও রঙ্গ মঞ্চের প্রভাবে লোকনাট্যে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য খুব প্রচলিত হয়। ইহার ফলে পূর্বপ্রচলিত 'যাত্রা-ডুয়েট-নৃত্যের' পাশে 'যাত্রা ব্যালে-নৃত্য' আসরে পরিবেশিত হইতে থাকে। নাট্য-স্বস্তির (dramatic relief) জন্য 'একক নৃত্য' ও যে কখনো কখনো যাত্রায় সংযোজিত না হইত তাহা নহে। বর্তমানে ডুয়েট নৃত্য ও নাট্য-স্বস্তিমূলক একক নৃত্য উঠিয়া গিয়াছে। ব্যালে নৃত্যের প্রচলন এখনও বজায় রহিয়াছে। তবে ইহার সংখ্যা কমিয়াছে। অনেক পালায় ইহা আবার থাকেও না। বর্তমান কালের আসরে নাট্যারম্ভের পূর্বে ছোট ছোট পৌরাণিক ঘটনামূলক এক প্রকার নৃত্য পরিবেশিত হয়। ইহা কথাকলি নৃত্যের অনুকরণ। লোকনাট্যে এই নৃত্য 'ড্রামা-ডান্স' (drama dance) নামে পরিচিত। কৃষ্ণ-কালিন্দী, যমুনাবিহার, মহিষাসুরবধ, শকুন্তলা-দুষ্মন্ত, মদনভস্ম, শুম্ভনিশুম্ভ বধ প্রভৃতি ড্রামা-ডান্স বর্তমানে আসরে উপস্থাপিত করা হয়। ইহাকেও পূর্বরঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

গানের দিক হইতে লোকনাট্যে আখড়াইবন্দী, প্রস্তাবনা-গীতি, গণের গান, একানে বালকের গান, যাত্রা ডুয়েট গান, যাত্রা ব্যাঙ্গে গান, জুড়ির গান উক্তি-গীতি, ও বিবেকাদির গীতি প্রচলন সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে জুড়ি ও সুর প্রয়োগের দিক হইতে অবশিষ্ট প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

রঙ্গস্থলের চারকোনায় চারজন জুড়ি বসিতেন ; তাহাদের কাছাকাছি হাফ-জুড়ি ও বালকগণ বসিত। গানের সময় সকলেই দাঁড়াইয়া গান ধরিতেন। কেবলমাত্র দোহারগণ বসিয়া গান করিতেন। যাত্রা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরিবেশিত হয় বলিয়া সুরের রেশ বজায় রাখিবার জন্য দোহারের প্রয়োজন হয়। দোহারের সাহায্যে সুরের জমাটিভাব রক্ষিত হয় বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই আসরনাট্যে দোহারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। দ্বাদশশতকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পরিবেশনেও দোহারের সাহায্য লওয়া হইত। জুড়িগণ উকিলের মত পোষাক পরিতেন। জুড়িগায়করা সকলেই ওস্তাদগায়ক হইতেন। প্রৌঢ় জুড়িয়া পুরুষ চরিত্রের উক্তি-গীতি গাহিতেন। কখনো তাহারা সমবেত ভাবে গান করিতেন, কখনো বা এক এক জন জুড়ি গানের এক একটি অংশ গাহিতেন। কীর্তনাঙ্গ জুড়ির গানে দোহারের ব্যবস্থা থাকিত। জুড়ির গানের

সময় মাঝে মাঝে কণ্ঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত ; এই সময় বেহালা-বাদক বেহালায় সুর ধরিতেন। বেহলার সঙ্গে পাখোয়াজ বা তবলায় নানা প্রকার ছন্দোময় বাদন-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইত। ইহার ফলে এক একটি জুড়ির গানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত। ইহাতে নাটকের গতিরুদ্ধ হইয়া যাইত। এই শতকের প্রথম হইতে দর্শকদের নাট্যবোধ জাগ্রত হইতে আরম্ভ করায় জুড়ির গানের প্রতি ক্রমশঃ আকর্ষণ কমিতে থাকে। অনেক সময় দর্শকরা এই শ্রেণীর গানে বিরক্ত হইতেন। এই সম্পর্কে যাত্রা জগতে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ভূকৈলাসের রাজ-এষ্টেটে সাবিত্রী-সত্যবান পালায় জুড়ির গানে অতিষ্ঠ হইয়া জনৈক মোক্তার-শ্রোতা সদ্য বিবাহিত সত্যবানকে ছাড়িয়া দিয়া জুড়িদের লইয়া যাইবার জন্য আসরে দাঁড়াইয়া যমরাজের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। দর্শক রুচির জন্য এই শতকের প্রথম দশক হইতেই লোকনাট্যের সঙ্গীতে নূতনত্ব দেখা দিল—জুড়ির গানের পাশে বিবেকের গানের সূচনা হইল।

জুড়িদের উক্তি-গীতি ছাড়া মাঝে মাঝে অন্যান্য গান কয়েকজন শিল্পী পরিবেশন করিতেন। এই গায়কগণ হাফ্-জুড়ি নামে খ্যাত। কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিলে হাফ-জুড়িগায়ক জুড়িগায়কের পদে উন্নীত হইতে পারিতেন ; হাফ জুড়িরা প্রয়োজন স্থলে গানে দোহারকি করিতেন। নারী চরিত্রের উক্তি-গীতি গাহিত বালকগণ। তাহারা কখনো সমবেতভাবে গান করিত ; কখনো বা একজন গাহিত অন্যরা দোহারকি করিত। এই সকল বালক সাঁচ্চার জোড়া ও জরির টুপি পরিধান করিত ; বালকগণ করুণ রসাশ্রিত পুরুষের উক্তি-গীতিও অনেক সময় পরিবেশন করিত।

লোকনাট্যে জুড়ির গানে রাগরাগিনীর উপর ভিত্তি করিয়া সুর আরোপিত হইত। এই বিষয়ে কীর্তনাঙ্গ ও মনোহরশাহী ঢঙের সুর এক সময় জনপ্রিয় ছিল। যাত্রা গানে অনেক সময় টপ্পা-ভাঙ্গা তান মিশ্রিত হইত। এই শেষোক্ত রীতি যাত্রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে যাত্রা গানের সুরারোপ সম্পর্কে অশীতিপর বৃদ্ধ একজন প্রবীণ যাত্রা শিল্পীর উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে,— [১]"জুড়ি ও বালকদের গানে কীর্তনাঙ্গ সুর, মনোহরশাহী ঢঙের সুর ও রাগরাগিনীর সঙ্গে টপ্পা-ভাঙ্গাতান মিলিয়ে সুর প্রয়োগ করা হত। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই এ রীতি চলে আসছে।" গিরিশ

---

১ সুধকুমার দত্ত—পরিশিষ্ট, নট কোম্পানী ও হাওড়াসাভিনয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

যুগে মঞ্চে প্রচলিত থিয়েটারী গানের সুর যাত্রায় প্রবর্তিত হয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' নাটক হইতে। মঞ্চের সুর শিল্পী ভূতনাথ দাস প্রথম ঐ পালায় ইহার প্রবর্তন করেন। মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রায় রাগ সংগীতের কাঠামো বজায় রাখিয়া যেমন সুর করা হইত তেমনি আবার ইহার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাউলের সুরের ঢঙ্ মিশাইয়া নূতনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হইত। এই সব গান সাধারণত দ্রুত লয়ে গীত হইত। মুকুন্দদাসের গান খুব উদ্দীপনা পূর্ণ ছিল। এই গানে আবেগ ও দ্রুততার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হইত। কারণ যে গানে যথেষ্ট আবেগ ও দ্রুততা নাই জনজাগৃতির ক্ষেত্রে সে গান তেমন ফল-প্রসূ হয় না। স্বদেশী যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জন-জাগরণ। মুকুন্দদাসের যাত্রায় কথনো কথনো কৃষ্ণ যাত্রার প্রসিদ্ধ অধিকারী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও অগ্নিবীণার কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান গীত হইত।

লোকনাট্যে বিবেকের গানে রাগরাগিনীর ভিত্তিতে সুর সংযোজিত হইত। ইহার সঙ্গে টপ্পা-ভাঙ্গা ছোট ছোট তানের টুকরা মিশাইয়া দেওয়া হইত। বর্তমানে যাত্রার সুরারোপ পদ্ধতি অনেকটা হাল্কা হইয়াছে। দর্শকদের শুনিবার ও বুঝিবার সুবিধার জন্য উচ্চারণ স্পষ্টতা ও ভাবাবেগের সঙ্গে অভিনয়ের ভঙ্গিতে উচ্চ সুরে বিবেকের গান পরিবেশিত হয়। এই চড়া সুরের উদ্বেল গীত-তরঙ্গাঘাতে পালার বিশেষ বিশেষ ভাব বহু দূর বিস্তৃত সহস্র সহস্র শ্রোতার মনে রসোন্মাদনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। চড়া সুরের জন্য যাত্রা গানে সাধারণত উত্তরাঙ্গ রাগ অধিক ব্যবহৃত হয়। বিবেক-জাতীয় চরিত্রের গানে এখনও এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য গানে পূর্ব্বের মত সুরের বিশুদ্ধতা ও তান-বৈশিষ্ট্য বর্তমানের যাত্রায় বজায় রাখা হইতেছে না। রেকর্ড-রেডিও-সিনেমার আধুনিক গানের প্রভাবে নানা ঢঙের সুর-মিশ্রণে এক প্রকার পাঁচমিশালী সুর-প্রয়োগরীতি এখন যাত্রায়প্রচলিত হইয়াছে। লোকনাট্যে নৃত্য-গীতের সঙ্গে যেমন যন্ত্রাদি বাদিত হয় তেমনি স্বতন্ত্রভাবে ঐকতান (concert), ভাবাত্মক সংগীত (mood music), শাব্দিক ফলশ্রুতি (sound effect) এবং আবহ সংগীতের (atmosphere music) জন্য ও ইহাদের ব্যবহার করা হয়। লোকনাট্যের আসরে প্রথমেই ঐকতান বাদিত হয়। ঐকতানের মধ্য দিয়া শ্রোতাদের পালারম্ভের জানান দেওয়া হয় বলিয়া অনেক সময় একাধিকবার ঐকতান প্রয়োগের পরে গান সুরু হয়। প্রাকৃত ও সংস্কৃত অভিনয়ে এক সময় ধ্রুবাগীতির প্রচলন ছিল। নাট্যশাস্ত্রে ভাব অনুযায়ী নাটকে পাঁচ প্রকার

[১]ধ্রুবাগীতি ব্যবহারের উল্লেখ রহিয়াছে। [২]নাট্যারম্ভের পূর্বেও এই ধ্রুবাগীতি সংযোজিত হইত। এই ধ্রুবাগীতি পরিবেশ সৃষ্টিরও সহায়ক ছিল। যাত্রার ঐকতান একদিকে যেমন শ্রোতাদের অভিনয় আরম্ভের জানান দেয় অন্য দিকে তেমনি আসরে অভিনয়ের একটি পরিবেশ রচনা করিয়া দেয়। যদিও ধ্রুবা যন্ত্র-সহযোগে গান তথাপি অভিনয়ের পূর্বে পরিবেশ রচনার দিক হইতে যাত্রার আসরে বাদিত ঐকতান ধ্রুবাগীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এক সময় লোকনাট্যে প্রত্যেক অংকের শেষে একটি করিয়া ঐকতান বাদিত হইত ; হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাটকে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এখন নাট্যারম্ভের পরে ঐকতান বাদন উঠিয়া গিয়াছে।

লোকনাট্যে বহু পূর্ব হইতেই ভাবাত্মক সংগীত ও শব্দক্ষেপণ বিধি বিশেষরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। [৩]"বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিখ্যাত বেহালা বাদক শশিভূষণ অধিকারীর দলে তৎকর্তৃক করুণ ইত্যাদি অভিনয়োচিত আনুসঙ্গিক সুর প্রয়োগের রীতি প্রচলিত হয়। পরবর্তী কালে বেহালার সঙ্গে বাঁশি মিলিয়ে অভিনয়ের সঙ্গে ঐ রকম সুর সংযোজনা করা সুরু হয়।" অভিনয়ের এই সুর-প্রয়োগই মুডমিউজিকের নিদর্শন। বর্তমানে যাত্রায় বেহালার বিশেষ প্রচলন নাই। ক্ল্যারিওনেট ও কর্নেট বাঁশি মুডমিউজিক সৃষ্টির প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক হইতে লোকনাট্যে কিছু কিছু শব্দক্ষেপণ রীতি প্রবর্তিত হয়। উপবনে পাখীর ডাক, পিস্তলের গুলি ছুঁড়িবার আওয়াজ, প্রান্তরে মিলাইয়া যাওয়া ডাকের প্রতিধ্বনি, মেঘ-বৃষ্টির ধ্বনি প্রভৃতিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকনাট্যে আবহসংগীত প্রয়োগের প্রতিও যে একেবারে লক্ষ্য নাই তাহা নহে। এই আবহ-সংগীত বিশেষ ভাবে পরিবেশিত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। কেটেল্ ড্রাম ও নানা প্রকারের বাঁশিতে এই সংগীত সংযোজিত হয়। সংগীত প্রয়োগের জন্য লোকনাট্যের আসরে নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। উনিশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত

১। প্রাবেশিকী আক্ষেপিনী ক্রামিকী উত্থাপিনী প্রসাদিকী ইতি পঞ্চ ধ্রুবাঃ—৩১ অধ্যায়, ধ্রুবা প্রসঙ্গ, নাট্যশাস্ত্র (বরোদা)

২। এস বংসে ঠাবিদোঠ্ঠা গো। ইয়ং বীণা পডিসারী অদি। ইমে তিণ্ণি মিঅঙ্গা সজ্জী অত্থি এস কাংস তালণং পক্কালণুজ্জলাণাং হল্লাবোলা। এদং ধুআগীদমালবী অদি। কর্পূরমঞ্জরী—১ জবণিকান্তরম্—শ্রীরাজশেখর।

৩। নারায়ণ চন্দ্র দত্ত—বাঁশি প্রসঙ্গ (পরিশিষ্ট)

যাত্রায় তানপুরার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তানপুরার ব্যবহার প্রসঙ্গে মতিলাল রায়ের দল, অভয় দাসের দল, সাঁতরা কোম্পানী, ত্রৈলোক্য পাইনের দল, নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজ প্রভৃতি বিখ্যাত যাত্রা সম্প্রদায়ের নাম করা যাইতে পারে। এই শতকের প্রথম হইতেই দলে হারমোনিয়ম রাখা হইত। ইহার সাহায্যে যন্ত্রাদির সুর মিলানো হইত। গানের সময়ও ইহাতে কেবল স্থায়ী স্বরটি ধরিয়া রাখা হইত। গানের সঙ্গে বাজানো হইত তানপুরা ও বেহালা। তখন বেহালার খুব প্রাধান্য ছিল এবং প্রত্যেক দলেই একাধিক বেহালা বাজিত। তানপুরা উঠিয়া যাইবার পরে গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজনার প্রচলন হয়। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপৌত্র হরিমোহন রায়ের যাত্রা-দলে মাঝে মাঝে ক্ল্যারিওনেট বাজাইবার ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু মথুরানাথ সাহার দলে অভিনীত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভৃগুচরিত' পালা হইতে ১৩১০ সালে [১]বংশী বাদক নারায়ণ চন্দ্র দত্ত (নারায়ণ মাষ্টার) স্থায়ীভাবে যাত্রায় ক্ল্যারিওনেটের প্রচলন করেন। ইহার অল্প পরেই [২]ভূষণ দাসের দলে কালীচরণ মিত্র যাত্রায় স্থায়ীভাবে কর্নেটের প্রবর্তন করেন। এই শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে লোকনাট্যের আসরে বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট ও হারমোনিয়ম বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সঙ্গতের জন্য তবলা ও ঢোলকের খুব প্রচলন ছিল; কোন কোন পালায় পাখোয়াজও বাজান হইত। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের পর হইতে effect সৃষ্টির জন্য অধিকাংশ দলেই ঝাঁঝের প্রয়োগ প্রবর্তিত হয়। ঐকতান ও গানের সঙ্গে তাল দেওয়া লোক-নাট্যের সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্য। বহুপূর্ব হইতেই এই কাজে মন্দিরা ও করতালির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। আবহ সংগীতে ড্রাম-এর ব্যবহার যাত্রায় প্রচলিত। অনেক দলে এল্‌থন্‌ বাঁশি ও নাগারা বাদ্যযন্ত্র বাজান হইয়া থাকে।

অভিনয় :—লোকনাট্যের আসরে অভিনয়-প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রোতৃমণ্ডলীর রসানুভূতির সহায়ক রূপে ভাবদ্যোতক আলো, অন্যান্য প্রকার আলোর কৌশল ও দৃশ্য রচনাদির কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। [৩]"অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল।" ইহার মধ্য দিয়া আলো দৃশ্যাদির অভাব সহজেই পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব। লোকনাট্যের অভিনয়ে যে তুমস্ত

১। নারায়ণ মাষ্টার—পরিশিষ্ট, বাঁশি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

২। ভূষণদাসের দল—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৩। তপতী নাটকের ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৬

গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সঙ্গে শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতে থাকে ? "আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি।" অভিনয়ের যাদুস্পর্শে রসিকের মনোমঞ্চে ইহা আপনি স্পষ্ট হইয়া উঠে। স্থান-কাল-পরিবেশ সম্পর্কে এই সৃজনী শক্তির সহায়ক লোকনাট্যের বর্ণনাত্মক সংলাপ। পালার সংলাপ রচনায় এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লোকনাট্যকারগণ লক্ষ্য রাখেন। থিয়েটারী অভিনয়ের মত বিভিন্ন বস্ত্র সম্ভারের সাহায্য না লওয়া সত্ত্বেও সংগীত ও অভিনয় নিপুণতার মধ্য দিয়া লোকনাট্যের বিভিন্ন রস শ্রোতার চিত্তের উপর ঝরণা ধারার মত ছড়াইয়া পড়ে।

খোলা জায়গায় কয়েক সহস্র লোকের শ্রুতিরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অভিনয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয় বলিয়া আসরাভিনয়ে জোরালো কণ্ঠের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু শুধু কণ্ঠের দ্বারা অভিনয় কখনো সম্ভব নহে, এমন কি রেডিও প্লেতেও নহে। রেডিও শ্রোতার দৃষ্টি গোচর না হইলেও সংলাপ বলিবার সময় সেখানেও অভিনেতার নানাভঙ্গি আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। বস্তুত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মুখাবয়ব ভঙ্গি (posture, gesture, expression) ছাড়া অভিনয় সম্ভব নহে। কাজেই যাত্রাভিনয়ে কণ্ঠের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মুখাবয়ব ভঙ্গির সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজনীয়। উল্লিখিত ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর প্রয়োগে দূরবিস্তৃত দর্শকের কথা স্মরণ রাখিতে হয় বলিয়া লোকনাট্যের অভিনয় উচ্চ গ্রামে বাঁধা, রঙ চড়ানো। চিত্রে রঙ ফলাইবার জন্য যেমন নানা ধরণের তুলির প্রয়োজন অভিনয়ের বিভিন্ন ধারায়ও তেমনি বিচিত্র অভিনয়-তুলিকা ব্যবহৃত হয়। যান্ত্রিকতার সাহায্যে সমস্তটাই অনেক বড় করিয়া দেখানো হয় বলিয়া ছায়াচিত্রের অভিনয় ধারা অতি সূক্ষ্ম তুলির কাজ, যান্ত্রিক সহায়তাহীন থিয়েটারী অভিনয় ধারা সাধারণ সরু তুলির টান, এবং উন্মুক্ত বিস্তৃত আসরের অভিনয় ধারা মোটা তুলির পোঁছ। এই অভিনয় রীতিও দর্শক বহুলতার জন্য অনেক সময় যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় উদাত্ত স্বরে অভিনয়-ভাবাশ্রয়ী সঙ্গীতের উপস্থাপনা করা হয়। এই জন্য লোকনাট্যে অভিনয়ের রেশ ধরিয়া উক্তি-গীতির প্রচলন হইয়াছিল। আসরের প্রয়োজনে যাত্রার অভিনয়ে উচ্চতা, কান্নায় তীব্রতা, হাসিতে ধ্বনি-বাহুল্য, গানে উদাত্ত কণ্ঠ ও রস-সৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। লোকজীবনে সূক্ষ্মানুভূতি অপেক্ষা স্থূলত্বের প্রাধান্য

১ রঙ্গমঞ্চ—বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৯—রবীন্দ্রনাথ

বলিয়া লোকনাট্যের সঙ্গীত-অভিনয় রীতিতেও সূক্ষ্মত্বের অভাব। যাত্রার অভিনয় প্রয়োগের মূলে লোকরুচি ও শ্রোতার সংখ্যা দুই-ই ক্রিয়াশীল।

লোকনাট্যাভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণকারীর দৈহিক গঠনের সঙ্গে জোরালো ভারী কণ্ঠ ও উচ্চারণ স্পষ্টতার কদর আছে। কেবল এই সম্পদের অধিকারী হইয়াই অনেকে জনপ্রিয় অভিনেতারূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। কিন্তু এত সহজ উপায়ে অভিনয় কর্ম সম্পাদন সম্ভব নহে। ইহার জন্য বিভিন্ন দিক হইতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। অভিনয় অনুকরণাত্মক বলিয়া ইহা বাস্তবের হুবহু নকল নহে, বাস্তবের ভাবানুকরণ—art is idealizing imitation of nature (Croce)। এই ভাবানুকরণের জন্য বাস্তবের উপর রঙ ফলাইতে হয়। কিন্তু এমন ভাবে রঙের তুলি বুলাইতে হইবে যে দেখিয়া মনে হইবে—ইহা ঠিকঠিক বাস্তব নহে বটে, কিন্তু বাস্তবের সম্ভাব্য মাত্রাও ইহাতে লঙ্ঘিত হয় নাই ; ইহাতে যেন বাস্তবই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। অভিনয় ঠিক বাস্তব নহে, যেন বাস্তব (as if natural)। তাই অভিনয় আর 'হরবোলা' এক নহে। দর্শকদের বাস্তব-প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য অনেকে কণ্ঠস্বর ও অঙ্গাদিভঙ্গির উপস্থাপনায় বাস্তবতার সঙ্গে রঙ মিশাইতে গিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শিল্প সৃষ্টিতে সংযম আশ্রয়ের সৎসাহসের অভাব আছে বলিয়া এই শ্রেণীর অভিনেতারা প্রবল আঘাতের মধ্য দিয়া দর্শক-চিত্তে একটা তীব্র দোলা সৃষ্টি করিতে চাহেন, চরিত্র সৃষ্টি করিতে চাহেন না। অভিনয়-প্রয়োগে মাত্রাতিরিক্ত জবরদস্তি যেমন শিল্প-রীতি-বিরোধী তেমনি মাত্রাতিরিক্ত স্বাভাবিকতা অর্থাৎ হুবহু বাস্তবানুকরণও রস-সৃষ্টির পরিপন্থী। অভিনয় [১]"স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়।" এই ভিতরের দিকের লীলা দেখাইতে হইলে বিভিন্ন ধারার অভিনয়ে বিশেষ বিশেষ মাত্রাবোধের প্রয়োজন হয়। এই মাত্রাবোধ লইয়াই প্রকৃত অভিনেতা চরিত্র চিত্রণ-কার্য (to interpret character) সম্পন্ন করেন। ইহার জন্য সংযমের সঙ্গে অভিনয়ের যথার্থ অনুশীলন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্যবসায়ী শিল্পীর (commercial artist) এই দিকে তেমন নজর থাকে না। বাস্তবের সস্তা নকল করিয়া

[১] অন্তর-বাহির—পথের সঞ্চয়, পৃঃ—৭৫, ১৩৬৩—রবীন্দ্রনাথ

সাধারণ দর্শককে ভুলাইবার চেষ্টা ও করতলধ্বনির প্রতিই তাহার প্রধান লক্ষ্য, চরিত্র চত্রিণ ও সত্যের প্রতি তাহার শিল্পদৃষ্টি আচ্ছন্ন। অভিনয়ে প্রকৃত গুণী শিল্পীর সঙ্গে ব্যবসায়ী শিল্পীর পার্থক্য রহিয়াছে। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে,—[১]"ব্যবসায়ী আর্টিষ্ট বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিষ্ট সত্যের সাক্ষী।" এই বাস্তবের আবেদন চোখে, কিন্তু সত্যের আবেদন অন্তরের গভীরে। লোকনাট্যের অভিনয়-প্রয়োগ-ব্যাপারে ব্যবসায়ী শিল্পীদের সংখ্যাধিক্য হইলেও আসরে মাঝে মাঝে গুণী শিল্পীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

লোকনাট্যের অভিনয় রীতিকে মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে :—(ক) বিশ্লেষণাত্মক অভিনয় (acting with character analysis (খ) চমকদার ও ভঙ্গিময় অভিনয় (acting with stunt and pose) (গ) আবেগাত্মক অভিনয় (emotional acting) (ঘ) অতিনাটকীয় অভিনয় (melodramatic acting) (ঙ) মিশ্ররীতির অভিনয় (mixed style of acting)। প্রথম রীতির অভিনয়ে সর্বপ্রকার জবরদস্তি পরিহার করিয়া সংযম, শিল্প-চেতনা ও মাত্রবোধের সাহায্যে চরিত্র-রূপায়ণের প্রচেষ্টা থাকে। ইহাতে প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য এবং চরিত্র-বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি ও কল্পনার পরিচয় থাকে। এই রীতির অভিনয় কঠিন সাধনা সাপেক্ষ। লোকনাট্যের আসরে যাহারা এই রীতির অভিনয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে শীর্ষ-শিল্পী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুরেশমাষ্টার), ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বড় ফণী) ও সুরেন মুখার্জি। দ্বিতীয় রীতির অভিনয়তেও চরিত্র সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে দর্শক মনে বিস্ময়াকর্ষণ সৃষ্টির জন্য ইহাতে বিশেষ ধরণের চমক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। অভ্যস্ত শিল্পী এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সব চমকও অঙ্গাদিবিন্যাস প্রয়োগ করেন যে দর্শক মন ইহাতে সহজেই আনন্দিত হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর অভিনয়ে চমক ও ভঙ্গি সংযোজনায় যাহাতে মুদ্রাদোষ দেখা না দেয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই জন্যই এই রীতির অভিনয়ে কৃতিত্বের প্রয়োজন। এই পদ্ধতির অভিনয়ে সর্বাধিক খ্যাতির স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণী)। শরৎ মুখার্জি ও

[১] অন্তর-বাহির—পথের সঞ্চয়, পৃঃ ৭৭—১৩৬৩, রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতরঞ্জন বসু এই রীতির অভিনয় করিতেন। তৃতীয় পর্যায়ের অভিনয়ে চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা কণ্ঠ ও আবেগজনকতার উপরে অধিক জোর দেওয়া হয়। আবেগময় গভীর কণ্ঠের উত্থান পতনের মধ্য দিয়া দর্শক মনে একপ্রকার দোলা সৃষ্টি করা এই পদ্ধতি প্রয়োগকারদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই অভিনয় রীতিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নীলমণি বিশ্বাস, চন্দ্রকান্ত দত্ত (চন্দ্রে দত্ত), উপেন পাণ্ডা, কালীকিংকর গুহ, চুনীলাল গোস্বামী ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য। চতুর্থ রীতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে—অতিরঞ্জিত স্থূল শারীরিক উপায় এবং কণ্ঠে অস্বাভাবিক স্বরও জোর আরোপের মধ্য দিয়া দর্শকদের ভাবোত্তেজনার আস্বাদন করাইবার প্রচেষ্টা। চরিত্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ও আন্তরপ্রকাশের প্রতি দৃষ্টি এই অভিনয় রীতিতে অনুপস্থিত। ইহাতে সম্ভাব্যতার মাত্রা বজায় থাকে না। এই রীতির অভিনয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক নিকলের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে,— [1]"...performance which reaches its effects almost always by crude and generally physical means, which never seeks to persuade an audience that the actors and actions are related to life outside the theatre's walls."

লোকনাট্যের আসরে এই অতি নাটকীয় অভিনয় পদ্ধতিই অধিকাংশ অভিনেতা অনুসরণ করিয়া থাকেন। পঞ্চম পদ্ধতির অনুসরণকারী অভিনেতারা কোন একটি বিশেষ রীতিকে প্রাধান্য না দিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রীতির মিশ্র-প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদের মোটের উপর লক্ষ্য চরিত্র চিত্রণ। এই পদ্ধতির অভিনেতাদের মধ্যে যথেষ্ট যশ অর্জন করেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরলাল গঙ্গোপাধ্যায় (টিম্বল), সতীশচন্দ্র বসু, রমেশ মুন্সী, অমূল্য গাঙ্গুলী ও উমানাথ ঘোষাল।

লোকনাট্যের আসরে অভিনয়ের আর একটি রীতি ছিল। ইহাকে বক্তৃতা মূলক অভিনয় রীতি বলা যাইতে পারে। চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা ইহাতে বক্তৃতার প্রাধান্য। অভিনেতা অভিনয় করিতে করিতে সুযোগ বুঝিয়া নানা বিষয়ে বক্তৃতার অবতারণা করেন। নাট্য বহির্ভূত এই বক্তৃতাই ইহার প্রধান আকর্ষণ। বিংশ শতকে এই পদ্ধতির প্রধান ধারক ছিলেন মতিলাল রায় ও মুকুন্দদাস।

অধিকাংশ লোকনাট্যাভিনেতার অভিনয়ে সাধারণ ভাবে সুরেলাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দোময় পৌরাণিক নাটকের আসরাভিনয়ে ইহার কতকটা

1, The Theatre and Dramatic Theory-p, 86- A.Nicoll (Lond, 1965)

উপযোগিতা থাকিতে পারে। কিন্তু অন্য শ্রেণীর গদ্য সংলাপ যুক্ত পালায় এই রীতি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতাদের মধ্যে কেহ কেহ সুরেলাভঙ্গি বর্জন করিতে চেষ্টা করিয়াও যশস্বী হইয়াছেন। সাধারণ অভিনেতারা ইহা বর্জন করেন না। ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও সামাজিক পালায় যেখানে ছন্দোময় সংলাপ অনুপস্থিত এবং আবৃত্তিমূলক রীতি (recital style) যেখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নহে সেখানেও অধিকাংশ শিল্পী অভিনয়ে দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরগুলির উচ্চারণে বাংলা-উচ্চারণ রীতি বহির্ভূত আবৃত্তি-ভঙ্গির ভগ্নাংশ স্বরূপ বিশেষ সুরের টান প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা যেন একটি প্রথার মত। সকলে না হইলেও অধিকাংশ অভিনেতাই এই প্রথার অনুবর্তী। যাত্রাভিনয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে টেম্পো তুলিবার জন্য গানের উপস্থাপনা। গায়ককে গানের সঙ্গে ভাবাভিনয় করিতে হয়। ইহার সঙ্গে নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রও ভাবাভিনয় করিয়া চলে। এই জাতীয় গান সংলাপের সঙ্গেই জুড়িয়া দেওয়া হয়। সংলাপদ্বারা গান কখনো কখনো খণ্ডিত ভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পরিবেশিত হয়। এই শ্রেণীর গান যাত্রায় action song নামে খ্যাত। এই গান আবেগের চূড়ান্ত অবস্থা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। এই গানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বেরও পরিচয় দেওয়া হয়। তখন গানের সঙ্গে অভিনেতাকে নির্বাক ভাবাভিনয় করিতে হয়। ইহার জন্য যাত্রাভিনেতার সুর সাধনা প্রয়োজন। সুর-জ্ঞান না থাকিলে গানের সঙ্গে সুষ্ঠু ভাবাভিনয় করা সম্ভব হয় না। যাত্রাভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্বের অভিনেতা যে স্কেলে সংলাপ ছাড়িবেন পরের অভিনেতাকে ঠিক সেই স্কেলে সংলাপ ধরিতে হইবে। ইহার জন্যও সুর-জ্ঞান আবশ্যক। তাই ভাল যাত্রাভিনেতার পক্ষে সুর সাধনা অপরিহার্য।

যাত্রার অভিনয় প্রসঙ্গে Blocking-এর কথা উঠিতে পারে। রঙ্গস্থলে অভিনেতাদের অবস্থান ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইবে চরিত্র সৃষ্টি এবং grouping ও composition-এর মধ্য দিয়া বিচিত্র চিত্র রচনার গুরুত্বদ্বারা। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে বিবেচনা না করিয়া নিজেকে প্রদর্শন করাইবার অভিপ্রায়ে খুশিমত রঙ্গস্থলে অবস্থান ও গতিবিধির ব্যবস্থা করেন। দলের নামী অভিনেতাদের অনেক সময় এ বিষয়ে সংযত রাখা খুবই শক্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক, যাত্রাপালায় কখনো কখনো সুষ্ঠু ব্লকিং-এর পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল নামী অভিনেতা থিয়েটার হইতে যাত্রায় আসিয়াছেন তাহারা এ বিষয়ে

অনেক সময় সচেতন হইতেন। প্রসঙ্গত সুরেশ মুখার্জি পরিচালিত 'কর্ণবধ' (উমানাথ ঘোষালের দল), ফণিভূষণ মুখার্জি পরিচালিত 'বাসুদেব' (ভাণ্ডারী অপেরা), সুরেন মুখার্জি পরিচালিত 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (নট্ট কোম্পানী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভূতি গাঙ্গুলী ও ফণিভূষণ মতিলাল পরিচালিত 'কৈকেয়ী' (গণেশ অপেরা) পালাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

লোকনাট্যের বিশেষ বিশেষ যুগ :—প্রাচীন কাল হইতে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালা এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে ঐতিহাসিক, সামাজিক, আরো পরবর্তী কালে কাল্পনিক ও অন্যান্য পালা আসরে প্রযোজিত হইতে থাকিলেও এ পর্যন্ত লোকনাট্যের তিনটি যুগের পরিচয় পাওয়া যায়,—(ক) পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের যুগ, (খ) ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক নাটকের যুগ (গ) সামাজিক ও বিপ্লব-বিদ্রোহকাহিনীযুক্ত পালার যুগ।

প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ অরিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক যাত্রা-নাট্য প্রযোজনার যুগ চলিয়াছে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কখনো যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পালা অভিনীত হয় নাই তাহা নহে। উনিশ শতকে চৈয়াপাগলার 'কালাপাহাড়', বিংশ শতকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের 'পদ্মিনী', রাণী জয়মতী', 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ', 'আদিশূর', 'পঞ্চনদ', 'দাক্ষিণাত্য', 'ভাস্কর পণ্ডিত', 'টিপু সুলতান', 'বঙ্গবীর', 'দলমাদল' প্রভৃতি ঐতিহাসিক পালা এবং মুকুন্দ দাসের কয়েকটি সামাজিক-স্বদেশী পালা দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে আসরে প্রয়োজিত হইয়া জন-সমাদর লাভ করে। তথাপি ঐ সময় পর্যন্ত অধিকারী, লোকনাট্যকার ও শ্রোতৃগণের প্রধান আকর্ষণ ছিল পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালার প্রতি। তৎকালে প্রত্যেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক-নাট্যকার আসরাভিনয়ের জন্য অনেকগুলি করিয়া পৌরাণিক পালা রচনা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ভক্তিমূলক পালাও লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধপূর্বকালে যে লোকনাট্যকারদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকটি ঐতিহাসিক এবং একজন কয়েকটি সামাজিক পালা রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেই পরবর্তী যুগের পদধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে। সেই পদধ্বনি ক্রমে নিকটতর হইয়া যুদ্ধোত্তর কালে যাত্রা জগতে দ্বিতীয় যুগকে উপস্থাপিত করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে পৌরাণিক পরিবেশ ও ঘটনার প্রতি জনগণের আকর্ষণ কমিতে থাকে। এই সময় হইতে রূঢ় বস্তু জগতের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে ইতিহাসের বাস্তবঘটনা এবং

অপেক্ষাকৃত পরিচিত পরিবেশে কাল্পনিক ঘটনা লইয়া রচিত পালার প্রতি শ্রোতাদের বিশেষ আগ্রহ বাড়িতে থাকে। সুতরাং লোকচিত্তের রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক লোকনাট্যই অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। ফলে যাত্রার আসর হইতে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালার অন্তর্ধান ঘটিতে থাকে এবং ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক পালা প্রাধান্য লাভ করে। এই যুগে অবশ্য লোক-নাট্যকারদের মধ্যে কেহ কেহ বিপ্লবী, সামাজিক কাহিনী, রাজনৈতিক নেতা ও বংকিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য লইয়া যাত্রাপালা রচনায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নগণ্য। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কাল হইতে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাত্রায় ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক নাটকের যুগ চলিয়াছে। এইযুগে স্ত্রী-ভূমিকায় নারী স্থায়ীভাবে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। প্রযোজনার দিক হইতে ইহা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য বীরদের অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক, বিভিন্ন বহির্ভারতীয় দেশের কাহিনীযুক্ত নাটক, জীবনীনাট্য, কথাসাহিত্যের যাত্রারূপ প্রভৃতি আসরে বিশেষভাবে প্রযোজিত হইতে থাকিলেও যাত্রাপ্রযোজক, নাট্যকার ও দর্শক বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও বিপ্লব-বিদ্রোহকাহিনী লইয়া পালা রচনায় বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছেন। এই যুগে কাহিনী নির্বাচনের পরিবর্তনের সঙ্গে আলোক নিয়ন্ত্রণ ও যান্ত্রিকতার সাহায্য গ্রহণের রীতি প্রচলিত হওয়ায় যাত্রার প্রযোজনায় নূতনত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা লোকনাট্যের কথা বলিতে হইলে বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রীয় শাসনাধিকার, ভাষা, ধর্ম সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কারণ বাংলা-লোকনাট্য বিভিন্ন সময়ে সামগ্রিকভাবে এই সকল দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অষ্ট্রিকমূল কপোতাক্ষ, দামোদর, দ্রাবিড়মূল পুষ্প, ফল, নীল, বিল, পূজা, ভোট-চীন-মূল তিস্তা প্রভৃতি ও অসংখ্য আর্যশব্দ বর্তমান বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। তাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা তত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা করিয়া ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন,—[১]"প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বাঙ্গালাদেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পূর্ব পুরুষেরাই বাস করিয়া আসিতেছে।" কমপক্ষে পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে বাংলার সমুদ্র-উপকূল ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে নেগ্রিটোজাতি বাস করিত। ঐ সকল স্থান তখন অরণ্যময় ছিল। ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, উর্ণাবৎ কেশযুক্ত, দীর্ঘমুণ্ডধারী নেগ্রিটো আরণ্যকগণ সংগৃহীত ফলমূল, ও প্রস্তর অস্ত্রের সাহায্যে শিকারলব্ধ মৎস্যমাংস প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহার পরে ইন্দোচীন হইতে প্রশস্ত নাসামুখ, লম্বা নাসিকা ও দীর্ঘমুণ্ডযুক্ত পিতাভবর্ণের অষ্ট্রিক জাতি আসামের মধ্য দিয়া বাংলা দেশে আসিতে থাকে। বন্য যুগের অসভ্য নেগ্রিটো হইতে অষ্ট্রিকগণ কিঞ্চিৎ উন্নত। অষ্ট্রিক জাতির আগমনে বন্য যুগ হইতে বঙ্গবাসী বর্বর যুগে উন্নীত হয়। অষ্ট্রিকগণ বিজিত নেগ্রিটোদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে যে তাহারা নিজেদের ভাষা হারাইয়া ফেলে এবং পূর্ব ভারত হইতে উত্তর পশ্চিম ভারতের কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত অষ্ট্রিক ভাষা ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে; শেষ পর্যন্ত কোথাও অষ্ট্রিক জাতির মধ্যে কোথাও বা অন্যভাবে নেগ্রিটোদের বিলুপ্তি ঘটে। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় নেগ্রিটোদের প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে তাহারা [২]"ভারতবর্ষে এবং বাংলার স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিচিত্র জনসংঘের আবর্তে তাহারা টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই।" তবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এখনও ইহাদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়; এই প্রসঙ্গে [3] ডঃ বি. এস. গুহের ভারতীয় জনসমষ্টি সম্পর্কীয় আলোচনা স্মর্তব্য।

১। ভারত-সংস্কৃতি-পৃঃ ১০৫, ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৪

২। বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব—পৃঃ-৪১, ১৩৫৯

3. An Outline of the Racial Ethnology of India. (1937)—Dr. B. S. Guha

গোষ্ঠীবদ্ধ অষ্ট্রিকগণ ক্রমে এদেশে গৃহবাস, পশুপালন, কৃষিকার্য ও ধাতুর ব্যবহার প্রচলন করে। ক্রম বিবর্তনের ফলে বস্ত্রবয়ন, সাধারণ বাসন-পত্রের প্রস্তুতি, রন্ধন, নৌকাগঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মায় বিশ্বাসী [১]"অষ্ট্রিক জাতি একটি লক্ষণীয় সভ্যতার প্রকাশ করে।" বস্তুত এইদেশে অষ্ট্রিকগণই প্রথম সভ্যতার উন্মেষের সূচনা করে। অষ্ট্রিকদের একটি অনুন্নত শাখা অরণ্যে বসবাস করিতে থাকে। ইহাদের বংশধর হইতেছে কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর, মুণ্ডা, হো, কুরকু, ভূমিজ, মালপাহাড়ী ও বাঁশফোড়গণ। কালক্রমে অষ্ট্রিকগণ ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং উত্তর ভারতে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে একটি কৃষি-সভ্যতা গড়িয়া তোলে। [২]"এই কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি।" অষ্ট্রিকগণ গ্রামীণ সভ্যতার ধারক।

অন্তত পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্য সাগরীয় কোন স্থান হইতে দ্রাবিড়গণ উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। ইহারা পশ্চিম ভারতে সমুদ্র উপকূলের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে দ্রাবিড়গণ উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু পূর্ব ভারতে যেমন অষ্ট্রিকদের তেমনি পশ্চিম ভারতে দ্রাবিড়দের প্রাধান্য ছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়দের ভাষা ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে। তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, ও বেলুচিস্থানের ব্রাহুই প্রভৃতি ভাষায় ইহার পরিচয় রহিয়াছে। দ্রাবিড়গণ উন্নত সভ্যতার বাহক এবং নাগরিক সভ্যতা ইহাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার নগরগুলি ইহার পরিচায়ক। দীর্ঘমুণ্ডধারী, উন্নতনাস, কর্মঠ, শিল্পী, আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী, প্রবল সংঘশক্তি সম্পন্ন দ্রাবিড়দের সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে শান্তিপ্রিয়, কল্পনা-প্রবণ, উৎসাহ ও দৃঢ়তাহীন অষ্ট্রিকদের সংঘর্ষ ও মিশ্রণ ঘটে। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে স্থিতিশীল বসতি স্থাপনের পরে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে দ্রাবিড়গণ পূর্বভারতে বাস বিস্তার করে। [৩]"এখন হইতে আড়াই হাজার বৎসর আগে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরাই বাঙ্গালাদেশে বাস করিত, সারা বাঙ্গালাদেশ জুড়িয়া তাহারা ছিল।"

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বাবিল ও আসুরীয় জাতির

১। ভারত-সংস্কৃতি-পৃঃ ১০৬, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৪
২। ঐ পৃঃ ১০৮
৩। ঐ পৃঃ ১১০

সংস্পর্শ লাভের পরে মধ্য এশিয়ার আলপাইন অঞ্চল হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের মধ্য দিয়া আর্যগণ ভারতে আসে। আর্যদের লক্ষণ [১]"গৌরবর্ণ, দীর্ঘশরীর, মস্তক-সুগঠন, হনুদ্বয় অনুন্নত।" ইহাদের নাশা উন্নত, এবং কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ। আর্যভাষী নর্ডিক জাতিও কিছু পরিমাণে ভারতে প্রবেশ করে। ইহাদেরও দীর্ঘ করোটি, উন্নত নাসিকা, শ্বেত অথবা শ্যাম গাত্রবর্ণ, কেশ পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ এবং দেহ দীর্ঘ। আর্যদের সঙ্গে দ্রাবিড় ও মিশ্র দ্রাবিড়-অস্ট্রিকদের সংঘর্ষ হয়। শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল, সভ্য আর্যগণ তৎকালীন ভারতবাসীকে ক্রমে ক্রমে পরাস্ত করিয়া সমগ্র ভারতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। আর্য-পূর্ব ভারতের খণ্ডবিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে আর্যগণ একধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। পরাজিত আনার্যদের কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতে থাকিলেও অধিকাংশই আর্যীভূত হয়। নেগ্রিটো অস্ট্রিক মিশ্রিত কৃষি জীবীদের সঙ্গে দ্রাবিড় ও আর্যের মিলনে উত্তর ভারতে হিন্দু জাতির উৎপত্তি। পশ্চিম ভারত হইতে পূর্ব ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত ক্রমে এই হিন্দু জাতির বসবাস ছড়াইয়া পড়ে। নূতন সৃষ্ট হিন্দুজাতির সংস্কৃতিতে আর্যের প্রথা-রীতি-নীতির সঙ্গে অনার্য ধর্ম-পুরাণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মিশ্রণ ঘটে। অস্ট্রিকদের আত্মিক বিশ্বাস, দ্রাবিড়দের রহস্যবাদ, শিব-উমা প্রভৃতি দেবতা ও যোগসাধন পদ্ধতি, আর্যদের বৈদিক ধর্ম, হোম ও আধ্যাত্মিক সাধনার সকলই জনগণকর্তৃক গৃহীত হয়। এমনি ভাবে ভারতে একটি নূতন সভ্যতা গাড়য়া উঠে। [২]"এই সভ্যতায় আর্য অপেক্ষা অনার্যদের দানই অনেক বেশী, কেবল আর্যদের ভাষা ইহার বাহন হইল।" পরবর্তী কালে শক ও হূণরক্ত এই নবসৃষ্ট হিন্দু জাতির রক্তে মিশ্রিত হয়। হিন্দু জাতি ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারত হইতে বঙ্গ দেশে প্রসৃত হইতে থাকে। [৩]"উত্তর ভারতে তথা বঙ্গদেশের অধিবাসীদের জড় বা মূল হইতেছে দ্রাবিড় তথা আর্যদ্বারা রক্তে ও সভ্যতায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত (এবং সম্ভবতঃ নেগ্রিটোদের সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত) অস্ট্রিক জাতি।"

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তিব্বত হইতে বিস্তৃত নাসিকাযুক্ত, উন্নত গণ্ডাস্থিময়, সম্মুখীন অক্ষিপুট সমন্বিত ও অক্ষিকোনে চর্মভাঁজ যুক্ত (Epicanthic fold) মঙ্গোলীয় ভোটচীন জাতি ভারতে আসে। ইহারা আসাম, পার্বত্য চট্টগাম,

১। বিবিধ প্রবন্ধ. ২য় ভাগ—বাঙ্গালীর উৎপত্তি—বঙ্কিমচন্দ্র।

২। ভারত-সংস্কৃতি—পৃঃ-১১২, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়. ১৩৬৪

৩। ঐ পৃঃ-১০৮

এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গের আরো কয়েকটি স্থানে বসতি স্থাপন করে। চকমা, লেপচা, মেচ, মুর্মি, গুরাং, মঙ্গর প্রভৃতি সম্প্রদায় ইহার পরিচয় বাহক। কিন্তু ইহাদের আগমনের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে আর্যগণের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকে ইহারা খুবই কম প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে।

ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী Diodoros, Plutarch, Curtius প্রমুখ classical লেখকের মতামত অবলম্বনে দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন কালে গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল [1]গঙ্গারাষ্ট্র নামে অভিহিত হইত। শূদ্র-কুলোদ্ভব মহাপদ্ম নন্দ মিথিলা, কলিঙ্গ ও গঙ্গারাষ্ট্র পর্যন্ত তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এই নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া নন্দ-সাম্রাজ্য ও প্রভূত ধন-রত্নের অধিকারী হইলেন। সুতরাং মহাপদ্ম ও তাঁহার পুত্রদের গঙ্গারাষ্ট্র করতলগত হওয়ায় [2]চন্দ্রগুপ্তের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য সৌরাষ্ট্র হইতে বঙ্গদেশ (গঙ্গারাষ্ট্র) পর্যন্ত অর্থাৎ পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বৎসর পূর্বে বগুড়া জিলার মহাস্থান গড়ে একটি খণ্ডিত শীলাচক্র পাওয়া যায়। ইহাতে অশোকলিপির সমসাময়িক অক্ষরে উৎকীর্ণ প্রাকৃত ভাষার লিপি রহিয়াছে। এই লিপিতে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন সহরের (পুন্দনগল) শস্য ভাণ্ডার হইতে দুর্ভিক্ষের সময় শস্য ধার লইবার বিষয়ে স্থানীয় শাসন কর্তার অনুজ্ঞা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই লিপি অবলম্বনে ডক্টর সুকুমার সেনের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য,—[৩]"কোন সময় থেকে বাংলা দেশে আর্যদের বসতি আরম্ভ হয় তা ঠিক করে বলা শক্ত, তবে মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দীতে যে অন্তত উত্তর-বঙ্গে আর্যদের উপনিবেশ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।" এই উপনিবেশান্তর্ভুক্ত [4]পুণ্ড্র নগরী (উত্তর-বঙ্গ) মৌর্য যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল।

---

1. "The Gangaridae (people of the lower Ganges Valley)" p. 234 -- Political History of Ancient India, Dr. H. C. Roy Chowdhury, C. U. 1953

2. ......in the time of Chandra Gupta the Maurya Empire extended from Surashtra to Bengal (Gangaridae), i. e. from the Western to the Eastern Sea, p. 297 Political History of Ancient India, Dr. H. C. Roy Chowdhury, C. U, 1953

৩। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী-পৃঃ ১, ডক্টর সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৬২

4. The Brahmi record at Mahasthan, which is usually assigned to the Mourya period, refers to Pundranagar as a prosperous city, p. 44, History of Bengal (Vol. I), Dr. R. C. Mazumder (D. U.)

বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল কৌম (tribal) শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতের রাজতন্ত্রের প্রভাবে পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ প্রভৃতি কৌমতন্ত্রের অবসানে এখানে রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। [১]"প্রাচীন বাঙ্গলায় রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত হইতে মৌর্য আমলের খুব আগে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।" উত্তর ভারতের আর্যগণ কর্তৃক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে মৌর্য যুগ হইতেই উত্তর ভারতবাসী উন্নততর অস্ত্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ভাষার সাহায্যে বাংলাদেশে আর্যীকরণ আরম্ভ করে। কিন্তু এই আর্যরা বাধাহীনভাবে একাজ সম্পন্ন করিতে পারে নাই। দেশবাসীর সঙ্গে সংঘাত, বাঙ্গালীর পরাভব ও উভয়ের মিশ্রণের মধ্য দিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া একটু একটু করিয়া তাহাদের অগ্রসর হইতে হয়। অপেক্ষাকৃত কম উন্নত বাংলার কৌম সমূহ উত্তর ভারতের রাজন্য বর্গের রাষ্ট্রীয় এবং আর্থ নৈতিক প্রভুত্বকে ক্রমে ক্রমে স্বীকৃতি দান করায় এদেশে আর্যভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রাচীনবাংলা চারটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। উত্তর বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, পশ্চিমবঙ্গ লইয়া বর্ধমানভুক্তি, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গদেশ ও ওড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের সংলগ্ন অংশ লইয়া দণ্ডভুক্তি এবং কামরূপ লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ-ভুক্তি গঠিত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় (আনুমানিক ৩২০—৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ) মগধের গুপ্তাধিগত্য বিস্তারলাভ করিতে থাকে। ইহার পরে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০—৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ) রাঢ় অঞ্চলের প্রধান স্বাধীন নরপতি সিংহবর্মার পুত্র ও পুষ্করণার (বাঁকুড়া—পোখরণা গ্রাম) অধিপতি চন্দ্রবর্মাকে পরাস্ত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন। [২]"সমতট ছাড়া বাংলা দেশের আর সকল অংশই সমুদ্রগুপ্তের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রানুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।" পরবর্তী কালে সমতটে (দক্ষিণ-পূর্ববাংলা) ও গুপ্তাধিপত্য বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত সম্ভবত শেষ পর্যন্তই অশ্বমেধ যজ্ঞকারী কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বুধগুপ্ত বঙ্গদেশকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত রাখেন। পূর্বোল্লিখিত বাংলার ভুক্তিগুলির মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিই এই রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মৌর্য যুগ হইতে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতা বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করিতে থাকায় এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছাড়াও জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে।

১। বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব—পৃঃ ৪৪০, ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, ১৩৫৯

২। ঐ পৃঃ ৪৪৭

গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও বরেন্দ্রভূমের মৃগস্থাপন স্তূপ প্রভৃতিতে মহারাজ শ্রীগুপ্তের পোষকতা, ত্রিপুরার গুণিকাগ্রহা গ্রামে বৌদ্ধ মহাজানিক ভিক্ষুসংঘ স্থাপনে শিবভক্ত রাজা বন্য গুপ্তের ভূমিদান (৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় যে গুপ্ত রাজাদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল; জৈন ধর্মের প্রতিও তাহাদের অশ্রদ্ধা ছিল না। সুতরাং গুপ্ত যুগেও এই দুই ধর্মের বিস্তার বঙ্গদেশে অব্যাহত ছিল। বাংলায় জৈন ধর্মের কখনো খুব বেশি প্রভাব-বিস্তৃত হয় নাই। জৈন ও বৌদ্ধ সম্পর্কে উদারতা এবং পোষকতা থাকিলেও গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ছিলেন। বাংলার বাহির হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভূমিদান দিয়া গুপ্ত রাজন্য বর্গ তাহাদের স্থিতি সম্পন্ন করাইতেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের রীতি এই সময় হইতেই প্রচলিত হয়। সাধারণ গৃহস্থরাও ব্রাহ্মণ-বসতি স্থাপনের জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া [১]"ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য-সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে, এবং তাহারাই ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক আদর্শ-নির্দেশের নিয়ামক হইয়া উঠেন।" ইহার ফলে দেশে পূর্ব প্রচলিত ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা সমাজের নিম্নস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে এবং উচ্চস্তরে আর্য-ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভাষা প্রাধান্য পাইতে থাকে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্ম গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি যেমন সাদরে বাঙ্গালী গ্রহণ করিল তেমনি নিকটবর্তী অঞ্চলের আর্যদের চলিতভাষা মাগধী-প্রাকৃত কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে জাতীয়তার দিক হইতে বাংগালী এক বিচিত্র সংকর জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। এই জাতি গঠনে [২]"নিগ্রোবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরে এবং সংকীর্ণ স্থান-গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মঙ্গোলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্বদিকে সংকীর্ণ স্থান-গণ্ডির সীমা অতিক্রম করে নাই।" সুতরাং প্রধানত [৩]"অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য—এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল।" এই নবসৃষ্ট

১। বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব—পৃঃ ৪৫১, ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, ১৩৫৯
২। ঐ —পৃঃ ৪৮,
৩। ভারত-সংস্কৃতি—পৃঃ ১০৮, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৪

বাঙ্গালীর ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

শাসনের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশ একসময় চারটি প্রদেশে বিভক্ত হয়। এই প্রদেশগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় (সুহ্ম), পূর্ব বাংলা বঙ্গ এবং আসাম অঞ্চল কামরূপ নামে অভিহিত হইত। রাঢ় ও বরেন্দ্র একত্রে গৌড় এবং বঙ্গ ও কামরূপ একসঙ্গে বঙ্গ আখ্যা লাভ করিল। এই বঙ্গদেশে ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগ হইতেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনরশ্মি শিথিল হইতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে এই শতকের প্রথমেই পূর্ববঙ্গের সামন্ত নরপতি বন্যগুপ্ত স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া 'মহারাজাধিরাজ' হইলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবার গৌড় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে থাকে। এবং সপ্তম শতকের সূচনাতেই গুপ্তরাজদের মহাসামন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে (কানাসোনাঅঞ্চল) রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় হইতেই বাংলাদেশে সামন্ত তন্ত্রের সূত্রপাত হয়। সামন্তগণ মহারাজাধিরাজের অধীনে থাকিয়া বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করিতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় মূল রাজশক্তিকে সাহায্য করিতেন। এই সকল সামন্ত সপ্তম শতাব্দী হইতে ব্যাপকভাবে স্বাধীন হইতে আরম্ভ করেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা (৬০৫—৬৫০ খ্রীঃ আনুমানিক) এবং মালব ও মগধরাজ হর্ষবর্ধনের (৬০৬—৬৪৬ খ্রীঃ) মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম করিয়া শশাঙ্ক বিস্তৃত রাজ্যের নরপতিরূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কলিঙ্গের শাসনকর্তা শৈলোদ্ভব মাধবরাজের ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের গঞ্জাম অনুশাসনে শশাঙ্কের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ তাম্রশাসনে শশাঙ্ক সম্পর্কে বলা হইয়াছে,—[1]"চতুরুদধিসলিল বীচী মেখলা নিলীনায়াং সদ্বীপ—

গিরিপত্তনবত্যাং বসুন্ধরায়াং গৌপ্তাব্দে বর্ষশতত্রয়েবর্তমানে

মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাঙ্করাজে শাসতি"—(পংক্তি ১-৩)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন। ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হিউয়েনসঙ বাংলা ভ্রমণে আসেন।

---

1. Epigraphia Indica Vol. VI p. 144--শাসনটির ইংরেজি অনুবাদ—"While Gupta year three hurdred was current (and) while the Maharajadhiraja the glorious Sasankaraja was ruling over the earth surrouded by the girdle of the weavs of the water of the four oceans with islands, mountains and cities" p. 146. (Vol. VI)

তখন বঙ্গদেশ কয়ঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক কিন্তু ইহাদের কোন স্থানেরই রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই। কাজেই মনে হয় রাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ৬৩৬—৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন। শশাঙ্ক সম্বন্ধে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন, [1] "Like Yasodharman he rose and vanished like a meteor, leaving behind only the record of a splendid military carrier." সুতরাং উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধনের প্রভাবে গৌড়-রাজ্যের বিনষ্টি ঘটে। এই সময় দেশীয় সামন্তগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে নানা প্রকার শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয় এবং বাংলাদেশে শতবর্ষব্যাপী [2]মাৎস্যন্যায় চলিতে থাকে। দেশে কোন রাজার একাধিপত্য নাই, যে যেখানে পারিয়াছে সেইখানেই সে নিজের প্রভুত্ব দাবি করিয়াছে। [3]উড়িষ্যা বাংলা এবং পূর্বাঞ্চলের আরও পাঁচটি দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রত্যেকেই ব্যক্তি-ক্ষমতা অনুযায়ী নিজে নিজেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজা বনিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন দেশে কোন রাজ্যশাসক ছিলেন না। সুতরাং এই দাবিদারদের মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রামের ফলে বাংলায় নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই নৈরাজ্যের সময় যে কোন রকমের বৃহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে গ্রাস করিয়া মাৎস্যন্যায়ের রথচক্র ঘর্ঘর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তীব্র গতিতে চালিত করিয়াছে। ইহার ফলে যখন উৎপীড়ন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন দেশে একজন রাজা এবং একটি রাষ্ট্র গড়িয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ সচেষ্ট হইলেন। তাহারা গোপালদেব নামক একজন প্রবল যোদ্ধা সামন্তকে গৌড়ের রাজা রূপে নির্বাচিত করেন। মালদহের খালিমপুর লিপি ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে,—

1. Ancient India—p. 250, Dr. R. C. Mazumder (Delhi 1960)

২। অপ্রণীতোহি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি। বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে। তেন গুপ্তঃ প্রভবতীতি॥ অর্থশাস্ত্র (কৌটিল্য, বিনয়াধিকারিক—প্রথম অধিকরণ—চতুর্থ অধ্যায়, ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৬৪

3. In Odivisa, in Bengal and other five provinces of the east, each Kshatriya, Brahman and Merchant constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the country. p.p. 365—366—The Indian Antiquary (Vol. IV)

[1] মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপালইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশির্দিশমাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥—শ্লোক—৪

প্রকৃতিপুঞ্জ শব্দটির অর্থ প্রজাসাধারণ হইলেও মনে হয় এইখানে সামন্ত নায়কগণই ইহার লক্ষ্য। [২]"এই সামন্তনায়কেরাই বহু বৎসর নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ে উৎপীড়িত হইয়া শেষ পর্যন্ত সকলে একত্রে এই নির্বাচন কার্যটি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই [3]নির্বাচন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত থাকিলেও ইহা সত্য যে [৪]সমৃদ্ধ ও সমরকুশল বপ্যটের তনয় গোপালদেব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজা হইয়া গৌড়-বঙ্গকে আপন শাসনাধীন করিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। গোপালদেব প্রায় ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার পরে ধর্মপাল (৭৮০—৮১৫ খ্রীঃ), দেবপাল (৮১৫—৮৫৫ খ্রীঃ), নারায়ণপাল (৮৬০—৯১৫ খ্রীঃ), রাজ্যপাল (৯১৫—৯৪০ খ্রীঃ), দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০—৯৬০ খ্রীঃ), মহীপাল প্রথম (৯৮০—১০৩০ খ্রীঃ), বিগ্রহপাল তৃতীয় (১০৫৫—১০৮১ খ্রীঃ), রামপাল (একাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে—১১২০ খ্রীঃ) কুমারপাল (১১২০-১১৩৯ খ্রীঃ), মদনপাল (১১৩৯-১১৬০ খ্রীঃ) বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। গোপালদেব হইতে পালবংশ অবিচ্ছিন্নভাবে রাজত্ব করিলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নরপতিদেরই নাম করা হইল।

1. Epigraphia Indica Vol. IV p. 248—ইংরেজি অনুবাদ—"His son was the crest-jewel of the heads of kings, the glorious Gopala, whom the people made take the head of fortune to put an end to the practice of fishes; whose ever lasting great fame the glorious mass of moonlight on a full moonlight seeks to rival by its whiteness in the sky. p. 251.

২। বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব—পৃঃ ৪৭৫. ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, ১৩৫৯

3. It is open to doubt whether the passage refers to anything like a regular election by the general mass of people, and whether this was at all practicable in those days and in such abnormal times. p. 97, History of Bengal, Vol. I (D. U.). Dr. R. C. Mazumder

৪। খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যট—শ্লোক—৩, খালিমপুর লিপি, ধর্মপাল

Epigraphia Indica Vol. IV—p. 248, Edt.—E. Hultzsch 1896—1897

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেন বংশীয়গণ মনে হয় পাল রাজত্বে কর্মব্যপদেশে বাংলায় আসেন। পরে পালবংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সেনবংশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে থাকে। জনশ্রুতি আছে যে রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধবিদ্বেষী নরপতি আদিশূর (দশম শতাব্দী) রাজত্ব করিতেন। তিনি কান্যকুব্জ হইতে পুত্রেষ্টিযাগার্থে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড় দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাগরণে সমর্থ হন। [১]"আদিশূর নামক যে প্রকৃত একজন রাজা ছিলেন এবিষয়ে কেহ কখনও সন্দেহ করেন নাই। আদিশূর কখন কোন স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই কথা লইয়াই বহুদিন বাদানুবাদ চলিতেছে।" এই বাদানুবাদের পূর্ণ ঐতিহাসিক মীমাংসা এখনো সম্ভব হয় নাই। কিংবদন্তী প্রসিদ্ধ রাঢ়ের এই শূররাজ বংশের [২]আদিশূর-বংশীয় চন্দ্রসেনের কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে বিজয় সেনের বিবাহ হয়। [৩]বিজয়সেনের পূর্ব পুরুষ রাঢ়ে বসতি স্থাপন করেন। দ্বাদশ শতকে পালরাজ মদনপালকে পরাস্ত করিয়া বিজয়সেন বঙ্গদেশে প্রথম সেন বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ শতকের তৃতীয় পাদে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন (১১৬০—১১৭৮ খ্রীঃ) গৌড়বিজয় সমাপ্ত করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন। ক্রমরাজ্যবিস্তারের ফলে বঙ্গ, কামরূপ, গৌড় ও কলিঙ্গ সেনবংশের নরপতি লক্ষ্মণসেনের (১১৭৮—১২০১ খ্রীঃ) অধীন হয়। ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণসেনেই বাংলাদেশে রাজত্ব করেন।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মধ্যদিয়া ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন উন্নত স্তরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসনব্যবস্থাসহ গাঙ্গেয় সভ্যতা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ফলে ভাষা, ধর্ম, উৎসবাদিও ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নূতনরূপ গ্রহণ করে। সমাজের নিম্নস্তরে পূর্ব সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হইলেও ক্রমে ইহাও যে উন্নত সংস্কৃতির স্পর্শ লাভ করিতে থাকে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভাষার দিক দিয়া বহুপূর্ব হইতেই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। দেবদেবী সম্পর্কীয় নানা কাহিনী ও ধর্ম শাস্ত্রাদি সংস্কৃতেই

১। গৌড়রাজমালা—পৃঃ ৫৬—প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড—রমা প্রসাদ চন্দ, ১৩১৯

২। জীবনীকোষ—(ভারতীয় ঐতিহাসিক), তৃতীয় খণ্ড—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ১৩৪৫

3 The Senas settled in Radha. The first notable king of the dynasty was Vijoy Sen who defeated the Pala king Madanapala and conquered Bengal. p. 320. Ancient India, Dr. R. C. Mazumder (Delhi 1960)

রচিত হইতেছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ব্যাপক বিস্তারের ফলে ঐ সকল বিষয়ে জনগণের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য সাধারণের ভাষার সাহায্য লওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। বাংলাদেশে আর্য প্রভাবে মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তিত রূপ অর্থাৎ মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ চলিত ভাষা রূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। জলবায়ুর প্রভাবে উচ্চারণ বিকৃতি ও নানা প্রকার দেশী শব্দ সংযোজনের ফলে ধীরে ধীরে তাহাও পুনঃ পরিবর্তিত রূপ ধারণ করিল। সংস্কৃতে রচিত বিভিন্ন বিষয় এবং নানা ধর্ম-ধারণা এই ভাষার সাহায্যেই আচার্য, কথক ও পাঁচালিকারগণ জনসাধারণের মধ্যে পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহাদের মনোগ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সঙ্গে তাহাদের সংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এই ভাবে রচিত আচার্যদের সংগীতের মধ্যে দশম শতকের মাঝামাঝি সময় স্বতন্ত্র বাংলা ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধার করা যাইতে পারে,—

[1]"By the middle of the 10th century, to which period the earliest exant specimens of Bengali can be referred, the Bengali language may be said to have become distinctive, as the expression of life and religious aspirations of the people of Bengal, with the nucleus of a literature uniting the various dialectal areas."

বৌদ্ধসহজযানীরা দেবদেবী, পূজা-অর্চনা, মন্ত্রজপাদিরূপ বাহ্যানুষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিতেন না। তাহাদের মতে শূন্যতা (প্রকৃতি) ও করুণা (পুরুষ) অর্থাৎ নারী ও নরের (সাধনসঙ্গিনী ও সাধকের) মিলনে চিত্তে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়-সংসার-সংস্কার চেতনা বিলুপ্ত হইলে মহাসুখানুভূতি জন্মে। কায়া সাধনার সাহায্যে এই মহাসুখানুভূতিই জীবের কাম্য, আর এই অনুভূতির অবস্থাই সহজ অবস্থা। এই সাধন পদ্ধতি গুরুমুখী। ইহাকে অবলম্বন করিয়া নানা গ্রন্থাদি রচিত হইলেও সাধারণের মধ্যে ইহার গুহ্য রীতি প্রচার করিবার জন্য সহজযানী সিদ্ধাচার্যগণ বহু চর্যাগীতি রচনা করেন। এই শ্রেণীর কতগুলি গীতি পুঁথিতে সংগৃহীত হইয়া নেপালের রাজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হাজার বৎসরের পুরাতন বাংলা

1. The Origine and Development of Bengali Language, p. 81—Dr. S. K, Chatterjee (C. U.—1926)

ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গানও দোহা সেখান হইতে আবিষ্কার করেন। তিনি তেইশ জন পদকর্তা রচিত সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের সন্ধান পাইয়াছেন। কাহ্নপাদ, শবরপাদ, ধামপাদ, ঢেণ্ঢণ পাদ, লুইপাদ, কুক্কুরিপাদ, ভুসুকুপাদ, প্রমুখ সিদ্ধাচার্য রচিত এই পদগুলি মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশজাত একটি [1]স্বতন্ত্র ভাষার ('বাংলা') প্রাচীনতম পরিচয় বহন করিতেছে। প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন স্বরূপ [2]চর্যাপদ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে,—

(ক) উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত—গুঞ্জরী মালী ॥

চর্যা ২৮—শবর পাদানাম্

(খ) নগরবাহিরিরে ডোম্বি তোহারি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহস বাহ্মণ নাড়িয়া ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ ॥ চর্যা ১০—কাহ্ন পাদানাম্

এই ভাষাই বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে। অঞ্চলভেদে ইহার পার্থক্য থাকিলেও ইহার সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য একটি রূপও রহিয়াছে। লোকনাট্যকারগণ এই রূপটিকেই তাহাদের রচনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ধর্মের দিক হইতে আলোচিত গুপ্ত, পাল ও সেন রাজতন্ত্রের মধ্যে গুপ্ত যুগে কিছু কিছু জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। বাহ্মণ্য ধর্মের শাখাগুলির মধ্যে [3]"বৈদিকের ঝঙ্কার বাঙ্গালা দেশের সুরে চিরকালই অতি ক্ষীণভাবে শুনা গিয়াছে।" শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবশাখাই এই দেশে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের অধিপতি বন্যগুপ্ত শিবভক্ত ছিলেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ে ও কামরূপে শৈব ধর্মের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটে, এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমিতে থাকে। রাজা শশাঙ্কও বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের ঢাকার উত্তর-পূর্বে আশ্রফপুর অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ প্রমুখ

1. "The language of the charys is the genuine vernacular of Bengal at its basis." p. 115,—O. D. B. L., Dr. S. K. Chatterjee (C. U. 1926)

২। চর্যাপদ—অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু।

৩। ভারত-সংস্কৃতি—পৃঃ ১১৪, ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৪

খড়্গরাজের কথা বাদ দিলে দেশে তখন আর কোথাও বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে রাজপোষকতা লাভ করে নাই। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈষ্ণব শাখা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণের নানা কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত হইতে থাকে। পাহাড়পুরের সপ্তম-অষ্টম শতকের মৃৎ ও প্রস্তর চিত্র দেখিয়া ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় মন্তব্য করিয়াছেন, [1]"কৃষ্ণলীলার যমলার্জুন, কেশীবধ, কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে কংসরাজের মল্লদের যুদ্ধ, গোবর্ধন ধারণ, গোপ-বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম, কৃষ্ণকে লইয়া বাসুদেবের গোকুলে গমন, গোপীলীলা প্রভৃতি কাহিনী ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়াছিল।" [2]পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত এই জন্যই তাঁহাদের তাম্র শাসনাদিতে কি কোথাও তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই। বরেন্দ্র ভূমি যে তাহাদের 'জনকভূ' বা পিতৃভূমি তাহা রামপাল দেবের সান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম্ কাব্য হইতে জানা যায়।" বরেন্দ্রভূমির এই পাল রাজন্যবর্গ বৌদ্ধ হইলেও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই রাজবংশের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে কখনো বঞ্চিত হয় নাই। পালরাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃতির পোষক ছিলেন। পূজা যাগযজ্ঞাদিতেও যে তাহারা কখনো অংশগ্রহণ করিতেন না এমন নহে। রাজকর্মে যেমন ব্রাহ্মণগণ স্থান পাইতেন তেমনি কৈবর্ত প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও পালরাজগণ এই কাজ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতেন না। বৌদ্ধব্রাহ্মণ্য ও আর্যেতর সংস্কার-সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদানে পাল যুগেই বাংলা দেশে এক সামাজিক সমন্বয় গড়িয়া উঠে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ হিন্দু এই উভয় ধর্মের দেবদেবীর কল্পনায়ও আর্যেতর প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই ভাবে যে বৃহৎ সমন্বয় গড়িয়া উঠে তাহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্মৃতি ও সংস্কৃতির আদর্শই যে প্রধান্য পায় তাহা বুঝা যায় পালরাজতন্ত্রের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্বর্ণের স্বীকৃতি, উত্তরাধিকার আইন, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের চর্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়া। এই যে নবসমন্বিত সংস্কৃতি ইহার উপরই পালযুগে বাঙালী-সংস্কৃতির ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। গুপ্তযুগে এই সমীকরণের সূচনা হইলেও ইহা পালরাজতন্ত্রের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণদের একাংশ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, হোম, পূজা প্রভৃতি কর্মে ব্যস্ত থাকিত এবং অন্য অংশ নানা প্রকার রাষ্ট্রীয় কর্মে

১। বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব—পৃঃ ৪৬৩, ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, ১৩৫৯

২। বাংলার ইতিহাস—পৃঃ ১৭৪, প্রভাস চন্দ্র সেন, ১৩৭২

নিযুক্ত হইত। এই যুগে রাজপদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রীয় আমলা-তন্ত্রও ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে। ব্রাহ্মণগণ সাধারণত মন্ত্রিত্ব, সেনাপতিত্ব প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ রাজকার্যে বৃত হইতেন। [১]"শাণ্ডিল্য গোত্রীয় গর্গদেব, তৎপুত্র দর্ভপাণি, তৎপুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্র কেদার মিশ্র ও তৎপুত্র ভট্ট গুরুব মিশ্র যথাক্রমে ধর্মপালদেব, দেবপালদেব, শূরপালদেব (বিগ্রহপালদেব), ও নারায়ণপাল দেবের মন্ত্রিত্ব করেছিলেন।" রামপালদেবের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব রাজা কুমারপালের মহামন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন। [২]কমৌলির তাম্রশাসনে জানা যায় যে তিনি দক্ষিণ বঙ্গে একটি নৌ-যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া সাফল্য লাভ করেন,—

যস্যানুত্তরবঙ্গ সঙ্গরজয়ে নৌবাট—
হী হী রব ত্রস্তৈর্দিককরিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদগম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুককেনিপাত পতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ
শীকরৈরাকাশে স্থিরতাকৃতা যদিভবেৎস্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥ —শ্লোক ১১

একাদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের নৃপতি হরিবর্মদেবের মহামন্ত্রী ছিলেন সাবর্ণ্য গোত্রীয় ভট্ট ভবদেব। লক্ষণসেনের মহামাত্য ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন ব্রহ্মণ কুলতিলক হলায়ুধ। ভবদেব ভট্ট এবং হলায়ুধ কেবল রাষ্ট্রীয় কর্মই করিতেন না, এই দুই অমাত্য আবার ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শেরও প্রতিনিধি ছিলেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার এবং দশকর্ম পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ, মীমাংসা, তন্ত্র, গণিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ভবদেব বৌদ্ধ নৈয়ায়িক পাষণ্ড বৈতণ্ডিকদের যুক্তি তর্ক খণ্ডনেও সুদক্ষ ছিলেন। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' 'শৈবসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'মীমাংসাসর্বস্ব' গ্রন্থাদি রচনা করেন হলায়ুধ। গুরু অনিরুদ্ধের উপদেশে বল্লাল সেন রচনা করেন স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থ 'দানসাগর' (১১৬৯ খ্রীঃ), 'আচার সাগর ও 'প্রতিষ্ঠাসাগর'।

১। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—পৃঃ ১৪, ডক্টর সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী, ১৯৬২

2. Epigraphia Indica Vol. II-p, 351 (1894), Ed. J. Burgess, ইংরেজী অনুবাদ "On another occasion of Vaidyadeva's (Yasya) victory at the battle of southern Vanga, if the elephants of the eight quarters did not run away terrified by the shouts from the enclosure of boats, it was because they had no place to run to (i. e. the shouts of the rowers pervaded all space). Moreover, if the spray, thrown up by the downward strokes of the upraised rudder-oars, had remained fixed in the sky, then the moon would have become spotless (being washed clean by the spray)," p. 355.

বল্লাল সেনের আংশিক রচনা স্মৃতিগ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' (১১৬৭ খ্রীঃ) সমাপ্ত করেন রাজা লক্ষ্মণ সেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পাল-সেন রাজত্বে ব্রাহ্মণগণের অধিকতর রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও পোষকতা পাইবার জন্য সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির চর্চা বিশেষভাবে বাড়িতে থাকে। ফলে এই ধর্ম-সংস্কৃতি সমাজের উচ্চস্তর হইতে সাধারণ স্তরে ক্রমপ্রবাহিত হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পালযুগে নানা ভাবে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় ঘটিতে থাকে। কিন্তু সেন-রাজগণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তাঁহারা অধিক আনুকূল্য দেখাইতে থাকেন। কাজেই বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কমিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধসাধনার প্রভাব থাকিলেও বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্মই সমাজের নানা স্তরে ছড়াইয়া পড়ে। বর্মন-সেন যুগে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবানুষ্ঠান, আচার পদ্ধতি এমনকি দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজ পর্যন্ত পৌরাণিক ধর্মাদর্শ, জ্যোতিশ ও স্মৃতি সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। নানা দেব দেবীর পূজা-অর্চনা, তীর্থ স্নান, উপবাস-ব্রত, হোম-যজ্ঞাদি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাগ্রহে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গৃহীত হয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব পূজার্চনা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। মকরবাহিনী দশহরা গঙ্গা, শরৎকালে দুর্গা, হেমন্তে দীপান্বিতা কালী ও জগদ্ধাত্রী, শীতে মাঘমাসে রটন্তীকালী, বসন্তে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা, বসন্তরোগের প্রতিকার কল্পে শীতলা, ওলাওঠার প্রতিবিধানের জন্য কালী ও ওলাদেবী, শিশুমঙ্গলের জন্য জাতাপহারিনী ও উত্তরবঙ্গের বুদ্বেশ্বরী (বুড়ীঠাকুরানী), সর্পভয় দূরীকরণের জন্য শ্রাবণ ও ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসা, শুভবিধানের জন্য মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীর পূজা বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর শাক্ত উৎসব রূপে অনুষ্ঠিত হয়। মনসাপূজা উপলক্ষে ভাসান গাহিবার রীতি আছে। [১]মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় একসময় রাত্রি জাগিয়া দেবীমাহাত্ম্যমূলক সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা করা হইত। শাক্ত উৎসবের মধ্যে পূর্ববঙ্গে জয়দুর্গার পূজা প্রচলিত। বৃক্ষতলে ঘটের উপর এই লৌকিক দেবতার পূজা সম্পন্ন হয়। ইহার কোন মূর্তি নাই।

১। ধর্মকর্মলোকসবে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ চৈতন্য ভাগবত আদি, বৃন্দাবন দাস।

[১]"নানা প্রকার নাচ গান ও বীভৎস আচরণের সহিত গ্রামের বহির্ভাগে জয়দুর্গার পূজা বা পত্রাবলী পূজা সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করা হয়।"

শৈব উৎসবের মধ্যে ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দশীতে অনুষ্ঠিত শিবরাত্রি সর্ব প্রধান। এই উৎসবে নিদ্রা নিষিদ্ধ। ভক্তগণ সংগীতনৃত্যাদির মাধ্যমে রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শিশুর মঙ্গলের জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বলীবর্দবাহন পঞ্চমুখ পঞ্চানন, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের মিলিত রূপ ত্রিনাথ ও চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক অন্যান্য শৈব উৎসবের অন্তর্গত। চড়ক উপলক্ষে দলে দলে লোক নীল-গাজন গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করে। এই পরিক্রমালব্ধ দ্রব্যাদি পূজায় উৎসর্গ করিয়া গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করা হয়। পুত্রবতী জননীরা নীলের উপবাস করেন। চড়কের দিন বাণফোঁড়া, বঁড়শী ফোঁড়া, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, চড়কদণ্ড ঘুরানো প্রভৃতি এবং নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈষ্ণব উৎসবের দিক হইতে বসন্তে দোলযাত্রা, বর্ষায় রথযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা, শরতে কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, হেমন্তে রাসযাত্রা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময় নাম-যজ্ঞ প্রসঙ্গে মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ছাড়া শরতে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা উদ্‌যাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রাত্রি জাগরণ ও অক্ষক্রীড়ার বিধান রহিয়াছে। মাঘী শ্রীপঞ্চমীতে বিদ্যার্থীর সরস্বতী পূজা, সন্তান কামনা ও ইহার মঙ্গলের জন্য কার্তিক সংক্রান্তিতে দেবসেনাপতি কার্তিকের পূজা, বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ভাদ্র সংক্রান্তিতে যন্ত্রপতি বিশ্বকর্মার পূজা এবং গন্ধ-বণিকগণ কর্তৃক বৈশাখীপূর্ণিমায় গন্ধাসুরবধকারিণী গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ বঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় এবং পূর্ববঙ্গে দানবদেবতা মোচরাসিংহ ও গাবরদলনের পূজা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশে স্বতন্ত্র সৌর সম্প্রদায় না থাকিলেও সূর্যপূজার প্রচলন আছে। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি হইতে বুঝা যায় যে একসময় বঙ্গে সূর্য পূজারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। গৃহস্থের বসত বাটীর বাহিরে শনিবারে শনিপূজার (বারের পূজার) ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই পূজার সংবাদ পাইলেই গৃহস্থের পূজাস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। পূজা অন্তে পাঁচালি পাঠ ও সিরনি দেওয়া এই পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে ব্যাঘ্রারূঢ়া কুলাই দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় পৌষসংক্রান্তিতে। এই পূজার

১। বাংলার পাল পার্বণ—পৃঃ ৩১—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ১৩৫৯

পূর্বে কয়েকদিন ধরিয়া বারো বাঘের ছড়া কাটিয়া রাত্রিকালে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হয়। কেহ ইহার বিরোধিতা করিলে বাঘের ছড়ায় উপস্থিত বুদ্ধিমত তাহার নিন্দা ও ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কথা জানাইয়া দেওয়া হয়। বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুরের কংসাবতী নদীতীরস্থ ধারেন্দা পরগণায় ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশীতে ইন্দ্রপূজা অনুষ্ঠিত হয়। [১]মেদিনীপুরের ইতিহাসে ইন্দ্রধ্বজের বর্ণনা করা হইয়াছে। মাঠে শালগাছ পুঁতিয়া তাহার উপর নববস্ত্রে আচ্ছাদিত বংশনির্মিত ছত্র স্থাপন পূর্বক ইন্দ্রধ্বজ (ইঁদ) প্রস্তুত করা হয়। ইন্দ্র পূজায় রাত্রিকালে বিশেষ গীত নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাদ্রমাসে খন্দপূজা নামক এবং অগ্রহায়ণে নবান্ন নামক শস্যোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শস্যোৎসবে নৃত্যগীতাদির বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। নবান্ন-শস্যোৎসবের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, দেবতা, পিতৃপুরুষ, কাকাদি প্রাণী ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে শস্য উঠিবার পরে নূতন অন্ন দান করা। পালপার্বণাদির বিবরণ হইতে সহজেই অনুমিত হইবে, কেন বাংলাকে বারোমাসে-তের-পার্বণের দেশ বলা হয়।

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে কয়েকটি জাতির মিশ্রণে বাংগালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; এবং বাংলার আর্যেতর জাতির আর্যীকরণ মৌর্য-রাজাদের সময় হইতে সুরু হইয়াছে। কিন্তু যে কথাটি সবসময় মনে রাখা দরকার তাহা এই যে, যে নৃগোষ্ঠীগুলি এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের সংস্কার তাহারা পূর্ণভাবে ত্যাগ করে নাই। ইহার প্রমাণ এই যে আজও বাংলার জনগোষ্ঠীতে আর্যেতর গোষ্ঠীর লোক নিজ নিজ ধর্মসংস্কার অনেকখানি বজায় রাখিয়াছে। এই সব আর্যেতর গোষ্ঠীর 'টোটেম্,' 'ট্যাবু', ও 'মোরস্' কি ছিল এবং কিভাবে আধুনিক আচার-বিচারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের এই আর্যেতর জনগোষ্ঠী ও তাহাদের আরাধ্য লৌকিক দেবতার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও লৌকিক দেবতা

দার্জিলিং জিলার কার্শিয়াং-এ নেওয়ার, গুরাং, ওরাওঁ, কালিম্পং-এ দামাই, লিম্বু, লেপচা, মংগর, গোরুবাথানে থাম্বু, জোর বাংলায় মুর্মি, শিলিগুঁড়ি অঞ্চলে মুণ্ডা ও মোঙ্গলোদ্ভব রাজবংশী, ফাঁসিদাওয়ায় সাঁওতাল, মিরিক অঞ্চলে মুর্মি, মংগর প্রভৃতি উপজাতির বসবাস রহিয়াছে।

১। মেদিনীপুরের ইতিহাস—পৃঃ ৭৭, চতুর্থ খণ্ড, ত্রৈলোক্যনাথ পাল

জলপাইগুড়ি জিলায় বহুসংখ্যক রাজবংশীর বাস আছে। ইহারা [1]মোঙ্গলোদ্ভব জাতি; ইহার আর একটি শাখা 'দোবাসিয়া' আলিপুর দুয়ার অঞ্চলে বাস করে। অপদেবতায় বিশ্বাসী ও ধরমেশ পূজারী ওরাওঁ, [2]মোঙ্গলোদ্ভব মুর্মি, থাম্বু, লিম্বু, গুরাং, মংগর, মুণ্ডা ও সাঁওতালগণ শামসিং, মাটিয়ালি, লংকাপাড়া, হাসিমারা প্রভৃতি চা-বাগান অঞ্চলে রহিয়াছে। তিয়ার, ভূঞা, দোশাদ, মহলি, রাভা, লোহার ও [3]মোঙ্গলজাত মেচ্‌গণ জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে। লোহারদের পেশা লৌহকর্ম। ইহারা কিছু কিছু স্বর্ণকর্মও করিয়া থাকে। আলিপুরদুয়ার ও বক্সাদুয়ারে ভুটিয়া ও ভোটচীনজাত টোটোগণ হস্তাপাড়া, টোটোপাড়া প্রভৃতি স্থানে থাকে।

কুচবিহার জিলাব বিভিন্ন অঞ্চলে কোচ, পলিয়া, রাজবংশী, মুণ্ডা, নাগাশিয়া, হজাঙ্গ, চকমা, গারো, ভুটিয়া ভূমিজ প্রভৃতি ছড়াইয়া রহিয়াছে।

পশ্চিম দিনাজপুর জিলার বিভিন্ন স্থানে তুনিয়া, কেওট, হাড়ি, কুর্মি প্রভৃতি জাতি বাস করে। রায়গঞ্জ, কুমারগঞ্জ, ও বালুরঘাট অঞ্চলে কোচ, পলিয়া ও রাজবংশীদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই তিনটি সম্প্রদায়ের [4]দৈহিক গঠন হইতে মনে হয় ইহারা মোঙ্গলজাতির বংশধর। বাংলাদেশের এই [5]"রাজবংশী, পলিয়া, কোচ প্রভৃতি মোঙ্গলীয়রা হিমালয় বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে আসিয়া ঐতিহাসিক যুগেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।" এই জিলার গঙ্গারামপুর, হিলি, তপন অঞ্চলে ওরাওঁদের বাস রহিয়াছে।

রাজবংশী, তিয়ার, পলিয়া, মল্ল, পোদ, পৌণ্ড্র, বিঁদ, মুণ্ডা, মুন্দ্রা, মহলি, মালপাহাড়িয়া, ভূমিজ, চকমা, কোরা, লোধা, ওরাওঁ, সাঁওতালরা মালদহ জিলার বিভিন্ন স্থানে বাস করে। দিয়ারা থানায় অনেক চাঁই থাকে। পল্লী

---

1. There seems, however, to be little doubt that they are a Mangoloid race and entered Bengal from the east by the valley of the Brahmaputra. p. 34, Eastern Bengal and Assam Dist. Gazetteers—Jalpaiguri—1911.

2. The Murmis belong to a Mongolian or semi-Mongolian race. p. 41. Ibid.

3. The Meches are of Mongolian origin and are believed to be the western branch of the Kachari or Bado tribe. p. 36. Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, 1911.

4. The general appearance shows unmistakable signs of Mongolian strain. p. 68, Bengal Dist. Gazetteers (W. Dinajpur, 1965)—J. C. Sengupta

৫। বাঙালীর পরিচয়—পৃঃ ৩৮, অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংস্করণ

অঞ্চলের এই সকল আদিবাসীর মধ্যে রাজবংশীদের সংখ্যা অধিক। [1]পল্লী জনসংখ্যার শতকরা ২৪·০৭ ভাগই রাজবংশী। এই [2]রাজবংশীরা বাঙ্গাল নামে খ্যাত। ইহারা গ্রামের যে অঞ্চলে বাস করে তাহাকে বাঙ্গালপাড়া বলা হয়।

বীরভূম জিলায় মাল, বাওরী, হাড়ি, ডোম, বাগদী, সাঁওতাল, প্রভৃতি জাতির বাস রহিয়াছে। [3]বাওরী, হাড়ি, ডোম, বাগদী, সাঁওতাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতকে পালামৌ ও রামগড অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। হাড়িদের মধ্যে মেথর, কাহার, দাই, ভূঁইমালি—এই চারটি সম্প্রদায় আছে। বীরভূমের সাংগোরা বাজার অঞ্চলে সেটদের বাস। ময়ূরেশ্বর ও লাভপুর অঞ্চলে ভোল্লা জাতি বাস করে।

পুরুলিয়া জিলায় হো, কোরা (মুদিকোরা), লোধা (খরিয়া), মালপাহাড়িয়া, কুর্মি, মুন্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল বাস করে। ঝালদা, বাঘমুণ্ডি, বরাভূম, বান্দোয়ান, মানবাজার, হুরা, শালতোরা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে [4]সাঁওতাল, মালপাহাড়িয়া, হো, মুন্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি উপজাতি আদি-অষ্ট্রেলীয় পর্যায়ভুক্ত। অষ্ট্রেলীয়দের পূর্বোল্লিখিত দৈহিক গঠনের সঙ্গে ইহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে।

মালুয়া, ঢুলিয়া, মোলা, মল্লভূমিয়া, বাউরী ও বাগদী বাঁকুড়া জিলার নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। বাগদীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। [5]ইহারা অনার্য সম্ভূত জাতি এবং ইহার বংশোৎপত্তি সম্পর্কে নানা প্রকার উপকাহিনী প্রচলিত আছে। বাউরীদের মধ্যে গোবরিয়া, পাথুরিয়া, কাঠুরিয়া, মালুয়া, ঢুলিয়া, জেঠিয়া প্রভৃতি কতগুলি সম্প্রদায় রহিয়াছে। এই জিলার প্রায় সর্বত্রই

1. Sensus, 1961 W. Bengal (Malda), p. LVII (B. Roy)

2. Locally the Rajbanshis are known as Bangals and the part of the village in which they reside, as Bangalpara. p. LVII, Ibid,

3. Bengal Dist. Gazetteers, Birbhum—1910.

৪। বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে সাঁওতাল, মালপাহাড়িয়া, ভূমিজ প্রভৃতি যে সকল উপজাতি আছে তাহারাও এই আদি-অষ্ট্রেলীয় পর্যায়ভুক্ত। পৃঃ ৪৭, বাঙালীর পরিচয়—অধ্যাপক মীনেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংস্করণ।

5. The Bagdis are another caste of non-Aryan origin, who account for their genecies by a number of legends. p. 59, Bengal Dist. Gazetteers (Bankura)—1908.

কিছু কিছু সাঁওতাল আছে ; ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা বড়পাহাড়ী, মানসিং ও কুদ্রাসিনী।

বর্ধমান জিলার চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর, কুলটি প্রভৃতি অঞ্চল, আসানসোল, রানীগঞ্জ এলাকা এবং এই জিলার উত্তর ও দক্ষিণাংশের কতগুলি স্থানে কিছু কিছু তিয়ার, মাল, ডোম, হাড়ি, কেওরা, ওরাওঁ, সাঁওতাল প্রভৃতি বাস করে।

হুগলী জিলার নানা স্থানে হাড়ি, ডোম, দোসাদ, কৈবর্ত, কেওরা, পোদ, ভূমিজ, দোয়াই, বাউরী রাজবংশী, সাঁওতাল, মাল, বাগদী প্রভৃতি জাতি ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাগদীর সংখ্যা অধিক।

নদীয়া জিলার তেহাট্টা, দামুরহুদা অঞ্চলে কৈবর্ত, ঝালো, মালো ও বনগ্রাম অঞ্চলে বাগদীর বাস রহিয়াছে। এই বাগদীরা মাল সম্প্রদায়ের অংশ বিশেষ। [1]ওল্ডহাম সাহেবের মতে ইহারা ভূমিদাসরূপে আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুচি, পাটনী, রাজওয়ার, চামার, পোদ, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি বাস করে। ইহাদের মধ্যে কথকতা, বারোয়ারী পূজা ও মেলা প্রভৃতি বিশেষ প্রচলিত আছে।

চব্বিশ পরগণা জিলার দক্ষিণাঞ্চলে কৈবর্ত, ঝালো, মালো, মাল্লা, পাটনী, নমঃশূদ্র, মুণ্ডা ওরাওঁ, ঘাসি সম্প্রাদায়ের বসবাস রহিয়াছে। জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিয়ার, ধুনিয়া, কোনাই, লোহার রাজবংশী, মেথর, হাড়ি, পাসি ও চামার বাস করে। অন্যান্য জিলা হইতে এই জিলায় পোদ ও কাওরার সংখ্যা অধিক। [2] পোদ ও কাওরাদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে। পোদ চার প্রকার—মেছো পোদ, চাষী পোদ, তাঁতী পোদ, ভাস পোদ। সাগরদ্বীপে ভাস পোদদের সংখ্যা অধিক। কাওরার তিনটি উপসম্প্রদায়,—ছাহি কাওরা—ইহারা ঢোল বাজায়, মজুরের কাজ করে ও চৌকিদারী প্রভৃতি চাকুরী করে ; বাবুর্জী কাওরা ইউরোপীয়দের এবং খ্রীষ্টানদের বাড়ি রান্না প্রভৃতি কাজ করে ; হাড়ি কাওরা ঢোল বাজায় ও পাল্কী বহন করে।

হাওড়া জিলার বিভিন্ন স্থানে বাগদী, পোদ, তিয়ার, কাওরা এবং কিছু কিছু ওরাওঁ, সাঁওতাল বাউরী ও ডোম বসবাস করিতেছে। মেদিনীপুর জিলার

1. Mr. Oldham is of opinion that they are the section of Mal who accepted life and civilization in the cultivated country as serfs and co-religionists of the Aryans. p. 46, Bengal District Gazetteers-Nadia-1910, J. H. E. Garrett.

2. Bengal District Gazetteers, 1914-24-Parganas, L. S. S. O'Malley

খড়্গপুর, গরবেতা, বেলপাহাড়ী, জামবনী, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে হাড়ি, বাগদী, মাল, ওরাওঁ ও সাঁওতালদের বাস রহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জিলার সাগরদীঘি, নবগ্রাম, আসানপুর ও মিরজাপুর অঞ্চলে সাঁওতালদের বাস আছে। জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে ওরাওঁ, মুণ্ডা, কোরা বাস করে। এই জিলার নানা স্থানে বহু সংখ্যক বাগদী থাকে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তও ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে [1]Cast Government (জাতিগত শাসনব্যবস্থা) প্রচলিত ছিল। এই রীতি অনুযায়ী পুরুষানুক্রমে গ্রামের কোন বিশেষ পরিবার সেই অঞ্চলের উপর আধিপত্য করিতেন। অধিপতিকে মণ্ডল বলা হইত। জনগণকে সামাজিক ও আরো নানা বিষয়ে মণ্ডলের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইত। অপরাধের জন্য মণ্ডল যে শাস্তি বিধান করিতেন তাহা অবশ্য পালনীয় ছিল। অন্যথায় অপরাধী জাতিচ্যুত হইত। মুর্শিদাবাদের নানা স্থানে পোদ ও চাঁই ছড়াইয়া রহিয়াছে। জিলার মাণিকনগর, বেলডঙ্গা, কালীতলা, দয়ানগর প্রভৃতি স্থানে অনেক মুচির বাস আছে।

উপজাতীয়দের মধ্যে মনসা, ভাদু, মানসিং, বড়পাহাড়িয়া, কুদ্রা প্রভৃতি দেবদেবী, বৃক্ষ, শিলা, এবং জাতির প্রতীক (totem) রূপে পশু-পক্ষীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

অনিষ্ট-বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং সমৃদ্ধি ও মঙ্গল লাভের জন্য উপজাতীয়দের মধ্যে নানা দেবদেবী কল্পিত হইয়াছে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই সকল দেবদেবীর পূজা করা হয়। বীরভূমের সাংগোরা অঞ্চলের লেটদের মধ্যে ধরম ও মনসা পূজার বিশেষ প্রচলন রহিয়াছে। মনসা সর্পের দেবী। নদীয়া জিলার রাজওয়ার, চামার, পোদ, এবং বাঁকুড়া জিলার বাউরীদের প্রধান দেবদেবীর মধ্যে রহিয়াছেন মনসা ও ধরমরাজ। বাঁকুড়া জিলার বাউরী, বীরভূম ও মেদিনীপুরের সাঁওতাল, ডোম, মহালী, বাউরী লোধাদের বিশেষ বিশেষ দেবতা মানসিং, কুদ্রা, বড়পাহাড়ী ও বড়াম। মানসিং ও কুদ্রা অনিষ্টকারী দেবতা। পৌষ সংক্রান্তিতে গাছের তলায় শিলাখণ্ডে বড়াম দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বড়ামের পূজাস্থানে অনেক সময় হাতী ঘোড়ার মূর্তি থাকে। এই পূজা উপলক্ষে আদিবাসী নর-নারীর নৃত্য-গীত বিশেষ রীতি বলিয়া গৃহীত। বড়াম পূজায় ছাগ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি পশু বলির প্রথা চলিত। বড়াম পশুর দেবতা।

1. Bengal Dist. Gazetteers—Murshidabad, 1914—L. S. S. O' Malley

মেদিনীপুরের ঘাটাল ও কাঁথি অঞ্চলে বাঘ ও কুমীরের দেবতা রূপে কালুরায়ের পূজা প্রচলিত। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের পল্লীবাসী মৎস্যজীবী, কাঠুরিয়া ও মৌলেদের মধ্যে ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের দেবতা রূপে ব্যাঘ্র-বাহন দক্ষিণরায়ের পূজার প্রচলন রহিয়াছে। এই দেবতার হাতে তীর, ধনুক, ঢাল, তলোয়ার ও টাঙ্গী থাকে। মূর্তির পার্শ্বে একটি মাটির কুমীরও প্রস্তুত করা হয়। এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ফাঁকা জায়গায় গাছের নীচে। ইহাতে কোথাও কোথাও পশু বলির রীতি আছে। এই উপলক্ষে পূজার দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহের জন্য 'মাঙন-প্রথা' প্রচলিত। ছড়া কাটিয়া পাড়ায় পাড়ায় মাঙন চলে।

চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের মধুজীবী (মৌলে), মাঝি-মাল্লার ও শিকারীদের মধ্যে বনবিবির পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বনবিবিরও বাহন ব্যাঘ্র। বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে পল্লী-বাসীদের মধ্যে পালাগানও পরিবেশিত হয়। এই জিলার কৈবর্ত, ঝালো, মালো প্রভৃতি মৎস্যজীবীরা মাকাল ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে। মৎস্য লাভের কামনায় জলাশয়ের ধারে মাটির ছোট ছোট স্তূপ নির্মাণ করিয়া ধানদূর্বা, সিন্দুর, ফুল-ফল, তুলসী প্রভৃতি উপকরণ দিয়া এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নদীয়া, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্তানের মঙ্গলের জন্য পাঁচুঠাকুর অথবা বাবাঠাকুরের পূজা করা হয়। দাঁত বাহির করা লম্বাচুলযুক্ত পুরুষাকৃতির মূর্তি পাঁচুঠাকুর রূপে পূজিত হয়। শিশুদের পুঁয়ে ধরা প্রভৃতি রোগমুক্তির কামনা লইয়া এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। চব্বিশ পরগণার গঙ্গার নিকটবর্তী কাঁচড়া পাড়া প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঢেলাই দেবতা নামে বৃক্ষ পূজার রীতি প্রচলিত। এই পূজার উদ্দেশ্য শিশুর মঙ্গলকামনা করা ও কান্নাকাটি থামাইয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলা। এই পূজার উপকরণ ফল ও মাটির ঢেলা। পুরুলিয়া জিলার গড়জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের কুর্মী-মাহাতো এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জিলার উপজাতীয়দের মধ্যে শস্যোৎপাদন ও ভ্রাতাবন্ধুদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র মাসে করম পূজা করা হয়। ইহাতে করম দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক গীত ও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্য-গীতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায় যোগদান করে। শাল গাছের ডাল পুঁতিয়া সেই ডালকেই করম দেবতা বলিয়া পূজা করা হয়। এই পূজায় নানা প্রকার অঙ্কুরিত শস্যের ডালি দেওয়া হইয়া থাকে। করমের ব্রতকথাও প্রচলিত আছে।

বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জিলার উপজাতীয়দের মধ্যে ঘাঁটু-পূজা প্রচলিত। ঘাঁটু চর্ম রোগের দেবতা। রাস্তার তেমাথায় বা জলের ধারে এই পূজার ব্যবস্থা হয়। ভাঙা হাঁড়ি উলটাইয়া দিয়া তাহার উপর গোময় দ্বারা ঘাঁটুর মূর্তি প্রস্তুত করা হয়। পূজার শেষে হাঁড়িসহ ঘাঁটুর মূর্তি লাঠি দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ওলাউঠার দেবতা ওলাবিবি এবং হাম বসন্তের দেবতা ঝোলাবিবি। এই দুই লৌকিক দেবতার পূজা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। এই দুই দেবতার পূজার সময় মূল দেবীর পার্শ্বে বাহড়বিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, ঝেটুনেবিবি ও আসানবিবির মূর্তিও রক্ষিত হয়। চব্বিশ পরগণা (জয়নগর, কাকদ্বীপ) ও হাওড়া জিলায় এই দেবীর খ্যাতি অধিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে ওলাইবিবির পূজা প্রচলিত। শনি বা মঙ্গলবারে এই দেবীর পূজা প্রশস্ত। বাঁকুড়া জিলার ছাতনা, মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ী, ঘাঘরা ও গড়বেতা অঞ্চলের উপজাতীয়দের বিপদবারণ ও গ্রাম রক্ষণের দেবী সিনি। প্রস্তরখণ্ডে এই দেবতার পূজা হয়। বৃক্ষতল পূজার প্রশস্ত স্থান। এই পূজায় পশু বলির বিধান আছে। ইহাতে দেবী মাহাত্ম্যমূলক গীত-নৃত্যের আয়োজন করা হয়। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জিলায় ভাদু উৎসব বিশেষ প্রচলিত। ভাদ্র মাসে ভাদু উদ্‌যাপিত হয়। ইহাতে নৃত্য গীতের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। একমাস ভাদু পূজার শেষে সংক্রান্তির দিনে ইহা বিসর্জিত হয়। বাউরী, বাগদী, কুর্মী-মাহাতো প্রভৃতি সাম্প্রদায়ের মধ্যে ভাদুর প্রচলন অধিক।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের উত্তরাংশের আদিবাসীদের মধ্যে কিছু টুসুর প্রচলন থাকিলেও পুরুলিয়া জিলা ইহার প্রধান ক্ষেত্র। পৌষমাসে টুসু পূজা উদ্‌যাপিত হয়। ইহাতে মেয়েদের নৃত্য-গীতের প্রাধান্য রহিয়াছে। টুসু অবলম্বনে মেয়েদের দ্বন্দ্বমূলক গীতিরও প্রচলন রহিয়াছে। এই উপলক্ষে কেবল যে টুসু দেবতা সম্পর্কীয় গান গীত হয় তাহা নহে, সাংসারিক বা সামাজিক নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত গীতও টুসু উৎসবে গাওয়া হইয়া থাকে। ভূমিজ, লোধা ও সাঁওতালদের মধ্যে লৌকিক দেবতা ভৈরবের পূজা হইয়া থাকে। মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাঁকুড়া ও হুগলী জিলার বনাঞ্চলের উপজাতীয়রা এই উগ্রদেবতার বিশেষ ভক্ত। ব্যাঘ্র ও হস্তী এই দেবতার প্রতীকরূপে পূজিত হয়।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলি উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙ্গালীর আচার, ব্যবহার, ধর্মাচরণ, শিক্ষারীতি ও ভাষা ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতেছেন।

ইহাদের মধ্যে অনেকে ঐগুলি এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে তাহাদের সঙ্গে উন্নত বাঙ্গালীর পার্থক্য সহজে ধরা যায় না। [১]"বিজ্ঞান-বিদ্যা যাহাই বলুক, মানুষ তাহার সংস্কারকে এবং বিশ্বাসকে আপনার ধাতুর সহিত আপনার প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস করিয়া বাঁধিয়া লয় এবং তদনুসারে কর্ম করিয়া থাকে।" সুতরাং মানবজীবনের নিয়ামক সংস্কার-বিশ্বাস অনুযায়ী উপ-জাতীয়দের অনেকে এখনো তাহাদের সম্প্রদায়গত প্রাচীন রীতির অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সাঁওতালদের মত বাউরীদের মধ্যে বিবাহের পূর্বে মহুয়া গাছের সঙ্গে কন্যার একবার নকল বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। বাউরী সম্প্রদায়ের টোটেম এর প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। [২]"পিঠের কিছু অংশ লাল একরকম বক ও কুকুর তাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।" এইরূপ চিহ্নযুক্ত প্রাণীর সঙ্গে তাহাদের টোটেমের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত বাঙ্গালীজাতির উদ্ভব ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা, বাঙ্গালীর ভাষা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতীয় সম্প্রদায় ও তাহাদের দেবোৎসবের কথা বলা হইল। বাঙ্গালীর এইসব ধর্মীয় দেবোৎসব হইতেই লোকনাট্যের উন্মেষ হয়।

ধর্মোৎসব হইতে যেমন যাত্রার উদ্ভব তেমনি পরবর্তীকালেও ধর্মোৎসবেই ইহা অধিক অনুষ্ঠিত হইত। আর এই অনুষ্ঠানের সুবিধার জন্য সমর্থদের গৃহে দেব-মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির নির্মিত হইত। প্রধানত ধর্মানুষ্ঠানে অভিনীত হইত বলিয়া ভক্তিভাবাত্মক ও দেবমাহাত্ম্যমূলক কাহিনী দীর্ঘকাল যাবৎ যাত্রার প্রধান অবলম্বন ছিল।

যাত্রার উদ্ভব

অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও মানুষ ধর্মোৎসবে নৃত্য-গীতাদির সাহায্যে সাধারণের মধ্যে ধর্মমাহাত্ম্য প্রচার করিত। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে শোভাযাত্রার (going in a procession) ব্যবস্থাও হইত। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, মাঘীসপ্তমীর স্নানযাত্রা, দশহরা স্নানযাত্রা প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য বহন

১। যজ্ঞকথা যজ্ঞ—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, পৃঃ ৪৯৩, তৃতীয় খণ্ড, রামেন্দ্র রচনাবলী, ১৩৬৬,

২। বাঁকুড়ার মন্দির, পৃঃ ৩৬—অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আই. এ. এস.), ১৩৭১

করিতেছে। এই শোভাযাত্রায় নৃত্য-গীতযোগে দেবমাহাত্ম্য কীর্তিত হইত। প্রাচীনকালে এই [১]জঙ্গম উৎসবকে বলিত যাত্রা। বস্তুত যাত্রাশব্দটি গত্যর্থক। গমনার্থক 'যা' ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি [যা+ত্র (ভাবে)+আ (স্ত্রীং)]। [২]"ক্রমে ঐ দেবলীলায় গমন ব্যাপার এতই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে লোকে সাধারণে প্রদর্শনাভিলাষী না হইয়া একস্থানে বসিয়াই তদ্ব্যাপার প্রকটন করিল।" ইহাতে পরিক্রমা বন্ধ হইল বটে কিন্তু এই ধর্মানুষ্ঠান যাত্রা নামেই খ্যাত থাকিল। পরবর্তীকালে এই প্রকার ধর্মোৎসবের নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের সঙ্গে অভিনয়ের উপাদান সংযোজিত হওয়ায় যাত্রাপালার উদ্ভব হয়। যাত্রা সম্পর্কে বিশ্বকোষেও বলা হইয়াছে—[৩]"ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সেই দেব চরিত্রের অলৌকিক ঘটনা পরম্পরা স্মরণ রাখিবার জন্য এক একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গীত-বাদ্যাদিযোগে ঐ সকল লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত।"

বাংলাদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা লৌকিক দেবতার উৎসবকে 'যাত' বলে। 'যাত' শব্দটিও গমনার্থক (যা+ত)। 'যাত' শব্দের পরিবর্তিত রূপ 'যাত্রা' হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু 'যাত্রা' শব্দটির পরিবর্তিত রূপ যে 'যাত' নহে ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

গ্রহগণের মধ্যে প্রধান সূর্য; ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ইহা নানাভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এই জন্যই সূর্যোপাসনার ব্যাপকতা অধিক। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন যাত্রা উপলক্ষে কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত নৃত্যগীতযুক্ত আড়ম্বর পূর্ণ উৎসব সুপ্রাচীন। এই সূর্য-যাত্রা উৎসব হইতেও যাত্রা কথাটি প্রবর্তিত হইতে পারে। [৪]"যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।" সংস্কৃত বিশ্বকোষে যাত্রা সম্পর্কে বলা হইয়াছে—'যাত্রাতু যাপনোপায়েগতৌ দেবার্চনোৎসবে'। মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে দেবধর্মোৎসব হইতেই যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যাত্রার প্রচলন ছিল। দেবী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ-পৃঃ ১৭, ডক্টর সুকুমার সেন, ১৯৫৯

২। বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড, ১৩০৯

৩। ঐ

৪। বাংলানাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—পৃঃ ৬৯, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬০

ভগবতীর উদ্দেশে প্রতি মাসেই যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এই জাতীয় ষোড়শ প্রকার যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায় বামকেশ্বর তন্ত্রে,—

[1]বৈশাখে মঞ্চযাত্রা চ চন্দনাগুরু কল্পনা।
জ্যৈষ্ঠে মহাস্নানযাত্রা অম্বুবাচীদিনত্রয়ম্॥
আষাঢ়ে রথযাত্রা চ দিগ্‌দিন ব্যাপিনীপরা।
শ্রাবণে জলযাত্রা চ বস্ত্রভূষণ চামরৈঃ॥
ভাদ্রে যাত্রা ধুননাখ্যা চণ্ডিকায়া দিনত্রয়ম্।
আশ্বিনে চ মহাপূজা যাত্রা যজ্ঞবলিপ্রিয়া॥
কার্তিকে দীপযাত্রা চ নবান্নম্ অগ্রহায়ণে।
পৌষে চাঙ্গরাগযাত্রা বস্ত্রালংকার ভূষণৈঃ॥
মাঘেমাসি মহাদেবী রটন্তী চ চতুর্দশী।
দোলকেলিঃ ফাল্গুনে চ চৈত্রে যাত্রা চতুষ্টয়ী॥
দূতী যাত্রা রাসযাত্রা বাসন্তী নীল যাত্রিকা।
এবং যাত্রা ময়া প্রোক্তা ষোড়শী ভবমোচনী॥

বৈশাখে মঞ্চযাত্রা, চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে মহাস্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে জলযাত্রা, ভাদ্রে ধুননযাত্রা, আশ্বিনে মহাপূজাযাত্রা, কার্তিকে দীপযাত্রা, অগ্রহায়ণে নবান্ন যাত্রা, পৌষে অঙ্গরাগ যাত্রা, মাঘে মহাদেবীযাত্রা, ফাল্গুনে দোলযাত্রা, চৈত্রে দূতীযাত্রা, রাসযাত্রা, বাসন্তী যাত্রা ও নীলযাত্রা—এই ষোলপ্রকার যাত্রা ভববন্ধন মোচনের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

স্কন্দ পুরাণেও একটি দীর্ঘ তালিকায় মুক্তিপ্রদায়িনী দ্বাদশ প্রকার যাত্রার উল্লেখ করা হইয়াছে—

দ্বাদশৈতাঃ মহাযাত্রা গুণ্ডিকাখ্যাস্তু পাবকাঃ।
একৈকা মুক্তিদা সর্বাঃ ধর্মকামার্থ সাধনাঃ॥

মুক্তিলাভের জন্য প্রতিমাসে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে যে উৎসবাদি উদ্‌যাপিত হইত তাহাও যাত্রানামে খ্যাত। ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন এই প্রকার দ্বাদশ যাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন,—

[2]বৈশাখাদিষু মাসেষু যাত্রাপূজা বিধিংমুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবস্য যথাবদ্বক্তু মর্হসি॥

১। বামকেশ্বর তন্ত্র—১—৫৪ পটল হইতে বিশ্বকোষের ১৫শ খণ্ডে উদ্ধৃত (১৩০৯)

২। যাত্রাতত্ত্বম্—রঘুনন্দন কৃত

বৈশাখাদিষু মাসেষু দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
যাযা দ্বাদশযাত্রা স্যুস্তাস্তা বক্ষ্যামিতে শৃণু॥
বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নাপন্যুদীরিতা।
আষাঢ়ে রথযাত্রাস্যাৎ শ্রাবণে শায়নী তথা॥
ভাদ্রে দক্ষিণ পার্শ্বিয়া আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা।
উত্থানী কার্তিকেমাসি ছাদনী মার্গশীর্ষকে॥
পৌষে পুষ্যাভিষেকঃ স্যান্মাঘেশাল্যোদনীতথা।
ফাল্গুনে দোলযাত্রাস্যাচ্চৈত্রে মদনভঞ্জিকা॥
একৈকমুক্তিদা সর্বা ধর্মকামার্থ সাধনা।

উল্লিখিত দ্বাদশটি যাত্রা হইতেছে—বৈশাখে চন্দনী, জ্যৈষ্ঠে স্নাপনী, আষাঢ়ে রথ, শ্রাবণে শয়নী, ভাদ্রে দক্ষিণ পার্শ্বিয়া, আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা, কার্তিকে উত্থানী, অগ্রহায়ণে ছাদনী, পৌষে পুষ্যাভিষেক, মাঘে শাল্যোদনী, ফাল্গুনে দোল ও চৈত্রে মদনভঞ্জিকা। যাত্রা অথবা উৎসব উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য নাট্যরচনারীতিও প্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত। কালপ্রিয়নাথের যাত্রা উপলক্ষে ভবভূতি [১]উত্তররাম চরিত ও [২]মালতীমাধব নাটকদ্বয় রচনা করেন। কালিদাস [৩]মালবিকাগ্নিমিত্র ও শ্রীহর্ষ [৪]রত্নাবলী নাটক বসন্তোৎসবে অভিনীত হইবার জন্য রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি শাস্ত্রানুযায়ী জয়বিজয়-কাহিনী অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে। বাংলায়ও দেব-ধর্মোৎসবে অভিনয় করিবার জন্যই যাত্রানাট্য রচিত হইতে আরম্ভ করে—ইহা দ্বিধাহীনভাবে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকারের যাত্রা প্রচলিত রহিয়াছে। [৫]হিন্দু রাজাদিগের সময় হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র যাত্রার সমাদর দেখা যায়।

১। সূত্রধার—অদ্যখলু ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়াম্ আর্যমিশ্রাণ্ বিজ্ঞাপয়ামি। ১ম অঙ্ক—উত্তররামচরিত

২। সূত্রধার—সন্নিপতিতশ্চ ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রাপ্রসঙ্গেন নানাদিগন্ত বাস্তব্যো-জনঃ। ১ম অঙ্ক—মালতীমাধব

৩। সূত্রধার—কালিদাসগ্রথিতবস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রয়োক্তব্যমিতি। ১ম অঙ্ক, মালবিকাগ্নিমিত্র

৪। সূত্রধার—অদ্যাহংবসন্তোৎসবে…শ্রীহর্ষদেবেন অপূর্ববস্তুরচনালংকৃতা রত্নাবলীনাম নাটিকা-কৃতা—১মঅঙ্ক, রত্নাবলী

৫। বিশ্বকোষ—১৫শ খণ্ড (১৩০৯)

দেশভেদে ইহাতে নানা রীতির প্রবর্তন হয়। যাত্রাপ্রয়োগে প্রথম দিকে সকলে সাজসজ্জা করিয়া আসরে বসিত এবং প্রয়োজন অনুসারে উঠিয়া যে যাহার অভিনয়, নাচ, গান করিত। হিন্দুস্থানী যাত্রায় এখনো এই রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। পরবর্তীকালে উপস্থাপনা রীতির পরিবর্তন হওয়ায় ইহাতে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অধিকারী ও দোহারগণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আসরেই বসিয়া থাকেন। মণিপুরে কৃষ্ণযাত্রার বিশেষ প্রচলন আছে। রাজবংশেও কৃষ্ণযাত্রা অভিনয়ের প্রথা রহিয়াছে। [1]"মণিপুর রাজবংশে স্ব স্ব পরিবার মধ্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচন করিয়া কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত রাসযাত্রার অভিনয় করিবার চিরপদ্ধতি প্রচলিত আছে।" ওরাওঁদের মধ্যে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন উপলক্ষ্যে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের নৃত্যানুষ্ঠান যাত (যাত্রা) নামে খ্যাত। এই সামাজিক অনুষ্ঠানে নূতন সাজে সজ্জিত যুবক-যুবতীরা বহুদূর হইতে শোভাযাত্রা করিয়া যাত্রাস্থানে আসে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহাদের নৃত্যগীত চলে। [2]"যে গ্রামে যাত্রার অনুষ্ঠান হয় সেই গ্রামের বর্ষীয়সী কয়েকজন মহিলা মঙ্গলকলস (করুসা) মাথায় করিয়া সেইখানে উপস্থিত থাকে। কোন কোন সময় তাহারাও ঐ ভাবে নৃত্যে যোগদান করে।"

মধ্যযুগে মালবে কোত্তর বংশীয় জনৈক রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত কথাকলি যাত্রায় নামপুতিড়ি ব্রাহ্মণগণ রামনাট্য অভিনয় করিতেন। এই অভিনয়ের সমস্ত গান আসরে উপস্থিত স্বতন্ত্র ব্যক্তি দ্বারা গীত হইত। বিশ্বকোষ হইতে জানা যায় যে এই গায়ক 'ভাগবতর' নামে অভিহিত হইতেন। দাক্ষিণাত্যে 'ইড়ামরু কলি' নামক একপ্রকার যাত্রার প্রচলন আছে। ইহাতে [3]"এক একজন ব্যক্তি রঙ্গস্থলে আসিয়া এক একটি অংশ মাত্র অভিনয় করিয়া থাকে।" একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি আসরে অভিনয় করে না। ত্রিবাঙ্কুরে নামপুতিড়ি ব্রাহ্মণদের বহু সম্প্রদায় সামাজিক ও ধর্মনাট্য অভিনয় করিয়া থাকেন। [4]"ঐ অভিনয় ব্যাপার যাত্রাকলি ও কথাকলি ভেদে দ্বিবিধ।"

নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ-যাত্রা ও ভৈরব-যাত্রার প্রচলন আছে। ভৈরব যাত্রায়

১। বিশ্বকোষ—১৫শ খণ্ড (১৩০৯)

২। বাংলানাট্য সাহিত্যের ইতিহাস-পৃঃ ৬৭, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬০

৩।৪। —বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড (১৩০৯)

ভৈরব-ভৈরবী লইয়া নগর পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমাশেষে [১]"ভৈরব মন্দিরে কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত করিয়া লিঙ্গযাত্রা সমাহিত হয়, এবং মহিষাদি বলি সহকারে পূজাদি দেওয়া হইয়া থাকে।" নেপালী যাত্রার সঙ্গে বাংলা যাত্রার মিল ছিল। সেইজন্যই হয়ত বাংলার 'গোপীচন্দ্র নাটক' সপ্তদশ শতকে নেপালে গিয়া যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও যত্নে রক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে নেপাল হইতে ঐ নাটকটি উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

যাত্রার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-কথার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই এখানে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব শাখার কৃষ্ণ-কাহিনী অষ্টম শতাব্দী হইতে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং পরম সৌগত পাল রাজাদের বৈষ্ণব মন্ত্রিগণের প্রভাব এবং শৈবপন্থী সেন রাজাদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে উদার দৃষ্টির জন্য ইহা আরো প্রসার লাভ করে। লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠানে শিবের আরাধনা যথেষ্ট হইলেও কৃষ্ণ-ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না বলিয়া মনে হয়। প্রথমে কৃষ্ণের সঙ্গে নারী-শক্তি রাধার সংযোগ ছিল না। কারণ বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে কৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেমলীলার উল্লেখ থাকিলেও রাধার নাম পাওয়া যায় না। [২]ভোজবর্মার বেলাবলিপিতেও কৃষ্ণ গোপীদের লীলার কথা আছে, কিন্তু রাধার উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে সাতবাহন হালের [৩]গাথাসপ্তশতীতে এবং [৪] কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনো হইতে পারে, শৈবগণ যেমন পুরুষ-শিবের সঙ্গে প্রকৃতি-শক্তির আরাধনা করিত এবং সহজযানী বৌদ্ধরা যেমন করুণার (পুরুষ) সঙ্গে শূন্যের (প্রকৃতি) সংযোগে সাধনা করিত তেমনি এই রীতির প্রভাবে বৈষ্ণবগণও আরাধনার ক্ষেত্রে কৃষ্ণের পার্শ্বে গোপীগণের মধ্য হইতে নারী শক্তি রাধার সৃষ্টি করিল।

১। বিশ্বকোষ—১৫শ খণ্ড (১৩০৯)

২। বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব পৃ-৪৬২, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৫৯

৩। মুহমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো। এত্তাণং বল্লবীণং অণ্ণাণংবি গোরঅং হরসি॥ ১। ৮৯—গাহা-সত্তসঈ, সং—ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৫৬

৪। ······ধেনুদুগ্ধকলসানাদায় গোপোগৃহং
দুগ্ধেবস্কন্নিনীকূলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্তু তু।
ইত্যন্ত ব্যপদেশে গুপ্ত হৃদয়ঃ কুর্বণ বিবিক্তং ব্রজং
দেবং কারণ নন্দ সুন্দরশিরং কৃষ্ণস্যমন্মাতুবঃ॥—৪১, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়।

[১]শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের রাসলীলা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে গোপীগণের মধ্যে একজন কৃষ্ণের প্রিয়তমা ছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণপ্রেমলীলায় কবিগণ কর্তৃক সেই অনির্দিষ্ট নারী রাধায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। বস্তুত রাধা [২]"কবিমানসধৃত নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ।" এইভাবে কৃষ্ণ-গোপী-প্রেমকথায় কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম অবলম্বিত হইল এবং রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম অবলম্বনে বহুগীত রচনা হইতে আরম্ভ করায় ইহা লোকায়ত হইয়া উঠিল। রাধাকৃষ্ণ প্রেম অবলম্বনে [৩]উমাপতিধর, [৪]শরণ, [৫]শতানন্দ, [৬]রূপদেব, [৭]আচার্য গোপীক প্রমুখ এবং অজ্ঞাতনামা [৮]কবিরা বহুপদ রচনা করিয়াছেন। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে রাধাকৃষ্ণের অনেক পদ রহিয়াছে। জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দ রচিত হইবার পূর্বেই ইহা সঙ্কলিত হয়। কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় [৯]সংকলনটি দশম শতকের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। গাথা সপ্তশতী-রচনার সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলেও রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ কবি গোবর্ধনাচার্যের গাথা সপ্তশতীর অনুকরণে রচিত 'আর্যাসপ্তশতী হইতে বলা যায়, গীতগোবিন্দের পূর্বেই ইহার রচনাকাল। সুতরাং গীত-গোবিন্দের মূল বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণপ্রেম জয়দেবের নূতন সৃষ্ট নহে। গীত-গোবিন্দ রচিত হইবার পূর্বে রাধা কৃষ্ণের প্রেম-কথা লইয়া যে সকল ছোট ছোট পদ লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় তাহার পূর্ণতা সাধন করেন। ঐ সময় রাজসভা এবং পণ্ডিত সমাজ লোকায়ত ভাষার তেমন সমাদর করিতেন না ; ইহা

১। অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। ১০।২৪।২৪—শ্রীমদ্‌ভাগবৎ

২। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে—পৃঃ ১৭৫, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৫৯

৩। গর্বোদ্ভেদকতাবহেল বিনয়শ্রী ভাজিরাধাননে সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তিপতিতাঃ কংসদ্বিষোদৃষ্টয়ঃ। হরিক্রীড়া। ৩। উমাপতিধর—সদুক্তিকর্ণামৃত, ১ম খণ্ড, সঃ—শ্রীধর দাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯১২।

৪। রাধাং চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতানুতাপঃ স্মরন্। উৎকণ্ঠ। ২। শরণ ঐ

৫। রাধায়া সুচিরংজয়ন্তি গগনে বন্ধাঃ করভ্রান্তয়ঃ। গোবর্ধনোদ্ধার। ৩। শতানন্দ—ঐ

৬। স্মিত শবলিতরাধামাধবালোকিতানি। হরিক্রীড়া। ১। রূপদেব ঐ

৭। রাধাপ্রাঙ্গণ কোণ কেলিটিপিক্রোড়ে গতা শর্বরী। হরিক্রীড়া। ৫। গোপীক ঐ

৮। উদ্‌গীতং গুরু বাষ্পগদ্‌গদগলত্তারস্বরং রাধয়া। গীত। ৪। অজ্ঞাতনামা ঐ
যে বা শৈশব চাপল ব্যতিকরা রাধাস্তুবক্ষোন্মুখাঃ—গীত। ৫। অজ্ঞাতনামা ঐ

৯। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে—পৃঃ ১২৭, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৭০

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাই কাব্য রচনায় জয়দেবকে সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। লোকায়ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত 'গীত-গোবিন্দ' তৎকালীন গীতিনাট্যের পরিচয় বহন করিতেছে। [১]"গীতগোবিন্দ আসলে গীতিনাট্য।" পরবর্তীকালে ষোড়শ শতকে লোকায়ত বিষয়বস্তু লইয়া সংস্কৃত-পণ্ডিত লোকভাষাকে বাদ দিয়া সংস্কৃত প্রীতির জন্য সংস্কৃতেই নাট্য রচনা করিযাছেন। রূপ গোস্বামীকৃত 'দান কেলি কৌমুদী' নাটকে ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

গীতগোবিন্দের নাট্য প্রকৃতি

গীতগোবিন্দ কাব্য ও নাটকের গঙ্গাযমুনা-সংগম। এই কারণেই জন-গণের রসতৃষ্ণা নিবারণে ইহা অস্বাভাবিক সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই নাট্য কাব্যে যে রচনা রীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা ভরতমুনির নাট্য-শাস্ত্রশাসিত নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে ; বস্তুত গীত গোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায রচিত হইলেও ইহাতে রাধাকৃষ্ণ-কথা অবলম্বনে রচিত এবং নাট্যনির্দেশ, মন্তব্য, আবৃত্তি, গীতি ও নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত তৎকালীন লোকনাট্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এমনও হইতে পারে যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লইয়া জনগণের মধ্যে যে যাত্রা বা লোকনাট্য পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল দরবারী কবি জযদেব তাহাই রাজরুচি অনুযায়ী মার্জিত করিয়া সংস্কৃতে পরিবেশন করিয়াছেন। গীতগোতিন্দ বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত নাটকীয রূপ ফুটিয়া উঠে।

শ্রীগীতগোবিন্দ

(গীতিনাট্য)

প্রথম সর্গ—সামোদ-দামোদর

প্রস্তাবনা—

বিষয়—রাধা-কৃষ্ণের নিজন কেলি—রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি রহ কেলয়ঃ

(শ্লোক ১)

রচনা—কবি জয়দেব—বাগ্‌দেবতা ক্ষমাপতিঃ (২-৪)

স্থান—যমুনাকূলে পথিপার্শ্বস্থ কুঞ্জকানন- -প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং যমুনাকূলে। (১)

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ পৃঃ ৪২, ডক্টর সুকুমার সেন, ১৩৫৯

কাল—বর্ষাকালীন রাত্রি—মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামা

তমালদ্রুমৈর্নক্তং (১)

দেববন্দনা ও মঙ্গলাচরণ—মঙ্গলসমুজ্জ্বলগীতি (২৫)

গীতি। ১। মালব-রাগ, রূপকতাল (ধ্রুবা—জয়জগদীশ হরে)

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি দেবং·· কৃষ্ণায়তুভ্যং নমঃ॥ (৫-১৬)

গীতি। ২। গুর্জরীরাগ, নিঃসারতাল (ধ্রুবা—জয়জয়দেব হরে)

শ্রিতকমলাকুচ মণ্ডলধৃতকুণ্ডল···অনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ॥ (১৭-২৬)

নাট্যারম্ভ

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—বসন্তে বাসন্তী···উচে সহচরী॥ (২৭)]

সখী—(রাধাকে)—গীতি। ৩। বসন্তরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—বিহরতি হরি রিহ · বিরহিজনস্য দুরন্তে)

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমলমলয়সমীরে

······যমুনাজলপূতে। (২৮—৩৪)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেব ভণিতম্ ··মদনবিকারম্। (৩৫)

দরবিদলিতমল্লিবল্লীচঞ্চৎপরাগ

······সরোল্লাসৈরমী বাসরাঃ॥ (৩৬—৩৮)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—অনেকনারী···পুনরাহ রাধিকাম্। (৩৯)]

সখী—গীতি। ৪। রামকিরীরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—হরিরিহ···বিলসতি কেলিপুরে)

চন্দন চর্চ্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী

···অনুগচ্ছতি বামাম্॥ (৪০—৪৬)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবভণিতম্···হরিঃ ক্রীড়তি (৪৭—৪৮)

অধিকারীর মঙ্গলগীত—রাসোল্লাস ভরেণ · হরিঃ পাতুঃ বঃ॥ (৪৯)

দ্বিতীয় সর্গ—অক্লেশ-কেশব

স্থান—ভ্রমরগুঞ্জিত লতাকুঞ্জ—লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলীমুখর-

শিখরলীনা (১)

কাল—রাত্রি

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—বিহরতি বনে···রহঃ সখীম্॥ (১)]

রাধা—(সখীকে) গীতি। ৫। গুর্জরীরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—রাসে হরিমিহ…কৃতপরিহাসম্।) (২)

সঞ্চরদধর সুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্

…মনসা রময়ন্তম্॥ (১—৮)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেব ভণিতম্…পুণ্যবতামনুরূপম্॥ (৯)

রাধা—গণয়তি গুণগ্রামং…করোমি কিম্॥ (১০)

গীতি। ৬। মালবরাগ, একতালীতাল

(ধ্রুবা—সখিহে কেশিমথনমুদারম্…সবিকারম্)

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহংগতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্

…মধুসূদনমুদিত-মনোজম্॥ (১১—১৭)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেব ভণিতম্ বিতনোতু সলীলম্॥ (১৮)

রাধা—হস্তস্রস্ত-বিলাসবংশম্ সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি॥ (১৯—২০)

অধিকারীর মঙ্গলগীতি—সাকূতস্মিতমাকুলাকুল…ক্লেশং নবঃ কেশবঃ॥ (২১)

তৃতীয় সর্গ—মুগ্ধমধুসূদন

স্থান—যমুনাতীরবর্তী কুঞ্জ—কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে। (২)

কাল—রাত্রি

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্

…বিষসাদ মাধবঃ॥ (১—২)]

কৃষ্ণ—(স্বগত) গীতি। ৭। গুর্জরীরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—হরিহরি গতা সা কুপিতেব।)

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন

…দেহিসুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি॥ (৩—৯)

অধিকারীর মন্তব্য—বর্ণিতং জয়দেবকেন…রোহিণীরমণেন॥ (১০)

কৃষ্ণ—হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ

…বিরহব্যাধি কথং বর্ধতে॥ (১১—১৫)

অধিকারীর মঙ্গল গীতি—তির্যক্‌কণ্ঠবিলোল…দধতু বঃ ক্ষেমং

কটাক্ষোর্ময়ঃ॥ (১৬)

চতুর্থ সর্গ—স্নিগ্ধ-মধুসূদন

স্থান—যমুনা তীরে বেতসকুঞ্জ—যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে (১)

কাল—রাত্রি

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—যমুনাতীর…রাধিকাসখী ॥ (১)]

সখী—(কৃষ্ণকে) গীতি। ৮। কর্ণাটরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—সা বিরহে তব দীনা ‥ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা)

নিন্দিত চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্

…চঞ্চতিমুঞ্চতি তাপম্ ॥ (১—৮)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেব ভণিতম্ ·সখীবচনং পঠনীয়ম্ ॥ (৯)

সখী—আবাসো বিপিনায়তে…শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ (১০)

গীতি। ৯। দেশাগরাগ, একতালীতাল

(ধ্রুবা—রাধিকা তব বিরহে কেশব।)

সখী—স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্…মরণেবনিকামম্ ॥ (১১—১৭)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেব ভণিতম্ উপনীতম্ ॥ (১৮)

সখী—সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি…বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥ (১৯—২২)

অধিকারীর মঙ্গলগীতি—বৃষ্টিব্যাকুল…শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥ (২৩)

পঞ্চম সর্গ—সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ

স্থান—ভ্রমরগুঞ্জিতলতাকুঞ্জ

কাল—রাত্রি

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—অহমিহ নিবসামি…পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥] (১)

সখী—(রাধাকে) গীতি। ১০। দেশবরাড়ীরাগ, রূপক তাল

(ধ্রুবা—সখিহে সীদতি তব বিরহে বনমালী)

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়

…নির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥ (১—৭)

গীতি। ১১। গুর্জরীরাগ, একতালীতাল

(ধ্রুবা—ধীরসমীরে যমুনাতীরে · করযুগশালী)

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশং

…পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥ (৮—১৫)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবে কৃত হরিসেবে · সুকৃতকমনীয়ম্ ॥ (১৬)

সখী—বিকিরতি মুহুঃ…ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥ (১৭—২০)

অধিকারীর মঙ্গল গীতি—রাধামুগ্ধমুখারবিন্দ…ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ (২১)

ষষ্ঠ সর্গ—ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ

স্থান—কৃষ্ণের বেতস কুঞ্জ

কাল—রাত্রি

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—অথ তাং গন্তুমশক্তাং · সখী প্রাহ ॥ (১)]

সখী—(কৃষ্ণকে) গীতি । ১২ । গোণ্ডকিরীরাগ, রূপকতাল

(ধ্রুবা—নাথ হরে সীদতি রাধাবাসগৃহে ।)

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্

·· বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ (২—৮)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্ ··মুদিতম্ ॥ (৯)

সখী—বিপুলপুলকপালিঃ···বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ (১০—১১)

অধিকারীর প্রশংসা গীতি—কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে

···সায়মতিথি-প্রশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥ (১২)

সপ্তম সর্গ—নাগরনারায়ণ

স্থান—রাধার কুঞ্জ

কাল—রাত্রি—কলঙ্করেখাযুক্তচাঁদ আকাশে—স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ

বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশু জালৈঃ···ইন্দুঃ । (১)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—প্রসরতি শশধরবিম্বে···চকারোচ্চৈঃ । (২)]

রাধা—(স্বগত) গীতি । ১৩ । মালবরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—যামি হে কমিহ শরণং সখীজন বচনবঞ্চিতা ।)

কথিত সময়েহপি হরিরহহ ন যযৌ বনং

···স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ (৩—৯)

অধিকারীর মন্তব্য—হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী···

কোমলকলাবতী ॥ (১০)

রাধা—তৎ কিং কামপি···কুঞ্জেহপি যন্নাগতঃ ॥ (১১)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—অথগতাং মাধবমন্তরেণ···দৃষ্টবদেতদাহ ॥ (১২)]

রাধা—(সখীকে)—গীতি । ১৪ । বসন্তরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ।)

স্মরসমরোচিত বিরচিতবেশা···পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ।

(১৩—১৯)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবভণিত…জনয়তু পরিশমিতম্ ॥ (২০)

রাধা—(সখীকে) বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ…মদনব্যথাম্ । (২১)

গীতি । ১৫ । গুর্জরী রাগ, একতালীতাল

(ধ্রুবা—রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ।)

সমুদিতমদনে রমণীবদনে…বদ সখি বিটপোদরে ॥

(২২—২৮)

অধিকারীর মন্তব্য—ইহ রসভণনে…কবিনৃপজয়দেবকে ॥ (২৯)

রাধা—(সখীকে) নায়াতঃ সখি নির্দয়ো যদি

… স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ (৩০)

গীতি । ১৬ । দেশবরাড়ীরাগ, রূপকতাল

(ধ্রুবা—সখি যা রমিতা বনমালিনা ।)

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন…বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥

(৩১—৩৭)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন…হৃদয়মনেন ॥ (৩৮)

রাধা—(স্বগত) মনোভবানন্দনচন্দনানিল

… শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ (৩৯—৪১)

অধিকারীর আনন্দগীতি—প্রাতর্নীলনিচোলম চ্যুতমুরঃ…জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ (৪২)

অষ্টম সর্গ—বিলক্ষলক্ষ্মীপতি

স্থান—রাধার লতা কুঞ্জ

কাল—প্রভাত—স্মরশরজর্জরিতাপি সা প্রভাতে। (১)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ · অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়…প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥ (১)]

রাধা—(কৃষ্ণকে) গীতি । ১৭ । ভৈরবীরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—হরি হরি যাহি মাধব ··হরতিবিষাদম্)

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্

……বধূবধনির্দয়বালচরিত্রম্ ॥ (২—৮)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিত…অপিহৃরাপম্ ॥ (৯)

রাধা—(কৃষ্ণকে) তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ…কিমপি লজ্জাংজনয়তি ॥ (১০)

অধিকারীর মঙ্গলগীতি—অন্তর্মোহনমৌলি…শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ (১১)

নবম সর্গ—মুগ্ধমুকুন্দ

স্থান—রাধার লতা কুঞ্জ

কাল—সকাল বেলা

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—তামথ মন্মথখিন্নাং···উবাচ রহঃ সখী ॥ (১)]

সখী—(রাধাকে) গীতি । ১৮ । রামকিরীরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—মাধবে মাকুরু মানিনি মানময়ে ।)

হরিরভিসতি বহতি মৃদুপবনে···হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥ (২—৮)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্···হরিচরিতম্ ॥ (৯)

সখী—(রাধাকে) স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি···

···হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ (১০)

অধিকারীর মঙ্গলগীতি—সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদি···অশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ (১১)

দশম সর্গ—মুগ্ধমাধব

স্থান—রাধার লতা কুঞ্জ

কাল—সন্ধ্যা—সুমুখীমুপেত্য···প্রদোষে । (১)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—অত্রান্তরে মসৃণরোষবশাম্···হরিরিত্যুবাচ (১)]

কৃষ্ণ—(রাধাকে আনন্দগদ্‌গদভাবে)—গীতি । ১৯ । দেশবরাড়ীরাগ, অষ্টতাল

(ধ্রুবা—প্রিয়ে চারুশীলে···মুখকমলমধুপানম্ ।)

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী

···হরতু তদুপাহিত-বিকারম্ ॥ (২—৯)

অধিকারীর মন্তব্য—ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু···পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি ভারতী-ভণিতমতিশাতম্ ॥ (১০)

কৃষ্ণ—(রাধাকে) পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া···

···বহসি তন্বী পৃথ্বীগতা ॥ (১১—১৬)

অধিকারীর আনন্দগীতি—প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ···ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ (১৭)

একাদশ সর্গ—সানন্দগোবিন্দ

স্থান—রাধার লতা কুঞ্জ

কাল—সন্ধ্যা—রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে । (১)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীম্...

...রাধাংজগাদ] (১)

সখী—(রাধাকে) গীতি । ২০ । বসন্তরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে)

বিরচিতচাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত প্রণিপাতম্

...হরিমপি নিজগতিশীলম্ ॥ (২—৮)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবভণিতম্...কণ্ঠ তটীমবিরামম্ ॥ (৯)

সখী—(রাধাকে) সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং...

তৎ প্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ (১০—১২)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—হারাবলী-তরল-কাঞ্চন...সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥

(১৩)]

সখী—(কৃষ্ণদর্শনে লজ্জিতা রাধাকে) গীতি । ২১ । দেশবরাড়ীরাগ, রূপকতাল

(ধ্রুবা—প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ ।)

মঞ্জুতরকুঞ্জ তলকেলিসদনে...বিলসদশনরুচি-রুচির-শিখরে ॥ (১৪—২০)

অধিকারীর মন্তব্য—বিহিতপদ্মাবতী...জয়দেবকবিরাজরাজে । (২১)

সখী—(রাধাকে) ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো...

পদাম্ভোজে কুতঃ সংভ্রমঃ ॥ (২২)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—সা সসাধ্বস-সানন্দং...প্রবিবেশ নিবেশনম্ ।

(২৩)]

অধিকারীর বর্ণনাগীতি । ২২ । বরাড়ীরাগ, রূপকতাল

(ধ্রুবা—হরিমেকরসং...বদনমনঙ্গ-বিকাশম্ ।)

রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গম্

...হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্ ॥ (২৪—৩১)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—অতিক্রম্যাপাঙ্গং...ব্যগমদিবদূরংমৃগদৃশঃ ॥

(৩২—৩৩)]

অধিকারীর কৃষ্ণ প্রশস্তিগীতি—জয়শ্রীবিণ্যস্তৈর্মহিত ইব...

ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ (৩৪)

দ্বাদশ সর্গ—সুপ্রীত-পীতাম্বর

স্থান—মিলনকুঞ্জ

কাল—রাত্রি হইতে প্রভাত পর্যন্ত

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—গতবতি সখীবৃন্দে···উবাচহরিঃ প্রিয়াম্। (১)]

কৃষ্ণ—(রাধাকে) গীতি । ২৩। বিভাষরাগ, একতালীতাল

(ধ্রুবা—ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে।)

কিশলয়-শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্

···বিরম বিসৃজ রতিখেদম্॥ (২—৮)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেবভণিতম্···রতিরসভাববিনোদম্। (৯)

অধিকারীর বর্ণনা—প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ···বিলুলিতস্রগম্বরেয়ং ধিনোতি॥

(১০—১৫)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—ইতিমনসা···রাধাজগাদ···গোবিন্দম্। (১৬)]

রাধা—(প্রভাতে কৃষ্ণকে) গীতি । ২৪ । রামকিরীরাগ, যতিতাল

(ধ্রুবা—নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে।)

কুরুযদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ···শুভাশয় বাসয় সুন্দরে॥ (১৭—২৩)

অধিকারীর মন্তব্য—শ্রীজয়দেববচসি···কলিকলুষজ্বরখণ্ডনে॥ (২৪)

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ—রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং···পিতাম্বরোঽপি

তথাকরোৎ। (২৫)]

অধিকারীর মঙ্গলগীতি ও প্রশস্তি—পর্যঙ্কীকৃতনাগনায়ক···

শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু॥ (২৬—২৯)

গীতগোবিন্দ মহাকাব্যরূপে উল্লিখিত এবং মহাকাব্যের রীতি অনুযায়ী ইহার প্রতি সর্গের নামকরণও করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণের নির্জন কেলিসমন্বিত শ্রীগীতগোবিন্দ একখানি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য। এই গীতিনাট্য বারোটি দৃশ্যে বিভক্ত। ইহার ঘটনা কাল দুইটি রাত্রি ও দুইটি প্রভাত। কৃষ্ণ, রাধিকা ও সখী ইহার পাত্রপাত্রী। ইহারা গীতি সংলাপ ও আবৃত্তির মধ্য দিয়া ইহাদের বক্তব্য পরিবেশন করিয়াছে। নাট্যকার দৃশ্যারম্ভে ও প্রয়োজন স্থলে অন্যান্য জায়গায় নাট্য নির্দেশদান করিয়াছেন। প্রারম্ভে তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রস্তাবনা, দেববন্দনা, মঙ্গলাচরণ ও কবি পরিচিতি সমাপ্ত করিয়া পালা আরম্ভ করা হইয়াছে। পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী জয়দেবের এই গীতি-নাট্য গীতি ও নৃত্যসহযোগে পরিবেশিত হইত। ইহাতে মাঝে মাঝে অধিকারীর মন্তব্য সংযোজিত হইয়াছে। ইহা প্রচলিত প্রথানুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। লোক সমাজের রামায়ণগান, মনসার ভাসান ও ঢপকীর্তনাদির পালাতে এখনো

এই প্রথা প্রচলিত। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ক্ষেমীশ্বর, শূদ্রকপ্রমুখের নাটকাবলীতে এই শ্রেণীর রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু যেমন লোকায়ত রাধাকৃষ্ণকথা তেমনি কাব্যাংশের অন্ত্যানুপ্রাস ও ছন্দোবন্ধে লোকায়ত প্রাকৃত-রীতি বর্তমান। প্রাকৃতছন্দে পংক্তির শেষে মিলের (rhyme) ব্যবহার প্রচলিত। প্রাকৃতপৈঙ্গল হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

[১]সজ্জিয় জোহ বিবড্‌ঢিঅ কোহ চলাউ ধণু
পক্‌খর বাহ চলু রণণাহ ফরংত তণু।
পত্তি চলংত করে ধরি কুংত সুখ্‌গগ করা।
কন্নণরেংদ সুসজ্জিঅ বিংদ চলংতি ধরা ॥—১৭১ (নীল)

সংস্কৃত ছন্দে পংক্তির শেষে এইরূপ মিল ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোন রীতি নাই। কিন্তু গীতগোবিন্দে ইহার প্রভূত দৃষ্টান্ত মিলিবে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে,—

(ক) ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমলমলয়সমীরে,
মধুকর নিকরকরম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জ কুটীরে। (২৮) প্রথম সর্গ

(খ) নাম সমেতং কৃতসংকেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্।
বহুমনুতেতনুতে তনু সঙ্গত পবনচলিতমপিরেণুম্ ॥ (৯) পঞ্চম সর্গ

(গ) ভবতিবিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ (৭) ষষ্ঠ সর্গ

চর্যাপদে উল্লিখিত [২]'বুদ্ধ নাটকের' স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা না গেলেও লোকসমাজে প্রচলিত এই নাটকের অভিনয়ে গীতি ও নৃত্যের প্রাধান্য ছিল। গীতগোবিন্দেও গীতি নৃত্যের ব্যবস্থা আছে। মঙ্গলাচরণে [৩]"তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু"—ইত্যাদি অংশের বহুবচনাত্মক বয়ম্ পদের ব্যবহার এবং গানেধ্রুবার প্রয়োগ হইতে বুঝা যায় যে গীতগোবিন্দ পরিবেশনেরজন্য জয়দেব গোস্বামীকে একটি দল গঠন করিতে হইয়াছিল।

১। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্—১ম ভাগ, বর্ণবৃত্ত—বারাণসী, ১৯৫৯।

২। নাচন্তি বাজিল গান্তিদেবী। বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥ ১৭ চর্যা. বীণাপাদানাম্। বজ্রধরের (বাজিল) নৃত্য ও নৈরাত্মা দেবীর গানে বুদ্ধনাটকাভিনয় পরিসমাপ্ত হয়।

৩। গীতগোবিন্দ ২৪, ১ম সর্গ

পদ্মাবতী ও [১]পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুগণ এই দলে অংশ গ্রহণ করিতেন। পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী শিল্পী জয়দেব গায়ক-অধিকারী ছিলেন। গীত-গোবিন্দের গানগুলি রাগসঙ্গীত ও তৎকালীন প্রচলিত তালে গীত হইয়াছে। গানের রাগ ও তাল উল্লিখিত হইয়াছে। গানের সঙ্গে পরাশরাদি ধুয়া ধরিতেন ও দোহারকি করিতেন এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিতেন পদ্মাবতী। ইহার চব্বিশটি গীতই নৃত্যের সঙ্গে পরিবেশিত হইত। একজন মূল গায়ক কর্তৃক দোহার সহযোগে গান ও মাঝে মাঝে আবৃত্তির মধ্য দিয়া যেমন গীত-গোবিন্দ পরিবেশিত হইতে পারে, তেমনি পাত্রপাত্রীর রূপশয্যা গ্রহণপূর্বক গীতি-নাট্যরূপেও ইহা প্রযোজিত হইতে পারে।

বারো দশ শতক হইতে বাংলার অবস্থা

সেন রাজত্বের শেষভাগে সমাজ ক্রমে ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রাষ্ট্রকে দুর্বল করিতে আরম্ভ করে। [২]"শিল্প ও সাহিত্য বস্তু সম্বন্ধ বিচ্যুত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহ-গতলীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত ও মদির।" একদিকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা অন্য দিকে হিন্দুর স্মৃতিজ্যোতিশের নানা সংকীর্ণ সংস্কারের প্রাবল্যে সমাজ আত্মশক্তিহীন হইয়া উঠিতে লাগিল। সেন রাজত্বের এই অবস্থায় ১২০৩ হইতে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর আফগানিস্থানের Ghor অঞ্চলের অধিবাসী এবং দিল্লীর Viceroy কুতবউদ্দিনের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ও বিহারের শাসনকর্তা তুর্কী মুহম্মদ বখ্‌ত্‌-ইয়ার-খিলজি অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া একদিন দ্বিপ্রহরে ছদ্মবেশে নবদ্বীপ আক্রমণে আসেন। এই সময় সপার্ষদ্ রাজা লক্ষ্মণসেন গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থাবাস নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। [৩]বখ্‌ত্‌-ইয়ার-খিলজী বাংলার অরক্ষিত অবস্থার সমস্ত খবর লইয়া গোপনে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এবং সন্দেহাতীতভাবে বিহার

১। পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু কণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু। ২৯, ১২শ সর্গ, গীতগোবিন্দ

২। বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃঃ ৫২৯, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, কলি—১৩৫৯

৩. Mohammed Bukhtyar Khulljy, having acquired sufficient information of the unguarded state of Bengal, secretly assembled his troops; and marching from Bihar, proceeded with such expedition towards Nuddeah, that his approach was not even suspected. p. 27, History of Bengal, Stewart (1847).

হইতে নবদ্বীপ অভিযানে অগ্রসর হইলেন। [1]নগরে উপস্থিত হইয়া রক্ষীদের কাছে রাজদূতরূপে নিজের পরিচয় দিলেন এবং রাজাকে উপঢৌকন দিবার জন্যই নবদ্বীপে আসিয়াছেন এই কথা জানাইবার জন্য কেহই তাহাকে নগর প্রবেশে বাধা দান করিল না। ঐতিহাসিক ইসমী রচিত ফুতুহ-উস্-সালাতিন গ্রন্থ হইতে জানা যায়—বখ্‌ত্-ইয়ার প্রথমে লক্ষ্মণসেনকে বহুমূল্য এক উপঢৌকন প্রদান করেন, কিন্তু অল্প পরেই তিনি অতর্কিত আক্রমণ সুরু করেন; অপ্রস্তুত সৈন্যগণ যথারীতি বাধা দান করিতে লাগিল। কিন্তু পিছনের তুর্কী সৈন্যদল তৎক্ষণে নবদ্বীপে উপস্থিত হইল। কাজেই অল্প ক্লেশেই বখ্‌ত্-ইয়ার নবদ্বীপ অধিকার করিল। রাজা লক্ষ্মণসেন (Raja Luchmunyah) পরাজয় স্বীকার করিয়া পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন এবং বিক্রমপুরে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। ১২০৫ হইতে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহার মৃত্যুর পরেও সেনবংশীয়গণ পূর্ববঙ্গে ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

বখ্‌ত্-ইয়ার খিলজি ইহার পরে রাঢ় ও বরেন্দ্র দখল করিয়া লখ্‌নাবতি (Luknowty) নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পরে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌ত্-ইয়ার খিলজীর শাসনাবসান ঘটে। ইহার পর হইতে বহু সুলতান গৌড়ের শাসনকার্যে নিযুক্ত হন। এই সুলতানগণের সকলেই দিল্লীর অধীন ছিলেন। সুলতানদের ক্রমরাজ্যবিস্তারের ফল স্বরূপ ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই সমগ্র বাংলা মুসলমানাধিকারভুক্ত হয়। দিল্লীর দুর্বল বাদশাহ্ তৃতীয় মুহম্মদের রাজত্বে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে [2]সুলতান ফকর্-উদ্দিন নিজেকে বঙ্গের স্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষণা করেন ও স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করেন। ইনিই বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলমান শাসক। ফকর্-উদ্দিন বিক্রমপুর অঞ্চলে সোনারগাঁওতে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পর হইতেই বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে দিল্লী হইতে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইতে থাকে এবং গৌড়েই ইহার রাষ্ট্রকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই গৌড়ে ইলিয়াস্-খাজা-শাম্‌স্ উদ্দিন, ঘিয়াস-উদ্দিন, জালাল-উদ্দিন, নাসিরশাহ্, ফতে-শাহ্ প্রমুখ মুসলমান সুলতান পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন।

1 On passing the guards, he informed them, that he was an envoy going to pay his respects to their master. p. 27, History of Bengal,—Stewart (1847)

2. Fakher Addeen......caused himself to be proclaimed Sovereign of Bengal; and ordered the coin to be stamped...in his name. p. 52, Ibid.

এইভাবে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বাংলাদেশে ইস্‌লাম ধর্মপ্রচারের প্রবল প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। গাজী, দরবেশ, পীর, ফকির প্রভৃতি উত্তর ভারত হইতে বাংলাদেশে আসিয়া ধর্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। রাজশক্তির সহায়তায় লোভ প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগে যেমন এই কাজ চলিতে থাকে তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারবিরোধীরা হিন্দুবিদ্বেষ বশত সহজবোধ্য নূতন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের সামাজিক হীনদৃষ্টি হইতে নিজেদের মুক্ত করিতেও আরম্ভ করে। এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যাইতে পারে,—[১]"বাঙ্গালায় পাঠানগণ আসিলে এবং পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ জয় করিয়া বসিলে, সহজিয়া ও বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে খুব আদরের আসন দিয়াছিলেন।" বাংলাদেশে যে মুসলমান ধর্ম প্রচারিত হয় তাহাতে কোরান অনুযায়ী ধর্ম অপেক্ষা সুফীমত অধিক প্রচার লাভ করে। [২]"সুফীমতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোন বিরোধ হয় নাই" বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল। পরাজিত জাতির ধনবল, জনবল ও নানাপ্রকার সুখ সুবিধা কমিতে থাকে। ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বিজয়ী জাতির অনুচিকীর্ষু হইতে হয়। কিন্তু তাহার ফলে ধর্ম ও জাতিনাশের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এতবড় সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই সময় বাঙালী হিন্দুর একটি অংশ সংযম ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে 'কমঠব্রতী' হইয়া উঠে। ফলস্বরূপ ছুঁৎমার্গ ও বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র সংস্কার ইহাকে অক্টোপাশের মত আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়াইয়া ধরে। তখন দুঃখ দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য কেবল সর্বত্যাগ ও স্বর্গবাসনা প্রবল হইয়া উঠে। তাই [৩]কমঠ-কবচ পাইয়াই···গাড়ু, গামোছা, খড়ম ও ধুতিসার করিয়া···দই চিড়ে খাইয়া, কাঁচকলা ভাত খাইয়া" হিন্দুর এই অংশটি স্বরচিত শাস্ত্রাচার ও কুলাচারের দিকে চাহিয়া রহিল। অপর অংশটি [৪]বেতসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ

১। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০, সঃ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস—(১৩৭০)

২। ভারত-সংস্কৃতি—পৃঃ ১১৫, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩৬৪)

৩। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২, কলিকাতা ১৩৭০

৪। আত্মা সংরক্ষিতঃ সুস্কৈবৃত্তিমাশ্রিত বৈতসীম্—রঘুবংশ—৪র্থ সর্গ (৩৫) কালিদাস, এই শ্লোকের মল্লিনাথকৃত টীকায় কৌটিল্যের উদ্ধৃতি—'বলীয়সাভিযুক্তো দুর্বলঃ সর্বত্রানুপ্রণতো. বেতস ধর্মমাতিষ্ঠেৎ'

বেতসলতা যেমন স্রোতের অনুকূলে অবনত হইয়া স্রোতোবেগ হইতে আত্মরক্ষা করে সেই রকম সাময়িক স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া আত্মরক্ষা ও জাগতিক স্বার্থরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইল। এই অবস্থায় জাতীর বাস্তব অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যায়। কাজেই শিল্প-সাহিত্য-নাট্য রচনার কথাও অচিন্তনীয় হইয়া উঠে। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অতিবাহিত হয়।

বাংলাদেশে অনেককাল বসবাস করিবার ফলে তিন চার পুরুষের মধ্যে বিদেশী মুসলমানেরা বাংগালী বনিয়া গেলেন। দেশীয় মুসলমানেরা তো বাংগালী-ই। সুতরাং পাশাপাশি বাসবাস করিতে গিয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সংঘটিত হইতে লাগিল। ধর্মোন্মত্ততার জন্য জোর করিয়া হিন্দুকে মুসলমান করিবার প্রচেষ্টা কমিয়া গেল। হিন্দুদের প্রতি শাসকবর্গের বিদ্বেষ-ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। তাহারা হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় লইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। হিন্দুগণেরও পূর্বের সন্ত্রস্ত মনোভাব অনেকটা কমিয়া গেল। সুতরাং তাহারা ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষা চর্চায় মনোযোগী হইয়া উঠিতে লাগিলেন, ফলে লোকভাষাও একটু একটু করিয়া সাহিত্যের উপযোগী হইয়া উঠিতে লাগিল। মুসলমান পীর, মোল্লারা যেমন ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী তেমনি ধর্ম প্রচার কল্পেই হিন্দুরাও বাংলাভাষায় ভাগবত-পুরাণ-রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। (পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সুলতান বরবক শাহের রাজত্বে বর্ধমানের কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসু ভাগবত অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে বাংলায় প্রথম কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থরচনা আরম্ভ করিয়া ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত করেন। এই কাব্য রচনা করিয়া সুলতান কর্তৃক তিনি 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত হন।) সুলতানগণ এই সময় হইতে সভাসদ ও রাজ-কর্মচারীদের কাব্য রচনায় উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করেন। এই শতাব্দীতে কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় প্রথম 'শ্রীরাম পাঞ্চালী' রচনা করেন। সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদমূলক রচনা ছাড়াও দেবমাহাত্ম্য মিশ্রিত প্রচলিত দেশীয় পুরাণ কথা অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাব্যাদিও রচিত হইতে আরম্ভ করিল। এই শতব্দীর শেষে রচিত বলিয়া কথিত বিজয় গুপ্তের মনসা পাঁচালী হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্ম প্রচারক মহম্মদের বংশধর আলাউদ্দিন হুসেন সাহ্ আরবের মরুদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসিয়া

সুলতান মুজাফর সাহেবের অধীনে রাজকার্য গ্রহণ করেন। বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার বলে পরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইলেন। [1]কিন্তু সুলতানের নিপীড়ন ও ঔদ্ধত্যের জন্য তিনি বিদ্রোহ করেন; সুলতানের মৃত্যুর পরে অন্যান্য রাজকর্মচারী ও সভাসদগণের সহায়তায় পঞ্চদশ শতকের শেষে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেনশাহ্ শেরিফ্ মক্কা। গৌড়ের সুলতানগনের মধ্যে ইনি অধিক খ্যাতি লাভ করেন। এই সুলতানের রাজত্বে রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি সভাসদদের কাব্য চর্চায় উৎসাহিত করেন। অন্যতম সভাসদ শ্রীখণ্ডের যশোরাজখান ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণ পাঁচালি রচনা করেন। [2]হুসেনশাহের রাজত্বে পণ্ডিত ও ধার্মিকদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। নানাদিক হইতে রাজ্যের উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতে থাকায় প্রজারা কিছুটা আশ্বস্ত হইল। বসিরহাট মহকুমার বটগ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস পিপ্‌লাই ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মনসাবিজয়' মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। সুলতানের সেনাপতি পরাগলখান চট্টগ্রামে জায়গীর পাইয়া শাসনকর্তা হইবার পরে তিনি সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দ্বারা 'পাণ্ডববিজয়' নামে মহাভারত পাঁচালি রচনা করাইলেন। এই পরিবেশে হিন্দুর মনে আবার কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হওয়ায় জ্ঞানের ধারক ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞান আহরণের স্পৃহা বাড়িয়া উঠিল। সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে বহির্বঙ্গ মিথিলা হইতে ন্যায়-স্মৃতি শাস্ত্রাদি আহরণের প্রচেষ্টা দেখা দিল। নবদ্বীপ পুনরায় সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল। বাংলাদেশে সংস্কৃত পুরাণাদি ও লৌকিক পুরাণ মঙ্গলকাব্যকাহিনী পাঠক, কথক বা পাঁচালিকার কর্তৃক লোকসমাজে বিশেষ ভাবে পরিবেশিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য উদ্ধার যোগ্য, [৩] "এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোট-বড়

1. The oppressions and brutal temper of Muzuffir made him a rebel, and fortune made him a king. p. 71, History of Bengal, C. Stewart (1847).

2. He built public moques and hospitals in every district, and settled pensions on the learned and devout. p. 73, Ibid.

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭৭, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (১৯৫৯)

গানে অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষে দেবমন্দিরে।" সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বের এই অবস্থায় বীরভূম বাঁকুড়া অঞ্চলের পল্লীকবি বড়ুচণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নাটগীত রচনা করেন আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে।

মধ্যযুগের লোকনাট্যপ্রসঙ্গ

পূর্বকথিত গীতগোবিন্দের সংগে তুলনা করিলে দেখা যাইবে, বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও একখানি গীতিনাট্য। এমন অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে জয়দেবের অনুকরণে চণ্ডীদাস ইহা রচনা করিয়াছেন। আবার ইহাও অসম্ভব নহে যে চণ্ডীদাস তৎকালে জনগণের মধ্যে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লোকনাট্য বা যাত্রারীতি অবলম্বনে ইহা রচনা করেন। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ, রাধা ও সখী চরিত্র অবলম্বিত হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ, রাধা, যশোদা ও দূতীরূপে বড়ায়ি পাত্র-পাত্রীরূপে গৃহীত। নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হইত বলিয়া পাত্র-পাত্রীরা সংগীতময় সংলাপে তাহাদের বক্তব্য পরিবেশন করিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি গানে রাগ ও তালের উল্লেখ করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে নাট্যকারের (অধিকারীর) নাট্যকথন ও পাত্রপাত্রীর সংলাপে সমগ্র নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃতজ্ঞ চণ্ডীদাস স্বরচিত বহু সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করিয়াছেন। পাত্রপাত্রীর সংগীতের সাহায্যে নাট্য পরিস্থিতি বুঝা গেলেও এই শ্লোকগুলি নাট্য নির্দেশের কাজ করিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

(ক) ইত্যুক্ত্বা রাধিকা মৌনমাস্থায় চিরমেকতঃ।
চকারবসতিং নম্রবদনা বৃদ্ধয়া সহ॥

অথ পঞ্চশর ক্ষুন্নমনাঃ কৃষ্ণোমুণিব্রতং।
রাধায়াঙ্গীকৃতং মত্বা রভসাদিদমাহতাম্॥

দানখণ্ডের নাট্য নির্দেশের জন্য রচিত এই শ্লোকটির পূর্ববর্তী গীতাংশ—

মৌন করিআ তুহেঁ থাকি একপাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

এবং পরবর্তী গীতাংশ—

হংস রএ সরোবরে শুআহো পাঞ্জরে
কয়িলী সে নন্দন বনে।

হইতে নাট্যাবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া লওয়া যায়।

(খ) নিধায় কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়াসহ রাধিকা।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা॥ বংশীখণ্ডের এই শ্লোকের পরবর্তী 'কাখেতে কলসী বড়ায়ি জাও ধীরে ধীরে' গানটি হইতেই নাট্য পরিস্থিতি স্পষ্ট হইয়া উঠে।

সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলি এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এইগুলি নাট্যগীতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্য সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন যে ইহা [১]পাঞ্চালিকা নাট্য বলিয়া লেখা হইয়াছিল। একথা নিশ্চিত যে কোন প্রকার পরিবর্তন না করিয়া গায়কদের গানের সঙ্গে পুতুল নাচের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাট্যোপস্থাপনা সম্ভব। এই রকম স্থলে যাহারা পুতুল নাচাইবেন তাহাদের প্রতি পূর্ব নির্দেশ দিবার জন্য সংস্কৃত শ্লোকগুলি রচিত হইতে পারে। কিন্তু যাহারা পুতুলযুক্ত যষ্টি কোমরে বাঁধিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অথবা মাচার উপরে উঠিয়া কালো সুতার সাহায্যে পুতুল নাচাইবে সেইসব শ্রমিক-শিল্পীরা সংস্কৃত বুঝিবে ইহা আশা করা যায় না। তাহা ছাড়া মূল গীতিনাট্য যেখানে বাংলায় সেখানে সংস্কৃত নির্দেশ ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন থাকিয়া যায়। ইহা পরবর্তী সংযোজন না হইলে মনে হয় সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সংস্কৃত প্রীতি বশত বিনা প্রয়োজনেও চণ্ডীদাস এই শ্লোক সন্নিবেশ করিয়াছেন। আবার এমনও হইতে পারে, পালা গানের মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক পড়িলে অধিকারীর প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ সহজ হইয়া উঠিবে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে অতিরিক্ত সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে কথক মহাশয় কথকতার সময় জনগণের শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য যে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন এখনো তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ বাংলা গ্রন্থ অনুযায়ী বাংলায় কথকতা করিবার সময় এই শ্লোকের বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে না।

রাধাকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত জন্ম খণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রস্তাবনা

১। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ পৃঃ ১৩৮, ১৯৫৯

অংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই অংশটি ছাড়াও ইহাতে বারোটি খণ্ড সন্নিবেশিত হইয়াছে,—তাম্বুল খণ্ড, দানখণ্ড, নৌকা-খণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও বিরহখণ্ড। তাম্বুলখণ্ড হইতেই নাট্যারম্ভ, বৃন্দাবনের বনপথ ইহার ঘটনাস্থল। প্রস্তাবনার পরে এই তাম্বুলখণ্ডকে নাটকাকারে সাজাইলে নিম্নলিখিত রূপ ফুটিয়া উঠে :—

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

(গীতিনাট্য)

প্রস্তাবনা—**জন্মখণ্ড**।

নাট্যারম্ভ—তাম্বূলখণ্ড।

স্থান—বৃন্দাবনের বনপথ।

[অধিকারীর নাট্য নির্দেশ ও নাট্যকথন **অর্থাৎ** পরিস্থিতি ও পরিবেশ ব্যাখ্যা—

গুর্জরীরাগ—একতালীতাল

(ধ্রুবা—নিতি জাএ সর্বাঙ্গসুন্দরী।

বনপথে মথুরানগরী, সরাধা ॥)

দধিদুধে পসার সাজাআঁ…গাইল বড়ুচণ্ডীদাসে।

পাহাড়ীআরাগ—ক্রীড়াতাল

(ধ্রুবা—পথ হারাইল বড়ায়ি মাঝবৃন্দাবনে।

দৈবে সে জাণএ যার যে হেন ঘটনে ॥)

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে…বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।

পাহাড়ীআরাগ—চিত্রকলগনী—একতালীতাল

আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে……গাইল চণ্ডীদাসে।]

বড়ায়ি—(কৃষ্ণের নিকট রাধার রূপ বর্ণনা)

গুর্জরী রাগ—রূপক তাল

(ধ্রুবা—মুনি মন মোহিনী রমণী আনুপামা।

পদ্মিনী আহ্মার নাতিনী রাধা নামা ॥)

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর……চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥

কৃষ্ণ—দেশাগরাগ—রূপকতাল

(ধ্রুবা—পরাণ অধিক বড়ায়ি বোলেঁ৷ মো তোহ্মারে।

রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥)

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী…গাইল চণ্ডীদাস ॥

বড়ায়ি— আহের রাগ—লঘুশেখর তাল

(ধ্রুবা—বোলহসুন্দরকাহ্ন রাধার উদ্দেশে।

তঁথা গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে ॥)

আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী …গাইল চণ্ডীদাসে ॥

কৃষ্ণ— রামগিরীরাগ—রূপক তাল

(ধ্রুবা—তাম্বুল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী।

বকুলতলাত আছে সে সুন্দরী সতী ॥ ল ॥)

রাধার উদ্দেশ বোলেঁ৷ চিন্তিআঁমনে……চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥

[অধিকারীর নাট্যকথন—ধানুষীরাগ—রূপকতাল

(ধ্রুবা—মনে ধরি কাহ্নাঞিঁর বচনে। আল।

চলি ভৈল রাধিকার থানে ॥ ল ॥)

শুভতিথি বার শুভক্ষণে…বড়ু চণ্ডীদাসে ॥]

রাধা—(দূতীবড়ায়িকে) মালবরাগ—লগনী—কুড়ুকুতাল

তোহ্মে মোর বড়ায়ি মো তোহ্মার নাতিনী…গাইল চণ্ডীদাসে ॥

বড়ায়ি— রামগিরী রাগ—রূপক তাল

রাধে।

ডালিভরাআঁ ফুল পানে…গাইল চণ্ডীদাস ॥

ইহার পরে গ্রন্থের কিছু অংশ পাওয়া যায় নাই।

কৃষ্ণ—(বড়ায়িকে) পাহাড়িয়া রাগ—ক্রীড়া তাল

(ধ্রুবা—রাধার বচন নাপাইলেঁ বড়ায়ি

কাহ্নাইর প্রাণ জাএ।)

তোর মুখে সুণী রাধিকার রূপ…গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

[অধিকারীর নাট্যনির্দেশ—কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন দত্তং বাসোযুতং পুনঃ

তাম্বুলং সোপকরণং রাধায়ৈ জরতী দদৌ ॥

নাট্যকথন—পাহাড়ীআ রাগ—ক্রীড়াতাল লগনী প্রকীর্ণক।

(ধ্রুবা—কর্পূর তাম্বুল দিআঁ রাধক
বিমুখ বদনে হাসে ॥ ল বড়ায়ি ॥)
কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি···গাইলবুড়ু চণ্ডীদাসে ॥]

রাধা—(বড়ায়িকে) কোড়ারাগ—রূপক তাল
(ধ্রুবা—না বোল না বোল দূতী নাএ।
আবালীরাধা নহোঁ সুরতীযোগে ॥)
আহ্মার কোমল দেহে······চণ্ডীদাসে ॥

[অধিকারীর নির্দেশ—নিপীয় রাধাবচনং ততোবচন পণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনম্ ॥]

বড়ায়ি—(কৃষ্ণকে) কোড়ারাগ—যতিতাল
(ধ্রুবা—মোকে বোলে হেন বাণী।
এবেঁ তাক কি বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী ॥)
নবলীদল কোঁমল আহ্মার দেহে · গাইল চণ্ডীদাস ॥

কৃষ্ণ— দেশাগরাগ—যতিতাল
(ধ্রুবা—না জীবোঁ না জীবোঁ বিণি রাধা দরশনে।
সরূপে কহিলোঁ তোর থানে ॥)
আজি রজনী ত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে···বড়ুচণ্ডীদাসে ॥

[অধিকারীর নির্দেশ—
রাধানিহিতচিত্তস্য কৃষ্ণস্য বচনাদরং।
সাদরং জরতী প্রাহ গত্বা রাধামিদং বচঃ ॥]

বড়ায়ি—(রাধাকে) বেলাবলীরাগ—যতিতাল
(ধ্রুবা—নারেবড় কাহ্নাআঁ পাঠাইআঁ দিল মোরে।
মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে ॥)
নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ ··গাইল চণ্ডীদাস ॥

রাধা— রামগিরীরাগ—রূপকতাল
(ধ্রুবা—দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহিঁ লাজ।
তে কারণে মোক বোলসি হেন কাজ ॥ ল ॥)
এতকালে বুঢ়ী তোর কেহ্নে হেন মন···গাইল চণ্ডীদাসে ॥

[অধিকারী নির্দেশ—নিপীয় রাধাবচনং ততোবচন পণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং ॥]

বড়ায়ি—(কৃষ্ণকে) গুর্জরীরাগ—যতিতাল

(ধ্রুবা—না থাকিব তোর থানে জাইব আহ্মে রোষে।

কাহ্নাঞি॑ল আহ্মে তোহ্মার দোষে ॥)

কোপে কভোঁ মোকে হাথে॑ না ছইল সামী···গাইল চণ্ডীদাস ॥

কৃষ্ণ— কোড়ারাগ—ক্রীড়াতাল

(ধ্রুবা—যে মোর দূতী মাইল না ল।

নিজ দোষে সে পাইবে আতিবড় দুখে ॥)

আল।

দূতী অপরাধ কৈল······বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

বড়ায়ি—বরাড়ীরাগ—রূপকতাল

(ধ্রুবা—চড়ে॑ মাইলে রাধা মোরে দেখ বিদ্যমানে।

এত অপমান সহে কাহার পরাণে ॥)

তোহ্মার আন্তরে॑ কাহ্নাঞি॑ করি.ল॑া যতনে···চণ্ডীদাস গাএ ॥

কৃষ্ণ— দেশাগরাগ—রূপকতাল

(ধ্রুবা— বড়ায়িল।

বাটেত হৃজিআঁ দান করি তার অপমান

তোর মোর সাধিব মান ॥)

বড়ায়িল।

কদমের তলে বসী যমুনার তীরে · গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

[অধিকারীর নাট্যনির্দেশ—আধায় সাদরং চিত্তে দামোদরসমীহিতং।

মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদা ॥

অধিকারীর নাট্যকথন—রামগিরীরাগ—রূপক তাল

(ধ্রুবা—সবগোপী লআঁরাধা করি বিমরিষে।

মথুরার হাট জাইউ চিত্তের হরিষে ॥ গো ॥)

কপটে॑ কহিল বড়ায়ি রাধিকার থানে···চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥

অধিকারীর নাট্যনির্দেশ—

কালক্ষেপাসহঃ শুচি রাধামাধায় মাধবঃ।

উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরঃ ॥]

কৃষ্ণ—(বড়ায়িকে) দেশবরাড়ীরাগ—রূপকতাল

(ধ্রুবা—রাধিকা লআঁচল মথুরার হাটে।
মহাদাণী হআঁ আহ্মে রহি গিআঁ বাটে ॥)
এতদিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে···চণ্ডীদাস বাসলীগণে।
[অধিকারীর নাট্য কথন—কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ।
অভিমন্যুপ্রসূং প্রাহ রাধায়া মথুরাগতিম্ ॥
গুর্জরীরাগ-যতিতাল
(ধ্রুবা—বোল রাধিকারে সহি বড়ইযতনে।
যেহ্ন জাএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে ॥)
আইহনের ঘরে গিআঁ সাঁঝ সমএ···চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥
আহের রাগ—একতালী
(ধ্রুবা—মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সব সখিজন লআঁ আতি বড় রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥)
ঘৃত দধি দুধ ঘোলে সাজিআঁ পসার···চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥]

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বাকি এগারটি খণ্ডকেও নাটকাকারে সাজান যাইতে পারে। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটক বলিয়াই অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রত্যেকটি খণ্ড এই শ্রেণীর রূপের মধ্যে বিধৃত হইতে পারে। রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে রচিত গীতিনাট্যখানিকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে। খণ্ডগুলির প্রত্যেকটি এক একটি পালা; অথচ ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক হইতে আবার পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। সৃষ্টির আদি হইতে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ধর্ম গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনী লইয়া চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে ইংলণ্ডে রচিত নাট্যচক্রের (cycleplay) সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খণ্ড বিভক্ত পালাগুলির কিছুটা বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্যের বিভক্ত পালাগুলিকে একত্রে গীতিনাট্যচক্র বলা যায়। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন একদিনে গীত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং পালা বিভাগ অনুযায়ী একাধিক দিন ইহা গীত হইত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সহর হইতে দূরে বসিয়া চণ্ডীদাস লোকসমাজের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা ও পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। ইহার মধ্যেই বাংলার লোকনাট্যের একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, ইহাই কৃষ্ণযাত্রার আদিরূপ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেমন মূল গায়ক ও দোহার কর্তৃক আসরে বসিয়া কেবল

গানের মধ্য দিয়া পরিবেশিত হইতে পারে তেমনি রূপসজ্জা গ্রহণ করিয়া পাত্র-পাত্রীরা সংগীতময় সংলাপের মাধ্যমেও ইহার অভিনয় করিতে পারে। সংস্কৃত-শিক্ষিত কবি চণ্ডীদাস সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটক অভিনয়ের কথা জানিতেন। লোকসমাজে বহু পূর্ব হইতেই বুদ্ধনাটকাভিনয়েরও প্রচলন ছিল। ইহা ছাড়াও রূপসজ্জা করিয়া অভিনয় করিবার রীতি তৎকালীন সমাজে অপ্রচলিত থাকিবার কথা নহে। নৃত্যানুষ্ঠানেও সাজসজ্জা ও মুখোস ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। [১]"নৃত্যাভিনয় দুই রকমের ছিল—'পাত্র-নৃত্য' ও প্রেরণ-নৃত্য'। পাত্র-নৃত্যে দেব বা মানব ভূমিকার উপযোগী মুখোস ও সাজ গড়া হইত।" সুতরাং এমনও হইতে পারে যে রাধা, কৃষ্ণ বড়ায়ি ও যশোদার সাজসজ্জা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্যরূপে অভিনীত হইত; অধিকারী এবং দোহারগণও নির্দিষ্ট স্থলে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করিতেন। তৎকালীন নাট্যাভিনয়ে মূল গায়ক ও দোহারগণ সংগীতে অংশগ্রহণ করিয়া থাকিতেন।

চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং চৈতন্যদেবের সময় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্যাভিনয়ের প্রচলিত রীতি হইতেও তাঁহার অভিনীত নাট্যের আদর্শ গ্রহণ করিতে না পারেন এমন নহে। চৈতন্যদেবের অভিনয়ে [২]দোহার গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। তবে এক বিষয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অভিনয়ের পার্থক্য রহিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে চণ্ডীদাস সংগীতের অতিরিক্ত কোন সংলাপ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ে মাঝে মাঝে [৩]সংলাপের ব্যবহার আছে। নারদবেশে শ্রীবাস, বড়াই-বেশে ব্রহ্মানন্দ এবং কোটালবেশে হরিদাসের মধ্যে একটি সংলাপের নমুনা উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

[৪]ডাকি বোলে হরিদাস কেসব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে যাই মথুরা আমরা॥

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ পৃঃ ১৮, ডঃ সুকুমার সেন, ১৯৫৯

২। জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর। সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥ ১৮শ অধ্যায় মধ্য খণ্ড—শ্রীচৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবনদাস, সঃ-সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ২৭৪, কলিকাতা, ১৩৬৯

৩। ক্ষণে বোলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে। গোকুল সুন্দরীভাবে বুঝিয়ে তখনে॥ ঐ পৃঃ ২৭৪

৪। ঐ পৃঃ ২৭৩

শ্রীবাস বোলয়ে তুই কাহার বণিতা।
ব্রহ্মানন্দ বোলে কেনে জিজ্ঞাস বারতা॥
শ্রীনিবাস বোলে জানিবারে না জুয়ায়।
'হয়' বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়॥

এই সকল সংলাপ অভিনয়ের জন্য সংগীতের মত পূর্ব হইতে বাঁধা থাকিত অথবা চরিত্রাভিনেতা উপস্থিত বুদ্ধিমত ইহাদের ব্যবহার করিতেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। উপরে উদ্ধৃত ছোট ছোট সংলাপ সমূহ কথ্য ভঙ্গিতে গদ্যের মত করিয়া বলা হইত না সুরসংযোগে পদ্য-ভঙ্গিতে পরিবেশিত হইত তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এই সময়ের অভিনয়ে শ্রোতা ও অভিনেতার মধ্যেও অনেক সময় সংলাপ-বিনিময় চলিত। বৈকুণ্ঠ-কোটাল বেশী অভিনেতা হরিদাসের একটি সংলাপ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি স্পষ্ট করা যাইতেছে :—

[1]হাথেনড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সভারে জাগায়॥
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বোল কৃষ্ণনাম।
দন্ত করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥
হরিদাস দেখিয়া সকলগণ হাসে।
কে তুমি, হেথায় কেনে সভেই জিজ্ঞাসে॥
হরিদাস বোলে আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
'কৃষ্ণ' জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেম ভক্তি লুটাইব ঠাকুর সর্বথা॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে॥

এইভাবে দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে অভিনেতৃগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন লোকনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীচৈতন্য নাট্যশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া নাট্যাভিনয় করেন নাই। বৈষ্ণব লেখকদের গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়

১। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ১৮শ অধ্যায়, মধ্য খণ্ড, বৃন্দাবন দাস, পৃঃ ২৭০, সঃ-সত্যেন্দ্রনাথ বসু,

না। তিনি আসরে অভিনয় করিয়াছেন। জনপরিবেষ্টিত এইসব আসরাভিনয় যে যাত্রাধর্মী ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়ের ক্লাসিক্যাল রীতি পরিত্যাগ করিয়া নৃত্য-গীত সহযোগে মূলত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রচলিত লৌকিক রীতি অনুযায়ী নদীয়ায় চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। [১]চৈতন্য ভাগবত এবং [২]চৈতন্য চরিতামৃতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। রুক্মিণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদেব শ্রীবাসের গৃহেও কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় ইহার উল্লেখ রহিয়াছে—

তবে আচার্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণ্যাদি রূপ প্রভু আপনি হইলা॥

চৈতন্যদেবের পূর্বে কোন সময় হইতে লোকসমাজে বাংলা লোকনাট্যাভিনয়ে রূপসজ্জা গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হয় বিশেষ প্রমাণের প্রভাবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলেও চৈতন্যের অভিনয়ে যে এই রীতি গৃহীত হইয়াছিল বৈষ্ণব জীবনীকারগণ ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রশেখর ভবনে কৃষ্ণলীলায় শ্রীচৈতন্য [৩]'রুক্মিণীহরণ' পালা অভিনয় করেন। বৃন্দাবন দাস অনুযায়ী দেখা যায় যে ইহার পরে তিনি গোপীবেশে [৪]'ব্রজলীলারও' অভিনয় করিয়াছিলেন। সাধারণত উৎসব উপলক্ষে যাত্রাদির ব্যবস্থা হইত বলিয়া ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে যে চৈতন্যদেব 'রুক্মিণী দ্বাদশীব্রত' উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রশেখরের ঘরে 'রুক্মিণীহরণ' পালা অভিনয় করিয়া থাকিবেন। উপলক্ষ অনুযায়ী প্রথম পালার পরে তিনি কৃষ্ণযাত্রার অন্য পালার উপস্থাপনা করেন। আমাদের দেশে ধর্মোৎসবে সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়ে এখনও দেখা যায় যে প্রথমে উপলক্ষ অনুযায়ী একটি পালা প্রয়োগের পরে অন্যান্য বিষয় অবলম্বনে

১। শ্রীচন্দ্রশেখর-- ভাগ্য তার এই সীমা। যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা॥ বসিলা ঠাকুর সর্ব-বৈষ্ণব সহিতে। সভারে হৈল আজ্ঞা স্বকাচ কাচিতে॥ চৈতন্য ভাগবত—পৃঃ ২৭০

২।—আচার্য রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যার ঘরে দেবভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥ আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৩। বিনিবন্ধু বধি মোরে হরিবা যেমনে। তাহার উপায় বোলোঁ তোমার চরণে॥ চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ২৭২, সঃ-সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৩৬৯)

৪। প্রভু হইলেন গোপী নিতাই বড়াই। কে বুঝিবে ইহা যাহার অনুভব নাই॥ ঐ পৃঃ ২৭৭

রচিত পালা উপস্থাপিত করা হয়। শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি উৎসবে প্রথমে উপলক্ষ অনুযায়ী শিবরাত্রিবিষয়ক পালা, কৃষ্ণের জন্ম বিষয়কপালা, লক্ষ্মীর পালা অনুষ্ঠিত হইবার পরে অন্যান্য পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক পালা অভিনীত হইয়া থাকে।

নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত খানের ব্যবস্থাপনায় নদীয়ায় চৈতন্যদেবের অভিনয় সম্পাদিত হয়। অভিনয়ে চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, ব্রহ্মানন্দ, মুরারিগুপ্ত, শ্রীরাম, অদ্বৈত, গদাধর প্রমুখ বৈষ্ণবগণ অংশ গ্রহণ করেন,—

[১] গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ি—সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস—জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।

শেষ পর্যন্ত এই অভিনয়ে চৈতন্যই রুক্মিণীর ভূমিকা অভিনয় করেন এবং [২]গদাধর রাধার রূপসজ্জা গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন যে দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীচৈতন্য আদ্যাশক্তি রাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন,—

[৩]হেনই সময় সর্বপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি বেশধর॥

অদ্বৈতাচার্য বিদূষক রূপে অবতীর্ণ হন। এই অঙ্ক-নৃত্য অর্থাৎ নৃত্যযুক্ত নাট্যাভিনয়ে চৈতন্যের রূপসজ্জা সম্পর্কে চৈতন্যমঙ্গলে নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

[৪]হৃদয়ে কাঁচুলি পরে শঙ্খ কঙ্কণ করে,
দুটি আঁখি রসে ডুবু ডুবু॥

১। চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, পৃঃ ২৬৯, বৃন্দাবন দাস—সঃ-সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ১২৬৯

২। রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।······
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি। ঐ পৃঃ ২৭৩

৩। চৈতন্য ভাগবত—মধ্যখণ্ড—১৮শ পরিচ্ছেদ

৪। চৈতন্যমঙ্গল—মধ্য খণ্ড—লোচন দাস, পৃঃ ১৩৮—সঃ—মৃণালকান্তি ঘোষ, ১৩৫৪

পট্টবসন পরে, নূপুর চরণতলে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা বা দিবকাহে,
গোপীবেশে ঠাকুর আপনি॥

বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্য রূপানুরূপ সজ্জা গ্রহণ করিয়াছিলেন

হরিদাস কোতোয়ালের সাজসজ্জা গ্রহণ করেন,—

১ প্রথমে প্রবিষ্ট হইলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস॥
মহা-পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
দণ্ড হস্তে সভারে করয়ে সাবধান॥

চৈতন্য পূর্ববর্তী অভিনয়ানুষ্ঠানে প্রবেশ ও প্রস্থানের যথারীতি ব্যবহার ছিল কিনা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কিন্তু চৈতন্য প্রবর্তিত অভিনয়ে প্রবেশ-নিষ্ক্রমণের ব্যবহার স্পষ্ট।

শ্রীবাস নারদের বেশ ধারণ করেন,—

২ মহাদীর্ঘ পাকাদাড়ি, ফোঁটা সর্বগায়।
বীণাকান্দে, কুশ হস্তে চারিদিকে চায়॥

বড়াইর রূপসজ্জা গ্রহণ করেন ব্রহ্মানন্দ,—

৩ হাথে নড়ি, কাঁথে-ডালি, টেন পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান॥

কৃষ্ণলীলাভিনয়ে সকলেই চৈতন্যের নির্দেশ মানিয়া লইতেন। তিনিই অভিনেতৃগণের মধ্যে ভূমিকা বিতরণ করিতেন। সু-অভিনয়ের প্রতিও তাহার দৃষ্টি ছিল। চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করিয়া ভাবাবেগযুক্ত অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকসমাজে শ্রীচৈতন্য অপূর্ব রসসঞ্চার করিতেন,—

৪ আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলি কলমে॥

উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্যদেব স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চ,

১। ২।৩।৪।—শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, অধ্যায় ১৮, বৃন্দাবনদাস।

বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ, প্রলয় (মূর্ছা) যুক্ত [১]জ্যেষ্ঠ জীবন্ত সাত্ত্বিক অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করিতেন। তিনি জানিতেন যে সকল প্রকার অনুকরণকেই অভিনয় বলে না। ভাবরসোদ্বোধক স্বাভাবিক অনুকরণই অভিনয়। প্রথম শ্রেণীর এই অভিনয়ের জন্য 'আবেশ' বা empathy অর্থাৎ অভিনেতব্য চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার identification (আমিই সেই এই ভাব) প্রয়োজন। সংস্কৃতে দিগ্‌গজ পণ্ডিত চৈতন্যদেবের সঙ্গে নাট্য শাস্ত্রের পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। নাট্য শাস্ত্র হইতেও তিনি এই শ্রেণীর [২]সাত্ত্বিক অভিনয়ের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর [৩]চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করেন। সেখানে থাকাকালীনও তিনি নাট্যাভিনয় করেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই বিষয়ে তাঁহার সহযোগিতা করিতেন। জন্মাষ্টমীর সময় নন্দোৎসবে যে চৈতন্যদেব 'ব্রজলীলা' নাট্যানুষ্ঠান করেন তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃতে। চৈতন্যের সঙ্গে কাশীমিশ্র, নিত্যানন্দ, সার্বভৌম, কানাই খুটিয়া, তুলসী পাত্র, জগন্নাথ মাইতি প্রমুখ বহু বৈষ্ণব অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন,—

[৪] এই মত নানারঙ্গে চাতুর্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণ-জন্ম যাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা॥
কৃষ্ণ-জন্ম-যাত্রাদিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হইলা প্রভু লইয়া ভক্তসব॥
দধি দুগ্ধ ভার সবে নিজ-স্কন্ধে করি।
মহোৎসব স্থানে আইলা বলি হরি হরি॥
কানাই খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছে ব্রজেশ্বরী॥

১। সত্ত্বা তিরিক্তোঽভিনয়ো জ্যেষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে।
সমসত্ত্বোত্তবেন্মধ্যঃ সত্ত্বহীনোঽধমঃ স্মৃতঃ॥ শ্লোক ২.—অধ্যায় ২২ নাট্যশাস্ত্র, বরোদা

২। যথা জীব স্বভাবস্ত পুরিত্যজ্যাস্ত দৈহিকম্।
পরভাবং প্রকুরুতে পরদেহং সমাশ্রিত॥
এবং বুধঃ পরং ভাবং সোঽস্মিতি মনসা স্মরণ।
বেশবাগাঙ্গলীলাভি শ্চেষ্টাভিশ্চ সমাচরেৎ॥ শ্লোক ৭—৮, ২৬ অধ্যায়, নাটশাস্ত্র, বরোদা

৩। চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

৪। —ঐ ১৫শ পরিচ্ছেদ

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্বভৌম আর পরিছাপাত্র তুলসী ॥
ইহা সব লৈয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।

এই অভিনয়ে গোপবেশী চৈতন্যের লাঠি খেলা দর্শকদের মধ্যে বিশেষ চিত্ত-চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল,—

[১] অলাত চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোকচিত্তে চমৎকার পায় ॥

বিজয়া দশমী উপলক্ষে চৈতন্যদেব নীলাচলে আর একটি নাট্যানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে 'রাবণবধ' পালা অভিনীত হয়। মহাপ্রভু হনুমানের ভূমিকা গ্রহণ করেন,—

[২] বিজয়াদশমীলংকা—বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥
হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লংকার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া।
কাঁহারে রাবণা—প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥
গোসাঁইর আবেশ দেখি লোক চমৎকার।
সর্বলোক জয় জয় বলে বার বার ॥

চৈতন্যদেবের কৃষ্ণলীলা অভিনয় দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিত। চন্দ্রশেখর ভবনে তাঁহার অঙ্ক-নৃত্য অভিনয়ে [৩]'আনন্দে না জানে কেহ নিশিভেল শেষ।' চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীতি ও শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণলীলাভিনয় অবলম্বনে মধ্যযুগের পালা অভিনয় সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ধারণা করা যাইতে পারে। (ক) এই শ্রেণীর অভিনয়ের জন্য সব সময় পালা বাঁধা থাকিত না, বাঁধা থাকিত গান। (খ) তাহার সঙ্গে কথনো কথনো উপস্থিত মত কিছু সংলাপ মিশাইয়া পাত্রপাত্রী নৃত্য ও ভাবভঙ্গী সহযোগে অভিনয় করিত। (গ) নর ও নারী উভয় প্রকার চরিত্রই [৪]পুরুষ দ্বারা অভিনীত হইত। (ঘ) বৃদ্ধ বৃদ্ধা চরিত্রের মাধ্যমে ইহাতে হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থাও অনেক সময় থাকিত।

১।২। চৈতন্য চরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৫শ পরিচ্ছেদ।
৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১৮শ অধ্যায়, পৃঃ ২৭৬, সঃ—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ১৩৬৯
৪। হইলা বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ। সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র ॥ ঐ পৃঃ ২৭৭

ব্রহ্মানন্দের বড়াই বুড়ী এবং শ্রীবাসের বৃদ্ধ নারদের অভিনয় দর্শকদের [1]হাসির উদ্রেক করিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও নারদের ভাবভঙ্গী এবং রূপসজ্জা পরিকল্পনা হাস্যকর,—

[2]পাকিল দাড়ী মাথার কেশ।
বামনশরীর মাকড় বেশ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতি।
বিকৃত বদন উমত মতী ॥
… … …
নানা পরকার করে অঙ্গ ভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥
… … …
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥

ব্রহ্মার মানসপুত্র জ্ঞানী ও ভক্ত। তদুপরি নারদ একজন মুনি। তিনি [3]দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে স্পৃহাহীন, আসক্তি, ভয় ক্রোধশূন্য স্থির মতির ব্যক্তি এইরূপ চরিত্রের হাবভাব ও সাজসজ্জা হাস্যকর হওয়া শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত নহে। চণ্ডীদাস লৌকিক রীতি অনুসারে এই চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নারদ চরিত্রে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের [4]বড়ায়ির চলনের সঙ্গে চৈতন্যের কৃষ্ণলীলায় [5]বড়ায়ির গতিভঙ্গীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। (ঙ) পালায় বিষয়বস্তু রুক্মিণী হরণের মত পৌরাণিক ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মত লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ কথা। (চ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানে মার্গ সঙ্গীতের রাগ তাল এবং চৈতন্যের অভিনয় প্রসঙ্গে রুক্মিণীর পত্রপাঠে [6]'কারুণ্য

১। শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্বগণ হাসে।………শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠার বাক্য শুনি। হাসিয়া বৈষ্ণবগণ করে জয়ধ্বনি ॥ চৈ. ভা—পৃঃ ২৭১। ব্রহ্মানন্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্গে। ঐ পৃঃ ২৭৩

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জন্মখণ্ড—বড়ু চণ্ডীদাস।

৩। দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ২।৫৬—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

৪। কুটিলগমন ঘন কাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জন্মখণ্ড

৫। আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে। বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেম রসে ভাসে ॥ চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, বৃন্দাবন দাস।

৬। চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১৮শ অধ্যায়—বৃন্দাবনদাস

সারদা রাগ' ও মহামায়া ভাব সৃষ্টিতে 'মালশীরাগের' উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, তৎকালের সংগীতে সাধারণত ক্লাসিকাল রীতি অনুসৃত হইত। কিন্তু লৌকিক সুরের ব্যবহারেও কোন অন্তরায় থাকিবার কথা নহে। (ছ) সংগীতে কখনও পাত্রপাত্রী কখনো বা মূল অধিকারী ও দোহারগণ অংশ গ্রহণ করিতেন। পালাভিনয়ে সংগীত ও নৃত্যেরই প্রাধান্য ছিল। (জ) অভিনয়ে বেশভূষা ও বাস্তবানুগ ভাবপ্রকাশের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হইত। (ঝ) দীর্ঘ সময় ধরিয়া এই সব অভিনয় চলিত। কখনো আবার সমগ্র পালার অংশ বিশেষ একএকদিন অভিনীত হইত; এবং এইরূপে পর পর কয়েকদিনে পালাভিনয় সমাপ্ত হইত। (ঞ) ইহাতে অনেক সময় অধিকারীর নাট্যনির্দেশ, নাট্যকথন বা মন্তব্য সংযোজিত হইত। (ট) কখনো কখনো ইহাতে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে সংলাপ-বিনিময় হইত। (ঠ) পালাগুলি দর্শকপরিবেষ্টিত আসরে পরিবেশিত হইত।

চৈতন্যের অভিনয় দেখিয়া অথবা ইহার বিবরণ শুনিয়া বৈষ্ণব ভক্তগণ নাট্যরচনায়ও মনোনিবেশ করেন। বৈষ্ণব রচিত এই সকল নাটকের মধ্যে চৈতন্য জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বনে দশ অংকে বিভক্ত কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়', রায় রামানন্দের পঞ্চাঙ্কের 'জগন্নাথ বল্লভ', কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক রূপগোস্বামীর সাত অংকে বিভক্ত 'বিদগ্ধ মাধব'' অপৌরাণিক প্রচলিত কাহিনী কৃষ্ণের ঘাট-দান লইয়া রচিত রূপগোস্বামীর 'দানকেলি কৌমুদী' ভণিকা, কৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলা বিষয়ক তদ্‌রচিত দশ অংকের 'ললিত মাধব' ও দেবীনন্দন সিংহের 'গোপীনাথ বিজয়' উল্লেখযোগ্য। চৈতন্য চন্দ্রোদয় রচিত হয় খ্রীষ্টীয় ১৫৭৩ অব্দে। এই নাটক কটকের রাজা [1]প্রতাপরুদ্রের রাজসভায় জগন্নাথদেবের চন্দনোৎসব উপলক্ষে প্রথম অভিনীত হয়। বিদগ্ধ মাধবের রচনাকাল নাট্য শেষে '১৫৮৯ সম্বৎগতে' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দানকেলিকৌমুদী রচিত হয় ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। বিদগ্ধজনের জন্য সংস্কৃতে রচিত হইলেও ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি বিষয়বস্তু ও রচনা রীতির দিক হইতে তৎকালে প্রচলিত লোকনাট্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

দানকেলিকৌমুদী :—ভরত মুনির নাট্য শাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত দশ প্রকার নাট্য রচনার অন্তর্গত ভাণ এবং চতুর্দশ শতকের বিশ্বনাথের সাহিত্য

1. ...First presented at the sandal festival of Jagannatha in the court of Raja Pratapa Rudra, king of Cuttack. p. VII Introduction to Chaitanya Chandrodaya—Rajendra Lal Mitra (Calcutta—1854)

দর্পণের অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের অন্তর্গত ভাণিক-এর লক্ষণ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে এই ভাণ বা ভাণিক আত্মানুভূত বা অন্যানুভূত বিষয় অবলম্বনে একোক্তিমূলক (monologue) এক অংকের নাট্য রচনা। পঞ্চদশ শতকে বামন ভট্ট রচিত 'শৃঙ্গারভূষণ' এই শ্রেণীর রচনা। রূপগোস্বামীকৃত ভাণিকার সঙ্গে ইহার কিছু পার্থক্য আছে। এই [১]ভাণিকা সংগীতে পরিবেশিত হয়। মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্ষ-নির্বহণ নামক পঞ্চ সন্ধির রীতি পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে [২]উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি, সংহার এই সাত ভাগে ঘটনা বিভক্ত করিবার রীতি গৃহীত হয়,—

'অবগণিত সন্ধিভূমা নাট্যকলেয়ং বলিষ্ঠ সপ্তাঙ্গা'—শ্লোক ৯

ইহা একাঙ্ক রচনা হইলেও একোক্তিমূলক নহে। বহু পাত্র-পাত্রী ভাণিকায় সন্নিবেশিত হয়। রাধা, ললিতা, চম্পকলতা, নান্দীমুখী, বিশাখা, চিত্রা, বৃন্দা, কৃষ্ণ, সুবল, অর্জুন, মধুমঙ্গল প্রভৃতি বহু চরিত্রের বিভিন্ন পরিবেশে ছোট ছোট সংলাপ ও সংগীত আশ্রয়ে দানকেলিকৌমুদী রচিত হইয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিংশতি অধ্যায়ে নাট্যরচনার চার প্রকার বৃত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে,—ভারতী, সাত্ত্বতা, কৈশিকী ও আরভটী। রূপগোস্বামী এই নাট্য রচনায় [৩]ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতী বৃত্তিতে করুণ-বীভৎস রস, সংস্কৃত ভাষা ও পুরুষ চরিত্রের অবতারণা করা হয়; [৪]কৈশিকী বৃত্তিতে হাস্য-শৃঙ্গাররস, বিচিত্রবেশ, বহু নৃত্যগীত ('বিচিত্র বেশা' 'বহুনৃত্য গীতা') এবং পুরুষ ও নারী চরিত্রের উপস্থাপনা থাকে। লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ কথা গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতে রচিত ও সংগীতে পরিবেশিত রূপগোস্বামীর এই গীতিনাট্য রচনা জয়দেবের গীতিগোবিন্দ গীতিনাট্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

জগন্নাথবল্লভ নাটক :—চৈতন্যদেবের শিষ্য উড়িষ্যার রায় রামানন্দ রাধাকৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে 'জগন্নাথ বল্লভ' নামে যে পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন তাহাও শ্রীগীতগোবিন্দ গীতিনাট্য দ্বারা প্রভাবিত। [৫]রাজা প্রতাপরুদ্রের

১। ভাণিকেয়ংগেয়রূপা—ব্যাখ্যা সমাপ্তি, দান কেলিকৌমুদী—৩য় স.—১৩৩০

২। উপন্যাসোঽথ বিন্যাসো বিরোধঃ সাধ্বসং তথা সমর্পণং নিবৃত্তিশ্চ সংহারশ্চাপি সপ্তম ইতি। দানকেলিকৌমুদীর (৯ শ্লোকের) জীবগোস্বামীকৃত টীকা।

৩। পরমস্যবৃত্তের্ভারতী কৌশিক্যোর্যুগেণ আঢ্যঃ। ঐ

৪। হাস্যশৃঙ্গারবহুলা কৈশিকী। ৫৫,-২১শ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র

৫। প্রণয়তু রুদ্রনৃপে সুখমমৃতং। রায় রামানন্দভণিত চরিরমিতং।—৮১.—৫ম অঙ্ক. জগন্নাথ বল্লভ নাটক, প্রঃ—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, ১৩২৮

সুখ-বিধানের জন্য রচিত 'জগন্নাথবল্লভ' একখানি গীতিনাট্য। গীতগোবিন্দের প্রত্যেকটি অংশ সমাপ্তিতে নামাঙ্কিত। রায় রামানন্দের নাটকেরও পাঁচটি অঙ্কই যথাক্রমে [1]পূর্বরাগ, ভাবপরীক্ষা, ভাবপ্রকাশ, রাধাভিসার ও রাধাসঙ্গম নামে চিহ্নিত হইয়াছে। এই নাটকে বহু গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রের রীতি অনুসারে রচিত সংস্কৃত নাটকে সাধারণত এত গীতিসংখ্যা দৃষ্ট হয় না। জগন্নাথ বল্লভের প্রত্যেকটি গানের প্রথমে বসন্ত, কেদার, গোণ্ডকিরী ইত্যাদি রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল গানে ধ্রুবা ব্যবহৃত হইয়াছে। গান-গুলি জয়দেবের রীতি অনুসারে রচয়িতা রামানন্দের ভণিতাযুক্ত। প্রতাপ রুদ্রের সন্তোষবিধানের জন্য রচিত বলিয়া গানে তাহারও নামোল্লেখ দেখা যায়। গীতগোবিন্দে প্রাকৃত পৈঙ্গলের ছন্দোরীতি অনুযায়ী যেমন পংক্তির শেষে মিল (rhyme) ব্যবহৃত হইয়াছে জগন্নাথ বল্লভের প্রত্যেকটি গানে তেমনি মিলের পরিচয় রহিয়াছে। একটি গান উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে,—

[2]গোণ্ডকিরীরাগেণ

কলয়তি নয়নং দিশিবলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদুমারুতচলিতং ॥
কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদসমুদিত—মনসিজ বাধা ॥ । ধ্রু।
বিনিদধতী মৃদুমন্থর পাদং।
রচয়তি কুঞ্জরগতিমনুবাদং ॥
জনয়তু রুদ্রগজাধিপমুদিতং।
রামানন্দ রায় কবিগদিতং ॥

গীতগোবিন্দে মাঝে মাঝে নাট্য নির্দেশের ব্যবহার আছে; এই নাটকেও ইহার পরিচয় রহিয়াছে। গীতগোবিন্দ নৃত্যগীতে রূপায়িত হইবার জন্য রচিত। জগন্নাথবল্লভ নাটকও এইভাবে পরিবেশিত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ রহিয়াছে। এই নাটকের সংলাপও সংগীত উভয়ই ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। গীতিনাট্যের সংলাপ সুরে পরিবেশিত

১। পূর্বরাগো নাম প্রথমোঽঙ্ক, ভাবপরীক্ষা নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ, ভাবপ্রকাশোনাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ, রাধাভিসারশ্চতুর্থোঽঙ্কঃ, রাধাসঙ্গমোনাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ—জগন্নাথ বল্লভ নাটক।

২। জগন্নাথ বল্লভ— (৩৭) ১ম অঙ্ক, সঃ—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, ১৩২৮

হইবার রীতি আছে। এই নাটকের সংলাপও সুরে পরিবেশিত হইত কিনা এ সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। জগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে কয়েকটি সংলাপ উদ্ধৃত হইল,—

[১]মদননিকা—অয়ি সরলে অত্রাপি প্রষ্টব্যাস্মি ॥ ১১ ॥

অশোক—অণু সরিদব্বো মুউন্দো ॥ ১২ ॥

মদণিকা—অথ কিং ॥ ১৩ ॥

অশোক—অধকথং তাএ লজ্জাতরলা এহিঅঅংতু এণ্ণাদং ॥ ১৪ ॥

উনবিংশ শতকের কৃষ্ণযাত্রায় গোবিন্দ অধিকারীর নাটকে গদ্য ও পদ্য সংলাপ সুরে পরিবেশিত হইবার রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাহার 'মুক্তাবলী' ও 'দেয়াশিনী মিলন' পালা দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। জগন্নাথবল্লভ নাটকও হয়ত সামগ্রিক ভাবে সুরে পরিবেশিত হইত। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। লোকায়ত বিষয়বস্তু, রচনা ও পরিবেশন রীতির দিক হইতে 'গীতগোবিন্দ' প্রভাবিত 'দানকেলি কৌমুদী ও 'জগন্নাথবল্লভ' নাট্যদ্বয় তৎকালীন লৌকিক-রীতির নাট্যাভিনয়-প্রভাব-পুষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ।

ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে পূর্বোল্লিখিত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটি বাংলাপয়ারে অনুদিত হইবার ফলে ঐগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে লোচন দাস 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকের, ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে যদুনন্দন দাস 'রাধাকৃষ্ণলীলাকদম্ব' নামে 'বিদগ্ধমাধবের' এবং ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র) 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী' নাম দিয়া 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। বৈষ্ণব জীবনীকারদের মধ্যে ষোড়শ শতকে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', চূড়ামণি-দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়', সপ্তদশ শতকে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত', নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গীতাকারে রচিত 'গৌরচরিত্র চিন্তামণি' ও 'গীতচন্দ্রোদয়', বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, নরোত্তমদাস প্রমুখ বৈষ্ণবপদকর্তাদের বিভিন্ন ভাবের পদ অবলম্বনে সংকলিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র'

[১] জগন্নাথবল্লভ—(১১—১৪) ২য় অঙ্ক

বৈষ্ণবদাসের (গোকুলানন্দ সেন) 'গীতকল্পতরু' (পদকল্পতরু), কবিচন্দ্রের 'কৃষ্ণমঙ্গল', বলরামদাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। ইহার ফলে কৃষ্ণযাত্রার প্রসার লাভ ঘটে। উল্লিখিত চৈতন্য বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রচারের জন্য আবার চৈতন্য যাত্রারও প্রচলন হয় এবং লোকসমাজে ক্রমেই ইহার জনপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য কায়স্থ চন্দ্রশেখর দাস কৃষ্ণযাত্রা রচনা করিতেন। [1]"তাহার রচিত প্রথম যাত্রার পালার নাম হরিবিলাস।" চন্দ্রশেখরের শিষ্য জগদানন্দ এই পালায় 'রাই' সাজিতেন।"

মধ্যযুগে [2]পাল রাজাদের কাহিনী লইয়াও পালাগান প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতক হইতে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তার লাভ করিতে থাকায় রাধা-কৃষ্ণ কথা পালাভিনয়ে প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু লোকায়ত চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি শাক্ত কাহিনী, ধর্মমঙ্গল-কাহিনী, এবং ময়নামতী-গোবিন্দ চন্দ্র (গোপী চন্দ্র), গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথ-সিদ্ধদের কথা অবলম্বনে ও পালাভিনয় অপ্রচলিত থাকিবার কথা নহে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, নাথসাহিত্য প্রভৃতি যাহাদের প্রিয় ছিল তাহারা ইহাদের কাহিনী অভিনয় করিতেন, শুনিতেন।

(সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে নাথকাহিনী লইয়া রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটকে' বাঁধা পালার (লোকনাট্যের) পরিচয় পাওয়া যায়। নেপালে প্রাপ্ত এই নাটকে বাংলা ও নেপালী দুই রকম ভাষা দেখা হয়। বাংলায় রচিত ইহার গানগুলি প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে জাফীরখান সম্রাট ঔরঙ্গজীবের নিকট হইতে নবাব মুর্শিদকুলী উপাধি সহযোগে বাংলা ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ প্রথমেই মুকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করিয়া মুরশুদাবাদ নামে ঐ স্থানটিকে চিহ্নিত করেন। ইহার পর মুর্শিদকুলী খাঁ মুরশুদাবাদে প্রাসাদ, টাকশাল ও অন্যান্য সরকারী আপিস স্থাপন করিয়া ইহাকে বাংলার রাজধানীতে পরিণত করেন। নবাব গোপনীয় রাজকার্যে ভূপৎ রায় ও কিশোর রায়কে নিযুক্ত করিবার পরে অন্যান্য সরকারী কাজে

১। জীবনীকোষ (ভারতীয় ঐতিহাসিক)—৩য় খণ্ড, শশিভূষণ বিদ্যালংকার, ১৩৪৫

২। যোগী পাল ভোগী পাল মহীপালের গীত। ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত॥ চৈতন্য ভাগবত বৃন্দাবন দাস

বাছাই করা হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিলেন। এই সময় হইতে মুরশুদাবাদে চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের উৎপত্তি আরম্ভ হইল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্রমে রাষ্ট্রে ও ইহার ফলে সমাজে প্রাধান্য পাইতে সুরু করিল। মুর্শিদকুলী খাঁ [1]উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত মেদিনীপুর জিলাকে পৃথক করিয়া বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশের সীমানা বর্ধিত করিলেন। দেশের উৎপন্ন বৃদ্ধি কল্পে নবাব বিভিন্ন গ্রামের পতিত জমি উদ্ধার করিয়া চাষাবাদেরও ব্যবস্থা করেন। [2]ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে পঁচিশ হাজার টাকার পরিবর্তে নবাবের নিকট হইতে কাশিমবাজারে একটি কুঠী স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। ইহার ফলে ক্রমে মুর্শিদাবাদ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। অন্যদিকে মোগল সরকারের আপত্তি না থাকায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা অঞ্চলে Fort William সৈন্যাবাসে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে শতাধিক ইউরোপীয় সৈন্য সমাবেশ করিয়া নিজেদের ধনসম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করিল। বড়িষার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা—এই তিনটি গ্রামের উপর আধিপত্য লাভ করে। তৎকালে Fort William-এর সৈন্যদলের সাহায্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতদঞ্চলের দস্যু ডাকাতের অত্যাচার হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতি লইয়া পর্তুগীজ, আর্মেনি, মোগল, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় কলিকাতায় ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করিল। রক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় ব্যবসায়ীরাও এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। ব্যবসাকে অবলম্বন করিয়া এখানেও চাকুরীজীবী একটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল এবং অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতা জনবহুল সহরে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল। মুর্শিদকুলী খাঁ দেশের জন্য কিছু কিছু কাজ করিলেও কর আদায়ের জন্য ভূস্বামীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। জমিদারগণ ঠিক সময় বাৎসরিক খাজনা মিটাইতে না পারিলে তাহাদের ধরিয়া আনিয়া কর-ব্যবস্থা

1. He also annexed the district of Midnapore to Bengal although it had always before constituted a part of Orissa. p. 232. History of Bengal, Stewart.

2. ...in the year 1706 the English East India Company was induced to pay him 2 ,000 Rupees, for permission to establisd a factory at Cossimbazar. Ibid.

ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের খাদ্য ও পানীয় বন্ধ করিয়া দিতেন। অনেক সময় মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইত, শীতকালে গায়ে জল ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে রাখিবার ব্যবস্থা হইত। নবাবের সহকারী দেওয়ান সৈয়দ রেজাখানের অত্যাচার বীভৎস রূপ ধারণ করিয়াছিল। যে সকল ভূস্বামী যথা সময়ে চৈত-কিস্তি দিতে পারিতেন না তাহাদের শ্বাসরোধকারী পূতিগন্ধময় বিশেষ ধরণের পুকুরে দড়ি বাঁধিয়া টানা হইত এবং কখনো আবার ঢিলা পায়জামা পরাইয়া তাহার ভিতরে জীবন্ত বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই রূপ অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণের ফলে প্রাচীন বনিয়াদী জমিদারদের অনেকের জমিদারী বিকাইয়া গেল এবং তাহার জায়গায় একদল নব্য জমিদার সৃষ্ট হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নবাব আলিবর্দির আমলে মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ ভাস্কর পণ্ডিত ও তাহার বর্গীরা বাংলা আক্রমণ করেন। ভাস্কর পণ্ডিতের [1]দাবী নবাবের হাতীশালের সমস্ত হাতী এবং দশ মিলিয়ন টাকা আলিবর্দি পূরণ করিতে অস্বীকার করেন। কাজেই বর্গীরা বাংলাদেশে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও লুঠপাঠ সুরু করিয়া দেয়। কৌশলে নবাব ভাস্কর রাওয়ের মৃত্যু বিধান করিবার পরেও চার পাঁচ বৎসর ধরিয়া বাংলা এবং উড়িষ্যায় মাঝে মাঝেই বর্গীর অত্যাচার চলিতে থাকে। মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণ অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া গঙ্গার পূর্বতীরে আসিয়া কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করে এবং [2]মারাঠা-পীড়নের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। মারাঠার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আলিবর্দির অনুমতি লইয়া ইংরেজগণ তিন মাইল দীর্ঘ একটি পরিখা খনন করে। কলিকাতার এই পরিখাটি মারাঠা ডিচ্ নামে খ্যাত। বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা বন্ধ হইবার অল্পকাল পরেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে মীরজাফর, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রমুখের চক্রান্তে

1. Boskar Raow......demanded a crore with all the elephants belonging to the Nawab. p. 283 History of Bengal, C. Stewart

2. During the invasion of the Mahrattas, crowds of the inhabitants of the country on the western side of the river crossed over to Calcutta, and implored the protection of the English. p. 285 History of Bengal—Stewart.

পলাশীর প্রান্তরে প্রহসন মূলক যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাংশ স্মরণ করা যাইতে পারে,—

সেদিন এ বঙ্গ প্রান্তে পণ্য বিপণীর একধারে
নিঃশব্দ চরণে
আনিল বণিক্ লক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসনে
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে ॥ (শিবাজি-উৎসব)

বণিক ইংরেজদের অধীনে দেশীয় শাসনকর্তা রূপে (The Native Governors under the English Dynasty) বাংলার মসনদে মিরজাফরের আরোহণ ইহার পরবর্তী ঘটনা। অষ্টাদশ শতকের এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যে অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও অরাজকতা চলিতেছিল ক্লাইভের গর্দভ ('Colonel Clive's ass') মিরজাফর ও পরবর্তী নবাবদের আমলেও তাহার অবসান ঘটে নাই। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হইবার পরে ইংরেজদের সহিত বিরোধ দেখা দেয়। ফলে দেশের গণ্যমান্যদের অনেককে ইংরেজদের সহায়ক মনে করিয়া ধরিয়া আনাইয়া তিনি বন্দী ও হত্যা করিতে থাকেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরেজদের হাতে যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে ইংরেজ কুঠিয়ালগণের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার পড়ে। কিন্তু ফৌজদারী কার্যের ভার নবাবদের হাতে থাকে। ইহাতে দুই দলের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা না হওয়ায় রাজকার্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে দেশে নানা প্রকার অত্যাচার অবিচার চলিতে থাকে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দেশব্যাপি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; ইহা 'ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর' নামে খ্যাত। এই সময় পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর হাজার লোকের জীবনাবসান ঘটে। [১]"পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, খালাখন্দে দলে দলে মানুষ মরিয়া পড়িয়া থাকিত; ফেলিবার লোক পাওয়া যাইত না। আশ্চর্যের বিষয় এই, নব-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ রাজগণ এ মহামারী নিবারণের বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন

১। রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৫, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭

করেন নাই।" তদুপরি তাহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের যথেষ্ট শোষণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। দেশত্যাগ ও মৃত্যুর ফলে রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছিল তৎকালীন গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর [1]চিঠি হইতে জানা যায় যে অবশিষ্ট লোকের নিকট হইতে বলপূর্বক তাহা উসুল করা হইয়াছিল। ইংরেজ বণিকগণ এই দেশে রাজ্যলাভ করিয়াও বহুকাল ধরিয়া রাজার কর্তব্য রক্ষার দায়িত্ববোধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে অষ্টাদশ শতকের বাকি অংশ কাটিয়া যায়। অত্যাচার ও পীডন-শোষণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ধনীরা নবাব ও শক্তিমানদের তোষামোদ এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উপর তলার এই প্রবৃত্তি ক্রমে নিম্নতলে সংক্রামিত হইল। ইহাতে সত্য-নিষ্ঠা মর্যাদা হারাইতে লাগিল। কাজেই অনেকে আবার এই সুযোগে জালজুয়াচুরি, উৎকোচাদির সহায়তায় ধন লাভে সমর্থ হইয়া সমাজে গৌরবের অধিকারী হইতে লাগিল। এই ভাবে নীতি বোধ স্খলিত হওয়ায় জনরুচি নিম্নগামী হইয়া পড়িল। এই শতকে যে সকল 'হঠাৎ নবাবরা' জমিদারির ইজারা লইল তাহাদের শিক্ষাসংস্কৃতির প্রতি তেমন নজর ছিল না। কাজেই একটু নিম্ন রুচির প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক পৃষ্ঠপোষকতা দেখা দিল। এই সময় পূর্ব প্রচলিত যাত্রা, ঝুমুর, পাঁচালি, কথকতা ও কীর্তনের পাশাপাশি নানাস্থানে আদিরসাত্মক খেউড় গানের বিশেষ প্রচলন হয়। নদীয়া ও হুগলী অঞ্চলে ইহার খুব সমাদর বাড়ে—

[২]নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে আদিরসাত্মক ভাবের প্রস্রবণ বহিয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত তরজাগানেও এই শ্রেণীর গীত প্রবেশাধিকার পাইল। এই শতকে উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক তরজা হইতে জাত কবিগানের খুব বিস্তৃতি ঘটে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে কলিকাতা সিমুলিয়ার হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরুঠাকুর—১৭৩৮-১৮১২ খ্রীঃ), ফরাসডাঙ্গা-গোন্দলপাড়ার রাসুরায় (জন্ম ১৭৩৪ খ্রীঃ) ও নৃসিংহ রায় (জন্ম ১৭৩৮ খ্রীঃ),

1. It is called Najar, and it is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands to make up for the loss sustained in the rents of their neighbours, who are either dead or fled from the country. Nov. 3, 1772—ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকে লিখিতপত্র

২। অন্নদামঙ্গল—২য় খণ্ড, বারমাস বর্ণন, ভারতচন্দ্র

চন্দননগরের নিত্যানন্দ বৈষ্ণব (নিতাই বৈরাগী—জন্ম ১৭৫১ খ্রীঃ), বাগবাজার নিবাসী গুপ্তিপাড়ার ভোলাময়রা, ফরাসডাঙ্গা-গরীটির হেন্সমান এণ্টুনি (এণ্টনি ফিরিঙ্গি), ঠাকুরদাস সিংহ প্রমুখ কবিয়াল খ্যাতি লাভ করেন। কবিগানে গুরু ও দেববন্দনা, সখী সংবাদ, বিরহ এই তিনটি অংশের সঙ্গে যুগরুচি অনুযায়ী চতুর্থ অংশরূপে খেউড় স্থান পাইল। বিকৃত রুচির লেটোগানেরও জনপ্রিয়তা এই শতকে বাড়িয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যাত্রা ও গান যুগরুচি প্রভাবিত হইল। এই সময় যাত্রায় ভাঁড়ামি জাতীয় হাস্যরস পরিবেশনের জন্য পালায় অতিরিক্ত নূতন চরিত্র সংযোজিত হইতে লাগিল। নারদও ব্যাসদেবের ভূমিকায় কৌতুক রসের যোগান দেওয়ার জন্য ভাঁড়ামিকে প্রাধান্য দেওয়া যাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিল। আদিরসের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতার জন্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' অবলম্বনে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নাটমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, ধনীর গৃহ-প্রাঙ্গণ, বারোয়ারীতলা প্রভৃতি স্থানে নানা উপলক্ষে এইসব যাত্রা অভিনীত হইতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, যশোহর ও নদীয়া জিলায় যাত্রাওয়ালাদের আবির্ভাব ঘটে। অত্যধিক সঙ্গীত প্রধান ঐ সকল যাত্রায় গানের পাশে অধিকারীর ব্যাখ্যামূলক কথ্যভঙ্গির বক্তৃতাও সংযুক্ত হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্নরীতির যাত্রা অর্থাৎ শক্তি যাত্রা, নাথ-যাত্রা, পাল-যাত্রা, চৈতন্য-যাত্রা প্রভৃতি প্রচলিত থাকিলেও কৃষ্ণযাত্রাই অধিক জনপ্রিয় হয়। ইহার মূলে রহিয়াছে শ্রীচৈতন্যের অবদান। চৈতন্যদেবের কয়েক শত বৎসর পূর্ব হইতেই রাধাকৃষ্ণ কথা জনপ্রিয় হইতে থাকে; কিন্তু চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ক্রম বিস্তারের ফলে পরবর্তী কালে দেখা যায়---[1]"গুরু কর্ণে মন্ত্র দিতেছেন, পুরোহিত মন্দিরে মন্দিরে কৃষ্ণলীলা দেখাইতেছেন, কথক গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণলীলা কহিয়া বেড়াইতেছেন।" সুতরাং যে দেশে [2]"আবাল-বৃদ্ধ আপামর সাধারণ, দোকানী, গোসাঞি অবসর পাইলেই কৃষ্ণলীলার গ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসে, যে দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে কৃষ্ণলীলা ঢুকিয়াছে—যাহাদের কথায় রাধাকৃষ্ণ, চিন্তায় রাধাকৃষ্ণ, উৎসবে রাধাকৃষ্ণ, সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণ" সেই দেশেই

১। যাত্রা সমালোচনা—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৮৭৫

২। ঐ

তো কৃষ্ণযাত্রার অধিকতর সমাদর হওয়া স্বাভাবিক। তৎকালে প্রচলিত ঐ কৃষ্ণযাত্রার সাধারণ নাম ছিল 'কালিয়দমন যাত্রা'। [১]"মানভঙ্গ, নৌকাবিহার, কংসবধ, প্রভাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই কালিয়দমন যাত্রায় অভিনীত হইত।" কৃষ্ণযাত্রার সাধারণ নাম কালিয়দমন-যাত্রা হইবার কারণটি বিশ্বকোষে উল্লিখিত হইয়াছে; [২]"কালিয়-হ্রদ, কালিয়-নাগকে শ্রীকৃষ্ণ নির্জিত করিয়াছিলেন; সেই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া কোন একটি যাত্রা প্রথমে অভিনীত হওয়ায় উহার নাম কালিয়দমন এই সাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।" কৃষ্ণযাত্রার পালাবিভাগ, সংগীত ও গৌরচন্দ্রী কীর্তন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কীর্তনের কথা সংক্ষেপে উত্থাপিত হইতেছে।

রাজসাহী জিলান্তর্গত খেতুরী বৈষ্ণব প্রধান নরোত্তমদাস গ্রামের পিতৃ-ভূমিতে ছয়টি দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন সপ্তদশ শতকের প্রথমে। তৎকালীন প্রধান বৈষ্ণব ধর্মগুরু ও বৈষ্ণব কবিরা এই উৎসবে যোগদান করেন। খেতুরীর ঐ মহোৎসবে বৈষ্ণবগণের প্রচেষ্টায় [৩]পালাবন্দী কীর্তন গানের সূচনা হয়। ইহাতে প্রথমে চৈতন্যবন্দনা দিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা গীত হইবার রীতি প্রচলিত হয়। খেতুরীর উৎসবে কীর্তনীয়াগণ রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের প্রভাবে পালা কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকার প্রচলন করেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। উল্লিখিত নাটকের প্রথমাংশে রূপগোস্বামী [৪]চৈতন্য বন্দনা করেন। তাহার 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থে অপ্রাকৃত নায়ক নায়িকা [৫]রাধা-কৃষ্ণের শৃঙ্গারকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া নানা পর্যায়ে ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিপ্রলম্ভকে আবার [৬]পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য, প্রবাস এই চারটি পর্যায়ে এবং সম্ভোগকে যমুনাকেলি, নৌখেলা, বংশীচুরি, বস্ত্রচুরি,

---

১। ২।—বিশ্বকোষ ১৩০৯। ৩। "প্রধানত নরোত্তমের চেষ্টায় রাগতালের নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিদগ্ধ বৈষ্ণব সভায় পরিবেশিত হইয়া পদাবলী কীর্তনের সৃষ্টি করিল।...পদাবলী গীতিও আর প্রকীর্ণ গান মাত্র রহিল না, কৃষ্ণলীলার পালা অনুসরণ করিয়া ধারাবাহিক হইল।" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৪৫৯—৪৬০—ডক্টর সুকুমার সেন, ১৯৫৯ ৪। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়া বতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং সভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব সংদীপিতঃ, সদাহৃদয়কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দনঃ॥—২য় নান্দী-বিদগ্ধমাধব নাটক। ৫। সবিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ—শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ, উজ্জ্বলনীলমণি—রূপগোস্বামী। ৬। পূর্বরাগস্তথামানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি। প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্র-লম্ভশ্চতুর্বিধঃ॥ ঐ, রূপগোস্বামী

দানঘট্ট, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ভাগে চিহ্নিত করিয়াছেন। পালাবন্দী কীর্তনগান প্রচলনে উজ্জ্বলনীলমণির এই আদর্শ ক্রিয়াশীল ছিল ইহা মনে করা যাইতে পারে। 'শ্রীগীতচন্দ্রোদয়' পদসংকলন গ্রন্থেও নরহরি চক্রবর্তী বিভিন্ন পদ উজ্জ্বল নীলমণির আদর্শেই শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন,—

[1]বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ—এ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
বিপ্রলম্ভভেদ হয়—এ চারি প্রকার॥
পূর্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য, প্রবাস।
বিবিধ প্রকার ইহা উজ্জ্বলে প্রকাশ॥
মুখ্য গৌণ রূপে সম্ভোগ অষ্ট প্রকার।
ক্রমে এই সকল গীতে হইবে প্রচার॥

[2]নরহরি 'শ্রীগৌরকৃষ্ণরসামৃত' গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরীর উৎসবে প্রচলিত 'গড়ের হাটি' (গড়ানহাটী) কীর্তন রীতি অল্পকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। জনপ্রিয় কীর্তন অঞ্চল ভেদে কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন সহযোগে বর্ধমানের মনোহর শাহী পরগণার শ্রীখণ্ড অঞ্চলে 'মনোহরশাহী', মধ্যরাঢ়ের রাণীহাটি অঞ্চলে 'রেনেটী', ঝাড়খণ্ড এলাকার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে 'ঝাড়খণ্ডী' কীর্তন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। [3]"অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পদাবলী কীর্তন রীতিতে রাগতালের বিচিত্রতা ও মাধুর্য এতটা উৎকর্ষ পাইয়াছিল যে 'মঙ্গল'-পাঞ্চালীর পূর্বতন মর্যাদা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়।" কালক্রমে কীর্তন গানের সঙ্গে 'আখর' রূপে গায়কের ব্যাখ্যান আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত হইয়া নূতনত্ব সম্পাদন করে। এই রীতির প্রথম সূচনা হয় খেতুরীর উৎসবের কীর্তন গায়ক দেবীদাসের গানে। তিনি গানের মধ্যে অনেক সময় [4]ব্যাখ্যা মূলক অতিরিক্ত সুরেলা কথার ব্যবহার করিতেন।

১। শ্রীগীতচন্দ্রোদয় নরহরি চক্রবর্তী, প্রঃ-হরিদাস দাস (নবদ্বীপ)।

২। গীতচন্দ্রোদয় এই গ্রন্থ রসায়ন। ইথে অষ্টামৃত পূর্বে কৈল নিরূপণ॥ প্রথমে কহিল গৌর কৃষ্ণ রসামৃত। ইথে শ্রীউজ্জ্বল গ্রন্থ মতে ব্যক্ত গীত॥ গৌরকৃষ্ণ রসামৃত, নরহরি চক্রবর্তী।

৩। বাংলা সাহিত্যের কথা. পৃঃ ১৩৩. ডক্টর সুকুমার সেন, ক. বি. ১৯৬০,

4. The song sung by Devidas with his poetical comments, drew the eyes of the large assembly to Narottama, though too obvious a reference was not given in the text. p. 133. The Vaishnava Literature of Medieval Bengal (C. U. 1917)—D. C. Sen

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত ভারত চন্দ্রের 'চণ্ডী নাটকে' প্রাচীন পালার বাঁধা রূপের আর একটি নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই পালাটি অসম্পূর্ণ। মনে হয় চণ্ডীদেবীর মহিষাসুর দলনের বিষয় অবলম্বন করিয়া নাট্য রচনার বাসনা ভারতচন্দ্র পোষণ করিয়াছিলেন। নাটক হইতে মহিষাসুরের সংলাপের একটি অংশ উদ্ধার করা হইল। উদ্ধৃতি হইতে ঘোর দৈত্য মহিষাসুরের মোক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং [১]চার্বাকপন্থী ভোগবাদের প্রতি আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়,—

মহিষাসুর—শোন্‌রে গোঁয়ার লোগ ছোড়দে উপাসরোগ
মানহ আনন্দ ভোগ ভৈষরাজ যোগমে।
... ...
আপকো লগাও ভোগ কামকো জাগাও যোগ
ছোড়দেও যাগ-যোগ মোক্ষ য়হী লোগ-মে।

এইরূপ বাঁধা পালার কিছু নমুনা পাইলেও মোটের উপর বলা যায় যে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত লিখিত বাঁধা পালার তেমন প্রচলন হয় নাই।

জনগণের মধ্যে অভিনীত নাটকের সংগীত রীতি প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রাচীন কাল হইতেই ইহাতে রাগ সংগীত ব্যবহৃত হইত। চর্যা পদের সংগীত রীতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বুদ্ধনাটক-এ মার্গ সংগীতের রাগরাগিনীর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ নাটক ছাড়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং চৈতন্যাভিনয়ে রাগরাগিনী সম্বলিত সংগীত প্রয়োগের রীতি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। [২]গৌরচরিতচিন্তামণি ও শ্রীগীতচন্দ্রোদয়-এ ধানসী, তোড়ী, সিন্ধুড়া, কামোদ প্রভৃতি বহু রাগরাগিনীর উল্লেখ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে সপ্তদশ শতকের গায়ন পদ্ধতিতে মার্গ সংগীতেরই প্রাধান্য ছিল। এই শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল পালাভিনয় হইয়াছে তাহার সংগীতাংশে রাগরাগিনীর প্রাধান্য থাকিলেও লোকপ্রিয় লৌকিক সুরও যে কিছু কিছু ব্যবহৃত হইত ইহা অনুমান করা চলে। খেতুরীর উৎসবের পর হইতে বিভিন্ন ঢঙ-এর কীর্তন গান জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকায় অভিনয়ের সংগীতাংশে ইহারও প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। বৈষ্ণব অধিকারীদের কালিয়দমন যাত্রায় কীর্তনাঙ্গ সংগীত নিশ্চিতভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। অন্যান্য যাত্রাও ইহার প্রভাব হইতে

১। ঋণং কৃত্বাঘৃতং পিবেৎ, যাবৎজীবেৎ সুখং জীবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।
২। গৌরচরিত চিন্তামণি ও শ্রীগীতচন্দ্রোদয়—নরহরি চক্রবর্তী, প্রঃ—হরিদাস দাস।

মুক্ত থাকে নাই। কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা প্রচলিত হইবার পর হইতে কৃষ্ণযাত্রার পালায় [১]"প্রত্যেক যাত্রাভিনয়ে মোহড়া স্বরূপ সর্বাগ্রে গৌরচন্দ্রী পাঠ হইত।" সুতরাং সংগীত-রীতি ও নাট্যোপস্থাপনার দিক হইতে চৈতন্যোত্তর যাত্রাভিনয়ে এক রূপান্তর ঘটিল।

অষ্টাদশ শতকের যাত্রায় ব্যবহৃত যন্ত্রের মধ্যে ঢোলকের প্রাধান্য ছিল। [২]"কেবল যুদ্ধের কালে যাত্রায় জয়ঢক্কার বাদ্য হইত।" 'অন্নদামঙ্গলের' (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত) ষোলটি গীতই ক্লাসিকাল সুরে গাইবার নির্দেশ দিয়া ভারতচন্দ্র বসন্ত, কেদারা, হাম্বির, দেওবিভাস প্রভৃতি রাগের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে ক্লাসিকাল গানের খুব প্রচলন ছিল বলিয়াই ভারতচন্দ্র গানে রাগ-রাগিনী ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন। সুরের দিক হইতে এই প্রচলিত রীতিই যাত্রায় গৃহীত হইত। যাত্রার রাগ সংগীতের সুরে জনপ্রিয় কবিগানের ঢঙ্ ও যে মিশিয়া ছিল ইহাতে কোন সংশয় নাই। কবিগানের সুরে সাধারণত উচ্চাঙ্গ রাগরাগিনী অধিক থাকে। যাত্রার আসরে বহুদর্শকের শ্রুতি রঞ্জনের জন্য এই রীতি গৃহীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যেখানে উচ্চাঙ্গ রাগের ব্যবহার সম্ভব নহে সেখানে ছড়া সুরে গান বাঁধিবার দিকে যাত্রায় নজর দেওয়া হইত বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক হইতে প্রচলিত যাত্রা ও সঙ্গীতাদির একটি বিবৃতি উদ্ধার করা যাইতেছে; হিন্দুস্থানী ও বাংলা গীতরীতির মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়া জয়নারায়ণ ঘোষাল এই বিবরণ দিয়াছেন,—

[৩]হিন্দুস্থানে শুনি ইহা করিল প্রচার।
বাঙ্গালা দেশের ছাপ ভিন্ন রীতি তার॥
সংকীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর।
গড়াহাটি রানিহাটি বিরহ মাথুর॥ ১৩॥
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার।
কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর॥ ১৪॥
পাঁচালি অনেক ভাতি রামায়ণ সুর।
কত কথা তরজাতে সারিতে প্রচুর॥ ১৫॥
ভবানী ভবের গান মালসীমায়ুর।
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর॥ ১৬॥

১। বিশ্বকোষ, ১৩০৯ ২। বিশ্বকোষ—১৩০৯
৩। করুণানিধান বিলাস, পৃঃ ২৫৭, জয়নারায়ণ ঘোষাল, ১৮২০

বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুর চুর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর ॥ ১৭ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
শ্রবণে যাহার গানে ভকত আতুর ॥ ১৮ ॥
কালিয় দমন রাস চণ্ডীযাত্রাধীর।
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপুর ॥ ১৯ ॥
সাপুড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গালার নবগানে নূতন ঝুমুর ॥ ২০ ॥

উপরের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতকে গড়ানহাটি, রাণিহাটি প্রভৃতি ঢঙের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা-কীর্তন, কবি, পাঁচালি, রামায়ণ গান, তরজা, সারি, মালসী, গঙ্গাগীতি, বিজয়াসংগীত, আখড়াই, জারি, সাপুরের গান, ঝুমুর গান প্রভৃতির পাশে গোবিন্দমঙ্গল ও চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ, এবং কালিয়দমন-রাস-চণ্ডী-চৈতন্য যাত্রার খুব প্রচলন ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

নবজাগরণ প্রসঙ্গ

মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম এষণা ও সামন্ত-তান্ত্রিকতা। অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তিতে এই মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইংরেজ শাসনাধীনে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ শাসক নিজের স্বার্থের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই এদেশে যাবতীয় কার্য করিয়াছে। কিন্তু শাসকের অজ্ঞাতসারেই ইহার মধ্য দিয়া দেশের অগ্রগতি সূচিত হইয়াছে। উনিশ শতকের গোড়ায় বিদেশী সিবিলিয়ানদের জন্য যে দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহার মধ্যেই তো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চার সূচনা। ইংরেজগণ রাজ্যের অধিকার অর্জন করিবার পরে বহু অন্যায়, অবিচার, পীড়ন, শোষণ চালাইয়াছে সত্য, কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে উনিশ শতকে এদেশে সাহিত্য-শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে যে নূতন চেতনা ও জাগরণ (Renaissance) দেখা দিয়াছিল তাহারও মূলে ছিল ইংরেজ প্রভাব। ইতিহাসে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে[1] অহংকারী, স্বার্থপর, অকর্মণ্য শাসকবর্গের অসাধুতা ও অপদার্থতার জন্য জনগণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়। ইন্দ্রিয়াশক্ত রাজমহল ও অভিজাততন্ত্রের প্রভাবে গৃহজীবনের পবিত্রতা রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ধর্মের নামে নানাপ্রকার অন্যায় ও ব্যভিচার চলিতে থাকে। কুরুচিশীল সামন্তশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় আদি রসাত্মক সাহিত্যের উদ্ভবে এবং অশ্লীল সংগীতাদির প্রচলনে সমাজ-জীবন পঙ্কিল হইয়া পড়ে। এইরূপ আশাহীন, ভরসাহীন মৃতপ্রায় সমাজের দুর্দিনে ইংরেজ শাসন উন্নতিশীল জীবনাদর্শ বহন করিয়া আনে এবং ইহারই ফলে এই দেশে ঊনবিংশ শতকে নবযুগের অরুণোদয় সম্ভব হয়।

1. The country's administration had become hopelessly dishonest and inefficient and the mass of the people had been reduced to the deepest poverty, ignorance, and moral degradation by a small selfish, proud and unworthy ruling class. Imbecile lechers filled the thrown............The purity of the domestic life was threatened by debauchery fashionable in the court and the aristrocacy and the sensual literature that grew up under such patrons. Religion had become the hand maid of vice and folly. On such a hopeless decadent society, the rational progressive spirit of Europe struck with resistless force. History of Bengal, Vol II. p.p. 497-498.

J. N. Sarkar (D. U. 1948)

লর্ড ওয়েলেসলি বিলাত হইতে আগত সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও আইন শিক্ষার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কাজেই কেরীসাহেব, রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বিদ্বজন বাংলা গ্রন্থাদি রচনায় ব্রতী হইলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত এইখানে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রভাবে বাংলা ভাষা চর্চা ও বাংলা শিক্ষার জন্য নানাস্থানে পাঠশালা খোলা হইতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার জন্য আবার ফিরিঙ্গিরা কলিকাতার স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। Sherburne চীৎপুরে, আমড়াতলায় Martin Bowle এবং অন্য অঞ্চলে Arratoon Petres আর একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। [১]"১৮১৪ সালে কাশীধামে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির হস্তে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়া যান।" প্রধানতঃ কেরী ও মার্শম্যানের প্রচেষ্টায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পরে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী গরান হাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পরে সংস্কৃত কলেজের সন্নিকটবর্তী স্থানে উঠিয়া গেল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ঘড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে ও রাধাকান্ত দেবের সম্পাদনায় স্কুল সোসাইটি স্থাপন, ঠনঠনিয়া, আড়পুলী, পটলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে স্কুল গঠন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণের জন্য স্কুল বুক সোসাইটির পত্তন হয়। ঐ সোসাইটি হইতে কিছু কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মতিলাল শীল Seal's Free College নামে একটি অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করেন। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের সময় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সহরে একটি ইংরেজি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। British and Foreign School Society ইংলণ্ড হইতে Miss Cook-কে কলিকাতায় প্রেরণ করে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য। লেডি আমহার্ষ্টকে সভানেত্রী করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি Bengal Ladies Society প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই Society-র তত্ত্বাবধানে অনেক জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এইরূপে কলিকাতা, শ্রীরামপুর, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও বিদ্যালয়

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ৮০, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭

খোলা হইল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সাহেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্কুল খুলিবার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত সংস্কার সভা' প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে উনবিংশ শতকে দেশে ইংরেজী শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটিতে আরম্ভ করে।

রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা স্থাপন করিবার পরে ধর্মসংস্কারে ব্রতী হইলেন। হিন্দুধর্মের নানা আচার-সংস্কার বর্জন করিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াশাঁকো অঞ্চলে রামকমল বসুর (ফিরিঙ্গি কমল বসু) বাড়িতে তিনি নূতন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্মের বিধি অনুযায়ী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া উৎসাহের সঙ্গে ইহার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহিলাদের জন্য ব্রাহ্মিকাসমাজ স্থাপিত হইলে কেশবচন্দ্র ইহার আচার্যের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, পরে কেশবচন্দ্রের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]'শ্রীমান মহারাজ মহাতব চন্দ্র বাহাদুর বর্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন' করেন। মেদিনীপুর, ত্রিপুরা এবং ঢাকায়ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এই ভাবে উনিশ শতকে দেশে নব প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ছড়াইয়া পড়ে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী বিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন। ছাত্রদের লইয়া তিনি Academic Association নামক সভা স্থাপন করেন। এই সভার সদস্যদের অনেকেই ডিরোজিও এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সদস্যদের হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষও ক্রমে বাড়িতে থাকে। ডিরোজিওর শিষ্য এবং Academic Association-এর সদস্য মাধবচন্দ্র মল্লিক ছাত্রদের প্রকাশিত Athenium নামক মাসিক পত্রে হিন্দুধর্মের প্রতি তাহাদের মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন—"If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism"; হিন্দুকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ ছাত্র তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল-এর ব্যবস্থা-সচিব লর্ড মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—শ্রাবণ, ১৭৭০ শক—৬০ সংখ্যা

করিতে লাগিলেন। তাহারা দেশীয় শিক্ষাসংস্কৃতিকে মূল্যহীন বলিয়া মনে করিলেন। ফলে [১] "মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।" ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডফ্ এদেশে আসিয়া হিন্দুকলেজের কাছে বাস করিতে থাকেন এবং ইংরেজি শিক্ষা ও খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে তৎপর হইয়া পড়েন। এই সকল খ্রীষ্টানের তৎপরতায় মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ বহু বাঙ্গালী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। দেশে ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের প্রাবল্যের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যও বিশেষ উদ্যোগ দেখা দেয়। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' (১৮৭৩) স্থাপন করা হয়। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের দেওয়ানের পুত্র উমেশচন্দ্র সরকারের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপার লইয়া ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুসমাজে আন্দোলনের ফলে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতার অন্যতম ধনী খেলাৎচন্দ্র ঘোষের ভবনে সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভার অধিবেশন চলিতে থাকে। রাধাকান্ত দেব 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন এবং মতিলাল শীল কলুটোলায় এই সভার একটি শাখা স্থাপন করিয়া নানাভাবে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম সম্পর্কীয় নানা আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পরমত সহিষ্ণু উদার দৃষ্টি এবং স্বামী বিবেকানন্দের গণ-দেবতা সেবার মধ্য দিয়া উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রগতিমূলক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান সূচিত হয়।

এই দেশে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা অত্যন্ত জঘন্য ও নৃশংস রূপ ধারণ করে। রাজা রামমোহন এই প্রথা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার পুস্তক রচনা করেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। লর্ড আমহারস্টের রাজত্বে সহমরণ নিবারণের জন্য ঘোর আন্দোলন সৃষ্ট হয়। লর্ড আমহারস্ট এই নৃশংস প্রথাকে 'barbarous rite of suttee' বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার পরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ নিষেধ করিয়া একটি আদেশ[2] প্রচার করেন যে হিন্দু

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃ ১৪২, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭

2. "It is here by declared, that, after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part, or not shall be deemed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both." Regulation of 4th December, 1829—Lord Bentinck,

বিধবাদের সহমরণে যাহারা সাহায্য করিবে তাহাদের জরিমানা ও কারাবাসের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার পর সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় রামগোপাল ঘোষ ও ডিরোজিওর অন্যান্য শিষ্যরা বিধবা বিবাহের পক্ষপাতিত্ব করিয়া প্রবন্ধাদি লেখেন। ইহার পরবর্তী ফল-পরিণতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক প্রস্তাব' (দুইখণ্ড) নামক রচনা প্রকাশ ও বিধবা বিবাহ লইয়া আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠার পরে তিনি লেখনীর সাহায্যে নানাভাবে দেশের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও এই সম্পর্কে লেখনী ধারণ করেন। Academic Association-এর ছাত্ররা ডিরোজীওর নেতৃত্বে কুসংস্কার দূর করিবার জন্য বক্তৃতাদি দান করিতেন। এই ছাত্র সম্প্রদায় ডিরোজীওর প্রভাবে সুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দুকলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন, [১]'আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জল-স্পর্শশূন্য ব্র্যাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম।' প্রকৃতপক্ষে [২]"হিন্দুকলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের সমাজসংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।" সমাজসংস্কার হউক বা নাই হউক মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ এই নব্য সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ কাজে পরিণত হইল। [৩]কালেজের বালকেরা গোলদিঘীতে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মাধব দত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও সুরাপান করিত। যে যত অসম সাহসিকতা দেখাইতে পরিত তাহার তত বাহাদুরি হইত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত।' ইয়ং বেঙ্গলেরা দেশের সংস্কার সাধন ও শক্তি অর্জনের জন্য গোমাংস ভক্ষণের উপর জোর দিতেন। [৪]'একজন প্রসিদ্ধ ইয়ংবেঙ্গল বলিতেন যে, প্রত্যহ এবেলা অর্ধসের আর ওবেলা অর্ধসের গোমাংস ভক্ষন না করিলে বাঙ্গালী জাতি

১। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত—পৃ ৪৬, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫২

২। আত্মজীবন চরিত—কার্তিকেচন্দ্র রায়

৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—পৃ ১৫৭, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭

৪। সেকাল ও একাল - পৃ ৪৪, রাজনারায়ণ বসু (কলি—১৯০৯)

কখনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন কার্যে তাহাই করিতেন।' তৎকালে উইলসনের হোটেল গোমাংস ভক্ষণের একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল। এই নব্য সম্প্রদায়ের সুরাপায়ীদের মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) নাটকে চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় এই নব্য সম্প্রদায়ের (ইয়ং বেঙ্গল) মদ্যপান সম্পর্কে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি হাস্যকর কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাটির একটি অংশ উদ্ধার করা যাইতেছে,—

[1]ত্রিলোক তিমিরপুর নাম যার দিবাকর
সেই সূর্য মদে মাতোয়ালা।
ঢল ঢল লাল মূর্তি প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্তি
শুষিছেন সংসার পেয়ালা॥
অতএব বুধগণ আমাদের নিবেদন
শ্রবণেতে হউক সন্তোষ।
দেখিতেছি চরা চরে সকলেই পান করে
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ॥
বহ ২ সমীরণ বরিষ বারিদগণ
চমকহে চপলার মালা।
সহাস্য রহস্য মুখে পান করি মনো সুখে
জুড়াইব অন্তরের জালা॥ (সুবৃষ্টি)

এইভাবে সুরাপান চলিতে থাকায় ইহার কুফলও ফলিতে লাগিল। কাজেই সুরাপান বন্ধ করিবার জন্য নানাপ্রকার প্রচেষ্টা সুরু হয়। মদ্যপানের বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী সভা ও [2]তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নানা মতামত প্রকাশ করিয়া প্রবল আন্দোলন চালাইতে থাকে। এই সময় কলিকাতায় [3]"১৮৬৪ সালে প্যারীচরণ সরকার একটি সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন। ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে এই উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনারায়ণ বসু একটি সভা স্থাপন করেন।" কেশবচন্দ্র সেন 'ভারত সংস্কার সভা' স্থাপন করিয়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সুরাপান নিবারণেরও ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করেন।

১। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১ম খণ্ড, পৃ ৪০৬, বিনয় ঘোষ, ১৯৬২
২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৭২ শক—৮৪ সংখ্যা
৩। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র—২য় খণ্ড, পৃ ৬২২, (১৯৬৩) বিনয় ঘোষ

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কুঠিয়ালগণ বাংলা-বিহার-মাদ্রাজে চাষীদের দ্বারা নীলচাষের অধিকার লাভ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে নীল-কুঠিয়ালদের অত্যাচারে চাষীরা প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করে। বাংলার স্থানে স্থানে ইহা লইয়া বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচারে চাষীরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যানের 'সমাচার দর্পণ', ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে নীলরত্ন হালদারের 'বঙ্গদূত', ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এই সব অত্যাচার-কথা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশ মুখোপাধ্যায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—[১]"প্রজারা প্রাণ পণে নীল আবদ্ধ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করেন বটে, কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পুরে না। এই জন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাদনের সুধামৃত পান করিয়াছে সে আর প্রাণান্তে কুঠির মুখো হইতে চায় না, কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি বিপত্তি।"

ঈশ্বরচন্দ্র নীলকরদের বিষয় লইয়া 'কবির' সুরে ও 'রামপ্রসাদী' সুরে গান বাঁধেন,—

[২]কুঠেল সব শাহেবজাদা ধপ্‌ধপে বাইরে শাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ তায়। (গীত ১)

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেবদের নিষ্ঠুর বীভৎস অত্যাচারের বাস্তবচিত্র প্রকটিত হওয়ায় দেশবাসীর মনে এক নূতন চেতনা সঞ্চারিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে কলিকাতায় ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের কঠোর আচরণ দেখা দেয়। [৩]"সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত, এক জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না ; লোক নিজ বাসাতে দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে।"

১। আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র
২। নীলকর গীত
৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—পৃ ১৯৬, (১৯৫৭)

নীলকরদের অত্যাচার ও সিপাহী বিদ্রোহের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশী ভাব জাগরিত হইতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের—

[১]মিছা মণিমুক্তাহেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
* * * *
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

এই উক্তির মধ্যে স্বদেশ ও দেশবাসিগণের প্রতি যে প্রীতির উদ্বোধন হইয়াছিল সিপাহী বিদ্রোহের পরে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান কাব্য-শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তাহা আত্মসচেতন স্বদেশ-প্রিয়তায় রূপান্তরিত হইল—

[২]স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

মাইকেল মধুসূদন আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়ায় 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রকৃত নায়ক রাবণ দেশ-বৈরীর বিনাশকে বীরের ধর্ম বলিয়া প্রচার করেন এবং তাঁহার বন্দীরা দেশবন্দনা গানে বীরধাত্রী লংকা মুখরিত করিয়া তোলে.—

[৩]অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; নয়নে তব হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া হায় রতন মুকুট,
আর রাজ আভরণ হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠগো, শোক পরিহরি, সতি!
রক্ষঃ-কুলরবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ বিভাবরী।

১। স্বদেশ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
২। পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৫৮
৩। মেঘনাদ বধ কাব্য, ১ম সর্গ—মধুসূদন ১৮৬১

সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে যে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'ভারত-সঙ্গীত' ও 'ভারত-বিলাপ, কবিতাদ্বয়ে,—

ক। অহে বঙ্গবাসী, জানকি তোমরা
অলকা জিনিয়া হেমমনোহরা
কার রাজধানী, কি জাতি ইহারা,—
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায়। (ভারত-সঙ্গীত)

খ। হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি।
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি
আর কি ভারত সজীব আছে। (ভারত-বিলাপ)

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশী ভাব অবলম্বনে 'বীববাহু' কাব্য রচনা করেন। রাজনারায়ণ বসু 'Prospectus of a society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমেলার' প্রবর্তন করেন। রাজনারায়ণ এই সম্পর্কে বলিয়ায়াছেন, [১]ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভার পান। তিনি ঐ মেলা তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।' এই মেলার সঙ্গে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজরানায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাললাল মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি সংযুক্ত ছিলেন। হিন্দু মেলার কর্তৃপক্ষ শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য, ঐক্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম পরিচালনা করিলেও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,— [২]"আমাদের মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারত ভূমির জন্য।" [৩]বস্তুত "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা

১। আত্মচরিত—পৃ ৮৩, রাজনারায়ণ বসু ১৩১৫।

২। ১৭৮৯ শকে ৩০শে চৈত্র মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবৃতি।

৩। জীবনস্মৃতি—পৃঃ ৭৮—রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৩

সেই প্রথম হয়।" এই মেলার অধিবেশনে ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত জাতীয় সংগীত গীত হয়,—

"মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃ প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান,
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।
* * *
কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?"

ইহার পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র নানা দিক হইতে সমাজ সংস্কার ও হিন্দু-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে লেখনী চালনা করেন। উপন্যাস, ধর্মতত্ত্ব, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য প্রভৃতি বিভিন্ন রচনায় তিনি ইহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙালীর পূর্ব গৌরব, বাংগালীর শক্তি, বাংগালীর ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার কথা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে প্রস্ফুট হইয়া উঠে। স্বদেশসেবীর মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ঋষি বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনেই প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম ভূমির বন্দনা মন্ত্র যেমন সৃষ্টি করিলেন তেমনি ইহার মূর্তিটিও দেশবাসীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন,—[১]"চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকা রূপিনী অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা……আমি কাল স্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।"

১। আমার দুর্গোৎসব—কমলাকান্তের দপ্তর। (১৮৭৩—১৮৭৫)

নবীনচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পলাশীর যুদ্ধে' স্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন,—

[মোহনলাল-এর উক্তি]
পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ঐ তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক ! (৪র্থ সর্গ)

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) নাটকাবলীতে স্বদেশানুরাগ ও বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়। মনোমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫) নাটক, উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকদ্বয়ে দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'হরিশচন্দ্র' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

ক। দিনের দিন, সবেদীন, হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনুক্ষীণ॥
সে সাহস বীর্য নাহি আর্য ভূমে,
পূর্ব গর্ব খর্ব হল ক্রমে
চন্দ্র-সূর্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা রাহু মুখে লীন। (হরিশচন্দ্র)

খ। হায় কি তামসী নিশি ভারতমুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক সাগরেতে ভারতমা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব যশোরাশি কাঁদিতেছে অবিরাম ;
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল। (সুরেন্দ্র-বিনোদিনী)

রাজনৈতিক চেতনা অবলম্বনে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ভাগে নানা সম্প্রদায়ের ধর্মভাব ও ধর্মান্দোলন প্রবল হইয়া উঠায় দেশপ্রেমের মনোভাব সাময়িকভাবে মন্দীভূত হইয়া পড়ে। এই ধর্মভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় হরিমোহন কর্মকার, মনোমোহন বসু, রাম নারায়ণ তর্করত্ন, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশ চন্দ্র ও

রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীর মধ্যে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম, কেশব চন্দ্র প্রমুখের ব্রাহ্মধর্ম ও ইংরেজদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্যোগে ধর্মভাবের পটভূমিকা প্রস্তুত হয়।

উনবিংশ শতকের যাত্রাপ্রসঙ্গ

এতক্ষণ পর্যন্ত উনবিংশ শতকের শিক্ষা-সাহিত্য সম্পর্কীয়, সামাজিক, দেশাত্মবোধ মূলক ও ধর্মীয় পটভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। এই পটভূমিকায় যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তাহা দেশের এক বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিক সীমাবদ্ধ থাকে। জনসাধারণের মধ্যে ইহার উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সুতরাং অধিকাংশ লোকই পূর্ব প্রবাহিত স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতে থাকে। উনিশ শতকে কৃষ্ণনগর একটি উন্নত সহরে পরিণত হয়। কিন্তু রাজবাটীকে যাহারা ঘিরিয়া থাকিতেন তাহারা অনেকেই স্বার্থপর ও হীন চরিত্রের লোক ছিলেন। [১]"পূর্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন।" কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ধনী, মধ্য বিত্ত, এবং ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কাছারীর উকিল, মোক্তার, আমলারা এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। সুতরাং সমাজের সর্ব স্তরে একটা কদর্য ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতা প্রবাসীদের মধ্যে মদ্য পান, গাঁজা, চরস বিশেষ প্রচলিত ছিল। [২]"যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বার বিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না।" বাঈজী নাচ তখনকার দিনে একটি রেওয়াজ ছিল। ধনীরা ইহার জন্য অজস্র খরচ করিতেন। সহরাঞ্চলে মধ্য বিত্তের মধ্যে বাবু নামে এক সম্প্রদায় দেখা দিল। [৩]তাঁহাদের "শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমব্রিকের

১। আত্মজীবনচরিত—পৃঃ ৩৮ কার্তিকেয় চন্দ্র রায়।

২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৫৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭

৩। ঐ পৃ ৫৬

বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনা দিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।" এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' রচনাটি স্মরণযোগ্য,—[1]"হে রাজন্, যাঁহারা চিত্র বসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিত কুন্তল এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু।…হে নরাধিপ, বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফটিকপাত্র ইহাদিগের গণ্ডুষ। অগ্নি ইহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—তামাকু এবং চরুট নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি 'মদন-আগুন' এবং 'মনাগুন' রূপে পরিণত হইবেন। বার বিলাসিনীদিগের মতে ইহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন।" এই বাবুদের প্রভাবে অল্প বয়স্ক ছেলেদের রুচি, আলাপ ব্যবহার, চাল চলন, আমোদ-প্রমোদ সকলই কলুষিত হইয়া পড়িত। তাহাদের অনেকেই বাবুদের অনুকরণে নেশায় অভ্যস্ত হইত। ধনী, মধ্যবিত্ত ও ইয়ংবেঙ্গলের [2]"বিদ্বানবর্গের দ্বারা মদ্যের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়া এবং ধনী বাবুদিগের দ্বারা তাহা সসম্মানে গৃহীত হইয়া তদীয় সমূহ দোষ সত্ত্বেও সাধারণের আদরনীয় হইয়াছে।" তৎকালীন সমাজের এই সাধারণ বিকৃত রুচির প্রভাবে কবি-পাঁচালি গানে যে উত্তর প্রত্যুত্তর হইত তাহা [3]"অধিকাংশ স্থলে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময় যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে লোকের চিত্ত রঞ্জন করিতে পারিত।" লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রমুখ পাঁচালিকারের মধ্যে দাশরথি রায়ের অধিক প্রসিদ্ধি ছিল। এই পাঁচালিও [4]"অভদ্রতা ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমা"র ছড়াছড়ি থাকিত,—তথাপি লোকের আকর্ষণ ইহার প্রতি সমধিক ছিল। উনিশ শতকের যাত্রাও

১। লোকরহস্য, বাবু—বঙ্কিমচন্দ্র
২। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র—২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১০, বিনয় ঘোষ।
৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—পৃঃ ৫৭, শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯৫৭।
৪। ঐ পৃ ৫৭

এই ভাবাপন্ন ছিল।(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতায় উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে যাত্রায় গান ও বাজনার খুব প্রাধান্য ছিল; এবং অধিকারীর অধীনে নৃত্য গীতের জন্য একদল বালক রাখা হইত। ইহাতে ভাঁড়ামি জাতীয় হাস্যরসও পরিবেশিত হইত। যাত্রায় বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিবার জন্য একজন সূত্রধার থাকিত। কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধার করা যাইতেছে,—

৩। [১]করিছে সকল সূত্র হয়ে সূত্রধর ॥
জলধর বাদ্যকর বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয়রূপ।
রঙ্গ ভূমে রঙ্গ করে ভাঁড়ের স্বরূপ ॥
অধিকারী একমাত্র অখিল পালক।
আমরা সকলে তার যাত্রার বালক ॥

অভিনেতার দায়িত্ব সম্পর্কেও ঈশ্বর চন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৮৫৮) তাহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন,—"অঙ্গভঙ্গী ও বাক্যচ্ছটা দ্বারা আপন মনোগত ভাব শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে প্রতিভাত করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যে নটবর এ বিষয়ে কৃতকার্য হন তিনিই যথার্থ নট, নচেৎ অভ্যস্ত গদ্য-পদ্যগুলি মুখ হইতে নির্গত করিলেই নাটকের অভিনয় হইল না।" (উনিশ শতকের যাত্রা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছে [২]"কলিয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে প্রমোদমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না।" [৩]"অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাফ-আকড়াই অভদ্র বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যখন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তখন হইতে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। অনেকে যাত্রা, কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতেন।" দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য বিকৃত রুচি লইয়া উনিশ শতকের যাত্রা পরিবেশিত হইত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রও

১। মায়া—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত,
২। সংবাদ প্রভাকর—জুন ২৮, ১৮৫৮
৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ২০২

যাত্রাকারদের নীচ ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন— [১] "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন, যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" তথাপি দেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নগণ্য ছিল বলিয়া যাত্রার আসরে লোকের অভাব হইত না। তখন আমোদের উপকরণ দেশে যথেষ্ট ছিল না। বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে কবি, পাঁচালি ও যাত্রাই ছিল প্রধান। যাত্রায় কাহিনী, সাজপোষাক, গান ও নাট্যরীতি থাকে বলিয়া ইহার প্রতিই সাধারণের আকর্ষণ ছিল অধিক। তাই দূর দূরান্তরে যাইয়া শ্রোতারা যাত্রা হইতে সংগীত ও নাট্যরস-পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করিত— [২] "সেকালে যাত্রা গান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ দু-কোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভ'রে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।" শিক্ষিত লোক বিকৃত রুচি প্রভাবিত যাত্রা না দেখিয়া ইংরেজদের স্থাপিত রঙ্গালয়ে অভিনয়াদি দেখিয়া নাট্য-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে থাকেন। ইহার ফলে বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয়ের দিক হইতে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। পূর্বে রঙ্গালয় প্রস্তুত করিয়া অভিনয় করিবার দৃষ্টান্ত থাকিলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম হইতেই দেশীয় রুচিশীল ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা রঙ্গালয় প্রস্তুত করিয়া অভিনয় করিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন। ইহার ফলে সাঁসুচি থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিষ্টার ক্লিঙ্গার সাহেবকে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়া গড়ান হাটায় 'ওরিয়েনটাল থিয়েটার' স্থাপিত হয়। এই থিয়েটারে সেক্সপিয়ারের 'ওথেলো' নাটক অভিনীত হয়। [৩]"কেবল হিন্দু যুবকদের লইয়া সংগঠিত অভিনেতৃবর্গের দ্বারা একটি ইংরেজি নাটকের অভিনয় এই প্রথম।" ইহার পর প্যারীমোহন বসুর 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' (১৮৫৪), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, (১৮৫৬), সিমুলিয়ার 'ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) থিয়েটার' (১৮৫৭), টেগোর ক্যাসেল রোডে 'রামজয় বসাকের নাট্যশালা' (১৮৫৭), পাক পাড়ার জমিদার প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা

১। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' বঙ্কিমচন্দ্র—প্রচার, ১২৯১, মাঘ

২। ছেলেবেলা—পৃ: ২৩, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৫

৩। The Bengal Hurkara, 28 Sept. 1853.

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে [১]"বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৮), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়' (১৮৬৫), [২]"রাজা দেবী কৃষ্ণের ভবনে "শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' (১৮৫৮), ঠাকুর বাড়ি 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' (১৮৬৫), চুনীলাল বসুর উদ্যোগে ২৫, বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে [৩]'বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়' (১৮৬৮), ও 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (১৮৬৮) প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত মঞ্চ প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ চীৎপুর ঘড়িওয়ালা বাড়ি (মধুসূদন সান্যালের বাড়ি) 'ন্যাশানাল থিয়েটার' নামে সাধারণ রঙ্গালয়ের আত্ম প্রকাশ ঘটে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। ইহার পর শরৎচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গল থিয়েটার' (১৮৭৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় ও গুর্মুখ রায়ের আর্থিক সাহায্যে বিডন ষ্ট্রীটে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ষ্টার থিয়েটার' (পরে গিরিশ চন্দ্রের আর্থিক সাহায্যে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে), ভুবনমোহন নিয়োগীর 'গ্রেট ন্যাশানাল থিযেটার' (১৮৭৩), 'মিনার্ভা থিয়েটার' (১৮৯৩) প্রভৃতি নাট্যশালা স্থাপিত হয়।

শিক্ষিত ও রুচিশীলরা থিয়েটারে অধিক মনোযোগী হওয়ায় অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতদের মধ্যেই সাধারণভাবে যাত্রা নাট্যরস পরিবেশন করিবার দায়িত্ব বহন করিতে লাগিল; এবং দর্শকদের স্থূল রুচি অনুযায়ী যাত্রা পালা রচিত, পরিচালিত ও আসরস্থ হইতে থাকিল।

যাত্রা ও গীতাভিনয়

ইংরেজি নাটকের অনুসরণে রচিত থিয়েটারি নাটকে গানের স্বল্পতা হেতু দর্শকদের মনোরঞ্জনের অসুবিধা দেখা দেয়। ইহা লক্ষ্য করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শকুন্তলা' নামে একখানি গীতিবহুল নাটক রচনা করেন। [৪]নাটকটির মার্জিত ও সহজ লিখনভঙ্গি উল্লেখযোগ্য; ইহাই বাংগালীর প্রথম গীতাভিনয় পালা। ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া হরিমোহন মঞ্চাভিনয়ের ব্যয়-বাহুল্য বর্জন এবং যাত্রার বিকৃত রুচি দূরীকরণের জন্য

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—পৃঃ ২০৩ পূর্বোল্লিখিত

২। সংবাদ প্রভাকর, জুলাই—১৮৬৫

৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—পৃঃ ৭৩, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৪০)

৪। This is the first Opera in Bengali, It has been written in a simple and elegant style, and the interest is well sustained through out, May, 22, 1865, The Hindoo patriot, (1865)

গীতাভিনয় রচনায় ব্রতী হইলেন। হরিমোহন রায় (কর্মকার) গানের সংখ্যা বাড়াইয়া এবং গান গীত হইবার সময় কমাইয়া এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন। রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অবলম্বনে তিনি প্রথম 'রত্নাবলী গীতাভিনয়' রচনা করেন ১২৭২ সালে (১৮৬৫-৬৬)। ইহার পরে তিনি 'শ্রীবৎস-চিন্তা—গীতাভিনয়' (১৮৬৬)' 'জানকী-বিলাপ—গীতাভিনয়' (১৮৬৭), ও 'মানিনী—গীতাভিনয়' (১৮৭৫) রচনা করেন। তাহার গীতাভিনয়গুলি খুব জনপ্রিয় হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে [১] "শ্রীবৎস-চিন্তা—গীতাভিনয়'খানি 'সিমুলিয়া সখের যাত্রা কোম্পানী' দ্বারা প্রকাশিত ও অভিনয়কৃত হইয়াছিল।" গীতাভিনয়ে দৃশ্য পটাদির প্রয়োজন হয় না; ইহা আসরেই যথাযথভাবে অভিনীত হইতে পারে। রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কাজেই অল্প খরচে আসরে অভিনীত হইবার উপযোগী গীতাভিনয়ের প্রতি তৎকালীন বহুলোক আকৃষ্ট হইলেন। ফলে উনিশ শকতের দ্বিতীয়ার্ধে গীতাভিনয়ের খুব প্রচলন হয়। [২] যাত্রায় প্রচলিত কুরুচি বর্জনের প্রতি অধিকাংশ গীতাভিনয়ের কিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকিত বলিয়া রুচিশীলরাও ইহার আসরে উপস্থিত হইতে পারিতেন। গীতাভিনয় প্রসঙ্গে বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়িতে অভিনীত তিনকড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রী সত্যবান—গীতাভিনয়'-এরও (১৮৬৫) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মনোমোহন বসু ভক্তি ও করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পৌরাণিক নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই শ্রেণীর নাটক এবং হরিমোহনের সংগীত-রীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মতিলাল রায় ও ব্রজমোহন রায় উনিশ শতকের শেষভাগে যাত্রায় গীতাভিনয় পালার বিশেষ প্রচলন করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত 'কামিনী কুঞ্জ' গীতাভিনয়ের (গীতিনাট্যের) অনুষ্ঠান হইতে [৩] 'বঙ্গীয় নাট্যসমাজে সম্পূর্ণ নূতন' এক ধরণের অভিনয়রীতি প্রচলিত হয়। ইহার [৪] "আদি হইতে অন্তপর্যন্ত সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর।' যাত্রার গীতিভিনয়ে এই রীতি পূর্ণরূপে

১। রহস্য সন্দর্ভ, ৪৩ খণ্ড, পৃ—১১১ (১৮৬৭)

২। পদ্মাবতী গীতাভিনয় প্রসঙ্গে—We hope the Opera will supersede the degenerate Jatra, May 22, 1865—The Hindoo Patriot

৩। সংবাদ প্রভাকর—১৮৭৯

৪। ঐ

অনুসৃত হয় না। হরিমোহন রায় তাহার 'মানিনী' গীতাভিনয়ের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'অপারা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা এ পর্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহু দিবস হইল আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপখানি কথঞ্চিৎ 'অপারার' আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল।' এই মন্তব্য হইতে বুঝা যায় গীতাভিনয় আর পাশ্চাত্ত্য অপেরা (opera) এক নহে। ইহা প্রচলিত [১]'যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরণের একপ্রকার অভিনয়।' ইহাতে বহু সংখ্যক গান থাকে; এই গানে অনেক সময় একটানা সুরস্রোত বজায় রাখিবার জন্য দোহারের সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং চরিত্রের সংলাপের সঙ্গে আবার কখনো কখনো অধিকারীর বক্তৃতা সংযোজিত হইয়া থাকে। মোটের উপর বলা যায়,—যাত্রাব গীতাভিনয় পূর্বপ্রচলিত দীর্ঘ গীত রীতি হইতে পৃথক এক ধরণের সংক্ষিপ্ত বহু গীতিযুক্ত পালা যাহাতে সংলাপ, বক্তৃতা, গীত ও দোহার ব্যবহৃত হয় এবং ভক্তি ও করুণ রসের প্রাধান্য থাকে। বিংশ শতকের প্রথম হইতে বিশেষভাবে নাট্যকার ও অধিকারী পৃথক পৃথক ব্যক্তি হইতে থাকায় গীতাভিনয়ের বক্তৃতা বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অহিভূষণ ভট্টাচার্যের গীতাভিনয়গুলি স্মরণ করা যাইতে পারে। বক্তৃতা বন্ধ হওয়ায় গীতাভিনয় গীত ও অভিনয়ের মিশ্ররূপে পরিণত হইল। ইহাতে গানের সংখ্যা অনেক হইলেও ইহার অভিনেতব্য অংশেরও গুরুত্ব কম নহে। তাহা ছাড়া গীতাভিনয়ের অভিনেতব্য অংশ সংগীত সহযোগেও পরিবেশিত হয় না। সমস্ত দিক বিচার কবিয়া বলা যায় যে বাংলা গীতাভিনয় সংগীত বহুল নাটক, অপেরা নহে। বিশেষ রীতির সংগীত, নৃত্য ও লিরিক উচ্ছ্বাস প্রয়োগের দিক হইতে অপেরার সঙ্গে গীতাভিনয়ের পার্থক্য রহিয়াছে।

যাত্রার সংস্কার

পূর্বেই উনিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-ধর্মীয় পটভূমিকার পরিচয় প্রদানের সময় উল্লিখিত হইয়াছে যে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, নবগোপাল মিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, খেলাত ঘোষ, মতিলাল শীল প্রমুখ বিদ্বজ্জন নানাদিক হইতে বাঙ্গালীর সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সংস্কারের তরঙ্গ যাত্রা-

[১] বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—পৃ ৯৩, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৪০)

জগৎকেও স্পর্শ করিয়াছিল। কুরসিকতা ও ভণ্ড রসিকতা অধিকাংশ লঘুচেতা শ্রোতৃবর্গের আপাত ভাল লাগে বলিয়া যাত্রাওয়ালারা পালাগানে এই সকলের উপস্থাপনা করিতেন এবং যাত্রাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিবার জন্য স্থানে অস্থানে কুরুচিপূর্ণ নৃত্য-গীতও প্রয়োগ করিতেন। বিকৃতরুচির জন্য স্ত্রীলোকদের পক্ষে যাত্রা শুনা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল—[1]"স্ত্রীলোকের অকর্তব্য এই দুষ্ট-বুদ্ধিতে অন্যপুরুষ অবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিনীর সংসর্গ। এই সকল কর্ম স্ত্রীলোকের ধর্মনাশের কারণ হয়।" যাত্রার এই বিকৃত রুচির জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ইহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন পূর্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জন্যই মনোমোহন বসু সংস্কারক রূপে যাত্রার সংশোধনে ব্রতী হইলেন। অবশ্য উনিশ শতকের প্রথমে শিশুরাম, শ্রীদামদাস, সুবলদাস অধিকারী যে যাত্রার মার্জনের চেষ্টা করেন তাহার মধ্যেই যাত্রা-সংস্কারের সূচনা হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে ইহার ইংগিত পাওয়া যায়—[2] "শিশুরাম অধিকারীনামা এক ব্যক্তি কেঁদেলীগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে।... শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে।" ইউরোপীয় রুচি ও এতদ্দেশীয় রুচির মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১২) বুঝিয়াছিলেন যে ইউরোপ আর ভারতবর্ষ এক নহে। তাই জনগণের নাট্য পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি যাত্রাধর্মী একশ্রেণীর নাটক রচনা করেন। যাত্রার দীর্ঘ সময় ধরিয়া গায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া, গানের সংখ্যা কিছু কমাইয়া, পাত্রপাত্রীর কথা অধিকতর স্বাভাবিক করিয়া এবং পালায় ভক্তি ও করুণ রসের যোগান দিয়া মনোমোহনের নাটক রচিত হয়। সংগীত-প্রীতি, আবেগ প্রবণতা ও মন্থরগতি সম্পন্ন ঘটনার প্রতি তৎকালীন শ্রোতৃবর্গের যে আকর্ষণ ছিল নাটকে তাহার প্রতিও উপেক্ষা দেখান হয় নাই। মনোমোহন বাবু জানিতেন যে [3]"যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান, কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে, স্বভাবের

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—(সমাচার দর্পণ ১৩ই এপ্রিল, ১৮২২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বিবিধার্থ সংগ্রহ—মাঘ, ১৮৫৯

৩। মধ্যস্থ, পৌষ, ১২৮০—মনোমোহন বসু

প্রতি দৃষ্টি না রাখা।" সুতরাং প্রচলিত যাত্রার সংস্কার সাধন করিয়া তিনি ইহাকে উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রেট্ ন্যাশানাল থিয়েটারের বাৎসরিক উৎসবে চৌৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে প্রদত্ত বক্তৃতায় নাট্যাভিনয় সম্পর্কে মনোমোহন বলেন, [১]"আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও, আমরা চাই সেই যাত্রা গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।" এই রীতি অনুসরণে মনোমোহনের নাটক রচিত হয়। ইহা যাত্রার আসরে ও মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইবার উপযোগী। তাহার প্রথম নাটক 'রামাভিষেক' (১৮৬৭)। ইহার পরে তিনি 'সতী নাটক' (১৮৭৩), 'হরিশচন্দ্র নাটক' (১৮৭৫), 'পার্থপরাজয় নাটক' (১৮৮১), 'রাসলীলা নাটক' (১৮৮৯) প্রভৃতি রচনা করেন। মনোমোহনের নাটক যেমন 'বৌবাজার বঙ্গ নাট্যালয়ে' অভিনীত হইত তেমনি 'বৌমাষ্টারের যাত্রার দলে' ও অভিনীত হইত। মনোমোহন বাবু কিছু নাটক রচনা করিয়া ও দুই একটি বক্তৃতা দিয়া যাত্রা সংস্কারের আগ্রহ বাড়াইয়া দিলেন মাত্র। কিন্তু যাত্রার প্রধান সংস্কারক ছিলেন মদনমাষ্টার। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় একটি যাত্রার দল গঠন করেন। যাত্রা প্রয়োগ-প্রধান। মদনবাবু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রার প্রয়োগের মধ্য দিয়া নৃত্য-গীত, সুর-বাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বহু দিক হইতে ইহার সংস্কার করেন। তাহার প্রবর্তিত রীতি দ্বারা তৎকালীন যাত্রা বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। চন্দননগরের অধিবাসী মদনবাবু হুগলী কলেজে শিক্ষকতা করিতেন। প্রথমে তিনি সখের যাত্রাদল গঠন করেন। ক্রমে ইহার জনপ্রিয়তা বাড়িয়া যাওয়ায় শিক্ষকতার কাজ ছাড়িয়া তিনি পেশাদারী যাত্রা সংস্থা স্থাপন করেন। [২]"শুনেছি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই মদনবাবুর সখেরদল পেশাদারী দলে রূপান্তরিত হয়; তখন মতি রায়ের যাত্রার দল গঠিত হয়নি।" পূর্বে শিক্ষক ছিলেন বলিয়া 'মদনমাষ্টার' নামেই তাহার পরিচিতি চলিতে থাকে। সুতরাং তাহার দলটিও 'মদনমাষ্টারের দল' নামে খ্যাত হয়। তৎকালে এই দলটি যাত্রার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং নানাদিক হইতে ইহা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়াছিল।

১। মধ্যস্থ, পৌষ ১২৮০, মনোমোহন বসু

২। নারায়ণ চন্দ্র দত্ত—বাঁশি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

[১]"আধুনিক ভাবের যাত্রা প্রথম যখন প্রবর্তিত হয় সে সময় যে সব দল সৃষ্ট হয়, চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দল তাহাদের মধ্যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবতঃ প্রথম।"

[২]"যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটায় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে 'বাজেলোক'।" এই বেশির ভাগ লোকের সহজে বুঝিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি সাধারণ ভাবে সাধারণ লেখক কর্তৃক অধিকাংশ পালা রচিত হইত। এই সকল লেখকের পালা সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

[৩]"তেমনি আবার পালা গানটা লেখানো হয়েছে এমন সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া-কলমে, যারা ইংরেজী কপি-বুকের মক্‌শো করেনি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা ; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেননি পালিশ করে।" (উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মদন-মোহন চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন প্রমুখ যাত্রানাট্যকারের হাতে পড়িয়া যাত্রা-নাটক রচনারীতির দিক হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইতে আরম্ভ করে।)

পূর্বে যাত্রার পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট রীতি ছিল না। অধিকারীরা খুসী মত সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিতেন। গোবিন্দ অধিকারী বৃন্দার ভূমিকায় জরি দেওয়া সালুর কাপড় ব্যবহার করিতেন, অন্যান্য নারী চরিত্রে শাড়ির সঙ্গে কলাপাতার গহনা পরানো হইত। আবার লোকাধোপা স্ত্রী ভূমিকার জন্য ঢাকাই শাড়ি, চেলি ও প্রকৃত গহনা এবং পুরুষদের জন্য ঢিলা পায়জামা, চাপকান, কোমরবন্ধ, পাগড়ী, টুপি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের যাত্রায় এমনো দেখা গিয়াছে যে 'সীতার বনবাস' পালায় রাম, লক্ষ্মণ ও পারিষদ বর্গের ভূমিকায় [৪]"মোগলাই পাড়গী মাথায় আলবার্ট চেন শোভিত, চশমানাকে, হাইকোর্টের উকিলের ন্যায় কতগুলি লোক কথাবার্তা কহিতেছে।" রামলক্ষ্মণ যেমন চাপকান ও মোগলাই পাগড়ী পরিতেন তেমনি রাজা, জমিদার সকলেই একই পরিচ্ছদধারী। আবার [৫]"রাণী মেতরানীর এক পরিচ্ছদ।" মদনমাষ্টার এই রীতির পরিবর্তন করিয়া কিছুটা নূতনত্ব

১। চন্দননগরের কথক, কবিওয়ালা ও যাত্রা—হরিহর শেঠ, প্রবাসী—১৩৩১ (মাঘ)

২।৩। ছেলেবেলা—পৃঃ ২২, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৫।

৪।৫।—যাত্রা সমালোচনা (সকল যাত্রার কথা অংশ)—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭৫।

আনিলেন। তাহার দলে রাজার পোষাকে থাকিত ঢিলা পায়জামা, কোমরবন্ধ, চাপকান, কাবা ও সাঁচ্চার টুপি। রাণীরা গরদের চেলি অথবা ঢাকাই শাড়ি পরিতেন। এই সকল চরিত্রের পোষাকের সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের পোষাকের পার্থক্য বজায় রাখা হইত।

যাত্রায় রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা, রাবণ-মন্দোদরী, দশরথ-কৈকেয়ী, মেথর, ভিস্তিওয়ালা সকলেই নাচিত,—[১]"কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন।" এই সকল নৃত্যের অনেকগুলিতে আবার খেমটার ঢঙও থাকিত। যাত্রায় [২]"কৈকেয়ীর নৃত্য প্রভৃতি অরুচিকর ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং অসম্ভাবজনক ব্যাপারের অবতারণা" বড়ই ক্লেশকর ছিল। অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যাত্রায় সুনিয়ন্ত্রিত নৃত্য যে একেবারে ছিল না তাহা নহে। [৩]"প্রজ্বলিত দীপশীর্ষ পিত্তলের পিলসুজ মাথায় লইয়া প্রকাণ্ড আসরের মাঝখানে নটবরের বিস্ময়কর নৃত্য" এবং [৪]"ফুলের ডালি হাতে লইয়া বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর চৌতালে নাচ আবালবৃদ্ধ-বনিতার চমক লাগাইয়া দিত।" এই সকল নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের সামঞ্জস্য বিধানের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইত। সঙ্গীতে এক ধ্বনি-মাধুর্যময় তরঙ্গ সৃষ্ট হইত। [৫]"আসরের প্রত্যেক ঝাড় লণ্ঠন যেন সেই শব্দের তরঙ্গে ঝণ্‌ঝণ্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিত; নর্তকের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী যেন সেই ধ্বনি তরঙ্গে লীলায়িত হইয়া যাইত।" কোন কোন সংস্থায় এই শ্রেণীর নৃত্য পরিবেশিত হইলেও সাধারণ ভাবে তৎকালীন যাত্রার নৃত্যের মান অত্যন্ত নীচু ছিল। কাজেই মদন মাষ্টার নৃত্য উপস্থাপনা রীতির পরিবর্তন করেন। তিনি প্রত্যেক চরিত্রের নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিবার রীতি বন্ধ করিয়া পালায় নৃত্যের সংখ্যা কমাইয়া দিলেন। গাম্ভীর্যহীন চটুল নৃত্য যে তাহার যাত্রায় একেবারেই সংযোজিত হইত না তাহা নহে; তথাপি নৃত্যের ঢঙ পরিবর্তন করিয়া যাত্রায় মদনবাবু সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন।

যাত্রায় [৬]"দুই একটি কথা এবং তারপরেই গান থাকে, এতদিন সেই প্রণালীর অপেরা বা যাত্রা অভিনীত হইতেছিল।" মনোমোহন বসু দ্বারা প্রভাবিত হইয়া

১। যাত্রা সমালোচনা (সকল যাত্রার কথা অংশ)—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭৫
২। বিশ্বকোষ—১৩০৯।
৩। ৪। ৫—পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ২৫৬—বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৩৭৩।
৬। সংবাদ প্রভাকর—১৮৭৯।

মদনবাবু সংলাপের অংশ বাড়াইয়া সংগীতের সংখ্যা কমাইয়া দিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ফরাসডাঙ্গার রুচি অনুযায়ী যাত্রায় প্রচলিত খেম্‌টা নাচ ও ঐ ঢঙের হালকা সুরের গান সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর পছন্দ হওয়ায় বিভিন্ন নাট্যকার রচিত পদ হালকা সুরেই গীত হইতে থাকে। ফলে যাত্রা গানের মান নামিয়া যায়।) ইহা লক্ষ্য করিয়া সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছেন,—[১]"এক্ষণে বাংলার সুর পরিবর্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নৃত্যানুযায়ী সুর হইয়াছে।" মদনমাষ্টার এই প্রকার সংগীতের সংস্কার সাধনে মনোযোগ দেন। চটুল সুরের পরিবর্তে তিনি গানে রাগ-রাগিনী বজায় রাখিয়া ভাব অনুযায়ী নানা ধরণের সুর প্রয়োগ করিতে থাকেন। মদনমাষ্টারের 'দক্ষ-যজ্ঞ' পালা হইতে এই জাতীয় বহু প্রচলিত একটি গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

ভৈরবী—একতালা

তাই ভাবিগো মনে   বিনা নিমন্ত্রণে
কেমন করে যজ্ঞে   যাই বল না॥
তোমরা সবে যাবে   সমাদর পাবে
আমি গেলে পিতা   কথাতো কবে না॥
একে নারী আমি   ভিক্ষারীর ঘরণী
বিধাতা করেছেন   জনম দুঃখিনী।
শিব অপমানে   হয়ে অপমানী
শিব নিন্দে আমার   প্রাণে সবে না॥

[২]"পরমানন্দ হইতে মদন মাষ্টারের পূর্ববর্তী যাত্রাওয়ালাগণ যার যার গাওনা তার তার মুখ দিয়া সেই গান গাওয়াইয়া লইতেন।" যাত্রায় সাধারণত পুরুষরাই স্ত্রী চরিত্রে অবতরণ করিতেন।) পূর্বে থিয়েটারেও এই প্রথা ছিল। বর্তমানে বিডন স্ট্রীট ডাকঘর যেখানে অবস্থিত সেইখানে আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন। [৩]"এই নাট্যশালায় সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত

১। যাত্রা সমালোচনা—সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৭৫)
২। বিশ্বকোষ—১৩০৯।
৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,—পৃ ১৫৪ পূর্বোল্লিখিত।

করা হয়।" [১]"মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল।" সুতরাং পরামর্শ অনুযায়ী বেঙ্গল থিয়েটারে জগত্তারিণী, গোলাপ (গ্রেটন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিবাহের পরে সুকুমারী দত্ত নাম হয়), এলাকেশী, ও শ্যামা নামে চারজন স্ত্রীলোক অভিনেত্রী নিযুক্ত হইলেন। মঞ্চে নারী যোগদান করায় স্ত্রী ভূমিকায় বামাকণ্ঠে স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় ও গীত পরিবেশিত হইতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে যাত্রায়ও [২]"পুরুষের মুখে স্ত্রীলোকের গান অস্বাভাবিক ও শ্রুতিকঠোর বলিয়া সাধারণের উপেক্ষার বিষয় হইয়াছিল, তখন বিভিন্ন যাত্রার দলের অধিকারিগণ জুড়িদ্বারা সকল গানগুলিই গাওয়াইবার প্রথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন।" তদনুসারে 'দক্ষ-যজ্ঞ' পালায় [৩]"মদনবাবু সর্বপ্রথমে যাত্রার দলে জুড়ির গাওনা প্রবর্তন করেন।" এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় যে সব অভিনেতা ভাল গাহিতে পারিতেন না তাহাদের গান জুড়িদ্বারা সুগীত হইতে লাগিল। কারণ জুড়িরা সকলেই সুগায়ক হইতেন। [৪]"মদনবাবু পুরুষের গান বয়োবৃদ্ধ জুড়ির মুখে এবং স্ত্রীলোকের গেয় গীতগুলি বালকদিগের দ্বারা গাওয়াইতেন।" জুড়ির গানে কবি-ভাঙ্গাই উচ্চসুর, টপ্পা-ভাঙ্গা তান, মনোহরশাহী সুর ও রাগরাগিনী ব্যবহৃত হইত; কোমলকণ্ঠ-বালকদের গান অধিকাংশ স্থলেই কীর্তনাঙ্গের হইত। আসরে সুর জমাট রাখিবার জন্য জুড়ির গানের বিভিন্ন অংশ দোহার দ্বারা পুনরাবৃত্তি করিবার রীতি প্রচলিত হয়। অবশ্য সুর-তরঙ্গ অব্যাহত রাখিবার জন্য জুড়ির গানের পূর্বেও যাত্রায় দোহারকির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জুড়ির গানের সঙ্গে দোহারের অনুপস্থিতিতে পালটি গাওনার বদলে চার পাঁচটি বেহালার সমবেত বাজনা দ্বারা সুর জমাট রাখা হইত। ইহাতে জুড়িও গানের মাঝে দম লইবার জন্য একটু বিরাম পাইতেন। বর্তমান কালেও ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, বড়ে গোলাম আলি খাঁ, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল প্রমুখ ভারতবিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর খেয়াল গানে মূল গায়কের সুবিধার জন্য একজন করিয়া সহকারী গায়কের সাহায্য লইতে দেখা গিয়াছে। এই গায়ক কতকটা দোহারের কাজ করেন বলা যাইতে পারে। মদনমাষ্টার-প্রচলিত সংগীত রীতি মতিলাল

১। পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়,—প ১৩১—পূর্বোল্লিখিত ১৩৩০।

২। ৩। বিশ্বকোষ ১৩০৯।

৪। বিশ্বকোষ ১৩০৯।

রায় ও ব্রজমোহন রায় বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য যাত্রাকারগণের মধ্যে ও এই গায়ন রীতি প্রচলিত হয়।

যাত্রার আসরে বিভিন্ন রাগ রাগিনী যুক্ত গান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম দাস ও সুবল দাস অধিকারী রাগ সংগীতেই শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতেন। এই শতকের প্রথম ভাগে রামনিধি গুপ্তের উদ্যোগে অখড়াই গানের দল হয়। [১]"১২১০ অব্দে যখন মহামান্য রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আখড়াই আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস(রামঠাকুর ও নসিরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্বদাই আখড়াই সঙ্গীতের সংগ্রাম করিত, ইহারা তাবতেই এবিষয় পণ্ডিত ছিল কিন্তু সৌখিন ছিল না পেশাদারি করিয়া টাকা লইত।" আখড়াই গানে বহুযন্ত্র এবং রাগ সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত। রামনিধি গুপ্তের নিকট আত্মীয় কুলুই চন্দ্র সেন আখড়াই গানের অন্যতম প্রণেতা। [২]"কিন্তু নিধুবাবু তাহার পর অখড়াই বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী করেন এমত আর কেহই করিতে পারেন নাই, ইহার কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।" আখড়াই গান অল্প কথায় গাঢবদ্ধ রচনা। এক একটি আখড়াই গানের তিনটি অংশ। এই তিনটি অংশে তিনটি গান গীত হইত। ইহার প্রথম গানটি ভবানী বিষয়ক, দ্বিতীয়টি প্রণয়গীতি বা খেউড়, তৃতীয় গানটি প্রভাতী। প্রভাতী অংশে রজনী প্রভাত হওয়ায় নায়ক-নায়িকার মিলনের সম্ভাবনা দূরীভূত হওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশিত। আখড়াই গানে রাগ রাগিনীর প্রাধান্য ছিল এবং ধ্রুপদ খেয়ালের মত ইহাতে রাগরাগিনীর আলাপ করা হইত। তাল-লয়ের দিক হইতেও ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার আরম্ভে সহজ গতিসম্পন্ন ছন্দ, পরে দোলায়িত ছন্দ এবং শেষে দ্রুত গতির ছন্দ প্রকাশিত হইত। [৩]"ইহাতে কেবল সুরের ও রাগের পাণ্ডিত্য ও বাদ্যের পারিপাট্য। বাদ্যের নাম পিঁড়ে বন্দী, দোলন, সবদৌড় এবং গান সমাপনের সময় যে বাদ্য তাহার নাম মোড়।" রচনার দিক হইতে ভবানী বিষয়ক অংশের আরম্ভে (মোহড়া) ২৬ অক্ষরের একটি ত্রিপদী, পরবর্তী চড়া সুরের অংশে (চিতেন) ঐরূপ একটি ত্রিপদী এবং শেষ অংশে ঐরূপ দুইটি ত্রিপদী থাকিত। পূর্ণ আখড়াই গানের একটি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া রাগ রাগিনীর সঙ্গে ইহার নম্পর্কের কথা স্পষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে,—

১।২। গীতরত্ন গ্রন্থ, পৃ ।/০, ৩য় সংস্করণ ১২৭৫, রামনিধি গুপ্তের গান সংগ্রাহক জয়গোপাল গুপ্ত
৩। ঐ—বিজ্ঞাপন অংশ।

[1]অখড়াই সংগীত

ষষ্ঠ পাঠ

ভবানী বিষয়ক—বাগেশ্বরী

শৈলেন্দ্র তনয়া শিবে, সদাশিবে প্রদাভবে
সুধাংশুশেখর সীমন্তিনি। (মা)
বিকল পতিত জনে, ত্রাহি তারা নিজগুণে,
দয়াময়ী প্রণত পালিনি॥
আপন কর্মানুসারে, ভবে ভ্রমি বারে বারে,
শ্রমভরে কাতর তারিণি।
শিবদা অশিব হরা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
সদানন্দে সুখ প্রদায়িনী॥ ১ ॥

খেউড়—খাম্বাজ—

অনেক যতনে হয় ক্ষণেক মিলন। (দেওরা ওরে)
ইথেকি মনের সাধ পূরয়ে কখন॥
অতএব বলি আমি, হৃদয়নিবাসি তুমি,
নয়নে নয়নে থাক, একান্ত মনন॥ ১ ॥

প্রভাতী—ললিত-ভৈরব।

যামিনী যে যায় প্রাণ রাখিব কেমনে। (দেওরা ওরে)
হেরিয়ে অরুণ তব কমল নয়নে॥
সে কামিনী কুমুদিনী, সুখে পোহাল রজনী।
আমি কমলিনী বুঝি করিলেনা মনে" ॥ ১ ॥

আখড়াই গানে তৎকালে যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইতে 'করুণানিধান বিলাস' গ্রন্থে জয়নারায়ণ ঘোষাল তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন,—

[2]তম্বুরা সেতার বীণা কান্নুন দোতারা।
কপিলাস পিনাকাদি অতিমনোহরা॥

১। গীতরত্ন গ্রন্থ—পৃ ॥/, ৩য় সংস্করণ ১২৭৫—রামনিধি গুপ্তের গান সংগ্রাহক জয়গোপাল গুপ্ত।

২। করুণানিধান বিলাস, পৃ ৯২ জয়নারায়ণ ঘোষাল।

বেহালা সারিন্দা আর সারঙ্গীরবাব।
নফরি মোরচঙ্গ বাঁশী মিলাইল সব॥
মৃদঙ্গ ঢোলক আর তবল খঞ্জরি।
একস্বরে মিলাইল সহিত বাঁশরী॥
খটতাল মন্দিরায় তাল নিরূপণ।
থাকি থাকি সিঠি দেয় শামার সমান॥

কৃষ্ণলীলায় শিশুদের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের নৃত্যে ঐ সকল যন্ত্র বাদনের কথাও গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচিত অখড়াই গানের ওস্তাদ শ্রীদাম দাস ও সুবলদাস যাত্রা গানে রাগ-রাগিনী প্রয়োগ করিতেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভবানীপুরের সৌখিন দলে যে 'নল দময়ন্তী' যাত্রা অভিনীত হয় তাহাতেও [১]"নানা প্রকার রাগ রাগিনীযুক্ত গান হয়।" রামমোহনের বংশধর হরিমোহন রায়ের দলেও রাগ সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত। বদন অধিকারী ও গোবিন্দ অধিকারীর দলে কৃষ্ণ যাত্রায় রাগরাগিনী যুক্ত গান গীত হইত। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে খুব জনপ্রিয় অধিকারী হইয়া পড়েন। তিনিও যাত্রায় রাগ সঙ্গীত ও কীর্তনাঙ্গ সুর প্রয়োগ করিতেন। জোড়াসাঁকোর রাম চাঁদ অধিকারীর দলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 'নন্দ বিদায়' যাত্রায় [২]"প্রায় তাবৎ গীত হাফ-আখড়াইর খেয়াল, কীর্তনের এবং টপ্পার সুরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্টি এবং সুশ্রাব্য হইয়াছিল।" ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়ের দলে বিশ্বনাথ ধ্রুপদী রামধন ওস্তাদের বজনার সঙ্গে রাগ সংগীতে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন। ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' অংশের জন্য রাগ রাগিনীযুক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কেবল 'বিদ্যাসুন্দর' কেন সমগ্র 'অন্নদা মঙ্গলের' গানগুলির জন্যই তিনি ভৈরবী, ভৈরব, বসন্ত, কেদার, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, হাম্বির, মল্লার, যোগীয়া, দেববিভাস, বারোঁয়া, পিলু, সাহানা, প্রভৃতি বহু রাগরাগিনী কখনো এককভাবে কখনো বা মিশ্ররূপে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু যাত্রায় 'বিদ্যাসুন্দর' প্রচলিত হওয়ায় ইহার জন্য নূতন নূতন গান রচিত হইতে থাকে। এই সকল গানে কখনো রাগ-রাগিনীর

১। সমাচার দর্পণ, জুলাই, ১৩—১৮২২।

২। সম্বাদ ভাস্কর, মার্চ, ৩০—১৮৪৯।

ব্যবহৃত হইত, কখনো বা চটুল জংলী সুর আরোপিত হইত। বিদ্যাসুন্দরের খেমটা প্রচলিত হওয়ায় ইহার গানে হালকা চটুল সুর অধিক প্রযুক্ত হইতে থাকে। অন্যান্য যাত্রাও ক্রমে এই রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে যাত্রায় গানের মান নামিয়া যাওয়ায় মদন মাষ্টার ইহার সংস্কার করিতে উদ্যোগী হইলেন।

ঐকতান বাদন যাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রায়' [১] "নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন"-এর কথা সমাচার দর্পণে উল্লেখিত হইয়াছে। মনে হয়, তখন ঐ যাত্রায় বহু যন্ত্রে ঐকতানও বাদিত হইয়াছিল। আখড়াই দলে গানের সঙ্গে নানাযন্ত্রের সমবেত বাজনা চলিত। সুতরাং সমবেত যন্ত্র সংগীতের মাধুর্য তৎকালীন বাদকদের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। বিশেষত শ্রীদাম দাস অধিকারী আখড়াই গানের লড়াই করিতেন। তিনি যন্ত্রসঙ্গীতের বিষয় ভাল করিয়াই জানিতেন। কাজেই তাহার দলে সমবেত বাজনা প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। তাহাছাড়া যাত্রার আসরে ঐকতান বাদনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল পালা আরম্ভ হইবার সময় জ্ঞাপন। গাওনা আরম্ভের পূর্বে বাজনা শুনিয়া দলে দলে লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। বর্তমানেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে যে ইহার ব্যতিক্রম ছিল তাহা মনে হয় না। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে পেশাদার যাত্রায় উন্নত ধরণের ঐকতান প্রচলিত থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া কেবল ঐকতানের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রবাদক নিযুক্ত করা যাত্রায় স্বাভাবিক নহে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দর পালায় [২]"সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল।" ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া থিয়েটারে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ে ঐকতান বাদিত হয়। যদুনাথ পাল কর্তৃক এই ঐকতানের দল গঠিত হইয়াছিল। যদুনাথ পালের পরিচালনাধীনে বেলগাছিয়া অর্কেষ্ট্রা কোম্পানী' তৎকালে রাজ-রাজড়াদের অনুষ্ঠানেও সমাদৃত হইত।

১। সমাচার দর্পণ, ২৬ জানুয়ারী ১৮২২'

২। Hindoo pioneer 22 Oct., 1835, quoted in Asiatic Journal for April, 1836.

[1]লেডী রিপনের বিশেষ অনুরোধে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই ঐকতানের দল রাজকীয় অতিথিদের আমোদ বিতরণের জন্য একবার ব্যারাকপুরে পাঠাইয়াছিলেন। রাজ-অতিথিরা বাজনার খুব তারিফ করিয়াছিলেন। [২]১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী একটি সখের ঐকতান বাদনের দল গঠন করেন। এই দলটি থিয়েটারে ঐকতান পরিবেশন করিত। ঐকতান অধ্যক্ষ (Bandmaster) পার্বতী চরণ দাসের শিক্ষাধীনে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে [৩]বহুবাজার ঐকতান সমাজ গঠিত হয়। ঐকতানের প্রতি শ্রোতৃবর্গের আকর্ষণের জন্যই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইহার ক্রম বিস্তার হয়। থিয়েটারের প্রভাবে ঐ সময়ের যাত্রায়ও শ্রোতাদের খুশি করিবার জন্য ঐকতানের ব্যাপক প্রচলন হয়। উনবিংশ শতকের শেষভাগের যাত্রায় ঐকতানের প্রাধান্য এত বাড়িয়া যায় যে প্রতি অঙ্কের শেষে এমনকি কোন কোন পালায় প্রতি দৃশ্যের শেষে পর্যন্ত ঐকতান বাদিত হইত। প্রসঙ্গত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহীরাবণ' পালার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পালায় প্রতি দৃশ্যের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ রহিয়াছে। পেষাদারী দল গঠন করিয়া মদন মাষ্টারকেও ঐকতানের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়।

পূর্বে পেশাদারী যাত্রায় মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বাক্যের মত অসংলগ্ন ব্যঙ্গোক্তি ব্যবহৃত হইবার রীতি প্রচলিত ছিল। [৪]"রাজার একটিংয়ের সময় বেহালাদার 'প্রশংসাসূচক ব্যঙ্গোক্তি' এবং রাজার অভিনয়াংশ ব্যতিরেকে 'কি বলছ গো দাওয়ানজী' প্রভৃতি তাহার অভিনন্দন বাক্য" আসরে প্রয়োগ করা হইত। বর্তমানের রামায়ণ গানে অনেক সময় বেহালাদার কর্তৃক অনুরূপ অসংলগ্ন উক্তি প্রযুক্ত হইতে শুনা যায়। পালা বহির্ভূত এই সকল উক্তি যে কদর্য এ বিষয়ে

1. Special interest for the Belgachia concert was envinced by Her Excellency the Lady Ripon -- It was at her special request that the Maharaja deputed the Belgachia Orchestra Company, headed by Babu Jadu Nath Paul, to Barrackpur, to entertain their Royal Highnesses, the Duke and Duchess of Connaught, who greatly appreciated the Music.—Reminiscences of Michael M. S. Dutt by Babu Gourdas Bysack.—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, ২য় সংস্করণের পরিশিষ্ট পৃ ৮, যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৫)

২। পূর্বোল্লিখিত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পৃ ৮৪

৩। অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০ জানুয়ারী, ১৮৭৩,

৪। বিশ্বকোষ, ১৩০৯

কোন সন্দেহ নাই। মদন বাবু যাত্রার আসর হইতে এই রীতি উঠাইয়া দেন। পরে অন্যান্য দলেও ক্রমে ক্রমে ইহার প্রয়োগ বন্ধ হইয়া যায়।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মধ্যযুগে ইংলণ্ডের মামিংপ্লেতে দর্শকদের নিকট হইতে অর্থাদি (Quete) আদায় করা হইত। ঐ সময় ইংলণ্ডের [১]সরাইখানার প্রাঙ্গনে যে সব অভিনয় হইত তাহাতেও মাঝে মাঝে অভিনয় বন্ধ করিয়া দর্শকদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হইত। এই রকম আমাদের দেশেও উনিশ শতকের যাত্রায় অর্থাদি (প্যালা) আদায় করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। যাত্রার প্যালা সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সিংহের একটি বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতেছে,— [২]"যাত্রার অধিকারীর বয়স ১৬ বৎসর, বাব্‌রি চুল, উল্কী ও কানে মাকড়ি; অধিকারী দূতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসরে নাব্‌লেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন তারপর বাসদেব ও মনিগোসাঁই গান করে গ্যালেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত কালজল খাব না! কালমেঘ দেখবো না! (সামিয়ানা খাটাইয়া দিমু) কাল কাপড় পরবনা! ইত্যাদি কথাবার্তায় 'নবীন বিদেশিনীর' গানে লোকের মনোরঞ্জন করলেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরানো বনাত ও শালের গাদি হয়ে গেলো। টাকা, আদুলি, সিকি ও পয়সা পর্যন্ত প্যালা পেলেন।" অনেক সময় দর্শকরা খুশি হইয়া প্যালা দিতেন। আবার অসমর্থ দর্শকদের পক্ষে আসরে উপস্থিত থাকিয়া প্যালা দিতে না পারা লজ্জাকর হইয়া পড়িত। প্যালার অর্থের জন্য দর্শকগণ অনেক সময় বিব্রত হইয়া পড়িতেন। তৎকালের প্যালা সম্পর্কে সাময়িক পত্রে বলা হইয়াছে, [৩]"এদেশে পূর্বকালে রাজারা নানা প্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎ প্রমাণ নাটক গ্রন্থ সকল বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ় দেশীয় ক্ষুদ্র লোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয়

১। "actors in an inn-yard interrupting a dramatic movement of their performance to collect money form the spectators. P. 85. Actors on Acting—T. Cole & H. K. Chinoy (New Work) 1949.

২। কলিকাতার বারোয়ারী পূজা - হুতোম পাঁচার নক্সা পৃঃ ৩০—৩১, ১৩৫৫।

—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ

৩। সমাচার চন্দ্রিকা', (কস্যচিৎ পাঠকস্য পত্র—১৫ই পৌষ— ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৩১) ১৮৩২

ইহারা ধনি-লোকের সন্তান ইহারদিগকে প্রতিপদে পেলাদিতে হইবেক না কালিদমুনের ছোঁড়াগুলো সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আদুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক সময় রঙ্গভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এরকম যাত্রায় সে আপদ নাই।" এই মন্তব্য হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে প্যালা আদায় করা অধিকাংশ শ্রোতার মনঃপূত ছিল না। কিন্তু অধিকারীরা প্যালার জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। এই লোভবশত অনেক সময় তাহারা পালার বিষয় বস্তুর কথাভুলিয়া গিয়া বাবুদের মনোরঞ্জনে উৎসুক হইয়া উঠিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে গাওনার মর্যাদা মোটেই রক্ষিত হইত না। উনিশ শতকের প্যালালোভী অধিকারীর একটি কৃষ্ণযাত্রা গাওনার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—[১]"বৈঠক খানায় বাবুদের গট্‌রা চলিতেছে, এমন সময় আসরে কেষ্ট নামলেন। আর বাবুদের রাখে কে অমনি নেমে এসে 'বাবারে হনু! তুই লঙ্কা পোড়ালি কেমন করে বল?' বলে চেঁচাতে লাগলেন। শুনেই অধিকারীর চক্ষু স্থির!! কোথায় মানভঞ্জন, আর কোথায় লঙ্কাকাণ্ড! কি করে, অধিকারী কাজেই আপনি হনুমান সেজে দেখা দিলেন। তখন আর পেলার ভাবনা রইল না। গ্রামের মেয়েছেলেরা যাত্রা শুনতে এসেছিল, এসে তারা বাবুদের মজাই দেখতে লাগলো! ক্রমে বাবুদের ভাব গাঢ় হয়ে এলো। সুতবাং সকলেই হাত ধরাধরি করে হনুকে ঘেরে নাচতে লাগ্‌লেন।" এই সকল লক্ষ্য করিয়াই মদন মাষ্টার প্যালা-রীতি তুলিয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। প্যালা বন্ধ করিবার জন্য তাহার যাত্রায় দর্শক সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকে। মদন মাষ্টারের প্রভাবে অন্যান্য পেশাদারি সংস্থায় ও প্যালা লইবার রীতি বন্ধ হইতে আরম্ভ করে। উনবিংশ শতকের যাত্রার আসরে আর একটি রীতি প্রচলিত ছিল। ধনীর গৃহে যাত্রা গানের সময় বাহবা দিবার জায়গায় মাঝে মাঝে রুমালে বাঁধা টাকা-পয়সা রঙ্গস্থলে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইত। এই টাকা-পয়সা যাত্রাধিকারীর উপরি পাওনা ছিল। ধনী গৃহস্থেরও ইহাতে সুনাম হইত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে—[২]"সভায় যখন

১। পল্লী গ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব—শ্রীযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার (রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ) বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ—১৩৫৫

২। ছেলাবেলা—পৃঃ ২২, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৫

দাদাদের কাছে এসে বসলুম, রুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোস নাম।” ইহাও এক প্রকারের প্যালা রীতি। এই রীতিও যাত্রার আসর হইতে লুপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে যাত্রার আসর হইতে প্যালা আদায়ের রীতি অন্তর্হিত। পাঁচালি, রামায়ণ, মনসার ভাসান প্রভৃতির আসরে এখনো ইহা প্রচলিত রহিয়াছে।

ব্রতকথা প্রভৃতি ও যাত্রা

বাংলাদেশে ললনাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর ব্রত অনুষ্ঠিত হয়—শাস্ত্রীয় ব্রত ও যোষিৎ প্রচলিত ব্রত। দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তন্ত্রপুরাণের নানা কাহিনীকে ব্রতের ছাঁচে ঢালাই করিয়া শাস্ত্রীয় ব্রত রচিত হইয়াছে। গৃহস্থের নানা প্রকার মঙ্গল কামনায় এই সকল ব্রত পুরোহিতের সাহায্যে উদ্‌যাপিত হয়। স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, পূজা ও ব্রতকথা শুনিবার সাধারণ নিয়ম শাস্ত্রীয় ব্রতে লক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর ব্রতে লোকজীবনের স্বাভাবিকতার তেমন স্পষ্ট ছাপ নাই। ইহা শাস্ত্রাচারের কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন। শাস্ত্রীয় ব্রত বিভিন্ন মাসের নির্দিষ্ট তিথিতে শাস্ত্রীয় প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীর ব্রতের মধ্যে বৈশাখে অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত, জ্যৈষ্ঠে রুক্মিনী দ্বাদশীব্রত, নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, আষাঢ়ে মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত, শ্রাবণে বিপত্তারিণী ব্রত, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী ব্রত, অনন্ত চতুর্দশী ব্রত, আশ্বিনে মহাষ্টমী ব্রত, কার্তিকে কার্তিকেয় ব্রত, অগ্রহায়ণে মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত, পৌষে কাত্যায়নী ব্রত, মাঘে আরোগ্য সপ্তমী ব্রত, ফাল্গুনে শিবরাত্রি ব্রত, চৈত্রে রামনবমী ব্রত, প্রতিমাসে লক্ষ্মীর ব্রত প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। যোষিৎ প্রচলিত ব্রতে অর্থাৎ মেয়েলি ব্রতে মেয়েরা ব্রতের নানা দ্রব্য আহরণ করে, ব্রতস্থানে আলপনা দেয়, প্রতিকৃতি প্রস্তুত করে, পুকুর কাটে, গাছের ছোট ডাল পোঁতে, ডাল, পুকুর, প্রতিকৃতি বা আলপনায় ফুল দিয়া ছড়া-গান করে। ইহার সঙ্গে পুরোহিত ও শাস্ত্রাচারের কৃত্রিমতার কোন সম্পর্ক নাই। মেয়েলি ব্রতে বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভাদুলি ব্রতে' বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্রা, বাণিজ্য প্রচেষ্টা, বাপ-ভাই, সোয়ামী-শ্বশুরের মঙ্গল কামনা, 'তুঁষতুঁষালি ব্রতে' ধান, গরু, গোহাল, ক্ষেত, শাকসব্জী, মা-বাপের কুলের প্রতি শ্রদ্ধা, বিবাহ বাসনা, কৃষির প্রধান সহায়ক

মাটি ও সূর্যকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও মেয়েদের নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি, "মাঘমণ্ডল ব্রতে' ফুল তোলা, শিশির ভাঙ্গা, বিবাহের পরে শ্বশুর বাড়ীর সকলকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করা, সতীনের জ্বালা, পল্লীলোকের তামাক খাওয়া, জাল ফেলিয়া মাছ ধরা, বিবাহ উৎসবে মাছ কোটা, রান্না করা, পাতা কাটা, ভোজন করানো, পাতকুড়ানো, পাশাখেলা, শিশুকে নানা প্রকারে সাজানো এবং কপিলা গাইর দুধ খাওয়ানো, স্বর্গ কামনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া পল্লী বাংলার প্রকৃতি-চিত্র, চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। মেয়েলি ব্রতে বঙ্গনারীর চিত্র রচনা জ্ঞান এবং সংগীত প্রিয়তারও সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্র নাথের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য,—[১]"খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনে তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।" মেয়েলি ব্রতে যেমন ছড়া-গান করা হয় তেমনি কোন ব্রতে আবার ছড়া-গানের সঙ্গে মেয়েদের সমবেত নৃত্যের প্রচলন আছে। উদাহরণ স্বরূপ বর্ধমানে প্রচলিত 'শস্যপাতার ব্রতে'র কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, ব্রতের আলপনায় চিত্রকলা এবং ছড়ার সঙ্গে গীত ও নৃত্যকলার সম্পর্ক রহিয়াছে।

অনেক মেয়েলি ব্রতে কেবল কামনার প্রকাশ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সেঁজুতির ব্রতের' কথা বলা যাইতে পারে। সেঁজুতির ব্রতের ছড়া অবলম্বনে একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইতেছে,—

> বাঁশের কোড়া! শালের কোঁড়া!
> কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি, আমি যেন হই রাজার ঝি।
> কোঁড়ার মাথায় ঢালি মৌ, আমি যেন হই রাজার বউ।
> কোঁড়ার মাথায় ঢালি পানি, আমি যেন হই রাজার রাণী।

অনেক ব্রতের ছড়া আবার কামনা-কল্পনা, আবেগ-অনুভূতি লইয়া নাট্য-কলার সহিত মিতালি করিয়াছে। অনেক ছড়া বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধ্যে স্থান-কাল সহ দৃশ্য পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়। ছড়াগুলির পারম্পর্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও উক্তি অনুসারে পংক্তির পার্শ্বে পাত্রপাত্রীর নাম বসাইয়া দিলেই ইহাদের নাট্য লক্ষণ সহজেই ধরা পড়ে।

পূর্ববঙ্গের 'মাঘমণ্ডল ব্রতের' ছড়া হইতে মাধবের কন্যা চন্দ্রকলার সঙ্গে

১। বাংলার ব্রত—পৃ ৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৩৭

সূর্যঠাকুরের দ্বিতীয় বিবাহ এবং নূতন স্ত্রী লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের অংশ উদ্ধার করিয়া ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে,—

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ।
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর ফেরেন নানা দেশ।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন সাড়ি,
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর ফেরেন বাড়ি বাড়ি।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়,
তাই দেখিয়া সূর্যঠাকুর বিয়া করতে যায়।

এই অংশটি সূর্যঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশীদের কথোপকথন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পরবর্তী অংশ হইতে বুঝা যায় যে ইহার স্থান সূর্যঠাকুরের বাড়িতে। উক্তি অনুযায়ী পংক্তির পাশে পাত্রপাত্রীর নাম বসান যাইতেছে,—

বিয়া করলেন সূর্যঠাকুর দানে পাইলেন কি।—প্রতিবেশিনী
হাতিও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন, আর মাধবের ঝি।—সূর্যের বাড়ির লোক
খাট পাইলেন, জাজিম পাইলেন আর মাধবের ঝি।
লেপ পাইলেন, তোষক পাইলেন,
ঘটি পাইলেন, বাটি পাইলেন,
থালা পাইলেন, খোরা পাইলেন, আর মাধবের ঝি।

মায়ের জন্য আনছেন কি ... ... প্রতিবেশিনী
শাঁখা সিঁদুর। ... ... সূর্যের বাড়ির লোক
বাপের জন্য আনছেন কি। ... ... প্রতিবেশিনী
হাতি ঘোড়া। ... ... সূর্যের বাড়ির লোক
বইনের জন্য আনছেন কি। ... ... প্রতিবেশিনী
খেলানের সাজি। ... ... সূর্যের বাড়ির লোক
সতের জন্য আনছেন কি। ... ... প্রতিবেশিনী
কুঁইয়া পুঁটি। ... ... সূর্যের বাড়ির লোক
থামুনালো থামুনালো—শিয়রে থুমু। ... সতিন
রাতখান পোহাইলে কাউয়ারে দিমু।
উরু উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ি। ... প্রতিবেশিনীরা
ঐ যে দেখা যায় সূর্যের মার বাড়ি॥

সূর্যের মালো কি কর দুয়ারে বসিয়া। … আগত প্রতিবেশিনীরা
তোমার সূর্য আসতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়া !!
আসবেন সূর্য বসবেন খাটে। … … সূর্যের মা
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে ॥
গা হেলাবেন সোনার খাটে।
পা মেলাবেন রুপার পাটে ॥
ভাত খাইবেন সোনার থালে।
বেন্নুন খাইবেন রুপার বাটিতে ॥
আঁচাইবেন ডাবর ভরা।
পান খাইবেন বিড়া বিড়া ॥
সুপারি খাইবেন ছড়া ছড়া।
খয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা।
চুন খাইবেন খুটরী ভরা
পিক ফেলাইবেন লাদা লাদা।

ছড়ার পরবর্তী অংশ হইতে বুঝা যায় যে সূর্যঠাকুর নূতন স্ত্রী লইয়া বাড়ি আসিয়াছেন এবং তেলের বাটি লইয়া স্নানে গিয়াছেন। তাহার স্নানান্তে তেলের বাটির খোজ পড়িল ; ইহা লইয়া গৃহের মহিলাদের কথোপকথন চলিতে লাগিল,—

সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি বাটির তৈল।…গৃহের কোন মহিলা
তাই লইয়া সূর্যঠাকুর নাইতে গেলেন কৈলো ॥
নাইয়া ধুইয়া বাটি থুইলেন কৈলো !
বাটি বাটি কুমার আটি সকল পুড়িয়া গেল
লক্ষ টাকার বাটি আমার হারাইয়া গেল ॥
গেছে গেছে ইহ বাটি আপদ বালাই নিয়া।…সূর্যের মা
আরেক বাটি গড়মনে চাক্কা সোনা দিয়া ॥

ইহার পরের অংশ হইতে বুঝা যায় যে সূর্য দ্বিতীয় বার বিবাহ করায় তাহার প্রথম স্ত্রীর মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে। তিনি সতীনের ঘর করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বাপের বাড়ি যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন,—

আগাটনী পান বাটনী ধাই-শাশুড়িগো।……প্রথম স্ত্রী
আমারে নি নাইয়র দিবা, আমারে নি নাইয়র দিবা।

কি জানি কি জানি বউগো।……ধাই শাশুড়ি
জান গিয়া তোমার শশুরের ঠাঁই॥

সংগীতে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া পূর্বে আমাদের দেশে লোকনাট্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হইত। গ্রামাঞ্চলের কোন কোন মেয়েলি ব্রতের ছড়া-গান সেইরূপে লোকনাট্যের ভঙ্গিতে মেয়েদের মধ্যে পরিবেশিত হইত কিনা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ছড়ার নাট্যভঙ্গির কথা পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ চিন্তা করিয়াছেন।

পাঁচালি

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী বাঁদমুড়া গ্রামের অধিবাসী দাশরথি রায় (১২১২—১২৬৪) ঊনবিংশ শতকের প্রধান পাঁচালিকার। তাহার পাঁচালিপালা গান, বর্ণনা ও ছড়ার মাধ্যমে সুরে পরিবেশিত হইত। এই সকল পালার বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে যেমন সংগৃহীত হইত তেমনি সমসাময়িক ঘটনা বা সমকালীন বিষয় লইয়াও ইহা রচিত হইত। দাশরথির জীবদ্দশায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। এই সমকালীন ঘটনা লইয়া দাশরথি 'বিধবা বিবাহ' পাঁচালি রচনা করেন। তৎকালীন নব্য ইংরেজী শিক্ষিতদের লইয়া ব্রজমোহন রায় রচনা করেন 'ইয়ংবেঙ্গল পাঁচালি' এবং ইনকামট্যাক্স প্রথা অবলম্বনে লেখেন 'ইনকামট্যাক্স পাঁচালি'। অনুপ্রাস, ঝংকার ও সুরমাধুর্যমণ্ডিত পাঁচালির মূল গায়ক নানা বিষয় লইয়া অনেক সময় ছড়া কাটিতেন। এই ছড়া পরিবেশনেরও একটি বিশেষ ঢং ও সুর ছিল। পাঁচালিতে উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক অংশও থাকিত। এই উক্তি-প্রত্যুক্তি একই ব্যক্তি কর্তৃক পরিবেশিত হইলেও বলা যায় যে ইহা নাট্য লক্ষণাক্রান্ত। এই উক্তি-প্রত্যুক্তি ছাড়া নাটকের সঙ্গে ইহার আর কোন সম্পর্ক নাই। দাশরথির পাঁচালি পালা হইতে নাট্য লক্ষণাক্রান্ত একটি অংশের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে। এই অংশে উদ্ধব ও বৃন্দার কথোপকথন রহিয়াছে।

[১]উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথা

তখন শুনি বাক্য কিশোরীর বৃন্দের শিহরিল শরীর
নিরখিল শ্যাম সে তো নয়।

১। উদ্ধবসংবাদ—দাশুরায়ের পাঁচালি, ১ম খণ্ড—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৩০৯

মনেতে বিচার করি	শ্রীরাধার কিঙ্করী
	বিনয় করি উদ্ধবেরে কয় ॥৪২
কে তুমি কোথায় ধাম	এসেছ হে ব্রজধাম
	রাধার গুণধাম অবয়ব সব।
করে তোমার দৃশ্যরূপ	ঠিক যেন হে বিশ্বরূপ
	কিন্তু নয় কেশব ॥৪৩
শুনিয়ে কন উদ্ধব	মাধব নই আমি উদ্ধব
পাঠালেন জগতের ধব	আমারে গোকুলে।
কেমন আছে ব্রজসতী	সঙ্গিনী আদি রাধা সতী—
মগ্ন আছেন শ্রীপতি	সদা শোকাকুল ॥৪৪
বৃন্দে শুনিয়ে উদ্ধবের বচন	বারি পুরিত নয়ন
বলে, প্যারীকে কি পদ্মলোচন	করেছেন মনে।
দেখ ব্রজের বসতি সব	ছিন্নভিন্ন যেন শব
হয়ে আছি সবে শব	সেই কেশব বিনে ॥৪৫
করে গিয়াছেন যে দুর্দ্দশা	দেখ উদ্ধব ব্রজের দশা
দশম দশা হতে রাধার	কত দশা হল।
দীনবন্ধু করে দীন	গিয়াছেন যেই দিন
অন্ধকার নিশিদ্দিন	সুদিন ফুরাল ॥৪৬

পাঁচালির অধিকাংশই গীত হইত। আর কোন কোন অংশ দ্রুত আবৃত্তি করিয়া অথবা বিশেষ ঢঙে ছড়া কাটিয়া পরিবেশিত হইত। এই ছড়া তান-প্রধানছন্দে রচিত হইত। উনিশ শতকের যাত্রায় কবি, পাঁচালি প্রভৃতির প্রভাবে ছড়া গৃহীত হইয়াছিল। যাত্রার ছড়াও তানপ্রধান (পয়ার) ছন্দে রচিত হইত। রামধন মিস্ত্রীর যাত্রারদল ছড়া কাটাইবার জন্য বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল।

সঙ

লোকরঞ্জনের জন্য পাঁচালিতে দাশরথি অনেক সময় সঙ্-এর অবতারণা করিতেন। [১]'সমাজের অঙ্গ বিশেষের তীব্র সমালোচনা করাই তাহার অধিকাংশ সঙ্ বা রস প্রসঙ্গের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।' এই সঙ্ নাচিয়া গাহিয়া

১। উদ্ধবসংবাদ, ভূমিকা, দ্বিতীয় অংশ—২, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

ছড়া কাটিয়া চলিয়া যাইত। তৎকালীন যাত্রায়ও সঙের বিশেষ প্রচলন ছিল। তখন রাত্রিকালে যাত্রা আরম্ভ হইতে অনেক স্থানে প্রায় নয়টা বাজিয়া যাইত। কৃষ্ণযাত্রা খ্যাত গোবিন্দ অধিকারী পালাগানে [১]'রাত্রি শেষে আসরে নামিতেন; তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্তারা আসিয়া বসিতেন। তৎপূর্বে রাত্রি নয়টা হইতে তিনটা পর্যন্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙের ব্যবস্থা ছিল।' কেবল গোবিন্দ অধিকারী নহে প্রত্যেক দলেই সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে মেথর-মেথরানী, মালি-মালিনী, ভিস্তিওয়ালা, কালুয়া-ভুলুয়া প্রভৃতি সঙের উপস্থাপনা করা হইত। এই সকল সঙ্ অধিকাংশ স্থলেই অরুচিকর রঙ্-ঢঙ্, নৃত্য-গীত পরিবেশন করিত। যাত্রার আসরে রুচিশীলদের উপস্থিত থাকিবার পক্ষে অনেক সময়ই সঙ্ অন্তরায় হইয়া পড়িত। তৎকালে সঙ্ এত জনপ্রিয় ছিল যে পাঁচালি বা যাত্রার আসর ছাড়াও পূজোৎসবে সঙ্ গড়া হইত। ঐ সকল সঙের মধ্যে 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন', 'অশৈরণ সইতে নারি শিকেয় বসে ঝুলেমরি', 'ভাল করতে পারব না মন্দ করবো কি দিদি তাদের', 'বুকফেটে দরোজা', 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে', 'খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন', 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকাব কি উপায়', 'হাড় হাবাতে মিছরির ছুরি', 'আচাভো' 'বোম্বাচাক' প্রভৃতি সঙ্ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত কলিকাতার বারোয়ারি পূজা উপলক্ষে প্রতিমার দুই পার্শ্বস্থিত 'বকা ধার্মিক ও ক্ষুদ্র নবাব'-এর সঙ্‌টির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—[২]"বকাধার্মিকের শরীরটি কুকুরের মত নাদুস-নুদুস—ভুঁড়িটি বিলাতি কুমড়োর মত—মাতায় কামানো চৈতন ফক্কা ঝুটি করে বাঁদা গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটি কতক সোনার মাদুলি—হাতে ইষ্টি কবচ—চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া—কালা পেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গতবৎসর আশী পেরিয়েছেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে। গেরস্তগোচের ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন—হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটি কতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।

ক্ষুদ্র নবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে—দুদে আলতার মত রং—আলবার্ট ফ্যাশনে চুল ফেরানো—চীনের শূয়ারের মত—শরীরটি ঘাড়ে গদ্দানে—হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিমলের ফিন ফিনে ধুতি মালকোচা করে পরা,

১। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ২৫৪, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৩৭৩।

২। কলিকাতার বারোয়ারি পূজা, পৃ ২৭, হুতোম প্যাঁচার নকশা—কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৩৫৫)

হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজা রাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে—ইদেজোলার নাতি।”

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষেও রাস্তায় সঙ্ বাহির করা হইত। এক সময় জেলেপাড়ার সঙ্ কলিকাতায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কবে কখন হইতে সঙ্-এর প্রচলন হয় তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা না গেলেও এ কথা নিশ্চিত যে সঙ্ দ্বারা যাত্রা প্রভাবিত হইয়াছিল।

ঢপ-কীর্তন

ঢপ কীর্তনে উনিশ শতকে যাহাদের পরিচিতি ছিল মধুসূদন কিন্নর তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি ১২২০ সালে (বঙ্গভাষার লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে ১২২৫ সালে) যশোহর জিলায় বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত উলুশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম তিলক কিন্নর। পিতার অর্থাভাবের জন্য মধুসূদন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। গৃহে বসিয়া চেষ্টা করিবার ফলে বাংলা বই পড়িতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু গান রচনায় তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। প্রথম বয়সে মধুসূদন ঢাকার বিখ্যাত ওস্তাদ ছোটেখাঁর নিকট রাগ-সংগীত শিক্ষা করেন। পরে ঢাকা হইতে যশোহরে ফিরিয়া বারখাদিয়া গ্রামের রাধামোহন বাউলের কাছে ঢপ-কীর্তন শিক্ষা করেন। এই ঢপ কীর্তন গাহিয়া বাংলা দেশে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে গাওনা সমাপ্ত করিবার পরে সেইখানেই পরলোক গমন করেন। ঢপ-কীর্তনে অধিকারী প্রধান গায়ক ও অদ্বিতীয় অভিনেতা। [১]‘ঢপ-কীর্তন গায়ককে একাই সর্বচরিত্রে অভিনয় করিতে হয়।’ তবে তাহার সঙ্গে দোহার এবং যন্ত্র ও বাদ্য বাজাইবার জন্য অন্য শিল্পীরাও থাকেন। এই ঢপ-কীর্তনে মাঝে মাঝে নাটকের মত সংলাপ ব্যবহারের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। এইদিক হইতে ইহা নাট্যলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়।

ঢপে অধিকারী (ক) ঘটনা বিবৃত করেন, (খ) তুক্ক সুরে (খুব সংক্ষিপ্ত মিত্রাক্ষর কবিতা প্রার্থনার টানাসুরে পরিবেশন করা) কবিতা বলেন, (গ) কখনো বা তানের সঙ্গে কবিতা পরিবেশন করেন, (ঘ) স্তব পাঠ করেন, (ঙ) গান গাহিয়া রস-সৃষ্টি করেন এবং (চ) মাঝে মাঝে চরিত্রের নাম করিয়া সংলাপ প্রয়োগ করেন। এই জাতীয় সংলাপ পরিবেশনের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

১। মধুসূদনের ঢপ-কীর্তন গ্রন্থের ভূমিকা, পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং কলিকাতা—১৯৩৬

'শ্রীরাধা বলছেন—বৃন্দে, মিথ্যে বললে কেন ? বৃন্দা বললেন—আমি মিথ্যে বলেছি তা কি আপনি জেনেছেন তবে শুনুন'—(কলঙ্ক ভঞ্জন পালা)। এই প্রকার সংলাপে নাটকীয় ইঙ্গিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঢপ-পালাকে নাটক বলা যায় না। (ছ) ঢপের শেষে মিলন গাইতে হয়; এমন কি মাথুর পালায়ও ইহার প্রয়োজন। মিলন গাওয়া বা মিলন দেখানো 'মেলতাই' নামে পরিচিত। মাথুর পালার শেষাংশ হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—"কোকিল তখন পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়-পদ্মে দর্শন করে বলছেন,—ওরে এখানে—

ডাকরে কোকিল পঞ্চম স্বরে।
মদনমোহন আমার এল ঘরে ॥
এখন তোমরা সবে হরি হরি বল।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ দোঁহার মিলন হইল ॥'

মধুসূদন 'কলঙ্কভঞ্জন', 'অক্রূর সংবাদ', 'প্রভাস' ও 'মাথুর' এই চারটি পালায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া দিতেন। ১২৯৮ সালে প্রসন্নকুমার দত্ত এই চারটি পালা প্রকাশ করেন। মধুসূদন কিন্নরের গীত রচনার ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে প্রভাস পালা হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

রাগিনী ঝিঁঝিট-তাল ঠেকা

যশোদা—আমি কাঙ্গালিনী নই দ্বারি! শোনরে কই,
যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধনহারা কাঙালিনী,
আর কিছু নিতে আসিনি আমার সেই কৃষ্ণধন বই ॥
অন্য ধন কি গণ্য করি, মান্য যে ধন সে ধন গণি,
আমার সে ধন অতুল্য ধন, অমূল্য ধন রতন মণি,—
নীলমণি নীলকান্ত মণি, তার কাছে কি পরশমণি,
দ্বারি তোরে দিব মণি, দেখাও যাদুমণি কই ॥
রজত কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুলনা,
আমার সে যাদু বাছা ধন, একবার পেলে আর ভুলবে না,—
সূদন বলে ভুলি মণি তুচ্ছ করে অন্য মণি
যে ধন সাধন করে মুনি; সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই।

উনিশ শতকে আর একজন প্রসিদ্ধ ঢপ-কীর্তনের অধিকারী ছিলেন রূপচাঁদ

চট্টোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদের প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র রূপচাঁদ অধিকারী ঢপ গাহিয়া মুর্শিদাবাদ-বেলডাঙ্গার জমিদার জগৎশেঠের নিকট হইতে নিষ্কর জমি পাইয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন। তৎকালে রূপচাঁদের ঢপ-কীর্তন বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। এই সম্পর্কে একটি উক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে,—[১]"রূপের ঢপ যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত ; এখনো বেলডাঙ্গা অঞ্চলের লোকে বলিয়া থাকে—

বাজলো রূপ অধিকারীর খোল।
মাগীরা সব চরকা তোল॥"

ঢপের'তুক' দ্বারা যাত্রাগান প্রভাবিত হইয়াছে। পরমানন্দ ও বদন অধিকারী যাত্রায় বিশেষ ভাবে 'তুক' প্রয়োগ করিতেন। গোবিন্দ অধিকারীর পালায়ও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। তুক দ্বারা এক প্রকার 'Poetic effect' সৃষ্টি করা হইত। ঢপের মেলতাই দ্বারাও যাত্রা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। এই প্রসঙ্গে মতিলাল রায়ের 'ব্রজলীলা গীতাভিনয়' ও 'শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য গীতাভিনয়ের' উল্লেখ করা যাইতে পারে। উনিশ শতকের সাধারণ দর্শক পৌরাণিক নাটকে বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি সহ্য করিতে পারিতেন না। গীতাভিনয় রচয়িতা মনোমোহন বসুর দক্ষযজ্ঞ বিষয়ক 'সতী' (১৮৭৩) নাটকে মহাদেব ও সতীর বিচ্ছেদ দেখান হয়। ইহাতে সাধারণ দর্শক মনঃক্ষুণ্ণ হইলে তাহাকে এই নাটকের জন্য হরপার্বতীর মিলনান্তক একটি ক্রোড়াঙ্ক রচনা করিতে হয়। মেলতাইর প্রভাব বিংশ শতকের যাত্রাপালায়ও লক্ষিত হয়। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' ইহার উল্লেখ যোগ্য দৃষ্টান্ত। অহিভূষণ ভট্টাচার্য এবং হারাধন রায়ের যাত্রাপালায়ও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

রামায়ণ গান

গীতি, বর্ণনামূলক ও উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক ছড়া, চরিত্রের নাম উল্লেখ করিয়া কখনো পদ্যে কখনো গদ্যে, সুরে বা 'সুরহীন' সাধারণ ভাবে সংলাপ সংযোজনার মাধ্যমে রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়। অধিকারী ইহার মূল গায়ক, ছড়া-দার ও বক্তা। তাহার সঙ্গে আসরে দোহার ও বাদকগণ থাকেন। ইহাতে বক্তৃতাও বিভিন্ন চরিত্রের নামে সংলাপ পরিবেশনের সময় বেহালাদার কর্তৃক মাঝে মাঝে অসংলগ্ন উক্তি প্রয়োগ করা হয়। পাঁচালির মত ইহাতে অধিকারীর উক্তি

১। বঙ্গভাষার লেখক পৃঃ ৩৮৪, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—১৩১১।

প্রত্যুক্তিমূলক ছড়া ও চরিত্রের নামে সংলাপ পরিবেশনে নাট্যলক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে রাম-মাহাত্ম্যমূলক বিভিন্ন পালা গাওনা করা হয়। অনেক সময় সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণ কাহিনীও একদিনে একটি আসরে পরিবেশিত হয়। রামায়ণ গানের মত যাত্রায়ও সুরে গদ্য ও পদ্য সংলাপ সংযোজনা এবং ছড়ার ধরণের উক্তি প্রত্যুক্তি লক্ষিত হয়।

মঙ্গলচণ্ডীর গান

ইহা অনেকটা রামায়ণের মতই পরিবেশিত হয়। কিন্তু ইহাতে সাধারণত অসংলগ্ন উক্তি, চরিত্রের নামে অধিকারীর সংলাপ পরিবেশন এবং বক্তৃতা থাকে না। গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ পালার আকারে ছড়া ও গানের মধ্য দিয়া পরিবেশিত হয়। মূল গায়কের সঙ্গে যন্ত্রাদি বাদক ও দোহার থাকে। মঙ্গলচণ্ডীর গান সাধারণত কয়েকদিন ধরিয়া চলে। মনসার ভাসানও মঙ্গলচণ্ডীর গানের রীতিতে সাধারণত পরিবেশিত হয়; কেবল মূল গায়েনেব হাতে একটি বা দুইটি চামর থাকে। মঙ্গলচণ্ডীর গান ও মনসার ভাসানের মত ছড়া কাটার প্রথা ও দোহার ব্যবহাবের রীতি যাত্রায়ও প্রচলিত ছিল। গানে দোহারের ব্যবহার আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ এবং বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও ইহার পরিচয় রহিয়াছে। গীত-গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের 'ধুয়া' ব্যবহারে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রচলিত দোহারকির প্রথা কোন প্রকার গীতরীতি হইতেই বাদ পড়ে নাই।

কথকতা

টপ গায়কের মত কথক একাই গায়ক, বক্তা ও অদ্বিতীয় অভিনেতা। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দোহার থাকে না। পালায় কথক চরিত্রের নাম করিয়া নানা ভাবের সংলাপ ও গান পরিবেশন করেন। মাঝে মাঝে তিনি কাহিনীর অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করেন, চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কথকতায় অভিনয়ের ভঙ্গিতে চরিত্রের নাম করিয়া সংলাপ পরিবেশনের মধ্যে নাট্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কথকগণ সাধারণত ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী পরিবেশন করেন। কথকতা বহু প্রাচীন কাল হইতে সুরু করিয়া বর্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে। উনিশ শতকে [১]'গদাধর শিরোমণি, রামধন

১। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কলিকাতার বারোয়ারি পূজা, পৃ ২৫, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১৩৫৫

তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক' বঙ্গবাসীকে পুরাণ-কথা শুনাইয়াছেন। ঐ কথকদের মধ্যে বহরমপুর নিবাসী কালীচরণ ভট্টাচার্যেরও খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাহার কথকতা-শিষ্য হুগলী জিলার শ্রীধর কথকেব (জন্ম ১২১৩ সালে) প্রসিদ্ধি ছিল সর্বাধিক। গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম সিবাসী [১]'শ্রীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন।' শ্রীধর কথকতায় বহুবিধ গীতি প্রয়োগ করিতেন। কথকতা কালীন [২]"শ্রীধরের কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত ও কালীবিষয়ক সঙ্গীত যেন সুধার প্রস্রবণ ছিল।" এই প্রসঙ্গে শ্রীধরের একটি গীতি উদ্ধৃত হইল,—

গিরিরাজকে ডেকে দেগো, আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধার রাশি, উমাশশী প্রকাশিল।
এই নগরে লোক ছিল ঘরে, না ডাকিতে আমার ঘরে
কেবল উমার আগমনে, সকলে আনন্দ মনে,
গিরি পুরবাসিগণে গিরিপুর আজ পুরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডীপড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘট স্থাপন চণ্ডীপড়া সফল হল।

চব্বিশ পরগণা জিলার খাঁটুয়া গ্রামের ধরণীধর শিরোমণি (১৮১৩-১৮৭৫) উনিশ শতকের অন্যতম প্রধান কথক ছিলেন। কথকগণ ধর্ম, ভক্তিভাব, নীতি, শাস্ত্র নির্দেশ, পাপ পুণ্যের বিচার প্রভৃতি লইয়া লোকশিক্ষার প্রচারক ছিলেন। এই দিক হইতে যাত্রার সঙ্গে ইহার মিল রহিয়াছে। [৩]"আমাদের চাষা ভুষারা যাত্রারদল ও কথক ঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানশিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য।" শুধু চাষা ভুষা নহে সাধারণভাবে পল্লীবাসীদের অন্যতম শিক্ষার বাহনই ছিল যাত্রা ও কথকতা। কথকতার ধরণের বক্তৃতাও যাত্রায় গৃহীত হয়।

যাত্রা পালায় যেমন বক্তৃতাধর্মী দীর্ঘ সংলাপ সংযোজনা করা হইয়াছে, তেমনি সংলাপ পরিবেশনের সময় সুযোগ অনুসারে বিভিন্ন বিষয় লইয়া নাটক বহির্ভূত স্বকল্পিত স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতারও অবতারণা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মতিলাল রায় ও মুকুন্দদাসের নাম (বিশ শতক) বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাত্রার বক্তৃতা কথকতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

১। হুতোম প্যাঁচার নক্শা, কলিকাতার বারোয়ারি পূজা, পৃ ২৫ কালীপ্রসন্ন সিংহ, ১৩৫৫
২। পূর্বোল্লিখিত বঙ্গভাষার লেখক—পৃ ৩৫৯
৩। লোকহিত, কালান্তর, পৃঃ ৪৬, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬২

উনবিংশ শতকে কৃষ্ণযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা, চৈতন্য যাত্রা ও পুরানাদির কাহিনী লইয়া রচিত যাত্রার বিশেষ প্রচলন ছিল। তৎকালে সাধারণত অধিকারীরাই পালা রচনা করিতেন এবং ইহার পরিবেশনে অংশ গ্রহণ করিতেন। কখনো কখনো অধিকারীরা যে অন্য লেখক দ্বারা পালা রচনা করাইয়া না লইতেন এমন নহে। উনিশ শতকের এই সকল প্রধান যাত্রাকার ও যাত্রার অধিকারীদের পরিচয় যেওয়া যাইতেছে।

পেশাদার যাত্রার দল

শিশুরাম অধিকারী

তিনি বীরভূমের কেঁদেলি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। উনবিংশ শতকের কুরুচি প্রভাবিত যাত্রাকে ব্রাহ্মণ শিশুরাম কিঞ্চিৎ পরিশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণযাত্রা পরিবেশন করিতেন।

শ্রীদাম দাস ও সুবল অধিকারী

এই দুই অধিকারী কৃষ্ণ যাত্রায় খুব খ্যাতিলাভ করেন। তাহারা সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ঐ সময় কৃষ্ণ যাত্রায় [১]"প্রথমে গৌরচন্দ্রী পাঠের পরে কৃষ্ণের নৃত্য ও তদন্তে গোঁসাইর শুভাগমন হইত।" দাস ভ্রাতৃদ্বয় যাত্রায় এই রীতি অনুসরণ করিতেন। [২]ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামপুরে—শ্রীদাম ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

পরমানন্দ অধিকারী

বীরভূম জেলার রামবাটি গ্রাম নিবাসী এই অধিকারী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রার গাওনা সুরু করেন। [৩]"প্রাচীন ও প্রধান অধিকারীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ" পরমানন্দ উনিশ শতকের প্রথমে যাত্রার পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে কিছুটা সাফল্য লাভ করেন।

লোচন অধিকারী

এই অধিকারী 'অক্রুর সংবাদ' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' পালায় অশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাহার যাত্রা গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রচুর অর্থ পারিতোষিক দেন।

১।২। বিশ্বকোষ ১৩০৯

৩। সমাচার দর্পণ—২১ অক্টোবর, ১৮২০

বদন অধিকারী

তাহার বাড়ী ছিল হুগলী জিলায় জিরাট গ্রামে,—জন্মস্থান হাওড়া-শালিখা। তিনি পরমানন্দ অধিকারীর সঙ্গীত-শিষ্য ছিলেন। প্রথম বয়সে পরমানন্দের দলে তিনি বালকের অংশ গ্রহণ করিতেন। পরবর্তীকালে নিজে দল গঠন করিয়া তিনি 'মান', 'দান' ও 'মাথুর' পালায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বদন অধিকারী গানের সঙ্গে চমৎকার বেহালা বাজাইতেন। তাহার 'মাথুর' পালা হইতে একটি গান উদ্ধার করা যাইতেছে,—

যদি বাঁচাবি রাধার প্রাণ।
সবে মিলে কর্ণে গিয়ে শোনাও কৃষ্ণের নাম॥
শ্যামাসখি বলিশুন—শ্যামবর্ণের ফল আন।
শ্যামলতায় গেঁথে মালা কর শ্রী অঙ্গে প্রদান॥
ওলো যত সহচরি! করে ধরি বিনয় করি।
আনগে শ্যাম কুণ্ডের বারি রাধার অঙ্গে কর দান॥

এই সময় যেমন যাত্রার কিছু পরিমার্জন হইতেছিল তেমনি কিছু কিছু রূপান্তরও ঘটিতেছিল। ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় 'কলিরাজার যাত্রা'য় (১৮২১)। বহুবিজ্ঞ লোকের সহযোগিতায় এই মার্জিত নূতন যাত্রা প্রকাশিত হয়। সমাচার দর্পণে এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে—[১]"সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ কেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গভঙ্গ পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি স্বর ন্যাক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদুমধুর বাক্যালাপ কৌশলাদি দ্বারা নানা দিগ্‌দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞলোক উৎসুক এবং সহকারী অছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটি হইতে পারে।" আর একটি পরিমার্জিত যাত্রাভিনয় করেন দক্ষিণ ভবানীপুরের ভদ্র সম্প্রদায়। এই অঞ্চলের গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে সম্প্রদায়ের প্রথম গাওনা হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। পালার নাম 'নলদময়ন্তী'। এই যাত্রায় [২]"নানা প্রকার রাগরাগিনীযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন।"

১। সমাচার দর্পণ, ২৬ জানুয়ারী ১৮২১, মার্শম্যান।
২। ঐ ১৩ জুলাই, ১৮২২

[১]এই 'নলদময়ন্তী'র গান ও ছড়া রচনা করেন রামবসু। দেখা যাইতেছে যে [২]"বহু কালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে" যে প্রচলিত ছিল কয়েকজন অধিকারী ও সৌখিন সম্প্রদায় তাহার কিছু কিছু সংস্কার সাধনে ব্রতী হইলেন।

গোবিন্দ অধিকারী (১২০৫-১২৭৭ সাল)

হুগলী জিলার জাহাঙ্গীর পাড়ার (খনাকুল কৃষ্ণ নগরের কাছে) অধিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ১২০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে পাঠশালায় সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া আমতা-ধুরখালি (হাওড়া) গ্রামের গোলোকদাস অধিকারীর নিকট তিনি কীর্তন গান শিক্ষা করেন। [৩]"পূর্ববঙ্গের জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রার দলের তিনি প্রসিদ্ধ ছোকরা ছিলেন।" এই দলত্যাগের কিছুকাল পরে তিনি নিজে কৃষ্ণ যাত্রার দল গঠন করেন। সংগীত রচনায় তাহার খুব খ্যাতি হয়। তাহার বহু গানে অনুপ্রাসের প্রাচুর্য রহিয়াছে। অভিনয়ে গোবিন্দ বৃন্দা সাজিতেন। [৪]"গোবিন্দ অধিকারীর পোষাক জরি বসান শালুর কাপড়ে প্রস্তুত ছিল।" এই দলে অন্যান্য [৫]"যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইত, তাহারা কলা পাতার গহনা পরিত।" গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণ যাত্রায় [৬]"প্রধান বাদ্য যন্ত্র ছিল তানপুরা, খোল ও করতাল।" অভিনয় ও গানে গোবিন্দের খুব প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে। কৃষ্ণ যাত্রা গাহিয়া তিনি [৭]"বহু অর্থ উপার্জন করেন, এমন কি শেষে জমিদারী পর্যন্ত খরিদ করিয়া যান।" এদেশে এক সময় বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রসার লাভ করে। [৮]"বিদ্যাসুন্দরের আদি রসাশ্রিত প্রীতিপ্রদ গীতি স্রোতে যখন কলিকাতা এমন কি সমগ্র বঙ্গদেশ একরূপ মজিয়া উঠিয়াছিল, তখন সকরুণ বক্তৃতায় ও সুমধুর কৃষ্ণ প্রেম গানে সমস্ত বঙ্গ দেশকে মাতাইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার আসরে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছিলেন।" বর্ধমান রাজ বাড়িতে তাহার একচেটিয়া গাওনা ছিল। কেবল বর্ধমান নহে ১২৩০ সালের পরে কিছুকাল পর্যন্ত বদন ও গোবিন্দ অধিকারী কলিকাতায়ও কৃষ্ণ

১। সংবাদ প্রভাকর, ১৬ সেপ্টেম্বর—১৮৫৪, ঈশ্বর গুপ্ত
২। বিবিধার্থ সংগ্রহ মাঘ, ১৭৮০ শক, পৃ ২৩৫, রাজেন্দ্রলাল মিত্র
৩। জীবনীকোষ (ভারতীয় ঐতিহাসিক) ৩য় খণ্ড, ১৩৪৫—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
৪। ৫। ৬। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ২৪৫, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৩৭৩
৭। সরল বাংলা অভিধান, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সুবলচন্দ্র মিত্র
৮। বিশ্বকোষ, ১৩০৯

যাত্রায় একাধিপত্য বিস্তার করেন। গোবিন্দ অধিকারীর গাওনায় [১]"যাত্রার আসরে লোক ধরিত না, তিল ফেলিবার স্থান কুলাইত না; গোবিন্দ আসরে নামিবেন এই আশায় সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত।" গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণ যাত্রার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। (ক) ইহাতে গানের সংখ্যা প্রচুর; চার অঙ্কের 'কালিয়দমন' পালায় ছাপ্পান্ন খানি গান আছে। 'কৃষ্ণকালী' পালায় গানের সংখ্যা সত্তর। গোবিন্দের গানের কৃতিত্ব সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে তিন অঙ্কে রচিত 'কৃষ্ণকালী' পালা হইতে একটি গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হইল,—

কৃষ্ণ আজি কালী হইল নিধুবনে,
বন আলোকিত হল রূপের কিরণে ॥
চতুর্ভুজা এলাকেশী, দিগম্বরী করে অসি,
লোলজিহ্বায় অট্টহাসি করালবদনে ॥
প্রভাকর জিনি প্রভা শিরেতে কিরীটের শোভা,
মুণ্ডমালা গলে কিবা দুলিছে সঘনে ॥
নানা জাতি বনফুলে রক্তজবা বিল্বদলে,
পূজা করে যাই কুতূহলে অভয়ার চরণে ॥
আয়ান আসিয়ে দেখে, রাধিকে পূজে কালীকে,
পুলকে পুলকে ভরে লুটাবে ধরাসনে ;
কৃষ্ণকালীর চরণ কমলে দাসগোবিন্দ ভাবে কেবল
দারুণ শমন কবল এড়াতে নিদানের দিনে। (৩য় অঙ্ক, বৃন্দার গান)

গোবিন্দ অধিকারীর পালায় রাগরাগিণীযুক্ত গান ও কীর্তনাঙ্গ গান দুই-ই পরিবেশিত হইত। (খ) অনেক পালায় পদ্যে তুক্ক ব্যবহার করা হইয়াছে। কৃষ্ণকালী পালায় তুক্কর অবতারণা করিয়া নাটক সুরু করা হইয়াছে,—

বৃন্দা—শোনলো রাজনন্দিনী, নন্দ-নন্দনা নন্দিনী,
চিরদিন পিরীতির রীতি না যায় সমান।
কথনো বিরহ জ্বালা, পুন প্রেমে ঝালাপালা,
কথনো দুর্জয়মান, কভু অভিমান। (১ম অঙ্ক)

(গ) ইহাতে পদ্য ও গদ্য সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে। গদ্য সংলাপও

১। বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৩৮৪, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৩১১

অনেক সময় সুরে বলা হইত ; পদ্যসংলাপেও কখনো কখনো এই রীতি প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই রীতির মূলেও সংগীতের প্রভাব রহিয়াছে—ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। পাঁচ অংকে রচিত 'মুক্তাবলী' পালা হইতে সুরে গদ্য সংলাপ ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

সুবল—(সুরে) ওগো ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী, কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী রসময়ী রসবতী রাইধনি গো ! প্রণাম হইগো।

(প্রণাম, ২য় অঙ্ক)

এই প্রকারের সুরে গদ্যসংলাপ পরিবেশনে কথকতা ও রামায়ণ গানের প্রভাব রহিয়াছে। তিন অঙ্কের পালা 'দেয়াশিনী মিলন' হইতে সুরে পদ্য সংলাপ পরিবেশনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল,—

বৃন্দা—(সুরে) দেয়াশিনী বেশে সাজি বিনোদ নাগর।
ধীরে ধীরে চলে প্রফুল্ল অন্তর ॥
গোকুলে নগরে তাই শব্দ উঠিল।
একজন দেয়াশিনী ব্রজেতে আসিল ॥
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গমন।
ব্রজবাসিগণে চলে হরষিত মন ॥ (২য় অঙ্ক)

সুরে পরিবেশিত পদ্যসংলাপ ঢপের 'তুক্ক'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার নাটকে দীর্ঘ সংলাপের ব্যবহার নাই। সংলাপ খুবই ছোট ছোট। একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

কৃষ্ণ—ওগো দাদা ! এ কালিদহের জল যে বিষে বিষে নীল হয়েছে গো ! ওরা যদি এ জল খেয়ে থাকে তাহলে তো বাঁচবে নাগো।

বলরাম—কেন ভাই কৃষ্ণ, বিষজল খেলে কি প্রাণে বাঁচবে না ভাই ?

কৃষ্ণ—ওগো দাদা, এতো বিষজল নয়গো, এ যে আশীবিষ—কালকূট বিষগো !'

বলরাম—ও ভাই কৃষ্ণ ! এমন ফটিক জলে বিষ কে ঢাললে ভাই ?

কৃষ্ণ—দাদা গো ! এই কালিদহের জলে কোন বিষধর ভুজঙ্গ আছে গো। সেই বিষ ঢেলে এর জলকে বিষিয়ে রেখেছে গো। (৩য় অঙ্ক, কালিয়দমন পালা)

(ঘ) কোন কোন পালায় সংস্কৃত স্তব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত 'মাথুর' পালার উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

১। বৃন্দা—(স্তব) তপ্তহেমপ্রভানীল কুন্তলাবদ্ধমল্লিকাম্।
শরচ্চন্দ্রমুখীনিত্যং চকোরীচঞ্চলক্ষিণাম্॥

*

তপ্তকাঞ্চণগৌরাঙ্গীং রাধাবৃন্দাবনেশ্বরীম্।
বৃষভানুসুতাংদেবিং ত্বাংনমামি হরিপ্রিয়াম্॥ (১ম অঙ্ক)

২। বৃন্দা—(স্তব) ফুল্লেন্দিবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হবতংস প্রিয়ং।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বর সুন্দরম্॥

*

হেকৃষ্ণ করুণাসিন্ধু-দীনবন্ধু-জগৎপতে।
গোগেশগোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তুতে॥

(২য় অঙ্ক)

(ঙ) গোবিন্দ অধিকারী নাটককে অংকে বিভক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু অংকের দৃশ্য বিভাগ নাই। সংস্কৃত নাটকেরও অংক দৃশ্যে বিভক্ত নহে ; সুতরাং এই দিক হইতে তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুরণ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। অংকের প্রথমে আবার গোবিন্দ অধিকারী নাট্যস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন 'কৃষ্ণকালী' পালায় দ্বিতীয় অংকের প্রথমেই স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে—'আয়ান ভবন'। এই সকল কৃষ্ণ যাত্রায় মাঝে মাঝে নাট্য নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। চার অংকের 'কলঙ্ক ভঞ্জন' পালা হইতে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল.—

চতুর্থ অংক—নন্দালয়

যশোদা কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট, বৈদ্য,
রাম, কুটিলা ও জটিলার প্রবেশ।

বৈদ্য—(আসিয়া) মা যশোদা ! প্রণাম হই। (প্রণাম)

(চ) কোন কোন পালায় গৌরচন্দ্রিকা ব্যবহৃত হইত। তিন অঙ্কে রচিত 'গোষ্ঠবিহার' পালায় গৌর চন্দ্রিকা আছে। 'কলঙ্ক ভঞ্জন' পালায় গৌরচন্দ্রিকা নাই। আবার তিন অঙ্কে বিভক্ত 'মান ভঞ্জন' পালায় প্রথমে নান্দী ও পরে গৌর চন্দ্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

নান্দী—

জয় রাধা বল্লভ দেবাদি দুর্লভ
ভবভাব্য নিধি, ভবদুঃখহারী।

ওহে দীনবন্ধু, দীনজনের বন্ধু
ভবসিন্ধু পারে তুমি হে কাণ্ডারী ॥

ভবমাঝে হেরি বিপদ আকুল
কিসে পাব কুল ভেবে প্রাণাকুল
স্বগুণে নির্গুণে হয়ে সানুকুল
দেহ দেহ কূল গোকুল বিহারী ॥
মতি যেন থাকে ঐ যুগলপদে
পড়িলে বিপদে, রেখো নিরাপদে
দাসগোবিন্দ বলে, বিকাই যেন পদে
বিপদে ফেলনা বিপদবারী ॥

গৌরচন্দ্রিকা

বৃন্দা—গোরার মনে হল ব্রজধাম নন্দের নন্দন শ্যাম
ধরি কাঁদে আপন চরণে।
মনে হল ব্রজপুরী, গদাধরের মুখ হেরি
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়নে ॥
রাই কোন ভাবে ভরা প্রলাপ করয়ে গোরা
কাঁদি কহে বিনয় বচনে।
এতেক দেখিয়া মনে গোরা কাঁদে রাত্রদিনে
গোবিন্দ দাসের এই নিবেদন ॥

শৃঙ্গার, বাৎসল্য, সখ্যরস থাকিলেও গোবিন্দের পালায় ভক্তি রসেরই প্রাধান্য। উল্লিখিত পালাগুলি ছাড়াও তিনি 'শুকশাড়ীর পালা', ও 'চূড়ানূপুরের দ্বন্দ্ব' নামে আরো দুইটি পালা রচনা করেন। গোবিন্দদাস-এর দল সালখিয়ায় (হাওড়া) থাকিত। ১২৭৭ সালে তিনি সালখিয়ায় গঙ্গাতীরে পরলোক গমন করেন।

পিতাম্বর অধিকারী

বর্ধমানজিলার কাটোয়া অঞ্চলের অধিবাসী পিতাম্বর স্বরচিত কৃষ্ণযাত্রায় খুব সুনাম অর্জন করেন।

কালাচাঁদ পাল

তিনি ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলে কৃষ্ণ যাত্রা গাহিয়া খ্যাতির অধিকারী হন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১২১৭-১২৯৪ সাল)

তিনি নদীয়া জিলার ভাজন ঘাটে ১২১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতা মুরলীধর গোস্বামীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়া তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে সুরু করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা হইলে কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের একটি টোলে কাব্য অধ্যয়নে রত হইলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালায় তিনি নদীয়া বাসীকে মুগ্ধ করেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণকমল পূর্ববঙ্গে গিয়া যাত্রা সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেন; 'স্বপ্নবিলাস' (১৮৩৫), 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস', 'দিব্যোন্মাদ', 'সুবল সংবাদ', 'নন্দ বিদায়', 'ভরত-মিলন', প্রভৃতি পালায় সমগ্র পূর্ববঙ্গকে তিনি মাতাইয়া দিয়াছিলেন! সঙ্গীত রচনায় কৃষ্ণকমল অনুপ্রাস প্রয়োগে নিপুণ ছিলেন। তাহার গানের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

বসন্ত—তিনতাল

ভাইরে সুবল! ভাইরে সুবল! উপায় কি করি বল
কেবল রিপুবল—হইল প্রবল,
কানাই বিনে বৃন্দাবনে দুর্বলের আর কি আছে বল
পুনকি কালিয়দহে, বিষজলে প্রাণদহে
কিবা দাবানল দহে, দহে বৃন্দাবন সকল।
দেখি আর দিনেক দুদিন, যদি বিধি না দেয় সুদিন
তবে আর কেন দিনের দিন, দিন গুণে দিন কাটাই বিফল।

(সুবল সংবাদ)

তাহার যাত্রা পালায় গদ্য সংলাপ অপেক্ষা গীতি সংলাপ অধিক প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহার অনেক যাত্রাপালা চৈতন্য-জীবনী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যাইতে পারে।—[১]"বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস যেকথা দার্শনিকের ভাষায় কহিয়াছেন, তাহা কবির হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে। চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহের করুণ উচ্ছ্বাসে মাথুরের সৃষ্টি, তাঁহার উন্মত্ত প্রলাপে রাই উন্মাদিনী জীবন পাইয়াছে ও স্বপ্ন-বিলাস সার্থক হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, স্বপ্ন বিলাপ প্রভৃতি কাব্য প্রবীণ চৈতন্য-চরিতামৃত মহীরুহের ফুল ও ফল।"

১। নিত্যানন্দ গোস্বামী সংকলিত—'কৃষ্ণকমল গীতিকাব্যের'
—দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকা

কৃষ্ণকমল অধিকারী (জাতিতে বৈদ্য) হুগলী জিলার চুঁচুড়ায় ১২৯৪ সালে পরলোক গমন করেন।

মদনমাষ্টারের দল

যাত্রার সংস্কার প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি নিজে পালাকার ছিলেন। *দক্ষযজ্ঞ*, হরিশচন্দ্র, রাম বনবাস, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি তাহার দলের অভিনীত পালা।

মতিলাল রায়

১২৪৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামের অধিবাসী মতিলাল পরবর্তী কালে নবদ্বীপে বাস পরিবর্তন করেন। মতিলালের পিতার নাম মনোহর রায়। মতিলাল প্রথমে নপদ্বীপে মিশনারী স্কুলে ও পরে বারাসত এনট্রান্স স্কুলে লেখাপড়া করেন। বারাসত স্কুল লইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। প্রথমে মতিলাল কলিকাতা জোড়াসাঁকো থানায় কেরানীর কাজে যোগদান করেন। অল্পকাল পরে এই চাকুরী ছাড়িয়া তিনি চক ব্রাহ্মণ গড়িয়া স্কুল এবং তথা হইতে নবদ্বীপের একটি স্কুলে কার্য গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের কার্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরবর্তী কালে কলিকাতা জি. পি. ও.-তে কর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' মাঝে মাঝে কবিতাদি প্রকাশ করিতে থাকেন। ঈশ্বর চন্দ্র তাহার লেখা দেখিতেন ও উৎসাহ দিতেন। এই দিক দিয়া তাহাকে ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য বলা যাইতে পারে। দোগাছিয়া নিবাসী হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর উৎসাহদানে [১]"মতিলাল প্রথম রামায়ণের অন্তর্গত 'তরণীসেন বধ' নাটক রচনা করেন; পরে 'রাম বনবাস' রচিত হয়।" হরিনারায়ণ বাবুর সহযোগিতায় মতিলাল একটি যাত্রার দল গঠন করেন এবং চাকুরী ছাড়িয়া লোকনাট্য রচনা ও পরিবেশনে ব্রতী হন। এই দলটি বন্ধ হয় হরিনারায়ণ বাবুর সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায়। ইহার পরে ১২৮০ বঙ্গাব্দে তিনি নবদ্বীপে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। দলটির নাম হয় 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়'। সীতাহরণ গীতাভিনয়ের উপহার অংশে মতিলাল সংস্থার নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"আমি ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়' সংস্থাপনে

১ পূর্বোল্লিখিত বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৮৯৩

সাহসী হই।" দল গঠন করিবার পরে মতিলালের গাওনার প্রভূত খ্যাতি হয়। [১]"যাত্রার দল করিয়া ইনি কিছু জমিদারীও কিনিয়াছেন।" যাত্রা গানের জন্য মতিলাল ভট্টপল্লী হইতে কাব্য-কণ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপাধিদান উপলক্ষে ভট্টপল্লী হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক সহ তিনি একটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন,—

[২]মতিলাল কবের্দৃশ্য কাব্য দর্শনহর্ষিতা।
ভট্টপল্লী সমাচষ্টে কাব্য-কণ্ঠ-পদেনতম্‌॥

উনিশ শতকের শেষে 'বিজয় চণ্ডী' (১৮৮০), 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (১৮৮১), 'সীতাহরণ', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'কর্ণবধ', 'ভরত-আগমন' (১৮৮৮), 'নিমাই সন্ন্যাস' 'ব্রজলীলা' (১৮৯৪) প্রভৃতি গীতাভিনয়ে মতিলাল প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন। কেশব চন্দ্র সেনের বাড়িতে তাহার 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা শুনিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করেন। যাত্রার আসরে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে যাত্রা শুনিতেছিলেন। মতিলাল ঐ পালায় 'শ্রীধরের' ভূমিকা গ্রহণ করেন। [৩]"আবেগময় প্রাণমন মুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবল স্রোতে পরমহংস সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন, অনেক পরে মোহ অপগত হইলে রামকৃষ্ণ পরমহংস—মতি মতি বলিয়া স্বয়ং উত্থান পূর্বক রায় মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন।"

হরিমোহন রায়

রাজা রাম মোহন রায়ের পৌত্র জজ রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হরিমোহন একটি পেশাদারী যাত্রার দল গঠন করেন। তাহার দলের কৃষ্ণ যাত্রার খুব খ্যাতি হয়। কলিকাতার বাহির হইতেও তাহার দলের বায়না সংগৃহীত হইত। [৪]"কলিকাতা হইতে দূরদেশে যাইতে হইলে তিনি হস্তি-পৃষ্ঠে চড়িয়া গমন করিতেন। হরিমোহন গীতি রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাহার একটি গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

মানময়ি. দেখ তব পায়।
আহামরি প্রাণহরি ধরণী লুটায়॥

১। সরল বাংলা অভিধান (৬ষ্ঠ সং, সুবলচন্দ্র মিত্র)
২। বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৮৯৫, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
৩। ঐ পৃ ৮৯৬
৪। বিশ্বকোষ ১৩০৯

যার মানে তব মান, তাঁর এত অপমান।
প্রাণ সখি, প্রাণে ধরে দেখা কি গো যায় ॥
আর কাজ নাই মানে, সরে বস সাবধানে।
ঠেকিবে চরণ তব মোহন-চূড়ায় ॥

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

তিনি বর্ধমানের ধরণী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়। বর্ধমান-জামুই গ্রামের ওস্তাদ গোপাল রায়ের নিকট গান শিখিয়া তিনি কৃষ্ণ যাত্রার দলে প্রবেশ করেন। ইহার পরে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা শুনিয়া তাহার দলে যোগ দেন। ১২৭৭ সালে গোবিন্দ অধিকারী মৃত্যু মুখে পতিত হন।

এ দিকে নীল কণ্ঠের পিতা উন্মাদরোগগ্রস্ত হওয়ায় তিনি আর্থিক অনটনে পড়েন। অর্থ ক্লেশ দূর করিবার উদ্দেশ্যে রামমোহন পাঁড়ের নিকট নীলকণ্ঠ হিন্দী লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ১৪ বৎসর বয়সে তিনি এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর দোকানে খাতা লিখিবার কাজ স্বরু করেন। এই সময় তাহার সঙ্গীত শিক্ষা এবং মাঝে মাঝে আসরে গান করাও চলিতে থাকে। [১]"১৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি স্বয়ং দল গঠন করেন।" যাত্রার দলে গোবিন্দ অধিকারীর কাছে নীলকণ্ঠ মহাজনপদাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। সময় কালে স্বদলে তাহার [২]"স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি অবসর পাইয়া বিকশিত হইতে থাকে।" বর্ধমান, বীরভূম ও কলিকাতা অঞ্চলে তিনি যাত্রায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সঙ্গীত রচনায় নীলকণ্ঠ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহার 'মানভঞ্জন' 'দূতী-সংবাদ' প্রভৃতি কৃষ্ণ যাত্রায় জনগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। [৩]"নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গীতরত্ন উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।"

রসিকলাল চক্রবর্তী (১২২৭-১৩০০ সাল)

যশোহর জিলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত রায় গ্রামের অধিবাসী রসিকলাল ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৪ সালে মাতৃবিয়োগের পরে তিনি হরিগুণ গানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একদল বালক লইয়া একটি যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলটি 'বালক সংগীত যাত্রা' নামে খ্যাত হয়। এক সময়

১।৩। জীবনী কোষ ভারতীয় ঐতিহাসিক (৪র্থ খণ্ড),—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
২। সরল বাংলা অভিধান, ৬ষ্ঠ সং, সুবল চন্দ্র মিত্র।

[১]"বাংলার সর্বত্রই এই বালক সংগীতের আদর ও সম্মান বাড়িয়াছিল।" এই বালকগণ পীতবস্ত্র পরিয়া, মাথায় ফুলের কেয়ারী দিয়া রাখাল সাজিত। এই কৃষ্ণ যাত্রায় রসিক লাল বক্তৃতার পরিবর্তে লোকরঞ্জনের জন্য ছড়া ব্যবহার করিতেন। ইহার ফলে এই যাত্রা কতকটা অপেরার আকার ধারণ করে। রসিকলাল 'নিমাই সন্ন্যাস', 'কংসবধ', 'মায়ের ছেলে' প্রভৃতি পালার গাওনা করিতেন। তিনি চমৎকার গান বাঁধিতে পারিতেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

দেখরে জ্ঞানচক্ষু মেলে সেকি কালীদহে ডুবার ছেলে।
বিশ্বময়ই শুনিতারে বিশ্বময় সবাই বলে। (ওমন)
আছে পঞ্চভূতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ অনলে কি জলেস্থলে।
ঐ দেখ কান্তি আভা নীলময় নভোমণ্ডলে। (ওমন)
ঐ দেখ কৃষ্ণ রূপের প্রভাপড়ে ক্ষেত্র মাঝে দূর্বাদলে।
নব ঘন শ্যামের বর্ণ দেখরে ঐ নীরদ জলে,
(ওমন) ঐ দেখ শ্যামের শ্যামল বর্ণ ধরে বৃক্ষ পত্র ছলে।
অন্তরে আছেন কৃষ্ণ চেয়ে দেখ হৃদকমল,
(ওমন) সে যে অন্তর বাহির দেখে তারে ভাসে রসিক নয়ন জলে।

রসিকলাল চক্রবর্তী ১৩০০ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামধন মিস্ত্রী

তৎকালে অনেক নির্ধন ও নিম্ন বংশোদ্ভব ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে অভিনয় করিতে চাহিত। রামধন ঐ সকল লোক লইয়া একটি পেশাদারি দল গঠন করেন। পরে এই সম্প্রদায়ে অনেক ভদ্রলোক যোগদান করেন। [২]"তখন যাত্রার দলে সঙ্ সাজাইয়া বাহির করিবার প্রথা ছিল। এই দলে সিধু চাষা ধোপা, শিবু ও ঠাকুর যোগী সঙ্ সাজিয়া সাধারণের চিত্তে অপরিসীম আনন্দদান করিয়াছিল।" এই দলে [৩]"নিমাই মিত্র, তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য যাত্রা-পয়ার কাটাইতেন। পয়ার কাটানো ব্যতীত তাহাদের দোয়ারকি করিতে হইত।" পাঁচালি, রামায়ণ গান, মনসার ভাসানে ছড়া বা পয়ার কাটানোর রীতি প্রচলিত। ঐ সকলের প্রভাবে যাত্রায় ইহার প্রচলন হয়। বিশ্বনাথ ধ্রুপদী রামধনের দলে গান গাহিয়া

১। বিশ্বকোষ (১৩০৯)
২।৩। বিশ্বকোষ (১৩০৯)

সকলকে মাতাইয়া দিতেন। তৎকালীন যাত্রায় ঢোলক ও বেহালা অত্যন্ত জনপ্রিয় যন্ত্র ছিল। রামধন ওস্তাদ ঢোলক বাজাইতেন এবং নারায়ণ দাস এই দলে বেহালা বাজাইতেন। তখন নারায়ণ দাসের মত বেহালা বাদক খুব কম ছিল। এই দলে 'বিদ্যাসুন্দর' ও কৃষ্ণযাত্রা অভিনীত হইত।

প্যারীমোহন

বরাহনগরের প্যারীমোহন বেহালা বাজনায় দক্ষ ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে আসিয়া একটি যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলের সাজপোষাক অনেকটা কেতা দুরস্ত ছিল। তাহার বিদ্যাসুন্দর পালা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। বেহালাবাদন ও গান দুই বিষয়ে নিপুণ হওয়ায় প্যারীমোহন আসরে হাজার হাজার দর্শককে বিমোহিত করিয়া দিতেন। প্যারীমোহনের দল 'বেলতলার দল' নামে খ্যাত ছিল। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা গাহিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং বসবাসের জন্য এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিতে সক্ষম হন। তাহার দলে 'নলদময়ন্তী' পালাও অভিনীত হইত। প্যারীমোহনের কণ্ঠে গীত 'বিদ্যাসুন্দর' পালার একটি জনপ্রিয় গান উদ্ধার করা যাইতেছে,—

আমি আর যাব না তোমার সনে তুমি ফচকে মেয়ে,
পুরুষ দেখলে অমনি থাক তার পানেতে চেয়ে।
ঘরে থাকে ঘোমটার আড়ে, ঘাটে মাঠে রঙ্গ বাড়ে,
পুরুষ দেখলে পড়ে ঘাড়ে কুলের ভয় থাকে না।
নষ্ট মেয়ের দুষ্ট স্বভাব কখনো ঘোচেনা।

গোপাল দাস (উড়ে)

উৎকল বাসী গোপাল দাস কলিকাতার বীর নৃসিংহ মল্লিকের পরিচারক ছিলেন। কটক জিলার জাজপুর নিবাসী মুকুন্দ দাস সাধারণ কৃষি-জীবী ছিলেন। অর্থাভাবের জন্য পুত্র গোপালকে তিনি কলিকাতায় পাঠাইলেন; গোপাল মল্লিকবাড়ীর গৃহ-কর্মে নিযুক্ত হইলেন। গোপাল দাসকে এক সময় ফেরিওয়ালার কাজ করিতে হইত। তিনি বৌবাজারের রাধামোহন সরকারের যাত্রার দলেও চাকুরী গ্রহণ করেন,—

[১]"It is said that Biswanath Matilal, a rich man, who loved music, heard Gopal's street cry.... He called Gopal

১। Bengali Literature in the Nineteenth century—Dr. S. K. De P. 412. Calcutta—1962

and at his recommendation Radhamohan Sarkar of Bowbazar (Calcutta) took Gopal into his party which was patronized by Raja Nabakrishna of Sobhabazar."

নৃসিংহ মল্লিকের একটি সখের যাত্রার দল ছিল। গোপালদাস এক সময় মল্লিকবাবুর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার সখের দলটিকে পোশাদারী সংস্থায় রূপান্তারিত করেন। চন্দনগর অঞ্চলে গাওনা গাহিয়া খ্যাতিলাভ করায় গোপাল উড়ে নানা স্থান হইতে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা গহিবার জন্য বায়না পাইতে লাগিলেন। দলের প্রধান গায়ক ছিলেন কাশীনাথ ধোপা (কেশে চাষা ধোপা)। উনিশ শতকের মধ্যভাগে চন্দননগর চুঁচুড়া অঞ্চল হইতে যাত্রায় খেম্‌টা নাচের প্রচলন হয়।

[১]"চন্দননগর বা চুঁচুড়া নিবাসী জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সময়ে নৃত্য গীতের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া খেম্‌টা-ঢঙের নৃত্য উদ্ভাবন করেন।" [২]"কেশে ধোপা এই খেম্‌টা নাচ শিখিয়া গোপালের দলে মালিনীর নাচে যাত্রায় খেম্‌টার প্রচলন করেন। ইহার পরে অন্যান্য দলেও 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় খেম্‌টা নাচের প্রচলন হয়। খেম্‌টার সঙ্গে গানের সুরও হালকা হইয়া গেল। পরমানন্দ, বদন ও গোবিন্দ অধিকারী প্রমুখ "কৃষ্ণ যাত্রার গায়কগণ পূর্বে যে কবি-ভাঙ্গাই ও পূর্ণকীর্তনাঙ্গ সুরে গান গাইতেন—যে গানের সুর শুনিলে প্রাণ মোহিত ও অবশ হইয়া যাইত, এক্ষণে আর সে সুর নাই। এক্ষণে বাংলার নৃত্য-রুচি অনুসারে সুরও পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রকৃত রাগরাগিনী বিসর্জিত এবং মিশ্র সুর (জংলা) সমাদৃত হইতেছে।" 'বিদ্যাসুন্দরের' খেম্‌টার প্রভাবে উনিশ শতকের যাত্রা গানের সুরের অবনতি সম্পর্কে বিশ্বকোষের এই উক্তি হইতে বেশ পরিষ্কার ধারণা করিয়া লওয়া যায়। সিঙ্গুর (হুগলী) নিবাসী ভৈরবচন্দ্র হালদার বিদ্যাসুন্দর পালার জন্য গান রচনা করিয়া দিতেন। কেশে ও গোপাল সেই গানে দর্শকদের মাতাইয়া তুলিতেন। ভৈরব চন্দ্র রচিত বিদ্যাসুন্দরের একটি গান এখানে উদ্ধার করা যাইতেছে,—

কালেংড়া-কাওয়ালী

মিষ্ট ভাষী দৃষ্টি হাসি অবিশ্বাসী নারী
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারী ॥

১।২। বিশ্বকোষ ১৩০৯

নারীর যুক্তি পাওয়া ভার উন্মত্ত ত্রিসংসার
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারি ॥
মান ভাঙ্‌লেন ভগবান নারীর পায়ে ধরি।
নারীর জন্য কীচক মলো রাবণ নির্বংশ হল
আমি কি তা বুঝবো বলো, নারীর ছল চাতুরি ॥

গোপাল সুগায়ক ও দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন ; স্ত্রীভূমিকা গ্রহণ করিলে কেহ সহজে তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না। বিদ্যার ভূমিকায় তাহার অশেষ খ্যাতি ছিল। আনুমানিক চল্লিশ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান গোপাল উড়ে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। [১]গোপাল উড়ের নামে প্রচলিত দলটির প্রকৃত মালিক ছিলেন উমেশ মিত্র।

মহেশ চক্রবর্তী

তাহার দলের 'দক্ষযজ্ঞ' পালার অশেষ খ্যাতি ছিল। এই সংস্থায় একজন নৃত্য-কুশল নারী-চরিত্রাভিনেতা ছিলেন। তাহার নৃত্য দলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। [২]"পুরবাসিনীর ভূমিকায় কেশ বিন্যাস করিয়া সুসজ্জিত নট তাহার ঘন বিন্যস্ত কেশের উপরে স্থাপিত তিনটি কলস লইয়া যে অদ্‌ভুত Poetry of motion-এর সৃষ্টি করিত তাহা কল্‌পনাতীত।"

কৈলাস চন্দ্র বারুই (রায়)

তিনি রিষড়ার অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় একপ্রকার ছোট ছোট চুটকি সুর লাগাইয়া তিনি দর্শকদের মনোরঞ্জন করিতেন। কৈলাশচন্দ্রের একটি গানের নমুনা দেওয়া যাইতেছে,—

গা তোল নিশা অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ॥

আনন্দ অধিকারী ও জয়চন্দ্র অধিকারী

ইহারা বাঁকুড়া জিলার রামজীবনপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। রাম যাত্রায় অধিকারিদ্বয় লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

১। সরস্বতী পূজা, সমাজ কুচিত্র—ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নিশাচর), ১৩৫৫ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

২। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৫৭, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৩৭৩

প্রেমচাঁদ অধিকারী

পাতাই হাটা নিবাসী এই অধিকারী রামযাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

লাউসেন বড়াল

তাহার নিবাস ছিল বর্ধমান। 'হরিশচন্দ্র' পালায় তিনি যশ অর্জন করেন। কিন্তু 'মনসার ভাসান' পালায় উনিশ শতকের শেষে তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

রামকুমার কাঁশারী

এই অধিকারী চণ্ডীযাত্রা গাহিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

নারায়ণ দাস

তাহার 'শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ' পালা বিখ্যাত ছিল। 'রাবাণবধ' পালায় নারায়ণ দাস আসরে দুর্গা প্রতিমা উপস্থাপিত করিতেন। রামচন্দ্র দুর্গার পূজা করিতেন।

দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল

তিনি কলিকাতার হাড়কাটা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে তিনি ঘড়ির ব্যবসায় সুনাম অর্জন করেন। তিনি এই ব্যবসা হইতে দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল (ঘড়িওয়ালা) নামে পরিচিত হন। যাত্রার দল গঠন করিয়া চণ্ডী যাত্রায় দুর্গাচরণ সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাহার দলে বয়োবৃদ্ধ দোহারের পরিবর্তে আসরে বালকদোহার প্রযুক্ত হইত। [১]"দুইজন করিয়া চারদিকে আটজন বালক দাঁড়াইয়া যখন সমস্বরে তালমান সহকারে গান ধরিত, তখন শ্রোতার কর্ণ কোমল মধুর নিক্বণে ঝঙ্কারিত বোধ হইত।" এই সংস্থায় ঠাকুর দাস দত্ত রচিত 'নলদময়ন্তী', 'কলঙ্কভঞ্জন' ও 'শ্রীমন্তের মশান' পালাত্রয়ের খুব জনপ্রিয়তা ছিল। লোকনাথ দাস (লোকাধোপা) ও কালীনাথ হালদার দলের বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন।

ঠাকুরদাস দত্ত (১২০৮-১২৮৩)

তিনি হাওড়া জিলার ব্যাঁটরায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অফিসে ঠাকুরদাস একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে চাকুরী ছাড়িয়া তিনি যাত্রার দল গঠন করেন। কয়েক বৎসর

১। বিশ্বকোষ, ১৩০৯

দল চালাইবার পরে যাত্রা পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরদাস পাঁচালির দল করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাহার পাঁচালির দলটি চালু ছিল। ঠাকুরদাস নিজের দল ছাড়াও দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, ঝড়ুদাস ও বোকোর দলের জন্য যাত্রা পালা লিখিয়া দিতেন। সখের দলের জন্যও তিনি পালা রচনা করিতেন। তাহার দলে 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'রাবণ বধ', 'রামচন্দ্রের দেশাগমন' পালা বিখ্যাত ছিল। অন্যান্য দলের জন্য তিনি 'বিদ্যাসুন্দর', 'হরিশচন্দ্র', 'শ্রীবৎস-চিন্তা' 'কলঙ্কভঞ্জন' প্রভৃতি পালা রচনা করিয়াছিলেন। সংগীত রচনায় তিনি কুশলী ছিলেন। এখানে তাহার একটি গীত উদ্ধৃত হইল,—

গিরি কারে আনিলে, এনে কার তনয়া, প্রবোধিলে
অপরূপ রূপ এ যে দশভূজা কুঙ্কুমচন্দন পায়ে কে করেছে পূজা,
শুনহে পাষাণ, হয়ে হতজ্ঞান এমন ভুলিলে ॥
নারায়ণী বাণী দুপাশে দাঁড়ায়ে, দশভূজে পাশ শোভা পায়,
বলে গেলে হে গিরি, যাই আনিগে গিরিজায়—
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে, উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে,
দাসের আশায় আশা হয়, সায় ও পায় পাইলে ॥

ব্রজমোহন রায় (১৮৩১-১৮৭৬)

তিনি হুগলি জিলার জিরাট-বলাগড়ের নিকটবর্তী তেঁতুলে গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পাওনা তাহার দল কর্তৃক পরিবেশিত হইত। চণ্ডীযাত্রায় তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ব্রজমোহন রায় গীতাভিনয় পরিবেশন করিতেন। স্বরচিত ভক্তিমূলক গানে ব্রজমোহন দর্শকদের মাতাইয়া তুলিতেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে মধুসূদন কিন্নর ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ছাড়া গানে তাহার জুড়ি পাওয়া যাইত না। ব্রজমোহন রায়ের চণ্ডীযাত্রা হইতে গানের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

গৌরী—কাওয়ালী

হর দুঃখ হর-মোহিনী! কলুষ বারিণি.
তবসুত রবিসুত ভয়ে ভীত ভবরাণি।
কি হবে উপায় নিরুপমা মা—পদ বিতর কাতর জনে আপনি।

হলে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা যদিও অভয় দিবে ভবানী,
ডাকি বারে বারে, মম প্রতি কেন প্রতিকূল আর
ওমা পাষাণ সুতা পাষাণী, তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয় বাসিনী।
আসি আশু তোষ আশুতোষ-রমনী ॥
কি আছে মা মম বল আর কারে বলি বল, কেবল সম্বল তুমি শিবানী।
যদি তার নিজ গুণে, ব্রজমোহন নিগুর্ণজনে
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি, এভব তরিবারে তরণী
হও বারেক কর্ণধার আপনি ॥

সাবিত্রী সত্যবান, অভিমন্যু বধ, কংসবধ, তারকাসুর বধ, রামাভিষেক, লক্ষ্মণ-বর্জন, শতস্কন্ধ রাবণবধ প্রভৃতি পালা ব্রজমোহন রচনা করিয়াছেন। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি অক্ষর বৃত্তছন্দে ও গদ্যে তাহার নাটকের সংলাপ রচিত হইয়াছে। বক্তৃতাধর্মী সংলাপ, পয়ারছন্দে পালার কাহিনীর অংশবিশেষের বর্ণনা, ভক্তি, করুণ ও বীর রসকে প্রাধান্য দেওয়া তাহার পালার বৈশিষ্ট্য ছিল।

ব্রজমোহন ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা করিয়া মালদহজিলার আবগারী বিভাগে চাকুরী করিতেন। কিছুকাল পরে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কয়েক বৎসর পাঁচালির দল চালাইয়া তিনি ১২৭৯ সালে যাত্রার দল করেন। সুগায়ক ব্রজমোহন চার বৎসর কাল এই দল চালনা করেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

লোকনাথ দাস (লোকা ধোপা)

দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের মৃত্যুর পরে বেনেপুকুর নিবাসী লোকনাথ এই দলের অধিকারী হইলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি এই দল চালনা করিয়া লক্ষপতি হইয়াছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদের দিক হইতে এই দলের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। রাজা ঢিলা পায়জামা, চাপকান, কোমর বন্ধ ও পাগড়ী পরিতেন। রাজপুত্রেরও ঐরকম পোষাক ছিল, কেবল পাগড়ীর স্থলে জরির টুপি ব্যবহার করা হইত। আর রানীর পোষাকে ঢাকাই সাড়ি অথবা চেলি থাকিত। বাড়িওয়ালাদের নিকট হইতে অলঙ্কারাদি চাহিয়া লইয়া অভিনয়ান্তে তাহা বাড়িওয়ালাদের আবার ঠিক ঠিকরূপে ফিরাইয়া দেওয়া হইত। সখের দলেও এই রীতি ছিল। অধ্যক্ষেরা গৃহস্থের নিকট বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার, মৌক্তিক মালা ও বস্ত্রাদি ধার লইয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেন। সৌখিন দলের মত আসল অলঙ্কার গ্রহণ করায়

রূপ সজ্জায় খুব জৌলুস হইত। ইহাতে লোকাধোপার দলের গান শুনিয়া দর্শকগণ যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন। 'বিদ্যাসুন্দর', 'নলদময়ন্তী', 'শ্রীমন্তের মশান', 'কলঙ্ক ভঞ্জন' প্রভৃতি পালা লোকা ধোপার দলে অভিনীত হইত। পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতে শ্রোতারা তাহার যাত্রা শুনিতে আসিতেন। 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২) গ্রন্থের সম্পাদক উল্লেখ করিয়াছেন—[১]"পঁচিশ বৎসর পূর্বে লোকনাথ দাসের যাত্রাদল বহুস্থানে অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। লোকনাথ স্বয়ং একজন সুগায়ক।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই দল যশের অধিকারী হয়।

কালী হালদারের দল

দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের মৃত্যুর পরে তাহার দলের গায়ক কালীনাথ হালদারও একটি যাত্রার দল করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাহার দলে ঠাকুরদাস দত্তের যাত্রা পালাদি অভিনীত হইত।

গোবিন্দ যুগী

রামযাত্রার 'লবকুশ' পালায় তাহার সুনাম ছিল। এই পালায় করুণ রসের প্রাধান্য ছিল। তাহার গাওনায় শ্রোতার মন করুণ রসে আর্দ্র হইয়া উঠিত। গোবিন্দ যুগীর যাত্রায় দর্শকদের খুব ভিড় জমিত।

বোকোর দল

বোকো ও তাহার ভ্রাতা সাধু—এই দুইজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী একটি যাত্রার দল গঠন করেন। ইহাই 'বোকোর যাত্রার দল' নামে খ্যাতিলাভ করে। উনিশ শতকের মধ্য ভাগে বোকোর দলে ঠাকুরদাস দত্তের 'লবকুশ' পালা ও ভগবান গাঙ্গুলীর 'রাবণবধ' পালার গাওনা হইত। তৎকালে দলটির খুব জনপ্রিয়তা ছিল। একবার হাওড়া অঞ্চলে বারোয়ারি তলায় গান গাইতে যাওয়ায় পল্লী অঞ্চলে ইহা লইয়া গান বাঁধা হয়—

[২]কলাবেড়ের মাটি, উলুবেড়ের খড়
গড়েছিল নদের কার্তিক কারিকর,
দিলি বোকোর বায়না, শুনলি নারে গাওনা,

১। বাঙ্গালীর গান—পৃঃ ৭২৬, দুর্গাদাস লাহিড়ী
২। বিশ্বকোষ—১৩০৭

জেলায় জেলায় জেল খাটালি,
চৌদ্দপোয়া কালী কেন গড়েছিলি।

গান বাঁধার কারণ, বারোয়ারি তলায় বোকোর গাওনা লইয়া বাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বোকোর পক্ষে গান করা আর সম্ভব হয় না।

ঝড়ু দাস অধিকারী

বাগবাজার নিবাসী ঝড়ুদাস একটি যাত্রার দল গঠন করেন। তিনি নৃত্য বিশারদ ছিলেন। তাহার নাচের অভূতপূর্ব খ্যাতি ছিল। তৎকালে লোক মুখে প্রচলিত ছিল,—[১]"গাইয়ে লোকা, নাচিয়ে ঝড়ু, বক্তৃতায় গোবিন্দ"। ঝড়ুদাসের দলের 'কমলে কামিনী' পালা সর্বত্র প্রশংসিত হইত। ঠাকুরদাস দত্ত রচিত 'অক্রূর আগমণ' ও 'রাবণ বধ' পালাদ্বয়েরও খ্যাতি ছিল।

চয়ে পাগলা

তাহার দলের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একটি বিষয়ে তাহাকে কৃতিত্বের অধিকারী করিতে হইবে। উনিশ শতকের যাত্রায় ভক্তি ও করুণ রসাত্মক পৌরাণিক পালার এক রকম একাধিপত্য ছিল। মঙ্গল কাব্য ও চৈতন্য বিষয়ক পালা প্রচলিত থাকিলেও পৌরাণিক পালার মত ইহার তত প্রসার ছিল না। যাত্রার এই রকম অবস্থায় চয়ে পাগলা 'কালাপাহাড়'-এর কাহিনী লইয়া ঐতিহাসিক যাত্রা পরিবেশনে কৃতকার্য হন। যাত্রায় [২]"এই ব্যক্তি সর্ব প্রথম ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয় করেন"।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল এবং ধনকৃষ্ণ সেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে যাত্রা নাট্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাদের সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

অহিভূষণ ভট্টাচার্য, কাব্যতীর্থ ও সাঁতরা কোম্পানী

তিনি বর্ধমান জিলার কোক্‌সিমলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। উনিশ শতকের চতুর্থ পাদ হইতে অহিভূষণ লোকনাট্য রচনায় ব্রতী হন। তিনি অন্যান্য নাট্যকারের নাটক রচনা ও প্রকাশে সাহায্য করিতেন। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক তাহার নাটক অভিনীত হইলেও তিনি প্রধানত সাঁতরা কোম্পানীর নাট্যকার ছিলেন। বিংশ শতকের আন্দোলনাদি দ্বারা অহিভূষণ প্রভাবিত হন নাই। পৌরাণিক ও ভক্তি মূলক নাট্য রচনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি

১। ২। বিশ্বকোষ, ১৩০৯

যাত্রার জন্য 'প্রহসন' পালাও রচনা করেন। অন্য কোন যাত্রা নাট্যকার এই জাতীয় পালা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। অহিভূষণের সময় আট ঘণ্টা ধরিয়া যাত্রাভিনয় চলিত। সুতরাং তৎকালের নাটকের বিস্তৃতি বিধানের জন্য ইহাতে বহুঘটনার স্থান দিতে হইত এবং ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হইতে পঞ্চাশের অধিক সংখ্যক গীতি সংযোজনা করিতে হইত। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বহু জুড়ির গান (উক্তি গীতি) তাহার নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। নাট্যকার তাহার নাটকে গদ্য ও পদ্য সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ। পরিচিত কাহিনীকে সংলাপ ও সংগীতে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া লোকচিত্তে ধর্মবোধ ও ভক্তিভাব জাগরিত করাই তাহার নাটকের উদ্দেশ্য। অহিভূষণের কোন নাটক কেবল অঙ্কে বিভক্ত, কোনটি শুধু দৃশ্যে বিভক্ত, আবার কোন কোন নাটক অংক ও দৃশ্যে বিভাগ করা হইয়াছে। তাহার রচিত পালাগুলি গীতাভিনয়; অভিনয় অপেক্ষা ইহাতে গীতেরই প্রাধান্য। গীতাভিনয়ে গীতি ও অভিনয় দুই-ই থাকে। অহিভূষণের নাটকে প্রথম বিবেক জাতীয় চরিত্রের সৃষ্টি। সুরথ উদ্ধার পালার 'পাগলা-দিবোদাস' এই চরিত্র। যতদূর জানা যায় 'দণ্ডী পর্ব' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১০) তাহার প্রথম যাত্রা নাটক। উনিশ শতকের শেষে 'তুলসী লীলা' গীতাভিনয় (১৩০১ সাল) নামে তিনি একটি পালা রচনা করেন; এই পালাটি পনেরটি অংকে বিভক্ত। ইহার সংলাপ দীর্ঘ; গদ্য পদ্য উভয়বিধ সংলাপ নাটকে রহিয়াছে। পদ্য সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মিত্রাক্ষর ছন্দ দুইয়েরই ব্যবহার করা হইয়াছে। এই নাটক হইতে মিত্রাক্ষর ছন্দের (ত্রিপদী) একটি নমুনা উদ্ধার করা যাইতেছে,—

শঙ্খ চূড়—যে জন না চেনে তোরে   দেখাস এ দণ্ড তারে
নাহি ডরি কালদণ্ডে তোর
ধরি বজ্র বাম করে   পরাজিনু বাসবেরে
তোর দণ্ডে কি ভয় পামর॥ (৫ম অংক)

অস্ত্রযুদ্ধের পূর্বে বাগ্‌ যুদ্ধের অবতারণায় একজনের সংলাপের শেষ অংশের সংগে অপরের সংলাপের শেষ অংশের মিত্রাক্ষর রচনার দৃষ্টান্তও ইহাতে রহিয়াছে,—

যম—রাখ দেখি প্রাণ তবে কালদণ্ডাঘাতে। (দণ্ডাঘাত)
শঙ্খচূড়—হের এই অবাধে ধরিনু বাম হাতে॥ (নিক্ষিপ্ত দণ্ড বামহস্তে ধারণ)
অগ্নি—দেব রাজ, শীঘ্র বজ্র প্রহার দানবে।

শঙ্খচূড়—কেন ক্ষোভ থাকে সাধ পূর্ণ কর তবে ॥
অগ্নি—এত গর্ব সাহস কতক্ষণ রবে
শঙ্খচূড়—যতক্ষণ ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন দানবে। (৫ম অঙ্ক)

বস্তুত এই জাতীয় মিত্রাক্ষর সংলাপ রচনা তৎকালে প্রচলিত ছিল। একাধিক নাট্যকার তাহাদের নাটকে এই শ্রেণীর সংলাপ সংযোজনা করিয়াছেন। পূর্বে আলোচিত নাট্যকার মতিলাল রায়ের নাটকেও ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। থিয়েটারী নাটকেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। মনে হয় ইহা তৎকালের একটি প্রচলিত রীতি [১]'কুলীনকুলসর্বস্ব' থিয়েটারী নাটক হইতে এই শ্রেণীর সংলাপের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হইল। ঘটক অনৃতাচার্য ও পুরোহিত ধর্মশীলের মধ্যে বিবাহের পাত্র সম্পর্কে বাক্য বিনিময়—

ধর্ম—দেখিতে সুন্দর বর দাদ সব গায়।
অনৃ—বিনা চক্রে শালগ্রাম শোভা নাই পায় ॥
ধর্ম—দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জল দোষ।
অনৃ—এ দোষ ইহার নয় আছে জল দোষ ॥
ধর্ম—উভয় চরণ বেনমুখি ভরা ওল।
অনৃ—দেখ দেখি কিবা শোভা দেখিতে এ ওল ॥
ধর্ম—বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ।
অনৃ—শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ ॥
ধর্ম—দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই।
অনৃ—যে বলে উহাকে কানা তার চক্ষু নাই ॥
ধর্ম—কুলের পতাকা রবে একর্ম করিয়া।
অনৃ—(জনান্তিকে) দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দাও বিয়া ॥ (ষষ্ঠ অংক)

তুলসী লীলার প্রস্তাবনাগীতে ইহার মূল বক্তব্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে,—

সতীর মান রাখলেন হরি তুলসীরে শিরে ধরি,
শুন অপূর্ব মাধুরী সেই তুলসী লীলা কীর্তন।

উনিশ শতকে রচিত হইলেও এই নাটকে অহিভূষণের নাট্য রচনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া ইহার সংলাপ রচনারীতি ও প্রস্তাবনা গীতির উল্লেখ করা হইল। এই নাটকটি সাঁতরা কোম্পানীর জন্য লিখিত হইয়াছিল।

১। কুলীন-কুল-সর্বস্ব—রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮৫৪)

উত্তরাপরিণয়-গীতাভিনয়—(১৯০০) এই পালা এগারটি অংকে বিভক্ত। 'উত্তরাপরিণয়' পৌরাণিক নাটকখানি সাঁতরা কোম্পানীর যাত্রায় অভিনীত হয়। মতিলাল রায়ের নাট্যালোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে তৎকালে পালা চুরির রেওয়াজ ছিল। অহিভূষণের পালাগুলি মুদ্রিত করিবার ইহা একটি প্রধান কারণ। 'উত্তরা পরিণয় গীতাভিনয়ের' ভূমিকাস্বরূপ দুই একটি কথা অংশে তিনি ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন,—'কতগুলি বিশ্বাসঘাতক আমার অতি যত্নের পালাগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় চুরি করিয়া অন্যের নিকট বিক্রয় পূর্বক অর্থোপার্জন করিবেন এবং মফঃস্বলস্থ অধিকারিগণ ঐ অসম্পূর্ণ পালা ক্রয় করিয়া অযথা অপব্যবহার করিবে, ইহা অতীব অসহনীয় বোধেই উক্ত গীতাভিনয়দ্বয় মুদ্রাঙ্কিত করিতে বাধ্য হইলাম,—প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি লাভের জন্য নহে"।

নাটকের প্রথমে একখানি প্রস্তাবনা গীতি রহিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া নাট্যকার নাটকের মূল বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। গদ্য ও পদ্য সংলাপ নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদ্য সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মিত্রাক্ষর ছন্দ রহিয়াছে। নাটকের সংলাপ খুব দীর্ঘ। ইহাতে মাঝে মাঝে ছোট ছোট সংলাপও সংযোজিত হইয়াছে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

কীচক—চল প্রিয়ে, একটু নিজন স্থানে যাই।

সৈরিন্ধ্রী—এখন নিজন স্থান কোথায় পাবেন ?

কীচক—চল, আমার মোহনোদ্যানের মধুর মাধবী কুঞ্জে যাই।

সৈরিন্ধ্রী—সেখানে লোক সমাগমের সম্ভাবনা।

কীচক—তবে কোথায় যাবে ?

সৈরিন্ধ্রী—শুনেছি নিশিতে নাট্যশালা নির্জন থাকে।

কীচক—তবে তাই চল, সেখানেই যাই।

সৈরিন্ধ্রী—এখন ?

কীচক—এখনই—

সৈরীন্ধ্রী—না !

কীচক—তবে কখন ?

সৈরিন্ধ্রী—নিশিতে নাট্যশালা নিজন হলে।

কীচক—এই এতবড় দিনটে যাবে, তারপর সন্ধ্যা হবে,—তারপর তুমি যাবে, এত বিলম্ব ?

বিদূষক—ওঃ, খ্যাঁচকা দেখ। বোধহয় সেইখানেই প্রেমের সমাধি হবে! যার যেখানে মাটি কেনা! (১ম দৃশ্য, ৪র্থ অংক)

এই পালার গীতি সংখ্যা ত্রিশের উর্ধ্বে। সৈরিন্ধ্রী, অর্জুন, ভীষ্ম, দুর্যোধন প্রমুখের উক্তি গীতি নাটকে রহিয়াছে। অহিভূষণের নাটকে স্থূল হাস্যরস পরিবেশনের জন্য বিদূষক চরিত্র সংযোজিত হইয়াছে। এই নাটকে আদি, বীর ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের বিরাট পর্ব হইতে নাট্য কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে।

মহিলা যাত্রা

উনবিংশ শতকে প্রথম মহিলা যাত্রার প্রচলন করেন [১]"রাজা বৈদ্যনাথের রক্ষিতা কোন বারবিলাসিনী"। ইনি "বিদ্যাসুন্দর" পালা গাওনা করিতেন। প্রখ্যাত যাত্রাকর মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার দল পরিচালনা করেন। নবীনের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী এই দলের অধিকারী হইলেন। কালী ও কৃষ্ণ নামক দুই ভ্রাতা দল পরিচালনা করিতেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় সুগায়ক ও সুঅভিনেতা ছিলেন। দলটি 'বৌ মাষ্টারের দল' নামে খ্যাত হয়। এই দলে ধ্রুব চরিত্র, প্রভাসযজ্ঞ, দণ্ডীপর্ব, হরিশচন্দ্র, শ্রীমন্তের মশান প্রভৃতি পালার সঙ্গে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক,'সতীনাটক' ও 'হরিশচন্দ্র' পালা অভিনীত হইত। উনিশ শতকের শেষে বৌ মাষ্টারের দল খুব সুনামের অধিকারী হয়। চন্দননগরে বৌমাষ্টারের নামে একটি রাস্তা চিহ্নিত রহিয়াছে। এই রাস্তার নাম বৌমাষ্টারের গলি।

নবদ্বীপের নীলমণি কুণ্ডের একটি যাত্রার দল ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার স্ত্রী মুক্তামণি দাসী এই দলটির অধিকারী হইলেন। এই সংস্থা 'বৌকুণ্ডের দল' বলিয়া পরিচিতি লাভ করে। নীলমণি কুণ্ডের দলের প্রধান লেখক ছিলেন বৈকুণ্ঠপুর নিবাসী (বর্ধমান জিলা) কালীপদ মুখোপাধ্যায় (১৮২৩-১৮৮০)। কালীপদ রচিত 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'কালীয়দমন', 'ব্রজলীলা সংবরণ' প্রভৃতি পালা বৌকুণ্ডের দলে যশের সঙ্গে অভিনীত হয়। অঘোর কাব্যতীর্থ রচিত 'নহুশ উদ্ধার'ও এই সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়।

১। বিশ্বকোষ, ১৩০৯

যাত্রা ও ফরাসডাঙ্গা

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ফরাসডাঙ্গা সংগীত চর্চার একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময় হইতে যাত্রাকরগণ নূতন নূতন বায়না লাভের প্রত্যাশায় ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ভিড় জমাইতে থাকেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর হইতে নূতন মঞ্চাভিনয়ের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ বাড়িতে থাকে। ফলে কলিকাতায় যাত্রার চাহিদা কিছুটা কমিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ফরাসডাঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া অধিকারীরা অধিক বায়না সংগ্রহেয় চেষ্টা করেন। বর্তমানে যেমন চিৎপুর অঞ্চলে যাত্রার কেন্দ্র তৎকালে ফরাসডাঙ্গাও তেমনি যাত্রার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফরাসডাঙ্গার দলগুলির মধ্যে গোবিন্দ পাঠকের দলের নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। তিনি জাজপুরের অধিবাসী ছিলেন। 'হরিশচন্দ্র', 'কীচকবধ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস' প্রভৃতি পালায় তিনি খুব সুনাম অর্জন করেন। হেজলোক গ্রামের পীতাম্বর দাস কৃষ্ণ যাত্রার 'মাথুর', 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি পালার গাওনা করিতেন। শাহানগরের দুর্লভ দাসেরও কৃষ্ণযাত্রায় খ্যাতি ছিল। সায়রাবেড়ের অদ্বৈতপাল রামযাত্রা গাহিয়া পরিচিতি লাভ করেন। এই সময় দ্বিতীয় গোবিন্দ অধিকারী দল লইয়া ফরাসডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। তাহার নিবাস ছিল বাঁকুড়া জিলার চন্দ্রকোনায়; তিনি খ্যাতি লাভ করেন কৃষ্ণযাত্রায়। শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও গিরিশ চক্রবর্তী মেদিনীপুর জিলার শ্রীমন্তপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাহারা দল লইয়া ফরাসডাঙ্গায় বাস করিতেন; কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করিয়া তাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মতিলাল চক্রবর্তীর নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ-কানাসোনা। ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিত তাহার দলের খুব জনপ্রিয়তা ছিল। এই সংস্থায় 'শাল্ববধ', 'তুলসীলীলা' প্রভৃতি পালা অভিনীত হইত। হুগলি জিলায় সিঙ্গুর অঞ্চলের হরিদাস মণ্ডল মহাভারতের পালা লইয়া ফরাসডাঙ্গায় আসেন এবং যাত্রা জগতে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেন। 'নারীলীলা' বা 'দণ্ডীপর্ব' ও 'জম্ভাসুর বধ' পালায় তাহার দলের প্রভূত খ্যাতি ছিল। হুগলী জিলার গোপীনাথপুর নিবাসী কৃত্তিবাস মণ্ডল ও মহাভারতের পালা গাওনা করিতেন। তাহার দলটিও ফরাসডাঙ্গায় থাকিত। কলিকাতার নবীন ডাক্তার রামযাত্রায় সুনাম অর্জন করেন। নবীনবাবুর দল ফরাসডাঙ্গায় থাকিয়াই বায়না সংগ্রহ করিত। 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গীতাভিনয় খুব খ্যাতির সংগে তাহার দল কর্তৃক অভিনীত হইত। ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভের দলটির চণ্ডীযাত্রায় খুব সুনাম ছিল।

উনিশ শতকের সখের যাত্রা

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

বরাহনগর নিবাসী ঠাকুর দাস ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে একটি সখের যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা অভিনীত হইত। রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রাণ কৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও নিমাই মিত্র দলের অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। এই দলের যাত্রায় প্রথমে নান্দী গান গীত হইত। গায়ক ছিলেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ভট্টাচার্য, কেবলরাম পাল ও নিমাই মিত্র। 'কেলুয়া'র ভূমিকায় তারা ধোপার গান খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' পালাটি ঠাকুরদাস নূতন ভাবে সাজাইয়া ছিলেন। ঠাকুরদাস চণ্ডীযাত্রা এবং কৃষ্ণ যাত্রার পালা রচনা করেন। পালা দুইটি অভিনীত হয় মাকড়দহের (হাওড়া) বেণীমাধব পাত্রের দলে। হাওড়া-কোণা নিবাসী গোপীনাথ দাসের দলে তাহার লেখা একখানি রামযাত্রার পালা অভিনীত হয়। ঠাকুর দাস সখের ও পেশাদারী দলের জন্য যাত্রা লিখিতেন। উল্লিখিত পালা ছাড়াও তিনি 'হরিশচন্দ্র' ও 'শ্রীবৎস-চিন্তা' নামে আরো দুইটি লোকনাট্য রচনা করেন।

শ্রীনাথ সেন

কলিকাতার বিখ্যাত ধনী গুরুচরণ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনাথ সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল করেন। এই দলের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গান রচনা করিয়া দিতেন। [১]"এই সময় বাংলার প্রতি পল্লীতে বিদ্যাসুন্দরের প্রীতিপ্রদ গীত সমুদয় প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তৎকালে ছোট বড় ধনী নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্যাসুন্দর গাইয়া আপনাপন প্রাণের সখ মিটাইয়া গিয়াছিল।" শ্রীনাথ সেন বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা পরিবেশন করিয়া খুব পরিচিতি অর্জন করেন।

দক্ষিণ বরাহনগরের দল

দক্ষিণ বরাহনগরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা একটি বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলের গাওনার খুব প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। উত্তরপাড়ায় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে অভিনয় দেখিয়া [২]"তথাকার কুল কামিনীগণ মোহিত হইয়া পুরস্কারের স্বরূপ প্যালা না দিয়া আহ্লাদে পর্দার আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া অভিনেতৃবর্গকে সাজাপানের খিলি প্রদান" করিয়াছিলেন। তৎকালে ইহা দলের পক্ষে কম গৌরবের কথা ছিল না।

১।২। বিশ্বকোষ ১৩০৯

শিব ঠাকুরের দল

তিনি বেলতলা-ভবানীপুরের (কলিকাতা) অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যা-সুন্দরের গাওনায় তাহার দলের খ্যাতি ছিল।

স্বরূপ দত্তের দল

কলিকাতার হাড়কাটাগলি নিবাসী স্বরূপের দলে সখের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা অভিনীত হইত।

বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর দল

চব্বিশ পরগণা জিলার টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী একটি সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল করেন। অশ্লীলতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে দিয়া বৈকুণ্ঠনাথ নূতন ভাবে এই 'বিদ্যাসুন্দর' পালা রচনা করাইয়াছিলেন। ইহা পালাটির একটি বৈশিষ্ট্য। বৈকুণ্ঠের তিনটি আসরের গাওনায় তৎকালে আঠারো হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। পোষাক পরিচ্ছদ ও সঙ্গীতের প্রতি তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়াছিলেন।

গজার ভট্টাচার্যের দল

গজার জমিদার ভট্টাচার্য একটি দল গঠন করিয়া বিদ্যাসুন্দর পালা পরিবেশন করেন। পালাটি ঠাকুরদাস দত্ত রচিত ছিল। এই পালাটিও অশ্লীলতা মুক্ত ছিল ; তবে বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর দলের পালার মত ইহা তত উৎকৃষ্ট হয় নাই।

দীননাথ চৌধুরীর দল

হওড়া জিলান্তর্গত কোণার জমিদার দীননাথের দলে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রচিত 'হরিশচন্দ্র' পালা যশের সঙ্গে অভিনীত হইত।

উমাচরণ বসুর দল

হাওড়া-শিবপুর নিবাসী উমাচরণ একটি সখের যাত্রার দল গঠন করিয়া ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীবৎস-চিন্তা' পালা অভিনয় করেন। উমাচরণের দলে এই পালার সমধিক খ্যাতি ছিল।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের দল

বিখ্যাত ধনী ছাতু বাবুর (আশুতোষ দেব) দেওয়ান জোড়াসাঁকো নিবাসী রামচাঁদ হাফ-আখড়াই দলের সম্পাদকতা করিতেন। কবিতা রচনা ও সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। উনিশ শতকের পেশাদার যাত্রার দলগুলি সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার জন্য যাত্রা পরিবেশন করিতেছিল। কিন্তু

[১]"ভদ্রবিদ্বান লোক তাহাদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদায় যথার্থরূপে উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই।" এই সময় রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি সখের যাত্রাদল গঠন করেন। তিনি মার্জিত রুচির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গাওনা করিতেন। তাহার দলে 'নন্দবিদায়' পালা অভিনীত হইত। [২]"এই যাত্রা গতানুগতিক যাত্রা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে স্ত্রী চরিত্র মেয়েরা অভিনয় করিত। ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাটিতে নন্দবিদায় যাত্রার তৃতীয় অভিনয়" অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রায় রামচাঁদ খুব সুনাম অর্জন করেন। [৩]'ছিদাম' নামে উধ্বর্ তের বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার গানে তাবৎলোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। দলের দ্বিতীয় বালিকা 'পুঁটির' সখীর গানও অতি উত্তম ছিল। তাহার কণ্ঠে গীত নন্দবিদায়ের একটি গান উদ্ধার করা যাইতেছে,—

আড়ানাবাদর—আড়া খেম্‌টা

চোরের বিচার রাজা করে জানিরে অন্তরে।
রাজা হয়ে চুরি করে তার বিচার কে করে॥
তুমিত ভাই রাখাল রাজা ব্রজ বালক তোমার প্রজা
মধুপুরে হলে রাজা ব্রজবাসীর মন হরে॥
ঘরে ঘরে মাখন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি
বাঁশীর গানে মন চুরি করেছ তুমি—
দ্বিজ রামচন্দ্রের চিন্তে এ চোর কে পারে চিনতে
যে মজেছে পদ প্রান্তে কৃতান্তে সে তুচ্ছ করে॥

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বারাণসী ঘোষের বাড়িতে 'নন্দ বিদায়' পালা শুনিতে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয়।

বারাণসী বাবুর বড় দীঘিতে [৪]"শ্রীকৃষ্ণের যমুনা বিহার প্রভৃতি পালার অংশ প্রত্যক্ষভাবে অভিনীত হইয়াছিল"। পালার গানে হাফ-আখাইর খেয়ালাঙ্গ, কীর্তন ও টপ্পার সুর সংযোজিত হয়। ইহাতে ধ্রুপদাঙ্গেরও কিছু গান ছিল। তৎকালীন প্রখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ছটুটুলাল পাখোয়াজের সঙ্গে ধ্রুপদাঙ্গের গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বিধান করিতেন। [৫]"এই যাত্রায়

১।৩।৫। সম্বাদভাস্কর, ১৮ চৈত্র, ১২৫৫, বাহিরসিমলা বাসিনঃ।
২। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস. পৃ-১২, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪০
৪। বিশ্বকোষ, ১৩০৯

হাফ-আখড়াইর সুরে পয়ার কাটানো বড় চমৎকৃত হইয়াছিল"। 'নন্দ বিদায়' দীর্ঘ সময় ধরিয়া অভিনীত হইত। সমস্ত রাত্রি এবং পরের দিন বেলা প্রায় চার দণ্ড পর্যন্ত ইহার গাওনা চলিত।

অক্রুর দত্তের দল

বৌবাজার নিবাসী অক্রুর দত্ত একটি সখের দল গঠন করেন। এই দলে মাইকেল মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। বহু সংগীত সহযোগে 'পদ্মাবতী'কে গীতাভিনয়ের উপযুক্ত করিয়া সাজানো হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মাবতী গীতাভিনয়' প্রযোজিত হয়। বৌবাজার দত্ত বাড়ি ও তালতলার রামধন ঘোষের বাড়ি ইহার অভিনয় সম্পন্ন হয়। এই গীতাভিনয় কেবলমাত্র যবনিকা অবলম্বনে মঞ্চে অথবা যাত্রার আসরে সমভাবে অভিনীত হইতে পারে। 'পদ্মাবতী'র অভিনয়ে অক্রুর বাবুর দল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাগবাজারের দল

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজার সখের যাত্রার দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার সংগে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ সংযোগ ছিল এবং তিনি ইহার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই দলে যাত্রা পালার সঙ্গে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকও অভিনীত হয়।

জোড়াসাঁকোর দল

দ্বারকা নাথ মল্লিকের পাড়ার সম্ভ্রান্তদের লইয়া একটি সখের দল গঠিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটককে গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করিয়া এই দল কর্তৃক ইহা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পত্রিকায় এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়,—[১]"জোড়াসাঁকোস্থ দ্বারকানাথ মল্লিকের পল্লীস্থ সম্ভ্রান্ত বাবুদিগের শর্মিষ্ঠার গীতাভিনয় হইয়া গিয়াছে। সেদিন ৺পূজার রাত্রি হইলেও সখের যাত্রার খাতিরে" বহুলোক সমাগম হয়। জোড়াসাঁকোর এই অভিনয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

মেজ কাকার দল

রবীন্দ্রনাথের মধ্যম খুল্লতাতের একটি শখের যাত্রার দল ছিল। তিনি নিজে পালা রচয়িতা ও নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য

১। মধ্যস্থ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২—মনোমোহন বসু

উদ্ধার যোগ্য,—[১]"আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী ঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহি গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এই রকম শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরী করে তোলবার উৎসাহ ছিল।"

শিশিরকুমারের দল

অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক যশোহর জিলার শিশির কুমার ঘোষ একটি কৃষ্ণ যাত্রার দল গঠন করেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন। শিশির কুমার দলের জন্য ভক্তিমূলক শ্রীচৈতন্য বিষয়ক পালা রচনা করিতেন। দলটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

১। ছেলেবেলা—পৃঃ ২১, রবীন্দ্রনাথ (১৩৫৫)

পঞ্চম অধ্যায়

বিংশ শতকে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনা প্রভৃতি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। লোক-নাট্যালোচনার পূর্বে এই সকল দিক হইতে এই শতকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া প্রয়োজন। কারণ এইসকল চেতনা দ্বারাও লোকনাট্য কিছু কিছু প্রভাবিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শাসনে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, গুজরাট ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তাঁত-বয়ন শিল্প, অন্যান্য কুটির ও হস্ত-শিল্পের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। ইংলণ্ডে বয়ন ও হস্তশিল্পের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিকতার সাহায্যে নূতন নূতন শিল্পের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সরকারের অধীনে ভারতে ঐ জাতীয় শিল্পের ধ্বংস হইলেও ইহার পরিবর্তে যান্ত্রিক সহায়তায় শিল্প বৃদ্ধির যথোচিত ব্যবস্থা হয় নাই। [১]সুতরাং লক্ষ লক্ষ তাঁতবয়ন-চর্ম-লৌহ-মৃৎশিল্পীরা শিল্পের অবনতিতে সহরাঞ্চল ছাড়িয়া গ্রামে বসবাস করিতে আরম্ভ করে; আবার গ্রামের যে সকল লোক হস্ত-শিল্পে নিযুক্ত ছিল তাহারাও বাধ্য হইয়া শিল্প ছাড়িয়া কৃষিকর্মে মনোনিবেশ করিতে থাকে। ফলে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ইহাতে কৃষির উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। অথচ কৃষির উন্নতির জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করিলেন না। কৃষির উপর হইতে চাপ সরাইয়া লইবার জন্য বিকল্প কর্ম ব্যবস্থা বা শিল্পায়ন প্রভৃতির কোন উদ্যোগ সরকার পক্ষে লক্ষিত হইল না। কাজেই দেশের দারিদ্র্য প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। [২]সরকারী রিপোর্ট হইতে ইহার চিত্র খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিলাতে কাঁচা মাল ও খাদ্য শস্যের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি চলিতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,

1, The millions of ruined artisans, and craftsman spiners, weavers, potters, tanners, smelters, smiths, alike from the town and from the villages, had no alternative save to crowed into agriculture, P. 49—India to-day and tomorrow—R. P. Dutta, Delhi, 1955

2. At the root of much of the poverty of the people of India, and of the risks to which they are exposed in seasons of scarcity lies the unfortunate circumstances that agriculture forms almost the sole occupation of the mass of the population, and that no remedy for the present evils can be complete which does not include the introduction of a diversity of occupations through which the surplus population may be drawn from agricultural pursuits and led to find the means of subsistence in manufactures or some-such employment. Indian Famine Commission Report, 1880

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২,১০০ বুশেল [1]লীনসীডের জায়গায় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৭,০০০ বুশেলে দাঁড়ায়। [2]খাদ্য শস্যের রপ্তানিও অদ্ভুত রকম বাড়িতে থাকে। এই বিষয়ে দেশের অভাবের কথা মোটেই চিন্তা করা হয় নাই। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্য শস্য রপ্তানি হয় ৮৫৮,০০০ পাউণ্ড। ইহার স্থলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩·৮ মিলিয়ন, ১৮৭৭খ্রীষ্টাব্দে ৭·৯ মিলিয়ন ও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৯·৩ মিলিয়ন পাউণ্ড খাদ্য শস্য রপ্তানি হয়। সুতরাং বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে কৃষির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, ইহার উপর আবার সেই কৃষিজাত দ্রব্যের বর্ধমান রপ্তানির ফলে দেশীয় লোকের খাদ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলা দেশে সাধারণ লোকের খাদ্যাভাব ও কর্মাভাব প্রবল হইতে থাকে। মধ্যবিত্তের মধ্যেও শিক্ষিত বেকার, উকিল, অল্পবেতনের চাকুরী-জীবী ও শিক্ষকের মধ্যে অর্থাভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলে। ইংরেজ সরকারের ভূমিরাজস্ব ও বাণিজ্য নীতির ফলে এই শতকের শেষভাগে ভারতের অন্যান্য জায়গায়ও আর্থিক দুর্গতি দেখা দেয়, [3]এমনকি দুর্ভিক্ষ, প্লেগাদিরও আবির্ভাব ঘটে। সরকার ইহার জন্য Famine Commission গঠন করেন। কিন্তু প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কাজেই নিষ্ক্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র দেশের লোকের অসন্তোষ বাড়িতে থাকে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু এই শতকের শেষভাগে বাংলার ছোট লাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ইহার পরিবর্তন সাধনের জন্য একটি (Bill) রচনা করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে [4]লর্ড কার্জনের হস্তক্ষেপে বিলটি শোচনীয় রূপ ধারণ করে। লর্ড কার্জন নূতন আইন দ্বারা কলিকাতার নাগরিক প্রতিনিধির সংখ্যা কমাইয়া সরকার

1. ...linseed from 2,100 Bushels in 1833 to 237,000 in 1844, P. 50—India to-day and tomorrow—R.P. Dutta, Delhi, 1955.

2. Even more significant was the rising export of food grains from starving India. It rose from £858000 in 1849 to £3·8 million by 1858, £7·9 million by 1877, £9·3 million by 1901, Ibid.

3. Report of the Indian National Congress—(1902)—P. 142

4 Lord Curzon intervened and made the Bill worse. He reduced the number of the elected members to 25 twentyfive, making it equal to the number of the nominated members. The latter, with the official chairman, obtained the controlling power. Real popular Government was at an end. P, 333—The Economic History of India in the Victorian Age. Vol. II, R. C. Dutt, First Indian Edition (1960)

মনোনীত প্রতিনিধির সমান করিয়া দিলেন ; সরকারী চেয়ারম্যানের সাহায্যে শাসন নিয়ন্ত্রণও সরকারের হাতেই রহিল। এই ভাবে নূতন মিউনিসিপ্যাল এক্ট-এর বলে মিউনিসিপ্যালিটির গণশাসনের সমাধি ঘটিল এবং শাসন ক্ষমতা সরকারের হাতে চলিয়া গেল। ইহাতে শিক্ষিত জনগণের সরকার বিরোধী ক্ষোভ বর্ধিত হইল। এইবারে দেশনায়কগণ বুঝিলেন, অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সরকার নিরুদ্বেগ, এবং নানা বিষয়ে দেশীয় লোকের ক্ষমতা হরণ করিয়া ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্য পরিচালনা নিষ্কণ্টক করিতে অধিকতর উদ্যোগী। এই অবস্থায় দেশবাসীর অর্থকষ্ট মোচনে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও প্রচারের দিকে নেতাদের ঝোঁক পড়িল।

কংগ্রেস ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী খুলিয়া উৎপাদকদের উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করে। এইভাবে কংগ্রেসের স্বদেশীয়ানা প্রচার ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করে। মারাঠী নেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'শিবাজী উৎসব' উত্থাপন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে 'শিবাজীউৎসব' নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। [১]রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকা রূপে 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি রচনা করেন। এই কবিতায় অখণ্ড ভারতের কল্পনা প্রকাশিত,—

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণ ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
একপুণ্য নামে ॥

লর্ড কার্জন বুঝিলেন দেশে স্বদেশী চেতনা ক্রমেই বাড়িতেছে। তাই দেশবাসীকে খুশি করিবার জন্য হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমানের প্রাচীন কীর্তি রক্ষাকল্পে লর্ড কার্জন আইন প্রণয়ন করেন। কর্মদক্ষতা, বাগ্মিতা, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিতে তিনি নিপুণ ছিলেন। তবুও বহুদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি জি. কে. গোখেলে তাহাকে [২]স্বৈরতন্ত্রের উপাসক রূপে বর্ণনা করেন। বড়লাট কার্জনের আমলেই গোয়েন্দা বিভাগের সৃষ্টি হয়। কার্জন স্বদেশী চেতনার বৃদ্ধি দেখিয়া বুঝিলেন ইংরেজি শিক্ষার ফলেই দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছে। সুতরাং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করিয়া শিক্ষানিয়ন্ত্রণ দ্বারা

১। ১৯০৪, ২৭শে আগষ্ট (ভাদ্র ১৩১১) ২। Indian National Congress—(Vol. I)—p.p. 790—793

স্বদেশি-স্পৃহা হরণে উদ্যত হইলেন। শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় দেশে বিক্ষোভ দেখা দিল এবং দেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ গড়িয়া তুলিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইল। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার কথা পূর্ব হইতে প্রকাশিত হওয়ায় নৈতিক চরিত্র, ব্যবহারিক শিক্ষা ও স্বদেশিভাব সঞ্চারের উদ্দেশ্যে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে [১]ডন্-ম্যাগাজিন-এ 'An Examination into the Present System of Education in India and a Scheme of Reform'—নামে ভারতীয় শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা এপ্রিল হইতে জুন পর্যন্ত তিনটি সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ইহার পর সতীশ চন্দ্র ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'ডন্ সোসাইটি' স্থাপন করেন। এই সোসাইটির সংগে তৎকালে বিনয় সরকার, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মনীষী যুক্ত ছিলেন। এইভাবে এখান হইতে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়িয়া উঠে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে', 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না' ইত্যাদি গান এই সময় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। 'ডন্ সোসাইটি'তে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হইবার পরে শিক্ষা আন্দোলন খুব জোরদার হইয়া উঠে। সতীশ চন্দ্র মুখার্জি ও হীরেন্দ্র নাথ দত্তের নেতৃত্বে ছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগদান করে। বক্তৃতাকালে বাগ্মি-প্রবর হীরেন্দ্রনাথ বিদেশী শিক্ষা বর্জনের জন্য এম. এ. পরীক্ষার্থীদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিলেন,—[২]"ভাঙ্গো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। কায়েম কর স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়"। ইহার পর শিক্ষা বয়কট সুরু হয়। শিক্ষা আন্দোলনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, রবীন্দ্রনাথ, বারীন্দ্র ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণ চন্দ্র চাকলাদার, কিশোরী মোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি যোগদান করায় ইহা সফলতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। শিক্ষা আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্ররা

---

1. His long article, "An Examination into the Present System of Education in India and a Scheme of Reform," offers a masterly analysis of all the varied problems of Indian education and constitutes a landmark in the history of education reforms in India. It was published in three issues April to June, 1902. P. 4. Satish C. Mukherjee & the Dawn Magazine (1897—1913) H. Mukherjee (1953)

২। বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় সংস্করণ, ১ম ভাগ, পৃ ৩১৪, ১৯৪৪

যোগদান করায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর সরকার ছাত্র সমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া সকল প্রকার রাজনৈতিক সভা বক্তৃতা, পিকেটিং ইত্যাদি বন্ধ করিয়া 'কারলাইল সারকুলার' জারি করেন। ফলে শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ও জাপান ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার রমাকান্ত রায়ের নেতৃত্বে 'এনটি সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর। এইভাবে শিক্ষা আন্দোলন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ যাদবপুরে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদে গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকা, মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য আড়াই লক্ষ টাকা এবং রাজা সুবোধ চন্দ্র বসু মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করেন। ঐ বৎসর ১৪ই আগষ্ট পরিষদের অধীনে 'দি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এণ্ড স্কুল' স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সার্কুলার রোডে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট' স্থাপিত হয়। বর্তমানে সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করায় রংপুরে যোগদানকারীদের উপর কার্লাইল সার্কুলার অনুযায়ী ভীষণ অত্যাচার চলে। এই সময়ে সেখানেও অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায়ের নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। এইভাবে তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এণ্ডরুজ উড়িষ্যাকে বাংলা হইতে পৃথক করিবার প্রস্তাব দেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রস্তাব সমর্থন করায় উড়িষ্যা ও বাংলা দুইটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। দেশবাসী এই পৃথকীকরণ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন নাই। এই এণ্ডরুজ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ছোট লাট হইলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের **'Divide and Rule'** নীতি ইংরেজ সরকার নানা ভাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য ইংরেজরাই 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহযোগিতা করেন বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে; আবার এই ইংরেজগণই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বর্ণ হিন্দু ও তপশীলী হিন্দুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিশেষ চেষ্টা করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এণ্ডরুজ বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়া আসামের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গকে জুড়িয়া দিবার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু

হয়। বঙ্গভঙ্গ অবলম্বনে ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেশে অন্তত [১]দুই হাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর পাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন হলে বঙ্গ বিভাগ অবলম্বনে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইর প্রথমে সিমলা হইতে সরকারীভাবে [২]"ঘোষিত হইল যে ভারত সচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করিয়াছেন।" [৩]বাঙ্গালীর মধ্যে যে ঐক্য ও আত্মসচেতনতা গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্যই এই ঘোষণা একটি বোমার মত বঙ্গবাসীর উপরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘোষণা আইনে পরিণত হইলে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর ভারতের উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল সেই ঐক্য ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হইবে। সুতরাং সমগ্র বাংলা দেশ প্রবল বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, রাজা সূর্যকান্ত আচার্য, রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সকলেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। কেবল বাঙ্গালী নয়, অবাঙ্গালীরাও এই আন্দোলনের সফলতার জন্য ইহার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। বি. জি. তিলক, লালা লাজপত রায়, গোখেলে ও নৌরজীর সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টইলরাম গঙ্গারাম [৪]"লর্ড কার্জনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। যীশুর পূর্বে যেমন জনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমনি টইলরাম আসিয়াছিলেন।" এই প্রসঙ্গে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে টাউন হলের অধিবেশনে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। [৫]"মধ্যাহ্ন হতে

৪। আত্মজীবনী—কৃষ্ণকুমার মিত্র, পৃঃ ২৪৯, ১৯২৭

৫। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, পৃ ২৮, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১

1. 'The Congress and the National Movement (from a Bengalee stand-point) written under the direction of the Reception Committee of the Indian National Congress, 1928. P. 34. 3. The announcement fell like a Bomb-Shell upon an astonished public......it was a deliberate blow...it would be fatal to our political progress and to the close union between Hindus & Mohamedans upon which the prospect of Indian advancement so largely depended", A Nation in Making. P. 188 S. N. Banerjee.

২। ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া—পৃঃ ৮৫, প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৪২।

না হতেই সহস্র সহস্র যুবক ও ছাত্র কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হয় এবং রমাকান্ত রায় প্রমুখ নেতার পরিচালনায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে টাউন হলের অভিমুখে চলতে থাকে। টাউন হল লোকে লোকারণ্য। দোতলায় তিলার্ধ স্থান না থাকায় এক তলায় আর এক সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেও তিলার্ধ স্থান না থাকায় সম্মুখস্থ বিস্তৃত ময়দানে তৃতীয় সভার অনুষ্ঠান হয়। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সমগ্র আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। এমন অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, জাতীয় ঐক্য ও চেতনাবোধ ইতঃ পূর্বে আর কখনো এদেশে এমন প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়নি।" টাউনহলের [১]এই ঐতিহাসিক সভায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত বন্দেমাতরম্ স্বদেশী মন্ত্ররূপে প্রথম গৃহীত হয়। দোতলার সভার সভাপতি ছিলেন মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, একতলার সভার ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও ময়দানের সভার সভাপতিত্ব করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার।

এই আন্দোলনে [২]"বাংলার নিহিত শক্তি যেন সহসা আত্মপ্রকাশ করিল; কবি, বক্তা, চিত্রকর, সংবাদপত্রসেবক, গায়ক, যাত্রাওয়ালা— যিনি যেরূপে পারিলেন মাতৃসেবার মহাযজ্ঞে যোগ দিলেন। বাংলা তখন জাগিয়াছে। তাহার সেই তেজোদ্দীপ্ত নূতন মূর্তি দেখিয়া বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—

> "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি—
> তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননি।
> ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
> তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

ডন্, বেঙ্গলী, হিতবাদী, নিউ ইণ্ডিয়া, সন্ধ্যা, সঞ্জীবনী, অমৃতবাজার, বরিশাল হিতৈষী প্রভৃতি পত্রিকা এই সময় হইতে স্বদেশী ভাব প্রচারে বিশেষ তৎপর হয়।

1. Bande Mataram as a mantra of Nationalism was uttered through thousand voices for the first time on the fateful day of August 7, 1905 in connection with the historic Town Hall meeting promalgating resolution of Boycott and the Vow of Swadesh. p. 13. Bande Mataram & Indian Nationalism (1906—1908). H. Mukherjee & U. Mukherjee, 1957.

২। কংগ্রেস, ৩য় সংস্করণ, পৃ ১১১—১১৩ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৯২৮)

সরকার পক্ষ হইতে বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইল না। কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই বিদেশীপণ্য বর্জনের জন্য একটি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিলেন,—

[১]"আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইতে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকারের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য কেবল নিজেরা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, বন্ধু বন্ধব ও অন্যান্য লোক-দিগকে এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সঙ্কল্পের সহায় হউন।"

ইহার পর বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রচণ্ড আন্দোলন চলে। ফলত নানাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে থাকে। 'ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরী,' 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' (১৯০৬) 'যশোহর চিরুণীর ফ্যাক্টরী' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। টাককড়ি লেনদেনের জন্য 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হইল; একটি ন্যাশনাল বীমা কোম্পানীও স্থাপিত হয়। এই সময় যশোহরের চিরুণী, বর্ধমানের অন্তর্গত কাঞ্চননগরের ছুরি কাঁচি, বরিশালের নিব-কলম, কালিকচ্ছের দেশলাই প্রভৃতি ফেরি করিবার ব্যবস্থা হয়। দেশের নানা স্থানে দেশীয় পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ব্যারিষ্টার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী বহুবাজার ষ্ট্রীটে 'ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স,' ডন্‌সোসাইটির পরিচালনায় 'স্বদেশী ষ্টোর্স', কেদার নাথ দাসগুপ্তের উৎসাহে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,' বহুবাজার ও লালবাজারের সংযোগ স্থলে আব্দুল হালিম গজনভির 'ইউনাইটেড বেঙ্গল ষ্টোর্স' প্রভৃতি একের পর এক দেখা দিল। বস্ত্র, কাচ প্রভৃতি বিলাতি কোম্পানীর পণ্য বর্জনের উদ্দেশ্যে এই বয়কট আন্দোলনের সময় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন,—[২]"মালক্ষ্মী কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেব না। ঘরের থাকতে পরের নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরব না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না। মোটা বসন অঙ্গে নেব।" রজনীকান্ত সেন গাইলেন,—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই।

১। সঞ্জীবনী, ২০শে জুলাই, ১৯০৫, কৃষ্ণকুমার মিত্র

২। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সেই মোটা সূতার সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হইয়া গেল। [১]"এই সময় বাঙ্গালীর ঐক্যকে চিরন্তন করিবার জন্য কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে বঙ্গ বিভাগের দিন ৩০শে আশ্বিনকে 'রাখী বন্ধনের' দিন করা হয়। ঐ দিন কলিকাতায় অরন্ধন ও 'রাখী বন্ধন' উৎসব পালিত হয়। দলে দলে লোক এই উৎসবে যোগদান করেন। [২]"গঙ্গা স্নানান্তে বিডন উদ্যানে ও সেনট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে রাখী উৎসব সম্পন্ন হল।" এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথের 'রাখী সংগীত'টি সহস্র কণ্ঠে গীত হইয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছিল—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান।

* * * *

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক এক হউক
হে ভগবান।

ইহার পর সহরে ও গ্রামে সভা, আলোচনা, বস্ত্র, চিনি, লবন ও মনোহারী দ্রব্য বর্জনের পালা চলিতে থাকে। [৩]১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনে লালা লাজপত রায় বাংগালীর এই আন্দোলনের প্রশংসা করিয়া ভারতবাসীকে ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, [৪]বাংলা তথা ভারতের মুসলমানগণ কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পণ্য বর্জন

১। মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ২১৭, ৩য় সং, ১৩৬৭, যোগেশচন্দ্র বাগল

২। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, পৃ ১৬৭, ৪র্থ সং, শরৎ কুমার রায়।

3. I think the people of Bengal ought to be congratulated on being leaders of that March in the van of progress·····And if the people of India will just learn that lesson from the people of Bengal, I think the struggle is not hopeless, India's Fight for Freedom—p.p. 125—126—H. Mukherjee & U. Mukherjee,

4. The Englishman, 4th January, 1907 The All-India Moslem League" — P. 5.

আন্দোলন কখনো সমর্থন করেন নাই, বরং তাহারা বঙ্গ বিভাগের সমর্থন করিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিবেশন হইত মাত্র তিন দিন ধরিয়া। এই স্বল্প সময়ে ভারতের বহু সমস্যার সঙ্গে প্রাদেশিক সমস্যা আলোচনায় যথেষ্ট অসুবিধা হইত বলিয়া বাঙ্গালী নেতারা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি' প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গুড ফ্রাইডের ছুটিতে অশ্বিনী কুমারের আহ্বানে আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে বরিশালে ঐ সমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। অধিবেশনের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্ব হইতেই আসাম ও পূর্ব বঙ্গের ছোট লাট স্যার ব্যামফিলড ফুলার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। অথচ 'বন্দেমাতরম্' ছিল তখনকার আন্দোলনের প্রধান ধ্বনি। এই অধিবেশনে 'এন্‌টি সার্কুলার সোসাইটি' এবং বাংলার নানা স্থান হইতে প্রায় তিনশত সদস্য যোগদানের জন্য বরিশালে উপস্থিত হন। 'এন্‌টি সার্কুলার সোসাইটি'র স্বেচ্ছাসেবকগণ বন্দেমাতরম্-এর ব্যাজ ধারণ করেন। সদস্যগণ যখন রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন তখনই পুলিশের আক্রমণ সুরু হয়। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেব নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুই শত টাকা জরিমানা করেন। সুরেন্দ্রনাথ জরিমানার টাকা জমা দিয়া অধিবেশন স্থলে আসেন। কিন্তু পুলিশের অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত অধিবেশন পণ্ড হয়। ঐ সময় সদস্যদের উপরে লাঠি চালনা করা হইয়াছিল। [১]"সভ্যতাভিমানী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজত্বে প্রকাশ্য দিবালোকে বিনা অপরাধে রাজপুরুষগণ কর্তৃক শিক্ষিত লোকগণের প্রহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত বোধ হয় বরিশালের প্রাদেশিক সমিতি উপলক্ষে দেখা দিয়াছিল।" এই অত্যাচারে জনগণ গাহিল 'বরিশাল পুণ্যে বিশাল, হলো লাঠির ঘায়ে।' আন্দোলন আরো প্রবল রূপ ধারণ করিল। অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৬ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বরাজের মন্ত্র লইয়া যশোহর, খুলনা, শীলচর, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি নারায়ণ-গঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বক্তৃতা করিতে থাকেন। এই সময় বিদেশী শিক্ষা বর্জনের সঙ্গে বিদেশী বিচারালয় বর্জনেরও আন্দোলন উপস্থিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইংরেজ সরকার শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে

১। যজ্ঞভঙ্গের ভূমিকা, প্রিয়নাথ গুহ, ১৩১৪

তৎপর হইলেন। সুতরাং দেশবাসী তাহাকে অসন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু পরবর্তী কালে সরকারের বহু দেশবিরোধী কার্যের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে জনগণের সরকার বিরোধী মনোভাব বাড়িতে থাকে এবং দেশাত্মবোধের চেতনা ক্রমেই প্রবল হইতে আরম্ভ করে। এই দেশাত্মবোধ অবলম্বনেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা হয়। জাতীয় শিক্ষা ও স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশাত্মবোধ ও ইংরেজের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিংশ শতকের প্রথমে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। এই দুইটি উপাদান আবার এই শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দেশবাসীকে বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনে প্ররোচিত করে।

[১]১৯০১—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপার সার্কুলার রোডে একটি 'গুপ্ত সমিতি' গঠন করেন; এই সমিতির সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, সহ-সভাপতিদ্বয় চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সমিতিতে [২] "সাঁতার খেলা, লাঠিখেলা, ঘোড়ায় চড়া, মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing) সাইকেল চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাই ছিল আমাদের বাহিরের আবরণ। এই সঙ্গে বিশ্বস্ত ছেলেদের কাছে গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনির জীবনী এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলন কি করিয়া পরিচালিত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে বক্তৃতা হইত। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পি. মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রধানত বক্তৃতা দিতেন। বই পড়িয়া সব বুঝাইয়া দেওয়া হইত।" ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথনাথ মিত্র ঢাকায় একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতি পরিচালনা করিতেন বিখ্যাত লাঠি-ছোরা খেলোয়াড় পুলিন বিহারী দাস। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সতীশ চন্দ্র বসুও কলিকাতার মদন মিত্র লেনে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এ সমিতির নাম ছিল 'অনুশীলন সমিতি' এই সব আখড়ায়ও মুষ্টিযুদ্ধ, ছোরাখেলা, লাঠিখেলা ইত্যাদি চলিত। এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে এইসময় 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' (বরিশাল), 'ব্রতী-সমিতি' (ফরিদপুর), 'সাধনা সমাজ' ও 'সুহৃদ সমিতি' (ময়মনসিংহ) প্রভৃতি বহু বৈপ্লবিক সমিতি গড়িয়া উঠে। সমিতি গুলিতে বহু স্বেচ্ছাসেবক যোগদান

১। ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃ ১৮১, ৩য় সং, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট খ (১৯৪৯)

২। ঐ পৃ ১৯১, পরিশিষ্ট গ

করেন। [১]এই সব স্বেচ্ছা সেবকের হাতে লাঠি, মাথায় হলুদ রংএর পাগড়ী, গায়ের লাল সার্টে 'বন্দেমাতরম্'-ব্যাজ ও পরিধানের ধুতির একপ্রান্ত কোমরে ঘুরাইয়া বাঁধা থাকিত। বৈপ্লবিক সমিতির কেন্দ্র ছিল কলিকাতায়,—বাইরে ছিল শাখা। এই সকল সমিতির মুখপত্ররূপে কানাইধর লেনে সপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত থাকিত,—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা ৪।৭-৮

তখন এই পত্রিকায় বিরামহীন বিপ্লবাত্মক প্রচার চলিত। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারীনামে), বারীন্দ্র ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু (যোগাক্ষ্যাপার চিঠি নামে), অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ মুনীষী এই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 'কংসের কৃষ্ণ ভয়' 'রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম' 'ষড়যন্ত্র বা স্বাধীনতার ইচ্ছা' 'জাগরণ 'বাঙালীর বোমা,' 'বিদ্রোহী কে', 'সাধের মরণ', 'মূল সত্য কি' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিপ্লবীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাইত! বিভিন্ন কবিতার মধ্যদিয়া তৎকালীন বিপ্লবীদের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিত,—

[২]নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে
বিনাশ করি অসুরের দলে,
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন—
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।
জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণতট॥ (অকাল বোধন)

---

1. Bande Mataram—পত্রিকা, ১৫ মে, ১৯০৭, (The National Volunteer প্রবন্ধ)

২। যুগান্তর, ৩০মে, ১৯০৮, ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা

[১]ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণ জয় গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারত মাতা॥

* * *

সাজে নয়ন কি হীন বিলাসে শত্রু বিমুগ্ধ যখন পুরপল্লী।
ইংরাজ চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী।
কোষ নিবদ্ধ রবে খর অসি যখন বিলাঞ্ছিত ভারতবাসী॥

(রণনীতি)

এই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' (১৯০৪, মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত), ও বিপিন চন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' জাতীয়তা ভাব প্রকাশে বিশেষ রূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। ইংরেজ সরকার ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল, ফরিদপুরের সমিতি গুলিকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দমন নীতি চালাইতে আরম্ভ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সরকার 'প্রেস আইন' পাশ করিয়া 'যুগান্তর' পত্রিকা বন্ধ করেন। ইহার পরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত। ঐ বৎসর রাজা পঞ্চম জর্জের আগমনে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হয়। এই দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ঘোষণা দ্বারা পুনরায় পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ একত্রিত হইল। এই ভাবে স্বদেশী আন্দোলনের জয় নির্ধারিত হইলে ইহা সাময়িক ভাবে স্তিমিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন সুরু হইয়াছিল সরকারের দমন নীতির দ্বারা তাহার গতি রুদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দেশে জীবন যাত্রার মানের অবনতি ঘটে; শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মধ্যবিত্তের আর্থিক বিপর্জয় দেখা দেয়। [২]দেশের দরিদ্র জনগণের নিকট হইতে যুদ্ধের জন্য বিপুল চাঁদা সংগ্রহের গুরুভার, উন্নত দ্রব্য মূল্য, বেপরোয়া মুনাফা

১। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা, ২ সেপ্টম্বর, ১৯০৭।

2. The heavy burdens of crippling financial contributions exacted from the poverty-stricken people of India for the service of the war the rising prices and reckless profiteering created condition of mass misery and impoverishment, which were reflected in the unparalleled toll of the influenza epidemic at the end of the war, killing 14 millions. The growth of unrest was reflected in the Ghadar movement in the Punjab, and in mutinies in the army, which were suppressed with ruthless executions and sentences. P. 132 India to-day and tomorrow—R. P. Dutta (Delhi, 1955)

খোর কৃত আর্থিক দুর্গতি, লক্ষ লক্ষ লোক-ধ্বংসী মহামারী প্রভৃতির ফলে গণচিত্তে যে অস্থিরতা বাসা বাঁধিয়াছিল নৃশংস-উপায়ে-প্রশমিত পাঞ্জাবের ঘদর আন্দোলন ও সৈন্য বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্যে তাহারই প্রতিফলন দেখা দিয়াছিল। বিদ্রোহ দমন কল্পে সন্দেহ হইলেই গ্রেপ্তার করা, নির্বাসন দেওয়া, কোন অঞ্চলকে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বলিয়া ঘোষণা করা প্রভৃতি উপায়ে দমন, পীড়ন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের জন্য বড়লাট লর্ড চেম্‌স ফোর্ডের শাসনে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ 'রাউলট আইন' পাশ করা হইল। যে ইংরেজ সরকারের অধীনে সেনাপতি ডায়ার কর্তৃক জঘন্য পাশবিক উপায়ে জালিয়ান ওয়ালাবাগে নরহত্যা সংঘটিত হয়, যে ইংরেজ সরকারের চণ্ডনীতির রথচক্রে দেশবাসী ক্রমাগত নিষ্পেষিত হইতে থাকে সে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে ব্যক্ত হইতে লাগিল।

দেশের গুপ্ত সমিতিগুলি সন্ত্রাসবাদের (Terrorism) স্রষ্টা। সন্ত্রাসবাদীরা দেশোদ্ধার কল্পে হত্যার মধ্য দিয়া ইংরেজ ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই সম্প্রদায় ধনীর গৃহে ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিংসফোর্ড সাহেব বন্দেমাতরম্ পত্রিকা ও যুগান্তর পত্রিকার প্রিনটারদের শাস্তিদান করেন এবং দেশপ্রেমিক সুশীল কুমার সেনকে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। ইহার পরে কিংসফোর্ড সাহেব মজঃফরপুরে বদলি হইলে সন্ত্রাসবাদীরা সেইখানে তাহাকে হত্যার চেষ্টা করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে কিংসফোর্ডের গাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি গাড়ীতে না থাকায় রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রী মিসেস কেনেডি হত হইলেন। মিসেস কেনেডি ভারতের প্রথম স্বদেশী খুন। হত্যাকারী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়েন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিয়া রাজ-শাস্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করেন, আর ক্ষুদিরাম ঐ বৎসরে আগষ্ট মাসে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয় গান গাহিলেন। ১৯০৬—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর-বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হইলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা দ্বারা হত্যার চেষ্টা করা হয়, লেডী হার্ডিঞ্জ হত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) উড়িষ্যায় বুড়ি বালামের তীরে ধরা পড়িলেন; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরে মানবেন্দ্র রায় নামে পরিচিত) ধরা পড়িয়াও পলায়নে সক্ষম হইলেন। ১৯২৩-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থ সংগ্রহের জন্য পোষ্ট অফিস ও রেল ষ্টেশান

পোড়ানোর ব্যবস্থা হয়। ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ লোম্যান-এর হত্যাও দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি (১৯৩০), রাইটার্স বিল্ডিংস-এ সাহেব হত্যা করিতে গিয়া বাদল গুপ্তের সায়ানাইড প্রয়োগে আত্মহত্যা, ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডিহত্যা (১৯৩১), ডগলাস-হত্যা ও মেদিনীপুরের প্রদ্যোত ভট্টাচার্যের ফাঁসি (১৯৩২), বার্জেস-হত্যা (১৯৩৩) প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সন্ত্রাসবাদের কাজ চলিতে থাকে এবং পাশাপাশি সরকারের তরফ হইতে চলিতে থাকে মানিকতলা-মেছোবাজার-রাজাবাজার-বোমা ও অস্ত্র-মামলা। সন্ত্রাসবাদীরা যেমন অস্ত্র প্রস্তুত করিতেন তেমনি দুঃসাহসিক উপায়ে অস্ত্র সংগ্রহও করিতেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'রোদ্দা কোম্পানী' থেকে বহু অস্ত্র সংগৃহীত হয়। সন্ত্রাস-বাদীদের অস্ত্র সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ঘটনা চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। [1]"মেছুয়া বাজারের ধরপাকড়ের চরিমাস পরে চট্টগ্রামের প্রচণ্ডতম প্রয়াস অস্ত্রাগার লুণ্ঠনরূপে দেখা দিল। বাঙালীর এতবড় দুঃসাহসিকতা, এতবড় আত্মত্যাগ, এমন সংগঠনে, এমন দৃঢ়তা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল।"

রাউলট আইন সম্পর্কীয় আন্দোলন, জেনারেল ডায়ারের জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯), বোম্বাইতে প্রায় ১২৫,০০০ কর্মীর মিল ধর্মঘট, আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট প্রভৃতি লইয়া ১৯১৯ সালে এক বিপ্লবাত্মক সময় চলিতেছিল। [2] লালা লাজপত রায়ের উক্তিতে এই বিপ্লব কালের কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অনেক অংশ ব্রিটিশ, ফরাসী, সিরিয়া ও আরবের অন্তর্ভুক্ত হয়। তুরস্কের সুলতান তখন কনষ্ট্যান্টিনোপল-এ নজরবন্দী ছিলেন। যুদ্ধান্তিক সন্ধিতে ঠিক হয়, কেবল খাঁটি তুরস্ক অধ্যুষিত অঞ্চলই তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ও এই সন্ধি না মানা পর্যন্ত মিত্রশক্তি তুরস্কের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র তুরস্ক সম্পর্কে এই হীন সর্ত আরোপিত হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানগণ মনে করিলেন—ইসলাম বিপন্ন, আর সমস্তই ব্রিটিশের চক্রান্তে

১। ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃ ২৭৮, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ

2. It is no use blinking the fact that we are passing through a revolutionary period. Congress Session—Sept, 1920.

অনুষ্ঠিত। সুতরাং ব্রিটিশের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার জন্য খিলাফৎ কনফারেন্স-এর আয়োজন করা হইল। [১]"বিদ্রোহকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে গান্ধী খিলাফৎ কনফারেন্সে (নবেম্বর, ১৯১৯ খ্রী) সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগের উপদেশ দেন।" সুতরাং [২]১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানেরা ব্রিটিশ বিরোধী "খিলাফৎ আন্দোলন" সুরু করেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগ হইতে লর্ড ডাফরিনের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি-প্রচেষ্টা প্রবল হইতে আরম্ভ করে এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় [৩]'মুসলীম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমানে একটি দাঙ্গা হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করায় সমগ্র ভারত এই আন্দোলনে যোগদান করে এবং ইহার পর হইতেই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য দৃঢ় হইয়া উঠিতে থাকে। খিলাফৎ, রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদ কল্পে [৪]"কংগ্রেস কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশনে (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ খ্রী) ও নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে (৩০ ডিসেম্বর, ১৯২০ খ্রী) অসহযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে"। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রমুখ নেতা ঐ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। স্কুল কলেজের ছাত্ররা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক নরনারী অসহযোগে অংশ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করেন। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদকদ্রব্য বর্জন ও চরকা ব্যবহারের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়। তখন বাংলার ঘরে ঘরে চরকা প্রচলিত হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চরকার গান' কবিতা হইতে ইহার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করা যায়,—

১। ভারত কোষ, ১ম খণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন

2. History of the Congress—p. 322, P. Sitaramayya.

3. On 30 December 1906, just after the Mohammedan Education Conference at Dacca, a meeting was held to discuss the formation of a "Political association of Mohammedans"...A resolution for the formation of a political association, styled the "All—India Moslem League", was passed. P. 158, Indian National Congress—Dr. P. C. Ghose (1960).

৪। ভারত কোষ, ১ম খণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন

ঘর বার করবার দরকার নাই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার।
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর-ঘর,
ঘর-ঘর ক্ষীরসর আপনার নির্ভর!
পড়শীর কণ্ঠে জাগল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

তৎকালে চরকা লইয়া পল্লীবাসীরাও গান বাঁধিয়াছিলেন,—

চরকা আমার সোয়ামীপুত চরকা আমার নাতী।
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী॥

একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা যাইতে পারে। ভারতে নানা আন্দোলন চলিতে থাকায় যে অস্থিরতার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রিন্স অফ ওয়েলস তাহার সম্যক পরিচয় লইবার জন্য ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। [1]তাহার আগমন উপলক্ষে ১৭ই নভেম্বর দেশব্যাপী হরতাল পালনের মধ্য দিয়া জনগণ প্রিন্স অফ ওয়েলেসকে অভ্যর্থনা জানাইয়া অভূতপূর্ব সরকার বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দান করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গণচিত্তে রাষ্ট্রচেতনা ও স্বাধিকার বোধ খুব প্রবল হইয়া উঠে। ফলস্বরূপ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ান, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে চা-শ্রমিক ধর্মঘট, আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট, ষ্টীমার কোম্পানী ধর্মঘট, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সার্থক লবণ আইন আন্দোলন এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সভা সংগঠিত হয়। গণচেতনা ক্রমে প্রবল হইতে থাকায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে 'পূর্ণ স্বরাজ' মতবাদ গৃহীত হয় এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী গৈরিক-সাদা-সবুজ পতাকা উত্তোলন করিয়া ভারতে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়, [2]'আমরা যদি সরকারের

---

1. The hartal all over India which greeted the prince of Wales on his arrival on November 17 was the most overwhelming and successful demonstration of popular disaffection which India had yet known. P. 142—India to-day and to-morrow—R. P. Dutta (Delhi, 1955)

2. If we can but withdraw our voluntary help and stop payment of taxes, without doing voilence even under provocation, the end of this inhuman rule is assured. P. 159—India to-day and to-morrow—R. P. Dutta (Delhi—1955)

সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা না করি, সকল প্রকার কর দান বন্ধ করি এবং প্ররোচনা সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ না করি তবে এই অমানবোচিত শাসনের নিশ্চিত অবসান ঘটিবে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে 'রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স' দ্বারা ভারত-ইংরেজ সম্পর্কের কোন উন্নতি সম্ভব হইল না। ১৯৩২ সালে বাংলার ছোট লাট জন্ এণ্ডারসন্ কংগ্রেসকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রধান নেতাদের কারারুদ্ধ করেন। তখন কংগ্রেসকে খতম করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। পিটুনি কর ধার্য, গুলি-লাঠি চালনা, শারীরিক অত্যাচার, পল্লী অঞ্চলে সমবেত অর্থদণ্ড, জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতির সঙ্গে প্রধান নেতা সহ প্রায় সোয়া লক্ষ লোককে কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু ইহাতেও বাংলা ও ভারতের আন্দোলন প্রশমিত হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী তখন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিষ ধোঁয়াইয়া তুলিবার জন্য মুস্লিম লীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে বর্ণ হিন্দু ও তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নূতন নির্বাচন রীতি প্রচলিত করিতে মনস্থ করেন, এবং ইহার জন্য 'সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডা-রেশন'-এর নেতা ডঃ আমবেদ করকে উস্কাইবার চেষ্টা করেন। গান্ধী পুণার য়েরবাদা জেল হইতে আমরণ অনশন ঘোষণা করিয়া হিন্দুর মধ্যে এই দলীয় বিদ্বেষ বন্ধ করেন। জেল হইতে বাহির হইবার পরে অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য গান্ধী হরিজন আন্দোলনকে প্রবলতর করিয়া তুলিলেন। 'হরিজন পত্রিকা' প্রকাশ, সবর্ণ ও অসবর্ণের পংক্তি ভোজন প্রভৃতি বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর মন হইতে শ্রেণী বিদ্বেষ মুছিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল হের হিটলারের নেতৃত্বে। ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্য ভাঙ্গিয়া গেল। কংগ্রেসেও কিছুটা ভাঙ্গন ধরিল। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নেতা সুভাষচন্দ্র অবিশ্বাস্য 'ব্লাকহোল' স্তম্ভ অপসারণের আন্দোলনে ধৃত হইয়া গৃহে অন্তরীণ হইলেন। ১৯৪০ সালে মহম্মদ জিন্না ভারত বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের সঙ্গে আঁতাত করিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী প্রহরারত সুভাষচন্দ্র ভারত হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি রাশিয়া ও জার্মান হইয়া জাপানে গিয়া ভারতকে শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য কর্ণেল পি. কে. সায়গল (হিন্দু), কর্ণেল জি. এস. ধীলন (শিখ) ও মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ (মুসলমান)

এই তিনজনের নেতৃত্বে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আরমি' গঠন করেন। এই সময় ইংরেজ ভারত না ছাড়িলে আর ভারতের শান্তি নাই মনে করিয়া হরিজন পত্রিকায় গান্ধী 'ভারত ছাড়' (Quit India) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সমর্থন করিয়া 'আগষ্ট প্রস্তাব' পাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' (do or die) মন্ত্র লইয়া 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু দেশে যে জনজাগৃতি হইয়াছিল তাহার ফলে নেতৃহীন সাধারণ মানুষ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইলেন। একদিকে নেতৃবৃন্দকে কারামুক্ত করিবার আন্দোলন অন্যদিকে স্বতন্ত্র সরকার গঠন দুই-ই অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে। বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্র ও গুজরাটের স্থানে স্থানে যেমন দেশীয় সরকার স্থাপিত হয় তেমনি বাংলার কাঁথি ও তমলুকে স্বতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় বহুলোক আত্মবিসর্জন দিয়াও আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সাধনা করেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট ওয়াভেল ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের আমলে দেশে ইংরেজ সরকার এক কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়া জনগণকে সায়েস্তা করিবার চেষ্টা করেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীতে লক্ষ লক্ষ জীবন বিনষ্ট হইল। প্রায় ত্রিশলক্ষ লোক এই প্রকোপের বলি হয়। পথিপার্শ্বস্থ ডাষ্টবিন হইতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য মানুষ ও কুকুরের দ্বন্দ্ব, 'ফেন দাও' 'ফেন দাও' কান্নার সুর, ক্ষুধার জ্বালায় মাতার সন্তান বিক্রয় কিছুই সরকারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে নাই। সরকার নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, জনগণের দুর্দশা মোচনের সামান্যতম ব্যবস্থাও করিলেন না। [১]"প্রাচুর্যের মধ্যে অন্নাভাব ঘটিল। সরকারী নীতি-ই এর জন্য দায়ী। এ কারণ এবারকার দুর্ভিক্ষকে যে বলা হয়েছে মানুষকৃত দুর্ভিক্ষ তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারত উদ্ধার কল্পে জাপানের সাহায্যে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আরমি' লইয়া স্বদেশের দিকে 'কদম কদম' অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, অধিকৃত অঞ্চলে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। মণিপুরে

১ মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ৪৩২, ৩য় সং, যোগেশচন্দ্র বাগল

প্রবেশ করিয়া নেতাজীর আই. এন. এ সৈন্য বাহিনী 'দিল্লী চল' গান গাহিয়া ইম্ফলের নিকট উপস্থিত হইল। ইংরেজ সরকার বুঝিলেন ভারত ছাড়িতে হইবে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের অবসান হইল। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আঁতাত করিয়া মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের জন্য 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি তুলিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (direct action) সুরু করিল। দেশে রক্তের গঙ্গা বহিয়া গেল। গলিত শবের দুর্গন্ধে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া বড়লাট লর্ড মাউণ্ট বেটেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগ করিয়া দিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দেশ শৃঙ্খল মুক্ত হইল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহারা স্বাধীনতার যজ্ঞে ভাঁড়ে ভাঁড়ে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন তাহাদেরই একটি বিরাট অংশ দেবতার আশীর্বাদের পরিবর্তে যজ্ঞের নির্বাপিত বহ্নিকুণ্ড হইতে কেবল দগ্ধকাষ্ঠ লাঞ্ছিত তিলক ধারণ করিয়া অত্যাচার-প্রহার-ব্যভিচার-লাঞ্ছনায় অলঙ্কৃত হইয়া দেশ ত্যাগ পূর্বক ছিন্নমূল হইতে বাধ্য হইলেন।

ইহার পর সুরু হইল উদ্বাস্তু সমস্যা। পূর্ববঙ্গ হইতে যাহারা মার খাইয়া জীবন বাঁচাইবার জন্য এই দেশে আসিল তাহাদের অনেকেই অন্নাভাব, কর্মাভাব ও স্থানাভাবের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বা সরকারী সাহায্য ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতীয় নাগরিক হইয়া এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। আবার কতক লোক অন্ন-বস্ত্র-কর্ম-শিক্ষার অভাবে সুযোগ সন্ধানীর প্রভাব কবলিত হইয়া অসামাজিক পথে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পঞ্জাবে লোক বিনিময়ের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই নীতি গৃহীত না হওয়ায় বাঙ্গালী জনশক্তির এক বিরাট অংশের অবক্ষয় ও অপচয় দেখা দিল। আজও দেশ এই সমস্যা কণ্টকিত রহিয়াছে।

স্বাধীন ভারতের বাংলা দেশে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে হইতে খাদ্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বদেশী সরকার পক্ষ নানা প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব হইতেছে না। খাদ্য সমস্যা মানুষের বৃহত্তম সমস্যা। কাজেই খাদ্যান্দোলন অবশ্যম্ভাবী। ক্রমেই ইহা তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে। এই আন্দোলন অবলম্বনে বহুবার হরতাল—ধর্মঘট পালিত হইয়াছে; বহু মূল্যবান জীবনও অন্দোলনে বিসর্জিত হইয়াছে। খাদ্যাভাবের অধিষ্ঠাত্রী ভ্রূকুটি-কুটিল

করালদংষ্ট্রাল অলক্ষ্মী দেবী বিকৃতমুখব্যাদান করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই সরকার ও জনসাধারণ আজ ব্যতিব্যস্ত।

ইহার পর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক আক্রমণ ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানি আক্রমণের মোকাবিলায় সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠে। দেশবাসীর অর্থ, সামর্থ্য শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া সরকার পররাষ্ট্রলোলুপ শত্রুকে উপযুক্ত জবাব দিয়া নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত বিংশ শতকের রাজনৈতিক, স্বদেশীভাবমূলক, শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার সম্পর্কীয় পরিচয় দেওয়া হইল। ইহাদের দ্বারা কখনো পূর্ণভাবে কখনো আংশিক ভাবে বাংলা লোকনাট্য প্রভাবিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বিদেশী শাসকের শোষণ-পেষণ, অত্যাচার অবিচার ক্রমেই বাড়িতে থাকে। আঘাতে আঘাতে দেশবাসীর চেতনার উদ্বোধন সুরু হয়। এই সচেতনতার জন্য অন্যায়ের প্রতিবাদ বিভিন্ন পথে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এই শতকের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন, শিক্ষা আন্দোলন, বিপ্লব সমিতি ও সন্ত্রাসবাদ, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অসহযোগ আন্দোলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, ভারত-ছাড় আন্দোলন কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ প্রভৃতি দ্বারা বাংলা দেশে আলোড়ন সৃষ্ট হয়। স্বাধীনতা লাভের পরে উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন ও বিদেশী আক্রমণ জনগণকে প্রভাবিত করে। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আলোচিত অবস্থার মধ্য দিয়া বর্তমানে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ইহার পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে লোকনাট্য-কারদের উপর ইহার ব্যাপক প্রভাব পড়ে নাই। বাঙ্গালীর আন্দোলন নগর হইতে উন্নীত হইয়া শহরে এবং শহর হইতে ক্রমে গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন আন্দোলন পল্লীবাসীদের বিশেষ রূপে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই বলিয়া আন্দোলনাদি কোন স্থায়ী ফলও প্রসব করিতে পারে নাই। কাজেইকিছু ব্যতিক্রম ছাড়া লোকনাট্যে ইহার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকনাট্যকারগণ ঐ সকল বিষয়ে জনগণকে সচেতন করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া আসেন নাই। তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মবোধ ও অহেতুকী ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া নানা রসের পালা রচনা করিয়া

লোকচিত্তের নাট্য-পিপাসা চরিতার্থ করিতে থাকেন। তাহাদের নাটকের প্রধান অবলম্বন ছিল কল্পনা-মিশ্রিত পৌরাণিক্ গল্প এবং বেহুলা-চাঁদসদাগর ও কালকেতু-ফুল্লরার প্রচলিত কাহিনী। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল, মতিলাল ঘোষ, হারাধন রায়, অঘোর চন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রমুখ নাট্যকার এই শ্রেণীর নাটকই রচনা করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই সকল নাট্যকারের সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি নূতন যুগচেতনা ও সমাজচেতনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতে পারে নাই। অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত পল্লীবাসীরাও এ বিষয়ে একপ্রকার অচেতন ছিল। সুতরাং লোকনাট্যের পূর্বপ্রচলিত ভাবধারার যুগচেতনা-জনিত পরিবর্তন সম্পর্কে নাট্যকার বা দর্শকের মনে বিশেষ প্রশ্ন জাগে নাই। এই বিষয়ে মুকুন্দদাস ছিলেন স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রম।

বিংশ শতকের যুগচেতনা ও নানা আন্দোলন দ্বারা মুকুন্দদাসের লোক-নাটকগুলি প্রভাবিত। বিশেষভাবে স্বদেশী প্রচার ও জনজাগৃতির জন্য তিনি নাট্যরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সমসাময়িক কাল হইতে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৪), দ্বিজেন্দ্রলালের 'রানা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) 'মেবারপতন' (১৯০৮), গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৭), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৮) প্রভৃতি থিয়েটারী নাটক যেমন নগর ও সহরে কিছু স্বদেশী প্রেরণা যোগাইতেছিল, মুকুন্দদাসের নাটকও তেমনি পল্লীবাংলায় এক নূতন ভাবোন্মাদনা জাগাইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। তাহার প্রত্যেকটি নাটকে স্বদেশীভাব থাকিলেও তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'মাতৃপূজা', 'পথ' ও 'সাথী' এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু মুসলমান ঐক্য, অপৃশ্যতা বর্জন, পণ্য বর্জন, স্ত্রী-শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় 'পল্লীসেবা' ও 'কর্মক্ষেত্র' নাটকে স্থান পাইয়াছে। তাহার নাটকগুলি নানা সমস্যা, আদর্শবোধ ও সামাজিক কাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দ দাস ছাড়া বিশ শতকের প্রথমে মাত্র আর দুইজন নাট্যকারের নাটকে নূতন যুগ-চেতনার কিঞ্চিৎ প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু মুকুন্দদাসের রচনায় যে সাহসিকতার প্রত্যক্ষ ছাপ রহিয়াছে তাহাদের নাটকে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তী এই নাট্যকারদ্বয় হইলেন কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। কুঞ্জবিহারীর 'মাতৃপূজা' পৌরাণিক নাটক হইলেও ইহা

সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। ইহাতে ইংরেজ সরকার বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তাই নাটকটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় এবং নাট্যরচনার জন্য নাট্যকারের সঙ্গে কারাগৃহের পরিচয় ঘটে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ'—নামক ঐতিহাসিক নাটকেও স্বদেশীভাব স্থান পায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে লোকনাট্যকারগণ সাধারণভাবে সমকালীন আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হইতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে অনেক নাট্যকারের নাটকে স্বদেশ-প্রেম ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচারিত হইতে থাকে। তৎকাল হইতে সুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত এই দুইটি বিষয় বিভিন্ন পাল্লায় স্থান পাইয়া আসিতেছে। প্রসঙ্গত ভোলানাথ রায়ের 'পঞ্চনদ' (১৩২৫), 'দাক্ষিণাত্য' (১৩৩১), রামদুর্লভ কাব্যশাস্ত্রীর 'বাচস্পতি' (১৩২৫), পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'টিপু সুলতান', ব্রজেন্দ্র কুমার দের 'বাঙ্গালী' (১৯৪৮), সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মাটির মা' (১৩৫৫), বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মাটির প্রেম' (১৩৫৫), পূর্ণ চন্দ্র দাসের 'শৃঙ্খল মোচন' (১৩৫৭), নন্দগোপাল রায় চৌধুরীর 'আগুন' (১৩৬০), গৌরচন্দ্র ভড়ের 'কয়েদী' (১৩৬২), দেবেন্দ্রনাথ নাথের 'সাতভাই চম্পা' (১৩৬৯) এবং অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের মসনদ'-এর (১৩৭০) উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকনাট্য রাজনৈতিক বা অন্যান্য সাময়িক চেতনা দ্বারা সাধারণভাবে কিছু কিছু প্রভাবিত হইলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত লোকনাট্য মোটের উপর ধর্মের জয় ও ভক্তিভাব লইয়াই রচিত হইতেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে আঘাত-সংঘাত, অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়া পল্লীজীবনেও সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিমূলক চেতনা বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে মানুষের মনে বস্তুতান্ত্রিকতা যেমন প্রবল হইতে আরম্ভ করে তেমনি ভক্তিভাবও কমিতে থাকে। এই পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা। লোকনাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু এই পরিবর্তনের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করিতে সক্ষম হয় নাই। দেশে এবং সমাজে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে অধিকারী, ম্যানেজার ও দলের প্রধান অভিনেতার নির্দ্দেশে অতি সন্তর্পণে তাহা হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া রচিত পালায় নাট্যকারগণ ইহার পরিচয় দিয়াছেন মাত্র! এই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন

আন্দোলন, সামাজিক সমস্যা ও নানা সমসাময়িক ঘটনা দ্বারা কিছু কিছু প্রভাবিত হইয়া লোকনাট্য মন্থর গতিতে পথ পরিবর্তন করিতে থাকে।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় ব্রজেন্দ্র-কুমারের 'আকালের দেশ' (১৯৪৫) রচিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতেই মজুদদার মুনাফাখোর ও কালোবাজারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সব সমাজবিরোধীদের অসঙ্গত ক্রিয়া-কলাপ ও জমিদারের অত্যাচারের সঙ্গে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পরিচয় পাওয়া যায় কানাইলাল শীলের 'দেশের দাবী' নাটকে (১৩৫৬)। বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বেইমান' (১৩৫৭) পালায় খাদ্যাভাব, প্রজাপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'মানুষ' (১৩৫৪) জাতিভেদ সমস্যা এবং আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৃথ্বীরাজ' (১৯৪৯) বিধবা বিবাহ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত। সৌরীন্দ্র মোহনের 'রক্তবীজ' (১৩৫৮) পৌরাণিক নাটক হইলেও ইহাতে যুদ্ধোত্তরকালীন ধনি-দরিদ্র শ্রেণীসংঘাত-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'রঘু ডাকাত' (১৩৬১) নাটকে ধনিক শ্রেণীর শোষণের সক্রিয় প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় শ্রেণী সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর 'শহীদবীর' (১৩৬৪), বিনয়কৃষ্ণের 'ভুলের কাজল' (১৩৭০) প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'রিক্তানদীর বাঁধ' (১৩৭১) নাটকে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দেশবিভাগের কাহিনী অবলম্বন করিয়া জিতেন্দ্রনাথ বসাক 'রক্তের লেখা' (১৩৬২) নাটকখানি রচনা করেন। ভারতের দুই জননেতা, অহিংস আন্দোলনের পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী এবং পুরুষকার ও বীরত্বের পূজারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালীর জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে জনমনে তাঁহাদের আসন অটল রহিয়াছে। এই দুইজনকে অবলম্বন করিয়া যাত্রানাট্য রচিত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রকে লইয়া ব্রজেন্দ্রকুমার কর্তৃক 'মায়ের ডাক' (১৯৪৭) রচিত হইবার পরে নেতাজীকে লইয়া পূর্ণচন্দ্র দাস 'স্বপ্নসাধনা' (১৩৫৮) এবং জিতন্দ্রেনাথ বসাক 'বিদ্রোহী বাঙ্গালী' (১৩৫৮) লিখিয়াছেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ও তাহার অহিংস আন্দোলন অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রকুমার 'ধরার দেবতা' নাটকটি রচনা করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে যে ছোট ছোট সীমান্ত সংঘর্ষ চলিতেছিল জিতেন্দ্রনাথের 'ডাকিনীর চর' নাটকে (১৩৭১) তাহাই

রূপায়িত হইয়াছে। চৈনিক আক্রমণের পটভূমিকায়ও যাত্রানাট্য রচিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্র কুমারের 'রক্তের নেশা' (১৯৬৩) ইহার দৃষ্টান্ত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিংশ শতকের প্রথম হইতে বাংলা দেশে যে সমস্ত আন্দোলন সুরু হইয়া যায় তাহা নগর ও শহর জীবনে যেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে পল্লী জীবনে তেমনটি করিতে সক্ষম হয় নাই; সুতরাং লোকচিত্তে পূর্ব প্রচলিত ধর্ম ও ভক্তি ভাবই প্রাধান্য পাইতে থাকে। ফলে লোকনাট্য-কারগণও ঐ জাতীয় বিষয়বস্তু লইয়া প্রধানত দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত পালা রচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে থাকেন। এইভাবে রচিত এবং পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লিখিত বিশ শতকের লোকনাট্য ও নাট্যকারদের পরিচয় লওয়া যাইতেছে।

মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ (১২৪৯—১৩১৫)

ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রা অধিকারী মতিলাল ১৩০৯ সালে পুত্র ধর্মদাস রায়ের উপর দল পরিচালনার ভার দেন। চোখে ছানি পড়া ইহার প্রধান কারণ। এক চোখের ছানি কাটানো হয়। কিন্তু দৃষ্টি শক্তির অসুবিধার জন্য তিনি পূর্বের মত যথারীতি অভিনয় করা বন্ধ করেন। আসরে উপস্থিত থাকিলেও কদাচিৎ অভিনয় করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বরচিত লোকনাট্যে তিনি জনগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মতিলালের দলের বালক গায়ক গৌরচন্দ্র দাস বলেন, [1]"মতিবাবুর দলে আমাদের সময় দুটি হারমনিয়ম, চারটি বেহালা, তবলা, ঢোল, করতালি বাজান হত। কালো চোগাচাপকান পরা জুড়ি, কীর্তনাঙ্গগানের দোহার ও বালকগণ আসরের দু'দিকে ভাগ ভাগ হয়ে বসতেন; জুড়ির গানে আসর মাত হয়ে যেত। তৎকালীন ঢোলের বাজনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। বাদ্যকর ঢোলে মেঘ ডাকিয়ে ছাড়তেন। মতিবাবুর দলে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, 'অকালবোধন' পালায় আসরে দুর্গা প্রতিমা আনা হত। 'হরধনু ভঙ্গ' পালায় স্প্রীং লাগানো বিরাট ধনু ব্যবহার করা হত; ধনু ভাঙ্গার সময় তা থেকে কড় কড় শব্দ হত, মনে হত রামচন্দ্র সত্যই ধনু ভাঙছেন। 'রামের বনবাস' পালায় শৃঙ্গবের পুরে রাম লক্ষ্মণ সীতার গঙ্গা পার হইবার দৃশ্যে গুহক আসরে নৌকো নিয়ে আসত। নৌকোর ভিতর দিকে চাকা থাকত বলে আসরে নৌকো চলার effect সৃষ্টি হত। 'কর্ণবধ' পালায় আসরে রথ আনা হত। যাত্রাপালা অভিনয়ের সময় পূর্বে এ আমরা

১। গৌরচন্দ্র দাস—সত্যম্বর অপেরা দ্রষ্টব্য



চরিত্রাভিনয়ে —মুকুন্দদাস



মিল খাঁ—সুরেন মুখার্জি



লক্ষ্মণ—ফণী বিদ্যাবিনোদ



সিরাজ—ফণী মতিলাল



রাজা— প্রভাত বসু



রুদ্রশক্তি— বিনোদ ধাড়া (গায়ক)



মতি রায়—নাট্যকার



হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—নাট্যকার



অঘোর কাব্যতীর্থ—নাট্যকার



ভোলানাথ রায়—নাট্যকার



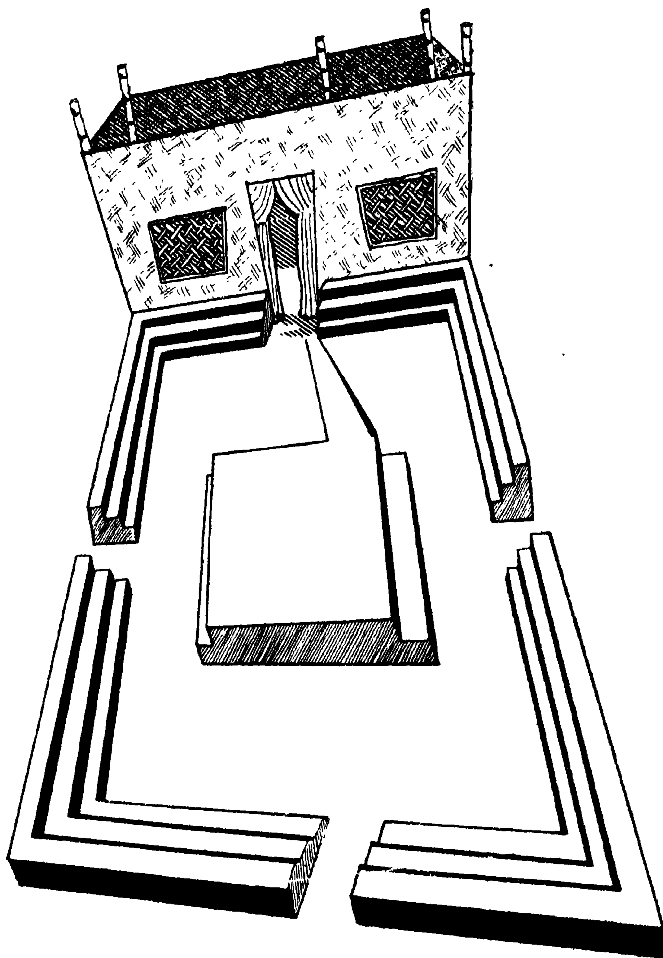
ফণী বিদ্যাবিনোদ নাট্যকার



ব্রজেন্দ্র দে—নাট্যকার



পুরুলিয়া-গড়জয়পুরে—'ভাদুরার দ্বিরাগমন' পালার আসর



১৮' × ১৪' (অথবা ১৮'
পেশাদার লোকনাট্যাভিনয়ের আসর. রঙ্গস্থল হইতে ১½ ফুট নীচু ও ৩ ফুট চওড়া
দুইদিকে যন্ত্রীদের বসিবার স্থান রঙ্গস্থল
চারিদিকে দর্শকদের বসিবার জন্য গ্যালারি। গ্যালারি ও রঙ্গস্থলের
মাঝে চারদিকে চেয়ার বা শতরঞ্চি পাতিবার জায়গা।
মুক্ত রঙ্গস্থল হইতে প্রবেশ প্রস্থানের একটি পথ
সাজঘর পর্যন্ত গিয়াছে। সমগ্র মণ্ডপের
উপর শামিয়ানা দেওয়া হয়।

কখনো দেখি নি। গাওনার সময় মতিবাবুর বক্তৃতার খুব কদর ছিল। ভক্তিরসের অভিনয়ে তাঁর জুড়ি ছিল না। নারদ, ভীষ্ম, শ্রীধর, বিভীষণ তাঁর উল্লেখযোগ্য চরিত্রাভিনয়। শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় তিনি দল পরিচালনার ভার দেন পুত্র ধর্মদাস রায়ের উপর, কিন্তু মাঝে মাঝে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। মৃত্যুর চার পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি কাশীধামে গেলেন। সেখানে সন্ন্যাসরোগে তিনি ১৩১৫ সালে দেহরক্ষা করেন।"

নবদ্বীপে পোড়ামার তলায় প্রতিবৎসর রাম রাজার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজার ব্যবস্থা হইত। পূজা উপলক্ষে নিজ ব্যয়ে তিনি নবদ্বীপের সেই [1]"পোড়ামার তলায় রামের দেশাগমন বা রামরাজা পালার" গাওনা করিতেন। সংগীত রচনায় তাহার খুব কৃতিত্ব ছিল। তাহার পালায় প্রথমেই মূল বিষয়টি একটি গানে ব্যক্ত করা হইত। উদাহরণ স্বরূপ 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ' (১৮৯৭) নাটকের প্রথম গীতিটি উদ্ধৃত হইল,—

ভবে যে ভাবে যে ভাবে, ভব বান্ধবে।
আছে সর্বত্রে এই প্রচার, শত্রুতা মিত্রতা আচার,
না করে বিচার, কেবল স্মরণে চরণে স্থান দেন সবে॥
কেহ তাঁয় পায় মিত্রতায়, কেহ বা স্নেহ মমতায়,
কেহ সখ্য তায়,—কেহ তাঁয় পায় শত্রুতায়,
যে কোন ভাবোন্মত্ততায়, ভাবলেই মোক্ষ পায়,
শুন গয়াসুর কি ভাবে সে পদলভে॥

নাট্যকার সংগীত রচনায় নানা প্রকারের অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া গীতিকথায় মধুর ঝঙ্কার সৃষ্টি করিতেন। মতিলাল পালা রচনা করিয়া অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্তরত্ন দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইতেন। এই সম্পর্কে 'রাম রাজা গীতাভিনয়ের' বিজ্ঞাপনাংশে তিনি বলিয়াছেন "আমার সকল গীতাভিনয়গুলিই ফরিদপুর জেলান্তর্গত হাসামদিয়া গ্রামনিবাসী, সম্প্রতি যিনি কলিকাতার কম্বুলিটোলা ১৫ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে থাকিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যবসা করিতেছেন সেই জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয় সংশোধন করিয়াছেন।" তৎকালে [2]যাত্রায় পালা চুরি করিবার ব্যবস্থা হইত। যাত্রার

১। বিশ্বকোষ ১৩০৯। ২। "কোন কোন ব্যক্তি সাধু বেশে আমার দলে প্রবেশ করিয়া স্বার্থসাধন কাল পর্যন্ত বিশেষ আনুগত্য স্বীকার করে, পরে মদ্রচিত গীতাভিনয়ের কিয়দংশ অভ্যাস ও কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া অন্য যাত্রা দলভুক্ত হইয়া তথায় কিঞ্চিদর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন।" রামরাজা গীতাভিনয়ের বিজ্ঞাপন অংশ

দলপতিরা এই জন্য চতুর লোক নিয়োগ করিতেন। তাহারা কিছু মুখস্থ করিয়া, কিছু লিখিয়া পালা চুরি করিতেন। কিন্তু চুরি দ্বারা পালার আদ্যন্ত লইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। কাজেই যে সব জায়গায় ফাঁক থাকিত নিজেদের রচনা বা অন্যের রচনা দ্বারা তাহা ভরিয়া তুলিতে হইত। বিভিন্ন হাতের রচনা বলিয়া ইহা দ্বারা রচনা সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইত না। মতিলাল রায়ের পালা চুরি হইত বলিয়া তিনি পালা ছাপিবার ব্যবস্থা করেন। মতিলাল সকল প্রকার যাত্রাভিনয় করিতেন। যাত্রায় গীতাভিনয় প্রচারকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। মতিলাল দেবশর্মা (রায় উপাধি) তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত পালাগুলি ছাড়াও 'যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক' (১৯০০), 'রাবণ বধ', 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ' (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) প্রভৃতি পালায় অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রচনা নৈপুণ্যের জন্য [১]তিনি ভট্টপল্লী হইতে 'কাব্য কণ্ঠ', নবদ্বীপ হইতে 'কবিরত্ন', মানকর হইতে 'কবিভূষণ' ও নবদ্বীপ রাজার নিকট হইতে 'রচনা-কুশল' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু 'গয়াসুরের হরিপাদ পদ্ম লাভ' নাটক হইতে মনে হয় যে তিনি 'কাব্য কণ্ঠ' উপাধিটি ব্যবহার করিতেন। স্বরচিত পালা গান গাহিয়া মতিলাল সমগ্র বাংলা দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। [২]প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে মতিলাল নারদ, মুনি-ঋষি ও ভক্তিমূলক চরিত্রেই সুঅভিনয় করিতেন এবং অভিনয় কালে নানা সুযোগে বক্তৃতার অবতারণা করিতেন। তাহার বাচন-ভঙ্গি ও ভাবাবেগযুক্ত বক্তৃতায় হাজার হাজার শ্রোতা মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। মতিলালের পালার বয়স্ক পুরুষের গান বয়স্ক ওস্তাদ জুড়ি ও বয়স্ক দোহাররা পরিবেশন করিতেন এবং নারী চরিত্রের গান কম বয়সের পুরুষ বা কখনো বালক ও বালক দোহার কর্তৃক গীত হইত।

রামরাজা (১৩১১, ২য় সংস্করণ)—মতিলালের নিজদলে অভিনীত আট অঙ্কের পৌরাণিক নাটক। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী ইহার অঙ্কগুলি দৃশ্যে বিভক্ত হয় নাই। নাটকে গানের সংখ্যা চল্লিশের উপর। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমান, গুহক, বিভীষণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা প্রমুখের জন্য জুড়ির গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল গানে প্রচলিত রাগরাগিনীর সুর আরোপিত হইত; কখনো মনোহরশাহী ঢঙের সুর আবার কখনো বা

১। গয়াসুরের হরিপাদ পদ্ম লাভ গীতাভিনয়ের পরিচয় পত্র। ২। সূর্যকুমার দত্ত—নট কোম্পানী ও হাস্তরসাভিনয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য, নারায়ণ চন্দ্র দত্ত—বাঁশী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

কীর্তনাঙ্গ সুর ইহাতে সংযোজিত হইত। এখানে আখরযুক্ত একটি কীর্তনাঙ্গ সুরের জুড়ির গান উদ্ধার করা যাইতেছে,—

সরমা—রাম সীতাকে লয়ে অযোধ্যায় যাও যাও আমার তরণী আমাকে দিয়ে যাও, সে তোমার বড় ভক্ত বলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, দেও তরণীকে দেও, দুঃখিনীর হৃদয়ের একমাত্র রতন সেই তরণীকে দেও, না দিলে, ছাড়ব না (সীতার প্রতি) মা! আমাকে ছেড়ে দেওত, দেখি তরণীকে দেন কিনা,

(সীতার হস্ত পরিত্যাগ পূর্বক দ্রুতবেগে রামপদ ধারণ করিয়া)

রাম! রাম! রাম! আমার তরণী দেও

গীত

ছাড়ব না তোমাকে রাম, দেওহে আমায় তরণী।
শুনেছি হে পতির মুখে রাম তোমার পদ তরণী,
দেও দেও আমায় ঐ তরণী, আমি পার হব হে বৈতরণী।
সকল আপদের বল, তরণী আমার কেবল,
এ তরণী সেই সম্বল, জেনেছি হে রঘুমণি;
(আমার আর নাই, আর নাই, তরণী হারা আমার আর নাই, আর নাই)
বুকে যেমন রাখতাম আমি তরণীকে দিবারজনী,
(তেমনি ঠিক তেমনি করে বড় যতনের ধন তেমনি করে)
বুকে রাখব তরণীখানি (মোলেও সঙ্গে যাবে) বুকে রাখবো তরণী খানি।
ভবপারে যাব বলে, তরণী ভাসিল জলে,
এভব কল্লোলে তারে কে দিলে বলহে শুনি,
(কে কর্ণধার হল তার, যদি রাম হেথা, কে কর্ণধার হল তার)
দেখিয়ে তরঙ্গ রঙ্গ আতঙ্ক মনেতে গণি,
(শোন শোন বলে কে বলছে আমায়, ডেকে ডেকে যেন কে বলছে আমায়)
এখনও, তোমরা তর নি,
(তরণী গেলে আর তরবে কখন)
এখনও তোমরা তর নি।

নাট্যারম্ভের পূর্বে একখানি গানে নাটকের মূল বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইহা অনেকটা নাটকের প্রস্তাবনার কাজ করিয়াছে। গানটি উদ্ধৃত হইল,—

গীত

চিরকাল কি থাকে সমান সুখ দুঃখ দ্বয়।
সুখের পরে দুঃখ, দুঃখের পরে সুখোদয়।
কালের গতিকে করে লয়,
দশরথের ব্রহ্ম তনয়, সামান্য ত নয়;
বনে যান রাম লক্ষ্মণ উভয়,
পরে সেই রাম রাজার জয়।

এই গানের পরেই নাট্যারম্ভ—প্রথম অঙ্ক ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রের প্রবেশ। লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষার পরে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান ও বিভীষণসহ পুষ্পক রথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহারা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিবার পরে শৃঙ্গবের পুরস্থ রামমিতা গুহকের সঙ্গে তাহাদের মিলন ঘটে। ইহার পরে নন্দীপুরে অপেক্ষমান ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার সঙ্গে রামচন্দ্র সঙ্গিগণসহ অযোধ্যায় ফিরিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। এই কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে। ঘটনা সংস্থাপনে নাটকীয় বৈচিত্র্য, গতি, ঔৎসুক্য বা দ্বন্দ্ব সংঘাতময় চরিত্র সৃষ্টির প্রতি নাট্যকারের লক্ষ্য নাই। রাবণ দেবগণকে বন্দী করিয়া বিভিন্ন কর্মে নিয়োগ করেন। এই অবস্থায় রজকের কাজ করিয়া শনি খুবই কষ্ট ভোগ করিয়াছেন—"এখনও সুষুপ্তি হয় না, নিদ্রাকর্ষণ হলেই স্বপ্নদর্শন, যেন রামহুস্ রামহুস্ করে কাপড়ই কাচ্চি।" (শনি—১ম অঙ্ক)। সুতরাং রাবণের মৃত্যুতে দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্তির জন্য শনি অত্যন্ত আনন্দিত। শনি চরিত্র নাটকে হাস্যরসেরও যোগান দিয়াছে। শনির শুকনো কাঠে রসের সন্ধান পাইবার জন্য নাট্যকার তাহাকে বেদানার সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন,—"বেদানা, বাইরে শুকনো, কিন্তু ভিতরে মোটা মোটা দানা দানা" (শনি—১ম অঙ্ক)। হনুমানের অগাধ সীতা-ভক্তি। সতী সীতার অগ্নিপরীক্ষা দানের জন্য হনুমান রামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত,—"আজ পৃথিবীকে অরামা করব, পরে স্বয়ং অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করবো" (রামকে মারিতে উদ্যত, ২য় অঙ্ক)। পুত্রশোকাতুরা সরমা রামভক্তির প্রাবল্যে

পুত্র তরণীর অকালমৃত্যু-শোক-সংম্বরণ করিতে পারিয়াছেন। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি প্রবল। অযোধ্যায় রামের অবর্তমানে ভরত রাম-পাদুকা পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। চৌদ্দ বৎসর ছয়দিন অন্তে রামের স্বদেশে ফিরিবার কথা। যথা সময় রাম না আসিলে ভরত চিতা প্রস্তুত করিয়া অনলে দেহ বিসর্জন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু যথাসময় রামচন্দ্র নন্দীগ্রামে উপস্থিত হওয়ায় ভরত নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন। রামের প্রতি কৈকেয়ীর বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে ভরত শংকাহীন হইতে পারেন নাই বলিয়া—রাম-অভ্যর্থনায় কৈকেয়ীর যোগদান তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কৌশল্যার অনুগ্রহে রামের প্রতি স্নেহশীলা কৈকেয়ীর নন্দীগ্রামে আসা সম্ভব হয়। দশরথের মৃত্যু ও রাম বনবাসের পরে অনুতাপদগ্ধ কৈকেয়ীর মানসিক পরিবর্তন ঘটে,—

কৈকেয়ী—আমার মত পাপিনী আর কে আছে? রাম তুল্য পুত্রকে বনে দিলাম, পতিকে নাশ করলাম, সাতশত উনপঞ্চাশটি রমণীকে বৈধব্যানলে চিরকাল পোড়াতে লাগলাম। দিদিগো লোকে কি আমার মুখ দেখে? না কৈকেয়ীর নাম কেউ কর্ণে করে। (৬ষ্ঠ অঙ্ক)

এই মানসিক পরিবর্তনের জন্যই কৈকেয়ী নন্দী গ্রামে রাম লক্ষ্মণকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন,—

কৈকেয়ী—আমার রামের নাম দয়াময়। (রামের প্রতি) রাম! রাম! হতভাগিনীর কোলে আয়, (লক্ষ্মণের প্রতি) লক্ষ্মণ! তুই কি আসবি! আমি রামকে বনে দিয়েছিলাম বলে আমার প্রতি তোর বড়ই ক্রোধ আছে, এখন মার্জনা কর, একবার মা বলে কোলে আয়, আয়, দুইভায়ে মা মা বলে কোলে আয়। (৭ম অঙ্ক)

বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়, স্বদেশে রামের প্রত্যাবর্তনের পরে কৈকেয়ী সঙ্কোচে তাহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। রামচন্দ্র নিজেই তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে সঙ্কোচহীন করেন। কিন্তু মতিলাল কৈকেয়ী চরিত্র কিছুটা নূতন ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভক্ত বৎসল রাম চরিত্রে ভরতের প্রতি ভ্রাতৃবাৎসল্য প্রাধান্য পাইয়াছে; এই চরিত্রে করুণ ও রৌদ্র রসেরও অবতারণা করা হইয়াছে। নাটকে ভক্তি ও করুণ রসের বান ডাকিয়াছে। শনি চরিত্রে হাস্য, লক্ষ্মণ চরিত্রে বীর, হনুমানে রৌদ্র, গুহকে সখ্য ও কৈকেয়ীর চরিত্রে বাৎসল্য রসের প্রকাশ রহিয়াছে। সংলাপ রচনায় নাট্যকার কৃতিত্বের

পরিচয় দিতে পারেন নাই। এক স্থানে মিলিত হইয়া এক একটি মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য অনেক স্থলেই চরিত্রগুলির মুখ দিয়া নাট্যকার আলোচনাধর্মী দীর্ঘ সংলাপের অবতারণা করিয়াছেন। সংলাপের সাবলীল গতির প্রতি নাট্যকার দৃষ্টি দিতে পারেন নাই; ইহার ভাষাও সংস্কৃত ঘেঁষা। বুদ্ধির অধিপতি বৃহস্পতির একটি সংলাপ উদ্ধৃত করিয়া নাট্যকারের সংলাপ রচনার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

বৃহস্পতি—দেবরাজ! তুমি যেগুলি রাবণের দুষ্কার্য বলে জ্ঞান করেছ, আমি দেখছি, সেইগুলিই তার সৎকার্য; রাবণ কর্তৃক ব্রহ্মরক্ত গ্রহণ, সেই ব্রহ্মরক্ত না হলে কি সীতার জন্ম হত? মন্দোদরী বিষ বলে সেই রক্ত পান করাতেই তো সীতার জন্ম হয়। তোমরা কি জান না যে রাবণ বর গ্রহণ করেছিল, দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, নাগ কর্তৃক বিনষ্ট হবে না। নর আর পশু রাক্ষসের খাদ্য বলেই তাচ্ছিল্য করে তাদের নাম উল্লেখ করে নি, [১]সেহ জন্যইতো ভগবান নররূপে ও তোমরা বানরাদি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলে। রাবণ আরও বলেছিল যদি কখনো কন্যার প্রতি আমার রতি কামনা হয়, তা হলেই আমার মৃত্যু হবে, সেই কন্যা ব্যতীত আমার মৃত্যুর কারণ আর কেউ হবে না; লক্ষ্মীতো সেই জন্যই কন্যারূপে মন্দোদরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন, ব্রহ্মশোণিত পানজনিত মন্দোদরীর গর্ভ হলো; মন্দোদরী গোপনে কুরুক্ষেত্রে সেই গর্ভ ত্যাগ করে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করে রেখে আসে, পরে কৃষকের লাঙ্গল চালনার সময় মৃত্তিকা হতে সেই কন্যা উত্থিতা হল বলে তার নাম হল সীতা। লোকে বলে সীতা পৃথিবীর কন্যা, জনকরাজ পালন করেছিলেন বলে তিনি তাঁর পিতা হলেন। মূল ধরতে হলে, সীতার মাতার নাম মন্দোদরী ও রাবণ সীতার পিতা। সব ভগবানের চক্র; এতে তোমরা দোষী, না রাবণ দোষী? দেবগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিল বলছো, কিন্তু বল দেখি কাউকে কি পদচ্যুত হতে হয়েছিল? যিনি যে কার্যের ভার গ্রহণ করে আছেন রাবণ তাকে সেই কার্যের ভারই দিয়েছিল, সূর্যকে হীনবীর্যে উদয় হতে হয়েছিল, তীক্ষ্ণকরে জ্বালাতন করতেন, তই বলেছিল, বীর্য সম্বরণ করে নিত্য নিত্য যাতায়াত কর। কই সূর্যকে কি বলেছিল, তুমি আর উদয় হতে পাবে

১। নররূপে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ।
বানর রূপেতে জন্ম নিল দেবগণ॥ বানরগণের জন্মবিবরণ, আদিকাণ্ড, কৃত্তিবাসী রামায়ণ

না, নিয়ত আমার লঙ্কা মধ্যে গুপ্ত হয়ে থাকতে হবে? চন্দ্রকে নিয়ত পূর্ণাংশে উদয় হতে হয়েছিল, বেস ত, কোন পক্ষে বর্ধিত কোন পক্ষে হ্রাসতা প্রাপ্ত হন, সেটি তো তাঁর কষ্ট; তবে বলবে পূর্ণভাবে উদয় হলে রাহু তাকে গ্রাস করবে এই ভয়, তা রাবণের দর্পে চণ্ডাল কি চন্দ্রকে স্পর্শ করতে পেরেছিল? চন্দ্র সূর্যের সে তো সুখের কারণই হয়েছিল। শমনকে অশ্বশালায় নিযুক্ত ও শণিকে রজক করেছিল; তাতেও অধিকার নষ্ট হয় নাই। রাবণ যে শমনকে অশ্বপাল করেছিল, সেটা নূতন নয়, চিরকালই শমন অশ্বপালক, কেননা অশ্বের নাম একটি তুরঙ্গ, মনের নাম একটি তুরঙ্গ, মনকে শমন চিরকালই শাসন করে; রাবণের মনের ভাব এই, অশ্বের যেমন বিবিধ গতি, মনের তদ্রূপ গতি সর্বদা থাকে, শমনের কার্য দেখলেই মনকে প্রবোধ দিবে যে, মন! দেখ, অশ্ব কুপথে গেলেই যেমন শমন তাকে শাসন করছে, তেমনি তুমিও কুপথে গেলে ঐ শমন কর্তৃক দণ্ডিত হবে, সাবধান যেন কুপথে গমন কর না! তুরঙ্গের শাসন কর্তাই শমন, সেই জন্য রাবণ শমনকে তুরঙ্গপাল পদে নিযুক্ত করেছিল, রাবণের যদি শমনকে পদ্যচুত করবার বাসনাই থাকতো, তাহলে কি তাকে অন্য পশুপাল করতে পারতো না? রাবণের তুল্য জ্ঞানী কি আর দ্বিতীয় ছিল? শণিকে রজকের কার্যে নিযুক্ত করেছিল। শণিতো চিরকালই সেই কার্য করছেন, যেখানে মল সেইখানেই শনির দৃষ্টি, যতক্ষণ মল থাকে, ততক্ষণ শনির দৃষ্টি যায় না, মলা পরিষ্কার করতে শনি ভিন্ন কেউ নাই, কারণ সে সামান্য বস্ত্রের মলা পরিষ্কার করতে শনিকে নিযুক্ত করেছিল তা নয়, দেহরূপ যন্ত্রের মলা পরিষ্কার করাই তার উদ্দেশ্য। পণ্ডিতগণ বলেন, লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করেন, জীবাত্মাও তেমনি জরাগ্রস্ত দেহ ত্যাগ করে নব-কলেবরে গমণ করেন, তাতেই জীবাত্মার বস্ত্র দেহ; বাস কেবল মলাতেই জীর্ণ হয়, তবে যে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের মলা পরিষ্কার করায় তার বস্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয়, তেমনি দেহের মলা পাপ, সেই পাপ সঙ্গে সঙ্গে দূর করতে পারলেই দেহ বহুদিবস স্থায়ী হয়, তবে দেহের মলা শীঘ্র দূর করতে শনি ভিন্ন আর কে আছে? সেইজন্য শনিকে পূর্ব পদেই রেখেছিল, এতে রাবণের প্রতি দোষারোপ করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। দেবকন্যাগণকে হরণ করেছিল, কিন্তু বল দেখি—কোন কন্যাকে পতিবিযুক্তা করে বলপূর্বক হরণ করেছিল কি? যত অবিবাহিতা কন্যাকে সে নিয়ে গিয়েছিল; পত্নী করায় কি দেবকন্যাগণ রাবণের প্রতি বিরক্তা ছিল? তার প্রমাণ দেখতে চাও, একবার লঙ্কায় গমন

করে দেখগে, রাবণ বিরহে তারা কত কাতরা, রাবণ রাজধর্মানুসারে কন্যাগণকে গ্রহণ করে বিবাহ করেছিল, এতে তার অপরাধ কি? ধরতে হলে রাবণ অপেক্ষা তোমরা দুষ্ক্রিয়াশীল। সীতাকে হরণ করেছিল বলছ, সেকি দুষ্টাভিপ্রায়ে? যদি কোন কুবাসনাতেই হতো তা হলে আর সীতাকে চেটি সঙ্গে অশোক কানন মধ্যে রাখতো না। যদি বল নল কুবেরের শাপ ছিল যে বলপূর্বক কোন রমণীর সতীত্ব নষ্ট করলে সেও নষ্ট হবে; তা মদন-পীড়িত ব্যক্তির কি মরণ বাঁচন জ্ঞান থাকে? যদি জ্ঞানই থাকবে, তাহলে আর সুন্দ উপসুন্দ তিলোত্তমাকে দেখে উভয়ে দ্বন্দ্ব করে নিপাত হত না, ব্রহ্মার মুণ্ডপাতও হত না। দেবরাজ! সৌভাগ্যের বিষয় একবার পর্যালোচনা করে দেখ দেখি, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে সে আজ্ঞানুবর্তী করে রেখেছিল, অথচ কাউকে পদচ্যুত করে নাই। শুম্ভ নিশুম্ভের ভয়ে তোমাদিগকে স্থান ভ্রষ্ট হয়ে লুক্কায়িত হতে হয়েছিল, আর রাবণ হতে তোমরা একদিনের জন্যও সে কষ্ট পাও নাই। যার এত সদ্‌গুণ, তাকেও আবার নিন্দা কর। দেবরাজ! আমি দিব্য চক্ষে দেখছি যে, সে রাবণ সামান্য নয়।

গীত

সামান্য নহে সে রাবণ।
সুখী আজীবন, যারে উদ্ধারিবার জন্য অবতীর্ণ পতিত পাবন॥
করেছিল সীতাহরণ, সে তো নহে অন্য কারণ,
পবিত্র করেছে সে যে পাপ লঙ্কা ভবন॥
সে রাবণের মরণ, একবার কর দেখি স্মরণ,
ধনুর্বাণ করে ধারণ সম্মুখে রাম নীরদবরণ,
দেখতে দেখতে হরির চরণ ত্যেজেছিল জীবন॥

(১ম অঙ্ক)

সীতার জন্মবিষয়ে মন্দোদরীর ব্রহ্মশোণিত পান, রাবণের অজ্ঞাতে কুরুক্ষেত্রের মৃত্তিকায় গর্ভপ্রোথিতকরণ, প্রভৃতিতে কল্পনার অভিনবত্ব রহিয়াছে।

[১]অদ্ভুত রামায়ণ হইতে সীতার জন্ম বৃত্তান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। বাল্মীকি [২]রামায়ণের সীতার উৎপত্তি মিথিলার কর্ষিত ভূমি হইতে।

এই প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের বক্তব্যও স্মরণযোগ্য,—

[৩]সাত বছরের রাম অযোধ্যা নগরে।
লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে॥
চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি।
মিথিলা হইল আলো পরম সুন্দরী॥

দ্বিতীয় অঙ্কে মহাদেব ও রামচন্দ্রের পারস্পরিক প্রণাম করণে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার, এবং অগ্নি ও মহাদেব কর্তৃক রামের স্তব নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিম্নে স্তবের নমুনা স্বরূপ অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল,—

ক। জয় রাঘব রাবণ অন্তকর, তব জীবন পাবন ধ্বান্ত-হর।
সুর সংকট তারণ কারণ হে, খর-দূষণ-নাশন বামন হে॥

* *

নর-কেশরী বিগ্রহ সত্যযুগে, সুর শৈবলিনী তব পাদযুগে।
প্রভু সম্প্রতি মৈথিলপুত্রী লয়ে অতি দুর্মতি তারয় কাল ভয়ে॥

খ। ত্বাং নমামি নাথ রাম বিশ্বসৃষ্টি কারণং
জ্ঞান বীর্য শান্তি ধৈর্য আদি ধর্ম ভাজনং।
চন্দ্র সূর্য বায়ু ইন্দ্র আদিদেব পূজিতং
নারদাদি বেদবাদি শুদ্ধ চিত্ত চিন্তিতং॥

* *

রক্ষ তুণ্ড খণ্ড খণ্ড কারী ঘোর তারকং
পূজয়াম চিন্তয়াম তং রঘুং প্রণীরকং॥

১। যথা সা শোণিতোদ্ভূতা রাক্ষসী গর্ভসম্ভবা। যথা ভূমিতলোৎপন্না জানকীচ যথা হি সা। সীতা তৎশৃণু বিপ্রেন্দ্র বর্ণয়ামি তবানঘ॥ ১, ৮ম সর্গ, অদ্ভুত রামায়ণ, বাল্মীকি।

২। অথমে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদ্‌ত্থিতা ততঃ॥ ১৩
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সাতু ব্যবর্দ্ধিতা মমাত্মজা॥১৪, ৬৬ অধ্যায়, বালকাণ্ড, বাল্মীকি রামায়ণ।

৩। আদিকাণ্ড, সীতার বিবাহ-পণ জন্য হরধনু দেওন বিবরণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

স্তব দ্বয়ের ছন্দের ঝঙ্কারে শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আন্দোলিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইত। ইহাতে আকাশবাণীও সন্নিবেশিত হইয়াছে,—

ভরদ্বাজ—মা অন্নপূর্ণাকেত ডাকলেম, দীনতারিণী দীনের প্রতি কৃপা করবেন কি? (আকাশবাণী—'চিন্তা নাই যাচ্চি')

ভরদ্বাজ—(সচকিতে) ও কে বললে 'চিন্তা নাই যাচ্চি'? মা যখন বলছেন, চিন্তা নাই তখন আর চিন্তা কি? (সকলের প্রতি) আসুন আপনারা সকলেই আসুন, যথাশক্তি স্থান প্রদান করিগে আসুন। (৩য় অঙ্ক)

গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ—এই নাটকে (১৩০৩) মতিলালের নাট্যরচনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া এখানে সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করা যাইতেছে। এই গীতাভিনয়টি ত্রয়োদশ অংকে বিভক্ত। ষষ্ঠ অংক ছাড়া বাকি অংকগুলি এক একটি দৃশ্যে সমাপ্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ অংক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; প্রথম অংশ ষষ্ঠ অংক নামে চিহ্নিত এবং দ্বিতীয় অংশ প্রথম গর্ভাঙ্ক নামে সূচিত হইয়াছে। সাধারণ নিয়ম অনুসৃত হইলে ষষ্ঠ অংক প্রথম গর্ভাঙ্ক এবং ষষ্ঠ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক এইরূপে চিহ্নিত হইত। কিন্তু নাট্যকার এই রীতি অবলম্বন করেন নাই। নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ। জুড়ির গান ছাড়া হরিভক্ত বালকদের জন্য 'গণের গান' ও শিশু গয়াসুরের জন্য 'একানে বালকের' গান নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। গণের গানটি মাঝে মাঝে সংলাপ দ্বারা খণ্ডিত। নাট্যারম্ভের পূর্বে অন্যান্য নাটকের মত এই নাটকের মূল বক্তব্যও একটি গানে পরিবেশিত হইয়াছে। বায়ু পুরাণ, গরুড় পুরাণ এবং গয়া অঞ্চলে প্রচলিত গল্প অবলম্বনে নাট্য কাহিনী রচিত হইয়াছে। দৈত্যরাজ ত্রিপুরাসুরের পুত্র মাতৃভক্ত গয়াসুরের হরি-সাধনা, পিতার নষ্ট-রাজ্যোদ্ধার এবং অন্তিমে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ নাটকের মূল বিষয়বস্তু। ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) নাট্যকার ইহাকে "মাহাত্ম্য গয়াসুরের চরিত্র বর্ণনরূপ গ্রন্থ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মাতৃভক্ত, হরিসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরোপকারী, প্রশাসক বীর বা দৈত্যপতি গয় চরিত্রে ভক্তিরসের সঙ্গে বীর ও করুণ রসের সমাবেশ হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসন চ্যুতির ভয়ে গয়ের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চক্রান্ত করিয়া হীন-মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার জন্য তাহাকেও পরিণামে শ্রীহীন হইয়া শাস্তিভোগ করিতে হয়। ইন্দ্রের চক্রান্তের সহায়ক শনিচরিত্রে হাস্যরসের

অবতারণা করা হইয়াছে। এই হাস্যরস কোন কোন স্থানে শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। শনি ও মঙ্গল চরিত্রে ঐক্যই যে প্রকৃত বল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র নারদ প্রকৃতজ্ঞানী, উদার দৃষ্টি সম্পন্ন এবং একান্ত হরিভক্ত। "আমি ব্রহ্মার পুত্র, কলহ উপস্থিত হলেই লোকে 'নারদ নারদ' বলে, অর্থাৎ আমি যে কলহপ্রিয় এটাই সাধারণের বিশ্বাস" (নারদের উক্তি—প্রথম অংক)—এই প্রচলিত ধারণা লইয়া নারদ চরিত্রটি খেলো করা হয় নাই। লক্ষ্মী চরিত্রে মর্তের নারী জনোচিত স্নেহার্দ্র-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরাসুর মহিষী প্রভাবতী চরিত্রে ভক্তি ও বাৎসাল্যভাব প্রাধান্য পাইয়াছে। নাটকের সংলাপ রচনায় নাটকীয় সংক্ষিপ্ততা ও গতিশীলতা রক্ষিত হয় নাই ; উপমা ও বিশ্লেষণেরজন্য অনেক স্থলে সংলাপের গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে আবার সঙ্গীত যুক্ত হওয়ায় এই মন্থরতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নাটকখানি ভক্তি ও করুণ রসপ্রধান।

রাবণবধ—গীতাভিনয় (১৩১৩)—এই পৌরাণিক নাটকখানি তেরটি দৃশ্যে বিভক্ত। ইহার প্রস্তাবনা গীতে নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে,—

বিশ্রবার পুত্র রাবণ, করিল জানকী হরণ,
কি কদাচরণ—শেষে মোক্ষফল প্রাপ্তি
সেই রাবণ বধ কর শ্রবণ।

নাটকের গীতিসংখ্যা পঞ্চান্নর অধিক। অঙ্গদ, হনুমান, রাবণ, বিভীষণ, রাম, লক্ষ্মণ প্রমুখের জন্য 'উক্তি গীতি' নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নাটকের সংলাপ রচনায় কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে নাটকে দীর্ঘ সংলাপ সংযোজিত হইলেও খুব ছোট ছোট সংলাপ ব্যবহারের দৃষ্টান্তও এই নাটকে রহিয়াছে। রাবণ ও হনুমানের ছোট ছোট সংলাপ লইয়া পয়ারের এক একটি Couplet রচিত হইয়াছে,—

রাবণ—বল দেখি এ নদের কই দুই কূল?
হনুমান—এক দিকে রক্ষকুল, অন্য সূর্যকুল।
রাবণ – নদ হলে বল দেখি বারি কই তার?
হনুমান—রক্ত যত জল হবে বেগ খরধার।
রাবণ—উঠিবে তোদের তাতে আনন্দ-তরঙ্গ?
হনুমান—রক্ষকুল দিকে দুঃখ তরঙ্গের রঙ্গ।

রাবণ—এক নদী দুই ভাব কথনো কি হয় ?
হনুমান—এক দিকে কূল ভাঙ্গে দুই দিকে নয়।
রাবণ—এ নদের কোন কূল অঙ্গ ভঙ্গ হবে ?
হনুমান—ভেঙ্গে যাবে রক্ষকুল মূল নাহি রবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মতিলাল 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ' পালায়ও ছড়া জাতীয় উক্তিপ্রত্যুক্তি মূলক বাগ্‌যুদ্ধ-সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন,—

যৌবনাশ্ব—আর কি বাসনা আছে করিতে সমর।
বৃষকেতু—এখনি নাশিব তোরে শোনরে পামর॥
যৌবনাশ্ব—কর্ণপুত্র বলে কি এতই গুমর।
বৃষকেতু—কেবল কথায় নয় দেখ কার্য মোর॥
যৌবনাশ্ব—কাঠ কাটে বল্লে লোহা ভেদিবে ভ্রমর।
বৃষকেতু—কৃষ্ণ বলে বজ্রভেদী ত্রাসিত অমর॥
যৌবনাশ্ব—কাঁচা মাসে বৃষকেতু গড়েছে কুমোর।
বৃষকেতু—তোরে ছেদি দেখাইব বাণের গুমর॥

রাবণ নীতি শাস্ত্র কুশল ও পরম তত্ত্বজ্ঞানী। তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া সত্বর বৈকুণ্ঠে গমন করিতে চাহেন। সেই জন্যই সীতা-হরণ করিয়া তিনি শমন দমন রামের লঙ্কাগমনের ব্যবস্থা করেন। রাবণের অন্তরে ফল্গু ধারার মত ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। তাই সীতাকে অবলম্বন করিয়া রাবণ ভক্তিপ্রেম সাগরে সন্তরণ করিয়া জীবন জ্বালার অবসান ঘটাইতে চাহেন। এই জন্যই তিনি কাহারো অনুরোধে সীতাকে মুক্তি দিতে রাজী হইতে পারেন নাই—

সীতায় কেমনে করি পরিহার।
সে আমার এ হৃদয়ের হার॥
সীতা মোর ধ্যান জ্ঞান, সীতা যে আমার প্রাণ,
সে যে হৃদয়ে সদা করিছে বিহার॥
যে সীতা থাকে অশোক বনে, পড়ে মমতায় ত্যজিতে কি তায়
পারি জীবনে ; কবে বা এ ভবনে, আনন্দ দিয়ে রাবণে,
সীতা করিবে আমার সন্তাপ-সংহার॥
আমি করেছি যে কারণ, রামের জানকী হরণ, হয় নাই সে সাধ পূরণ,

চাই না অন্য জন, বস্ত্র আভরণ, সীতার প্রেম সাগর মাঝে করি সন্তরণ,
আশা নহে সম্বরণ, শুনব না কারো বারণ দেখি পাই কিনা সে প্রেম
করতে ব্যবহার ॥ (৩য় দৃশ্য)

শেষ দৃশ্যে রাবণের উক্তি গীতে শুনা যায়,—

জীবনান্তে সীতাকান্তের পদপ্রান্তে যেন স্থান পাই।
আমার জানতে সাধ আর কিছুই নাই
আমার অন্তের কথা শুনতে হবে
তৃণ দন্তে করে ভিক্ষা চাই ॥ (১৮শ দৃশ্য)

এই নাটকেও করুণ-ভক্তি রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

উনবিংশ ও বিংশ শতকে মতিলাল রায় বহু সংখ্যক যাত্রাপালা আসরে প্রয়োগ করেন। মতিরায় পরিবেশিত অধিকাংশ আসর-নাট্যই সাফল্য মণ্ডিত হয়। ইহাদের কয়েকটির বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'সীতা হরণ গীতাভিনয়' (প্রকাশ-১২৯৯) -- এই পঞ্চাঙ্ক পালাটি ভক্তি ও করুণ রস প্রধান রচনা। দৃশ্য-অঙ্ক বিভাগহীন 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ গীতাভিনয়ে' (প্রকাশ-১২৮৮) ভক্তিরসের সঙ্গে করুণ, বীর, বীভৎস ও হাস্যরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। 'বিজয়চণ্ডী গীতাভিনয়' (প্রকাশ-১২৮৭) হরিনাথ রজুমদারের 'বিজয়বসন্ত' কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ভক্তি ও ধর্মশিক্ষা মূলক 'পাণ্ডব নির্বাসন গীতাভিনয়টি' (প্রকাশ-১২৯৪) নয় অংকে বিভক্ত। ছয় অংকে বিভক্ত 'ভারতাগমন গীতাভিনয়' (প্রকাশ-১২৯৫) ভক্তি-করুণ রসপ্রধান রচনা। চতুর্দশ অংকের 'ভীষ্মের শরশয্যা গীতাভিনয়' (প্রকাশ-১২৯৫) ভক্তি-করুণ রসাশ্রিত গীতি, বহু বিস্তৃত ঘটনা এবং চারিত্রিক মহত্ত্বে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। 'লক্ষ্মণ ভোজন গীতাভিনয়' (প্রকাশ-১২৯৯), ছয় অংকে বিভক্ত 'ব্রজলীলা গীতাভিনয়' (প্রকাশ ১৩০১), 'গয়াসুরের হরিপাদ পদ্মলাভ' (প্রকাশ ১৩০৩), নয় অংকে বিভক্ত 'যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক' (প্রকাশ ১৩০৭), 'কর্ণবধ' (তৃতীয় সংস্করণ ১৩১৬), দ্বাদশ দৃশ্যে বিভক্ত 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ' (প্রকাশ ১৩১৮), 'নিমাই সন্ন্যাস' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩১৩), ও 'শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য' (প্রকাশ ১৩০৯) গীতাভিনয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্যকে অংকে বিভাগ না করিয়া আটটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কথকতার ধরণের বক্তৃতা, পাঁচালির ঢং-এ ছড়া কাটিয়া উক্তি-প্রত্যুক্তি, গান,

দীর্ঘ সংলাপ, ধর্মোপদেশ, নীতি শিক্ষা এবং প্রধানত ভক্তি-করুণ রসের আশ্রয়ে মতিলাল মোটের উপরে অশ্লীলতা বর্জিত যাত্রাপালা রচনা করিয়াছেন। নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির তাগিদে ঘটনা সন্নিবেশ করিয়া ঘনীভূত নাট্যরস পরিবেশন করা তাহার পালা রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পালায় তিনি লিখিয়াছেন—

> হরি ভক্তি মহাফলা পরম সাধন
> হরিভক্তি ফলে হয় অসাধ্য সাধন।
> নিষ্কাম ভাবেতে যদি হরিভক্তি করে
> অপার সংসার সিন্ধু অনায়াসে তরে॥

টাইটেল পেজ-এর এই উক্তি কেবল এই নাটক সম্পর্কেই নহে, তাহার অন্যান্য পালা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

নিমাই সন্ন্যাস পালায় ক্রোধ, বিরাগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্রের মত গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলায় (১৮৮৪) ক্রোধ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকদ্বয় কৃষ্ণমিশ্রযতি প্রণীত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক হইতে এই প্রকার রূপক চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন বলিয়া মনে হয়। অথবা একজন অপর জনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও চৈতন্য বিষয়ক পালায় ইহার অবতারণা করিতে পারেন।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় গীতরত্ন (১২৬৮-১৩২০)

এই অধিকারী উনিশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম পর্যন্ত স্বরচিত ভক্তি মূলক কৃষ্ণ যাত্রায় গণচিত্তে আনন্দ পরিবেশন করেন। [১]"কৃষ্ণযাত্রায় তিনি বৃন্দার চরিত্র অভিনয় করতেন এবং সঙ্গীতে আসর মাতিয়ে দিতেন।" নীলকণ্ঠ [২]"সময় সময় গান গাহিতে গাহিতে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিতেন, এমন কি ভাবে মূর্ছিত হইতেন।" তাঁহার পালাগুলির মধ্যে 'কালিয় দমন', 'মানভঞ্জন', 'মাথুর' ও 'দূতী সংবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত পালায় অভিনয়ের বিশেষ কোন প্রাধান্য ছিল না; গানই ইহার প্রাণ। [৩]"নীলকণ্ঠ যে গানগুলি রচনা করিয়া যাত্রাভিনয়ের কালে প্রধানত নিজেই সুর তাল সংযোগে গাহিতেন সেগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর পদাবলীর

১। নারায়ণ চন্দ্র দত্ত—বাঁশী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ২। সরল বাংলা অভিধান, ৬ষ্ঠ সং, সুবল চন্দ্র মিত্র ৩। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ৩য় খণ্ড, ১ম সং—পৃ ৪২, কালিদাস রায়।

মর্যাদা লাভ করিয়াছে। সেই গানগুলি আজও রাঢ় বঙ্গের চণ্ডীমণ্ডপে, মাঠে, হাটে, খেয়া তরীতে, দীঘি পুকুরের ঘাটে ঘাটে মুক্ত কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়।" এখানে তাহার সংগীতের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

গাতোল, গাতোল উমা, রজনী প্রভাত হলো।
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্ব মঙ্গলে।
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ,
আলসে ঘুমাবে কত চাঁদ বদনে মা মা বল।
ব্রহ্ম আদি দেবগণ, করিতেছেন আগমন,
পূজিতে ও শ্রীচরণ, করে জবা বিল্বদল।
তিন দিন রাখিয়ে বুকে, করি মা জনম সফল।
তুমি মা যাবে কৈলাসে কি উপায় উমা দাসের দাসে,
নীল কণ্ঠের বারমাসে বার রিপু প্রবল হল॥

এই প্রসঙ্গে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নীলকণ্ঠ গীতাবলী' ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অধর চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত 'নীলকণ্ঠ পদাবলী' সংগীত সংগ্রহ পুস্তক দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেষের দিকে সঙ্গীত-পারদশা পুত্র রাম কমল মুখোপাধ্যায়ের উপর নীলকণ্ঠ দল পরিচালনার ভার দেন। এই সময় চাইবাসা জিলার সাইলকুপা—রাজবাড়িতে কৃষ্ণ-যাত্রা পরিবেশন করিতে গিয়া স্থানীয় লেখকদের অনুরোধে আ-কার হইতে সমস্ত স্বরবর্ণ এবং যুক্তাক্ষর বর্জন-পূর্বক নীলকণ্ঠ একটি পদ রচনা করিয়া সুর-তালে পরিবেশন করেন। ইহাতে তিনি প্রভূত সম্মানের অধিকারী হন। "প্রাচীন কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের আ-কার ভিন্ন অন্য স্বর ও যুক্তাক্ষর বর্জিত একটি কবিতা দেখাইয়া স্থানীয় লেখকগণ তাহাকে ঐ জাতীয় একটি কবিতা রচনা করিতে বলেন। পদকর্তা নীলকণ্ঠের গীতটি রচনার ইহাই মূল কারণ। গীতটি এখানে উদ্ধার করা হইল,—

একতালা

[১]তপন তনয় ভব হর হর বব বম্ বম্
রজত বরণ হর রজত বরণ মম
তম হর হর কমল নয়ন

১। জীবনীকোষ (ভারতীয় ঐতিহাসিক) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৩৩, শশিভূষণ বিদ্যালংকার (১৩৪৩)

শশধর হর	নব জল ধর
হলধর সম	ভবসব বলধর।
জগজন জয় হর	জগজয় কর খগ নগ
জগযত সব	তব কর।
অজর অমর পর	যত যত রয়
ভব অবয়ব সব	সম নয়
অনলধরহ হর	গরল ধরহ মম তম

যত সব সবল হর হ
ভবভয় হর হর রব মম ভয় পদ রতন
কহত তব অধম রতন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নীলকণ্ঠ হুগলী জিলার ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেন।

অহিভূষণ ভট্টাচার্য

বোধনে বিসর্জন (১৯০১) তিন অংকে বিভক্ত এই প্রহসন নাটিকাটি সাঁতরা কোম্পানী কর্তৃক অভিনীত হয়। বঙ্গদেশের জমিদার দুর্গোৎসব পালন করিয়া থাকেন। পূজা উপলক্ষ মাত্র। বাঈজীনাচ ইত্যাদি ইহার প্রধান বিষয়। প্রহসনে ইহারই চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সরস্বতী ও কার্তিক দেব-চরিত্র দুইটির মধ্য দিয়া বাঙালীর ঘরে নব্য শিক্ষিত যুবক যুবতীর উৎকট আধুনিকতাকেও নাটকে প্রকাশ করা হইয়াছে। সরস্বতী গাউন পরেন এবং ইঙ্গবঙ্গভাষায় কথা বলেন; আর কার্তিক কেতাদুরস্ত থাকিবার জন্য ব্রাশ দিয়া চুল পাট করা ও জুতোয় মাখন মাখানো প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত।

সুরথ উদ্ধার (১৯০১)—সাঁতরা কোম্পানীর যাত্রায় অভিনীত এই পৌরাণিক নাটটি আট অংকে বিভক্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে ইহার মূল কাহিনী আহৃত হইয়াছে। দেবীদুর্গার মাহাত্ম্য প্রচার নাটকের মূল উদ্দেশ্য। নাট্য কাহিনীতে রহিয়াছে,—মন্ত্রীর চক্রান্তে অঙ্গেশ্বর সুরথের রাজ্য-চ্যুতি, ছোটরাণী কনকপ্রভার সতীত্ব নাশের প্রচেষ্টা, পুত্র সুধিরথের হত্যার উদ্যোগ এবং পরিণামে দেবী দুর্গার কৃপায় রাজা সুরথের সর্বদুঃখমোচন, সকলের সঙ্গে মিলন ও রাজ্য প্রাপ্তি। নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ। নাটক হইতে একটি 'গণের গানের' দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

ষষ্ঠ অংক—প্রথম দৃশ্য

স্থান—কর্ণাটের কিরাতপল্লী নিকটস্থ শ্মশানক্ষেত্র, শ্মশানকালিকার মন্দির, সম্মুখে কাপালিক, অদূরে কিরাতগণ উপবিষ্ট।

কাপালিক—জয় তারা জয় তারা! সব তোমার ইচ্ছা মা! কৈ হে তারা মায়ের ভক্তগণ, অদ্য মহানিশায় মহামায়ার মহাপূজা, মাংসাদির প্রয়োজন। মাকে প্রণাম করে শীঘ্র শিকারে যাও।

গীত

কিরাতগণ—মোদের পরণাম লে, মোদের পরণাম লে।
কর আশিস, শ্মশান মা দোয়া দিস,
বনকে শিকার মেলে যেন পালে পালে॥
মেলে সজারু বরা, শিয়াগোস জংলী কাড়া,
মায়ীর শ্মশান পূজায় যেন গোধা মেলে॥

এই নাটকে বহু উক্তি-গীতি (জুড়ির গান) সন্নিবেশিত হইয়াছে। মানব পূর্বজন্মের কর্মানুযায়ী সুখদুঃখের অধিকারী হয়। কর্মফল ভোগের জন্যই জীব দুইদিনের জন্য পৃথিবীতে আসে; আবার কর্মানুসারে অনন্তের পথে চলিয়া যায়। কাজেই সংসারে কেহ কাহারো আপন নহে। এই দার্শনিক তত্ত্বটি সুধিরথ গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এই দার্শনিক তত্ত্বই এই চরিত্রটির মূলে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে—

সুধিরথ—(গীত) কেবা কার পর কে কার আপন।
কাল শয্যাপরে মোহতন্দ্রা ঘোরে
দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন॥
আসা যাওয়া জীবের সকর্মগতিকে কে রোধিবে সেই আবর্তগতিকে
যাতায়াতের পথে কার বা সাথীকে পথিকে পথিকে পথের আলাপন॥
স্রোতের তৃণসম ভাসিয়ে ভাসিয়ে তোমায় আমায় দাদা মিলেছি আসিয়ে
আবার কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
(কোথায় চলে যাব, স্রোতের টানে ভেসে, কালস্রোতের টানে ভেসে)
এক তৃণ ছেড়ে অন্য তৃণধরে অনন্ত সাগরে মিশিব—

এবার হয়েছি ভাই তব, আবার কার ভাই হব,
কোথা চলে যাব কি আছে নিরূপণ ॥ (২য় দৃশ্য, ২য় অংক)

সুরথ উদ্ধার পালার একটি গান 'পুরাতনী গীতি' রূপে বহুগীত। গানটি এই নাটকের 'এক্‌ানে বালকের' গানেরও দৃষ্টান্ত। সুধিরথ-এর এই গানটি উদ্ধার করা যাইতেছে,—

সুধিরথ—এ মায়ার খেলা আর কতদিন থাকবে মা! এ সংসার হরির নাট্যশালা। যাকে যা সাজাচ্ছেন সে তাই সাজচে। আবার আপন কর্ম শেষে চলে যাচ্ছে। এই শ্মশান দৃশ্যের বধ্যবেশ আমার জীবন নাটকের শেষ সজ্জা।

গীত

এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গ মঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নট নটবর হরি যায় যা সাজান সে তাই সাজে।
রঙ্গক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবে গাঁথা,
কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ ভার্যা কেহ ভ্রাতা
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা;
কত রঙ্গের অভিনেতা আসেন সেজে কত সাজে ॥
যার যখন হতেছে সাঙ্গ এ রঙ্গ ভূমির অভিনয়
কাকস্য পরিবেদনা আর তখন সে কারো নয়।
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, কন্যাপুত্রের কাতর বিনয়
শোনে না কারো অনুনয়, চলে যায় সাজ সজ্জা ত্যেজে ॥
মাতৃসাজে সেজেছিস মা—করতে স্নেহের অভিনয়,
কর্মসূত্রে কর্মক্ষেত্রে আমি তোর সেজেছি তনয়।
এই নাটকের এই অংকে পেয়েছি স্থান তোর অংকে,
হয়তো যাব পর অংকে, পর অংকে পুত্র সেজে ॥
না হইলে কর্ম শেষ কত যাব কত আসিব,
সং সেজে সংসার নাট্যে কত কাঁদিব হাসিব;
মহাযোগে কবে বসিব, মিশিব হরিপদরজে ॥

(৩য় দৃশ্য, ৬ষ্ঠ অংক)

এই নাটকে সংগীতের দিক হইতে যাত্রায় এক নূতনত্বের সৃষ্টি হয়। পাগলা, ক্ষ্যাপা প্রভৃতি একক চরিত্রের মধ্য দিয়া লোকনাট্যের আসরে প্রচলিত ন্যায়, অন্যায় ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের নির্দ্দেশক বিবেকজাতীয় চরিত্রের প্রচলন এই নাটক হইতে। পাগলা দিবদাস-এর বহু অংশে বিভক্ত 'আপন বুঝে চল এই বেলা' গানটি প্রথম যাত্রা-বিবেকের গান। এই শ্রেণীর চরিত্রে কিছু কিছু সংলাপ থাকিলেও গানই ইহার প্রধান অবলম্বন। দিবদাসের গানটি উক্তি ধরিয়া সুরু হইলেও ইহা জুড়ির গান নহে; ইহা দিবদাসের একক গীতি। গানটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

পুরঞ্জয়—পেতেছে বিষম ফাঁদ লোলুপ গৃধিনী;
এখনো আপন বুঝে চল মহারাজ। (দিবদাসের পুনঃ প্রবেশ)

গীত

দিবদাস—আপন বুঝে চল এই বেলা।
ঐ বাস্তু শকুন উড়ছে মাথায় গো
বসে যুক্তি দিচ্ছেন হাড়গেলা।
ঐ দেখনা ঐ একটি জনা সিংহীর মামা ভোম্বলদাসকে চিনতে জুয়ায়না
উনি গর্ত থেকে মারছেন উকি গো, বার করে লম্বা গলা॥
ঐ দেখ খ্যাঁকশেয়ালীর ছানা, ল্যাজগুটিয়ে আছেন যেন কত পোষ মানা,
সেথা পিঁজরেতে কালপেঁচা বসে দিতেছেন কত শলা॥ (প্রস্থান)

* * *

রাজা—আজ হতে সেনাপতি, বর্ম চর্ম অসি
উষ্ণীষ হীরকময় রাখি ভূমি তলে
অবসর তুমি আজ; সেতাপতি-পদে
করিনু বরণ বীর সঞ্জয় কেতুরে।
পুরঞ্জয়—ধর্মাধর্ম পরিণাম দেখিবার তরে
অকাতরে পালিলাম আদেশ তোমার। (উষ্ণীষরক্ষা)
[দিবদাসের পুনঃ প্রবেশ]

(গীত)

দিবদাস—ওতো পোষাক ছাড়া নয়, একে একে ছাড়বেন সবাই তাতেই
করি ভয়

এখন পূজার পুরুত চলে গেলে গো, হবেন রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা ॥
আপন বুঝে চল এইবেলা।

রাজা—উন্মাদের বেড়েছে আমোদ
নাহি যায় বোঝা কিছু পাগলের বোল ॥

(গীত)

দিবদাস—পাগলের বোল বুঝবে গো তখন, বাজিয়ে বগল ঐ ছাগল গোল বাধাবে যখন।
তখন হবে পাগল, করবে পাগল গো,
বসবে পাগলের মেলা, এই চাঁদের হাটে ॥
আপন বুঝে চল এই বেলা।

মন্ত্রী—পাগলাকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া ? ওকে এখন বিদায় করে দেওয়া হক।

(গীত)

দিবদাস—একা শুধু আমি বিদায় নই, একে একে সবাই ক্রমে হবে জল সই।
শেষে শ্যালকুকুরের খেঁকাখেঁকি গো হবে শ্মশান ভূতের খেলা ॥
আপন বুঝে চল এই বেলা।

মন্ত্রী—কেন গোল কর, সময় অসময় বোঝ না ?

(গীত)

দিবদাস—
তেমন সময় বুঝব যখনি, হাড়গেলার হাড়ভাঙ্গব—কত মারব শকুনি।
মারব মুচড়ে ডানা ঐ চিলের ছানা গো, এই দেখ দিবে পাগলার সাতনলা ॥
(সক্রোধে প্রহারোদ্যত)

পুরঞ্জয়—এখন নয়, সবধান।

(গীত)

দিবদাস—তবে পালারে দিবে পাগলা !
আপন বুঝে চল এই বেলা ॥

(প্রস্থান—২য় দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

দিবদাসের গানে বর্তমান চক্রান্তের ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের ইঙ্গিত দিয়া রাজা সুরথকে সাবধান করা হইয়াছে! নাটকের সংগীতও সংলাপ, সুরেলা সংলাপ। সুতরাং সংলাপে যে ভাবটি ব্যক্ত করা হয় সংগে সংগে সেইটিকে আবার সুরে পরিবেশন করিলে কেবল পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটিয়া থাকে এবং অযথা সময় নষ্ট হয়। ভাবাবেগময় সংলাপে, অথবা সংগীতে বক্তব্য পরিবেশনের রীতি নাটকে সাধারণত অনুসৃত হওয়া উচিত। কিন্তু লোকনাট্যের রীতি স্বতন্ত্র। ইহার একটি আসরে শ্রোতার সংখ্যা চার পাঁচ হাজার। সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে সংলাপে যে আবেগময় বক্তব্য উপস্থিত করা হয় দর্শকমনে ভাব জাগাইবার পক্ষে কেবলমাত্র তাহাই যথেষ্ট নহে। সংলাপের সমস্ত কথা খুব স্পষ্ট ভাবে সকল শ্রোতার কর্ণগোচর করানো অভিনেতার পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইয়া উঠে না। এই জন্যই যাত্রায় অনেক সময় পরিবেসিত সংলাপের ভাব অবলম্বনে গানের ব্যবস্থা করা হয়। লোকনাট্যের গায়ক পুতুলের মত বসিয়া গান পরিবেশন করেন না। তাহাকে ভাবাভিনয়ের সঙ্গে গান গাইতে হয়। একদিকে উচ্চ সুরে প্রকাশিত কথা, অন্য দিকে গায়কের ভাবাত্মক অভিনয় চরিত্রের ভাবটি সহস্র সহস্র শ্রোতার মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই লোকনাট্যে সংগীতের সংখ্যাধিক্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সুরথ-উদ্ধারের পরে বিবেকের গান প্রচলিত হইতে আরম্ভ করায় ক্রমে জুড়ির গানের প্রভাব কমিতে থাকে। এই ভাবে বিংশশতকের তৃতীয় দশকে জুড়ির গান যাত্রার আসর হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

সুরথ উদ্ধারে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে। পদ্য সংলাপে অমিত্রাক্ষর-ত্রিপদীর ব্যবহার করা হইয়াছে। নাটকের সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ। অহিভূষণের দীর্ঘ সংলাপ রচনার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

স্থান—নর্মদার উপকূলস্থ মহাশ্মশান

জটা, চীর ও অস্ত্রধারী সুরথের প্রবেশ।

সুরথ—কিছুই সত্য নয়, সব মিথ্যা—সব যেন স্বপ্নবৎ! এ জড়পিণ্ড জগৎই মিথ্যা। এ সংসারই প্রহেলিকাময় মায়ার ছায়াবাজী! কি চমৎকার, কি আশ্চর্য স্বপ্নের কুহক! এ ঘুমও ভাঙচে না—স্বপ্নের কুহকও ছাড়চে না। মায়া তন্দ্রার ঘোরে আশার বাতিকে—কেবল স্বপ্নের পরই স্বপ্ন দেখছি; কর্ণাট যুদ্ধে

সেই কোটি কোটি ক্ষত্রিয়-সেনার বিনাশ, সেই শোণিত-সাগরে সন্তরণক্রীড়া, সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহের সেই অসীম সমর কৌশল, এখন যেন স্বপ্নবৎ বোধ হচ্চে। যেন স্বপ্নেই সসাগরা ধরা পরাজয় করে এক কর্ণাট ভিন্ন সমস্ত ভূমণ্ডলের একছত্র রাজা হয়ে ছিলেম, স্বপ্নেই যেন চিরসুবিশ্বাসী সরল হৃদয় বীরকুলের আদর্শ পুরঞ্জয়কে সেনাপতি পেয়েছিলেম, সতীকুলের শীর্ষস্থানীয়া তেমন পতি-পবায়ণা সতীরত্ন কণকপ্রভাসম পত্নী পেয়েছিলেম, স্বপ্নেই পিতৃকুলের সুকৃতিতরুর অমৃতফল স্বরূপ তেমন নয়নানন্দ পুত্রযুগল পেয়েছিলেম, আবার পরক্ষণেই কিছু নাই! স্বপ্নের কুহক স্বপ্নেই মিশিয়ে গেল! সব বিপরীত—সঙ্গে সঙ্গে সব বিপরীত! তেমন বিশ্বস্ত বন্ধু দেবোপম পুরঞ্জয়কে পিশাচমূর্তিতে দেখলেম, শান্তির প্রতিমাকে রাক্ষসীর মূর্তিতে দেখলেম, স্বপ্নেই যেন সে স্বর্গের দেবতাকে শ্মশানের পিশাচ ভাবে দেখে তাকে কারাবন্দী করলেম, কুললক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর উপচারে পূজা করে বিসর্জন দিলেম। স্বপ্নের রাজ্য, স্বপ্নের ঐশ্বর্য, স্বপ্নের সম্পদ, স্বপ্নের জায়া—স্বপ্নের পুত্র—সব ছেড়ে বনে এলেম, স্বপ্নের কুহক ভেঙ্গে গেল, সব যেন কোথায় চলে গেল, সব ফুরিয়ে গেল। তাই বা কই? এক স্বপ্ন ভাঙচে, আবার অন্য স্বপ্ন, নূতন নূতন স্বপ্ন, এখনি যে পুরঞ্জয়কে পিশাচ ভাবে দেখলেম, আবার তাতে দেবভাব দেখি কেন? সেই রাক্ষসী মূর্তি কনিষ্ঠা রাজ্ঞী কনকপ্রভাকেই বা আবার শান্তিময়ী স্বর্গের দেবীভাবে দেখি কেন? আবার পূর্বমুহূর্তেই যাদেরদেহে দেবভাব দেখেছিলাম, সেই মন্ত্রী, সেই গৃহ-বৈদ্য-বিশারদ, সেই জ্যেষ্ঠা মহিষী, সেই বিশ্বস্তা পরিচারিকা বিদুষীতে পরমুহূর্তেই এই বীভৎস ভাব,—এই প্রেত পিশাচের বিকট ভাব দেখচি কেন? এ কি স্বপ্ন, চমৎকার!! এই ঘোর অন্ধকারময়ী অমানিশার অর্দ্ধ যামিনীতে জগৎ নিস্তব্ধ; কেবল নিশাচর হিংস্রক পশুগণ ভীষণ মূর্তিতে ছুটাছুটি করছে, অদূরে ঐ মহাশ্মশানের কি ভৈরব দৃশ্য! সবের শোণিতমজ্জা-লোলুপ শৃগাল কুকুরের কোহাহল, তার উপর ভীষণাকার পিশাচ-পিশাচীগুলো শোণিত-রসলিপ্ত অধরে অট্টহাস্যের সহিত ভীষণ তাণ্ডবে শ্মশানের ভীষণতা আরও ভীষণতর করে তুলচে, তার মধ্যে ও কি! সেই মন্ত্রী সেই বিশারদ—সেই জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী—সেই বিদুষী রাক্ষসরাক্ষসীর মত আমার চক্ষের উপর নৃত্য করচে! ওঃ কি বিকট মূর্তি, কি ভীষণ দৃশ্য, এ কি দেবী মায়া! না, মায়া নয়, সত্যই আমার ভাগ্যপটের ভীষণ চিত্র শ্মশানপটে প্রতিফলিত। সেই দিন— সেই ঘোর বর্ষার দুর্যোগময়ী কৃষ্ণানবমী নিশা, যে নিশায় আমার ক্ষুদ্র-

জীবননাটকের সুখের অঙ্কের পরিসমাপ্তি, যে নিশায়—এই বিঘ্ন, বিপদ, শোক, অশান্তিময় ভীষণ অঙ্কের অভিনয়, যে নিশায় হিংসা, দ্বেষ-স্বার্থ-প্রতারণা-প্রবঞ্চনাময় সংসারে ধিক্কার দিয়ে সর্ববিধ সর্বনাশের মূলরূপী বিষয় সম্পদকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে, সৈন্য সামন্ত স্বজনবন্ধুকে পূর্ণ শত্রু—ঘোর আততায়ী জেনে একাকী একটি অশ্বমাত্র অবলম্বন করে বনে এসেচি, সেই হতেই যেন কত বিভীষিকা দেখছি, সেই হতে যেন সংসার স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। সেই হতে এই দীর্ঘকাল বনে বনে অনাহারে অনিদ্রায় কেবল যথালব্ধ বনের ফলে আর নদীর জলে জীবন রক্ষা করচি, স্বর্ণ-সৌধবাসী রাজেশ্বর হয়ে, আজ আপন কর্ম্মদোষে তরুতলবাসী দীনহীন পথের ভিখারী। আমারই অদূরদর্শিতা দোষে পুরঞ্জয় কারারুদ্ধ, ধূর্ত শৃগালের চক্রে আজ পশুরাজ সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ, কালভুজঙ্গ আজ ভেকের নিকট নতমস্তক! আমারই পাপে আজ তরতর তরঙ্গময়ী শান্তিতোয়া তটিনী মরীচিকাময়ী মহামরুতে পরিণত, অমরাবতী আজ শ্মশান !! আমারও এই মহাপ্রায়শ্চিত্ত !! এই ত নিশাতে শান্তিময়ী প্রকৃতির অনন্ত কোলে অনন্তজীব মাতৃকোলে শিশুর মত সুখে নিদ্রিত! সকলেই সুখী—সকলেই নিশ্চিন্ত, কেবল শান্তি নাই এই হতভাগ্য সুরথের অনুতাপানল দগ্ধ পাপহৃদয়ে! হায় রে, কাল যার অনাথ আশ্রমে কোটি কোটি অনাথ আতুরকে অকাতরে অন্ন বিতরিত হয়েছে, শত শত অতিথি নিত্য যার অনাথ আশ্রমে থেকে শান্তিলাভ করেছে, সে আজ নিরন্ন ভিখারী, একমুষ্টি উদরান্নের কাঙ্গাল! সে আজ আত্মচিন্তায় চিরন্তর অশান্তির জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ, চিন্তার চক্ষে বিভীষিকা দর্শনে অত্মহারা! ঐ আবার ঐ তরঙ্গিনী নর্মদার লহরী লীলার সঙ্গে কিসের শব্দ! ঐ যে মিশিয়ে গেল, না,—না ঐ আবার—ও কার কণ্ঠস্বর! ওযে পরিচিত সুর, আমার মর্ম্মস্পর্শী করুণ কণ্ঠস্বর! কি—"পিতা প্রাণ যায়"! "ভাই সুধির জল দে" বলে আমার প্রাণকুমার অধিরথ ডাকচে নয়, ঐ যেচক্ষের উপর—আমার চক্ষের উপর সেই মন্ত্রী—সেই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী রাক্ষস মূর্তি ধারণ করে আমার অধিরথের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে শোণিত পান করচে! পিশাচ—অকৃতজ্ঞ-চণ্ডাল! দেখ তোর ঘৃণিত জীবনের পরিণাম (অসি নিষ্কাসন), কৈ—কোথায় সব মিশিয়ে গেল, ও—কি! অদূরে অস্ফুট মনুষ্য কণ্ঠস্বর। এ ঘোর নিশাতে ভীষণ শ্মশানে আর কোন্ নির্ভীক একাকী আসতে সাহস করবে, ঐ ত মানুষ বলেই বোধ হচ্ছে! একটু অন্তরালে থেকে দেখি! (অন্তরাল গমন) [১ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক]

উনবিংশ শতকের থিয়েটারী নাটকেও অনেক সময় এই রকম দীর্ঘ সংলাপ সন্নিবেশিত হইত। প্রসঙ্গত মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটকের' হরিশ্চন্দ্রের সংলাপের কথা বলা যাইতে পারে,—

ষষ্ঠ অংক—কাশী শ্মশান ঘাট

চণ্ডাল বেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত

রাজা—(স্বগত) আজ হয়ত ভ'দে আবার বকবে এখন।

……শ্মশান ভূমে তুই কেনে গো কেনে ?

তুই কে গা ?

এই সংলাপটি তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া চলিয়াছে।

সুরথ উদ্ধার দীর্ঘ সময় ধরিয়া অভিনয় করিবার মত সংগীত ও ঘটনাবহুল নাটক। রাজা সুরথের অঙ্গ-রাজ্যের উপর আত্মাধিকার লালসায় গৃহবৈদ্য 'বিশারদ' জালিয়াত রাজ কর্মচারী 'সত্যসরণ' জনৈক ব্রাহ্মণ ও রাণীর পরিচারিকা 'বিদুষীকে' লইয়া ষড়যন্ত্রকারী মন্ত্রীর চরিত্র সমস্ত ঘটনার পরিচালক। সরল, কর্তব্যপরায়ণ, বীর সেনাপতিরূপে পুরঞ্জয় চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। পদচ্যুত মন্ত্রী পৃথুপাদ-এর প্রতিশোধ গ্রহনেচ্ছু স্ত্রী 'ভৈরবী' সত্যই ভৈরবী। তাহারই খড়্গাঘাতে রাজপুত্রের হত্যায় উদ্যত কাপালিকবেশী কুটিল মন্ত্রীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়। এই মন্ত্রীর কৌশলে পূর্বমন্ত্রী পৃথুপাদ পদচ্যুত হইলে তাহার স্ত্রী ভৈরবী ও পুত্র দিবদাস-এর অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। এই ভক্ত উন্মাদ দিবদাস পূর্বমন্ত্রীর পুত্র দেবেন্দ্রবিজয়। লোকনাট্যে বহুরসের অবতারণা করা প্রয়োজন। এই দিক হইতে বীভৎস, করুণ ও ভক্তিরসপ্রধান এই নাটকে সেনাপতি পুরঞ্জয় ও জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র অধিরথ চরিত্রে বীররস, বিশারদ চরিত্রে হাস্যরস ও কূট মন্ত্রী চরিত্রে আদিরসের অবতারণা করা হইয়াছে। নর্মদা-স্রোতস্বিনী একটি নারি চরিত্র রূপে নাটকে দেখা দিয়াছে। এই চরিত্রের সহযোগিতায় শ্মশানেশ্বর ভৈরব মৃত অধিরথকে শিবদত্ত সঞ্জীবনী সুধা পান করাইয়া পুনর্জীবিত করেন। নর্মদা চরিত্রে শিবভক্তি প্রকাশিত। এই নাটকের শেষ দৃশ্যে আসরে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্ত্তিক গণেশ সহ দুর্গার আবির্ভাব দেখান হইত। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মতিলাল রায়ের 'অকালবোধন' পালায় এই রীতি অবলম্বিত

হইত। সুরথউদ্ধারের জনপ্রিয়তা এত অধিক হইয়াছিল যে ১৩৩০ সালের মধ্যে ইহার চৌদ্দটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গীতাভিনয় (১৯০৮) —ইহা ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্মমঙ্গল-এর (১৭১১) কাহিনী এবং জনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত ভক্তিমূলক লোকনাট্য। এই 'রঞ্জাবতী বা ধর্মলীলা গীতাভিনয়' নাটকে অঙ্ক বিভাগ নাই। ইহা বত্রিশটি দৃশ্যে সমাপ্ত। অম্বিকার রাজা কর্ণ সেনের স্ত্রী রঞ্জাবতীউক্ত "ধর্মই সর্বকর্ম ফলদাতা" (দশম দৃশ্য) —এই ভাব অবলম্বনে ধর্মসাধন ব্রত এবং ধর্ম-দেবতার লীলা মাহাত্ম্য প্রচার নাটকের মূল বিষয়। এই নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ। ইহাতে গণের গান, উক্তিগীতি, আদি রসাত্মক দ্বৈতগীতি, নেপথ্য গীতি প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। আদিরসাত্মক দ্বৈতগীতি পরিবেশন করিয়াছে ইঁদে মেথর ও রঙ্গিলা,—

গীত

ইঁদে— আজ মেরা সাদী।
মেরে পিয়ার কিয়া রঙ্গিলা সাহাজাদি, বাদ্‌সাহজাদি।
রঙ্গিলা—তু মেরা দিল পেয়েরা
তু মেরি জানরে তু মেরি জান,
আসনাইকি দরিয়ায়, পিরীত কি পালোয়ার বহে উজান,
সেঁইয়া বহে উজান।
তু মেয় না খসম বনা, হামি তুহারি বাঁদি,
হামি তুহারি বাঁদি॥ (প্রস্থান, ১৩শ দৃশ্য)

ইহাতে যাত্রা ব্যালে ও সংযুক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সপ্তম দৃশ্যে গঙ্গাতীরে সূর্যলোকবাসিনী 'কিরণবালাগণের' নৃত্য-গীতের উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

গীত

ঐলো সজনী প্রভাত রজনী, হেরি দিনমণি উদিল।
সরসী-সলিলে শশি-বিনোদিনী কুমুদিনী আঁখি মুদিল॥
শিশিরের ছলে নয়নের জলে ভাসায়ে তরুলতায়,
বিরহে বিবসা বিরহিনী ঊষা কাঁদিয়ে চলিয়ে যায়,
অথবা বিরহে জ্বলিয়ে, ছিঁড়ে মতিহার ছড়াইয়া দিয়া যায় বিরহিনী চলিয়া,
হেন ঊষাকালে, চল সখী জলে, জড়াবি হিল্লোলে যদিলো॥

রাজার প্রতি কর্তব্য, বীরত্ব, ও ভক্তিভাব লইয়া কালুডোমের চরিত্রটি সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে। "কালু ছোট জাত, কিন্তু তার হৃদয় ছোট নয়" (২৬শ দৃশ্য)। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র বিষ্ণুপুররাজ বীরমল্লের শ্যালক মহানদের (ধর্মমঙ্গলের মহাপাত্র মাহুদ্যা) চক্রান্তে নাট্যকাহিনী জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অম্বিকারাজ কর্ণসেনের (ধর্মমঙ্গলে ঢেকুরগড়ের সামন্তরাজ) বংশনাশের, বিষ্ণুপুরের রাজাকে বিষপ্রয়োগে হত্যার এবং মন্দারণের রাজকন্যা শৈলজার পাণিগ্রহণ পূর্বক গৌড়ের একচ্ছত্র রাজা হইবার বাসনা দ্বারা মহানদ চরিত্র পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্মের প্রভাবে তাহার সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় সে উন্মাদ হইয়া যায়। এইখানেই নাট্যকার পাপের পরিণতি দেখাইয়াছেন। উন্মাদ অবস্থায় মহানদকণ্ঠে তাহার ব্যর্থ বাসনা ধ্বনিত হইয়াছে,—

মহানদ—হাঃ হাঃ হাঃ ! আমার সাধের সংসার ! আমার সাধের হাটরে সাধের হাট ! আজ ভেঙে গেল ! আমার আপন হাতে সাজানো বাগান সব শুকিয়ে গেল রে—সব শুকিয়ে গেল। না না না— আমি যে আজ গৌড়ের একচ্ছত্রী রাজা। মন্দারন রাজকুমারী আমার বামে। হাঃ হাঃ হাঃ সাধের হাট সাজিয়েছি। অম্বিকা-রাজকে নির্বংশ করে—রঞ্জার বুক চিরে হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলে, বিষ্ণুপুর রাজকে বিষ খাইয়ে—আমি আজ বীরভূম, মানভূম, সকল ভূমের সার্বভৌম রাজা। (উনত্রিংশ দৃশ্য)

এই সংলাপ রচনায় [১]'যোগেশ'—চরিত্রের "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আ! হা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল"— সংলাপটি দ্বারা নাট্যকার কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছেন। মহানদ চরিত্র হরিনামরূপ মহৌষধি গুণে শেষ পর্যন্ত মায়ামোহময় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া চিরপবিত্রময় সাধুজনগম্য পথের পথিক হইলেন। স্নেহ ও ভালবাসা অবলম্বনে মন্দারন রাজকন্যা 'পাগলী' চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। কর্ণসেনের স্ত্রী বিষ্ণুপুর রাজবালিকা রঞ্জাবতী (ধর্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বর শ্যালিকা) বীর-ভার্যা, আদর্শ সতী ও মাতৃস্নেহের আধাররূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। লক্ষ্মী (ধর্মমঙ্গলের লখ্যা) চরিত্র ন্যায়পরায়ণতা, স্বামীভক্তি ও বীরপনা

১। প্রফুল্ল, ৫ম দৃশ্য, ৪র্থ অংক, গিরিশচন্দ্র

লইয়া রূপায়িত হইয়াছে। সাঁত্রা কোম্পানীর যাত্রায় অভিনীত এই নাটকে আদি, করুণ, বীর ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

বামন ভিক্ষা গীতাভিনয় (১৯২৯—৪র্থ সংস্করণ)—ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ১৫শ—২৩শ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী আহরণ করা হইয়াছে; ইহা ত্রয়োদশ অংকের পৌরাণিক নাটক। দৈত্যরাজ বলির দান-দর্প খর্ব করিবার জন্য নারায়ণের পঞ্চমাবতার কশ্যপপুত্র 'বামন' কর্তৃক তাহার দান পরীক্ষা নাটকের মূল বিষয়। দানপ্রার্থী বামনের দুই পদে স্বর্গ ও মর্ত ঢাকিয়াগেল। বামনের নাভিপদ্ম হইতে উদ্গত তৃতীয় পদ রাখিবার জায়গা দানরূপে বামনকে যোগাইতে না পারায় বলিরাজ ধর্ম কর্তৃক নাগপাশে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু ভক্তিমতী রানী বিন্ধ্যার পরামর্শে বলি দান-প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন,—

বিন্ধ্যা—···শিরস্থ সহস্রদল পদ্মে হরিপাদপদ্ম স্থাপন করে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। (৩য় দৃশ্য, ১৩শ অঙ্ক)

এই ভাবে শিরে হরিপদ ধারণ করিয়া বামনকে ত্রিপাদ ভূমিদানের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করায় বলিরাজ অন্তিমে নারায়ণের কৃপা লাভ করেন। নাটকে গানের সংখ্যা আটচল্লিশেরও অধিক। যাত্রা ব্যালে, গণের গান, ইন্দ্র, শিব, শুক্রাচার্য, বিধাতা, প্রহ্লাদ, বলি প্রমুখের জুড়ির গান, বামনের একক গান প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অহিভূষণের পালার গানে তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রাগরাগিনী যুক্ত ও কীর্তনাঙ্গ সুর সংযোজিত হইত। কীর্তনাঙ্গ সুরের জন্য তিনি আখর যুক্ত গীতি রচনা করিয়াছেন। এই নাটকে গদ্য ও পদ্য ছন্দের সংলাপ যোজনা করা হইয়াছে। নাট্যকারের পদ্য সংলাপ রচনার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

বলি—রাজা প্রজা প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ-গরিমা
ছায়াবাজী গুরুদেব! ছায়াবাজী সব।
জীবলীলা রঙ্গ ক্ষেত্রে পুতুলের খেলা,
আসা যাওয়া সং সাজা সংসারের রীতি।
বহু যুদ্ধে, বহু শ্রমে, বহু রক্তপাতে,
পেয়েছি বিপুল ধন ত্রিলোক জিনিয়া
বঞ্চিত করিয়া কত যক্ষ রক্ষ দেবে।

স্বর্গ হতে রিতারিত করিয়া বাসবে
আজ এ বিপুল ধনে আমি অধিকারী।
বহুজীব রক্তস্রোত, শ্রম বিনিময়ে
যে বিপুল ধনরত্ন করিনু অর্জন
সে অর্জিত ধনরত্নে দীনদুঃখী জনে—
যদি না করিনু তৃপ্ত, হায় গুরুদেব!
নিরন্নের দুঃখ যদি না করিনু দূর
দুঃখীর দুঃখের ভাগ লইয়া হৃদয়ে
না যদি করিনু ধন রত্নের সদ্‌ব্যয়,
কিসে তবে এ ধনের হবে সার্থকতা। (১ম দৃশ্য, ১২শ অঙ্ক)

পার্থিব জীবন সম্পর্কে 'সুরথ উদ্ধার' পালার সুধিরথের দার্শনিক দৃষ্টি ও বলিরাজের মানস চিন্তা একই ভাবধারায় পুষ্ট। এই নাটকে অন্তরাল হইতে শূন্যবানী প্রয়োগের ব্যবস্থা রহিয়াছে,—

বামন—সত্য করে বলছি তোর সাধ পূর্ণ করব---করব – করব।

শূন্যবাণী

ঘুচিবে বিষাদ, পূরাবেন সাধ,
ভিক্ষা গ্রহণের ছলে।
ভেবো না মা মনে, বিদায় দাও বামনে,
যেতে বলির যজ্ঞ স্থলে ॥

অদিতি—ওকি শুনি! কে আমাকে শূন্য বাণীতে বলির যজ্ঞে বামনকে বিদায় দিতে বলছে···মা জগত্তারিণী দুর্গা! দেখ মা তুমি আমার বামনকে রক্ষা করো। (৩য় দৃশ্য, ১১শ অঙ্ক)

দানবীর বলি চরিত্র বীরত্ব, ভক্তি, দরিদ্র-দরদ লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। শুক্রাচার্য দৈত্য গুরু –সুতরাং বলির হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি বলির মঙ্গল বিধানের জন্য সর্বদা চেষ্টিত। কিন্তু বলির দান-কার্যে বাধা দিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে একটি চক্ষু হারাইতে হয়! সৎকার্যে বাধা দানের ফল শুক্রাচার্যও এড়াইতে পারেন নাই। দেবযানী কচের প্রেমিকারূপে চিত্রিত হইয়াছে। মহিষী বিন্ধ্যা ভক্তিমতী, সতী ও স্বামীর ধর্ম-কর্মের সহায়িকা।

নাটকে মায়া ও হরি-ভক্তি রূপক চরিত্ররূপে সংযোজিত হইয়াছে। একাদশ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কড়ি ছাড়া পার না করিবার জন্য কৈবর্তদের ধর্মঘট করিতে দেখা যায়—

মন্না—পারের কড়ি টঁ্যাকে না গুজে বামুন-বৈষ্ণব, নাগা, ফকির কোনো সুম্মুন্দির বেটাকে পার করব না। কর্ ধর্মঘট।

সকলে—ধর্মঘট—ধর্মঘট—ধর্মঘট!

গীত

মাকাল ঠাকুরের দোহাই ভাই মোদের ধর্মঘট।
আজ হতে করলাম কিরে, সামনে রেখে কালীর মঠ॥

সমসাময়িক কালের ধর্মঘট আন্দোলনের দ্বারা নাট্যকার প্রভাবিত হইয়াছেন। নাটকের শেষে একটি পরিশিষ্ট-অংশ সংযোজিত হইয়াছে। শতাশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হওয়ায় বলি স্বর্গের ইন্দ্রত্বের অধিকারী হইলেন। কিন্তু বর্তমান ইন্দ্রের অধিকার কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে বিন্ধ্যাসহ সুতলপুরীর স্বর্ণপ্রাসাদে অপেক্ষা করিতে হইবে। পরিশিষ্টে এই সুতলপুরীর দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। এই দৃশ্য যাত্রার 'মেলতাই'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লোকনাট্য লোকশিক্ষার বাহন বলিয়া ইহাতে ধর্ম ও সমাজনীতি সম্পর্কে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদানেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। বহু চরিত্র ও বহু ঘটনা লইয়া 'বামন ভিক্ষা—গীতাভিনয়' একটি দীর্ঘ পালা। শৃঙ্গার, বীর, করুণ ও ভক্তি রসকে নাটকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স গ্রন্থ প্রকাশক—এর প্রচার পত্র হইতে জানা যায় অহিভূষণ রামাশ্বমেধ (১৩১১) ও রাইউন্মাদিনী (তৃতীয় সং, ১৩২৪) গীতাভিনয় দুইটিও রচনা করেন।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১২৭৮—১৩৩৩)

হাওড়া জিলার কল্যাণপুরের অধিবাসী হরিপদ চট্টোপাধ্যায় হুগলী নর্মাল স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে কিছুকালে অধ্যয়ন করেন। তিনি পৌরাণিক, ভক্তিমূলক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। এই নাট্যকার যাত্রায় কিছু কিছু নূতনত্ব প্রবর্তন

করেন। ১৩১০ সালে রচিত 'ভৃগু রচিত' নাটকের কয়েকটি গানে পরীক্ষা মূলকভাবে তিনি থিয়েটারী সুর আরোপের ব্যবস্থা করেন। এই সুর জনপ্রিয় হওয়ায় ১৩১১ সালে রচিত 'পদ্মিনী' নাটক হইতে যাত্রায় থিয়েটারী সুরের বিশেষ প্রচলন হয়। রঙ্গালয়ের সুরকর্তা ভূতনাথ দাসকে হরিপদ বাবু যাত্রা জগতে লইয়া আসেন। ইহার পর দেবকণ্ঠ বাগচী (নবদ্বীপ) ও যাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই দুই সুরশিল্পী এক সময় বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চে সুর সংযোজনার দিক হইতে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাদের সাহায্যে হরিপদবাবু যাত্রায় 'থিয়েটারী সুরের' প্রবর্তন করেন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে গিরিশ-যুগে মঞ্চে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য প্রবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলিবাবা' নাটকের (১৮৯৭ খ্রীঃ) সুনিয়ন্ত্রিত নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। তখন মঞ্চের নৃত্য পরিচালকদের মধ্যে সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় এবং নেপাল চন্দ্র বসুর খ্যাতি ছিল। হরিপদবাবু তাহাদের যাত্রায় আকৃষ্ট করিয়া আসরে নূতন নৃত্য রীতির প্রচলন করেন। নৃত্য প্রদর্শন করাইবার জন্য যাত্রায় ঐ সময় হইতে 'ব্যালে' সংযোজনার বিশেষ ব্যবস্থা হইতে থাকে। ব্যালের নৃত্য-গীতের সঙ্গে নাট্যকাহিনীর কোন গভীর সংযোগ থাকে না। পূর্বেও যাত্রায় নৃত্য-গীত করিবার জন্য একদল ছেলে থাকিত। কিন্তু তাহাদের নৃত্যাংশ অনিয়ন্ত্রিত ছিল এবং সুরের দিক হইতেও গানে নৃত্যের উপযোগী সুর সর্ব্বত্র আরোপিত হওয়া সম্ভব হইত না। মথুরা নাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের দলে 'পদ্মিনী' নাটক হইতে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য ও ইহার উপযোগী সুর আরোপ যাত্রায় বিশেষভাবে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। এই রকম বহু নৃত্য ও বহু গীতিযুক্ত যাত্রা-নাটক সাধারণভাবে অপেরা নামে পরিচিতি লাভ করিতে থাকে। বিংশ শতকের প্রথম দশক হইতে- হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও মথুরানাথ সাহার প্রচেষ্টায় যাত্রায় নৃত্যগীতের সঙ্গে অভিনয়ের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় বাড়িতে আরম্ভ করায় যাত্রা আর গীতাভিনয় নামে চিহ্নিত হইল না।

হরিপদবাবু যাত্রা পালায় অভিনয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং ইহাকে উন্নত করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন। তিনি থিয়েটার হইতে চুনীলাল দেব ও ক্ষেত্রমোহন মিত্রের মত অভিনেতাদের আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহলার-সময় যাত্রাভিনয়কে মার্জিত করিবার চেষ্টা করেন। নৃত্য-গীত-

অভিনয়ের নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া তাহার 'পদ্মিনী' নাটক আসরে প্রযোজিত হয়। তাহার এই রীতি যাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করায় গীতাভিনয় উঠিয়া যায়। নূতন নৃত্য-গীতি ও থিয়েটার দ্বারা যাত্রা প্রভাবিত হইতে থাকায় দলের নামকরণেও পরিবর্তন ঘটে। সংস্থার নামের সঙ্গে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা অথবা অপেরা-শব্দ সংযুক্ত হইতে থাকে। মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি, শশিভূষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপেরা পার্টি প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাত্রা জগতে 'পদ্মিনী' নাটকের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে ইহা বলা যায়।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রা পালার প্রতি অংকের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ রহিয়াছে; উনিশ শতাব্দীতে যাত্রায় ঐতিহাসিক নাটক সমাদৃত হয় নাই। ঐ শতকে চৈয়া পাগলার 'কালাপাহাড়' নামক ঐতিহাসিক পালা অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় বিশ্বকোষে।

মার্শম্যানের 'সমাচার দর্পণ'-এ (১৮২৭ খ্রীঃ ৫ মে) জোড়াশাঁকোর কিছু ভদ্র সন্তান কর্তৃক 'রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা'র সৌখিন অভিনয়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পত্রিকার বিবরণ হইতে জানা যায় যে সংস্কৃত ও বাংলায় প্রকাশিত বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ লইয়া এই পালা রচিত। ঐতিহাসিক পালা বলিতে যাহা বুঝায় উল্লিখিত পালাটি ঠিক তাহা নহে।

বিংশতকের প্রথম হইতে রঙ্গালয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৪) গিরিশ চন্দ্রের 'সৎনাম' (১৯০৪), দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ সিংহ' (১৯০৫) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষ সমাদর হইতে থাকে। ইহার প্রভাবে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় যাত্রায় ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ের প্রচলন করেন। 'পদ্মিনী' তাহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক; 'পদ্মিনী' আসরস্থ হইবার পরে বিভিন্ন যাত্রার দলে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালার পাশে ঐতিহাসিক পালাও অভিনীত হইতে আরম্ভ করে।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাটক দীর্ঘ। তৎকালীন শ্রোতৃমণ্ডলীর চাহিদা মিটাইবার জন্যই এই দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হইত। তাহার নাটকের বহুস্থলে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি নাট্য সংলাপে গদ্য এবং পদ্য দুই-ই প্রয়োগ করিয়াছেন। আদিরসাত্মক 'দ্বৈত গান', 'গণের গান', 'একানে বালকের গান' প্রভৃতি তাহার পালায় স্থান পাইয়াছে। তিনি প্রথমে বাল্মীকি রামায়ণের

একটি কাহিনী লইয়া 'লবণ সংহার' (১২৯২ সাল) নামক পৌরাণিক যাত্রা পালা রচনা করেন। ১৩৩৩ সালে তিনি ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন।

মহীরাবণ (১৯০১)—ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক পালা। রাম কর্তৃক রাবণ-পুত্র মহীরাবণ বধের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকে মহীরাবণ, বিনায়ক, নাগরাজ, হনুমান, রাম, লক্ষ্মণ প্রমুখের জন্য জুড়ির গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পল্লী রমণীদের গণের গানও রহিয়াছে (১ম দৃশ্য, ৫র্থ অঙ্ক)। নাট্য সংলাপে গদ্য এবং পদ্য ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বীর, ভক্তি, করুণ রসের প্রাধান্য থাকিলেও নাটকে শৃঙ্গার, হাস্য, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক রসেরও অবতারণা করা হইয়াছে। নাটকে প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে ঐকতান বাদনের উল্লেখ রহিয়াছে। মনে হয় নাটকটি উনিশ শতকের শেষে রচিত হইয়াছিল; প্রকাশিত হইয়াছে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। কারণ যাত্রার তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী অধিকারী কর্তৃক দুই বা তিন বৎসর হাতে-লেখা পালা অভিনয়ের পরে ইহা ছাপাইবার ব্যবস্থা করা হইত।

প্রহ্লাদ চরিত্র (১৯০৪)—ইহা নয় অঙ্কে সমাপ্ত পৌরাণিক নাটক। শ্রীমৎ ভাগবতের (বাংলা সং) সপ্তম স্কন্ধের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় হইতে এই নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। মথুরা নাথ সাহার দলে অভিনীত এই নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় চল্লিশ। ইহাতে হিরণ্যাক্ষ-পত্নী উপদানবী, নারদ, হিরণ্যকাশিপুর স্ত্রী কয়াধু ও পুত্র হ্লাদ প্রমুখের জন্য উক্তি গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নাটকেরও প্রতি অঙ্কের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ রহিয়াছে। নরসিংহ-মূর্তি-ধারী বিষ্ণু কর্তৃক হরিবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর হত্যা এবং তাহার পুত্র প্রহ্লাদের হরিভক্তি পরীক্ষা লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। নাটকে বাৎসল্য, করুণ, রৌদ্র ও ভক্তিরস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কয়াধু চরিত্র স্নেহপ্রবণ মাতারূপে চিত্রিত হইয়াছে। হিরণ্য-কশিপুর চরিত্রে হরিবিদ্বেষ ও অত্যাচার অবলম্বনে রৌদ্র রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নাটকের কয়েকটি সংলাপ সুরে পরিবেশিত হইবার নির্দেশ রহিয়াছে। এখানে ইহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

প্রহ্লাদ—(সুরে) ব্যথা তোর আর রবে না মা, ছেলের কথা শোন
মা কানে, ব্যথা হারি হরি যে মা, ভবের ব্যথা যায় মা নামে।

কয়াধু— একি হল প্রহ্লাদ রে! কাঁদাইলি মোরে
আসিয়াছে পিতা তোর যুদ্ধ হতে ফিরি,
কহিয়াছে চণ্ডালিনী বড় রানী কৃষ্ণমূর্তি তোর হাতে,
সেই হতে রাজা জ্বলন্ত-আগুন সম
তোরে অন্বেষিছে প্রতি দ্বারে দ্বারে।
যাদুরে আমার! ত্যজ ছেলে খেলা
অন্য অন্য শিশু সম যাও পাঠশালে,
মন দিয়া তথা গিয়া কর অধ্যয়ন
পিতা তোর করিবে যতন
ভাল·বেশে করিবেরে কোলে।

প্রহ্লাদ—(সুরে) পিতার কোলে আর যাব না, জগৎ পিতার কোল পেয়েছি, গুরুর গৃহে আর যাব না, হরি জগৎগুরু তা জেনেছি।

(১ম গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)

সুরে সংলাপ পরিবেশন ও গীতি ঠিক এক জিনিষ নহে। এই জাতীয় সুর-সংলাপ কথকতায় ব্যবহৃত হয়। উনিশ শতকের যাত্রা পালায়ও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত গোবিন্দ অধিকারীর বিভিন্ন পালা ও কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রধানত গীতি-সংলাপময় (কদাচিৎ ছোট গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত) গীতিনাট্য জাতীয় পালা 'স্বপ্নবিলাস' 'রাই উন্মাদিনী' (দিব্যোন্মাদ) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই সংলাপ গদ্য অথবা পদ্যে রচিত হইত। এখানে কৃষ্ণকমলের পালা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল,—

কৃষ্ণ—(সুরে) শুন চন্দ্রে! কথায় আর নাহি প্রয়োজন;
অবিলম্বে প্রিয়ার কাছে করহে গমন।
দুই এক মধ্যে আমি যাব বৃন্দাবন;
একথা অন্যথা মোর না হবে কখন।

(মথুরা-রাজভবন—দিব্যোন্মাদ)

নাটকে প্রহ্লাদ চরিত্রটি একানে বালকের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। ১৩২৬ সালে নাটকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পদ্মিনী (১৩১১)—চতুর্দশ শতকের দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দিন-এর চিতোর আক্রমণের কাহিনী লইয়া রচিত এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটকটি মথুরানাথ

সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রার দলে অভিনীত হয়। ব্যালে-গীতি সহ নাটকের সঙ্গীত সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। প্রচলিত রাগরাগিনীর গম্ভীর চাল ও চৌতাল, সুরফাঁক, ঝাঁপ প্রভৃতি ধ্রুপদী তাল পালার গানে ব্যবহৃত হইয়াছে; আবার ঠুংরী ও খেমটার হাল্কা চাল ইহার গীতে সংযোজিত হইবার কথাও নাটকে উল্লেখিত হইয়াছে। নাটকের প্রত্যেক গানে সুর ও তালের উল্লেখ রহিয়াছে। নাটক হইতে একটি যাত্রা ব্যালের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

আলাউদ্দিন—বাঁদি, বাঈজীরা কোথা— (বাঈজীদের প্রবেশ)

গীত

খাম্বাজ, দাদরা

বাঈজীগণ – আছি পথ চেয়ে নাথ তোমার।
কোকিল করে কুহু কুহু কোকিলা ছাড়ে উহু উহু ঝংকার॥
ছুটে আসে মদন ফুলধনু ধরি করে,
হেরে বিরহিনী বিরহে মরমে মরে,
তখন ভাল কইলে কথা, বাজে ব্যথা
নাথ নাথ নাথ সরম হয় তার॥

আলাউদ্দিন—কিয়া তোফা, কিয়া তোফা! বিবিজান আচ্ছি হুয়া।
(৭ম গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক)।

উনিশ শতক হইতে যাত্রায় যে আদি-রসাত্মক দ্বৈত গান চলিয়া আসিতেছিল সঞ্জীবচন্দ্র তাহার যাত্রা সমালোচনায় ইহার পরিচয় দিয়াছেন। বিশ শতকেও এই রীতি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দিবার জন্য খাতিম ও বাঁদির দ্বৈত নৃত্য-গীতিটি উদ্ধার করা যাইতেছে,—

গীত

আশাবরী—দাদরা

খাতিম—তুতাবাঁদিরে তুমোর জানের জান লক্কা পিয়ারা।
বাঁদি—খসমরে খসম, মুই মোরগিয়া, মোরগিয়া আর দিসনে আশকারা॥
খাতিম—তুতা বাঁদিরে তুমোর আসমানের পরী।
বাঁদি—মাইরি মাইরি মাইরি— আয় তোয় কলজেয় ধরি।

খাতিম—মোর জান নিলি, জান নিলি তোর ইশারা তো নয়, যেন
জবায়ের ছোরা ॥

এই নাটক হইতে একটি গণের গানেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল,—

(অরিসিংহ ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

আলাউদ্দিন—(কুর্ণিশ পূর্ব্বক) বোধ হয় আপনি চিতোরের মহারাণা ভীমসিংহ? আমি মহাশয়ের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আজ পরিচিত হবার জন্যই আপনার বাটীতে এসেছি।

ভীমসিংহ–এ দিল্লীপতির অলৌকিক অনুগ্রহ। চিতোরের মহারাণা তাতে বিশেষ অনুগৃহীত। আসুন।

গীত

ভীমপলশ্রী—সুরফাঁক তাল

ব্রাহ্মণগণ–জয়স্তু দিল্লীপতি নৃমণি নরকুল শোভন।
আহিমাদ্রি কুমারিকাধীশ বীরেন্দ্র রাজা ॥
কীর্তি মহিমা তব মণ্ডিত ধরণী সবে,
হীন সৌন্দর্য স্তব্ধ তব মহত্ত্ব-গর্বে,
থাকুক অটল-সম, ইহ কীর্তি অনুপম,
কর রাজ্য সুপালন, জয়াশিস করে চিতোর ব্রাহ্মণ ॥

(১ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)

চিতোরের ভীমসিংহের (রত্নসিংহ) স্ত্রী পদ্মিনীর সৌন্দর্যের জন্য তাহাকে লাভ করিবার উদগ্র বাসনা লইয়া দিল্লীর বাদশাহ্ আলাউদ্দিন (১২৯৬—১৩১৬ খ্রীঃ) চিতোর আক্রমণ করেন ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাজপুত রানা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পদ্মিনী জহর ব্রত পালন করিয়া নারীত্বের মর্যাদা রক্ষা করেন। এই ঐতিহাসিক কাহিনী নাটকের প্রধান অবলম্বন। তৎকালীন যাত্রার উপযুক্ত করিয়া রচনা করিবার জন্য ইহাতে ক্রোড়াঙ্কের শেষে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পদমূলে ভীমসিংহ, পদ্মিনী, লক্ষ্মণ সিংহ, উমা বাই প্রমুখের মিলন দেখান হইয়াছে। নাট্য-ভূমিকায় হরিপদবাবু বলিয়াছেন,—"যাত্রার ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়নে আমার এই প্রথম উদ্যম এবং যাত্রাতেও ইহা প্রথম অভিনয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। দেবদেবী-প্রাণময় হিন্দুসমাজ পৌরাণিক কথা শুনিতে এবং দেবদেবীর চিত্র

দেখিতে অতি ভালবাসেন, কিন্তু কালভেদে ও রুচিভেদে বর্তমান কালে নানা বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক প্রণয়নের ও অভিনয়ের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা রক্ষা করিতে হইলে নাট্যকারকে সময় অবস্থা দেখিয়া লইয়া তাহারই মুখাপেক্ষী হইতে হয়। উপস্থিত মুহূর্তে গ্রন্থকার তাহারই অধীন।" বিংশ শতকের প্রথমে মঞ্চে অভিনীত ঐতিহাসিক নাটক নগরে আদৃত হয়। এই সকল নাটক কলিকাতা হইতে দূরে সৌখিন সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হইয়া ইহাদের জনপ্রিয়তা বাড়াইতে থাকে। ফলে দর্শকগণ ঐতিহাসিক নাটকের প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এই ভাবে যে নূতন রুচি গড়িয়া উঠে নাট্যকার তাহার কথাই ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। এই রুচি অনুযায়ী ঐতিহাসিক যাত্রা-নাট্য প্রচলনে তিনি উদ্যোগী হইলেন।

লক্ষ্মণসেনের প্রতিনিধি রানা ভীমসিংহ স্বদেশপ্রীতি, প্রজানুরঞ্জন ও পত্নীপ্রেম লইয়া রূপায়িত হইয়াছে। আলাউদ্দিন বিলাসী ও নারীলোলুপ বাদশাহ। পদ্মিনীর রূপশিখা তাহার অন্তরে যে অগ্নিদাহ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নির্বাণের জন্য সসৈন্যে তাহাকে চিতোর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। কামোন্মাদ বাদশাহের কামানল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য পদ্মিনী জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া নর দেহকে ভস্মীভূত করেন। এই চরিত্রে কিছুটা দ্বন্দ্বের ও অবতারণা করা হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে ক্ষত্রনারীর সতী-ধর্মচেতনাকে স্বীকৃতি দিয়া পদ্মিনী আলাউদ্দিনকেও মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; আলাউদ্দিন হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

পদ্মিনী—এইটুকু কি বুঝে দেখলেন না যে রূপের পরিণাম ছাই ভস্ম। সেই ছাই ভস্মের জন্য আমি দয়ামায়া শূণ্য হয়ে কেমন করে এই নৃশংস রাক্ষস চণ্ডালের কার্য করি! আরও আলাউদ্দিন, তুমি বাদশাহ, রাজ্যের পিতা, পিতার কি এই কর্তব্য যে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি!

আলাউদ্দিন—···ধন্য হিন্দু, ধন্য হিন্দু রমণী! আমি মুসলমান, আমি আজ মুক্ত কণ্ঠে সগৌরবে তোমাদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করছি। ধন্য পদ্মিনী, তুমিই ধন্য! কিন্তু হায় হায় করলাম কি! (ক্রোড় অঙ্ক)

লক্ষ্মণ সিংহের পত্নী উমা বাঈ বীরাঙ্গনা। এই বীরাঙ্গনার প্রভাবে সংশয়ান্বিত লক্ষ্মণ সিংহ চিতোর রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। পাঁচ বৎসর

ধরিয়া আলাউদ্দিন চিতোর অভিযান চালনা করেন। পঞ্চম বর্ষের শেষে রাজঅন্তঃপুরে যুদ্ধের উন্মাদনা বজায় রাখিবার জন্য পদ্মিনী "ময় ভুঁখা হুঁ—ময় ভুঁখা হুঁ—রানা, রাজবলি দাও, রাজ রক্তে আমার এ পিপাসার শান্তি কর। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা"—এই সংলাপসহ গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাক্ষাৎ 'উত্তর-দেবী' বলিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১]'সরোজিনী নাটক' (১৮৭৫)-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পঞ্চবর্ষ শেষে সিংহ-পরাক্রমী ভীমসিংহ যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিলে চিতোরের পতন হয়। আলাউদ্দিনের বেগম 'পিয়ারী' নারীত্বের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি সম্রাটকে ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু রিপুর দাস আলাউদ্দিন তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। নারীর সতীত্ব ও স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা তাহার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু। এই নাটকের ক্রোড় অঙ্কের গীতি ও পদ্মিনী-আলাউদ্দিনের সাক্ষাৎ সরোজিনী নাটকের একটি দৃশ্যে সমাপ্ত ষষ্ঠ অঙ্কের গান ও সরোজিনী-আলাউদ্দিনের সাক্ষাৎ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। হরিপদ নাটকে বহু দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। পত্রের আকারে তাহার একটি দীর্ঘ সংলাপ উদ্ধার করা হইল,—

চতুর্থ অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, প্রকোষ্ঠ

পদ্মিনীর প্রবেশ

পদ্মিনী—(স্বগতঃ) আলাউদ্দিনকে স্বহস্তে পত্র লিখেছি, "আমি স্বামীর বন্দিত্ব মোচনের জন্য তোমায় আত্মদান করব! চিতোর বাসীরা অবশ্য সে মতে মত দান করে নাই, আর করবেও না, তথাপি আমি হিন্দু মহিলা, স্বামীর জন্য সব করতে প্রস্তুত। অতএব হে সাহেন্সা, আমি মুসলমানী হলে যেন আমার মর্যাদা হানি না হয়, এই আমার অনুরোধ। আর একটি

১। লক্ষ্মণসিংহ—(স্বগত)...এমন সময়ে বিকট স্বরে 'ময় ভুখাহুঁ' এই কথাটি বলে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা কে ভঙ্গ করলে?...(চকিত ভাবে) একি! চিতোরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার মূর্তি যে?...

আকাশবাণী—রাজবংশ প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত
যদি দিস্ পিতে মোরে—তবেই মঙ্গল।

[চতুর্ভুজাদেবীর মন্দির সম্মুখীন শ্মশান— ১ম গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক]

অনুরোধ—আমি যখন তোমায় আত্মদান করতে তোমার শিবির মধ্যে গমন করব, তখন আমার সহিত আমার চিরসঙ্গিনীগণ আমার অভ্যর্থনার জন্য গমন করবেন, তাদের যেন বাদশার দ্বারা কোন অসম্মান না হয়! তাঁদের মধ্যে কতক রমণী, অর্থাৎ যে সঙ্গিনীগণ আমার আমাগত প্রাণ, আমার বিরহ তিলার্ধ সহ্য করতে পারেন না, তাঁরা আমার সঙ্গে মুসলমানী হবেন, তাঁদের জীবনে যেন তাঁরা কষ্ট না পান। আর অবশিষ্ট রমণীগণ চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হবেন। এই পত্রের উত্তর এই পত্রবাহকের সহিত প্রেরণ করবেন। তাহলে অদ্যই বাদশার অভিমত মত কার্য করতে চেষ্টা করব"। এখন আলাউদ্দিন তুমি বোঝ! আজ-হিন্দু মহিলা যবনী হবে। বোঝ আলাউদ্দিন! এই পর্যন্ত যাহা মুসলমানের অদৃষ্টে ঘটে নাই, সেই অঘটন আজ মুসলমান অদৃষ্টে ঘটবে। বোঝ আলাউদ্দিন, তোমার কি কার্য চাতুর্য! তোমার কার্য পারদর্শিতায় আজ অনন্যোপায় হয়ে হিন্দুনারী তোমায় ভজনা করতে বাধ্য হয়েছে। আজ সমগ্র চিতোরবাসী হতবুদ্ধি, কাণ্ড জ্ঞানশূন্য, চিন্তাগ্রস্ত, কিন্তু পদ্মিনী নিশ্চিন্ত। সকল কার্যই মার পাদপদ্মে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। আমিও দেখতে চাই, তোমার পুরুষকার আর আমার পুরুষকার-দৈব সহমিলনে কি মহৎ কার্য নির্বাহিত হয়! আল্লাউদ্দিন! তুমি পুরুষ, দিল্লীর বাদশাহ, তোমার বলবিক্রমে ভারত তোমার পদানত। কিন্তু তুমি আজ এও দেখতে পাবে একটি সামান্য রমণী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরী অবলা তোমার—থাক, হৃদয়ের কথা হৃদয়ে থাক। একে ত পুরুষে বলে— স্ত্রীলোক অতি অধম, স্ত্রীলোকের কথা অপ্রকাশ থাকে না, কিন্তু পুরুষ, আমিও আজ দেখাতে চাই—পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোক অধম নয়, কোন অংশে হীন নয়। এ নারী জাতি ইচ্ছা করলে পুরুষ অপেক্ষাও সংসারে অনেক উচ্চ কার্য করতে পারে। যাক, বৃদ্ধ কঞ্চুকী, অরি, লছমনকে তো অনেক করে বুঝিয়েছি, কিন্তু আমার গোরাকে তো বুঝাতে পারছিনা। মা অন্ত গোরার প্রাণ, যে গোরা আমার, আমার স্নেহে জননী জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আপনার জন্য মায়া মোহ বিসর্জন দিয়েছে, আপনার উপজীবিকা সম্পত্তি সত্ত্বেও পরমুখাপেক্ষী হয়েছে সে গোরাতো কিছুতেই বুঝবে না। আমার কোন কথাতেই প্রবোধ মানছে না। এইযে আবার আসছে! ছেলে, এখন আবার কি জন্যে এলে?

পৌরাণিক নাটকের অলৌকিকতা ও অপরিচিত কাহিনী অপেক্ষা

ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে বোধ হয় শ্রোতৃমণ্ডলী অপেক্ষাকৃত পরিচিত কাছের মানুষকে খুঁজিয়া পাইলেন! তাই ক্রমেই ইহার চাহিদা বাড়িতে লাগিল। আদি, বাৎসল্য, ভক্তি, করুণ ও বীর রসের এই নাটকখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় ১৩৩৭ সালে ইহার সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নাট্য কাহিনীর মূল অবলম্বন [1]'Annals and Antiquities of Rajasthan'

অলর্ক (১৩১৯)—ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের (বাংলা সং) অন্তর্গত কাহিনী হইয়া রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। মথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের দলে নাটকটি অভিনীত হয়। ইহার গীতি সংখ্যা পঁয়ত্রিশের অধিক। অযোধ্যায় সূর্য বংশের রাজা ঋতধ্বজের স্ত্রী মদালসা, তাহার পুত্র অলর্ক, অলর্কের স্ত্রী আনন্দময়ী, ঋতধ্বজের বন্ধু, কুশাগ্রীয় প্রমুখের জন্য উক্তিগীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কুশাগ্রীয়-পুত্র ন্যায় পরায়ণ অংশুলের সংলাপ শেষে একটি উক্তি-গীতি এখানে উদ্ধৃত হইল,—

অংশুল—…যে ধনের দরিদ্র আমরা, আমরা সেই ধনেরই চিরদিন কাঙ্গাল হয়ে থাকব। যে ধনের নিকট তোমার রাজ অনুগ্রহ তৃণাদপি তৃণ, যে ধনের নিকট তোমার বিশাল রাজত্ব, অকুতো-প্রভুত্ব, অগণিত ধন রত্ন, মণিমুক্তা তুচ্ছ হতেও অতি তুচ্ছ, রাজকুমার কাঙাল আমি, সেই ধনের প্রত্যাশায় তোমার অনুগ্রহ পদদলিত করে এই মুহূর্তে চললেম। বিদায়, রাজেন্দ্র বিদায়—তবে সখা বলে মনে রেখো। (বেগে প্রস্থান)

গীত

রেখো সখা রেখো মনে, যেন সখা এই মনে,
ভিখারী ব্রাহ্মণ জাতি নয় তোমার তুচ্ছ ধনে।
যে ধনের কাঙাল তারা সে ধন নাই তোমার ঘরে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও সে ধন সতত বাসনা করে,
যোগী যোগাসনে বসি, হয় সে ধনের অভিলাষী,
কোটি লক্ষ জনে সেই ধন কেউ লভে হে ভাগ্য গুণে।
সে ধনের কাঙাল যারা তাদের কি আছে ভয়,
সমন হইতে দ্বারী দেয় হে তাদেরি জয়,

1. Colonel James Tod, 1829

কুবের হয় আজ্ঞা কারী আপনি স্বয়ং হরি
সে ধনীর পদধূলি ধরেন বক্ষে সযতনে ॥

অংশুমানের বেগে প্রস্থানের পরে এই উক্তি-গীতিটি কোন একক গায়ক বা জুড়িগণ দ্বারা গীত হইত। তখনো যাত্রায় জুড়িপ্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

ঋতধ্বজের কণিষ্ঠ পুত্র অলর্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবাহুকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। সুবাহু কাশীরাজের সহায়তায় সিংহাসন লাভে সচেষ্ট হইলে কাশীরাজের সঙ্গে যুদ্ধে রিপুর দাস অলর্ক পরাস্ত হইয়া রাজভ্রষ্ট হন। সংসারে থাকিয়া ষড়রিপুর প্রভাবে অলর্ক রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিণামে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া যোগ-সিদ্ধিদ্বারা রিপুর প্রভাব মুক্ত হইয়া তিনি শ্রীহরির অভয় পদে স্থান লাভ করিলেন। ইহাই নাটকের মূল ঘটনা। সুবাহুর সংলাপে এই রিপুর প্রভাব-মুক্তির কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—

সুবাহু— কামিনী কাঞ্চন যবে যাইল চলিয়া
অমনি কাঁপিল হিয়া তোর,
অমনি আসিল প্রাণে চিন্তা—আপনার গতি!
গতি-চিন্তা যবে এল, অমনি শ্রীপতি—
দিলেন অভয় পদে স্থান।
পেলি স্থান অনায়াসে!
আয় ভাই হরিভক্ত, পুনঃ দেরে মোরে আলিঙ্গন।

(৩য় গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক)

রাজ্য লাভে কাশীরাজের সহায়তা গ্রহণ করিলেও ভ্রাতৃবৎসল সুবাহু কখনো ভ্রাতা অলর্কের অমঙ্গল কামনা করেন নাই। কামিনী কাঞ্চন ও রাজ্য লোভী অলর্ক রিপুর দাস ছিলেন; কিন্তু দুঃখের আগুনে পুড়িয়া তাহার চেতনার উদয় হয়।

রানী জয়মতী (১৯১৪)—ইহা মথুরা নাথ সাহার দলে অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। সপ্তদশ শতকে আসামের শিবসাগর অঞ্চলের টংখুঙ্গিয়া বংশের রাজা চণ্ডেশ্বরের পুত্র [1]গদাপাণির স্ত্রী জয়মতীর সতীত্ব ও দুর্গাভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। রাজমন্ত্রী আনন্দ বড়ুয়ার নারী-

১। গদাপাণি গোবর রাজার পুত্র, জীবনীকোষ (ভারতীয় ঐতিহাসিক), ৩য় খণ্ড, পৃ ৬৩৯, শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ১৩৪৫।

লোলুপতা ও চক্রান্তের ফলে রাজার দুর্গতি দেখা দেয়। শিবরাম গুপ্ত-ঘাতক হইলেও তাহার মধ্যে ফল্গুধারার মত মনুষ্যত্ববোধ ছিল। পরবর্তী জীবনে ইহাই এই চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যকার বলিতে চাহেন যে মানুষ মনুষ্যত্ববোধ চিরতরে বিসর্জন দেয় না; ইহা সাময়িক ভাবে সুপ্ত থাকে মাত্র। উপযুক্ত পরিবেশে ইহার জাগরণ ঘটে। করুণ ও বীর রসকে প্রাধান্য দিয়া এই নাটকটি রচিত হইয়াছে।

বিদুর (১৩২০)—ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। মথুরা নাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় নাটকটি অভিনীত হয়। গণের গান ও যাত্রা-ব্যালেসহ নাটকের গীতি সংখ্যা চল্লিশের অধিক। ভীম, অর্জুন, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, বিকর্ণ প্রমুখের উক্তি গীতি নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। কুরু ও পাণ্ডু রাজপুত্রদের অস্ত্র পরীক্ষা, দুর্যোধন কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গ রাজ্য দান, অক্ষক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, জতুগৃহ দাহ, পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস, যুদ্ধবন্ধের জন্য কৌরব সভায় কৃষ্ণের দৌত্য ও বিরাটরূপ প্রদর্শন, ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের বক্ষ রক্ত পান, শকুনি ও দুর্যোধন সংহার, কুরুবিনাশ, ও কুন্তী-গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্রের বাণপ্রস্থের উদ্যোগ অবলম্বনে নাট্য কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি স্থলে যুদ্ধের জন্য দৃশ্যের অবতারণা না করিয়া নাট্যকার ভগবতী ও বিজয়ার সংলাপে ইহার ফলাফল ঘোষণা করিয়াছেন। নাট্য শেষে একটি ক্রোড় অঙ্ক যোজনা করা হইয়াছে। ইহাতে দেহত্যাগের পর বিদুর যমরূপে সভায় চিত্রগুপ্ত ও পারিষদবর্গের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। নাটকে ধার্মিক ও কৃষ্ণভক্ত বিদুর চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কুরু-পাপপুরী ত্যাগ করিয়া বিদুর 'যেখানে ক্রোধ, দ্বেষ হিংসা ও অভিমান নাই, যেখানে আত্মান্ধতা স্বার্থপরতা নাই, সেই রাজ্যে' (১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) বিদুর বাস করিতে মনস্থ করেন। রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্বক কুটিরে বাস করিয়া বিদুর ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করেন ও ধর্মচর্যায় মনোনিবেশ করেন। ধর্মপ্রাণ বলিয়াই কৃষ্ণ দৌত্য করিতে আসিয়া রাজভোগ ছাড়িয়া বিদুরের ঘরে ক্ষুদ গ্রহণ করেন। 'মহর্ষি মাণ্ডব্যের অভিশাপে মৃত্যুপতি যম বিদুর রূপে কুরু-কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন' (ভগবতী—১২শ গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক)। দুর্যোধনের মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং মহামতি বিদুর ধর্মরাজ যমমূর্তি ধারণ করিয়া যমরাজ্যে গমন করেন। এই নাটকের প্রারম্ভে নটীগণের একটি

গানে প্রস্তাবনার অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে নাটকের মূল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,—

এলেন দয়াময়—

নাশ করলেন দুর্যোধনে, রাখলেন পঞ্চপাণ্ডবের মান,

ক্ষুদ খেলেন বিদুর-ঘরে, দেখালেন ভক্তের ভগবান ॥

পূর্বের যাত্রাপালায় প্রস্তাবনা গীতি সন্নিবেশের বিশেষ রীতি প্রচলিত ছিল। প্রস্তাবনায় মূল বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হইত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রস্তাবনা সন্নিবেশে পূর্বোলিখিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পালার প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা ও প্রস্তাবনা যুক্ত হইলেও 'দিব্যোন্মাদ' পালায় নিকুঞ্জবন দৃশ্যের পূর্বে চৌদ্দ পংক্তির আর একটি প্রস্তাবনা অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবনায়ও পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হয়, —

চন্দ্রামুখে ধনী কৃষ্ণ আগমন শুনে ;
আনন্দে আনন্দ বারি বহে দুনয়নে। ইত্যাদি

'ভরতমিলন' যাত্রা পালায়ও কৃষ্ণকমল এই রীতি গ্রহণ কবিয়াছেন। গদ্য সংলাপ ও গীতি দুইয়েরই প্রাধান্য থাকায় পরবর্তীকালে রচিত এই পালাটি গীতাভিনয়ের পর্যায় ভুক্ত হইতে পারে। পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত এই পালায় প্রথমে একটি প্রস্তাবনা রহিয়াছে। পরে পঞ্চম অঙ্কের পূর্বে আর একটি প্রস্তাবনা অংশ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই নাটকে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র বিকর্ণ ন্যায় পরায়ণ ও ধার্মিক চরিত্ররূপে চিত্রিত হইয়াছে,—

বিকর্ণ—···হে সভাসদগণ! আপনারা কোন ধর্মের বশবর্তী হয়ে ঠাকুরাণী দ্রৌপদীর এই কাতরোক্তি শুনেও ন্যায় প্রতিবাদ কচ্ছেন না? এস্থলে ধর্মসঙ্গত কথা না বললে নিশ্চয়ই সতীশাপে আমাদের ধ্বংস হতে হবে। কুরুবীর পিতামহ ভীষ্ম, পিতা ধৃতরাষ্ট্র, ন্যায়পরায়ণ কৃপাচার্য ও দ্রোণ, মাহামতি বিদুর, সকলেই যদি নীরবে পাপীকে প্রশ্রয় দেন, এ দুর্মতি দুরাত্মা দাদা দুর্যোধনের মতানুবর্তী হন, এবং আপনাদের শত চক্ষের সম্মুখে যদি সতীর প্রতি এইরূপ পৈশাচিক ভাবে মহাপীড়ন হয়, তাহলে বুঝলাম, আপনারা সত্য সত্যই কুরু

অন্নে কর্তব্যহারা, জ্ঞানহারা, বুদ্ধিহারা হয়ে আজ ধর্মকে পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। (৭ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)

শকুনি কেবল কুটিল নহেন, তিনি দুর্যোধন কর্তৃক পিতা ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগান্বেষীরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন,—

শকুনি—(স্বগত) আর কাল প্রতীক্ষা করতে পারলাম না, অসহ্য পিতৃবিয়োগ যন্ত্রণা আমায় পাগল করে তুলেছে। সে কাল পূর্ণ হতে আর কতকাল অবশিষ্ট আছে…হায়রে! তবে কি পিতৃ প্রতিহিংসা প্রতিশোধিত হবে না? তবে এই পিতৃ অস্থি নির্মিত অক্ষ দলন করছি কি জন্য? পিতা, পিতা, কই—সেদিনের দিন কবে পাব? কুরু মেধ যজ্ঞে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েও যে সে দিন অন্বেষণ করতে পারছি না! পিতা, আর কতকাল, আর কতকাল? (১ম গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)

নাটকের শকুনি চরিত্র প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। মূল মহাভারত ও কাশীরাম দাসের মহাভারতে পিতৃ প্রতিহিংসার উল্লেখ নাই। [১]শকুনির সহোদরগণ দুর্যোধনের সহায় ছিলেন। কিন্তু এখানে শকুনি পিতৃহত্যা ও শতভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে চাহেন। ইহাই এই চরিত্রের মূল কথা। এই পরিকল্পনায় নাট্যকারের উপর মতিলাল রায়ের প্রভাব পড়িয়াছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে রচিত 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (৩য় সং ১৮৮৬ খ্রী) পালায় মতিলাল রায়ের শকুনি চরিত্রে এই পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়,—

শকুনি—(স্বগত)…যদি জীবিত কালের মধ্যে পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে না পারি তবে তো আমার জন্মগ্রহণ করাই বৃথা।…দুরাত্মা দুর্যোধন কি সামান্য দুষ্কার্য করেছে। আমার পিতা ও শত ভ্রাতাকে বিনা দোষে কারারুদ্ধ করে অনাহারে তাদের জীবন বিনাশ করেছে, এই দুঃখ কি প্রাণে সহ্য হয়? চরম কালে পরম দেবতা পিতা আমাকে ডাকলেন, দেখলেম দুই চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, কণ্ঠাগত প্রাণ, অতি মৃদুস্বরে আমাকে বললেন, শকুনি বাপ! তুমি আমার বংশধর কুলতিলক! ব্যাকুল হয়োনা! আমার জীবনান্ত হলে আমার অস্থিদ্বারা পাশা নির্মাণ করে রেখ। সেই অক্ষক্রীড়ায় তোমাকে কোন ব্যক্তি পরাজিত করতে পারবে না। সেই অক্ষ হতে তোমার বিপক্ষকুল বিনষ্ট হবে। আমিতো পিতৃ অস্থিতে এই পাশা নির্মাণ করেছি, কৈ এ

১। সভাপর্ব—৪৭ অধ্যায়, মহাভারত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।

পর্যন্ত ত কুরুকুল নষ্ট করতে পারলেম না, দুরাত্মা দুর্যোধন আমার একশত ভ্রাতাকে বিনষ্ট করেছে, ও পাপাত্মারাও তেমনি একশত ভ্রাতা, সে সকলকে নিধন করতে না পরলে ত আমার মনোবেদনা দূর হচ্ছে না।

(অংক-দৃশ্য-বিভাগহীন পালাটির প্রথমাংশ)

ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র পুত্রস্নেহ ও বিদুরের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ অবলম্বনে রূপায়িত হইয়াছে। বিদুর পত্নী পদ্মাবতী পতিভক্তি পরায়ণা ও ধর্মবতী। চিন্তামগ্ন বিদুর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধর্ম-অধর্মের ভীষণ সংগ্রামের পূর্বচিত্র দর্শন করিয়া পদ্মাকেও দেখাইতে সমর্থ হন। পদ্মাবতীর ধর্মবল ছিল বলিয়া ধর্মপ্রাণ বিদুর তাহাকে ইহা দেখাইতে পারেন। এই ভবিষ্যৎ চিত্র দেখিয়া কোমল-প্রাণা পদ্মাবতী অস্থির হইয়া পড়েন,—

পদ্মাবতী—প্রভু ভীষণ হতেও ভীষণ চিত্র আর দেখতে পারছি না! ঐ যে কুরুপুরী শ্মশান হচ্ছে, শৃগাল কুক্কুরগণ ঐ যে শ্মশানে মহাহ্লাদে বিচরণ করছে। (৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)

গান্ধারী পতিভক্তিশীলা, তাহার পুত্রস্নেহ থাকিলেও দুর্যোধনাদির পাপকর্ম একেবারেই সমর্থন করেন নাই। নাট্যরচনায় রৌদ্র, বীর, বীভৎস, করুণ ও ভক্তিরস প্রাধান্য পাইয়াছে। দুর্যোধন-সখা তোতলা 'বিরোচন' হাস্যরস পরিবেশনের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে।

রামনির্বাসন (১৯১৬)—রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনী লইয়া রচিত এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকটি মথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। নেপথ্য গীতি, যাত্রাব্যালে, গণের গান ও দশরথ, কৌশল্যা প্রমুখের জন্য জুড়ির গান ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরধনু ভঙ্গের পর রাম কর্তৃক পরশুরামের গর্ব খর্ব করা হইতে রামের নির্বাসন ও দশরথের মৃত্যু পর্যন্ত ইহার কাহিনী বিস্তৃত। দশরথ চরিত্র পুত্রস্নেহ ও সত্যরক্ষার দ্বন্দ্বে উদ্বেলিত হইয়াছে। ভ্রাতৃভক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা লইয়া লক্ষ্মণ চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে। দশরথের বয়স্যপুত্র গজকচ্ছপ এবং পণ্ডিত করকানন্দ স্থুল হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছে। সমস্ত বিয়োগান্ত পরিস্থিতির মূলে রহিয়াছে ঈর্ষাকাতর দাসী মন্থরা। তাহারই প্ররোচনায় কৈকেয়ী ভরতের জন্য সিংহাসন ও রামের বনবাস প্রার্থনা করিলে সত্যসন্ধ নৃপতি ভগ্নহৃদয়ে তাহা মঞ্জুর করিতে বাধ্য

হইলেন। কৈকেয়ী চরিত্রে কিছু নূতনত্ব দেখা দিয়াছে। মন্থরার কূটপরামর্শে শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত হইলেও প্রথমে কৈকেয়ীর চরিত্রে স্নেহ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল। সাময়িকভাবে সে দ্বন্দ্ব তিরোহিত হইলে দশরথের কাছে তিনি বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রায়োন্মাদ হইলেন,—

(উন্মাদিনীর ন্যায় সন্ন্যাসিনী বেশে কৈকেয়ীর প্রবেশ)

কৈকেয়ী—কৈ স্বামিন্! কৈ ধরণীর একচ্ছত্র সম্রাট! দণ্ড দাও, দণ্ড দাও, দণ্ডধর—দণ্ড না দিলে পাপিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,—আমার রামকে এই ক্ষণে অযোধ্যায় আনবার ব্যবস্থা কর। পদাঘাত কর, পদাঘাত কর। সত্যসন্ধ! একি তোমার সত্যরক্ষা! মাহাপাপিনী দুশ্চারিনী আমি, আমার কথায় তুমি আমার পরম ধার্মিক রামকে বনবাসে দিলে, তোমার পণ তুমি রক্ষা করলে, এখন পাপিনীর উপায় কর! যন্ত্রণায় প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! বল—বল, অনুমতি দাও, গলে অঞ্চল দিয়ে দন্তে তৃণ কবে আমার রামকে আমি ফিরিয়ে আনিগে। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, অন্ধকার—অন্ধকার দেখছি। (৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক)

অনুতাপ দগ্ধ কৈকেয়ী চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার মতিলাল রায়ের 'রাম রাজা গীতাভিনয়' দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। দশরথের মৃত্যুর পূর্বে নাট্যকার সিন্ধুবধের দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন যেন দশরথ মানস চক্ষে ইহা দেখিতেছেন। নাটকে নিয়তি দেখা দিয়াছেন; কিন্তু তাহার কণ্ঠে গীত নাই। সংলাপেই তিনি বশিষ্ঠকে রাম অবতারের কারণ স্মরণ করাইয়া তিরোহিত হইয়াছেন। নিয়তি ও বশিষ্ঠের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া নাট্যকারের পদ্যসংলাপের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল,—

বশিষ্ঠ—এস দেবি, জীবভাগ্য বিধায়িত্রী নিয়তি জননি,
এস ওমা, কহ দাসে কেন অলক্ষ্যে পশিয়া—
কেন কার্য সাধিলে কৌশলে!
কল্যাণময়ের করিলে গো অকল্যাণ?

নিয়তি—তোমার সম্মানে মতিমান্,
জাননা কি ঋষি—রাম অবতার কি কারণ?

বশিষ্ঠ—জানি ও মা সে শোকাশ্রুময় মহাগ্রন্থ-মুখবন্ধ,—

স্মরণেও হৃদকম্প ঘটে—
নিস্পন্দ নিশ্চল হয় শোণিতের গতি !

নিয়তি—তবে কেন ঋষি বৃথা চেষ্টা কর ?

বশিষ্ঠ - কর্তব্য বুঝে না মাগো—শ্রম-বিফলতা
ভবিষ্যৎ শুভাশুভ গাথা কল্পনায় না করে স্মরণ !
কর্তব্য যে ওমা এক চক্ষে অশ্রুরেখা
অন্য চক্ষে লয়ে আশার বর্তিকা,
করে খেলা আঁধারে আলোকে।
বশিষ্ঠ ত ছার মাতঃ ! কর্তব্যের গুরুকার্যে
অবতার ভার্গব আপনি পিতৃবাক্যে—
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা —
তাঁর শির করিলে ছেদন ! কর্তব্যের গুরু অনুরোধে—
নিজে মহামায়া নিজপ্রাণ করিলেন ত্যাগ—
পিতা দক্ষালয়ে। হে নিয়তি মাহাদেবি !
তোমায় ভাবিয়া কেবা হয় কর্তব্য নিমুখ ?
জানি ও মা সবি, এই রাম লীলা মূর্তিমান্
করুণার মহাউৎস—নিরাশায়—প্রাণে
শোকের সাগর—তথাপি মা,
কর্তব্যের গগন চুম্বিত মহাশৈল
তাহা আরোহিতে করে চেষ্টা সন্তান তোমার।
যাও দেবি—সাধ গিয়া নিজ মহাব্রত—
বিধির নির্দিষ্ট লিপি নাহি করি অতিক্রম।
আমার আরাধ্য ওই কর্তব্য-বিগ্রহ—
পূজিব তাহারে দীন, তার ভক্তি-উপহারে।

(উভয়ের প্রস্থান—৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক)

নাটকে হাস্য, বীর ও ভক্তিরস থাকিলেও বাৎসল্য ও করুণ রসই ইহাতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ১৩৩৪ সালে এই নাটকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

জয়লক্ষ্মী (১৯২১)—ইহা মথুরানাথ সাহার দলে অভিনীত পঞ্চাঙ্ক নাটক।

ইহার মূলে ঐতিহাসিকতা থাকিলেও নাটকটী কল্পনাপ্রধান। "গোধূলি শয্যাশায়ী সূর্যালোকের ন্যায় কল্পনার ক্রোড়ে যে সত্যাংশ নিহিত রহিয়াছে তাহা লইয়াই এই নাটক" (ভূমিকা)। অবন্তীকার বৌদ্ধ রাজা প্রদ্যোতবর্ধনের সেনাপতি পদ্মনাভ-এর পুত্র বলাদিত্য ও অবন্তীকার জনৈক ধনাঢ্য কুমারী জয়লক্ষ্মীর মিলন-কথা নাটকে বিধৃত হইয়াছে।

পঞ্চরাত্র (১৩৩১)—ইহা কাশীরাম দাসের মহাভারতের বিরাট পর্বের কাহিনী অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। নাটকটি হরিপদ বাবুর মৃত্যুর পরে ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার জীবিত অবস্থায় 'গৌরাঙ্গ অপেরায়' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পরে এক বৎসর বিরাট রাজের গৃহে 'কঙ্ক'নামে যুধিষ্ঠির বিরাট রাজের দাস রূপে, 'বল্লব' নামে ভীম রাজপাচকরূপে, ক্লীব বেশে 'বৃহন্নলা' নামে অর্জুন অন্তঃপুরের নৃত্যগীত শিক্ষকরূপে, 'গ্রন্থিক' ও 'গোপতন্ত্রী পাল' (তন্ত্রিপাল) নামে নকুল ও সহদেব অশ্বগোপালক রূপে এবং 'সৈরিন্ধ্রী' নামে নারীদের প্রসাধনকারিণীরূপে দ্রৌপদী অজ্ঞাত বাস করিতেছিলেন। এই অজ্ঞাতবাসের শেষ পাঁচটি রাত্রির ঘটনা লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। এই সময় দুর্যোধনাদি বিরাট রাজার উত্তর-গোগৃহ হইতে গোধন হরণের আয়োজন করেন। ইহা লইয়া যুদ্ধ সুরু হইলে অজ্ঞাতবাসরত অর্জুনের সাহায্যে বিরাট রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং দুর্যোধনের পক্ষ হইতে অভিমন্যুকে বন্দী করিয়া আনা হয়। পঞ্চরাত্রির সমাপ্তিতে পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করেন এবং পিতাপুত্রের (অর্জুন ও অভিমন্যু) মিলন ঘটে। বিরাট-কন্যা উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ সম্পন্ন হইলে নাটক সমাপ্ত হয়। দুর্যোধনের দম্ভ নাশ ও অর্জুনের বীরত্ব নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। অর্জুন কলাকুশলী, গুরুভক্ত ও বীররূপে নাটকে চিত্রিত হইয়াছেন।

প্রচারপত্র হইতে জানা যায় যে 'জনা বা প্রবীর পতন' (১৮৯৫), 'দাতাকর্ণ' (১৩০৪), 'রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর' (১৯০৩), 'নল দময়ন্তী' (১৯০৩), 'যদুবংস ধ্বংস' (১৯০৬), 'দুর্গাসুর' (১৯০৯), মুদ্রারাক্ষস অবলম্বনে 'চাণক্য' (১৯১০), 'তারা' (১৯১১), 'অন্নপূর্ণা' (১৯১১) 'গৌরাঙ্গ' (১৯১৮), 'মেঘনাদ' (১৯১৯), 'ক্ষণাদেবী' (১৩২৭), ও 'কালাপাহাড়' নামে আরও কয়েকখানি নাটক এই নাট্যকার কর্তৃক রচিত হইয়াছে। এই নাট্যকার রচিত অন্যতম

ঐতিহাসিক নাটক 'রণজিতের জীবন যজ্ঞ' ইংরেজ সরকার বিরোধী ভাব-পুষ্ট হওয়ায় ইহা তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। নাটকটি রণজিৎ সিংহের যুদ্ধকাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছিল। তাহার 'জয়দেব' নাটক যাত্রার আসরে যেমন অভিনীত হয় তেমনি গ্রাণ্ড ন্যাশনাল, ষ্টার, মিনার্ভা থিয়েটারেও অভিনীত হয়। এই নাটকে ভূতনাথ দাসের সুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে, ম্যাডান থিয়েটার্স কর্তৃক এই নাটকের নির্বাক চিত্র রূপ এবং অরোরা ফিল্ম কর্তৃক সবাক চিত্র-রূপ গৃহীত হয়। হিজমাষ্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক এই নাটকি রেকর্ড করা হয়।

ধনকৃষ্ণ সেন (১২৭১—১৩০৯)

তিনি বর্ধমান জিলার খাঁড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ধনকৃষ্ণ কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) বি এ. ক্লাশের ছাত্রাবস্থায় ১২৯৫ সালে 'সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক' নামে প্রথম একখানি নাটক রচনা করেন। ইহা ত্রৈলোক্যনাথ পানের যাত্রার দলে অভিনীত হয়। ১৩০৯ সালে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে নাট্যকার পরলোক গমন করেন। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী তাহার নাটকে গণের গান, জুরির গান প্রভৃতি থাকিলেও সংলাপ রচনায় তিনি কিছু নূতনত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তিনি অনেক স্থলেই ছোট ছোট সংলাপ সংযোজনা করিয়া নাট্যরচনা করিয়াছেন। তৎকালের যাত্রা পালায় ইহা ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত।

সতীমালাবতী (১৩০৯)—চৌদ্দটি দৃশ্যে বিভক্ত এই পৌরাণিক নাটকখানি ত্রৈলোক্যনাথ পানের দলে অভিনীত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ড হইতে গৃহীত সতী মালাবতী চরিত্র নাটকের মূল অবলম্বন। নাটকে উপবর্হণ, সত্যদাস, রক্তদন্ত, বশিষ্ঠ প্রমুখের জন্য উক্তি-গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে নেপথ্য গীতিও রহিয়াছে! কয়েকখানি গান আখরযুক্ত কীর্তনাঙ্গের। নাটকের মোট গীতি সংখ্যা চল্লিশের উর্দ্ধে। সংগীত রচনায় নাট্যকার যথেষ্ট অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত হইল,—

সত্যদাস—···যেদিন সে ভাবের অন্যথা হবে—যেদিন আপনাদের প্রতি আমার এই অচলা ভক্তি কিছুমাত্র বিচল হবে, সেইদিন—সেই মুহূর্তেই যেন সত্যদাসের নাম এ জগৎ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়,—

গীত

যবে সে ভাবের অভাব হবে ভ্রান্তভাবে
সে দিন যেন না থাকি ভবে।
যে ভাবে ভাবি তোমারে ভাবের ভাবী বিনে কে বুঝিবে।
আমি পুত্র তুমি পিতা, অসন-বসন-জীবন দাতা ;
এ ভাবের হলে অন্যথা, নরকেও স্থান নাহি হবে।
তবস্নেহ-তরুছায়া সদা শীতল করে কায়া
কিছার ঐশ্বর্য মায়া, স্বপ্নে মমতায় না ভুলিবে। (২য় দৃশ্য)

পুষ্কলপতি গন্ধর্ব উপবর্হণ সেনাপতি দুর্জয় সিংহকে নারী অবমাননার জন্য তিরস্কার করেন। ইহাতে সেনাপতি অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া উঠেন। কোষাধ্যক্ষ রক্তদন্তকে সিংহাসনের এবং নগরপালকে অর্থের প্রলোভনে তিনি বশীভূত করেন ; ইহার পর প্রজাদের করভার আপাত লাঘব করিয়া দুর্জয় সিংহ তাহাদেরও হস্তগত করেন। গন্ধর্বরাজ উপবর্হণ নিমন্ত্রিত হইয়া দেবসভায় গমন করিলে দুর্জয়সিংহ বিদ্রোহ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এই ভাবে প্রতিহিংসার জ্বালায় উপবর্হণকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাণী মালাবতীকে তিনি নিজের মহিষী রূপে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠেন। দুর্জয় সিংহ কার্যোদ্ধার করিয়া রক্তদন্ত ও নগরপালকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাহারা বিদ্রোহ করেন। দ্বন্দ্বে রক্তদন্ত দুর্জয় সিংহের অস্ত্রাঘাতে এবং নূতন রাজা দুর্জয় সিংহ নগরপালের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। উপবর্হণ দেবসভায় উর্বশীর নৃত্য দেখিয়া কামনাহত হওয়ায় ব্রহ্মা কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার অল্প পরেই প্রাণত্যাগ করেন। মালাবতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য এবং হরিভক্তির মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্রহ্মা উপবর্হণকে পুনর্জীবিত করেন। এই হইল নাট্য কাহিনী। নাটকটির নাম সতী মালাবতী হইলেও ঘটনাবলীতে তাহার প্রাধান্য নাই। মালাবতী ও সত্যদাসের স্ত্রী সত্যবতী দুইটি নারী চরিত্র একই সতীত্ব-ভক্তি ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে। উপবর্হণ কর্তব্য পরায়ণ, স্নেহাশীল ও ভক্ত হইলেও হৃদয় কাম-মুক্ত হয় নাই বলিয়া উর্বশীর নৃত্য ও কটাক্ষে কাম মোহিত হইয়া উর্বশীর হস্তাকর্ষণ করেন। ইহার ফলেই তাহাকে শাপগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হইতে হয়। সত্যদাস শ্রদ্ধাশীল, উপবর্হণ ও মালাবতী তাহাকে প্রতিপালন করেন বলিয়া তাহাদেরই তিনি পিতা-মাতা জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু সত্যদাস যথেষ্ট কারণের অভাবে পত্নীদ্রোহী হইয়া পড়েন; ইহার জন্ম তাহাকে অনুতাপ দগ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। রাজপুত্র দিবোদাস একানে বালকের দৃষ্টান্ত! হরিমাহাত্ম্য প্রচারের দিকে নাট্যকার যত দৃষ্টি দিয়াছেন চরিত্র সৃষ্টির প্রতি তত লক্ষ্য রাখেন নাই! কেবল মাত্র বিশ্বাস ঘাতক, নারীলোলুপ, প্রতিহিংসা পরায়ণ দুর্জয়সিংহ চরিত্র নানা প্রবৃত্তির সংঘাতের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্রই নাটকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ধর্ম ও মনুষ্যত্ব বিরোধী কর্মের মধ্য দিয়া দুর্জয় সিংহ কেবল নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। এই নাটকে বহু দীর্ঘ সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ দ্বাদশ দৃশ্যের একটি দীর্ঘ স্বগত উক্তির মধ্য দিয়া নাট্যকার দুর্জয় সিংহের মানসিকতার পরিচয় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যাত্রা নাট্যে এইরকম অবস্থায় সাধারণত মানসিক বৃত্তিকে কুমতি প্রভৃতি চরিত্রে পরিণত করিয়া একটি সংগীতময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু নাট্যকার এই জাতীয় পরিস্থিতি রচনার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। এই নাটকে সংলাপ রচনায় পদ্য ছন্দেরও অনুসরণ করা হইয়াছে। নাট্যকার সংলাপ রচনায় সারল্য বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পদ্য সংলাপে গৈরিশ ছন্দ ও মিত্রাক্ষর ছন্দ অনুশীলন করেন। এখানে মিত্রাক্ষর ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

দুর্গা—নির্ভয়—নির্ভয়—নির্ভয় নারদ!

কিবা চিন্তা বাপ আমার আমি হব কর্ণধার
অভিশাপ-সাগরে তোমার।
এ কৈলাস পরিহরি সন্ন্যাসিনী বেশ ধরি
থাকিব রে কানন-মাঝারে॥
শুনাইব হরিনাম, অবিরাম অবিশ্রাম,
করিবিরে তুই হরি গান।
কিবা তরু কিবা লতা সবে হরি নাম কথা
কহিবেরে মাতাইয়া প্রাণ॥
হরিনাম হরিনাম সুখশান্তি মোক্ষ ধাম
আমি তোরে দিব দীক্ষা-দান।
ভয় কি রে বাপ আমার মুছে ফেল অশ্রুধার
প্রাণ দিয়ে করিব রে ত্রাণ॥ (১ম দৃশ্য)

নাট্যকার ভক্তি ও করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন।

অনুধ্বজের হরি সাধনা—(প্রকাশ ১৩১১) এই নাটকটি নাট্যকারের মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ সেন কর্তৃক ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিল্বরাজ রথধ্বজের পুত্র অনুধ্বজ হরিভক্ত ছিলেন। তাহার হরিভক্তির প্রাবল্যে রথধ্বজ সর্ব দুঃখ মুক্ত হইলেন। এই কাহিনী লইয়া নাট্য রচনা করা হইয়াছে। নাটকের বহু স্থলে ছোট ছোট সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে। এই পালাটি মতিলাল রায়ের 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ' দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, ইহাতে ভক্তি ও করুণ রস পাধান্য পাইয়াছে। নাটকখানি পিতাম্বর পানের দলে অভিনীত হয়। 'পৃথু রাজার শতাশ্বমেধ,' 'অভিমন্যু' 'কর্ণবধ' 'হংসধ্বজের মহামুক্তি' (রচনা ১৩০৪ প্রকাশ ১৩১৪) 'মহাপরীক্ষা,' 'উমাতারা' (প্রকাশ ১৩১৫) 'বিল্বমঙ্গল' (প্রকাশ ১৩১৪), 'রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর' নামে নাট্যকার আরো কয়েকটি পালা রচনা করেন। তাহার কতগুলি নাটক অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'নাগযজ্ঞ' নামে তিনি চার অঙ্কের একখানি থিয়েটারী নাটক রচনা করেন; ইহা রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহার পর হইতে অন্নদা প্রসাদ যাত্রানাট্য রচনায় ব্রতী হইলেন। তিনি কয়েকটি পৌরাণিক যাত্রানাট্য রচনা করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেন।

অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ (১৩০৯)—ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের কাহিনী লইয়া এই পৌরাণিক নাটকটি রচিত হইয়াছে। অজামিলের পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি নাটকের মূল অবলম্বন। ভক্তি, বীর ও করুণ রসের সঙ্গে নারকীয় বীভৎস রসও নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে।

কার্তবীর্য সংহার (১৩০৯)—ইহা মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বীর ও করুণ রসাত্মক পৌরাণিক নাটক। জমদগ্নিহত্যার ফলে উত্তপ্ত পরশুরাম কর্তৃক নিঃক্ষত্রিয়করণে নাটকে তীব্র করুণ রসের সঞ্চার হইয়াছে। শোক সন্তপ্ত কার্তবীর্যমহিষীর প্রতিহিংসা ও যুদ্ধ গমনের মধ্য দিয়া তাহাকে বীরাঙ্গনা

রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কার্তবীর্য ও পরশুরাম চরিত্রদ্বয় বীরত্ব অবলম্বনে রূপায়িত হইয়াছে। অন্নদাপ্রসাদের পালাগুলির মধ্যে এইটি অধিক নাট্যগুণান্বিত।

অর্জুন পরাভব—কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে ইহার কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের মৃত্যু ও নাগকন্যা উলুপীর সাহায্যে তাহার পুনর্জীবন লাভ নাটকের মূল কথা। বভ্রু-বাহনের বীরত্ব ও চিত্রাঙ্গদার কারুণ্য ইহাতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

জয়দ্রথ বধ (১৯০৭)—ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। কাশীরাম দাসের মহাভারতের দ্রোণ পর্বের কাহিনী লইয়া রচিত এই নাটকের গীতি সংখ্যা ত্রিশের উর্ধ্বে। ভীম, জয়দ্রথ, কর্ণ, দুর্যোধন, ভানুমতী প্রমুখের জন্য নাটকে উক্তি-গীতি সংযোজিত হইয়াছে। নাটকের গদ্য সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কর্ণের আত্মসমালোচনা মূলক স্বগতোক্তিটি নব্বই পংক্তি লইয়া রচিত। অন্নদা প্রসাদের নাটকে ভক্তি, বীর ও করুণ রসেরই প্রাধান্য। অহিভূষণ ভট্টাচার্য তাহার যাত্রা পালা সংশোধন করিয়া দিতেন। 'জয়দ্রথ বধ' পালার কৃতজ্ঞতা স্বীকার অংশে অন্নদাপ্রসাদ বলিয়াছেন— "ইহার পরেও তিনি আমার অন্যান্য কয়েকখানি নাটক দেখিতে আগ্রহ ও দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়া স্বীয় মহত্বের যে প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নহে"। অহিভূষণ কর্তৃক সংশোধিত 'জয়দ্রথ বধ' অন্নদা প্রসাদের মৃত্যুর পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীদাম উন্মাদ' (দ্বিতীয় সং—১৩২১) ও 'কনৌজকুমারী' নামে তিনি আরো দুইটি নাটক রচনা করেন।

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ (১২৭৯ - ১৩৫০)

তিনি যশোহর জিলার নড়াল মহকুমান্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অঘোরচন্দ্র ভট্টাচার্য কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলে হেডপণ্ডিত রূপে শিক্ষকতা করিবার পরে শেষ জীবনে মল্লিকপুর দক্ষতা বিদ্যানিকেতনে কর্মগ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় তিনি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। অঘোরচন্দ্র একসময় খুব জনপ্রিয় যাত্রা নাট্যকার ছিলেন। এইজন্য নাট্যরসিকবৃন্দ যশোহরে তাহার জন্মজয়ন্তী উৎসব উদ্যাপন করেন। তিনি ঘটনা ও সংগীত প্রধান নাটক রচনা

করিতেন। গণের গান, একানে বালকের গান, আদি রসাত্মক দ্বৈত সঙ্গীত, যাত্রাব্যালে, হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্য ঘটনা বহির্ভূত চরিত্র সৃষ্টি ও নানা রসের যোগান দিয়া তাহার পালা রচিত হইয়াছে। নারী চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর দ্বন্দ্বাদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। অঘোরচন্দ্রের নাট্যসংলাপ দীর্ঘ ছিল। সংলাপ সারল্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তাহার পক্ষে তেমন সম্ভব হয় নাই।

তাহার প্রথম নাটক 'কল্কি অবতার গীতাভিনয়' ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। "এই কল্কি অবতার পুস্তকই আমার ক্ষুদ্র লেখনী হইতে প্রথম প্রসূত এবং যাত্রা সম্প্রদায়েও প্রথম অভিনীত" (ভূমিকা, কল্কি অবতার)। কল্কি পুরাণ হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। দশ অঙ্কে বিভক্ত এই গীতাভিনয় বৌ-কুণ্ডের দলে অভিনীত হয় ১৩০৫ সালে। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় নাটকখানির অভিনয় ব্যবস্থা হয় এবং অভিনয়ের চার বৎসর পরে তাহারই যত্নে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী' হইতে ১৩০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলিয়াছেন—"আরও একটি মহোদয়—যাঁহার যত্নে আমার এই পুস্তক কলিকাতার যাত্রাসম্প্রদায়ে প্রথম অভিনীত এবং সম্প্রতি জনসমাজে প্রচারিত, সেই মহানুভব মহাত্মার নিঃস্বার্থ উপকার এবং অকৃত্রিম ভালবাসা আমার আজীবন হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত থাকিবে। ইনি অন্য কেহ নহেন, সুবিখ্যাত সাঁতরা কোম্পানীর সুলেখক খ্যাতনামা বাবু অহিভূষণ ভট্টাচার্য"। পৌরাণিক নাটক ছাড়া ভক্তিমূলক এবং ঐতিহাসিক নাটকও তিনি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক নাটকেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং এই শ্রেণীর নাটকের সংখ্যাও প্রচুর। কল্কি অবতারের পরে অঘোরচন্দ্র 'মগধবিজয়' (১৯০৩), 'দাতাকর্ণ' (১৯০৪), সমুদ্রমন্থন, 'হরিশচন্দ্র' (১৯১৪) প্রভৃতি নাটক রচনা করেন।

অনন্ত-মাহাত্ম্য (১৩২৩)—কাশীরাম দাসের মহাভারতের (শান্তিপর্ব) অনন্ত ব্রত উপাখ্যান অবলম্বনে এই পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছে। নারী-মোহে কোশলরাজ চিত্রাঙ্গদের দুর্গতি এবং অনন্তদেবের কৃপায় দুঃখমুক্তি—নাটকের মূল বিষয়। অনন্ত চতুর্দশী ব্রত-মাহাত্ম্য প্রচার যে নাটকের উদ্দেশ্য তাহা 'উচিত' চরিত্রের উক্তিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—

উচিত—...এখন মহারাজ, পত্নী পুত্রাদি সঙ্গে করে স্বরাজ্যে গমন কর।

তারপর অনন্ত চতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপন করে অক্ষয় লোকে গমন কর। (৯ম দৃশ্য-৫ম অঙ্ক)। বড় রাণী 'করুণার' প্রতি ছোট রাণী 'মোহিনীর' বিদ্বেষ নাটকে চক্রান্তজাল ছড়াইতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় পত্নীর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য চিত্রাঙ্গদ 'করুণা' ও তাহার পুত্র 'সুধীরকে' বনবাসে পাঠাইলেন। আদর্শ সতী ও ভক্তিমতী নারী করুণা অনন্ত দেবের (নারায়ণ) আরাধনা করিয়া বনবাস কালে দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি অর্জন করেন। মোহিনী কিন্তু বয়স্ক রাজাকে ভালবাসেন না; তিনি তাহার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেন মাত্র। মোহিনী যুবক সেনাপতি বিজয় সিংহকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়া কোশল সিংহাসন অধিকার করিতে চাহেন। কর্তব্যপরায়ণ বীর কোশল সেনাপতি কামুক নারীর অবাঞ্ছিত প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় মোহিনী প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইলেন,—

মোহিনী—অপমানের প্রতিশোধ নেব, কোথায় লুকাবি, কোথায় পালাবি, পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান পাতি পাতি করে তোর সন্ধান করব। সমুদ্রে লুকালে সমুদ্রের জল গণ্ডুষে নিঃশেষ করে তোকে সেখান থেকে বের করব। মরুভূমির ধূ-ধূ বালুকা রাশির মধ্য থেকে তোকে টেনে নিয়ে আসব, যাবি কোথায়। মোহিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে কোথাও গিয়ে তোর নিস্তার নেই। আজ হতে মোহিনী ভীষণ সংহারিণী মূর্তিতে এই ছুরিকা হস্তে তোরই অনুসন্ধানে বেরুবে। দেখি কেমন করে তুই রক্ষা পাস। (৯ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)।

উত্তুঙ্গ উচ্চাশা ব্যর্থ হইবার ফলে লালসাময়ী প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী 'মোহিনীকে' শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হইতে হয়। নাট্যকাহিনীর চালক চক্রান্তময়ী মোহিনীর জন্য মুগ্ধ চিত্রাঙ্গদ রাজ্যহারা হইলেন। কিন্তু 'করুণার' ভক্তি প্রভাবে অনন্তদেবের কৃপায় রাজা পত্নী-পুত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। করুণার পুত্র সুধীর একানে বালক, অল্প বয়সে অনেক কষ্টভোগ করিয়া দেব-মাতৃভক্ত এই বালক সুখের নীড়ে ফিরিয়া আসে। নাটকখানি আদি, করুণ, ভক্তি, রৌদ্র ও বীভৎস রসকে প্রাধান্য দিয়া রচিত হইয়াছে। ইহাতে যাত্রাব্যালে ও আদি রসাত্মক দ্বৈত-সঙ্গীত (ঝাড়ুদার—ঝাড়ুদারনী) সংযোজিত হইয়াছে। ইহা 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য-সমাজে' অভিনীত হয়। জনপ্রিয়তার জন্য ১৩৪৩ সালে ইহার নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কুরুপরিণাম (১৩২৮)—ইহা শশিভূষণ অধিকারীর দলে অভিনীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। কণ্ঠালিঙ্গন বদ্ধ নটনটীর নৃত্য-গীতে প্রস্তাবনার অবতারণা ও সমাপ্তি করা হইয়াছে,—

প্রস্তাবনা, গীত এবং নৃত্য করিতে করিতে কণ্ঠালিঙ্গনবদ্ধ নট-নটীর প্রবেশ—

গীত

নট—কিবা শোভা মনোলোভা দেখলো সই চাঁদবদনী।
নটী—তোমার তরে থরে থরে (দেখ) ফুটেছে ফুল গুণমণি॥
নট—কুহু কুহু তানে কোকিল ঝঙ্কারে।
নটী—গুণ গুণ রবে অলি মধুর গুঞ্জরে॥
নট—ধীরে নীল নীরে নাচিছে নবনলিনী॥

নাটকের প্রস্তাবনায় মূলভাবের ইঙ্গিত, মুখ্য ঘটনার সূত্র, দেব চরিত্রের মানবরূপে মর্তে আগমন-সংবাদ, প্রধান দেবচরিত্রের মহাত্ম্য কীর্তন, অথবা মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি অবলম্বন করা হয়। নট-নটীর এই জাতীয় প্রেমগীতি লইয়া প্রস্তাবনা এই নূতন। কুরুপরিণাম-এর মত শোকাবহ নাটকে এই শ্রেণীর প্রস্তাবনা উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হারাধন রায়ের 'ধর্মের জয়' (১৩২০) নাটকের মূল ঘটনা এবং এই নাটকের মুখ্য ঘটনা একই। এই নাট্য পাঠে উল্লিখিত নাটকখানি বহুস্থানে স্মৃতিপথে উদিত হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ অংশ অবলম্বনে 'কুরুপরিণাম' রচিত হইয়াছে।

সুমতিকে পরিত্যাগ করিয়া কুমতি দ্বারা চালিত হইয়াছিল বলিয়া কৃতকর্মের জন্য দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয় এবং কুরুপতনে পাণ্ডবদের রাজ্যলাভ ঘটে। এই মূল কাহিনীর পাশে নাট্যকার আর একটি উপকাহিনীকে নাটকে স্থান দিয়াছেন। রাজ্যলোভে অঙ্গরাজ্যের সেনাপতি 'দুর্জন সিংহ' হিংস্র কাপালিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কর্ণবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত। এক্ষেত্রেও দুর্জনসিংহ কুকর্মের ফল ভোগ করেন। নাটকে গানের সংখ্যা চল্লিশের উর্ধ্বে। গান্ধারী, পদ্মাবতী, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অশ্বথামা প্রমুখের জন্য জুড়ির গান নাটকে সংযুক্ত হইয়াছে। নাটকে কয়েকটি গণের গান রহিয়াছে। শকুনির মৃত্যুর পরে নগর পথে নাগরিকাগণের গীতটি উদ্ধৃত হইল; এই গানে শকুনির চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

গীত

(দিদিলো) বালাই গেল, বালাই গেল ঠাণ্ডা এবার হল দেশ।
বাস্তু ঘুঘুর বাচ্চা মামা যমের ঘরে গেল শেষ॥
এমন মামার জোড়াটি আর মেলেনা কোথায়,
দেখা হলে বলতে পার কালনেমীও হেরে যায়।
কীর্তিধ্বজা উড়িয়ে মামা রাখলে নামটা বেশ॥

(৮ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

এই সংগীতটি লইয়াই দৃশ্যটি রচিত হইয়াছে। কর্ণপুত্র 'বৃষকেতু' একানে বালক। কাপালিকের খড়্গাঘাতে জীবনাবসানের উপক্রম হইলে মাতৃভক্ত বৃষকেতু গাহিয়া উঠিল,—

কোথা মা দুঃখিনী আমার, একবার এসে কর মা কোলে।
জন্মের মত প্রাণ ভরে ডাকি তোরে মা মা বলে॥
সকল আশা ভেঙ্গে গেল কোন সাধ মোর না মিটিল
মনের সাধ যত মনেতে রহিল,—
আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হল, কোথা মা যাব মা চলে।
পড়েছি কৃতান্ত করে, নিতান্ত বধিবে মোরে
কেহ নাই মা এ সংসারে রাখিতে আমারে,
আজ বিদায় হল বৃষকেতু দুঃখিনী মা তোরে ফেলে॥

(৫ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

দীর্ঘসংলাপ নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; এই সংলাপে কৃতকর্মের জন্য দুর্যোধনের অনুশোচনা এবং করুণ পরিণামের কথা ব্যক্ত হইয়াছে,—

(ভগ্নোরু অর্ধশায়িত ভাবে দুর্যোধন আসীন)

দুর্যোধন—কে বলে দুর্যোধন বেঁচে নাই। কে বলে দুর্যোধনের রাজসিংহাসন শূন্য হয়েছে? কে বলে দুর্যোধন ভ্রাতৃবন্ধু হারা হযেছে—কেন, কেন, এই যে দুর্যোধনের দুর বক্ষস্থলে এখনও স্পন্দন অনুভব হচ্ছে, এই যে এখনো দুর্যোধন সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করে রয়েছে, এই যে এখনো সসাগরা ধরার

অধীশ্বর রাজা দুর্যোধন ভ্রাতা বন্ধুগণের শবময় দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে, শব-ভোজী শিবাকুল, শকুনি, গৃধিনীলয়ে রাজ্য-সুখ সম্ভোগ করছে, এই যে এখনো উন্মুক্তশ্মশান প্রান্তরে নীলচন্দ্রাতপরূপে নীলআকাশ মস্তক উপরিভাগে লম্বমান রয়েছে, দিবানিশি সুর্য চন্দ্র সমভাবে রাজা দুর্যোধনকে রাজকর প্রদান করছে, তবে কে বলবে দুর্যোধন রাজ্যহীন হয়েছে? শয্যাহীনই বা হয়েছে কোথায়? এই যে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বালুকা শয্যায় শয়ন করে, মৃত গলিত শব রাশির সুগন্ধবাহী গন্ধবহের শীতলব্যজন উপভোগ করছি, তবে দুর্য্যোধন রাজ্যহীন হয়েছে, এ মিথ্যা কলঙ্ক কোন মিথ্যাবাদী রটনা করেছিল? বেশ আছি। বেশ ঘুমুচ্ছি, তবে তোরা কেন বৃথা জ্বালাতন করিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। সব কথা দুর্যোধনের স্মরণ-পটে লেখা রয়েছে; বলেছিলে, বলেছিলে, তুমি পিতামহ ভীষ্মদেব। তুমি গুরু দ্রোণাচার্য্য! পাণ্ডব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বারংবার নিষেধ করেছিলে, সে সব কথা দুর্যোধনের মনে আছে, তুমি খুল্লতাত বিদুর, তুমি পিতৃবন্ধু সঞ্জয়। তোমাদের তো কোন কথা দুর্যোধন বিস্মৃত হয় নাই। শুনেছি শুনেছি অন্ধ মাতা গান্ধারীর করুণ রোদন বেশ করে দুই কর্ণ ভরে শুনেছি, দেখেছি, দেখেছি, সরলা পতিব্রতা ভানুমতীর পুত্রশোক সহ্য করে পতির মঙ্গল কামনা করা, এ সবই আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তবুও তোমরা আমায় জ্বালাতন করবে, তবুও তোমরা আমায় একটু সুখে নিদ্রা যেতে দেবে না? কি যন্ত্রণা! তবুও তোমরা আমায় জোর করে দেখাবে? আমি কি অন্ধ হয়েছি? আমি কি দেখতে পাচ্ছি না? ঐ যে পাণ্ডবপত্নী ভ্রাতৃবধূ একবস্ত্রা রজঃস্বলা পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে প্রিয় ভ্রাতা দুঃশাসন ঐ যে সভামধ্যে উলঙ্গিনী করবার জন্য ঐ যে ভ্রাতা আমার সজোরে বসন আকর্ষণ করছে। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না, পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় বৃকোদর গদাহস্তে লোহিত লোচনে ধর্মরাজের ইঙ্গিত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছে? আমি কি দেখতে পাচ্ছি না যে ঐ নিয়তির নীলাঞ্চল মধ্যে জয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে দুর্যোধনের ভবিষ্যৎ ধ্বংস চিত্র হস্তে করে কৃষ্ণসহ ঐ বিজয়ী পাণ্ডবগণ হাসতে হাসতে ঐ যে বিরাজ করছে। তবে কেন বল তোমরা আমাকে জ্বালাতন করছ? আমি বেশ ঘুমুচ্ছি, ঘুমোই, আর আমাকে জাগিও না।

(চক্ষু মুদ্রিত করণ)

[কর্মফলের প্রবেশ]

কর্মফল—লহ কর্মফল, এনেছি সেই ফল ফলেছে যে ফল অকর্ম তরুমূলে।
স্বকরে সলিল করিলি সিক্ত, দিবানিশি বসি যে তরুরমূলে॥
ধ্বংস তরু রোপি কৌরব-ভূমিতে কৌরবের চিতা জ্বালিলি করেতে
গৌরবের সহ বৈভব নাশিতে বাতি দিতে কারে না রাখিলি কুলে॥
আপনি জ্বলিলি আপনি নিভিলি ধর্মাধর্মে নিজে জলাঞ্জলি দিলি,
স্বকর্মের ফল আপনি ভুঞ্জিলি, পাপানল ঐ উঠিছেরে জ্বলে॥

(৯ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

জীবনে কর্মই প্রধান। নিজ নিজ কর্ম ভোগ করাই জীবনের বিধান। কুকর্ম পরিত্যাগ করিয়া সুকর্মের সাধনা দ্বারা মানবকে কর্মবীর হইবার জন্য সর্বদা চেষ্টিত হইতে হইবে। এইরূপ কর্মযোগ শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ জীবদেহ ধারণ করিয়াছেন। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চক্রী কৃষ্ণের এই চরিত্র রহস্য শিবের সংলাপে নাট্যকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—

শিব—চিন্ময়! তুমি কখনো চিৎস্বরূপ আনন্দময়ভাবে যোগিগণের ধ্যানের বিষয় হও, আবার কখনো জীবদেহ ধারণ করে কর্মযোগ শিক্ষা দিবার জন্য জীবের দৃষ্টি গোচর হও। আজ আবার এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মধ্যে পাণ্ডবগণ সঙ্গে করে কর্মযোগের মীমাংসা সাধনে ব্যস্ত হয়ে রয়েছ, কর্মময় সংসারে জীবকে কর্মবীর করবার নিমিত্ত অনন্তকর্মী হরি। তুমি কর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করে আবার এক নূতন লীলা বিকাশ করছ। (৬ষ্ঠ দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র অশ্বত্থামা ক্ষত্রধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ; পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পৈশাচিক উপায়ে তিনি পঞ্চপাণ্ডব-শিশু হত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত উগ্রচণ্ডারূপ পরিত্যাগ করিয়া কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেন এবং ক্ষত্রবৃত্তি সমাপন করিয়া অস্ত্রপরিত্যাগান্তে স্বধর্ম আশ্রয় করেন। এই চরিত্রে রৌদ্র, বীভৎস ও শান্ত রসের অবতারণা করা হইয়াছে? কাপালিক চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার চিরাচরিত কামুকতা ও বীভৎস ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যাত্রানাট্যে কাপালিক চরিত্র সৃষ্টিতে সাধারণত এই রীতি অবলম্বন করা হয়। পূর্বের বেশ্যা বর্তমানে বৈষ্ণবী 'রসময়ী' এবং ভাণ্ডেশ্বর চরিত্রদ্বয় হাস্যরসের জন্য নাটকে স্থানলাভ করিয়াছে। রসময়ী এক সময় শকুনির

আশ্রয়ে ছিল—'মনোমোহিনী শকুনির প্রাণরক্ষিনী'রূপে ; শকুনির মৃত্যুর পরে সে কাপালিকের প্রেমাবদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ছেলের দলের তাড়া খাইয়া তাহাকে পলাইতে হয়। শকুনি-রসময়ীর সম্পর্কের মধ্য দিয়া নাট্যকারের অদ্ভুত কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় ভাব লইয়া কোন লোক-নাট্যকার এপর্যন্ত শকুনি চরিত্র চিত্রিত করেন নাই। গান্ধারী পুত্র-শোকাতুরা হইলেও বীর জননীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী বাৎসল্য ভাবের চরিত্র। আদি, বীর, হাস্য, বাৎসল্য, বীভৎস, করুণ ও ভক্তিরস অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে। নাটকের প্রত্যেক চরিত্রই কৃতকর্মের জন্য ফলভোগ করিয়াছে। নাটকের শেষে একটি ক্রোড়াঙ্ক যোগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন লাভ দেখান হইয়াছে।

চন্দ্রকেতু (১৩২৯)—এই আখ্যানমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটকটি নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। নাটকখানি শশিভূষণ হাজরা প্রতিষ্ঠিত 'সন্তোষপুর শান্তিনাট্য সম্প্রদায়ে' অভিনীত হয়। ইহার গানের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। আদি রসাত্মক দ্বৈত-গান এবং যাত্রা-ব্যালে ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। নাট্যকারের ব্যালে রচনার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

(প্রমোদ উদ্যান, মদমত্ত বিক্রমকেতু সহ নর্তকীগণের প্রবেশ)

নর্তকীগণ (নৃত্য সহ)—ঝিকি মিকি আঁখি মোদের মাটি মাটি গা।
ঢলি ঢলি গায়ে পড়ি টলি পড়ে গা॥
রঙ্গিলা পেয়ালা ভর্তি প্রাণে চায় বেজায় ফুর্তি
বেহাগের তানে কান করেলো ঝাঁ ঝাঁ॥
এ হেন সুরাতে পরাণ বঁধু কেমনে যামিনী জাগিব শুধু
চুমে চুমে পিয়ো মধু নিঝুম রজনী সাঁ সাঁ সাঁ॥

(প্রস্থান—৬ষ্ঠ দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)

আখরযুক্ত কীর্তন গান ও নাটকে সংস্থাপিত হইয়াছে। অবন্তীরাজ 'বিক্রম-কেতু' মন্ত্রী এবং সহকারী সেনাপতি 'দুর্জন সিংহের' চক্রান্তে পড়িয়া ন্যায়পরায়ণ সেনাপতি 'জয়সিংহকে' কারারুদ্ধ করেন এবং পুত্র 'চন্দ্রকেতুকে' রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। মহিষী 'অলকা'ও পুত্রের অনুগামিনী হইলেন। ইহার পর সিংহাসনলোভী মন্ত্রী ও সহ-সেনাপতি রাজাকে হত্যা করিতে উদ্যত

হইলে বয়স্য ও সেনাপতির সাহায্যে তিনি প্রাণে বাঁচেন। আঘাতে আঘাতে অনুতপ্ত বিক্রমকেতুর চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে এবং শেষে নির্বাসিত পুত্রকে সিংহাসন দান করেন। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী। এই কাল্পনিক কাহিনীতে পুরুষকার ও দৈবের দ্বন্দ্বে দৈবকে জয়ী করা হইয়াছে। দেবানুকূল্যেই নির্বাসিত রাজপুত্রের রাজ্যলাভ ঘটে। বিক্রম চরিত্রটি প্রথমে পুরুষকার অবলম্বনে রচিত হয়; এই পুরুষকার ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিবর্তিত হয়। বিক্রমদেব নারীলোলুপতা, অবিচার ও অত্যাচারে প্রচণ্ড হইয়া উঠেন। রাজ্যলোভী মন্ত্রী ও সহ-সেনাপতি একদিন তাহার জীবন নাশের চেষ্টা করেন। ইহাতে সংসারের প্রতি রাজার বিতৃষ্ণা জন্মে। তিনি সংসারের মহাসত্য আবিষ্কারে বনবাসী হইলেন। নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ঘটনাচক্রে রাজচরিত্রটিও পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়া দৈবাধীন হইলেন। কিন্তু তিনি ইহার অনিবার্য কারণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। রাজবিদ্বেষী ছিলেন মন্ত্রী ও সহ-সেনাপতি। রাজাকে হত্যা করিতে গিয়া তাহারা দুজনেই বিশ্বাসী ও রাজভক্ত সেনাপতি জয়সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইহার পর রাজার পক্ষে নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত কারণ থাকিতে পারে না, এখন তাহার ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া নির্বিঘ্নে রাজ্য পরিচালনা করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। বিক্রম দেবের মধ্যে পুরুষকার ছিল না, পুরুষকার আশ্রয়ের বাসনা তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল মাত্র। পুরুষকার ও দৈবের দ্বন্দ্ব দেখাইয়া নিশ্চিতভাবে পুরুষকারের পরাজয় প্রতিষ্ঠিত করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই নাটকেও 'কর্মফল' চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। এই চরিত্রটি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বিক্রম দেবকে কর্মফল সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করেন। 'কুরু-পরিণাম' নাটকেও 'কর্মফল' চরিত্র গীতকণ্ঠে দেখা দিয়াছিল। বস্তুত এই শ্রেণীর চরিত্র লোকনাট্যের ছকে বাঁধা চরিত্র (stock character); বিভিন্ন সুযোগে নাটকে ইহারা আসা যাওয়া করে।

মেবার কুমারী (১৯২৩)—ইহা পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। [1]'Annals of Mewar' হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই নাটক বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া নাট্য রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক নাটকের তথ্য

1. Annals of Mewar—Ed. C. H. Payne—1913.

অবিকৃত রাখিতে চেষ্টা করা যে প্রয়োজন লেখক ইহার সম্পর্কে সচেতন,—"মেবার কুমারী ঐতিহাসিক নাটক সুতরাং সাধ্যমত এই নাটকে ইতিহাসের তথ্য ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি" (ভূমিকা)। ঝাড়ুদার-ঝাড়ুদারনীর দ্বৈত-নৃত্য-গীতি, গণের গান, যাত্রা-ব্যালে-গীতি প্রভৃতি সহ ইহাতে প্রায় চল্লিশখানা গান সংযোজিত হইয়াছে। এই নাটকের গদ্য সংলাপ পূর্বাপেক্ষা ছোট হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীকে অবলম্বন করিয়া রাণা ভীমসিংহ ও মানসিংহের দ্বন্দ্ব নাটকের মূল বিষয়; ভীমসিংহ দুর্বল চরিত্র। যুদ্ধ বিমুখ ভীমসিংহ শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকুমারীর পরপারে যাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেনাপতি অজিত সিংহের চরিত্রে বীরত্ব, দেশপ্রেম ও কর্তব্য বোধ স্থান পাইয়াছে। কৃষ্ণকুমারী কৃষ্ণ সাধিকা; ইহাই নাটকের নায়িকা চরিত্র। পিতাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেমের বলে তিনি বিষপান করিয়া জীবনাবসান ঘটাইলেন। ঐতিহাসিক নাটক হইলেও নাট্যকার ইহাতে ভক্তি ভাবের সমাবেশ করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায়ও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—"এদেশের এই ভারতের যাহা প্রাণ, সেই ভক্তিভাবের সমাবেশ করিতে কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইয়াছি"। এই ভক্তি বলেই পঞ্চম অঙ্কের দশম দৃশ্যে নিত্যধামে কৃষ্ণা ও কৃষ্ণরূপী নন্দলালের মিলন দেখান হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞাপালন (১৩৩২)—এই পৌরাণিক নাটকখানি ভূষণ দাসের দলে অভিনীত হয়। ইহার গানের সংখ্যা পঁয়ত্রিশের অধিক। দুর্যোধন দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, অর্জুন প্রমুখের জন্য উক্তিগীতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অর্জুনের উপাংশুব্রত এবং ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের বক্ষ-রক্ত-পানের প্রতিজ্ঞা-পালন-কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে। ইহা রৌদ্র, বীর, করুণ ও ভক্তিরসের নাটক। নাটকে গদ্য ও পদ্য সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে; ইহার পদ্য সংলাপে অমিত্রাক্ষরছন্দ ছাড়াও মিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণা করা হইয়াছে। এই জাতীয় স্তবক-বন্ধ সংলাপের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

১

অর্জুন— আমার অদৃষ্টে আছে অশেষ লাঞ্ছনা।
জীবনের অন্তরালে
হারাইয়া বুদ্ধিবলে
অন্তরে অনন্ত আশা করেছি কল্পনা।

২

আমার অদৃষ্টে আছে অশেষ লাঞ্ছনা।
জন্ম তোর যার বীর্যে
সেই কর্ণ অঙ্গরাজে
কতবার এই পার্থ দিয়েছে যন্ত্রণা।
আমার অদৃষ্টে আছে অশেষ লাঞ্ছনা॥

৩

আমার অদৃষ্টে আছে অশেষ লাঞ্ছনা।
যাহার ঔরস জাত
অভিমন্যু বিশ্বখ্যাত
যার সঙ্গে রণে তুই হারালি চেতনা
তাহার পিতার ভাগ্যে অশেষ লঞ্ছনা॥
ভেকের বাসনা যথা সমুদ্র শোষণে
মক্ষিকার ইচ্ছা যথা স্বরগ গমনে,
পঙ্গু যথা বাঞ্ছা করে লঙ্ঘিতে পর্বত
সেইরূপ তোর আশা বাতুলের মত॥

(১ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)

এই নাটকে কর্ণচরিত্র সৃষ্টিতে কিছু নূতনত্ব রহিয়াছে; তাহার মধ্যে প্রথম হইতেই কৃষ্ণভক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন। কর্ণের সংলাপ ও কর্ণের জন্য প্রদত্ত জুড়ির গানে ইহা প্রকাশিত,—

কর্ণ— তাই বলি হে কেশব, পুত্র হতে আজি আমি ধন্য হব ভবে,
তব কৃপাবিন্দু পেয়ে হইয়াছি ধন্য এবে।

জুড়ির গান

ধন্য আমি ভবে আজি এই ভবে
ভাবের অভাব ধনে করেছি ধারণ।
নাহি চাহি আর তুচ্ছ রাজভার
সংসার অসার জেনেছি তার সার
কেবল সুপুত্র আমার মঙ্গল কারণ॥

কর্ণাকাশে কৃষ্ণ পূর্ণ শশধর—
বৃষকেতু আমার চকোর,
সুধার আসে বাছা ভ্রমে নিরন্তর—
সুধাবিনা দুঃখে জীবন যাপন ॥
বড় আশা করে কৃষ্ণ তব সনে
খেলিতে বাসনা করিয়াছে মনে,
প্রবোধিছ তারে আসি অন্য দিনে
পুরাব বাসনা বলিছ বচনে—
ভক্তাধীন কৃষ্ণ এ ভব সংসারে
সুধাদানে রুষ্ট হওনা বাছারে,—
(কারণ) ক্ষণকাল পরে নয়ন আসারে
মাতাপুত্র দোহে হবে নিমগণ ॥

(৭ম দৃশ্য, ১ম অংক)

তারকাসুর বধ (১৯২৬)—ইহা বীণাপাণি যাত্রা পার্টিতে অভিনীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক ॥ দৈত্যরাজ তারকামহিষী 'প্রচণ্ডা' ইন্দ্রপত্নী 'শচীর' সৌন্দর্যে বিদ্বেষ পরায়ণা হইয়া উঠেন ; বিদ্বেষ-জ্বালার অবসান কল্পে তিনি শচীকে দাসীরূপে পাইতে চাহেন। তারকাসুর শচীকে বন্দী করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। 'চৈতন্যরাম' সংগীতে তাহার বিবেক জাগ্রত করিতে ব্যর্থ হইলেন,—

তারকাসুর— স্বর্গপুরী আজ আনিব উপাড়ি।
ফেলাইব তারে সাগরের জলে
অথবা সে পুরী রেণু রেণু করি
মিশাইব ধূলিকণা সনে।
না মারি পরাণে
আনিব শচীরে আপন ভবনে,
দিব উপহার মহিষীর করে।
কক্ষভ্রষ্ট উল্কা সম যাইব ছুটিয়া
নিবারণ কারো না শুনিব আর।

(বেগে যাইতে উদ্যত, সহসা চৈতন্যরামের প্রবেশ)

গীত

চৈতন্যরাম— ওরে কথাটা বুঝি শুনলি না।
পাগল বলে পাগলের কথা
হৃদয়ে বুঝি গেলনা ॥

তারকা—যাও পাগল! সব সময় বিরক্ত করো না, আমি কারো কথা শুনব না।

চৈতন্যরাম—(গীতাংশ)

তুই শুনবি কি আর, তোর শোনবার দফা রফা হয়েছে,
কালসাপিনী তোর ঐ রানী আজব মন্ত্র ঝেড়েছে।
এবার দেখবি মজা কেমন সাজা ভগা বেটা তো শুনবে না ॥

(প্রস্থান—২য় দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

স্বর্গ আক্রমণকারী দৈত্য সম্রাট তারকার সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে বীর দৈত্য নিহত হইলেন। কিন্তু দৈত্যপতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভক্তিভাব ছিল বলিয়া তিনি অন্তিমে মুক্তি লাভ করেন। নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ঘেষড়া-ঘেষড়ানীর মদ্যপান ও দ্বৈতনৃত্য-গীতের অবতারণা করা হইয়াছে। সমগ্র কাহিনীর সঙ্গে বেমানান এই অংশের অবতারণার মূল উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন। ইহা তৎকালীন চাহিদা অনুযায়ী নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাট্যকারের এই শ্রেণীর দ্বৈতগীতের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

(ঘেষড়া-ঘেষড়ানী নৃত্যসহ গান করিতে করিতে প্রবেশ)

ঘেষড়া –মাইরি মাইরি, মাইরি মাইরি, মাইরি মাইরি তুই যে আমার প্রাণ।
ঘেষড়ানী—এক দু তিন চার—এক দু তিন চার, এ কদু তিন চার,
এক দু তিন চার তুই যে রে বেইমান,
শুধু মুখের সুধায় ভুলিয়ে আমার মজিয়ে রাখিস প্রাণ ॥
ঘেষড়া—ছিঃ ছিঃ ছিঃ বলিস কিরে—বলিস কিরে ওখেঁদি তুই বলিস কিরে
তোর কথা শুনে মরে যাই—
ঘেষড়ানী—উঃ হুঁ হুঁ গেল বুঝি ১।২।৩।৪।৫, গেল বুঝি গেল বুঝি,
ওরে ধররে আমায় আমি বুঝি আর নাই—

ঘেষড়া—পায়ে ধরি ওরে খেঁদি, যাসনে চলে আমায় ফেলে,
এই দেখ আই ঢাই করে প্রাণ।
ঘেষড়ানী—তোর শিরের ভিতর হীরের ছুরি, উহু মরি আর মারিসনে
বেইমান।। (৬ষ্ঠ দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

নাটকে যাত্রা-ব্যালেও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা আদি, রৌদ্র, বীর ও ভক্তিরস প্রধান নাটক। নাটকের মূল কাহিনী ব্যাসদেবের মহাভারতের শল্য পর্বের ৪৭শ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শতাশ্বমেধ (১৩৩৬)—ইহার মূল কাহিনী ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। নাটকটি শশিভূষণ হাজরার শান্তি অপেরায় অভিনীত। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের গানের সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ। গণের গান ব্যালে ও নেপথ্য গীতি ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। চন্দ্রবংশের অত্যাচারী রাজা 'বেণ'-এর পুত্র পৃথিবীপতি 'পৃথু' অস্পৃশ্য নিষাদ 'ঝিমনলালকে' আলিঙ্গন দান করেন বলিয়া রাজপুরোহিত 'সনকের' ব্যবস্থায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস যাপন করেন। বনবাসান্তে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্‌যাপন করিয়া তিনি পৃথিবী হইতে পিতৃকলঙ্ক দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। যজ্ঞের ফলে স্বর্গপতি ইন্দ্রের সিংহাসনচ্যুতিভয় উপস্থিত হওয়ায় তিনি যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া রাজ্যে নানাপ্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি করেন। শেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি ধর্মপরায়ণ পৃথুকে পরমার্থপদে আত্মমন নিয়োগ করিবার বর দান করেন। রাজা যজ্ঞ ব্যবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক পুত্র 'নিরঞ্জনকে' রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। সম্রাট পৃথু ধর্মপরায়ণ ও ক্ষত্রিয় বীর; তাহার অন্তরে মাঝে মাঝে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার বৈপরীত্য লইয়া সিন্ধুরাজ 'দুর্দমনের' চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। তিনি নাস্তিক, তাহার সমগ্র রাজ্যে নাস্তিকতার প্রভাব। রাজা দুর্দমন কামিনী-কাঞ্চন লোভে আত্মহারা। নাট্যকার 'কাঞ্চনকে' দেহরূপ ধারণ করাইয়াছেন 'কামিনী' ও 'কাঞ্চনের' সঙ্গীত স্রোতে দুর্দমনকে ভাসাইয়া দিয়াছেন। নাটকে হাস্যরস পরিবেশনের জন্য বয়স্য চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। রাজপুরোহিত সনক বর্ণাশ্রম ধর্মপালনে তৎপর। এই রীতি অনুসারে তিনি রাজা পৃথুকে বার বৎসর বনবাস করিতে আদেশ দেন। কিন্তু এই গুরুদণ্ড দানের ব্যবস্থায় সনকের মন প্রথমে সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরে সেই সংশয় দূরীভূত হয়। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই নীতি অনুযায়ী সনক পৃথুকে

রাজ্য পরিচালনা করিবার নির্দেশ দিতেন। নাট্য কাহিনী সনক দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়াছে। দুর্দমনের স্ত্রী সুনন্দা স্বামি-প্রেমিকা,—

সুনন্দা—...স্বামীর সমস্ত দুঃখের ভার, সমস্ত যন্ত্রণার ভার, সমান ভাগে ভাগ করে ভোগ করেছি। জাননা তুমি দাদা। গভীর নিশীথে নিদ্রিত স্বামীকে যখন ব্রহ্মহত্যার অভিশাপগুলি স্বপ্নঘোরে কালসাপের মত এসে দংশন করেছে তখন সেই অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মহত্যায় উদ্যত স্বামীকে সারা রাত্রি জেগে আমিই রক্ষা করেছি। (৪র্থ দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)

সুনন্দার সংলাপে ব্যক্ত 'দুর্দমন' চরিত্রের এই পরিকল্পনায় অঘোর চন্দ্র ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলমগীর' নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। আলমগীরও নিদ্রিত অবস্থায় দেবদূতের তাড়নায় আত্মহত্যায় উদ্যত হইতেন; 'উদিপুরী' বেগম শয্যাপার্শ্বে সারারাত জাগিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেন,—

আওরঙ্গজীব—কারা ?

উদিপুরী—যেসব দেবদূত আপনাকে আত্মহত্যা করাবার জন্য এই রকম অমাবস্যার রাত্রিতে ঘুমন্ত আপনার হাতে ছোরা তুলে দেয়।

(তয়বরখাঁর প্রবেশ)

আওরঙ্গজেব—তয়বর খাঁ, ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অপেক্ষা কর।

(তয়বরের প্রস্থান)

উদিপুরী—আপনার সে বজ্রমুষ্টি থেকে অস্ত্র কে কেড়ে নেবে জাঁহাপনা ? ঘুমন্ত শয্যা থেকে উঠে সে সকল দেবদূতের তাড়নায় যখন আপনি বারাণ্ডা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়তে যান তখন আপনাকে ধরে শয্যায় আবার কে শয়ান করাবে হতভাগ্য সম্রাট ? (৩য় দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

পৃথুর পুত্র 'পুরঞ্জয়ের' চরিত্রে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে,—

পুরঞ্জয়—জাতিগত ভাবে মানুষের কাছে মানুষ অস্পৃশ্য হতে পারে একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। ...এ অন্ধ নিয়ম—এ স্বার্থপর নিয়ম স্বার্থপর মানুষের গড়া। তার প্রবর্তক তোমার ঐ পুরোহিত সনক।

(৩য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

নাট্যকার অস্পৃশ্যতা বর্জনের সমস্যা তুলিয়া ধরিয়াছেন মাত্র; কিন্তু তাহার সমাধান করেন নাই। তাই পুরঞ্জয় নাটকের শেষের দিকে বলিয়াছে— "সমাজ রক্ষা করতে হলে শাসনকর্তা রাজা এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের ও

নিতান্ত প্রয়োজন আছে" (১০ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে গান্ধীজী স্বরাজের জন্য প্রয়োজনীয় অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। নাট্যকারের উপর ইহারই কিঞ্চিৎ প্রভাব পড়িয়াছে। এই সমস্যা সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন —"এখনও এ সমস্যার অনুকূলে বহু মতবাদ চলিতেছে; সুতরাং সেক্ষেত্রে কোনরূপ সমাধান করাই আমি সমীচীন বলিয়া মনে করি নাই"। আসল কথা হইতেছে, তৎকালে মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রার গানে গানে যে কথা স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিয়াছেন অঘোর চন্দ্র তাহা বলিতে সাহস করেন নাই। নাটকের শেষে একটি ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ইন্দ্রকর্তৃক পৃথুকে বরদান ও লক্ষ্মী-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি দেখান হয়।

অনুধ্বজের হরি সাধনা (১৩৪৩)—এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকটি ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত হয়। গণের গান, যাত্রা-ব্যালে, একানে বালকের গান প্রভৃতি লইয়া নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ। প্রস্তাবনায় জানান হইয়াছে যে অনুধ্বজের হরিভক্তি প্রকাশই নাটকের উদ্দেশ্য। সিংহাসন লোভে মন্ত্রী শংকরলালের চক্রান্তে বিল্বরাজ 'রথধ্বজ' মদ্ররাজ 'মলয়কেতুর' হস্তে বন্দী হইলেন। মদ্ররাজের লুব্ধ দৃষ্টি রথধ্বজ-মহিষী 'অলকার' প্রতি। অলকা রাজপুরী হইতে বনে পলায়ন করিয়া নারীত্বের মর্যাদা বাঁচাইতে চেষ্টা করেন। সাধকের সাহায্যে রথধ্বজ কারামুক্ত হইয়া বনগমন করেন। হরিভক্ত বিল্বরাজপুত্র অনুধ্বজ রাজপুরী পরিত্যাগ করেন। কারামুক্ত বিল্বরাজকে হত্যা করিতে উদ্যত মদ্র সেনাপতি 'বীর কেতন' শংকরলাল কর্তৃক নিহত হইলেন, এবং রানী অলকাকে আক্রমনোদ্যত মদ্ররাজ 'মলয়কেতু' ভীলের বর্ষাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর রাজা রানী ও অনুধ্বজের বনে মিলন হয় এবং অনুধ্বজের হরিভক্তি প্রভাবে সকলে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রদর্শন করেন। এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। 'চন্দ্রকেতু' নাটকের মত এখানেও মন্ত্রীর চক্রান্ত দেখা দিয়াছে। ঐ নাটকে মন্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন, বর্তমান নাটকে মদ্র সেনাপতি 'বীর কেতনের' হস্তে মৃত্যু লাভের ভয়ে সুরঙ্গ পথে অবস্থিত মন্ত্রীর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। নাটক দুইটির মন্ত্রী-চরিত্রে এইমাত্র প্রভেদ। 'শতাশ্বমেধ' নাটকের দুর্দমন চরিত্রের মত মদ্ররাজ 'মলয়কেতু' কামিনী-কঞ্চনলোভী। রাজপুরীতে সুরক্ষিত অবস্থায় 'অলকার' পলায়ন অত্যন্ত আকস্মিক। রথধ্বজের কারামুক্তিতে নাট্যকার সাধকের

অলৌকিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। সাধকের কমণ্ডলুর জলের স্পর্শে রাজা কারা হইতে বাহির হইলেন অথচ কারার দ্বার রুদ্ধই রহিল। ইহা গোঁজামিল বলিয়া মনে হয়। শংকর লালের স্ত্রী 'মেধা' স্বামীকে ভালবাসেন কিন্তু তাহার অন্যায় আচরণের সমর্থন করেন না। স্বামীকে ধর্মের পথে ফিরাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়া পরিণামে তিনি সফলকাম হন। বিল্বরাজ-বয়স্য 'রসরাজ' কেবল হাস্যরসিক নহেন, তিনি লোকচরিত্র সমীক্ষারও অধিকারী। শংকলালের চরিত্র রহস্য সহজেই তাহার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞ রসরাজ রাণীর মর্যাদা বাঁচাইবার জন্য মদ্রমন্ত্রী বীরকেতনকে বাধা দিয়া তাহার হাতে বন্দিত্ব গ্রহণ করেন। ইহা আদি, ভক্তি ও করুণ রস প্রধান নাটক হইলেও ইহাতে হাস্য, বীর ও বীভৎস রসেরও অবতারণা করা হইয়াছে।

অভিমন্যু বধের কাহিনী লইয়া 'সপ্তরথী', সুরথ রাজার দুর্গোৎসব অবলম্বনে 'লক্ষবলী', মনসা মঙ্গলের কাহিনী হইয়া 'বেহুলা', 'সমুদ্র মন্থন', 'কংস বধ', 'রাবণ বধ', 'শ্রীবৎস', বিজয় বসন্তের কাহিনী লইয়া 'সৎমা' (১৯২১), 'অদৃষ্ট' (১৯২১), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯২৩), 'তরণীর যুদ্ধ' (১৯২৪), 'নহুস উদ্ধার' (১৯২৫), নিষদরাজ নল ও দময়ন্তীর বনবাসের কাহিনী লইয়া 'নল দময়ন্তী' (১৩৩৪), 'প্রহ্লাদ' (১৯৩৫), প্রভৃতি আরও কয়েকখানি নাটক অঘোরচন্দ্র রচনা করিয়াছেন।

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

নবদ্বীপ নিবাসী এই পালাকার বিংশ শতকের প্রথমভাগে কয়েকটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তাহার রচনায় বিভিন্ন রসের মধ্যে ভক্তি ও করুণরস প্রাধান্য পাইয়াছে। ধর্ম ও নীতিশিক্ষা পালাগুলির মূল লক্ষ্য। 'শ্রীমন্তের মশান' (১৩০৮), 'অনুধ্বজের হরিসাধনা', 'কর্ণের দান পরীক্ষা', 'প্রবীর পতন', 'শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ' প্রভৃতি পার্বতীচরণ রচিত যাত্রাপালা।

কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮৬-১৩১৯)

চব্বিশ পরগণা জিলার ধেনুয়া গ্রাম নিবাসী কেশবচন্দ্র ইষ্টার্ণ রেলওয়েতে চাকুরিরত অবস্থায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'জড়ভরত' নামক পৌরাণিক নাটকটি প্রথম রচনা করেন। ইহার পরে 'মহিষাসুর বধ' ও 'রাণাপ্রতাপ' (ভারত গৌরব) নাট্যদ্বয় রচিত হয়। অপ্রকাশিত 'মহিষাসুর বধ' সত্যম্বর

চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হয়। ইংরেজ সরকার বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হওয়ায় 'রাণা প্রতাপ' পালার মাত্র কয়েকটি অভিনয় হইলে সরকার কর্তৃক ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রাজেয়াপ্ত হয়। কেশবচন্দ্রের নাটকে যাত্রাব্যালে, গণের গান, জুড়ির গান সংযোজিত হইয়াছে। তিনি নাটকে দীর্ঘ সংলাপ সংযোজনা করিয়াছেন; তৎকালীন লোকনাট্যে গানের প্রাধান্য ছিল বলিয়া কেশবচন্দ্র নাটকের শেষে অতিরিক্ত কতগুলি করিয়া গীতি সংযোজনা করিয়াছেন। গানগুলি প্রয়োজনবোধে গীত অথবা পরিত্যক্ত হইতে পারে। ১৩১৯ সালে নাট্যকার পরলোক গমন করেন।

জড়ভরত (১৯০২)—এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী [১]বিষ্ণুপুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। নাটকে ভক্তিরসের সঙ্গে করুণ, বীভৎস ও অদ্ভুত রসের অবতারণা করা হইয়াছে। সকল যাত্রা নাটকেই হাস্যরস কিছুটা থাকে বলিয়া ইহার আর উল্লেখ করা হইল না। মন্ত্রী 'সন্তপের' ভাই 'জড়ভরত'-এর হরিভক্তির মধ্যে নাটকের মূলভাব নিহিত। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক হইতে সিন্ধুরাজ 'রহুগণের' মন্ত্রী সিংহাসনলোভী 'সন্তপের' চক্রান্তে রাজমহিষী 'করুণার' সঙ্গে রাজ-গুরু 'সুব্রতের' অলীক গোপন সম্পর্ক সম্বন্ধে রাজার সন্দেহের সৃষ্টির ফলে রাজ পরিবারের সর্বনাশ ঘটানো প্রাধান্য পাইয়াছে। নাটকে আদ্যাশক্তি 'পাগলিনী' বেশে বহুবার ভক্ত জড়ভরতকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 'পাগলিনী' গানে গানে নাটকে বিবেক ও ধর্মের বাণী ছড়াইয়াছেন। নাট্য সমাপ্তির পরে এই নাটকে সতের খানি অতিরিক্ত গানের সমাবেশ করা হইয়াছে। নাটকের বিভিন্ন স্থানে এই গান গীত হইবার নির্দেশ দেওয়া আছে। গণের গান প্রভৃতির সঙ্গে অতিরিক্ত গান সমেত নাটকের গীতি সংখ্যা ত্রিশের ঊর্ধ্বে। নাট্যারম্ভের পূর্বে গন্ধর্ব বালকগণের 'শ্বেতশতদল বাসিনীর' বন্দনা গানে প্রস্তাবনা অংশটি রচিত হইয়াছে। নাটকের উদ্দেশ্য যে হরিগুণ-গান করা তাহা এই প্রস্তাবনায় প্রকাশিত হইয়াছে,—

'কৃপণা হয়োনা করুণায়,
বাসনা গাহিতে হরিগুণ গান'; (প্রস্তাবনা গীতি)

১। বিষ্ণুপুরাণ—২য় খণ্ড—১ম, ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়

নানা দুঃখকষ্ট এবং প্রবঞ্চনার মধ্যেও 'করুণা' চরিত্রটি সতীত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভক্তি প্রভাবে 'রহুগণ'-এর মোহমুক্তি ঘটে। 'সন্তপ' বিশ্বাস ঘাতক ও স্বার্থপর। তাহার হৃদয়ে স্নেহ, মায়া মমতার লেষ মাত্র নাই। এই চরিত্র নাটকে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং নাট্য কাহিনীকে প্রধানত চালনা করিয়াছে। এই নাটকখানি সত্যস্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজ' কর্তৃক অভিনীত হয়।

সগর-যজ্ঞ—(১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ)—এই নাটকের মূলকাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকাণ্ড হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজে' অভিনীত এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ; ইহা ছাড়াও নাট্যশেষে আটখানি অতিরিক্ত গান গ্রথিত হইয়াছে; প্রয়োজন বোধে এই গানগুলিও গীত হইতে পারে। নাটকে আদি রসাত্মক দ্বৈত-সঙ্গীত, গণের গান ও যাত্রা-ব্যালে সংযোজিত হইয়াছে। ভৃত্য 'ষষ্ঠী চরণ' ও পরিচারিকা 'রম্ভা' আদি রসাত্মক দ্বৈতগীতি পরিবেশন করে। যে দৃশ্যে এই গানের অবতারণা করা হইয়াছে সে দৃশ্যটি নাটকের পক্ষে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় (৫ম গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক দ্রষ্টব্য)। অযোধ্যার নরপতি 'সগর' অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে ইন্দ্র ইহাকে ধরেন। সগর ষাট হাজার পুত্র ও সৈন্যগণ সহ যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে পরাস্ত করেন। কিন্তু নারায়ণের ইচ্ছায় যজ্ঞাশ্ব পাতালে নীত হয়। সগর পুত্রগণ পাতালে অশ্ব সংগ্রহ কবিতে গিয়া কপিল মুনির অভিশাপে ভস্মীভূত হইলেন। পরে সগর যজ্ঞসমাপনান্তে 'অংশুমানকে' সিংহাসনে বসাইয়া লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তি দর্শনে জীবন সফল করেন। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী। কিন্তু নাট্য রচনার দোষে এই কাহিনী একেবারেই অন্তরালে পড়িয়াছে। প্রধান হইয়া উঠিয়াছে সগর পুত্র 'অসমঞ্জার' অত্যাচার, নারীলোলুপতা ও সিংহাসন লাভের জন্য নানা চক্রান্ত এবং পুত্রহত্যার প্রচেষ্টা। প্রস্তাবনা অংশে নাটকের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে,—

দেববালাগণ— (গান)

হরি, মহিমা তোমার গায়িতে বাসনা
তোমার করুণা লইয়া
এস শক্তি দিতে ক্ষুদ্র মানসে
স্বগুণে ক্ষুদ্র হইয়া।

একখানি গানে প্রস্তাবনা সমাপ্ত হইলে নাটকে একটি সূচনা অঙ্ক সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে মর্তে গঙ্গা আনয়নের সূচনা প্রস্তুত করিবার জন্য নারায়ণের কপিলমুনিরূপে মর্তে অবতীর্ণ হইবার কথা জানানো হইয়াছে। সূচনার শেষে পাঁচটি অংক নাটকে সমাবেশ করিবার পরে একটি ক্রোড়াঙ্ক ইহাতে যুক্ত করা হইয়াছে। এই ক্রোড় অঙ্কে সগরের যজ্ঞ সমাপন হয়। সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জা অযোধ্যার ধূমকেতু। তাহার অত্যাচার ও নারী লোলুপতা দেশে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করে। রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইবার পরে সিংহাসন লোভে তিনি পুত্র হত্যায় উদ্যত হইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুদখোর শ্রেষ্ঠী সুধাকরের মৃত্যুতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসায় তিনি বৈরাগ্য গ্রহণ করেন এবং পুত্র অংশুমানকে সিংহাসন দানের অনুমতি দেন। রাজা সগর ভক্তিমান, বীর, স্নেহবৎসল ও কর্তব্যপরায়ণ চরিত্ররূপে চিত্রিত হইয়াছেন। পুত্রের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে না পারায় তিনি অনুতপ্ত। হৈহয়রাজ 'বলাদিত্য' বীর, অত্যাচারী এবং নারী-লোলুপ হইলেও বিধবা 'কমলার' প্রভাবে তাহার চরিত্র পরিবর্তিত হয়। যে নারীর জন্য সঞ্জয় কেতনের পুরী সে আক্রমণ করে সেই নারীকে সে মাতৃসম দেখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অসমঞ্জা ও সুধাকরের সঙ্গে তাহার মানসিক বিরোধ দেখা দেয়। এই চরিত্রে 'মানে হচ্ছে' কথাটির ব্যবহারে মুদ্রাদোষ সৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান হরিভক্ত। তাহাকে নাটকের 'একানে বালক'রূপে গ্রহণ করা যায়। এখানে নাটকের এই চরিত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি, হৃদয়াবেগ ও সারল্য অবলম্বনে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠী সুধাকর সুদখোর। তিনি ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য গোরু দেখিয়াই গোদুগ্ধ পানের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। অন্যের অর্থে জীবন উপভোগ করায় তাহার আপত্তি নাই। এই সুদখোর লক্ষ্মণ বর্মাকে সুদ অনাদায়ের জন্য অন্ধকূপে রাখিয়া মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেন। তাহার বাল-বিধবা কমলা ছদ্মবেশে এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুধাকরকে হত্যা করেন। ইহাই পাপের পরিণতি। সঞ্জয় কেতন সগরের অধীনস্থ ভূপতি, পরে সে তাহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। এই চরিত্রে বীরত্ব, রাজভক্তি, হরিভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতা স্থান পাইয়াছে। সঞ্জয় কেতনের স্ত্রী রেবতী স্নেহশীলা ও কর্তব্যপরায়ণা। তিনি অংশুমানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সগর রাজার নিকট হইতে কিছুকালের জন্য তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন। এই সময়

অসমঞ্জা তাহাকে হত্যা করিতে আসিলে তিনি অংশুর স্থানে আপন পুত্র বিজয় কেতুকে নিদ্রিত রাখিয়া অংশুর হত্যা নিরোধ করেন। এই চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকার 'ধাত্রী পান্নার' কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। বিজয়কেতু প্রথমে হত হয়, পরে সে হবির কৃপায় জীবন লাভ করে। কমলা পতিহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে সুধাকরের গৃহে কর্মগ্রহণ করেন। নাটকে অনেক স্থলে তাহার আগমণ আকস্মিক হইয়া উঠিয়াছে। হৈহয় রাজসভায় (২য় গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) এবং সগরের মন্ত্রণাগারে (৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) প্রবেশের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেভাব নাটকে কমলা অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে একদিন সে বালবিধবা থাকিলেও এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি বয়সের অধিকার অর্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বয়স না হইলে এতটা বুদ্ধি চাতুর্য দেখানো সম্ভব হয় না। সুধাকরের গৃহে পুরুষ বেশে কর্মরত কমলা,—সুধাকর তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। সুধাকরকে হত্যার পরে কমলা চরিত্রে এবং বিজয়কেতন হত্যার ব্যাপারে অসমঞ্জা চরিত্রে বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে। আদি, বীর, করুণ, ও ভক্তিরস নাটকে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তর্ষি-সৃজন (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ)—বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৫৭ম ও ৬০ম অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকটি সত্যস্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজ' কর্তৃক অভিনীত হয়। কেশব চন্দ্রের এই নাটকখানি তৎকালে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১ "একদিন অভিনয় স্থলে বঙ্গের শক্তিশালী প্রবীণ নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; তিনি অভিনয় দর্শনে নবীন নাট্যকার কেশব বাবুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং এই নাটকের নানারূপ প্রশংসাবাদ করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন—যদি নানাবিধ ঘটনা সৃষ্টির সহিত নাটকান্তর্গত চরিত্রগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট করিতে করিতে নানাবিধ রসের অবতারণা করাই নাটকের ধর্ম হয়, তাহা হইলে 'সপ্তর্ষি-সৃজনে' তাহা হইয়াছে"। অযোধ্যার নরপতি ত্রিশঙ্কুর সর্গলাভের কাহিনী পালার প্রধান

১। ১৩৩০ সালের ২৮শে ফাল্গুন সপ্তর্ষি-সৃজন নাটকের সঙ্গে প্র'থত পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং এর বিজ্ঞাপনপত্র।

অবলম্বন। নাটকে প্রজাপ্রিয় ও কর্মনিষ্ঠ রাজা ত্রিশঙ্কু এবং ব্রহ্মতেজের অধিকারী বিশ্বামিত্র চরিত্রদ্বয় চমৎকার রূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। রাজকুমার অজিত চরিত্রে বীরত্ব ও সেনাপতি ধৃষ্টকেতু চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতা প্রাধান্য পাইয়াছে। স্নেহশীলা রাণী সত্যবতীর বৈপরীত্য লইয়া ঈর্ষাময়ী ছোটরাণী অনীতা চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। অদৃষ্ট, পুরুষকার, প্রেম ও ভক্তি চরিত্ররূপ ধরিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহারা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যাত্রার রূপক চরিত্র। ইহারা সকলেই ভাবের প্রতিমূর্তি। বহু চরিত্র রূপায়িত করিয়া নয়টি রস সৃষ্টি করিবার ফলে নাটকখানি বিচিত্র ঘটনাজালে সমাকীর্ণ হইয়াছে। নয়টি রসের সবাবেশ হইলেও বীর, করুণ ও ভক্তিরস নাটকে বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে। পুরুষকার ও অদৃষ্টবাদের দ্বন্দ্বে ত্রিশঙ্কু চরিত্রটি রূপ লাভ করিয়াছে। দ্বন্দ্বাবসানে রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্র সৃষ্ট নূতন স্বর্গ লাভ করেন। পার্থিব শরীরে জীবকে স্বর্গলাভ করিতে দেওয়া দেবতাগণের ইচ্ছা বিরুদ্ধ। তাই বিশ্বামিত্র তপোবলে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সপ্তঋষির নামে সাতটি নক্ষত্রের সৃষ্টিতে সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে নূতন স্বর্গ রচনা করিলেন ; এই নূতন স্বর্গেই ত্রিশঙ্কুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়,—

বিশ্বামিত্র—ঐ দেখ বৎস ত্রিশঙ্কু! তোমাকে নূতন স্বর্গে লয়ে যাবার জন্য দেববালাগণ আগমন করছেন। নূতন স্বর্গে যাবার সময় তুমি এইবার অন্তরে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলন কর। (৫ম অঙ্কের ক্রোড় অঙ্ক)

নাটকের শেষে বালক ও জুড়ির জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন কোন অভিনয়ে প্রয়োজন মত ঐ গানগুলি ব্যবহৃত হইত। 'সপ্তর্ষি সৃজনে' প্রায় পঁয়ত্রিশখানি গান আছে। জুড়ি ও বালকের অতিরিক্ত তেরখানি গান ধরিলে গানের সংখ্যা পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে। তৎকালে অন্তত আট ঘণ্টা ধরিয়া অভিনয় চলিত বলিয়া যাত্রানাট্যে গান ও ঘটনার এত বিস্তৃতি দেখা যায়। নাটকের প্রস্তাবনায় গন্ধর্ব-বালকদের হৃষীকেশ-বন্দনা-গীতি রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও অনেকগুলি গণেরগান নাটকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই নাটকে যাত্রা-ব্যালেও রহিয়াছে,—

(বিষণ্ণবদনে ইন্দ্র সিংহাসনে আসীন)

ইন্দ্র—গাও বিদ্যাধরীগণ

পুনঃ অন্ত আনন্দ সংগীত।

অপ্সরাগণ নৃত্যসহ— (গান)

কুঞ্জে ঐ উঠল বাঁশীর সুর।
কুলের ভরম, লজ্জাসরম, চলে গেল বহুদুর।
না জানি ঐ বাঁশের বাঁশী কি যাদু জানে
হৃদয় ছিঁড়িয়া যেন—প্রাণ টেনে আনে,
উঠলো বাঁশীর সুর অমনি মদন-শর,
জর জর করলো কলেবর ;
থাকতে ঘরে প্রাণ নাহি ধরে,
সাধ হয় সব লুটিয়ে দিই তারে—
বনে বসে বাজায় বাঁশী, যে জন এত সুমধুর।

ইন্দ্র—যাও তোমরা। (অপ্সরাগণের প্রস্থান, ৫ম গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক)
নাটকে দীর্ঘ সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে ; সংলাপ রচনায় আবার গদ্য পদ্য উভয় প্রকার রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কেশব চন্দ্র মন্থর গতিসম্পন্ন গুরু গম্ভীর চালের ভাষা ব্যবহার করিতেন। তৎকালের যাত্রায় অনেক সময় বিশেষ চরিত্র রূপায়ণে দুইজন শিল্পী অংশ গ্রহণ করিতেন। সপ্তর্ষি-সৃজন পালায়ও এই রীতি অবলম্বিত হইত। ত্রিশঙ্কু চরিত্র দুই শিল্পী দ্বারা রূপায়িত হইত। প্রথম অংশ অভিনয় করিতেন সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় অংশ অভিনয় করিতেন নীলমণি বিশ্বাস। ১ "ত্রিশঙ্কুর—'দগ্ধ হল, দগ্ধ হল সর্বাঙ্গ আমার' সংলাপ থেকে দ্বিতীয় অংশ ধরা হত : নীলমণি বিশ্বাসের ঐ সংলাপ অভিনয়ে ক্ল্যাপের পর ক্ল্যাপ পড়ত"।

নাট্যকারের দীর্ঘ পদ্যসংলাপ রচনার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

ত্রিশঙ্কু—দগ্ধ হল, দগ্ধ হল সর্বাঙ্গ আমার,
সেই সঙ্গে দগ্ধ হল বুঝি—
জীবসহ নিখিল ভুবন!
যেই দিকে হেরি, অগ্নিময় নেহারি সকল!
অগ্নি—অগ্নি—ভীম অগ্নি জ্বালা ;
ওই ওই পিশাচের দল
ধরি অনল স্ফুলিঙ্গ রাশি

১। গৌরচন্দ্র দাস—নাটকের অজিতের ভূমিকাভিনেতা, সত্যম্বর অপেরা দ্রষ্টব্য

জ্বলন্ত নয়নে, সুভীষণ বদন-ব্যাদানে ;
তাণ্ডব নর্তনে আসে গ্রাসিতে আমায়
ঐ, ঐ ব্রহ্মশাপ
ধরিয়া রাক্ষসী মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর
হুঙ্কার কম্পিত করি অনন্ত মেদিনী,
নারকীয় চিত্রাবলী ধরি দুই করে,
বলে যেন নারকীয় স্বরে—
ওই, ওই ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল।
পুণঃ ঐ দৃশ্য সুভীষণ—
ব্রহ্মশাপ ভীষণ রাক্ষস,
অবগাহি সপ্তসিন্ধু নীরে,
উদ্বেলিত করি তারে
পৈশাচিকী অঙ্গ-সন্তাড়নে
বিশ্বগ্রাসী—হলাহল রাশি
বেগে যেন করে উদ্গীরণ।
সেই সে গরল রাশি মধ্যস্থল হতে
যেন কোন্ প্রেত ভয়ঙ্কর
করিয়া বিকট মুখখানি
উচ্চ কণ্ঠে জগতে জানায়,
ওই, ওই ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল !
আবার, আবার ওকি দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
কে তুমি—ক্রোধ-রক্ত কলেবর,
দ্বাদশ ভাস্কর সম
বিস্ফারিত জ্বলন্ত লোচনে,
চাহিয়া আমার পানে
খল খল উচ্চ হাস্য কর অনিবার
কি বলছ,—তুমি অদৃষ্ট
বিচারে নিকৃষ্ট যারে বলেছিনু আমি।
হে অদৃষ্ট, পায় ধরি তব,
করতালি দিয়া আর পৈশাচিক সুরে

বলিয়োনা বলিয়োনা জগৎ সমক্ষে,
শুনাইয়ো না পুনঃ পুনঃ
অযোধ্যার অধিবাসিগণে,
ওই, ওই ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল !
কেও, কে কাঁদে—কেন কাঁদে ?
দুর্ভিক্ষের সুতীব্র তাড়নে
হইয়া কঙ্কালসার
নয়ন-আসারে কারা
ওই চারিদিক্ দেয় ভাসাইয়া,
ঘোর অরাজকে ?
অত্যাচারে মর্ম্মন্তুদ যাতনা-আবেশে,
কে তোমরা কাঁদ এত চারিধারে মোর ?
ওঃ অযোধ্যার প্রজাগণ !
ত্রিশঙ্কুর বক্ষঃ অস্থি হৃদয়শোণিত—
পুত্রাধিক প্রিয়তম প্রজাগণ মম
কাঁদিতেছ মর্ম্ম বেদনায় !
কাঁদ, কাঁদ !
আর দেখ, পরিত্যক্ত বিজন কান্তারে
তোমাদের পূর্ব নরপতি,—
কর্ম্মদোষে চণ্ডালত্ব লভি
কাঁদিতেছে অনুক্ষণ আকুল অন্তরে।
এ কি হৃদিমাঝে কে বাঁশী বাজায় ?
মুরলীর মনোহর সুরে
কে আমার অন্তর নাচায় ?
অস্ফুট ভাষায় কে তুমি হে হৃদয়ের ধন,
সুধা মাখা আশ্বাস বচনে
আশ্বস্ত করিয়া মোরে
বল ধীরে ধীরে—
ত্রিশঙ্কু, আশা তোর হবে সম্পূরণ ?
কে তুমি, অন্তর্যামী শ্রীমধুসূদন !

মনচোরাধন ! মম নারায়ণ !
করুণা আধার !
অপার পরীক্ষা-নীরে পড়িয়াছি প্রভু,
চরণ-তরণী দানে
পার কর নিজ গুণে ভবকর্ণধার !

এই সংলাপের পরে নাটকের শেষে সংযোজিত গীতগুলির মধ্য হইতে একখানি বালকদের গান সর্বদাই গীত হইত ; গানটি এখানে উদ্ধার করা যাইতেছে,—

বালকদের গান—চিন্তামণি হে নারায়ণ, রাখহে শঙ্কিতজনে ।
পদতরী দাও শ্রীহরি, চাহ করুণা নয়নে ।।
শুনেছি পুরাণে বিধি, হরিণাম মহৌষধি,
দূরিত করে দুরিত রাশি, অনাশে নাশে ভবব্যাধি ।
বিপদে পড়ে জীব যদি, সাধে ও নাম নিরবধি,
চরণদানে এ ভবনদী, পার কর তায় নিজগুণে ।।
আমি—অকূলে পড়ে আকুল প্রাণে ডাকি তোমায় মধুসূদন,
কোথা আছ হে কৃপানিধি, করহে কোলে কালবরণ ।
ভীষণ অতি এ পারাবার, পড়েছি তায় হে কর্ণধার—
মহাবারিধি কর হে পার চরণ-তরী দানে ।।
ইচ্ছা তব পুরাইতে বুকে ধরে বাসনা রাশি
নামটি তোমার করে সম্বল হয়েছি হরি বনবাসী ।
সকল আশা গিয়াছে ভাসি, তবু কেন হে কাল শশী—
বাজাও আসি আশার বাঁশী পুনঃ মম হৃদয়াসনে ।।
(২য় গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক)

ত্রিশঙ্কুর দীর্ঘ সংলাপের অভিনয়ান্তে বালকদের এই গান যাত্রার আসরে বিশেষ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিত। কেশবচন্দ্র 'অংশুমান' নামে আর একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন ।

ধর্মদাস রায় (১২৭৬—১৩২৪)

নবদ্বীপের অধিবাসী ধর্মদাস রায় মতিলাল রায়ের পুত্র। মতিলালের মৃত্যুর পূর্ব হইতেই তিনি নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় পরিচালনার দায়িত্ব

গ্রহণ করেন। তিনি সুঅভিনেতা ছিলেম। দলে অভিনয় করিবার জন্য 'শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা' (১৩১৫), 'কবচ-সংহার', ভাগবতের কাহিনী লইয়া ভক্তি ও করুণরস প্রধান 'শ্রীকৃষ্ণের মথুরা বর্জন' (১৩১৯), কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে মূলকাহিনী সংগ্রহ করিয়া রৌদ্র, বীভৎস ও ভক্তিরসাশ্রিত 'রত্নাকর-উদ্ধার' (১৩২০) মহাভারতের শ্রীবৎচিন্তার কাহিনী অবলম্বনে 'চিন্তার চিন্তামণিলাভ' (১৩২৬) প্রভৃতি কয়েকটি যাত্রাপালা তিনি রচনা করেন।

মতিলাল ঘোষ

তিনি চব্বিশ পরগণা জিলার রাজপুর-হরিনাভির অধিবাসী ছিলেন। তাহার নাটকে দীর্ঘসংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সংলাপে গদ্য ও পদ্য ছন্দের ব্যবহার আছে। গণের গান, যাত্রাব্যালে ও জুড়ির গান তিনি নাটকে সংযোজিত করিয়াছেন। মতিলাল ঘটনা প্রধান নাটক রচনা করেন। তিনি পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক লোকনাট্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। যতদূর জানা যায়, ভক্তি ও করুণ রসপ্রধান 'প্রভাস মিলন' (১৯০৫) তাহার প্রথম নাটক। নাট্য-পরিবেশ রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রয়োজনীয় বাস্তবতা বোধের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

অভিমন্যু বধ—(১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৫ম সংস্করণ)—কাশীরাম দাসের মহাভারতের দ্রোণ পর্ব হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই আট অঙ্কের পৌরাণিক নাটক ভূষণ দাসের দলে অভিনীত হয়। ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় বেয়াল্লিশ। নাটকে উক্তি-গীতি, গণের গান প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে; ইহার প্রত্যেক অঙ্কের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ রহিয়াছে। গান রচনায় অনুপ্রাসের উপর লেখকের পক্ষপাতিত্ব ছিল,—

হিংসা-বিষ-দশন, দংশিত হৃদয় মন জ্বলে জ্বালা অনুক্ষণ।
করিব আজ নিবারণ, সাধি অসাধ্য সাধন॥
যম অশিতে, অরি নাশিত যাব সমরে চকিতে।
অর্জুন সনে, সম্মুখ রণে হল না আশা পূরণ॥
পাষাণে প্রাণ বাঁধিব অনুক্ত-তেজ সাধিব।
অভিমন্যু বিনাশিব যে কোন রণকৌশলে॥
নর জনমে বীর ধরমে মায়া নাশিব মরমে।
আত্মীয় সবে বিস্মৃত হবে তবে হবে নীতি পালন॥

(১ম গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক, কর্ণের উক্তি-গীতি)

নাটকে গদ্য এবং পদ্য সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে। পদ্য সংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর ছন্দোরীতি অনুসৃত হইয়াছে। মিত্রাক্ষর ছন্দের সংলাপের দুইটি উদাহরণ উধৃত হইল,—

ক। উত্তরা (পূর্ববৎ অবস্থিত হইয়া)—

কিবা মনোহর রাঙ্গাপদ
জিনি নব কোকনদ
লাঞ্ছিত শশাঙ্ক-মদ
নাথহে, মম মতিগতি তব চরণে।
নমঃ রমণী-হৃদি-রঞ্জন,
মদন-মদনাঞ্জন,
বিরহ ভয় ভঞ্জন
নাথহে, মম মতিগতি তব চরণে।
নমঃ দয়াময় প্রেমময়
গুণময়-জ্ঞানময়,
মনোময় বিশ্বময়,
নাথহে, মম মতিগতি তব চরণে।
নমঃ অবলা-জন-যাচিত,
সতীত্ব-ধন-পূজিত,
সতত পদ বাঞ্ছিত,
নাথহে, মম মতিগতি তব চরণে। (২য় গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)

খ। সত্যশরণ—(স্বগত)

লোকে বলে—পঞ্চভূত জীবদেহে বাস করে,
আমি বলি পঞ্চভূত সব আছে ঘরে ঘরে।
মামা, ভাগ্নে, জামাই, শালা আর পোষ্যপুত,
এ সংসারে ঘরে ঘরে এরাই পঞ্চভূত।
দেহ-তত্ত্ব বলে—পঞ্চভূতে লুটে খায়,
এ পাঁচ ভূতের খাওয়া কিন্তু কেউ না দেখতে পায়।
বুকে বসে হেসে হেসে বুকের রক্ত চোষে,
(তবু) জেনেশুনে মূর্খ লোকে এই ব্যাটাদের পোষে।

(২য় গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক)

বীর অভিমন্যুর সঙ্গে একক যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারায় সপ্তরথী একত্রিত হইয়া তাহাকে নিহত করেন। মহাভারতের এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। অভিমন্যু হত্যায় নাট্যকার বীভৎস ভাবের অবতারণা করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষে মরণোন্মুখ অভি পিপাসায় কাতর। সত্যশরণ তাহাকে সঙ্গের জলটুকু পান করিতে দিলেন। এমন সময় দুঃশাসন-পুত্র দোষণ কৃষ্ণপক্ষীয় দূতের ছদ্মবেশে আসিয়া তৃষ্ণার্তের অভিনয় করিয়া পানীয় প্রার্থনা করে। অভিমন্যু জীবনের আশা নাই জানিয়া অক্ষত ছদ্মবেশধারীর মূল্যবান জীবন বাঁচাইবার জন্য নিজে জল পান না করিয়া তাহাকে পানপাত্র দান করিতে উদ্যত হয় এমন সময় ছদ্মবেশী অভিমন্যুর মুখে কম্বল চাপা দিয়া তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করে। ইহার পর শকুনির সংকেত পাইয়া রথিগণ আসিয়া পুনঃ পুনঃ অভিমন্যুর মৃতকল্প শরীরে আঘাত হানিলে অভির মৃত্যু হয়। অপ্রয়োজনে জোর করিয়া এই প্রকার বীভৎসতা সৃষ্টি করা নাট্যকারের পক্ষে সুপরিকল্পনার পরিচয় বহন করে না। কারণ যুদ্ধান্তে নিশ্চিত মৃত্যু আসিয়া অভিমন্যুর হস্ত ধারণ করিয়াছে। এমত অবস্থায় ক্ষত্ররীতিবিরোধী উপায়ে কম্বল চাপা দিয়া দোষণ কর্তৃক অভির বক্ষঃস্থলে আমূল ভল্ল বিদ্ধকরণ ও রথিগণের পুনরায় অস্ত্রাঘাত নিতান্তই কষ্ট-কল্পিত ও অপ্রয়োজনীয়। অভিমন্যুর মৃত্যু প্রসঙ্গে নাট্যকার শকুনি চরিত্রে অস্বাভাবিক বীভৎস ভাব আরোপ করিয়াছেন। ভুলিলে চলিবে না শকুনিও একজন বীর এবং রথী; তিনি কূট কৌশলী এবং দুর্যোধনের অন্যতম মন্ত্রী। মর্যাদাহানিকর বীভৎসতা তাহার চরিত্রে আরোপ করা সমীচীন নহে; অন্তত মহাভারতে শকুনি চরিত্র সম্পর্কে এজাতীয় বীভৎসতার ইঙ্গিত নাই। শকুনির সংলাপটি উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে—

শকুনি—(অভিমন্যুর মৃত শরীর উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ কি সুন্দর দৃশ্য—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! আজ আমার হৃদয়ের জ্বলন্ত চিতা নির্বাণ হল! উঃ—তবুও যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তি বোধ হচ্ছে না। ইক্ষু খণ্ড উত্তমরূপে চর্বণ না করলে সুমিষ্ট রস পাওয়া যায় না। ইচ্ছা হচ্ছে অভিমন্যুর এই মৃত দেহটা দুইটা প্রকাণ্ড লৌহময় গদার মধ্যস্থলে রেখে, সজোরে একটু একটু করে নিপীড়ন করি। আঃ—কি বলব যে, মনুষ্যের পক্ষে নর-মাংসাহার শাস্ত্র নিষিদ্ধ—নৈলে আজ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করতাম। যাই এ শুভ সংবাদ কৃষ্ণ শিবিরে ঘোষণা করি গে।

(প্রস্থান, ২য় গর্ভাঙ্ক, ৭ম অঙ্ক)

অভিমন্যু চরিত্রে বীরত্ব ও পত্নীপ্রেম প্রাধান্য পাইয়াছে। উত্তরা পতিপ্রেম ও স্নিগ্ধতা লইয়া রূপায়িত হইয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ অমঙ্গের স্বপ্ন দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন দর্শনের কথা মনে পড়ে,—

উত্তরা—স্বপ্নে দেখেছি, যেন শরতের আকাশে পূর্ণ চন্দ্র উদয় হয়েছে। তার বিমল কিরণে পৃথিবী হাসছে,—এমন সময় সে শোভা, আমার দেখা সম্পূর্ণ হয়নি, এমন সময় সাতদিক হতে সাতটি কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড রাহু এসে, সেই পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করলে! বড় কুস্বপ্ন! দেখে অবধি আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। (১ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)।

[১] কপালকুণ্ডলা তাহার সর্বনাশের কুস্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়। জলেই তাহার প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। অভিমন্যুর মৃত্যুও উত্তরার স্বপ্নকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করে। স্বপ্নে আমাদের বিশ্বাস আছে এবং উত্তরার পক্ষে স্বপ্ন দেখা অস্বাভাবিক নহে। 'Coming events cast their shadows before' এই উক্তিকেই যেন উত্তরার স্বপ্ন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। সুভদ্রা চরিত্রে বাৎসল্যভাব রহিয়াছে; বীর মাতারূপে তাহার দৃঢ়তা ও কর্তব্যবোধের অভাব নাই। নাটকে সত্যশরণ নামে বিদুরের প্রতিপালিত অর্ধক্ষিপ্ত যুবক চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিবেক ও ধর্মবোধ জাগরিত করিবার জন্য এই যুবক ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি প্রমুখের নানা কর্মের সমালোচনা করিয়াছে। এই চরিত্র লোকনাট্যের বিবেকের পর্যায়ের; সে সর্বদা সত্য ও ধর্ম উভয়কে সমর্থন করিয়া জীবন পথে চলিবার কথা জানাইয়াছে। বিবেকের বক্তব্যের প্রধান অবলম্বন সংগীত। এই চরিত্রের জন্য নাটকে সঙ্গীতেরও অবতারণা করা হয় নাই এমন নহে। তথাপি মিত্রাক্ষরছন্দেই তাহার অধিকাংশ বক্তব্য পরিবেশন করা হইয়াছে। ভীম চরিত্রে বীরত্ব ও বাৎসল্য ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে। অর্জুনের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ ও অভিমন্যুর প্রতি বাৎসল্যের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মের বিরোধ লইয়া কর্ণ চরিত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বৃহদ্বার দৃশ্যে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে সপ্তম অঙ্ক ও অষ্টম অঙ্ক নাট্য-সংহতি নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু লোকনাট্যে ধর্মবোধ, ন্যায়বোধ ও সহজভাবে তত্ত্বজ্ঞান দান করা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি যে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় নাটকে তাহার অভাব ঘটে নাই।

১। কপালকুণ্ডলা—৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিমচন্দ্র।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্য ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ইহার জন্য অর্জুনের যুদ্ধোদ্যম বজায় রাখা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইতে অভিমন্যুর মৃত্যু চাই। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অভিমন্যুর মৃত্যু হয়। ইহাতে পাণ্ডব পক্ষের শোক করিবার কোন কারণ নাই। কারণ পৃথিবীতে মানব আসিয়া আপন আপন কর্ম সমাধা করিয়া চলিয়া যায়। এখানে কাহারো সঙ্গে কাহারো কোন সত্য সম্পর্ক নাই। মানুষের আসল সম্বন্ধ পূর্ণ-ব্রহ্ম পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গে। তাই নাটকের শেষে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তিতে পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব দেখাইয়া পাণ্ডবগণকে শান্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোক হইতে চন্দ্রবেশী অভিমন্যুর গানে এই ভাবটি প্রস্ফুট হইয়াছে,—

চন্দ্রবেশী অভিমন্যু—(গীত)

এ বিশ্ব-সংশার-নাট্যশালা মাঝে
কেহ পিতা মাতা কেহ ভ্রাতা সাজে,
অভিনয় কালে আনন্দে বিরাজে,—
যবনিকা পতন হইবে যখন,—
তখন কে বা মাতা পিতা কেহ কারও নয়।
অনাদি পিতা আদি মাতা ঐ দেখ বিরাজে
পূর্ণ-ব্রহ্ম পুরুষ-প্রকৃতি মদন-মোহন সাজে। (৮ম অঙ্ক)

এই অংশের দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকেও মানব জীবনের এই গূঢ় তত্ত্বটি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নাটকে শৃঙ্গার, বাৎসল্য, বীর, বীভৎস, করুণ ও ভক্তি রসের সমাবেশ করা হইয়াছে।

সীতার পাতাল প্রবেশ—ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। সীতা উদ্ধারের পরে রামচন্দ্রের সিংহাসন লাভ, লবণ রাক্ষস বধ, শম্বুক হত্যা ও তাহার ছিন্ন মুণ্ডের প্রভাবে মৃত ব্রাহ্মণ-পুত্রের পুনর্জীবন লাভ, সীতার বনবাস, কুশ ও লবের রামায়ণ গান শিক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য স্বর্ণসীতা নির্মাণ, যজ্ঞস্থলে কুশ লবের রামায়ণ গান ও সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনা লইয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। বন্ধু প্রীতির আধার ও প্রজানুরঞ্জক রূপে রাম চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ভরত চরিত্রে ভ্রাতৃপ্রেম ও শম্বুকের মধ্যে ভক্তিভাব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সখ্য, বাৎসল্য, করুণ, বীর ও ভক্তি রস প্রধান নাটক। ইহাতে যাত্রা-ব্যালে, গণের গান প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। সঙ্গীতে

আখর যুক্ত কীর্তনাঙ্গ গানও রহিয়াছে। এই নাটকখানি 'ভাণ্ডারী অপেরায়' অভিনীত হয়।

বুদ্ধলীলা (১৩১৩)—বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক কাহিনী পৌরাণিক ঢঙ্-এ পরিবেশনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই নাটকে মহাদেব, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবচরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তাহার পিতাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। ইহা কৌরব সভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নাটকের শেষে বুদ্ধদেব বিষ্ণু মূর্তিতে দেখা দিয়াছেন। বুদ্ধদেবের স্ত্রী গোপাকেও লক্ষ্মীর অবতার রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে সূত্রধার চরিত্র সংযোজন। এই চরিত্র কোন কোন অংক বা গর্ভাংকের প্রথমে প্রবেশ করিয়া নাট্য ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে যেমন পরিচয় দিয়াছে তেমনি আবার বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশাদিও বর্ষণ করিয়াছে। সংস্কৃত নাটকে সূত্রধারের নাট্যকার, নাট্যবস্তু, নাট্যাভিনয়-উপলক্ষ, নাটকের পাত্র প্রভৃতি সম্পর্কে ইংগিত দিবার পরে নাটকের কাহিনী অংশের অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রসঙ্গত শ্রীহর্ষ রচিত [১]'রত্নাবলী' নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মতিলাল ঘোষ সূত্রধার চরিত্র প্রবর্তনে এই রীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের সঙ্গে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার নাটকের প্রথমে দেখা দেয়, কাহিনী অংশের অভিনয় আরম্ভ হইবার পরে আর নাটকে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই নাটকে সূত্রধার বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়াছে। এই সূত্রধার চরিত্রের মধ্যদিয়া মতিলাল ঘোষ তৎকালীন যাত্রায় শিরশ্ছেদ, পতন ও মূর্ছা, যুদ্ধ, সঙ্ প্রভৃতি উপস্থাপনার প্রচলিত রীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন,—

"সূত্রধার—সং কৈ ? হাসি কৈ ? যুদ্ধ কৈ ?… . পতন ও মূর্ছা কৈ ?
শিরশ্ছেদ কৈ ? কিছুই নাই ? (২য় গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (১৩৩১)—[২]শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ইহার মূল কাহিনী

১। সূত্রধার— …অদ্যাহং বসন্তোৎসব ‥শ্রীহর্ষদেবেন ‥রত্নাবলীনাম নাটিকা কৃতা…যথাবৎ-প্রয়োগেণ ত্বয়া নাটয়িতব্যা—ইতি……ননু অয়ং মম যবীয়ান্ ভ্রাতা গৃহীতযৌগন্ধরায়ণভূমিকঃ প্রাপ্ত এব। প্রস্তাবনা অংশ, রত্নাবলী।

২। শ্রীমদ্ভাগবত (বাংলা সং) ১ম স্কন্ধের ১১শ-১৫শ অধ্যায়, ২য় স্কন্ধের ১ম অধ্যায়, ১২শ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ঘটনা প্রধান পৌরাণিক নাটক। দ্রোণ হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য অশ্বত্থামা অর্জুনের বংশ ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হইলেন। উত্তরার পুত্র ভারত সম্রাট পরিক্ষিত জননী-জঠোরে বাস কালে অশ্বত্থামা ব্রহ্মশাপে তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণের কৃপায় তখন পরীক্ষিতের জীবন রক্ষা পায়। পরবর্তী কালে পরীক্ষিত রাজা হইলে পাহাড়ী দস্যু রুদ্রচণ্ডের সাহায্যে অশ্বত্থামা তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইলেন। ইহার পর অশ্বত্থামার প্রভাবে শমীক ঋষির পুত্র 'শ্রীঅঙ্গের' অভিশাপে তক্ষক প্রদত্ত ফল খাইয়া পরীক্ষিত মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ইহাই নাট্য ঘটনা। ইহা বীভৎস, করুণ ও ভক্তিরস প্রধান নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র অশ্বত্থামা। তিনি যোদ্ধাও বীর, কিন্তু এখানে তাহার বীরত্বের পরিচয় নাই। তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ পৈশাচিক চক্রান্তকারী ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৩১৩), 'পরশুরাম' (১৯১০), ভূষণ দাসের দলে অভিনীত 'ধ্রুব' (১৯১৪) 'বৃন্দাবনবিহারী', (১৯১৭) ও 'দ্বারাবতী' (১৯২২) নামে তিনি আরো কয়েকটি নাটক রচনা করেন।

মুকুন্দদাস (১২৮৫—১৩৪১)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে নানা আন্দোলন যে প্রবল তরঙ্গাঘাতে গণচিত্ত উদ্বেলিত করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ এই সকল আন্দোলনে ক্ষেত্র ছিল প্রধানত নগর ও শহর। তাই বাংলার চারণ কবি মুকুন্দদাস মনস্থ করিলেন যে তিনি পল্লীজীবনে জাগরণ সৃষ্টি করিবেন। তাহার মত অন্য কোন লোকনাট্যকার এই কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই। মুকুন্দদাসের পালাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পূর্বে আলোচিত বিংশ শতকের আন্দোলনাদির পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলি রচিত হইয়াছিল। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাবশিষ্য মুকুন্দদাস ১২৮৫ সালে ঢাকা জিলার বিক্রমপুর অঞ্চলে বানারিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা গুণদয়াল দে বরিশালের আদালতে কাজ করিতেন। বরিশালে কাশীপুর অঞ্চলে তাহার বাস ছিল। পুত্র যজ্ঞেশ্বর দে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পযন্ত পড়াশুনা করেন। লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ ছিল না বলিয়া গুণদয়াল দে তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া একটি মনোহারী দোকান করিয়া দিলেন। কিন্তু দোকানদারী অপেক্ষা সঙ্গীতে তাহার অধিকতর আকর্ষণ ছিল। বরিশালে

স্বামী রামানন্দের সংসর্গে আসিয়া তিনি কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠেন। এই সময় স্বামী রামানন্দ তাহার নাম দেন মুকুন্দদাস (মুকুন্দের দাস এই অর্থে, মুকুন্দ-দাসের পদবি দে)। তদবধি যজ্ঞেশ্বর দের পরিবর্তে তিনি মুকুন্দদাস নামেই খ্যাত হন। বিংশ শতকের প্রথমে 'সাধন সঙ্গীত' নামে তিনি একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। গীত রচনায় তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। আঠার বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন। বরিশাল কালীবাড়ীর পূজারী ভক্ত সোনা ঠাকুরের প্রভাবে মুকুন্দদাস ক্রমে কালীভক্ত হইয়া উঠেন এবং পরবর্তীকালে বরিশাল কাশীপুর অঞ্চলে তিনি 'আনন্দময়ী আশ্রম' স্থাপন করিয়া সেখানে কালী প্রতিষ্ঠা করেন। জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গলাভ করিয়া তিনি স্বদেশ ভক্ত হইলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় [১]"অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে স্বদেশী প্রচারে বাহির হন"। ইহার পর মুকুন্দদাস 'স্বদেশী যাত্রা পার্টি' নামে একটি দল গঠন করিয়া স্বদেশী যাত্রা গানে বাংলার লোক-চিত্তকে স্বাধীনতা-স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। [২]"যাত্রাই বাংলার খাঁটি নাট্য, একেবারে বাঙালীর নিজস্ব। আমাদের জাতীয় নাট্য বলে যদি কিছু থাকে সেটি হচ্ছে যাত্রা।" মুকুন্দদাস এই জাতীয়-নাট্যকে জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে লাগাইলেন। স্বদেশী যাত্রা রচনায় মুকুন্দদাসকে বিশেষ-ভাবে উৎসাহিত করেন অশ্বিনী কুমার দত্ত; তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের [৩]"সময়ে শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাস দ্বারা স্বদেশী যাত্রা রচনা করাইলেন.........স্বদেশী যাত্রায় অশ্বিনীকুমারের শিষ্য মুকুন্দদাস [৪]বিদেশীকে শুনাইয়া দিলেন,—

(বিদেশী) আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে
মন তো স্বাধীন রয়।
হাত বাঁধবে পা বাঁধবে,
ধরে না হয় জেলে দেবে

১। মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা।

২। নাট্যশালাপ্রসঙ্গে—শিশির কুমার ভাদুড়ী, মণি বাগচি রচিত শিশির কুমার ও বাংলা থিয়েটার গ্রন্থের পৃঃ ৩৭০।

৩। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার—পৃঃ ১৭৬, ৪র্থ সংস্করণ, শরৎকুমার রায়।

৪। স্যার ব্যাম্ফিল্ড ফুলার—আসাম ও পূর্ববঙ্গের ছোটলাট।

মন কি ফিরাতে পারবে
এমন শক্তিময় ? ”

গানটির বাকি পংক্তিগুলিও এখানে দেওয়া হইল,—

বন্দেমাতরম্ মন্ত্র কানে
বর্ম এঁটে দেহে মনে,
রোধিতে কি পারবে রণে
তুমি কত শক্তিময়।

[১] “বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন এত প্রবল ও তীব্র হয়ে ওঠে যে সরকার একে একটি ‘প্রোক্লেম্‌ড ডিষ্ট্রিক্’ বা ‘আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী’ অঞ্চল বলে ঘোষণা করলেন”। সরকার এই আন্দোলন দমনে নানা উপায় অবলম্বন করেন। আন্দোলন দমনে ফুলার সাহেব বরিশালে গুর্খাদ্বারা নিরপরাধদেরও লাঞ্ছিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই ফুলারকে লক্ষ্য করিয়াই উল্লিখিত গীতটি রচিত। [২] এক সময় মুকুন্দদাসের স্বদেশী গান শুনিয়া স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহাকে একখানি লাঠি উপহার দেন। লাঠিতে খোদাই করা ছিল,—

“যে রাখে আমারে তার হয়না বিপদ,
মুকুন্দের সখা আমি মূর্খের ঔষধ।”

মুকুন্দদাসের নিকট [৩]‘চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতাই জীবন’ বলিয়া বোধ হইত। তিনি ছিলেন কর্মযোগী,—

এ মহা কর্মের যুগে শান্তি নাই কর্মত্যাগে,
মুকুন্দ করেছে কর্ম, শান্তিবারি পিপাসায়। (৬ষ্ঠ দৃশ্য, পল্লীসেবা)

এই কর্মযোগ সাধনায় দেবতার আশীর্বাদ চাই। তাই তিনি রণরঙ্গিনী অসুর নাশিনী শ্যামার চরণে আশিস মাগিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন,—

জাগো গো জাগো জননী, (ওমা শ্যামা)
তুই না জাগিলে শ্যামা
কেউ জাগিবে না গো মা ;

১। মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ২২০, ৩য় সং, যোগেশচন্দ্র বাগল
২। মুকুন্দদাসের পুত্র কালীপদ দের বক্তব্য
৩। কর্মক্ষেত্র, বাউল—১ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক

তুই না নাচালে কারো
নাচিবে না ধমনী। (১৬শ দৃশ্য, পল্লী সেবা)

কেবল শ্যামা মাকে নহে সমগ্র দেশবাসীকে জাগাইবার জন্যই মুকুন্দদাস চারণ কবির ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন,—

আবার যখন গান ধরেছি
গাবো গো সেই গান,—
বুকটা যাহে ফুলে ওঠে
শিরায় যাহে অগ্নি ছোটে,
তন্দ্রা যাহে যায়গো ছুটে,
মাতায় যাহে প্রাণ।
* * * *
গান গেয়েছি অনেক বটে
তারে কি কয় গান,
আকাশ পৃথ্বী হলনা যায়
টলটলায়মান।
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস
উঠলো না যায় ঘূর্ণি বাতাস
লক্ষ প্রাণের সমুদ্রে যায়
ডাকলো নাকো বান। (৩য় দৃশ্য, ব্রহ্মচারিণী)

এই নিদ্রিত বাঙ্গালীকে জাগ্রত করিবার জন্য দৃপ্ত কণ্ঠে মুকুন্দদাস গাহিয়া উঠিলেন—

দাঁড়ারে বাঙালী আপনা ভুলিয়া
সাজাই বাংলা নূতন সাজে।
মাভৈঃ ওঠরে ও বাঙ্গালী বীর
কতকাল রবি নত করি শির,
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির
অনাহত শব্দ ধ্বনির মাঝে। (১২শ দৃশ্য, পল্লীসেবা)

তাহার স্বদেশী যাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাতে উদ্দীপনাময় গানের সঙ্গে মুকুন্দদাস আবেগ ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া জনগণের মোহনিদ্রা

ভাঙ্গিয়া দিতেন। মাথায় পাগড়ী ও গৈরিক ভূষণধারী মুকুন্দদাস প্রত্যেক পালায় একটি গায়ক চরিত্রে অংশ গ্রহণ করিতেন। তাহার অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গান ও বক্তৃতা। একটি পালার প্রস্তাবনা হইতে বীরাচারী মুকুন্দদাসের মানস-চিন্তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়,—

বাঙ্গলায় আজ যে ঘোর অমানিশা। রাজরাজেশ্বরী—এসো মা, আজ সপ্তকোটী বাঙ্গালীর ভগ্ন হৃদয়ে তোমার ভৈরবী মূর্তি নিয়ে। বাঙ্গালার গগন পবন কম্পিত করে মহোল্লাসে অট্টহাস্যে বাঙ্গালীর গৃহ-শ্মশানে করো আজ তাণ্ডব নৃত্য। শিবা মুখরিত ভয়াল শ্মশানে 'হিলি হিলি কিলি কিলি' করে নাচুক তোমার ডাকিনী যোগিণী; হোক মা তোমার মহাপ্রলয়ের বৈষ্ণবী লীলার ধ্বংস যজ্ঞের চির সমাধান। সৃষ্টি করো বাংলায় আজ এক নূতন বীর জাতি, দেও তাদের নূতন প্রাণ, নব ভাবে নবোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হয়ে করুক তারা প্রতিগৃহে তোমার শারদীয় উৎসবে মঙ্গল ঘট স্থাপনা। বাজুক দামামা, কাড়া, ঘণ্টা, ঢোল, শঙ্খ, করতাল, জয়ডঙ্কা, খোল, নাচুক ধমনী শুনিয়ে সে রোল। সপ্তকোটী কণ্ঠে কল কল নিনাদে বিশ্বকম্পিত করে বাঙ্গালী করুক তোমার বিজয়বার্তা ঘোষণা। দাও তাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্মের তেজ, প্রাণে নূতন প্রেরণা; জয়োল্লাসে মাতৃগরবে গর্বিত বাঙালী করুক তোমার পূজার বেদী রচনা; বীরাচারী বাঙালী বীরাচারে করুক তোমার জগন্ময়ী রূপের বিরাট আয়োজন।

হায়মা, রুগ্নদেহ, ভগ্নমন, অবসন্ন প্রাণ, আশাহত চিন্তাক্লিষ্ট বাঙ্গালী আমরা দাঁড়িয়ে আছি শুধু অহমিকার উচ্চ গিরিশিরে। নাহি পথ, আছে একটিমাত্র পথ বাণিজ্য—সে পথ রোধি বিদেশী বনিকগণ বিস্তারিয়া আধার বদন। আর এক পদ মাত্র আগ্রাসিলেই বাঙ্গালীর আশাহত জীবনের হইবে নির্বাণ। তথাপি জানি আমি বাজিলে নামের ভেরি তমোজাল যাইবে ছিঁড়িয়া। কিন্তু চলিয়াছে সব, কিছুদিন পরে বাঙ্গালীর আপনার বলিতে আর রহিবে না কিছু। ঐ দেখ বাঙ্গালীর রক্তচুষি তরঙ্গ-সঙ্কুল কাল-স্রোত বাঙ্গলার বুক চিরি পশ্চিম সাগরে চলিয়াছে ছুটি। তাই প্রার্থনা করি,—আশিস কর মা আজি, অহমিকার উচ্চ গিরি হতে বাঙ্গালী ঝাঁপায়ে পড়ুক ঐ কাল-স্রোতের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে পাউক তারা শীতল সমাধি। কিন্তু মরিবে না মায়ের সন্তান। তুচ্ছ প্রাণ দান করি পাইবে তারা দেব-জীবন, আবার আবার বহুদিন পরে মর্মর-মণ্ডিত কক্ষে স্বর্ণ বেদিকায় স্থাপিবে সে মাতৃমূর্তি রতন মন্দিরে। তথনি,

তখনি উল্লাসে আবেগে মাতি জননীরে চাহি বাঙ্গালী গাহিবে আবার বন্দে মাতরম্‌। (প্রস্তাবনা, পল্লীসেবা)

স্বদেশী যাত্রা গাহিয়া মুকুন্দদাসকে কারাবরণ করিতে হয়। আড়াই বৎসর কারাবাস কালে তাহাকে ঘানিও টানিতে হয়, ইহার উপর জেল দারোগার নির্যাতন তো ছিলই। তাহার কারাবাসের সময় শিশুপুত্র ও কন্যা রাখিয়া তাহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন। কারাবাসান্তে মুকুন্দদাস পুনরায় প্রচণ্ডভাবে স্বদেশী প্রচারে মনোনিবেশ করেন। গাওনার সময় অনেক আসরেই তাহাকে পুলিশের লাঠির ঘা খাইতে হইয়াছে। ১৩৪১ সালে সদলবলে কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া তিনি অনেকগুলি গাওনা করেন। মুকুন্দদাস তেজোদৃপ্ত কণ্ঠ এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় গাওনার সময় তিনি হঠাৎ একদিন অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ১৩৪১ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মরজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

তাহার প্রত্যেকটি নাটকই সামজিক কাহিনী লইয়া রচিত। সামাজিক মানুষের নানারকম দোষ ত্রুটি দেখাইয়া ইহাদের সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে নাটকগুলি লেখা হইয়াছে। এইদিক হইতে নাট্যকারকে একজন সমাজ সংস্কারকও বলা যায়। নাট্যঘটনা অবলম্বনে কুচরিত্র সৃষ্টিতে কোথাও তাহার উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এইজন্যই মুকুন্দদাসের পালা গান শুনিয়া কেহ ক্ষুব্ধ হইতেন না, বরং শ্রোতৃমণ্ডলী নূতন ভাব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করিবার জন্যই কেবল পালাগুলিতে ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, নাটকীয় কাহিনী রচনা এবং চরিত্র তাহার পালায় উপলক্ষ মাত্র; স্বদেশী ভাব প্রকাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি গান ও বক্তৃতার সাহায্য গ্রহণ করিতেন, এবং ইহাদের মধ্য দিয়া মুকুন্দদাসের পালা হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিত। মুকুন্দদাসের যাত্রায় একানে বালক, আদি রসাত্মক দ্বৈতগান, যাত্রাব্যালে, বিবেক, জুড়ির গান প্রভৃতির ব্যবহার নাই। তিনি গানের সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই দোহার ব্যবহার করিতেন। মুকুন্দ দাস একাধারে নাট্যকার, নট, গায়ক ও পরিচালক ছিলেন। সাধারণ যাত্রা নাটকের মত তাহার নাটক দীর্ঘ নহে। যখন আট ঘণ্টা ধরিয়া যাত্রা নাটক পরিবেশনের রীতি প্রচলিত ছিল তখনই তিনি তিন-চার ঘণ্টায় স্বদেশী যাত্রা অভিনয় করিতেন। বর্তমানে যাত্রায় যে সময় সংক্ষেপ করা হইয়া থাকে মুকুন্দদাসের যাত্রা হইতেই তাহার সূচনা হইয়াছে। মুকুন্দদাস

গীতিকার হইলেও তাহার পালায় [1]নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের দুই-একটি গীতি ব্যবহার করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'ব্রহ্মচারিণী' ও 'পল্লীসেবা' পালা দুইটির উল্লেখ করা যায়।

মাতৃপূজা—ইহা তাহার প্রথম প্রকাশিত যাত্রাপালা। দেশমাতৃকার পূজায় তিনি প্রথম গাহিলেন,—

হাসিতে খেলিতে অসিনি এ জগতে
করিতে হবে মোদের মায়ের সাধনা ;
দেখাতে হবে মোদের জগতবাসী জনে
এখনো ভারতের যায়নি চেতনা।
গভীর হুঙ্কারে হুঙ্কারি মাকে ডাক—
শিহরিয়া উঠুক বিশ্ব মেদিনীটা ফেটে যাক
আমাদের জন্মভূমি দেবতার লীলাভূমি
দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হউক কামনা।
সার্থক হবে তবে এ জীবন সবাকার—
ছেলের গৌরবে হবে গরবিনী মা আমার,
জগৎ লুটিবে পায়, মিটে যাবে সব দায়
পূর্ণ হবে মুকুন্দের এতদিনের বাসনা।

দেশের স্বাধীনতা-প্রীতি-কর্তব্যহীন বাবুদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

বাবু বুঝবি কি আর মলে,—
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে।
খেতে ভাত সোনার থালে, নাউ স্যাটিস্‌ফাইড্‌ ষ্টিলের থালে,
তোদের মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে।
পমেটম্‌ লাইক্‌ করিলি দেশী আতর ফেলে
সাধে কি তোদের দেয়রে গালি—ব্রুট, ননসেন্স, ফুলিস বলে।
ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সাবা,
চোখের চশমা জোড়া দেখনা তোরা খুলে।
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ইউ নো বাঙ্গালীবাবু—ইওর হেড ফিরিঙ্গির বুটের তলে।

১। প্রস্তাবনা, পল্লী-সেবা—মুকুন্দদাস

মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চলো,
সাহেবি চালটি ছাড় যদি সুখ চাও কপালে।
বন্দেমাতরম্ বাজাও ডঙ্কা, জাগুক ভাই সকলে,
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে।

ইহার পরেই মুকুন্দদাস সুর ধরিলেন,—

আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম,—
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি
অতল তলে ডুবিয়ে দিতাম।
শোন সব ভাই স্বদেশী, হিন্দুমুসলেম ভারতবাসী,—
পারি কিনা ধরতে অসি জগৎকে তা দেখাইতাম।
কথা শুনে প্রাণ যদি মজে সেজে আয় বীর সাজে,
দাস মুকুন্দ আছে সেজে দাঁড়ী পেলে তরী ভাসাইতাম।

'মাতৃপূজার' এই গানের পরে মুকুন্দদাসকে আর ইংরাজ সরকার সহ্য করিতে পারিলেন না। তাহার 'মাতৃপূজা' পালা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইল; তিনি কারারুদ্ধ লইলেন। ইহার পর রচিত 'পথ' ও 'সাথী' পালা দুইটিও বাজেয়াপ্ত হয়।

সমাজ—এই পালাটি অঙ্কে বিভক্ত করা হয় নাই; ইহা চব্বিশটি দৃশ্যে সমাপ্ত। সামাজিক বিবাহে কৌলীন্য ও পণ প্রথার কুফলের জন্য গৃহস্থ কামিনী মুখুজ্যের সরোজ ও নির্মলা নামক দুইটি কন্যার জীবন ব্যর্থ হয়। জনৈক সহৃদয় ধনী শরৎ চ্যাটার্জীর যুবক পুত্র নগেন বিনা অর্থে নিঃস্ব ননীবাবুর তৃতীয় কন্যা প্রমীলার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করেন। ইহাই নাটকের মূল ঘটনা। কিন্তু বিভিন্ন দৃশ্যে নাট্যকার মূল ঘটনা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। মানবজীবনের কর্তব্য, কলেরা-ক্রান্ত অনাথ মেথর বালকের শুশ্রূষা করা, শ্রীচৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, অষ্টপাশ মুক্ত হইয়া ভক্তিসাধনা করা, বর্তমানে দেশে জগজ্জননীর পূজা-প্রণালীর পরিবর্তন করা, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর কৃষ্ণসেবার কুফল, মদ্যপান ও বেশ্যা-সক্তির পরিণাম, মোহ-আঁধার ঘুচাইবার জন্য মায়ের নাম কীর্তন করা (নাটকের সমাপ্তি দৃশ্য) প্রভৃতি অবতারণার কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। মুকুন্দদাসের যাত্রা পালায় নাটকীয় সংহতি রক্ষা করিবার কথা ভাবা হয় নাই। নানা বিষয়ে অন্ধ সমাজের চোখ খুলিয়া দিবার প্রতি তিনি অধিক

দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ছোট পালাটিতে প্রায় চব্বিশখানি গীতি সংযোজিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গণের গানও আছে। এই নাটকে মুকুন্দদাস প্রধানত নর-সেবা ও ঐক্যের গান গাহিয়াছেন। তাই ভাবুক চরিত্র 'সত্য' বলিয়া উঠিল—"নর সেবাই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা", যতদিনে "শ্রীচৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আচণ্ডালে কোল দিতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ভারতের কল্যাণ নেই !" (৪র্থ দৃশ্য)

পল্লীসেবা—অঙ্কবিভাগহীন এই পালায় ষোলটি দৃশ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। প্রথমে প্রস্তাবনা, তাহারপরে নাট্যারম্ভ। পল্লীর সংস্কার না হইলে কোন আন্দোলনই সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। রাজা, জমিদার ও শিক্ষিতদের মোহমুক্ত হইয়া পল্লীগঠনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। দেশের উন্নতি করিতে হইলে ধর্মগোলা স্থাপন, কৃষকদের শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বাবলম্বন ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। ইহাই নাটকের মূল বক্তব্য। পল্লী সমিতির চালক 'নিত্যানন্দ' নাটকের প্রধান চরিত্র। জমিদার শরৎ রায়ের পুত্র রাজেন্দ্রও তাহার সঙ্গী হইয়াছেন ; তাহারা পল্লীবাসীর কাছে নানা আদর্শ প্রচারে ব্যস্ত। নাটকের চরিত্রগুলি দ্বন্দ্বসংঘাতে ক্ষতবিক্ষত নহে। প্রচারের যন্ত্র রূপেই তাহারা যেন নাটকে স্থান পাইয়াছে। ধর্মপ্রবণ, জরাগ্রস্ত বাঙ্গালী জাতির জাগরণের জন্য নাট্যকার ধর্মাচরণে সাত্ত্বিকগুণ অপেক্ষা রজোগুণকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী। নিতাই চরিত্রে এই মনোভাবটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

নিতাই—তাইতো বলি পণ্ডিতজী, এখন আমাদের রজঃগুণটিই জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশময় এখন সেই আলোচনাই হওয়া উচিত। আমাদের দুর্দশা দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ওরে তোরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে কিছুদিন শিকেয় তুলে রাখ। যদি কৃষ্ণ ভজনই করতে চাস, তবে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে ডাক, জাতিটা একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠুক। যে জাতির ভাত জোটে তো ডাল জোটে না, ডাল জোটে তো ভাত জোটে না, তার কাছে প্রেমের কথা বলায় কোন ফল হবে কি? রজঃগুণের কথা বল, জাতিটা উঠে দাঁড়াক। পেট ভরে খাক, খেতে পারলেই গায়ে একটু বল পাবে তখন তার মা বোনের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য তাকে সংবাদ পত্রে চোখের জল ফেলতে হবে না। মনে রেখ, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা দুর্বলের জন্য নয় ; তাইতো আমি ঠাকুরকে বলি—

গীত

ঠাকুর বাজাও তোমার বিজয় শঙ্খ, উদ্যত কর খড়্গ।
প্রলয় পেষণে করো বিচূর্ণ পাপ-দনুজ বর্গ ॥
ভ্রুকুটি কুটিল করাল ভীম ভৈরব ভয়াল
রাজসমারোহে এস মহারাজ কাঁপায়ে মর্ত স্বর্গ ॥
নমঃ নমঃ নমঃ বিকট ভীষণতম,
এস বজ্র নিনাদে রথ ঘর্ঘরে কাঁপায়ে মর্ত স্বর্গ ॥ (৯ম দৃশ্য)।

জনজাগৃতির জন্য আদর্শ প্রচার ও বক্তব্য প্রধান লোকনাট্য রচনা করিয়া মুকুন্দদাস বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা ঘুচাইবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই নাটকেও তাহারই পরিচয় রহিয়াছে। গণেরগান সহ নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় সাতাশ। দেশের শিক্ষিতরা যাহাতে পল্লীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহারই উদ্দেশ্যে পল্লীর ছাত্ররা গান ধরিল,—

বাবুরা সহরের মায়া ছেড়ে পল্লীতে না এলে ফিরে
বাজবে না করমের বিষাণ, ঘুচবে না এ দেশের বলাই। (১৩শ দৃশ্য)

ইংরেজ সরকার দেশী শিল্পের সমাধি রচনা করিয়া বিলাতী পণ্য ব্যবসায়ে দেশের অর্থ বিদেশে চালান করিতে থাকে বলিয়া বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে যে আলোচিত বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের প্রজাগণ গাহিয়া উঠে,—

বিদেশী চিজ্ আর কিনব না
কও কছম করি,
তবে দেশের টাকা রইবে দেশে
লক্ষ্মী ঘরে আসবেরে ফিরি। (৮ম দৃশ্য)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই ইংরেজসরকার কৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সম্পর্কে মুসলিম লীগ সৃষ্টির কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফত আন্দোলনের সময় হইতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর দেশের নেতৃগণ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতে আরম্ভ করেন। নাগর নাট্যে ইহার প্রভাব খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। তৎকালীন ঐতিহাসিক নাটকে সুযোগ পাইলেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা প্রচার করা হইত,— [১]"তবু এ মিলনের অভিলাষ—হে কবি, বছর যাক্,

১। আলমগীর, ১২শ দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্ক, ক্ষীরোদপ্রসাদ (১৯২১)

যুগ যাক্, বহু শতাব্দী চলে যাক্, শতাব্দীর পারে একদিন তোমার তুলিকা মুখে আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হক। এস ভাই, জগতের অলক্ষে এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া) চির-জাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে—হিন্দু-মুসলমানে—একবার আলিঙ্গন করি।"

মুকুন্দদাসের বিভিন্ন নাটকেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য নাটকে চারণ কবিও 'সুলভা' চরিত্রের মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বাণী শুনাইয়াছেন,—

ভাইরে ভাই—
হিন্দু আর মুসলমান
এক মায়েরই দুটি সন্তান রে,—
একত্র হইয়ে সবে
মায়ের পূজা কর ভবে,
ধন্য হবে মানব জীবন,
বন্দেমাতরম্। (১৩শ দৃশ্য)

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন আন্দোলনের প্রচার কল্পে পল্লীর চেতনা জাগ্রত করিবার জন্যও মুকুন্দদাসের চেষ্টার ক্রটি ছিল না,—

ভাইরে ভাই—ভারতের সুসন্তান
কর সবে অবধান রে—
বিদেশী লবণ চিনি, অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি
ছুঁয়োনা ভাই চিনি আর লবণ
বন্দেমাতরম্। (১৩শ দৃশ্য)

দেশের শক্তির এক বিরাট অংশ নারীজাতিকে পেছনে ফেলিয়া রাখিয়া দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করানো কথনই সম্ভব নহে। তাই পল্লী সমিতির চালক 'নিত্যানন্দ' বুঝিলেন—"মা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত যোগ্য ছেলে পাবার আশা করাই বাতুলতা।" সুতরাং নিত্যানন্দের কণ্ঠে নারী জাগরণের গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—

জাগাও সকলে আজি
নিদ্রিতা শকতি,

তোমাদের হাতে মাগো
ভারতের মুক্তি। (৪র্থ দৃশ্য)

ব্রহ্মচারিণী—অঙ্ক বিভাগহীন পনেরটি দৃশ্যে সমাপ্ত এই নাটকের প্রস্তাবনায় সমাজের মাতৃশক্তিকে জাগরিত করিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরে নাট্যারম্ভ। নাট্যকাহিনীতে কামান্ধ জমিদার ব্রজেশ্বরের অত্যাচার, দেওয়ান হরগোবিন্দের স্বার্থপর কুটিলতা, সুদখোর রাজীবদত্তের হৃদয়হীনতা ও নব্যবাবুদের কর্তব্যহীনতাকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। নাটকের মূল বক্তব্য হইতেছে, বিপথগামীরাও উপযুক্ত পথ প্রদর্শক পাইলে ক্লেদমুক্ত হইতে পারে। তাই ব্রজেশ্বর, রাজীব দত্ত, মতি দত্ত প্রমুখ বিপথগামীদের লোকসেবক, ও ন্যায়পরায়ণ ব্রহ্মচারী প্রেমানন্দের প্রভাবে চারিত্রিক পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। আশ্রমবাসী প্রেমানন্দ জনচিত্তে ঈশ্বর-ভক্তি, দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট। এই লোকনাট্যে ব্রহ্মচারী 'প্রেমানন্দ' গানে গানে গণজাগৃতির বাণী প্রচার করিয়াছেন,—

গীত

হা রে বান এসেছে মরাগাঙ্গে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনো ঘুমাও॥
কত যুগ গেছে কেটে, দেখেছ কত স্বপন,
বদর বলে ধর বইঠা, জীবন মরণ পণ ;
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে
ফাগুন বইছে পাল খাটাও॥
অবহেলে থাকলে বসে কাঁদতে হবে সারাজীবন,
যুগযুগান্তের তপস্যাতে মিলেছে এমন লগন ;
পারের মাঝি হাল ধরেছে, মিছে পরের মুখ তাকাও॥ (৮ম দৃশ্য)

নাটকের গীতিসংখ্যা বাইশের অধিক। এই পালায়ও 'গণের গান' সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কর্মক্ষেত্র—ইহা চার অঙ্কের পালা। প্রস্তাবনার পরে নাট্যারম্ভ হইয়াছে। নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় পঁচিশ। ইহার মূল বক্তব্য, দেশের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র পল্লী অঞ্চল ; সেখানে আদর্শ গৃহস্থ গড়িয়া তুলিতে হইবে। নাটকের প্রধান আদর্শ চরিত্র 'বাউল-এর' সংলাপে ইহা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, —

বাউল—আদর্শ গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমার এই বিরাট কর্মক্ষেত্রের আয়োজন। খাঁটি গৃহস্থ না হলে প্রকৃত কর্মবীর দেশে জন্মাবে না—এই আমার বিশ্বাস (৫ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)।

পল্লীর উন্নতির জন্য গৃহশিল্পে মনোনিবেশ এবং সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন যে একান্ত প্রয়োজনীয় পালায় তাহাও বলা হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে গান্ধীজীর চরকা কাটা এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত অস্পৃশ্যতা বর্জন দ্বারাও 'কর্মক্ষেত্র' প্রভাবিত। পালার ছাত্রীগণ চরকা সম্পর্কে গাহিয়াছে,—

চরকা আমার পিতা মাতা
চরকা বন্ধু সখা,
চরকায় ভাত কাপড় পরি
জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা
চরকা প্রাণের সখা। (৫ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

অস্পৃশ্যতা বর্জন সম্পর্কে বাউল গাহিয়াছে,—

কামার, কুমোর, চামার, মুচি
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধর জড়িয়ে গলা তাদের
ভুলে আপন পর। (৫ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)।

বিদেশী পণ্য বর্জনে মুকুন্দদাস পল্লী নারীদেরও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালার গান ও তাহার বক্তৃতা এ বিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পালার একটি গান উদ্ধার করা যাইতেছে,—

ছেড়ে দেও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পরোনা।
জাগগো ও জননী, ও ভগিনী, মোহের ঘুমে আর থেকোনা।
কাঁচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে কলঙ্ক হাতে পরোনা।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী জগৎ ভরে আছে জানা,
চটকদার কাঁচের বালা, ফুকের মালা, তোমাদের অঙ্গে শোভে না॥
নাই বা থাক মনের মতন স্বর্ণ ভূষণ তাতেও যে দুঃখ দেখিনা,
সিঁথিতে সিঁদুর ধরি বঙ্গনারী জগতে সতী শোভনা॥
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে, কোটি টাকার কম হবে না,
পুঁতি, কাঁচ, ঝুটা মুক্তায় এই বাংলায়, নেয় বিদেশে কেউ জানেনা।

ঐ শোন বঙ্গমাতা, সুধান কথা, জাগো আমার যত কন্যা।
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী, দুবেলা অন্ন জোটে না।
কি ছিলেম কি হইলাম, কোথায় এলাম মা যে তোরা ভাবিলি না।
(ফেরিওয়ালা—৩য় দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

আমরা দেখিয়াছি—এই গানের পরে বক্তৃতার শেষে বহুনারী স্বেচ্ছায় কাঁচের চুড়ি, গলার মালা খুলিয়া একস্থানে জড় করিলে গাওনা শেষ হইবার পূর্বেই তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। যে চাষীর শ্রমের ফলে দেশের ধমনীতে রক্তস্রোত বহিতেছে সেই চাষীকে দুঃস্থ অজ্ঞাত অবস্থায় দূরে ফেলিয়া রাখিলে দেশের অগ্রগতি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং চাষীর দুর্দশা ঘুচাইয়া তাহাকেও নূতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া দেশ-মাতৃকার বন্দনা গান গাহিতে হইবে। 'কর্মক্ষেত্র' পালায় চারণ কবি এ সত্য প্রচার করিয়াছেন,—

বাউল—স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ,
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।
দেবতার আশিস্ বর্ষিবে সে দিন অজস্র ধারায় মাথার পর,
আসিবে নামিয়া নূতন শকতি নব বলে হবে বলিয়ান,—
শক্তিতে হবে শক্তিমান। (৫ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

বাস্তবকে উড়াইয়া দিয়া কেবল পরজগৎ লইয়া থাকিলে দেশবাসীর দুর্দশা কখনও ঘুচিবে না। মানব জীবনে দুই জগতেরই প্রভাব আছে, প্রয়োজন আছে। সেই জন্যই বাউল ধর্মজগৎ ও বাস্তব জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের পক্ষপাতী,—

বাউল—ব্রহ্মসাধন নিরত কোন্ মহাপুরুষ অনাহারে জীর্ণ শরীর বহন করে পৃথিবীর উপেক্ষাকে ধর্মসাধনার অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছেন? অর্জুন কি ধার্মিক ছিলেন না? আজন্ম ব্রহ্মচারী মহামতি ভীষ্ম—তিনি কি অধার্মিক? কার্তবীর্য, রাজর্ষি জনক—এঁরা কি তোমাদের আদর্শ পুরুষ নন? ধর্ম সাধনার পথে পরিধেয় বস্ত্রখানারও অনাবশ্যকতা জ্ঞান, জড় জগৎটা কিছু নয়, ওটা মায়াময়—এ যেদিন ভারতের উর্বর মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকে ভারত রসাতলে যেতে বসেছে। (১ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

বাউলের কন্যা গার্গী আদর্শ শিক্ষয়িত্রী, তিনি দেশে আদর্শ গৃহিনী তৈরীর কাজে নিযুক্ত হইয়া মাতৃজাতির জাগরণের জন্য কর্মপথে অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যান্য নাটকের মত এই নাটকেও নাট্যকার নানা আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। গৃহস্থ 'বাউল' চরিত্রটি ইহার প্রধান প্রচারক।

মুকুন্দদাস 'দাদা' ও 'জয় পরাজয়' নামে দুইখানি পালা রচনা করিয়াছিলেন। এই পালা দুইটিও খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় (১২৮২—১৩৫৭)

তিনি হাওড়া জিলান্তর্গত পাঁচলা বাসুদেবপুরের অধিবাসী ছিলেন। কুঞ্জবিহারী কয়েকটি পৌরাণিক যাত্রা পালা রচনা করেন। তাহার একখানি পৌরাণিক পালা বিশ শতকের স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইহার ফলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তাই পরবর্তী কালে তিনি স্বদেশী-ভাব-মুক্ত পৌরাণিক নাটক রচনা করেন।

মাতৃপূজা (১৯০৮)—এই পৌরাণিক নাটকখানি ভূষণচন্দ্র দাসের যাত্রা সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে ইহার মূল কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে। দৈত্যরাজ 'শুম্ভ' কর্মবলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। রাজপ্রতিনিধি 'রক্তবীজ' স্বর্গরাজ্যকে উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করিয়া তুলেন। অশেষ অত্যাচারে জর্জরিত দেব-প্রজাদের সমবেত চেষ্টায় তাহাদের মাতৃভূমির উদ্ধার সম্ভব হয়। এই কাহিনীতে ইংরেজ রাজশক্তির অকথ্য পীড়ন, শোষণ, ও দেশ-মাতৃকার উদ্ধার কল্পে বিংশ শতকের প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলনের স্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে। ভূমিকায় পালাকার বলিয়াছেন—"প্রকৃতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ না থাকিলে রাজ্যে নীতিবিরোধ ও প্রজা পীড়ন হয়—ফলে প্রজাগণের মানসিক শক্তির তিরোধান ঘটে; উত্তরোত্তর নির্যাতন সহিতে সহিতে প্রজাদিগের যখন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়, তখন প্রতিকার সাধনে সমবেত চেষ্টার স্বতই উদ্রেক হয়; তজ্জন্যই রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ ঘটে"। নাটকের রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বিরোধ ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রজাবৃন্দের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার প্রচারে সরকার স্বার্থবিরোধী অশুভ ফলের ইঙ্গিত পাইলেন। সুতরাং 'মাতৃপূজার' অভিনয় বন্ধ হইল, প্রকাশকের ভাণ্ডার হইতে গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইল, এবং লেখকের গৃহ পুলিশ কর্মচারী

কর্তৃক 'মাতৃপূজার' বহ্‌ুৎসব উদ্‌যাপিত হইল। কুঞ্জবিহারী কিছুকাল বর্ধমান রাজধানীতে পলাতক থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ধৃত হইলেন। কারাগৃহ ঘুরিয়া আসিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-বাসনা তিনি কেবল মনে মনেই পোষণ করিতে থাকেন। ইহা লইয়া তিনি আর নাটক রচনা করেন নাই।

নাটকের গীতি সংখ্যা পঁয়তাল্লিশের ঊর্ধ্বে। ইহাতে যাত্রাব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'মাতৃপূজা'র গানে সুর ও তালের উল্লেখ করা হইয়াছে। নাটকে গন্ধর্বগণ, দেববালকগণ গানে গানে দেশপ্রেমের বাণী ছড়াইয়াছে। সুমেরু উপত্যকায় (৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক) গীত দেববালকগণের এই শ্রেণীর একটি গান উদ্ধার করা যাইতেছে,—

সাড়ঙ্গ—এক তালা

আর আমরা পরের মাকে মা বলিয়ে ডাকব না।
জয় জননী জন্মভূমি, তোমার চরণ ছাড়ব না।
ফিরব না আর পরের দ্বারে, ভাসব না আর নয়ন নীরে
কি সুধা তোর হৃদয় ক্ষীরে জীবনে মা ভুলব না।
কি করুণা কি মহিমা, কি অতুল মাধুরিমা!
সুজলা, সুফলা শ্যামা এমন মা আর পাব না!

শুম্ভ রাজা হইলেও রাজ্যের প্রকৃত চালক সেনাপতি 'রক্তবীজ'। ইংলণ্ডেস্থিত রাজার প্রতিনিধি যেমন ভারত শাসনকার্য পরিচালনা করেন ইহাও যেন কিছুটা সেই রকম। স্বার্থপর অত্যাচারী শাসক রক্তবীজ। পীড়িত পরাধীন দেশের সমস্ত মুখর অভিব্যক্তিকে পদাঘাতে দমাইয়া রাখাই তাহার নীতি। তাহার অত্যাচারে দেশে দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, অশান্তি, অকালমৃত্যু দেখা দেয়। কিন্তু এই সব অবস্থায়ও তাহার শোষণের শেষ নাই। যে কোন রকমে রাজকোষের অর্থ বৃদ্ধির জন্য তিনি চেষ্টিত। রাজশক্তির আর এক স্তম্ভ 'মুণ্ড' অন্যায় অত্যাচারে বিরত থাকিবার মনোভাব প্রকাশ করায় রক্তবীজ তাহাকে কর্মোদ্যোগী করিয়া তুলিতে চাহেন। তাহার বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যাচারের মধ্য দিয়া তিনি বীরত্বকে রূপায়িত করিতে চেষ্টিত,—

রক্তবীজ— ·····মনের দুর্বলতা ত্যাগ কর। দুর্বলের প্রতি বলবানের পীড়া চিরদিনই চলে আসছে; বীর কুলে জন্মগ্রহণ করে বীরত্ব বিসর্জন দিও না। 'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা'—একথা যেন বিস্মৃত হয়ো না।

(৩য় গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক)।

দৈত্যদের অবিরাম স্ত্রী প্রসঙ্গ, নৃত্যগীত, মদ্যপান, দৌরাত্ম্য, কটূক্তি, লোভ, নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া নাট্যকার তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অশুভ অশান্তির মধ্যে অদৃষ্ট পুরুষ 'শক্ত্যানন্দ' দেশ-সেবকদের আশার বাণী শুনাইয়াছেন। পরাধীন স্বর্গের 'কুমার' সেই আশার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি দেশ মাতার হাহাকারে ব্যথিত। তাই তাহার বন্ধন দশা ঘুচাইবার জন্য তিনি অগ্রণী হইয়াছেন,—

কুমার—···আমাদের স্বর্গজননী! বীর প্রসবিনী পুণ্যময়ী মাতৃভূমি!—আজ পাপ-দৈত্যভারে নিপীড়িতা। ওঃ, কি মর্মভেদী হৃদয়োচ্ছ্বাস! তীব্র দীর্ঘশ্বাসে মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ সলিলও উতপ্ত হইয়াছে! কেবল বলছেন,—'কে আছিস, কে আছিস, আয় বাপ, আমার বন্ধন মোচন কর। কোটি কোটি শস্ত্র-ধারী সন্তানের মা হয়ে আজ আমার এই দশা'! · আমি যাই, মুহূর্তকাল বৃথা নষ্ট করব না। সময়ের অপব্যবহার করতে নেই। মা মহাশক্তির উদ্বোধনে শক্তিলাভ করে মাতৃমুক্তি সাধনে চেষ্টা করি। (৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক)

কুমারের এই প্রচেষ্টার মধ্যে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনকারীদের প্রভাব স্পষ্ট প্রকাশিত। যে সকল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন রাজপুরুষ দেশে অবিচার অত্যাচার করার কথা বলিয়াছেন সেই স্বল্পসংখ্যক প্রত্যাখ্যাতদের সঙ্গে রাজপুত্র 'পূর্ণেন্দু' চরিত্রের মিল রহিয়াছে। পূর্ণেন্দু শুভ বুদ্ধির প্রতীক। তাহার বিনাশে শুম্ভের পতন ঘটে। ইংরেজ সরকারও শুভ বুদ্ধি পরিত্যাগ করায় তাহাদের ভবিষ্যৎ রাজ্য ত্যাগের পথ প্রস্তুত করিতেছিলেন। 'শান্তি', 'তুষ্টি', 'ঈর্ষা', 'লোভ', 'পাপকে' রূপক চরিত্ররূপে নাটকে উপস্থাপিত করিয়া ইহাদের স্বরূপ ও মানব চরিত্রের উপর ইহাদের প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পরাজিত দেশের 'ত্রিদিব রঞ্জন' দৈত্যরাজের বয়স্য নিযুক্ত হইলেও স্বদেশের মঙ্গল কামনাই তাহার অন্তরে ধূমায়িত হইয়াছে। রাজা শুম্ভ ঠিক অত্যাচারী ছিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রজাগণের "স্বাধীনতা লাভের প্রবৃত্তি জেগেছে—তারা আর মহাশক্তিকে শান্ত হতে দেবে না" (৭ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)। তাই তিনি রক্তবীজের কর্মে সমর্থন জানাইয়াছেন এবং নিজের শুভ বুদ্ধির (পূর্ণেন্দুর) বিনাশ সাধন করিয়াছেন। নাট্য রচনায় রৌদ্র, বীভৎস, করুণ, বীর ও ভক্তি রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

তরণী সেন—রচনা ও অভিনয়ের বহুবৎসর পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই পৌরাণিক নাটক প্রকাশিত হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড হইতে ইহার কাহিনী

সংগৃহীত হইয়াছে। রাম লক্ষ্মণের সহিত ভক্তবীর তরণীসেনের প্রচণ্ড যুদ্ধ ও রামহস্তে তাহার মুক্তি কাহিনীর মূল বিষয়। এই নাটকও ভূষণ চন্দ্র দাসের দলে অভিনীত হয়। নাটকটি কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। নাটকে বহুসংখ্যক গীতি সংযোজিত হইয়াছে। নাট্য শেষে জুড়ি ও বালকদের জন্য অতিরিক্ত আঠারখানি গান যোজনা করা হইয়াছে; গানগুলি গীত হওয়া অধিকারীর ইচ্ছাধীন। জুড়িরগান উঠিয়া যাইতে থাকায় এই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। রচনায় ভক্তি, বীর ও করুণরস প্রাধান্য পাইয়াছে।

প্রতিজ্ঞাপালন (৯২৭)—ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। ইহার মূল কাহিনী কাশীরাম দাসের মহাভারতের দ্রোণপর্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। "ইহার ঘটনাকাল সন্ধ্যা হইতে পরদিন অপরাহ্ন পর্যন্ত" (ভূমিকা)। দুর্যোধনের পুত্র 'লক্ষ্মণ' অভিমন্যুর হাতে নিহত হওয়ায় সপ্তরথী অভিমন্যুকে বধ করেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যুদ্ধে চক্রব্যূহের দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে অর্জুন তাহাকে যম-সদনে পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। কৃষ্ণের কৌশলে তিনি সেই প্রতিজ্ঞা পালনে সক্ষম হইলেন। ইহাই নাটকের মূল বিষয়। নাটকখানি কবি নবীন চন্দ্র সেনের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। নাটকের গীতি-সংখ্যা পঁয়তাল্লিশের অধিক, ইহাতে কয়েকটি যাত্রাবাদ্যালে সংযোজিত হইয়াছে। নাটক হইতে একটি বিবেকের গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

ভ্রান্তি—এই পথে এস, কোন কষ্ট নাই,
বড়ই সরস পথ!
বিলম্ব করো না—চল শীঘ্র,
পূর্ণ কর মনোরথ।
দুর্যোধন—তোমার কথায় আর না করি প্রত্যয়,
আশা মরীচিকাময়ি! বড়ই সন্তপ্ত
আমি! ক্ষণকাল ভাবি স্থির মনে! চারি
দিকে ভীষণ আঁধার—তোমা সনে শুধু
চলেছি আঁধার পথে; পদে পদে তার
তীক্ষ্ণ কাঁটা ফুটিতেছে পায়! কত আর
যাব অন্ধকারে? কই—আছ কি আমার
প্রিয় বন্ধু, কেহ? এস—দেখাও আলোক,
সূচিভেদ্য অন্ধকারে পথহারা আমি।

প্রজ্বলিত দীপ হস্তে বিবেকের প্রবেশ—(গান)

রত্ন-প্রদীপ জেলে এসেছি।
আঁধারে পথ ভুলেছ, তাইতো ছুটে এসেছি ॥
উজ্জ্বল আলোকে চল চল ধীরে ধীরে
চিরানন্দময় জ্ঞান সিন্ধুতীরে
সুখে রবে শান্তি-মণি মন্দিরে
প্রেমের আনন্দ পেতে রেখেছি ॥
সাধ করে কেন বিষাদ
দুদিনের তরে কেন বিষাদ ?—
জীবনাবসানে শ্মশানে যখন
শত্রু-মিত্র সব একত্র শয়ন
বেঁচে থেকে তবে দ্বন্দ্ব কি কারণ
বুঝেও বোঝনা কত বলেছি ॥

প্রতিজ্ঞাপালন বীর, ভক্তি ও করুণ রসাত্মক নাটক। ইহাতে গান্ধারী চরিত্রটি স্নেহময়ী জননীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে যথেষ্ট সরলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ প্রভৃতি বিষয়ে কূট শকুনির আত্মকর্ম সমর্থনে গান্ধারীর সঙ্গে কথোপকথন হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে,—

গান্ধারী—বুঝলাম পাণ্ডবের যশোগৌরব বিস্তার—দ্রৌপদীর পুণ্যোজ্জ্বল চরিত্রের অপূর্ব জ্যোতি বিকাশ করাই তার উদ্দেশ্য। নইলে দুর্যোধন আমার যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করে এমন কাজে লিপ্ত হবে কেন—তুমিও তাতে উদ্‌যোগী হবে কেন ? কিন্তু কুন্তী-পুত্রগণই ধন্য ! তারা জগতে প্রশংসা ভাজন, আর আমার সন্তানগণ—আমার দাদা পদে পদে সকলের কাছে নিন্দা ভাজন।

শকুনি—আমরা মানুষের কাছে নিন্দা ভাজন, কিন্তু তাঁর কাছে নয়। নাটকের কুচরিত্র অংশের যারা অভিনয় করে, তাদের ভাগ্যে নিন্দা—গালি-বর্ষণ তিরস্কার লাভ হয় বটে, কিন্তু তারা নাট্যকারের কাছে উৎকৃষ্ট পুরস্কার পায় আমরাও সেই ভব-নাট্যকারের কাছে পুরস্কার পাব তাঁর কাজ করেছি বলে,— সংসারে যারা কাজ করে, নিন্দা-স্তুতিতে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।

গান্ধারী—আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করব দাদা, যেদিন কুরুপাণ্ডবের বিরোধ ভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে হস্তিনায় এসেছিলেন, সেদিন তাঁকে বাঁধবার জন্য দুর্যোধনকে উত্তেজিত করেছিল কে ?

শকুনি—শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল। তাঁকে বেঁধে রাখতে না পারলে কিছুতেই কাছে থাকে না। তাই দুর্যোধনকে ইঙ্গিত করেছিলাম,—খেলা করে যাচ্ছ বটে, কিন্তু ঐ প্রাণের দেবতাকে প্রাণে প্রাণে বেঁধে রাখতে ভুলো না।

গান্ধারী—তোমার অন্তরে এমন প্রগাঢ় ভক্তি লুকান আছে, তা আগে জানতাম না। আজ আমি তোমার নতুন মূর্তি দেখলাম।······দাদা, দাদা, ভগ্নীর প্রণাম গ্রহণ কর। (প্রণাম—৪র্থ দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

পাপ পথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য দুর্যোধনের মনে মাঝে মাঝে চেতনা জাগ্রত হইলেও প্রবৃত্তির তাড়নায় আবার তিনি সেই পথেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাটকে কৃষ্ণচক্রী রূপে চিত্রিত হইয়াছেন; তাহারই চক্রান্তে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা সম্ভব হয়। এই নাটক শশিভূষণ হাজরার দলে অভিনীত হয়।

পণ্ডিত হারাধন রায় (১২৭২—১৩২৬)

হাওড়া জিলার কল্যাণপুরের অধিবাসী হারাধন রায় হাওড়া-কুলকাশা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তাহার নাটক ঘটনা বহুল। ইহাতে সংগীতেরও প্রাধান্য রহিয়াছে। সংলাপ রচনায় তাহার সংস্কৃত প্রীতির পরিচয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'শাল্ববধ' তাহার প্রথম পৌরাণিক নাটক। বীর, ভক্তি, করুণ রস প্রধান এই নাটকখানি প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রাদলে অভিনীত হয়।

লক্ষ্মণ বর্জন (১৩১১)—কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের কাহিনী লইয়া রচিত এই পৌরাণিক নাটক বারোটি দৃশ্যে বিভক্ত। দ্বাদশদৃশ্যে নাট্য কাহিনী সমাপ্ত হইবার পরে গোলকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীরূপে রামসীতার মিলন দেখাইবার জন্য 'শেষ দৃশ্য' নামে ইহাতে একটি 'মেলতাই দৃশ্য সংযোজিত হইয়াছে। কোন কোন দৃশ্যে পট পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়া উপদৃশ্য যোজনা করা হইয়াছে। তৎ-কালীন ফরাসডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্ন কুমার নিয়োগীর যাত্রাসম্প্রদায়ে এই নাটক অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্যা পঁয়ত্রিশের অধিক। নাটকের দ্বাদশ দৃশ্যে লক্ষ্মণের দেহত্যাগেব পরে অনন্ত-পত্নীগণের পর পর দুইটি যাত্রাব্যালে রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ রহিয়াছে। নাটকে রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, ভক্তিরস থাকিলেও ইহা করুণ রস প্রধান রচনা। প্রথমে দুইটি গানে নাটকের ভূমিকাংশ সমাপ্ত করা হইয়াছে। এই ভূমিকাই প্রকৃতপক্ষে

প্রস্তাবনা। রামলীলা-অবসান শ্রবণ করানো যে নাট্যকারের উদ্দেশ্য তাহাই ভূমিকায় ব্যক্ত হইয়াছে —

সুধী সভ্য জনগণ, সবে করুণ শ্রবণ—
রামলীলা অবসান, দূর হবে ভব ভয়। (২য় গীত)

বৈকুণ্ঠে কমলারূপী সীতার ক্লেশ দূর করিবার জন্য ব্রহ্মা ও শিব যুক্তি করিয়া কালপুরুষ ও দুর্বাসার সাহায্যে রামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠে আনিবার ব্যবস্থা করেন। কালপুরুষ অযোধ্যায় আসিয়া রামের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণায় নিযুক্ত হইলেন; মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বে রামচন্দ্রকে দিয়া কালপুরুষ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে মন্ত্রণা সমাপ্তির পূর্বে কেহ তথায় উপস্থিত হইলে তাহাকে বর্জন করিতে হইবে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুর্বাসা আসিয়া মন্ত্রণা গৃহের দ্বারী লক্ষ্মণকে দ্বার ছাড়িয়া রামের সঙ্গে দুর্বাসার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ রাজি না হওয়ায় দুর্বাসা অযোধ্যা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে উভয় সংকটে পড়িয়া তিনি ঋষিকে গুপ্ত গৃহের পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণ মন্ত্রণা সমাপ্তির পূর্বে তথায় উপস্থিত হয় বলিয়া রামচন্দ্র তাহাকে বর্জন করেন। লক্ষ্মণ সরযূ-তীরে যোগাসনে প্রাণত্যাগ করেন। তারপর ঐ নদীতীরে ভরত, শত্রুঘ্ন, মাণ্ডবী, উর্মিলা ও শ্রুতকীর্তি রামের চরণে প্রাণ ত্যাগ করিলে তিনি সরযূতে প্রাণ বিসর্জন দেন। ইহাই নাটকের প্রধান বিষয় বস্তু। ভ্রাতৃস্নেহ ও সীতা-প্রেম অবলম্বনে রাম চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মণের চরিত্রে ভ্রাতৃভক্তি, রাজকুমারগণের প্রতি বাৎসল্য ও অযোধ্যার মঙ্গল কামনার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ অপ্রিয় সত্য ভাষণেও বিরত হইতেন না। ভরত অদৃষ্টের বিধান মানিয়া লইয়া ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনে সাধারণ সংসারীর মত কার্য করিয়া যাইবার পক্ষপাতী। এই চরিত্রে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় গন্ধর্বরাজ 'লোমশের' সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় ও তাহাকে পরাস্ত করায়। চতুর্থ দৃশ্যে 'পেলারাম' চৌকিদার ও তাহার স্ত্রী 'সুখী' চরিত্রদ্বয়ের মধ্য দিয়া হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হাস্যরস অত্যন্ত স্থূল, মাঝে মাঝে অশ্লীল শব্দও রহিয়াছে। এই চরিত্রদ্বয়ের সঙ্গে নাটকের কোন যোগসূত্র রচিত হয় নাই। লোকরঞ্জনের জন্য নাটকে ইহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই নাটকে নারী চরিত্রের বিশেষ প্রাধান্য নাই। উর্মিলা চরিত্রে পতিপ্রেম, রাজকুমারগণের প্রতি বাৎসল্য ও লক্ষ্মণ বর্জনের ফলে শোক-ভাবের সমাবেশ করা হইয়াছে। নাটকে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সংলাপ কখনো গদ্যে কখনো বা পদ্যে

উপস্থাপিত হইয়াছে। কিছু সংলাপ অমিত্র-পয়ারেও গ্রথিত হইয়াছে। রণক্ষেত্রে গন্ধর্বরাজ লোমশের সঙ্গে ভরতের বাক্য বিনিময়ে মিত্রাক্ষর-পয়ার ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই অংশে উভয়েরই উক্তি সংক্ষিপ্ত; একজনের এই সংক্ষিপ্ত উক্তির শেষাংশের সঙ্গে অপরের উক্তির শেষাংশ লইয়া মিত্রাক্ষর রচনা করা হইয়াছে। ১৩১০ সালের পূর্বে প্রকাশিত অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'তুলসী লীলায়' অস্ত্র-যুদ্ধের পূর্বে বাগদ্বন্দ্ব অবলম্বনে এই শ্রেণীর সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে। মনে হয়, হারাধনের উপর ইহারই প্রভাব পড়িয়াছে। এখানে ভরত ও লোমশের বাগযুদ্ধের উক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে,—

লোমশ—পশুর অধম রাম জ্ঞানময় নয়।
ভরত—পুনর্বার রামনিন্দা ত্যজি প্রাণভয় ?
লোমশ—ফণী-মণি রয় কি রে কভু ভেকশিরে ?
ভরত—অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় নির্বাণের তরে।
লোমশ—জোনাকি জানে কি কভু তপনের মান ?
ভরত—পরিণামে আছে তোর নরকেতে স্থান।
লোমশ—তেজ-গর্ব এই ভাবে চিরদিন রবে,
ভরত—নীরবিন্দু পদ্মপত্রে অচঞ্চল কবে ?
লোমশ—কবে রে সক্ষম তৃণ অচল-ছেদনে ?
ভরত—কার্যে দেখ কাজ কিরে বৃথা আস্ফালনে।
লোমশ—পতঙ্গ হইয়া আশা পশিতে অনলে ?
ভরত—কে পতঙ্গ কে অনল দেখ তবে ফলে।
লোমশ—দে রণ দে রণ শীঘ্র তবে দুরাশয় !
ভরত—এই শরে যাবে তবে কৃতান্ত-আলয়। (উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ও লোমশের অস্ত্রহীন হওয়া, ৬ষ্ঠ দৃশ্যের ৩য় পট পরিবর্তন—যুদ্ধস্থল)

মীরা উদ্ধার (১৩১৫)—রাজপুতনার রাজপুতবধূ মীরার ঐতিহাসিক কাহিনী নাটকের মূলবিষয়। এই ঐতিহাসিক কাহিনীকেও পৌরাণিক ঢঙ্-এ পরিবেশন করা রইয়াছে। ভক্তিরস প্রধান এই নাটকে নারদের অভিশাপ বৃত্তান্ত সংযোজিত হইয়াছে।

ধর্মের জয় (১৩২০)—মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসটির কাহিনী লইয়া এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি রচিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের পরিণাম দেখানই যে নাটকের উদ্দেশ্য তাহা প্রস্তবনা অংশে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দ্রৌপদী এবং রাজমাতা গান্ধারী শোক-বিহ্বল নারীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। অশ্বত্থামা পৈশাচিক প্রতিহিংসা পরায়ণ ও ক্ষাত্র ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াদি ও বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য মায়াবী রাক্ষস চরিত্র 'চার্বাক' সৃষ্ট হইয়াছে। কুক্রিয়ার ফল স্বরূপ চার্বাককে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান অংশে নাট্যকার বীভৎস রসকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। ভীম রৌদ্র ও বীর রসের চরিত্র রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের পরিণামে দুর্যোধন 'জ্ঞাতি হিংসা—পাপে নিজের সর্বনাশ—স্বজাতির সর্বনাশ—জন্মভূমির সর্বনাশ' (দুর্যোধন—২য় দৃশ্য, ১ম অঙ্ক) দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন; তাহার মধ্যে কৃষ্ণভক্তির পরিচয়ও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বীর দুর্যোধন শত্রুভাবে কৃষ্ণভক্তরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। ইহাতে কিঞ্চিৎ নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ। 'দণ্ডী' চরিত্রে বহু সংস্কৃত শ্লোকও ব্যবহৃত হইয়াছে। নাট্যকারের সংলাপ রচনার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিবার জন্য দুর্যোধনের একটি উক্তি উদ্ধৃত হইল; এই অংশে তাহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

দুর্যোধন—কৃষ্ণ! আমি ঐহিক সুখের চরম তৃপ্তি লাভ করেছি। আকাঙ্ক্ষা আগুন আর আমার অন্তর পোড়াতে পারবে না; এভাবে আর আমার মনের চাঞ্চল্য আনতে পারবে না। আমি উত্তমরূপে প্রকৃতিস্থ হয়েছি। সসাগরা বসুন্ধরা শাসনে, বিপক্ষের রাজগণের গর্বিত মস্তকে আরোহণে, আমি দেবদুর্লভ সুখ উপভোগ করেছি। শেষে ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমর-মৃত্যু ও লাভ করছি। তোমাদের বিদ্বেষবুদ্ধি এখন আর আমার উচ্চ গতি রোধ করতে পারবে না। কৃষ্ণ সুচতুর মহাশিল্পী তুমি যে সুন্দর ভবের হাট সাজিয়েছ তা আমি উত্তম রূপেই দেখে শুনে ভোগ করে গেলাম। তোমরা এখন আমারই ভুক্তাবশিষ্ট তুচ্ছ পার্থিব সুখ, শোকার্ত মৃতপ্রায় হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভোগ কর। কৃষ্ণ! তুমি যদি যথার্থ স্বার্থশূন্য অন্তর্যামী হও, তাহলে আমার প্রকৃত অন্তর বুঝে কার্য কর। পাণ্ডবগণ তোমামোদে ভক্তিযোগে তোমার সাধনা করছে জানি, কিন্তু কৃষ্ণ! আমিও দিবানিশি আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে, প্রবলপ্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ভীষণ শত্রুতায় শত্রুভাবে তোমার মূর্তি আর কার্য ধ্যান করেছি; এখনো তুমি আমার জীবনের স্থির লক্ষ্য। যা কিছু করছি তোমাকেই আদর্শ ভেবে—তোমারই অনুকরণ প্রিয় হয়ে—তোমারই মত

সকলের বড় হব ভেবে করেছি; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি। ভক্তিভাবে নয়, শত্রুভাবে তোমারই ভক্ত আমি,—অন্যায় ভাবেই তোমার কার্য ভেবেছি। পাণ্ডবেরা ভক্তি যোগেও বোধহয় কখনও তোমায় ভাবের প্রাণে ভাবতে পারেনি! ভক্তি-অভক্তি—পাপ-পুণ্য—বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোমারই যদি সৃষ্ট হয়, তুমি যদি প্রবৃত্তিরূপী হও তাহলে কৃষ্ণ! আমিও তোমার পূজা করেছি। দুর্বলতায় নয়, কেঁদে পায়ে ধরে নয়; বীরভাবে—গায়ের জোরে—প্রকৃতির অনুকূল স্রোতে হাসি মুখে ভেসে ভেসে। দেখি, তোমার অপার ভবসাগরের কূল পাই কিনা অকূল কাণ্ডারী। তুমি যদি প্রকৃতই সর্বান্তর্যামী হৃদয়-বিহারী হও তাহলে আর কিছুই বলব না কৃষ্ণ! তুমিই মনে মনে বুঝে দেখ, তুমি মনে মনে তার বিচার কর। দেখবো তুমি কেমন সমদর্শী নির্বিকার! কিরূপ সর্বময় সদানন্দময়! ওকি শূন্যে যেন অপূর্ব মূর্তি রাখালগণ সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ গুণগান করছে! মরি-মরি, যেন শত শত রাখাল বেশী কৃষ্ণমূর্তি, কি আশ্চর্য মায়া! কি প্রাণারাম মধুর দৃশ্য! (বিস্ময়ের দৃষ্টি, ১ম গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)

নাটকে দুর্যোধনের অধর্ম পক্ষের সম্পূর্ণ পতন ও যুধিষ্ঠিরের ধর্মপক্ষের সিংহাসন লাভ দেখান হইয়াছে। পালার গীতিসংখ্যা প্রায় চল্লিশ। দুর্যোধন, ভীম, গান্ধারী, দ্রৌপদী, অর্জুন প্রমুখের জন্য জুড়ির গান নাটকে যোজনা করা হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে 'নেপথ্য সঙ্গীত' সংযোজিত হইয়াছে। জুড়ি দ্বারা এই নেপথ্য সঙ্গীত গীত হইত। 'ধর্মের জয়' পালায় ভক্তি, করুণ, বীর, রৌদ্র ও বীভৎস রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। "নাটকখানি 'গণেশ অপেরা পার্টি' কর্তৃক মহা যশের সহিত অভিনীত হইয়াছিল"—(প্রকাশকের নিবেদন)।

তাম্রধ্বজ (১৩২৭)—এই পৌরাণিক নাটকটি দ্বিতীয় দশকের প্রথমে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হয়। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধরিবার ফলে তাম্রধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধে ভীম-অর্জুনের পরাভব ও শিখিধ্বজের দানপরীক্ষা নাটকের মূল বিষয়-বস্তু। ইহা করুণ, বীর ও ভক্তি রসাত্মক নাটক। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে নাটকের মূল কাহিনী গৃহীত হইয়াছে।

মহাশ্বেতা (দ্বিতীয় সং—১৩৩৭)—তারাশংকর তর্করত্নের কাদম্বরীর কাহিনী অবলম্বনে এই পালার কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। নাটকে দেব চরিত্র সন্নিবেশের মূলে রহিয়াছে ভক্তিরস সঞ্চারের উদ্দেশ্য।

'সুরথ উদ্ধার' (দ্বিতীয় সং ১৩১৪), 'নল দময়ন্তী' (১৩১২), 'পার্থ পরীক্ষা'

(১৩১৪), 'যযাতি' এবং 'রাম-অবতার' (১৩২০) নামে তিনি আরও কয়েকটি লোকনাট্য রচনা করেন।

নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়

তিনি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত সাহান্নুই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। নিতাই পদ শশিভূষণ অধিকারীর গ্রাণ্ড অপেরা পার্টিতে অভিনেতা রূপে যোগদান করেন। কিছুকাল অভিনয় করিবার পরে তিনি নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহার যাত্রা-পালায়, আদিরসাত্মক দ্বৈতগীতি, গণের গান, একানে বালকের গান এবং কোন কোন নাটকে জুড়ির গান ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি গদ্য এবং পদ্যে নাট্য সংলাপ রচনা করিয়াছেন। আবেগপূর্ণ সংলাপ রচনায় নাট্যকার অধিকাংশ স্থলেই পদ্যছন্দের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। গদ্য অপেক্ষা পদ্য সংলাপ রচনায় তিনি অধিক সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাটকার নাট্য ঘটনা বহির্ভূত চরিত্রকে নাটকে স্থান দিয়াছেন।

শ্মশানে মিলন (১৯১৪)—ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের (বাংলা সং) অন্তর্গত হরি-শ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 'মহাকালী সংগীত সম্প্রদায়' ও 'বালক সঙ্গীত সমাজ' কর্তৃক অভিনীত হয়। ইহাতে যাত্রা-ব্যালে সুখচাঁদ ও মতিয়ার আদি রসাত্মক দ্বৈতগীতি, গণের গান, একানে বালকের গান প্রভৃতি সংযুক্ত হইয়াছে। নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় বত্রিশ। নাটকের শেষে অতিরিক্ত এগার খানি গান সংযোগ করা হইয়াছে। প্রয়োজন বোধে এইসকল গান ও গীত হইতে পারে। অতিরিক্ত গানগুলি দুই ভাগে বিভক্ত: ইহাদের কতকগুলি জুড়ির জন্য ও কতগুলি বালকদিগের জন্য রচিত হইয়াছে। মহাকালী সঙ্গীত সম্প্রদায়ে এই গানগুলি গীত হইত। এই সময়ে জুড়ির গান জনপ্রিয়তা হারাইতে থাকে বলিয়া ঐ শ্রেণীর সমস্ত গান অতিরিক্ত রূপে উল্লেখ করিয়া নাটকের শেষে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

তপোবনে আবদ্ধ অবিদ্যাগণের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্র তাহাদের মুক্তি দান করেন। ইহাতে অবিদ্যাবিনাশে উদ্যত ক্রোধী ঋষি বিশ্বামিত্র হরিশচন্দ্রকে রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত মনে করিয়া অভিশাপ দগ্ধ করিতে মনস্থ করেন। হরিশচন্দ্র উপযুক্ত শাসক বিশ্বামিত্রকে রাজ্য দান করিয়া অভিশাপ হইতে আত্মরক্ষা করেন। দানের দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র

রোহিতাশ্বকে কাশীতে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করিয়া হরিশচন্দ্র শ্মশানে চণ্ডালের কর্ম গ্রহণ করেন। এই ভাবে সংগৃহীত স্বর্ণ মুদ্রাদ্বারা ঋষির দক্ষিণা দিয়া হরিশচন্দ্র ঋণ মুক্ত হইলেন। পত্নী ও পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য হরিশচন্দ্রের মন যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন শৈব্যা মৃত রোহিতাশ্বকে কোলে করিয়া শ্মশানে আসেন। এই নিদারুণ দুঃখের তরঙ্গাঘাতে পিতামাতা প্রায়োন্মাদ হইয়া গেলেন। এতদ্দুঃখেও হরিশচন্দ্র ধর্ম ও কর্তব্য বজায় রাখায় বিশ্বামিত্র আশ্চর্য হইয়া মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন; এবং শ্মশানেই তাহাদের মিলন হইল। হরিশচন্দ্র আবার বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। নাটকের ইহাই মূল কাহিনী। দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে একটি ক্রোড় অঙ্ক সংযুক্ত হইয়াছে। নাট্যকার ইহাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য বৃদ্ধ কালা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে অবলম্বন করিয়া রচিত; এই অংশ নাটকের সঙ্গে কোন সংযোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। নাটকের প্রধান চরিত্র হরিশচন্দ্র দানবীর, ধৈর্যশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, ত্যাগী ও ধর্মরক্ষক নরপতি রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র ক্রোধী ও অহংকারী ঋষি। শেষ পর্যন্ত হরিশচন্দ্রের নিকট তাহার দর্পের অবসান ঘটে। মন্ত্রী, মন্ত্রী-কন্যা 'দেবসেনা', সেনাপতি 'বিরাটকেতন' ও হরিশচন্দ্রের পালিত পুত্র 'শশবিন্দুকে' লইয়া নাটকে একটি বড় উপকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু রস সৃষ্টির জন্য যাত্রা নাট্যে উপকাহিনী যোজনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে নাটকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে হয়। বর্তমান নাট্যকার এবিষয়ে যথেষ্ট শৈথিল্য দেখাইয়াছেন। শশবিন্দু মিষ্টভাষী, সরল বীর ও প্রেমিক-রূপে চিত্রিত। বিরাটকেতন বিশ্বাসঘাতক ও নরহন্তা। দেবসেনাকে জোর করিয়া অধানস্থ করিবার জন্য তিনি মন্ত্রীকে সিংহাসনের লোভ দেখাইয়া নাটকে চক্রান্তজাল বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন। হরিশচন্দ্র রাজ্যচ্যুত হওয়ায় এবং বিশ্বামিত্র মন্ত্রী ও সেনাপতির উপর রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করায় তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়া অনেকটা সহজ হইয়া উঠিল। দেবসেনা ও শশবিন্দু প্রণয়াবদ্ধ জানিয়াও মন্ত্রী সিংহাসন লোভের জন্য বিরাটকেতনকে কন্যাদানে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনাবিল প্রেমের অধিকারিণী দেবসেনা বিরাট-কেতনকে বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায় বিরাটকেতন শশবিন্দুকে হত্যা করেন। দেবসেনা মৃত প্রেমিকের দেহ লইয়া শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্বামিত্রের কৃপায় শশবিন্দুকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম হইলেন। বিরাটকেতন

মৃত্যুর পরে প্রেতরূপ ধারণ করিয়া স্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীকেও কৃতকর্মের জন্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। 'আত্মসাৎ' ও 'বয়স্ত' চরিত্রদ্বয় নাটকে হাস্যরস যোগাইয়াছে; কিন্তু নাট্যকার ইহাদের নাটকে অবশ্য প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে পারেন নাই। রোহিতাশ্বকে নাটকের একমাত্র বালক চরিত্র বলা যায়; মাতৃভক্তি, কর্তব্যবোধ ও শোকভাব অবলম্বনে এই চরিত্র রূপায়িত হয়। রাণী শৈব্যা স্নেহবৎসল ও স্বামিভক্তিপরায়ণা। 'শক্তি পাগলিনী' ছদ্মবেশী মহামায়া। এই চরিত্র নাটকে গানে গানে বিবেক, ধর্ম ও কর্তব্যের পথ দেখাইয়াছে এবং অন্যায়ের প্রতিকার করিবার ইঙ্গিত দিয়াছে। নাট্য-সমাপ্তির পূর্বে প্রজাগণের গীতে নাটকের মূল সুর ধ্বনিত হইয়াছে,—

বিশ্ববাসী বল সবে আসি যথা ধর্ম তথা জয়
আনন্দে মাতিয়া হৃদয় খুলিয়া তোল তোল ধর্ম নামের জয়।

শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য ও রৌদ্র রসকে প্রাধান্য দিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসও পরিবেশিত হইয়াছে। হরিশচন্দ্রের সংলাপ অবলম্বনে নাট্যকারের বীভৎস রস সৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

হরিশচন্দ্র— উড়িতেছে শকুনির দল;
কভু কেহ তুলিয়া পুচ্ছাগ্র ঊর্ধ্বে,
নিশ্চল যুগল পক্ষ করিয়া বিস্তার
বেগ ভরে নেমে আসে শবের উপর;
সবমাংস লোভ বশে
চঞ্চুপুটে লালারস হয় বিগলিত।
চারিদিকে শিবাদল
কর্ণকটু কি ভীষণ করিছে চীৎকার।
মনে হয় যেন
মশান-দুন্দুভি হতে
কি এক নিষ্ঠুর বাদ্য অশিব ভীষণ
চারিদিকে ঘোর রবে হয় বিঘোষিত!
কঙ্কাল সঙ্কুল এই শ্মশানের ভূমি
হইয়াছে কণ্টকিত—না চলে চরণ;
রৌদ্র তাপে হইয়া উত্তপ্ত
মড়ার মাথার খুলি বিদীর্ণ বিকৃত,

হয় তাহে বিগলিত মস্তিষ্ক তরল।
কোথা বায়স বসিয়া শিরে,
চঞ্চু দিয়া করে ভেদ
নিমীলিত নয়ন যুগল ;
জিহ্বা টানি ছিঁড়িছে শৃগাল,
উদরের অন্ত্রচয় করিয়া বাহির
কুক্কুর করিছে তাহে
কি ক্রীড়া ভীষণ !
গৃধ্র তাহে ছিদ্র করে হরষে উল্লাসে।
হায় শব! এই কি মানব দেহ!
এই তার শেষ পরিণাম! (২য় দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)

শ্রীবৎস চিন্তা—কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব হইতে ইহার মূল কাহিনী আহৃত হইয়াছে। লক্ষ্মী ও শনির বিবাদের ফলে শনির চক্রান্তে সৌতিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় রাজা শ্রীবৎস সিংহাসনচ্যুত হইলেন। বহু দুঃখ কষ্ট ভোগের পরে চিন্তামণি-নারায়ণের কৃপায় পুনরায় শ্রীবৎসের রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী। ইহা বীর, ভক্তি ও করুণ রসাত্মক নাটক ; এই পৌরাণিক নাটকটি গদাধর ভট্টাচার্যের দলে অভিনীত হয়।

শৈশব সাধনা (১৯২৬)—বিষ্ণুপুরাণের প্রথম খণ্ডের ১১শ—১৩শ অধ্যায় হইতে মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা উত্তানপাদের প্রথম স্ত্রী সুনীতির প্রতি দ্বিতীয় পত্নী সুরুচীর সতীন-বিদ্বেষের ফলে মোহান্ধ উত্তানপাদের অসহায় অবস্থা, সুনীতি ও ধ্রুবের দুঃখ কষ্ট এবং ধ্রুবের কঠোর হরিভক্তি সাধনা লইয়া নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। আদি, ভক্তি ও করুণ রস প্রধান এই পৌরাণিক নাটকখানি সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়।

অজা দেবী (১৯২৬)—নবদ্বীপ বঙ্গ-নাট্যসমাজে অভিনীত এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। অযোধ্যার রাজপুত্র শুক্রাচার্য-শিষ্য 'দণ্ড' গুরুর অনুমতি না লইয়া আচার্য-কন্যা অজার সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইহাতে শুক্রাচার্যের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইহার ফলে দণ্ডকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। বীর দণ্ডের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা লইয়া মৃত স্বামীর শোকে অধীরা অজাও সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেন ; স্বর্গে দণ্ডের সঙ্গে সতী অজার মিলন ঘটে। ইহাই নাটকের মূল বিষয় বস্তু। নাট্য

ঘটনার প্রধান পরিচালক শুক্রাচার্য। সাধনা-লব্ধ শক্তিযুক্ত শুক্রাচার্যের চরিত্রে রৌদ্ররস ও পরে বাৎসল্য রস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। শিষ্য 'দণ্ডের' সঙ্গে কন্যা 'অজার' গোপন প্রেমে তপোবন অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শুক্রাচার্য অযোধ্যার মন্ত্রী আশাগুপ্তের পুত্র দণ্ডী দ্বারা রাজপুত্র দণ্ডের শিরচ্ছেদ করাইলেন। পরে ইহার জন্য মনে অনুশোচনা দেখা দিলে তাহার চরিত্রের রুদ্র ভাব প্রশমিত হয় এবং তিনি স্নেহাস্পদ মানবে রূপান্তরিত হইলেন। নাটকে উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত রহিয়াছে,—

শুক্রাচার্য—অজা আমার নিরপরাধিনী। আমি সময়ে বিবাহ দিই নাই, দীর্ঘ তপস্যায় আশ্রমের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। নিরুপায় হয়ে মা আমার যোগ্য পাত্র পতিত্বে বরণ করে আমার আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করেছে।

(১০ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)

নাটকে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও করুণ রস প্রাধান্য পাইয়াছে।

সপ্তমাবতার (১৯২৭)—হরধনু ভঙ্গ, রামের বনবাস, সীতা হরণ, বিভীষণের স্বজাতি ত্যাগ, তরণী বধ, মেঘনাদ বধ, প্রমীলার চিতারোহণ, রাবণবধ ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বনে ইহা ঘটনা বহুল পৌরাণিক নাটক। ইহাতে যাত্রাব্যালে, গণের গান, জেলে-জেলেনীর দ্বৈতগীতি প্রভৃতি সংযোজিত হইয়াছে। আদি, বীর, করুণ ও ভক্তিরস নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। রাবণ চরিত্রে শক্তি ও ভক্তি, মেঘনাদে বীরত্ব এবং লক্ষ্মণ চরিত্রে মাতৃভক্তি ও জিতেন্দ্রিয়তা প্রকাশিত। বিভীষণ চরিত্রটি নাটকে উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কর্তব্য বোধ ও ভক্তির সঙ্গে পুত্র স্নেহের দ্বন্দ্বে বিভীষণ দোলায়িত হইয়াছে। 'সৎসঙ্গ' ও 'অসৎসঙ্গ' দুইটি রূপক চরিত্ররূপে নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে। এই নাটকখানি সত্যম্বর অপেরা ও বিলগাঁ নটকোম্পানীতে অভিনীত হয়।

অন্নপূর্ণা (১৯৩৫) :—হরিবংশের অন্তর্গত হরিবংশ পর্বের ২৯ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী গৃহীত হইয়াছে। কাশীরাজ দিবোদাকে পরীক্ষা করিবার জন্য মহাদেব রাজ্যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেন। মা অন্নপূর্ণা ভক্ত দিবোদাসের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দুর্ভিক্ষ দূর করিতে কাশীধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই মহাদেবকে ভিক্ষা দান করেন। এই কাহিনী নাটকের প্রধান অবলম্বন। স্কন্দপুরাণেও এই কাহিনী রহিয়াছে। উমানাথ ঘোষালের দল ও বিভিন্ন লোকনাট্য সম্প্রদায়ে নাটকখানি অভিনীত হয়।

রাইচরণ সরকার কবিরঞ্জন

তিনি বরিশাল জিলার হয়বতপুর গ্রাম নিবাসী ছিলেন। রাইচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করিতেন। লোকনাট্য রচনা করিয়া রাইচরণ 'কবিরঞ্জন' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার নাটকগুলি ঘটনাপ্রধান; তিনি কয়েকখানি পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক রচনা করেন। তাহার নাটকে যাত্রাব্যালে, গণের গান, একানে বালকের গান, আদিরসাত্মক দ্বৈত ও সমবেত গীতিও সংযোজিত হইয়াছে। সমসাময়িক আন্দোলনাদি দ্বারা রাইচরণের নাটক কিছু কিছু প্রভাবিত হইয়াছে। সংলাপ রচনায় তিনি সংক্ষিপ্ততা, সারল্য এবং ভাব-ভাষার সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

রাইচরণের প্রথম নাটক 'যোগবল' (১৯১৫)। মেহের কালীবাড়ির সর্বানন্দ ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চাঙ্ক ভক্তিমূলক নাটকখানি রচিত হয়। মিত্র ইনষ্টিটিউশনের তৎকালীন শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ ইহা সংশোধন করিয়া দেন। রাইচরণের ছাত্রগণ এই নাটকের আংশিক মুদ্রণব্যয় বহন করে।

গন্ধেশ্বরী (১৯২৫)—ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। শশিভূষণ হাজরার দলে ইহা প্রথম অভিনীত হয়। মহানন্দীকেশ্বর পুরাণের গন্ধাসুর বধ-কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের আরাধ্যা গন্ধেশ্বরীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। দুর্গা গন্ধাসুরকে বধ করিয়া গন্ধেশ্বরী নাম ধারণ করেন এবং গন্ধবণিকরাজ সুবর্ণবট-এর নষ্ট ব্যবসায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করেন। দৈত্যরাজ গন্ধাসুর ও তাহার স্ত্রী কৃষ্ণভক্ত অর্চির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে অর্চিকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নাটকে কৃষ্ণভক্ত অর্চি চরিত্রের জন্য সংস্কৃত স্তব সংযোজিত হইয়াছে (৪র্থ দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)। এই নাটকে কয়েকটি যাত্রা-ব্যালে আছে; ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য—মদ্র দেশ, রাজার নৃত্য-শালা, রাজগুরু কাশ্যপ আসীন।

নর্তকীগণ— নৃত্য-গীত

এস হে প্রাণেশ! আমোদ কাননে।
এসেছে ওই নিশি উজলিয়া দিশি
হাসিমাখা আননে॥

সেথা শ্যামল লতাকুঞ্জে বসিবে হাসিয়া
সেথা বিমল চাঁদ দিবে চাঁদিমা মাখাইয়া,
মন্দমলয় দিবে গন্ধ
ফুল দিবে মকরন্দ,
পাখী দিবে আনন্দ স্বছন্দে গাহিয়া,
মোরা হাসি রূপ গানে, প্রেম-সুধা-দানে,
তুষিব যতনে ॥

(গানের পরে দ্রুতপদে জয়ার প্রবেশ)

জয়া—রক্ষা কর—রক্ষা কর। (ভূতলে পতন)

কাশ্যপ—এ কি হল! (নর্তকীদের প্রতি) চলে যাও তোমরা, ঘরে বায়ু খেলতে দাও। (নর্তকীদের প্রস্থান)।

রাজগুরু কাশ্যপকে নৃত্যগীতে আপ্যায়ন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে লোকরঞ্জনের জন্যই এই ব্যালে নাটকে উপস্থাপিত হইয়াছে। যাত্রার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই পালায় কৃষকগণ ও কৃষক-পত্নীগণের আদি রসাত্মক সমবেত গীতি সংযোজিত হইয়াছে (৩য় দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)। নাটকখানি ঘটনাবহুল ও অত্যন্ত দীর্ঘ।

সতীত্ব ও পুত্র স্নেহ লইয়া কাশ্যপ-পত্নী অনিমা চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অর্চির চরিত্রে সতীত্ব ও কৃষ্ণভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। কাশ্যপ পুত্রের মৃতদেহের উপর বসিয়া শবসাধনা করিয়া কালীর বর লাভ করেন। কাশ্যপ চরিত্রে একনিষ্ঠ সাধন-শক্তি ও দেব-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যাচারী দৈত্যরাজ গন্ধাসুরকে হত্যা করিবার জন্য বরলাভের সঙ্গে তিনি মৃত পুত্রকেও কালীর প্রসাদে ফিরিয়া পাইলেন। অত্যাচারী গন্ধাসুর চরিত্রে রুদ্র ও বীর-ভাবের পরিচয় রহিয়াছে। নাটকে ভক্তি, বীর, শৃঙ্গার, করুণ ও বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে।

পাষণ্ড-দলন (১৯২৬)—ইহা পঞ্চাঙ্ক ভক্তিমূলক নাটক। শশিভূষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপেরা পার্টি কর্তৃক নাটকটি অভিনীত হয়। ইহার গীতিসংখ্যা পঁয়তাল্লিশের অধিক। ইহা ছাড়াও পরিশিষ্টে বালকদের জন্য আরো সাতখানি অতিরিক্ত গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইপালায়ও একাধিক যাত্রা-ব্যালে এবং ঘেঁষেড়া-ঘেঁষেড়ানীর আদি রসাত্মক দ্বৈত-সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; গানগুলিতে কীর্তনাঙ্গ সুর ও রাগরাগিনী ব্যবহারের

নির্দেশ রহিয়াছে। ইহাতে তাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাসের শিষ্য ভজন দাস গানে বিবেকের বাণী শুনাইয়াছে। তাহার গানের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

নাগকেশর—হুঁ হুঁ, শোন অরি সিংহ, সেই কাশ্মীরী মেওয়াটাকে—এঃ এঃ! কৃষ্ণহে! আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ? এঃ—একেবারে পাগল করে তুললে যে!

(গীতকণ্ঠে ভজনদাসের প্রবেশ)

ভজন – (গান)—ভৈরবী—একতালা

ভবের হাটে পাগলজুটে, মজালুটে করছে খেলা।
ভবের পাগল মনের পাগল, সব দেখি পাগলের মেলা॥

নাগকেশর—ঐ যা নরোত্তম দাসের শিষ্য ভজা পাগলা—এসে পড়েছে।

ভজন—(পূর্বগীতাংশ)

আমি পাগল তুমি পাগল, ভবের মেলায় সবাই পাগল।
কেউতো নয় ভাই কাজের পাগল, জাতের পাগল পাগলা ভোলা॥

অরিসিংহ—যেন একটা সঙ।

ভজন—(পূর্বগীতাংশ)

আমিও সঙ্, তুমিও সঙ্, এ সংসারে সকলি সং
সঙে সঙে কতই যে ঢং ভবরঙ্গে ঢংয়ের মেলা॥

নাগকেশর—সোজা পথ দেখ বলছি।

ভজন—(পূর্বগীতাংশ)

চল না যাই ভাই সোজা পথে, কি কাজ বাঁকা-চোরা পথে
কাঁদতে হবে পথে পথে, পেতে হবে বিষম জ্বালা॥

অরিসিংহ—পাগল! যাবি কিনা বল।

ভজন—(পূর্বগীতাবশেষ)

আমি যাব তুমি যাবে এ সংসারে কেউ না রবে,
কেউ মরিবে কেউ তরিবে ধরি হরিপদ-ভেলা॥ (৩য় দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

নাগকেশর ও অরিসিংহের চক্রান্তের ফলের চাঁদরায় কাশ্মীরী মেওয়া 'শোভনা' বেশ্যার কবলে পড়িয়া ক্রমে পাষণ্ড হইয়া উঠেন। চাঁদরায় চরিত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া নাট্যকার ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ধর্মের জয় ও অন্যায়কারীর শাস্তিবিধান বা পরিবর্তন লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য। কাজেই নরোত্তম

দাসের প্রভাবে চাঁদরায়েরও পরিবর্তন আসে এবং তিনি শেষ পর্যন্ত হরিভক্ত হইয়া উঠেন। অরি সিংহ, বেশ্যা শোভনা প্রভৃতিরও শাস্তির ব্যবস্থা হয়। স্বার্থপর কামান্ধ বকধার্মিক নাগকেশর মাঝে মাঝে হাস্য রসের যোগান দিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক চাঁদরায়কে নরকের চিত্র দেখাইবার মধ্যে বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে। আদি, করুণ ও ভক্তিরসকে নাটকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভক্তির প্রভাবেই মানুষ স্বাভাবিক সৎ জীবন যাপন করিয়া অন্তে সুখলাভ করিতে পারে ইহাই নাটকের মূল বক্তব্য।

শ্বেতার্জুন (১৯২৭)—কাশীরাম দাসের মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব হইতে এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। নাটকখানি শশিভূষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপেরা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হয়। ত্রিনেত্র নগরের রাজা শ্বেতবাহুর সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ নাটকের প্রধান বিষয়। রাজশ্যালক দধিমুখের চরিত্রে হাস্যরস এবং সেনাপতি দুর্জয় সিংহের চরিত্রে রাজভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিহিংসা ও কুটিলতায় বড়রানী 'কমলার' কদর্যময়তার পাশে রাজমাতা 'সিংহবাহু'র সতী স্ত্রী 'সুশীলা'র স্নেহপরায়ণতা লক্ষ্য করিবার মত। নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। ইহা বীর ও ভক্তিরস প্রধান নাটক।

বেদ-উদ্ধার (১৯২৭)—মৎস্য পুরাণ হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। বেদ-পুরাণ ধ্বংসে উদ্যত দৈত্যরাজ হয়গ্রীব-এর নারায়ণ হস্তে মৃত্যু ও বেদের মুক্তিলাভ নাটকের মূল ঘটনা। এই নাটকে অবন্তী-সেনাপতি আজবের সতী স্ত্রী 'লহনার' প্রতি অত্যাচারী দৈত্য সেনাপতি 'শঙ্খগ্রীবের' কামান্ধতার কাহিনী বড় হইয়া উঠিয়াছে। মাতার সম্মুখে পুত্রহত্যা ও নির্মম অত্যাচারের ফলেও লহনা তাহার সতীধর্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। কিন্তু "শঙ্খ গ্রীবকে দিয়ে কৌশলে তার স্ত্রী-পুত্র হত্যা করিয়ে তাদের রক্তে পুত্র বিরাব-এর প্রেতাত্মার তর্পণ" (২য় দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক) করিয়া লহনা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। লহনা চরিত্রে সতীত্ব এবং বাৎসল্যের সঙ্গে বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে। হয়গ্রীবের ছোট রানী রেণুকা চরিত্র সতীত্ব, বাৎসল্য ও প্রতিহিংসার ভাব লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। নারী চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার বিশেষ বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। হয়গ্রীব-পুত্র সুষীম নাটকের একমাত্র বালক চরিত্র। এই চরিত্রে মাতৃভক্তি ও হরিভক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। দৈত্যরাজ হয়গ্রীব বেদ-পুরাণ বিদ্বেষী। কারণ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগণ

ইহাদের সাহায্যে সামাজিক ব্যাপারে বহু বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল মানুষই ঈশ্বর সৃষ্ট, সকলের ধমনীতেই উষ্ণ রক্তধারা বহমান। সুতরাং ইহাদের লইয়া গঠিত সমাজে স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বৈষম্য থাকা অনুচিত। ব্রাহ্মণরা বেদ-পুরাণের সাহায্যে নানা সংস্কার প্রবর্তিত করিয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। সেই জন্যই দৈত্যরাজ বেদপুরাণ ধ্বংসে উদ্যোগী হইয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতে যুগবিরোধী সংস্কার ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের প্রবর্তন করিতেছিলেন। এই আন্দোলনদ্বারা নাটকখানি কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অবন্তীর মন্ত্রী গায়বের একটি সংলাপ উদ্ধারযোগ্য। সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি গায়ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতনকে বিসর্জন দিয়া নূতন সাম্যবোধ লইয়া সমাজকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী এই অবন্তীমন্ত্রী গায়ব,—

গায়ব—পুরাতন চুরমার করে ফেল—নূতনকে নূতন ছাঁদে গড়ে তোল। দামপূর্ণ বদ্ধ জলার মত এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন একঘেয়ে সমাজে নূতন স্রোত প্রবাহিত কর—সঞ্জীবন মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। পতিতকে টেনে তোল। বৈষম্য দূর করে সাম্যের স্থাপনা কর। ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে তোমরা যদি চেষ্টা কর এ সমাজ আবার উচ্চতম হতে পারে।

১ম পুরোহিত—আমরা কি করব (গীতকণ্ঠে কর্মানন্দের প্রবেশ)

কর্মানন্দ—অযুতকণ্ঠে জলদমন্দ্রে বল তারা তারা।

ব্যাঘ্রবিক্রমে যাও রণাঙ্গনে পদভরে কাঁপুক ধরা ॥
ওঠ ব্রাহ্মণ ছাড়ি হুহুঙ্কার, ঝঙ্কার সামের প্রণব ওঙ্কার
সদর্পে দাওহে ধনুকে টঙ্কার, টুট অহঙ্কার বধ অবাধে শত্রুযারা ॥
ভাই তুমি বিপ্র, শূদ্র তুচ্ছক্ষুদ্র বলে তবু তারা রুদ্রসম রুদ্র
সঙ্গে লয়ে চল ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র, অভেদমিলনে দাও সমবেত সাড়া ॥

(১ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

এই নাটকে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবও পড়িয়াছে। অবন্তীর সেনাপতি আজব ও মন্ত্রী গায়ব চরিত্রে এবং তারা-মন্দিরের ভক্তগণের গানে (১ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক) ইহার পরিচয় রহিয়াছে। জন্মভূমির উদ্ধার কল্পে যুদ্ধে পরাস্ত আজব দৈত্যের হাতে বন্দী হইয়া ভূগর্ভস্থ গুপ্ত গৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এইরূপে বন্দী আজবের আক্ষেপ উক্তির মধ্যে দেশপ্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

আজব—ওমা জন্মভূমি! আজ তুমিইবা কোথায় আর আমিই বা কোথায়

যে সুখে যে শান্তিতে—যে আনন্দে তোমার কোলে থাকতাম, স্বর্গেও বুঝি তেমন সুখ—তেমন শান্তি, তেমন অনন্দ পেতাম না। প্রভাতে দেখতাম বসন্ত-সূর্যের রক্তিমায় রঞ্জিতা প্রকৃতির অপূর্ব সুষমা। মধ্যাহ্নে দেখতাম ভাস্কর-কিরণ-প্রখরতায় সুন্দরী প্রকৃতির ম্রিয়মাণতা। সায়াহ্নে দেখতাম কনকরশ্মি রঞ্জিতা প্রকৃতির নবীন গরিমা। সে মাধুর্যময়ী হাসি আর দেখতে পাব না। এই নরকেই পচে মরব। গরীয়সী জননীর প্রাণমাতানো হাসি দেখতে পাব না—এই নরকেই পচে মরব। হায় মা জন্মভূমি! আমি মরব দুঃখ নাই। মৃত্যুকালে একবার দেখা দাও—একবার এস। (৫ম দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)।

এই সংলাপের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাট্যকার ভূগর্ভস্থ গুপ্ত গৃহে এক নূতন সংগীতময় পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। জন্মভূমি গীতকণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া আজবের কাতর প্রার্থনা পূরণ করেন এবং দেশ-জননীর এই সুসন্তানের মনে আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। রূপক চরিত্র অবলম্বনে এই জাতীয় সঙ্গীতময় পরিবেশ রচনা করা যাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য। নাটক হইতে অংশটি উদ্ধার করা যাইতেছে,—

আজব—একবার দেখা দাও—একবার এস।

[গীত কণ্ঠে জন্মভূমিরূপিণী দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা— গীত

এসেছি বাপ, এসেছিরে চেয়ে দেখ, তব জননীরে।
কেঁদোনা কেঁদোনা বাছা, ভেসোনা আর আঁখিনীরে॥

অজব—কে মা তুমি?

(গীতাংশ)

দুর্গা—চিনিতেকি নারিলে তুমি আমি তোমার জন্মভূমি।
ছিলাম চির গৌরবিনী, আজ আমি কাঙ্গালিনীরে॥
(ফিরি আমি বনে বনে)

আজব—রাজরাজেশ্বরী মা আমার! আমি বেঁচে থাকতে তোমার এই দশা! হায় মাগো, তোমার এ দশা দেখবার আগে আমার মৃত্যু হলনা কেন?

(গীতাবশেষ)

দুর্গা—কেঁদে বল কিহবে ফল, ফেলনা আর নয়নজল।
বুকে আনো সাহস বল, মুক্ত কর বন্দিনীরে॥
(মারি অরি মহারণে) [প্রস্থান]

আজব—মা, মা, আমিতো বন্দী। আমি আর কি করব, যদি পারতাম—যদি শক্তি থাকত, ভীমপদাঘাতে লৌহদ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চলে যেতাম। (৫ম দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

নাট্যকার পূর্ব প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দীর্ঘ সংলাপ রচনা পদ্ধতি পরিহার করিয়া এই নাটকে অনেক স্থলেই সংক্ষিপ্ত সংলাপ সংযোজিত করিয়াছেন।

[১] প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদম্।

কেশবধৃতমীন শরীর জয় জগদীশ হরে॥ গীতগোবিন্দের এই গীতিটি অবলম্বনে নাট্যারম্ভের পূর্বে এই পালায় নান্দী গানের অবতারণা করা হইয়াছে। নাটকে গানের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। ইহাতে যাত্রাব্যালেও সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিষ্য, স্তাবক, বালক ও ভক্তদের জন্য গণের গান, বিরাবের করুণ একানে বালকের গান, মালিনী ও বটুর আদিরসাত্মক যাত্রা ডুয়েট প্রভৃতিও নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। এই নাটকখানি রাইচরণ গিরিশচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছেন। নাটকটি শশিভূষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপেরা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হয়।

নাট্যকার 'কর্মফল' (১৯২৫) নামে আর একখানি নাটক রচনা করেন; ইহা ষষ্ঠী অপেরায় অভিনীত হয়।

ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী (১২৯৭—১৩৩৯)

তিনি বর্ধমান জিলার রায়ান গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইবার পরে তিনি পল্লীসেবায় মনোনিবেশ করেন। ইহার কিছুকাল পরে ভোলানাথ যাত্রানাট্য রচনায় ব্রতী হইলেন। তাহার প্রথম নাটক 'কুবলাশ্ব' (১৯১৬)। নাট্যরচনা নৈপুণ্যের জন্য ভোলানাথ নবদ্বীপ হইতে ১৩২৫ সালের ১লা বৈশাখ অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বিদ্বজ্জন-স্বাক্ষরিত উপাধিপত্র লাভ করেন। এই উপাধিপত্র দ্বারা তাঁহাকে 'কাব্যশাস্ত্রী' ও 'ভারতী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যাত্রানাট্যের গঠন-রীতিতে ভোলানাথ কিছু পরিবর্তন আনেন। পূর্বে যাত্রার আদি রসাত্মক দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য মেথর-মেথরাণী, ঘেষড়া-ঘেষড়ানী, মালি-মালিনী প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করা হইত। তিনি এই জাতীয়চরিত্রকে নাটক হইতে বিদায় দিবার

১। শ্রী গীতগোবিন্দ—১ম সর্গ, গীত ১, শ্লোক ৫—জয়দেব

চেষ্টা করেন। হাস্যরস পরিবেশনের জন্য যাত্রানাট্যে যে চরিত্র সংযোজিত হইত অধিকাংশ স্থলেই তাহার সঙ্গে মূল নাট্য ঘটনার অবশ্য সংযোগ থাকিত না। কেবল লোকরঞ্জনের জন্যই চরিত্রটি নাটকে আনা হইত। ভোলানাথবাবু এই শ্রেণীর চরিত্রকে অনেক সময় নাটকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতেন। তাহার নাটকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজচেতনার পরিচয় রহিয়াছে; এই প্রসঙ্গে 'পৃথিবী' ও 'পঞ্চনদ' নাটক দুইটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাটকে কোন সমস্যা উত্থাপন করিলে তিনি তাহার সমাধানও করিয়া দিতেন। এইখানে অঘোরচন্দ্রের সহিত তাহার পার্থক্য রহিয়াছে। অঘোরচন্দ্র সমস্যা তুলিয়া ধরিতেন, কিন্তু সমাধান করিতেন না। ভোলানাথ রায় নাটকে ঘটনা সন্নিবেশে মাঝে মাঝে আকস্মিকতার পরিচয় দিয়াছেন। নাট্যঘটনাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার প্রতি ও চরিত্র সৃষ্টির প্রতি তাহার দৃষ্টি ছিল। সংলাপ সংযোজনার স্বচ্ছন্দগতি, ওজস্বিতা এবং ভাব ও ভাষার মিলনের দিকে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখায় তাহার রচনায় নাট্যোৎকর্ষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার নাটকের অধিকাংশ স্থলেই খুব দীর্ঘ সংলাপ সন্নিবেশের রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনি নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার সংলাপ সংযোজনা করিয়াছেন। সংলাপের ভাষায় অনেক সময় উপমা প্রয়োগের বাহুল্য দেখা দিয়াছে। নাট্য রচনায় ভোলানাথ কবি-সবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। ভোলানাথ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে ঘটনা সন্নিবেশ, চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ সংযোজন ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে লোকনাট্য রচয়িতাদের মধ্যে তাহার স্থান খুব উচ্চে। তাহার নাটকে বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে।

ভোলানাথের নাট্য সঙ্গীতে কখনো কখনো স্বদেশীভাব প্রকাশ পাইত। ১৩৩৭ সালে রচিত 'জরাসন্ধপালায়' সঙ্গীত ও সংলাপে স্বদেশীভাব প্রকাশিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক ইহা বাজেয়াপ্ত হয়। পরে সংশোধনের নির্দেশ সহ পালাটি অভিনয়ের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই জরাসন্ধ পালার 'দেবানিক'-এর 'ওমা দিগম্বরী নাচগো শ্যামা রণমাঝে' গানখানি খুব উত্তেজনা পূর্ণ ছিল। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী পরবর্তী কালে যাত্রার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া থিয়েটারী নাটক রচনায় মনোযোগ দেন। তাহার প্রথম থিয়েটারী নাটক 'বিদ্ধ্যাবলির' সংস্কৃত রূপ 'বামনাবতার'। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটকটি অভিনীত হয়। 'জাহ্নবী', 'ধর্মদ্বন্দ্ব', 'বৃত্রসংহার' ও

'গঙ্গাবতরণ' মঞ্চাভিনীত নাটক কয়টি ভোলানাথ রচনা করেন। লোকনাট্য রচনা ছাড়া ভোলানাথ লোকসেবায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৩৩৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

কুবলাশ্ব (১৯১৬)—বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী লওয়া হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের নিবেদন অংশে নাট্যকার বলিয়াছেন যে "বঙ্গের খ্যাতনামা সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ, বেহালাবাদ্য-নিপুণ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ অধিকারী মহাশয় স্বীয় সঙ্গীত সম্প্রদায়ে অতীব দক্ষতার সহিত ইহার অভিনয়" করেন। কুবলাশ্ব যে তাহার প্রথম নাট্য রচনা তাহাও নিবেদন-অংশে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—"সহৃদয় সুধীগণ এই আমার প্রথম উদ্যম"। নাটকে পঁয়ত্রিশখানার অধিক গান রহিয়াছে। এই গীতিগুলি ছাড়াও নাটকের শেষে জুড়ি ও বালকদের জন্য অতিরিক্ত চৌদ্দখানি গান যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে এই গানগুলিও নাটকের বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যালে গীতি, গণের গান দ্বৈত সঙ্গীত প্রভৃতি নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। তৎকালে যাত্রায় আদি রসাত্মক দ্বৈত সঙ্গীত ও নৃত্য উপস্থাপিত হইবার রীতি প্রচলিত ছিল। ভোলানাথ ইহার প্রভাব প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নাটকে বেদে-বেদেনীর দ্বৈতগান রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে আদিরসের প্রাধান্য নাই। তাহা ছাড়া এই চরিত্রদ্বয় নাটকের কিছু প্রয়োজনও মিটাইয়াছে। কেবল সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যই ইহাদের নাটকে স্থান দেওয়া হয় নাই। আদিরসাত্মক দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশক চরিত্রের সঙ্গে সাধারণত লোকনাট্যের ঘটনার কোন যোগ থাকে না। এই নাটকে ইহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে। নাটকের প্রথমে শ্বেতশতদল বাসিনী সরস্বতীর বন্দনা গানে প্রস্তাবনা করা হইয়াছে—

দেববালাগণ—(গান)

সমল মানসে বিমল আলো, দেওমা নিখিল-বন্দিনী।
শীতল করিতে ভূতলে এস মা, শ্বেতশতদল বাসিনী॥

'শক্তি চাঁদ পাগল' (ছদ্মবেশী জ্ঞান) নাটকে গানে গানে বিবেক, ধর্ম ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছে। তাহার একটি গান প্রসঙ্গত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

মন্ত্রী—ঐ যে, ও আবার কে হাতমুখ নাড়তে নাড়তে এদিকে আসছে, কোথা যাই, আর রক্ষা নাই। (শক্তি চাঁদের প্রবেশ)

শক্তি চাঁদ—(গান) কে নেবে তোর রক্ষের ভার।

ওরে বক্ষে বসে দুঃখ দিলি চক্ষে কত দেখব আর ॥

মন্ত্রী—কে ও, শক্তি চাঁদ যে, অনেকদিন পরে দেখা, যা হোক বেশ ভালতো।

শক্তিচাঁদ—(পূর্ব গীতাংশ)—ভালর কি কাল আছেরে ভবে

কিসে ভাল থাকি তবে,

শোধ নিতে কে ছাড়ে কবে—

ভালয় ভালয় আয়রে এবে নইলে যাবি যমের দ্বারে।

মন্ত্রী—(স্বগত) ও বাবা, এ ও দেখছি সেই মতলবেই! (প্রকাশ্যে) আহা মরে যাই আর কি, শক্তিচাঁদ তোমার কি সুমধুর কণ্ঠস্বর, যেন আমার যুগল কর্ণে সুধা বর্ষণ করছে। শক্তি চাঁদকে আমাদের পাগল বলে কে। সাধু সাধু শক্তি চাঁদ। তোমার মত লোকের কি এত বিচলিত হওয়া উচিত। সে সব কথা একেবারে ভুলে যাও।

শক্তিচাঁদ—(পূর্বগীতাংশ) ভোলা কিরে কথার কথা

দিলি যত প্রাণে ব্যথা,

সব আছে এই মর্মে গাঁথা

পালালে আর বাঁচন কোথা ধর্মের কাছে সুবিচার ॥

(কেশাকর্ষণ)

মন্ত্রী—শক্তি চাঁদ বাবা, উহু বাবা! গেলাম বাবা! ও বাবা—শক্তিচাঁদ বাবা, ক্ষেপা বাবা, ছেড়ে দাও বাবা! লোকে দেখলে বলবে কি, ছেড়ে দাও, বাপ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

শক্তিচাঁদ—(পূর্বগীতাবশেষ) ছাড়ব যদি বুড়ো তোরে,

কে শিখাবে ভ্রান্ত নরে পাপীর বিচার হয় কেমন করে,

স্বয়ং রক্ষাকর্তা এলে পরে রাখতে নারে দুরাচার ॥

[মন্ত্রীকে ধরিয়া শক্তিচাঁদের প্রস্থান, ২য় গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক]

নাটকে গদ্য ও পদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সংলাপে ভারী চালের সংস্কৃত গদ্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে সংলাপে গতিশক্তির অভাব দেখা দিয়াছে, অবশ্য পরবর্তী কালে নাট্যকারের সংলাপ রচনায় এই ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। এই নাটকের গদ্য সংলাপের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

উজ্জানক—না সেনাপতি। একদিন-না-একদিন সমযোদ্ধার দর্শন পাবই পাব। চিরদিন সমভাবে অতিবাহিত হয় না। সুখদুঃখ নিয়ত চক্রবৎ ঘূর্ণিত

হচ্ছে। স্থির জেনো, সেনাপতি, যেদিন আমার আয়ুসূর্য পূর্বাচল পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে প্রতীচি-পুলিনে অগ্রসর হবে, সেইদিন—সেই ভীষণ সমস্যার দিনে সমযোদ্ধারা আবির্ভূত হয়ে, তোমাদের এই প্রবল প্রতাপাদিত্য দৈত্য কুলতিলককে ইহধাম হতে চিরদিনের তরে অবসর দেবে। (৩য় গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক)
পদ্য সংলাপে গৈরিশ ছন্দ এবং মিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; এখানে মিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দের সংলাপের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে.—

নারায়ণ—কে তব সম্মুখে দেখ, ভক্তপ্রাণধন ;
দাঁড়ায়ে মোহন রূপে ভুবন-মোহন।
কুবলাশ্ব—কে তুমি মধুর ভাষী অসিতবরণ ?
হৃদে যেবা করে খেলা; তুমি কি সে ধন ?
নারায়ণ—হের হের ভক্তবর, মেলিয়া নয়ন
আমি সেই ভয়হারী হরিনারায়ণ।
কুবলাশ্ব—মুখে হরি, হৃদে হরি, সম্মুখেতে হরি,
কত ছলা জান কালা বিনোদ-বিহারী। (৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)

অযোধ্যার রাজা 'বৃহদশ্ব' পুত্র 'কুবলাশ্ব'কে সিংহাসন দান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। উতঙ্ক মুনি দৈত্য অত্যাচার দূর করিবার জন্য রাজা কুবলাশ্বকে আহ্বান করেন; কিন্তু চক্রীরা বাধা দান করায় ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারায় অযোধ্যাপতি ক্রুদ্ধ মুনির অভিশাপে উন্মাদ হইয়া বনে গমন করেন। এই বার রঞ্জিতাশ্ব সিংহাসন পাইয়া রাজপুত্রদের হত্যা করিবার চেষ্টা করেন এবং সুন্দরী ভ্রাতৃজায়া 'প্রতিভাকে' স্ত্রীত্বে বরণ করিতে মনস্থ করেন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া রঞ্জিতাশ্বের স্ত্রী স্বামী-হস্তে নিহত হইলেন। উতঙ্ক মুনির আশ্রমে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় আশ্রম অপবিত্র হয়; ফলে রঞ্জিতাশ্ব মুনির শাপে যৌবনেই জরাগ্রস্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেন। অন্যদিকে মধুদৈত্যপুত্র ও 'উজ্জানক' নামে খ্যাত পরাক্রমশালী 'ধুন্ধু' নারদের পরামর্শে পিতৃহন্তা বিষ্ণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য স্বর্গ অবরোধ করেন। দৈত্যরাজ ধুন্ধু শিবপ্রদত্ত শূলের সাহায্যে স্বর্গ অধিকার করিয়াও বিষ্ণুর সন্ধান পাইলেন না। হঠাৎ তাহার দৈত্য-সিংহাসন কাঁপিয়া উঠায় নারদের পরামর্শে ক্ষত্রিয়-রক্ত দিয়া শক্তি পূজা করিয়া এই অশুভ দূর করিবার ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে কুবলাশ্ব কৃষ্ণসাধনায় মনোনিবেশ করেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করায় তিনি ব্রহ্মশাপ মুক্ত হইলেন এবং বিষ্ণুপ্রদত্ত শব্দভেদী বাণ লাভ করিলেন।

ইহাদ্বারা ধুন্ধু দৈত্যকে নিহত করিয়া 'ধুন্ধুমার' নাম গ্রহণ পূর্বক তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। হাস্যরস পরিবেশনের জন্য নাট্যকার একাধিক চরিত্রের আমদানি করিয়াছেন। ধুন্ধু-বয়স্য ও বয়স্য-স্ত্রী রঙ্গিলা হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছে, আবার শনি চরিত্রেও হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে। এই নাটক বহু ঘটনায় ভারাক্রান্ত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নাটকের মূল কথা। কুবলাশ্ব শাস্ত্র-শস্ত্র পারদর্শী রাজা। তাহার ভ্রাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি ও কর্তব্য বোধের অভাব ছিল না। ধুন্ধু মহাশক্তিশালী। ষোড়শ যোজন ব্যাপি তাহাব দেহ, তাহার নয়নে অনল উদ্গীরিত হয়। পরম শিবভক্ত দৈত্যরাজ কামাশক্ত হওয়ায় শিবপ্রদত্ত শূল হারাইয়া যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। অযোধ্যার কনিষ্ঠ রাজপুত্র সিংহাসনলোভী ও নারী লোলুপ। তাহাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়া। রঞ্জিতাশ্বের স্ত্রী বাসন্তী চরিত্র সরলতা, পতিপ্রেম, স্নেহ পরায়ণতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা অবলম্বনে রূপায়িত হইয়াছে। রক্তিমা পতিভক্তি পরায়ণা। কৃষ্ণ হইতেও পতি তাহার নিকট বড়। সেই পতির মৃত্যুতে পতিহন্তা কুবলাশ্বকে যোদ্ধাবেশে আক্রমণ করিয়া বীর দৈত্যের বীর জায়ার পরিচয় দান করিয়াছেন। এই চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার মধুসূদনের বীর জায়া প্রমীলা চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রমীলার মত পতিপ্রেম, কোমলতা, কঠোরতা ও বীরভাব লইয়া রক্তিমা চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। রক্তিমা সমররঙ্গিনী নারীবাহিনী লইয়া যুদ্ধে গমন করেন,—

রক্তিমা—সমররঙ্গিনী সঙ্গিনী সকলে,
ধর অসি খরসান ক্ষত্রির নিধনে।
প্রমোদ উদ্যানে পশি যেমন তোমরা
নখে ছিঁড়ে বৃন্তচ্যুত করিতে কুসুম,
তেমনি আজিকে সবে অসির আঘাতে
ফুলবনে দেহচ্যুত কর ক্ষত্র শির।

(অসি উদ্যত—৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক)

প্রমীলাও বামাবাহিনী লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন,

রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,

উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্মুকে টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! (৩য় সর্গ, মেঘনাদবধ)

এই নাটক রচনায় আদি, হাস্য, রৌদ্র, বীর, করুণ ও ভক্তিরস প্রাধান্য পাইয়াছে।

পৃথিবী (১৯১৭)—হরিবংশের হরিবংশপর্বমধ্যস্থ দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি গণেশ অপেরা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হয়। নাটকের পঞ্চাঙ্কের শেষে নাট্যকার একটি ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত করিয়াছেন। ব্যালে ও গণের গান সহ নাটকের গীতি সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। প্রথমে 'কবিতা' ও 'কল্পনার' গানে প্রাস্তাবনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনা গীতির মাতৃবন্দনায় পৃথিবীর দুঃখের অন্ধকার দূর করিয়া আনন্দের আলো ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছে,—

আঁধারে ভরিয়া যায় মা।
উজ্জ্বল করা, উৎসব ময়ী
মলিনমানসে আয় মা।

নাটকের মূল ভাবের সঙ্গেও ইহার মিল রহিয়াছে। নাটকে বলা হইয়াছে যে পাপ উদ্যত ফণার সাহায্যে দুঃখ বিস্তার করিয়া ক্ষণিক জয়লাভ করিলেও পরিণামে ইহার পরাজয়ে দুঃখের অবসান হয়। চন্দ্রবংশের রাজা প্রতিষ্ঠান-পতি অঙ্গ মদ্য-বেশ্যাসক্ত পুত্র 'বেন'কে সিংহাসন দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় 'মৃত্যু' অঙ্গ-মহিষী সুনীথাকে অঙ্গের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। সুনীথা মৃত্যুর কন্যা। মৃত্যু চাহেন যে অঙ্গ নামে মাত্র রাজা থাকিবেন এবং সুনীথা প্রকৃত রাজকার্য পরিচালনা করিবেন। মৃত্যুর বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় তাহার চক্রান্তে অঙ্গ রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন এবং অঙ্গপুত্র বেন রাজসিংহাসনে বসিলেন। জ্ঞানবাদী বেন কর্মাত্মক বৈদিক ধর্মে অবিশ্বাসী হইয়া যাগযজ্ঞ ও হরিভজনা বন্ধের আদেশ প্রচার করেন এবং এই সঙ্গে আরো ঘোষণা করেন যে পৃথিবীতে রাজাই একমাত্র পূজ্য। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যভ্রষ্ট অঙ্গ কাঞ্চিপুর রাজের সহায়তায় বেনের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বন্দী হইলেন। কিন্তু রণক্ষেত্রে বেনের সহচর মাতুল 'অহিতকুমার' ঈর্ষান্বিত হইয়া বেনকে গুপ্তাঘাত করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রণক্ষতদের শুশ্রূষার জন্য আগতা কাঞ্চিপুররাজ অচলেন্দ্রের স্ত্রী 'অলকা'র জলদানে মরণোন্মুখ বেনের জীবন ফিরিয়া আসায় কৃতজ্ঞ বেন বন্দী

অচলেন্দ্রকে মুক্তি দেন এবং পিতাকে সিংহাসন ফিরাইয়া দেন। ইহাতে স্বেচ্ছাচারিনী সুনীথা ক্ষিপ্ত হইয়া পিতৃপরামর্শে অঙ্গকে হত্যা করিতে গিয়া ভ্রাতা অহিতকুমারকে নিহত করেন। এই অবাঞ্ছিত হত্যায় বেনের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবী ও বেনের পুত্র পৃথুকে রাজ্যভার দিবার পরে নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানবাদের সমন্বয় প্রচার করিয়া বেন যোগবলে দেহত্যাগ করেন। এই নাট্যকাহিনীতে কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদের তত্ত্ব স্থান লাভ করিয়াছে। যাগযজ্ঞপূর্ণ কর্মাত্মক ধর্মের দৌরাত্ম্যে একসময় ধর্মের প্রকৃতমর্ম বুঝা দুষ্কর হইয়া উঠে। মনীষীরাও তখন তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন—চার্বাক, অষ্টাঙ্গযোগী ও দার্শনিক। দার্শনিকরা বলেন যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই ধর্ম। সুতরাং দর্শন-জ্ঞানবাদীদের মতে জ্ঞানই ধর্ম। এই জ্ঞানবাদীদের লক্ষণ আত্মদর্শন। বেন এই মতাবলম্বী বলিয়া কর্মাত্মক ধর্মকে অস্বীকার করেন,—

বেন—কাম্য কর্মে ধর্মের প্রকৃত মর্ম লুপ্ত হচ্ছে। তোমাদের যজ্ঞ ধূমে ব্রহ্মের বিরাট জ্যোতি ঢাকা পড়ছে। কর্মত্যাগকর—তোমার বেদের সারাংশ ধর—জ্ঞানের পথে চলে যাও। (ক্রোড় অঙ্ক)

বেন শেষ পর্যন্ত নিষ্কাম কর্মকে স্বীকার করায় জ্ঞান-কর্মের মধ্যে একপ্রকার সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

নাটকের ঘটনা সন্নিবেশে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রঙ্গশালায় মদ, সিদ্ধি, চরস, আফিং ও গুলির অংশ নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন; ইহা কেবল হাস্যরস পরিবেশনের জন্য সংযোজিত হইয়াছে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বেনের রাজসভায় কাঞ্চিপুরের রানী অলকার প্রবেশ আকস্মিক ও অস্বাভাবিক। চতুর্থ অঙ্কের নবম গর্ভাঙ্কে প্রাণময়ী ও চিন্তারামের অংশ নাটকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। এই চরিত্র দুইটির সঙ্গে নাট্য কাহিনীর সংযোগ নাই। চিন্তারাম পত্নী-প্রেমিক, বীর, কর্তব্যপরায়ণ ও ধর্মাচারী রাজা অচলেন্দ্রের (কাঞ্চিপুররাজ) বয়স্য। এই চরিত্রটি মূল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া রচিত হয় নাই। হাস্যরস পরিবেশনই ইহার আসল উদ্দেশ্য। এই নাটকে আরো একটি চরিত্র হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছে। এই চরিত্রটি বেনের মাতুল মৃত্যু-পুত্র অহিতকুমার। এই চরিত্রটি নাটকে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

অহিতকুমার নেশাখোর, নারীলোলুপ, রাজ্যলোভী। তাহার গুপ্তাঘাত প্রাপ্তির পর রণক্ষেত্রে বেন অলকার অযাচিত উপকারে বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেলেন। শত্রুর স্ত্রী হইয়াও আর্তের প্রতি করুণা বিতরণে অলকা কার্পণ্য না

করায় বেনের কৃতজ্ঞতাবোধ প্রবল হইয়া উঠে। অহিতকুমারের মৃত্যুর পর বেন কর্মে বিশ্বাসী হইলেন। কাঞ্চিপুরের রাণী অলকা পতিপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সেবাধর্ম অবলম্বনে রূপায়িত হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের শুশ্রূষায় রত অলকাচরিত্রে [১]'মেবারপতন' নাটকের ভীমসিংহ-কন্যা 'মানসী' চরিত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। অঙ্গ-মহিষী সুনীথা মৃত্যুর কন্যা। তাহারই প্ররোচনায় সুনীথা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠেন। ইহার ফলে স্বামীহত্যায় উদ্যত হইয়া তিনি ভ্রাতৃহত্যা করেন। এই অবাঞ্ছিত ভ্রাতৃহত্যায় তাহার মানসিক পরিবর্তন আসে এবং ক্রমে তিনি স্বামীর অনুগতা হইয়া উঠেন। সুনীথা চরিত্রে পুত্রস্নেহের অভাব ছিল না। বেনকে হত্যায় উদ্যত মৃত্যু-পুত্র লোভী ও অকৃতজ্ঞ অহিতকুমার যেমন ঘটনাচক্রে মৃত্যুবরণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন সুনীথাকেও তেমনি অনুতাপ-দগ্ধ হইয়া বিষপান পূর্বক স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। নাট্যকার নাটকে স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়াছেন মন্ত্রি-রূপী শনির চরিত্রের মধ্য দিয়া,—

শনি— ভানুরে রাহুর গ্রাসে হেরি কক্ষপথে,
কে না বল বিচারিবে—
এ ভবে বিধির বিধি আছে একজন ?
তুমি আমি কিছু নই,
বিরাট খেলার ক্ষুদ্র খেলনক—
খেলি মোরা তাঁর ইচ্ছামত,—
স্বেচ্ছাচারে শক্তিদাতা
নাই এ সংসারে। (১ম গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক)

অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে মন্ত্রী রাজা অঙ্গকে কর্মের পথ দেখাইয়াছেন। মন্ত্রি-রূপী শনির বড় ভাই মৃত্যু ; পাপই তাহার প্রধান সহচর। পাপের আগুন জ্বালাইয়া তিনি রাজপরিবারের নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় নরপতি স্ত্রী ও শ্বশুরের চক্রান্তে নামে মাত্র রাজা হইয়া স্ত্রী-পুত্রের মুখাপেক্ষী কাষ্ঠ পুত্তলিকায় পরিণত হইয়াছেন। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করায় তাহাকে শেষ পর্যন্ত বনবাসী হইতে হয়। বনবাসকালে বেনও পৃথিবীর চণ্ডালপুত্রের শবের উপর সাধনা করিয়া শক্তির অধিকারী হইবার চেষ্টা করেন এবং শবটিকেও রক্ষা করেন। এই শবেই নারায়ণের অংশে 'পৃথুর' আবির্ভাব

১। মেবারপতন, দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯০৮।

হয়। অন্যায়ের প্রতিকার চেষ্টা ও পুত্রস্নেহ অঙ্গ চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অঙ্গপুত্র বেন জ্ঞান মার্গী ; কর্মবাদে তাহার বিশ্বাস নাই,—

বেন—কার কথা কর্মাধীন এ মহা সংসার !
কে বলেরে পরিণাম মানবদেহের,
রাজা ভিন্ন অন্য বিচারক—
কে সে এ ভারত ভূমে কুহকীপ্রধান !
কর্ম যদি এত বলবান,
কেন সে ত্রিশঙ্কু তবে অর্ধপথে রয়,—(২য় গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক)

কর্মবাদ বিরোধী বেন ক্রমে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। 'বেনরূপী নরবিষধর' রাজা হরিভজনা বন্ধ করিয়া রাজভজনার আদেশ জারি করেন। 'পৃথিবী তাহার কাছে মাতৃরূপিনী নহেন, ধরিত্রীর অধিপতি বলিয়া তিনি পৃথিবীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন। পৃথিবী অনেক চেষ্টা করিয়াও বেনের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত মায়া পৃথিবীর সাহায্যে তাহাকে বেনের কামনা পূরণ করিতে হয়। বেন যোগভ্রষ্ট তাপস,—

বেন—তোমার মতন ও রূপসাধনা
কত লক্ষকোটি জন্ম করিয়াছে বেন।
সলিলে আসন করি শীত ঋতুযোগে—
উর্ধ্বপদ অধোমুণ্ডে জপেছি অজপা,—
দুরন্ত নিদাঘ ঋষি আতপের তলে.
চতুর্দিকে অগ্নিরাশি করি প্রজ্বলিত,
স্বকরে ছেদন করি কত শতবার
স্বীয় মুণ্ড সে অনলে দিয়েছি আহুতি।
তবু হায় যোগভ্রষ্ট আমি—
লক্ষ্যস্থলে পারিনি পৌছিতে,—
তাই আজ পৃথিবীর রাজদণ্ড করে। (৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)

বেন অষ্টযোগ সিদ্ধ। তিনি বীর ও পৌরুষাবলম্বী। সিংহাসনে বসিয়া তিনি সুবিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; কূটনীতিতেও বেন পারদর্শী। গুপ্তাঘাতের পরে রণক্ষেত্রে বেন অবাঞ্ছিতরূপে অলকাপ্রদত্ত জল পান করিয়া মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর হইতে নারীর প্রতি মাতৃজ্ঞানের পরিচয় বেনের চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কার্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অলকার স্বামী

কাঞ্চিপুররাজ অচলেন্দ্রকে বন্দিদশা হইতে মুক্তি দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। মাতা সুনীথার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডকে বেন অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং মাতার এই জঘন্য বৃত্তিকে তিনি কখনও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সুনীথা অঙ্গরাজকে হত্যা করিতে আসিয়া মন্ত্রীর কৌশলে ভ্রাতা অহিতকুমারকে হত্যা করেন ; এই ঘটনার ফলে জ্ঞানবাদী বেন কর্মবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন,—

বেন—বা—বা ! ফুটে গেল অদ্ভুত আলোক
দেখা যায় কর্মাধীন সত্য এ সংসার।
ধরিল বিজয়লোভে স্বার্থের ছুরিকা
স্বীয় বক্ষ বিদরিল তায়,—
এই কর্ম—এই তার ফল।
আছ তুমি সূক্ষ্ম বিচারক,
এ বিচার তব
জগতের স্বপ্নের অতীত। (৩য় গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)

জীবের কর্মানুসারে যিনি অকাতরে ফলবিধান করেন সেই চৈতন্যময় নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপানুভূতি লাভ হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মানুষের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়। ইহার ফলে সমস্ত পৃথিবীই তাহার নিকট একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপে প্রতিভাত হয়। বেন বুঝিলেন যে এই মানসিকতা জ্ঞানমার্গে বা নিষ্কাম কর্মমার্গে লাভ করা সম্ভব। বেন সোঽহং জ্ঞানের অধিকারী হইলেন। জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মের সামঞ্জস্য বিধান পূর্বক ধ্যানস্থ হইয়া তিনি নরদেহ ত্যাগ করেন এবং পরিণামে নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন। এই নাটক রচনায় বীর, ভক্তি, হাস্য, করুণ ও বীভৎস রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই নাটকে বহু ঘটনার অবতারণা করায় ইহার নাট্যক্রিয়ার গতি অত্যন্ত মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নাটকের ক্রিয়া সম্পর্কে বলা যায়—।[1] "...Once the action starts it must run its uninterrupted course," নাট্যকারের পক্ষে এই নিয়ম মানিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ তৎকালে সাত আট ঘণ্টা ধরিয়া নাটকের অভিনয় চালাইতে হইত বলিয়া জনরুচি অনুযায়ী ইহাতে নানা ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নাটকের অভিনয়কাল হইতে প্রচারের জন্য ভোলানাথ যাত্রা-জগতে একটি নূতন রীতি প্রবর্তন করেন। তাহার পরামর্শে গণেশ অপেরা পার্টি

1. The Playwright's Art—p. 15, " Busfield

কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করিয়া সংবাদপত্র-সম্পাদক ও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই নূতন নাটকের একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। মঞ্চের এই অভিনয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য হইল পত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে নাটক সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এইভাবে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার পর যাত্রার আসরে নাট্যোদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রসঙ্গে মনোমোহন থিয়েটারে 'পৃথিবী' নাটকের অভিনয়-সংবাদ সাময়িকপত্র হইতে উদ্ধার করা যাইতেছে,—

[1] Last Tuesday at 5 p. m. the Ganesh Opera Party held a performance of the Grand Mythological Five-act drama by Babu Bholanath Roy called the Prithivi on the stage of Manomohan Theater, which was filled up with the highest number of enthusiastic audience……

ইহার পর হইতে অনেক যাত্রা পার্টি কর্তৃক নূতন নাটক খুলিবার সময় এই রীতি অবলম্বিত হইতে থাকে।

পঞ্চনদ (১৩২৫)—ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ১৩২৫ সালের ১৬ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে ইহার উদ্বোধন হয়। নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় ত্রিশ; প্রথানুযায়ী ইহাতে যাত্রা-ব্যালে, গণের গান প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১০০০—১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গজনীপতি সুলতান মামুদ (৯৯৭—১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ) তের বারের অধিক ভারত আক্রমণ করেন। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তাহার দ্বিতীয় আক্রমণ চলে ভাতিণ্ডার নরপতি জয়পালের রাজ্যে। এই সংঘর্ষই নাট্যকারের মূল অবলম্বন। ব্রাহ্মণ শাহীবংশের রাজা জয়পাল যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। করদানের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া সুলতান তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু এই অপমান অসহ্য হওয়ায় তিনি মুক্তিলাভান্তে [2] অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন করেন। এই নাট্য রচনায় ভোলানাথ কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে এই ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মামুদ চরিত্র রূপায়ণেও তিনি ইতিহাসকে ঠিকভাবে অনুসরণ করেন নাই। হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যবোধে

---

1. Amrita Bazar Patrika, Thursday, 18 Octo., 1917

2. Although Jayapala was released on promise of paying tribute, he did not choose to survive disgrace, and burnt himself to death in pyre which he set on fire with his own hands. p. 307 Ancient India —Dr. R. C. Mazumder (Delhi—1960,)

যাহাতে ফাটল না ধরে তাহার প্রতি বিশেষ জাগ্রত চেতনা ছিল বলিয়া নাট্যকার অত্যাচারী মামুদ চরিত্রের ধর্মবিদ্বেষ মুছিয়া দিয়াছেন। নাট্যকার বলিতে চাহেন যে হিন্দু হইলেই সে ভাল হয় না, আবার মুসলমান হইলেই মানুষ মন্দ হয় না। ভালোমন্দ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই রহিয়াছে। হিন্দুর মধ্যে যেমন পঞ্চনদপতি 'জয়পাল' রহিয়াছেন তেমনি জয়পালের সহোদর 'দুর্জয়পালের' মত স্বার্থপর হীন চরিত্রের লোকের ও অভাব নাই। গুজরাটরাজ সোমেশ্বর সিংহের চরিত্রে ধর্মপ্রাণতা এবং জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্তির সমর্থনের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে,—

সাধনানন্দ—প্রতিজ্ঞা কর আজ হতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, উচ্চ, নীচ জাতি ভেদ না করে সবার বিপদে সমান ভাবে বুক পেতে দেবে।

(৬ষ্ঠ দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যবোধ এবং জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্তির ধারণায় নাট্যকারের মধ্যে সমকালীন সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। মামুদ চরিত্র দোষগুণের সমাবেশে গঠিত। রক্ত-পিপাসু, পরশ্রীকাতর দস্যু হইলেও তাহার বীরত্ব, উদারতা ও মনুষ্যত্ববোধ যে একেবারে ছিল না তাহা নহে—

মামুদ—জগৎটাকে দেখাতে চাই, হিন্দু সম্রাটের তুলনায় মামুদ কোন অংশে ন্যূন নয়। ভারত হতে পারশ্য অসভ্য, বর্বর নয়। (৪র্থ দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

ইতিহাসের মামুদের ধর্মদ্বেষ থাকিলেও নাট্যকারের মামুদ ধর্মবিদ্বেষী নহেন। ইতিহাসে গজনীর সুলতান মামুদ সম্পর্কে বলা হইয়াছে,—

[1] His ferocity and avarice know no bounds and his religious zeal, bordering on fanaticism, led him to violate wantonly the most sacred sentiments of a great people.

সুলতান মামুদ সম্পর্কে আর এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—

[2] To the Hindus he is to this day a varitable Hun who destroyed their most sacred shrines and hurt their religious feelings.

সুতরাং মামুদের উদারতা ও ধর্মবিদ্বেষহীনতা সম্পর্কে একেবারেই

---

1. Ancient India—p. 311, Dr. R. C. Mazumder (Delhi, 1960.)

2. A Short History of Muslim Rules in India—p. 64, Dr. I. Prasad (Allahabad—1965)

নিঃসংশয় হওয়া যায় না। নাট্যকার ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই। সম্রাট জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালের মধ্যে বীরত্ব ও নারীর প্রতি সম্ভ্রমবোধ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বাসনা মানুষকে সংসারজালে আবদ্ধ করে, বৈরাগ্য বন্ধনমোচন করিয়া মানবকে ধর্মের পথে লইয়া যায়। তাই সনাতন হিন্দুধর্মে ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে। হিন্দুধর্মের এই বৈশিষ্ট্য রক্ষায় জন্য গুজরাট রাজা সোমেশ্বর সিংহ 'সাধনানন্দ সন্ন্যাসী'র বেশে নানা কর্ম করিয়া চলিয়াছেন। এই কর্ম প্রবণতা অবলম্বনে নাট্যকারের পরিস্থিতি রচনার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে। গজনীসম্রাট মামুদকে হত্যায় উদ্যত দস্যুসর্দার দয়াল ও সাধনানন্দরূপে ছদ্মবেশী সোমেশ্বর সিংহ প্রমুখকে অবলম্বন করিয়া এই পরিস্থিতি রচনা করা হইয়াছে,—

চপল—ইনিই শ্রীমান্ সুলতান সাহেব।

দয়াল—বিশ্বাস হয় না। যে সুলতান মামুদ জীবন উপেক্ষা করে শত দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা, বিশালহৃদয়-সমুদ্র, দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি উত্তীর্ণ হয়ে শত্রুশঙ্কুল ভারতে নেমেছে—সাপের মুখে হাত দিয়েছে, সেই সুলতান মামুদ প্রাণভয়ে এত কাতর।

মামুদ—সত্য অনুমান করেছ। কিন্তু—কিন্তু সন্ন্যাসি, সে প্রাণ আর আমার নাই। পূর্বে ছিল আশার প্রাণ, এখন হয়েছে আসক্তির প্রাণ—তাই মান দিয়েও রাখতে বাসনা। কেন জান? ভারতে এসেছি, কিন্তু তার সম্যক দেখা হয় নাই। সাধ, ভারত দেখব, ভারতের আর্যকুল দেখব, আর্যঋষি রচিত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ দেখব; আর দেখব কোন বলে হিন্দু সমস্ত জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করতে সাহস করে। সন্ন্যাসি, সন্ন্যাসি বাঁচাও, আজকের মত—একটি দিনের জন্য।

(জানু পাতিয়া বসিলেন। তদ্দর্শনে রহমান, নেয়ামত ও চপলচরণ জানু পাতিয়া বসিল)

দয়াল—তোমাদের বাঁচা হবে না,—তোমাদের বাঁচা হবে না। ঊর্ধ্বে নিয়তি লোল রসনা বিস্তার করে তোমাদের মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছে। নিম্নে সুকঠিনমৃত্তিকা তোমাদের কবর হবার জন্য আপনা হতে ফেটে উঠেছে। গোটা ভারতখানা এক নিঃশ্বাসে বলছে, তোমাদের বাঁচা হবে না। অত্যাচারী পাঠান যদিও মৃত্যুর কিছু

বিলম্ব ছিল, আর নাই! ব্যাধের দৃষ্টি অতিক্রম করে ব্যাঘ্রের বাসায় এসে পড়েছ। প্রস্তুত হও। (গুপ্ত পিস্তল বাহির করিল)

নেয়ামত—একি, একি সন্ন্যাসি!

দয়াল—তোমাদের বাঁচা হবে না।

রহমান—আমাদের প্রাণ নিয়ে সুলতানকে বাঁচাও।

দয়াল—বাঁচা হবে না।

মামুদ—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঘৃণা ভরে) আর বাঁচতে ইচ্ছা নাই সন্ন্যাসি! আমার ভারত দেখা হয়েছে, ভারতবাসীর হিন্দুয়ানী বুঝেছি. আর মরতে আপত্তি নাই। আর্য সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনে গোপন ভাবে পিস্তল—তাদের বিভূতি-চন্দন স্বকার্য উদ্ধারের ভান, তাদের কণ্ঠ নিঃসৃত সামগানও বোধ হয় কুলটার কদর্য সঙ্গীত হতেও হেয়! শুনেছিলাম, আর্যবংশের কে একজন একটা পারাবতের জন্য দেহের মাংস কেটে দিয়েছিল; কিন্তু সন্ন্যাসি, আজ তোমাদের দেখে আমার সে ভ্রম কেটে গেছে। সে শুধু আত্মম্ভরিতা—সে সব মিথ্যা।

(চারণবালকগণ ও চারণীগণ সহ সাধনানন্দ প্রবেশ করিলেন, বালকগণের হস্তে ফল ও জলপাত্র ছিল, চারণীগণের হস্তে বৃক্ষপল্লব ছিল)

সাধনানন্দ—সে যদি মিথ্যা হত তাহলে সুলতান সাহেবের নাম এতক্ষণ স্মৃতি হতে লোপ পেয়ে যেত।

মামুদ—তুমি আবার কে?

সাধনানন্দ—আমি! চিনতে পারবেন না। আমি একটা কেন্দ্রচ্যুত উপগ্রহ—কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্র—রুদ্ধবাষ্প আগ্নেয়গিরি। নাও, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়েছ, ফল এনেছি, জল খাও।

(চারণবালকগণ ফল ও জলপাত্র তাহাদের সম্মুখে ধরিল, চারণীগণ পল্লবে মৃদু মৃদু ব্যজন করিতে করিতে গাহিতে লাগিল)

গীত

মায়ের দেওয়া খুদ কুঁড়ো মায়ের দেওয়া বনের ফল
মায়ের দেওয়া নদীর জল, নাইতো অভাব মোদের ঘরে.
আসুক যত শ্রান্ত পথিক সেবা করি সমাদরে।
হোক না তারা শত্রু মোদের হোক না তারা হৃদয়হীন,
কি ক্ষতি তায় স্বার্থ-পথে হিন্দু চির উদাসীন;

অতিথি গৃহাগত এই তো তোদের চরম ব্রত,
চায় না তারা দেব-রাজত্ব সত্যে যাদের হৃদয় ভরে।
(সাধনানন্দ সকলের হাতে ফল দিলেন)

মামুদ—এর মধ্যে প্রতারণা নাই তো সন্ন্যাসি ?

সাধনানন্দ—কোন ভয় নাই সম্রাট। হিন্দুর ধূমায়মান বিদ্বেষের তীব্ররশ্মি মামুদ সাহেব, জেনে রেখো, পরেতো মুখের উপর পড়বে, অলক্ষিত-ভাবে একেবারে ধাঁ করে বুকে বাজবে না।

মামুদ—আর সে দিন নাই সন্ন্যাসি! সে দিন গিয়েছে।

সাধনানন্দ—যদিও সেদিন গিয়েছে, যদিও অতীতের অমৃতময় ইতিহাস যুগান্তরের কঠোর পীড়নে চোরের মত বিস্মৃতির তমোময় তলে বিশ্রাম নিয়েছে, তবু হিন্দু—হিন্দু। ভারতের এ দিগন্তব্যাপি ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এখনো একটা বিদ্যুৎ দেখা দেয়, সেটা হিন্দুর সনাতন ধর্ম।

মামুদ—ধন্য হিন্দু, ধন্য হিন্দু! (৪র্থ দৃশ্য, ৩য় অংক)

সম্রাট নন্দিনী সফিয়া চরিত্র প্রেম ও ক্ষমাধর্ম অবলম্বনে রচিত হইয়াছে; সফিয়ার ব্যক্তিপ্রেম শেষে বিশ্বপ্রেমে পরিবর্তিত হইয়াছে,—

সফিয়া—কিন্তু এখনো যে তোমায় ভালবাসি না তা নয়—তবে এ ভালবাসা স্বতন্ত্র। যে ভালবাসা বিশ্বমণ্ডল ব্যাপ্ত হয়ে আছে—যে ভালবাসা কীট হতে মানুষ পর্যন্ত সমানভাবে ছড়ান—যে ভালবাসা অনন্ত প্রেমের সৃষ্টি চির উজ্জ্বল—এ সেই জিনিষ। (৬ষ্ঠ দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

এই চরিত্র সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের [১]'মানসী' চরিত্র দ্বারা ভোলানাথ কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়াছেন,

"অজয়—তুমি আমায় ভালবাসনা!

মানসী—বাসি।

অজয়—না। তুমি আর কাউকে ভালবাস।

মানসী—মানুষ মাত্রকেই ভালবাসি।

অজয়—নিষ্ঠুর!

মানসী—কেন অজয়, তোমায় ভালবাসি বলে কি আর কাউকে ভালবাসতে

১। মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯০৮

নেই? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয়খানিকে গ্রাস করে রাখতে চাও? কি স্বার্থপর!

অজয়—ভালবাস মানসী। তোমার উদার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করে নাও।" (৬ষ্ঠ দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

আদিশূর (১৯২৩—ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইহার প্রচারমূলক প্রথম অভিনয় রজনী ১৮ই আশ্বিন, ১৩৩০ সাল। মনোমোহন থিয়েটারে এই অভিনয় সম্পন্ন হয়। একাদশ-দ্বাদশ শতকে রাঢ়ের এক শাসনকর্তা বৌদ্ধধর্মবিরোধী আদিশূর বৌদ্ধ ধর্ম দূর করিয়া কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কিংবদন্তী-ইতিহাসই নাটকের মূল অবলম্বন। আদিশূরের বৌদ্ধ বিদ্বেষ সম্বন্ধে ভাদুড়ি-কুলের বংশাবলীতে পাওয়া যায়,—[১]তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং। শশাঙ্ক গৌড়ং··· ॥

তাহার পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্পর্কেও রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত শ্লোক রহিয়াছে,—[২]আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্। আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চান্ পঞ্চগোত্র সমুদ্ভবান্ ॥

জনশ্রুতি আছে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রাঢ় অঞ্চলে আদিশূর রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ইতিহাসে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। কুলজী ও জনশ্রুতিতে আদিশূরের খোঁজ পাওয়া যায়। মহেশের 'কুলপঞ্জিকা'য় (গৌড় রাজমালা—১ম খণ্ড, ১৩১৯) পঞ্চব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—ক্ষিতীশো তিথিমেধা (চ) বীতরাগঃ সুধানিধিঃ। সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্মাত্মা আগতা গৌড়-মণ্ডলে ॥

[৩]বংকিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' হইতে জানা যায় যে আদিশূর পুত্রেষ্টিযাগার্থ ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ ও ছান্দড় নামক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

নাট্যকাহিনীর প্রধান চালক চরিত্র তক্ষশীল। তিনি অদৃষ্টবাদী ভীরু নহেন; পৌরুষ অবলম্বী, রুদ্র ভাবাপন্ন এই ধর্মগুরু লক্ষ্যে পৌঁছাইবার বাধা পায়ে দলিয়া চলিবার নীতিতে বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধন তাহার জীবনের মূলমন্ত্র,—

১। গৌড় রাজমালা, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩১৯ রমাপ্রসাদ চন্দ, পৃঃ ৫৮।

২। ঐ পৃঃ ৫৭ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক।

৩। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার—বিবিধপ্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ।

তক্ষশীল—আমি ব্রহ্মা, আমি পুচ্ছ বিগলিত সর্প,—আমি বৌদ্ধ রাজ্যের ভূমিকম্প। (৪র্থ দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

তাহার ভয়ে বৌদ্ধগণ ত্রস্ত; তিনি আদিশূর ভ্রাতা বৌদ্ধ অনাদিসেনকে বলিয়াছেন—'আমি চাই বৈদিক ধর্মের কালস্বরূপ তোমাদের সবকটাকে এক হাতে গতিয়ে এক চোট কাটতে—বুঝলে? (৩য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)। এই মনোভাবের ফলে তাহার বৌদ্ধবিদ্বেষ ক্রমে পৈশাচিকতায় রূপান্তরিত হয় বলিয়া মেলার সময় তিনি অসহায় ভাবে অতর্কিতে বৌদ্ধদের পোড়াইয়া মারিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। দেশে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরে তক্ষশীল বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই চরিত্রে মাঝে মাঝে 'চাণক্য' চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। চাণক্যের ছিল মণীষা-গণিকা তক্ষশীলের আছেন ব্রহ্মণ্যদেব বুদ্ধিদাতা,—

তক্ষশীল—আমি ব্রাহ্মণ—ভিক্ষাজীবী, তবে আছেন আমার ব্রহ্মণ্য দেব। কি বলছ দেবতা? অনাদি চাচ্ছে যুদ্ধ বন্ধ কর—হবে না,—না? হবে না, হবে না—যাও? (৩য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

[১]"চাণক্য—তবে সন্ধি হবে না।

কাত্যায়ন—কেন?

চাণক্য—তুমি এখন শিবিরে যাও। আমি একবার প্রেয়সীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।

কাত্যায়ন—প্রেয়সী কে?

চাণক্য—জাননা (হাস্য), আমার একজন গণিকা আছে।

কাত্যায়ন—তোমার গণিকা!" (২য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

আদিশূর বীর ও গুরুভক্ত; বৈদিক ধর্মের অভ্যুত্থানের জন্য অন্ধের মত তক্ষশীলের আদেশ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। আদিশূর স্নেহপ্রবণ পিতা বলিয়া পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি বৌদ্ধদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া মানসিক শান্তির সন্ধানে তৎপর হইলেন। রাজভগ্নী 'অপরাজিতা' স্বামীহত্যার পৈশাচিক প্রতিহিংসায় উদ্যত। কনোজ রাজভ্রাতা 'জগৎ বর্দ্ধনকে' মূর্চ্ছিত অবস্থায় দ্বিখণ্ডিত করিয়া তিনি রক্তাক্ত মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিলেন। এই চরিত্রে বীভৎস ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আদিশূর-কন্যা 'লক্ষ্মী' স্বামী

১। চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯১১

প্রেমের আদর্শে গঠিত। তাহার স্বামীপ্রেম ধর্মবিদ্বেষের উর্দ্ধে। অনাদিদেনের মধ্যে ধর্মভাব প্রবল; তিনি নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ, সত্য ও ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি জীবন দানে কুণ্ঠিত নহেন। বল্লভ মিশ্রের চরিত্রে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে। একানে বালক চরিত্র 'ভানুর' (আশ্রিরের পুত্র) মধ্যে দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য হইতে একটি গান উদ্ধার করা যাইতেছে,—

ভানু—যেতে পারবে দিদি? বাঙ্গলার জন্য মন কাঁদবে না। আমি যদি তুমি হতুম থানেশ্বরকে টেনে বাঙ্গলায় নিয়ে আসতুম, তবু বাঙ্গলা ছেড়ে চলে যেতুম না।

লক্ষ্মী—ভানু!

ভানু— গীত

আমার সোনার বাঙ্গলা দেশ।
সোনায় গড়া সযতনে নখ হতে এর মাথার কেশ
সোনার রবি সকাল বেলায় ঢলে পড়ে সোনার গায়,
সোনার পাখা প্রজাপতি সমীরণে নাচে ধায়;
সোনা ছড়ায় মেঘের জলে সবুজ ক্ষেতে সোনা ফলে,
সবটুকু এর সোনা মাখা, এ সোনার কথার নাইকো শেষ।

জনপ্রিয়তার জন্য এই গানখানি [1]হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্ কর্তৃক রেকর্ড করা হয়। ইহাতে যাত্রাবাদ্যে ও গণের গান সংযোজিত হইয়াছে। নাট্য রচনায় আদি, বাৎসল্য, রৌদ্র, বীর, বীভৎস রস ও ধর্মভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

দান-যজ্ঞ (১৩২৮)—ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ১৫শ-২৩শ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। দৈত্যরাজ বলি কর্তৃক বামনরূপী ব্রাহ্মণকে ত্রিপাদ ভূমি দানের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে। অহং ভাব মনে রাখিয়া ধর্ম কর্ম করিলেও জীবের বাসনা মুক্তি ঘটে না; ব্রহ্মপুরুষে আত্মদানই একমাত্র মুক্তির পথ। এই দার্শনিক তত্ত্বটি নাটকে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেম-ভক্তি সাধক বিরোচন পরব্রহ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নির্বাণ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। দৈত্যরাজ

1. H. M. V. Bengali Song No. P 8853, sung by J. N. Ghosh, Record No. G. C. 21-12940

বলির মধ্যে ইহার বৈপরীত্য দেখা দিয়াছিল। বলি পরদুঃখ কাতর, কল্পতরু, দানবীর; মুক্ত হস্তে অজস্র মণি, মুক্তা, হেম লক্ষ লক্ষ লোককে দান করিয়াও তিনি দান-বাসনা মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাহার দান ব্রতে ধর্মবোধ যেমন ছিল তেমনি অহং ভাবও পিছন হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। এই বোধই তাহার বাসনা মুক্তির অন্তরায় হইয়াছিল। প্রার্থীর দুই পদে স্বর্গ ও মর্ত আবরিত হইল, তৃতীয় পদ রক্ষা করিবার স্থান দেওয়া দৈত্যরাজের পক্ষে সম্ভব হইল না। শেষ পর্যন্ত বামনরূপী উপেন্দ্রের নাভিস্থল হইতে উত্থিত তৃতীয় পদে আত্মদান করায় বলির অহং ভাব ও দান গর্বের অবসান ঘটিল এবং পরিণামে তিনি নারায়ণের কৃপা লাভে সমর্থ হইলেন। দৈত্যরাজ মহিষী 'বিন্ধ্যা' পতিভক্তি পরায়ণা নারী রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। প্রহ্লাদ ও নারায়ণের সংঘর্ষে নাটকে বীর রসের সঞ্চার করা হইয়াছে। ইহা বীর, করুণ ও ভক্তি রসের নাটক। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি গণেশ অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়।

ধনুর্যজ্ঞ (১৯২৫)—শ্রীমদ্ভাগবতের (বাঙ্গলা সং) দশম স্কন্ধের অন্তর্গত চতুর্থ, পঞ্চত্রিংশৎ ও চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি ও গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। ১৩৩০ সালের ২৪শে আশ্বিন মনোমোহন থিয়েটারে ইহার প্রথম প্রচার-অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। দেবকীর অষ্টম গর্ভজ পুত্র কৃষ্ণকর্তৃক মথুরাপতি কংসের নিধন কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। নাটকে বিশ খানার অধিক গান আছে; ইহাতে যাত্রাব্যালে ও গণের গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জীবনের শেষ লক্ষ্য মুক্তি; সেই লক্ষ্যে কেহ যায় দীনের মত আবার কেহ যায় বীরের মত। কংস চরিত্রে এই ভাবটি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। দৈব ও পুরুষকারে মধ্যে দৈবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন নাটকের মূল উদ্দেশ্য,—

দৈব ঐ শোন কার নূপুরের বাঁশীতে আমার বিজয় বাজে।

পুরুষকার—ঐ দেখ তারই বক্ষে বাহুতে আমারও মহিমা রাজে॥

(৬ষ্ঠ দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

অত্যাচারী কংস পুরুষকারের পূজারী হইলেও তাহার অন্তরের অন্তস্তলে ফল্গুধারার মত বিষ্ণুপ্রীতি প্রবাহিত। তাই অক্রূর তাহাকে বলিয়াছেন—তোমার জয় দি, কি তোমায় অভিসম্পাত করি। তোমায় যোগীর আসনে

বসাই, কি দস্যুর ভূমিকায় নামাই! তুমি উষ্ণ প্রবাহ, কি উত্তপ্ত বালুকা রাশির মধ্যে শীতল জলস্রোত"! (৩য় দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)। কংসের মধ্যে ভগ্নী দেবকীর প্রতি স্নেহ সঞ্চিত ছিল বলিয়া তাহার উপর হিংসাচরণে মথুরাপতির মনে মাঝে মাঝে সংশয় দেখা গিয়াছে। কংসের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র দেববান পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৈত্য গুরু মায়াসুরের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া মায়া বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং কারাগার হইতে কৃষ্ণকে গোকুলে পাঠাইতে সাহায্য করিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কতগুলি পৈশাচিক কর্মে লিপ্ত হইবার জন্য তাহাকে পরিণামে অনুতাপদগ্ধ হইতে হয়। কংসমহিষী 'প্রাপ্তি' দৈবে বিশ্বাসী বলিয়া উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে সৎপথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অপর মহিষী পুরুষের পৌরুষে বিশ্বাসী 'অস্তি' বিদ্যুল্লতার মত বিসর্জনের অন্ধকারে কংসকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। উত্তম মালি, অধম রজক ও আকিঞ্চনের অংশকে অকারণে প্রাধান্য দেওয়ায় নাটকে ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। ইহা রৌদ্র, বীর, করুণ ও ভক্তিরস প্রধান নাটক।

দাক্ষিণাত্য (১৯২৬)—এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটকখানি গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। মহম্মদ গিয়াসুদ্দিনের পুত্র রক্তপিপাসু বিদ্বান নিষ্ঠুর মহম্মদ তোঘলকের রাজত্বে (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ) দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর (১৩৩৬খ্রীঃ) ও বাহমনিরাজ্য (১৩৪৭ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠার কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। নাটকখানি তৃতীয় দশকের স্বদেশী ভাব ও হিন্দুমুসলমান-ঐক্যের দ্বারা প্রভাবিত,—

প্রজাগণ— (গীত)

আজি হিন্দুর অশ্রু যবনরুধির একেবারে হয়ে মিলিত
করিল এ ধরায় নূতন সৃষ্টি,
রাখিল বিশ্বে নূতন কীর্তি,
অমর অক্ষয় মঙ্গলময় মাধুরিমা মাখা ললিত,
কেবলি ত মুখে হয়না এ মিলন মিলুক চক্ষের চাহনি।

(১ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)

লুণ্ঠন ও নরহত্যায় মহম্মদ যে পারদর্শী ছিলেন ভারতে তিনি তাহার পরিচয় রাখিয়াছেন—[1]"He captured several forts, and committed

---

1. Tarikh-i Badauni (Abdul Kadir) Eng. Trans.—H. M. Elliot & J. Dowson (1875), (Text Vol. I. P. 227)

ravages and massacres from Lahore, Samana, and Indri to the confines of Badaun."

[1]..."When his subjects failed to responnd to his wishes, his wrath was terrible."

আফ্রিকার মরক্কো দেশের পরিব্রাজক ইবন বটুতা সাত বৎসর মহম্মদ তোঘলকের কাজী ছিলেন। মহম্মদ তোঘলক সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—

[2] The ceremonies of his religion are dear to his heart, and he is very severe in respect of prayer and the punishment which follows its neglect.

এই সাংঘাতিক চরিত্রের শাসনকর্তার আমলেও নিঃস্বার্থপরতা, বুদ্ধি ও শৌর্যবীর্যের বলে দাক্ষিণাত্যে দুইটি রাজ্যের অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছিল। নাটকের প্রধান চরিত্র দিল্লীর সম্রাট এই মহম্মদ তোঘলকের মধ্যে বিদ্বাবত্তা ও মিতব্যয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নাট্যকার এই চরিত্র চিত্রণে খামখেয়ালীপনা, রক্ত পিপাসা ও অত্যাচারের উপরই জোর দিয়াছেন,—

সাহারা—মহম্মদ, তুমি মানুষ? সম্রাট গিয়াসুদ্দিনের পুত্র? আমার ভাই? না, কে তুমি ছদ্মবেশী, ভাই হয়ে ভগ্নীর জন্য ছুরি শানাও—সম্রাটের আসনে বসে স্বার্থের পূজা কর—মানুষ হয়ে মানুষ খাও? তাও নিজের ভাগিনেয়—জামাতা, পুত্র হতেও,—পশুতেও যা পারে না। তুমি কোন জাহান্নমের? (২য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

মহারাষ্ট্রীয় জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ পুত্র-শোকাতুর গঙ্গুর (ইতিহাসের হুসেন গাঙ্গুবাহমনি) বুদ্ধিমত্তা এবং পাঠান ক্রীতদাস জাফর খাঁর (হাসান) নিঃস্বার্থপরতা ও অস্ত্রদক্ষতাবলে বাহমনি রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। বুক্কা রায় চরিত্র শৌর্য ও দেশপ্রাণতা লইয়া রূপায়িত হইয়াছে। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্যের মন্ত্রণাধীনে বুক্কারায় বিজয় নগরের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্নেহ, প্রেম কোমলতার আধার সম্রাট কন্যা সাকিনার কাছে নারী জন্ম নিরর্থক নহে।

2. A Short History of Muslim Rules in India—P. 135, Dr I. Prasad (Allahabad—1965)

1. Ibn Batuta's Rihal (Safarnama), taken from P. 134 of A Short Hitory of Muslim Rules in India by Dr. I. Prasad (1965)

নারী-জীবন রত্নের মত অমূল্য ; উপযুক্ত স্ত্রী হইবার গৌরব অর্জনেই ইহার সার্থকতা। সেই গৌরবের অধিকারিণী হওয়াই সাকিনার লক্ষ্য—

"সাকিনা— ·····রত্ন জন্ম পেয়েছি, আপন প্রভায় জলব, নারী হয়েছি—স্ত্রী হব"। (৬ষ্ঠ দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

সাকিনা বাঁদির কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি শুনিয়াছে,—

বাঁদি — কাহে হাম সখি, মান করনুলো ভাগল চিতচোরকালা।
পাগল হউকি গরল ভখিনু, ক্যাসে জীয়ে ব্রজবালা॥
যমুনা দরশনে দহত তনু সুচল লাগত কুসুম রেণু।
বিনুসো মাধব কুলীশ কুহুরব চাঁদে উহু একি জালা॥
চলই সজনিলো কাঁহা বঁধুয়ামম বুঝহুসবসে সেমম প্রিয়তম।
জীবন বিকায়ব, যোগিনী সাজব, ধরব শ্যামজপমালা॥
(৬ষ্ঠ দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

তৎকালীন মুসলমান সম্রাটের অতঃপুরে সাকিনার পক্ষে শ্যাম-সঙ্গীত শ্রবণ করা কতখানি স্বাভাবিক তাহা ভাবিবার বিষয়। এই সংগীত সংস্থাপনে ভোলানাথ দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। টাঁহার সুজার প্রাসাদকক্ষে পিয়ারা বেগমও শ্যাম-সংগীত গাহিয়াছিলেন,—

পিয়ারা— সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলগো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ হইলগো
কেমনে পাইব সই তারে।
(সাজাহান, ১ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

এই নাটকে আদি, বীর ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

✓ কৈকেয়ী (১৯৩০)—কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বনে রচিত এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকটি গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রাব্যালে, গণের গান প্রভৃতি লইয়া এই নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় চল্লিশ। নাটকের প্রথম প্রচার-অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৩৩৩ সালের ২০শে আশ্বিন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরে। বিবাহের পরে রাম-লক্ষ্মণ ভরত-শত্রুঘ্নের অযোধ্যায়

আগমন বৃত্তান্ত লইয়া নাট্যারম্ভ হইয়াছে। ইহার পর রামচন্দ্রের সিংহাসনারোহণের উদ্যোগ, কেকয়রাজের ইঙ্গিতে এবং মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী কর্তৃক রাম-বনবাসের ব্যবস্থা, ভরতের রাম পাদুকা গ্রহণ ও নন্দীগ্রামে রাজপ্রতিনিধিত্ব করণ, অপহৃতা সীতা উদ্ধারে রামের সদলবলে লঙ্কা গমন, বিভীষণের রাম পক্ষে যোগদান, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও মারুতির গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, তরণীবধ, পরাজিত রাবনের নিকট রামচন্দ্রের রাজনীতি শিক্ষার ব্যবস্থাও রাবণের মৃত্যু সীতার অগ্নিপরীক্ষান্তে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার স্বদেশাগমনের ব্যবস্থা এবং ভরত ও কৈকেয়ীর রাম আগমন প্রতীক্ষার ঘটনা নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহার সঙ্গে রোহিলারাজ চিত্র, রাণী নন্দেয়ী, রাজপুত্র কবচ ও কুণ্ডলকে অবলম্বন করিয়া একটি বড় উপকাহিনী সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকে ইহাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় করিয়া তোলা হয় নাই। বহুবিস্তৃত ঘটনা লইয়া নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে; পারম্পরিক যোগসূত্র রক্ষা করিয়া ইহাদের সাজানো হয় নাই। ঘটনাগুলি যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রণক্ষেত্রে রোহিলারাণী নন্দেয়ীর আগমনের মত আকস্মিকতার পরিচয় ও নাটকে রহিয়াছে। রাজগিরির রাজা কেকয়ের ইঙ্গিতে দাসী মন্থরা কৈকেয়ীর স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া উত্তপ্ত করিয়া তোলে। মন্থরা রামের বনবাস ও দশরথের মৃত্যুর পরে সপত্নী পুত্রের প্রতি কৈকেয়ীর স্নেহাধিক্য লক্ষ্য করিয়াছে এবং ইহাও বুঝিয়াছে যে দশরথ-পরিবারে অহেতুক আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করিয়া সে কেবল কলঙ্কিনী হইয়া রহিল। অনুতপ্ত মন্থরা শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় জীবন বিসর্জন দিয়া সমস্ত হৃদয় জ্বালার সমাপ্তি ঘটায়। ঊর্মিলা চরিত্রে স্ত্রীত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বের প্রকাশ অধিক। লক্ষ্মণের প্রতি অগাধ ভালবাসা সত্ত্বেও সেবাব্রতই তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন। কবচ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে—"প্রেমের উদ্যান,—ত্যাগের বিদ্যালয়,—মাতৃত্বের মহোর্মি" (৮ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)। মাতৃত্ববোধের দিক হইতে ঊর্মিলা, কৈকেয়ী ও নন্দেয়ীর মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে। তাহারা কেহই যেন স্বামীর স্ত্রী নহেন, সন্তানের মা এই প্রসঙ্গে ভগ্নী কৈকেয়ীকে উক্ত নন্দেয়ীর সংলাপ উদ্ধারযোগ্য,—

নন্দেয়ী—আমায় এখানে পুত্রের পথে এনে ফেলেছ; তোমার জয় হয়েছে। আমি আর স্বামীর স্ত্রী নই আমি তোমার অনুসৃতা, মহামন্ত্র দীক্ষিতা—ঐ পুত্রের মা। নারী-জনের উদ্দেশ্য স্বামীর স্ত্রী হওয়া নয়, পুত্রের মা হওয়াই; স্ত্রী-জীবন নিজের জন্য—মাতৃজীবন পরের জন্য। (৮ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)।

রাজা কেকয়ের দ্বিতীয়া কন্যা নন্দেয়ীর সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ দূরীভূত হওয়ায় বাৎসল্য ভাব তাহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। এই বাৎসল্য ভাবের বলেই তিনি সপত্নীপুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়া জীবনে শান্তির অধিকারিণী হইলেন; নিজের পুত্রের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন ও কর্তব্যের পথ অবলম্বনে তাহার নারী জীবন সার্থক হয়। কৈকেয়ী বুদ্ধিমতী, সংসার-অভিজ্ঞা, সর্বকর্মকুশলা; রামচন্দ্রের প্রতি তিনি সমধিক স্নেহশীলা। সুতরাং মন্থরার পরামর্শে তাহার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। দুষ্টা সরস্বতীর প্রভাবে দ্বন্দ্ব-ক্ষত কৈকেয়ী মন্থরার হাতে হাত মিলাইলেন। কিন্তু ভরতকে সিংহাসনে বসান তাহার উদ্দেশ্য নহে, তাহার উদ্দেশ্য অনেক মহৎ। রামচন্দ্র রাজনীতি শিখেন নাই। সুতরাং অযোগ্য অবস্থায় সিংহাসনারোহণের উদ্যোগী হওয়ায় তিনি অপরাধী হইয়াছেন। এই অপরাধের দণ্ডদানে ("অজ্ঞানে অগম্যা-আলিঙ্গন উদ্যোগ অপরাধের দণ্ড"—কৈকেয়ী ১ম গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক) এবং রাজনীতিতে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তিনি জানিতেন যে ইহাতে তাহার অশেষ কলঙ্ক হইবে। সে কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়াও তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য একজন রাজা গড়িতে চাহিয়াছেন; এইখানেই তাহার আত্মত্যাগের পরিচয়,—

কৈকেয়ী—আমি এক। রাজা গড়তে বলেছি দেশের জন্য আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে। রাজার ছেলে রাজা—রাজভোগ হইতে রাজভোগে, সে রাজা অনেক হল—গেল; এ রাজা হবে, নিজে নিরন্ন হওয়া—নিরাশ্রয়ের অশান্তি পাওয়া—অত্যাচারীর আঘাত সওয়া আর সাধুর উপকার বোঝা। এ রাজা থাকবে আ প্রলয় অমর; এ রাজাকে স্মরণ হবে দেশের ওপর ভবিষ্যতের প্রত্যেক ধাক্কায়। (১ম গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক)।

ভরতের মধ্যে রাজর্ষিত্ব ছিল বলিয়া তিনি যে রামের সিংহাসনে বসিবেন না ইহাও কৈকেয়ী জানিতেন। তাই রাম বনবাসের এই চতুর্দশ বৎসর কালের জন্য তিনি ভরতের হইয়া দশরথের কাছে রাজ্য কামনা করিয়াছিলেন। কৈকেয়ীর প্রভাবে রামের বনবাস হইলে দশরথের মৃত্যু হয়; সুতরাং কৈকেয়ী দশরথের মৃত্যুর জন্য দায়ী ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক না হইলেও প্রকৃত সত্য নহে—আপাত সত্য। দশরথের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহার শব্দভেদী বাণপ্রয়োগের অক্ষমতার মধ্যে। এই বাণের অপব্যবহার করিয়া তিনি অন্ধ মুনির নিকট মৃত্যুর অভিশাপ কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। এইখানেই দশরথের মৃত্যু বীজ; কৈকেয়ী উপলক্ষ মাত্র,—

উর্মিলা—তোমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ—তাঁর শব্দভেদী বাণ প্রয়োগের শক্তির অপব্যবহার—তার অমর্যাদা। (৩য় গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)

কৈকেয়ী স্ত্রী-জাতি নহেন, মাতৃ-জাতীয় নারী, তাই তিনি উপযুক্ত সন্তান গড়িতে চাহিয়াছেন। কাজেই রামচন্দ্র বনবাসান্তে রাজধানীতে আসিয়া যদি তাহাকে তাচ্ছিল্য করিতেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব হইত না। কারণ রামচন্দ্রের এইরূপ ব্যবহারে তিনি বুঝিতেন যে পুত্রকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়া রাজা গড়িয়া তুলিবার সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হইল, কেবল কলঙ্কের বোঝা বহন করাই সার হইল। এই মনোভাব লইয়া রামের আগমনবার্তা শুনিয়া কৈকেয়ী আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কৈকেয়ীও রামের আগমনবার্তা শুনিয়া আত্মহত্যার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন—

[1] যদি রাম পূর্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এদেহ নহে ত্যজিব জীবন॥
এতেক ভাবিয়া রাণী হইলা অধোমুখ।
করেতে রাখিল এক বিষের লড্ডুক॥

কৈকেয়ীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছিল রামের নিকট পরাজয়ের গ্লানি, লজ্জা ও লাঞ্ছনার ভয়ে। বর্তমান নাটকের কৈকেয়ী অন্য ভাবাপন্ন। তিনি নৃপ গঠনকারী, আত্মত্যাগী, সন্তানবৎসল জননী মহাদেবী। ভোলানাথের কৈকেয়ী নাটক রচিত হইবার পূর্বে মতিলাল রায় 'রামরাজা' নাটকে এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'রাম নির্বাসন' নাটকে কৈকেয়ীর কলঙ্ক ভঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। মতিলালের কৈকেয়ী রাম-বনবাসের উপলক্ষ মাত্র। দৈবচক্রে ইহা সংঘটিত হইয়াছে,—

কৌশল্যা—আমিতো সবই জেনেছি যে, দৈবচক্রে পড়ে আমার ভগ্নী কৈকেয়ী এত কলঙ্কিনী। আমার রাম বনে গেল, মহারাজ দশরথ স্বর্গে গেলেন, আমি পড়ে পড়ে কাঁদছি, কে যেন রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ চতুরানন হংসারূঢ় হয়ে আমার সম্মুখে এসে বললে যে, মা! মহারাজ দশরথ স্বর্গে গিয়েছেন, রামের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। দেব-চক্রে রাম রাজা না হয়ে রাবণ বধের জন্য বনে গিয়েছেন, চৌদ্দবৎসর পরে নিশ্চয়ই আসবেন। তবে আর কৈকেয়ীর দোষ

১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস, 'কৈকেয়ীর সঙ্গে শ্রীরামের কথা, লঙ্কাকাণ্ড।

কিসে? দেবতারা ছল করে এই কার্য করলেন, কৈকেয়ী ঘোর কলঙ্কিনী হল। আহা! কৈকেয়ীর কোন দোষ নাই, সে যে আমা হতেও আমার রামকে ভালবাসে। (৬ষ্ঠ অঙ্ক, রামরাজা)।

দেবচক্রে কার্য হলেও কৈকেয়ী অনুতপ্তা হইয়াছেন। হরিপদর কৈকেয়ী দুষ্টা সরস্বতী ও ব্রহ্মশাপের প্রভাবে মন্থরার পরামর্শ গ্রহণ করেন। কৈকেয়ীর প্রতি [১]ব্রহ্মশাপের বিষয় কৃত্তিবাসও উল্লেখ করিয়াছেন,—

ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে॥
পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে।
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণেরে ছলে॥
তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে দিল ব্রহ্মশাপ॥
দেখিয়া করিস ব্যঙ্গ কহিস কর্কশ।
সর্বলোকে গায় যেন তব অপযশ॥

কৈকেয়ী বিবাহের পূর্বে ব্রাহ্মণকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাহাকে শাপগ্রস্ত হইতে হয়, তাই হরিপদর রামনির্বাসনে দেখা যায়,—

ব্রহ্মণ্য দেব—বাল্যে কৈকেয়ীর প্রতি আছে ব্রহ্মশাপ,
করেছিল দুষ্টা নারী ব্যঙ্গ এক ব্রাহ্মণেরে—
তাই সে ব্রাহ্মণ দিল অভিশাপ—
ভুবন অখ্যাতি তোর গাহিবে কৈকয়ী।

(৭ম গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক, রামনির্বাসন)

কৈকেয়ীর মতিভ্রমের মূলে এই শাপ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল। রাম লীলা সম্পূর্ণ করিবার জন্য দেব-আদেশে দুষ্টা সরস্বতী কৈকেয়ীর কণ্ঠাধিষ্ঠাত্রী হইয়াছিলেন,—

ইন্দ্র—তুমি না করিলে দয়া দয়াময়ি,—
রামলীলা অসম্পূর্ণ রয়—
দুরাচার রাবণের না হয় সংহার।

(৭ম গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক, রাম নির্বাসন)

১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড—'ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে কুঁজী কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দেয়'

দৈব প্রভাব ও ব্রহ্মশাপের ফলে ঘটিত কুকর্মের জন্য 'রামনির্বাসনের' কৈকেয়ী অনুতাপ দগ্ধ হইয়া প্রায়োন্মাদিনী হইয়াছেন ; দশরথের কাছে তিনি দণ্ড ভিক্ষা করিয়াছেন। এমন কি মন্থরাকে পদাঘাতে জর্জরিত করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই,—

কৈকেয়ী—দূর হ' চণ্ডালিনী—এই পদাঘাতে তোর কুঁজ ভাঙ্গব। তোকে মৃত্যুমুখে পাঠাব, তোর তপ্ত শোণিত পান করব, সর্বগাত্রে লেপন করব, তাণ্ডব নৃত্যে নৃত্য করব। প্রাণের রামের কাছে ছুটে যাব, দন্তে তৃণ করে—জোড় করে ক্ষমা চেয়ে তাকে আমার অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনব, তবে আমার দেহের উত্তাপের হ্রাস পাবে—প্রাণের জ্বালা কমবে—আয়—আয়—এক পদাঘাত নয়—শত শত পদাঘাত। (মন্থরাকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পদাঘাত করন —১ম গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক)।

কৈকেয়ী চরিত্র রূপায়ণে মতিলালের দেব-চক্র ও অনুতাপানল-পরিকল্পনা দ্বারা হরিপদ প্রভাবিত হইয়াছেন ; কিন্তু ব্রহ্মশাপ ও মন্থরাকে শাস্তিদান হরিপদর কৈকেয়ী চরিত্র চিত্রণের দুইটি নূতন উপাদান। ভোলানাথ কৈকেয়ীর চরিত্র রূপায়ণে দুষ্টা সরস্বতীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন! কিন্তু তাহার কৈকেয়ী অনুতপ্তা নহেন। হরিপদবাবু মন্থরার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন কৈকেয়ী দ্বারা ; ভোলানাথবাবু হৃদয়হীন কুকর্মের জন্য চরিত্রটির শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন কৈকেয়ী-ভ্রাতা কন্দুকদ্বারা। এই দুইটি বিষয়ে কিছু কিছু মিল থাকিলেও কৈকেয়ী চরিত্র রূপায়ণে ভোলানাথ পূর্ববর্তী নাট্যকারদ্বয় অপেক্ষা অভিনব মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কৈকেয়ী দৃঢ়-ব্রতশীলা, চিরকর্তব্য পরায়ণা। তাই কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া তিনি রামচন্দ্রের বনবাস ব্যবস্থা করেন। কৈকেয়ীর "ইহা স্বার্থ নয়, অলৌকিক আত্মত্যাগ ; তিনি দানবী নন—মহাদেবী" (কৈকেয়ীর ভূমিকা)। রামের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা ও রাজর্ষির গুণাবলী অবলম্বনে ভরত চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। রামের বনবাস সংবাদে ভরত এতই মর্মাহত হইয়াছিলেন যে তিনি মাতা কৈকেয়ীকে অপরাধের জন্য তীব্র তিরস্কার করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই! বিভীষণ তরণীর প্রতি পুত্রস্নেহ ও রামের প্রতি কর্তব্যের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইয়াছেন। রামের পক্ষ অবলম্বন করিলেও বিভীষণের মনে রাবণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যে ছিল নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণ রাজনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বীর ও ভক্ত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রামচন্দ্রকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। নীচ

স্বার্থপর মনোবৃত্তি লইয়া কৈকেয়ী চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে রৌদ্র, বীর, করুণ, বাৎসল্য ও ভক্তি রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

যজ্ঞাহুতি (১৩৩৭)—মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত কাহিনী অবলম্বন রচিত এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় সাঁইত্রিশ; ইহাতে গণের গান ও কয়েকটি যাত্রা ব্যালে রহিয়াছে। সূর্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্যতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের ছায়ামূর্তি স্বামী সকাশে রক্ষা করিয়া অশ্বিনীমূর্তিতে সূর্যের নিকট হইতে পলায়ন করেন। সূর্যদেব ইহা বুঝিতে পারিয়া অশ্বমূর্তি ধারণ করিয়া উত্তর কুরু পাঞ্চালে তাহার সহিত মিলিত হইলেন। এই মিলনের ফলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। বিরূপ জন্মের জন্য দেব সমাজে পতিত হওয়ায় তাহারা যজ্ঞাহুতির অংশলাভে বঞ্চিত হইলেন। যজ্ঞাহুতি দাবী করায় দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদের স্বর্গচ্যুত করেন। স্বর্গভ্রষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারবতীর সূর্যবংশীয় রাজা শর্যাতির শরণাপন্ন হইলেন। শরণাগতকে উদ্ধার করিবার জন্য শর্যাতি এক যজ্ঞের আয়োজন করেন; শর্যাতির জামাতা চ্যবন মুনির ব্রহ্মশক্তিবলে—অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই যজ্ঞে আহুতি পাইয়া দেবযোগ্য সম্মান লাভ করেন, ইন্দ্রেরও দর্প চূর্ণ হয়। এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। শর্যাতি-নন্দিনী সুকন্যার নিষ্কাম সেবা ও সতীত্বের বলে চ্যবনমুনির যৌবন ও পুনর্দৃষ্টি লাভ ঘটে। সুকন্যার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া চ্যবন শরণাগত রক্ষী স্নেহপ্রবণ শর্যাতির যজ্ঞেও হোতা হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞাহুতির অধিকারী করেন। অকৃতদার সন্ন্যাসী বৃদ্ধ চ্যবন চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ত্যাগের দ্বারা ভোগের ক্ষয় হয় না, ভোগের মধ্য দিয়া ভোগাতীত হইতে হয়,—

গ্রহাচার্য—ভোগ যদি নাই চিনলে ত্যাগ করছ কি? নিঃস্বের আবার ত্যাগ কি? অন্ধ, যেটা দেখে, সেটাকে আমি ঠিক অন্ধকার বলতে পারিনা। কখনো যদি তার আলোক দেখা থাকত, তবে একদিন সে অন্ধকারের নাম করতে পারত। সেটা কিছুই নয়—কতকটা একাকার বলতে পারা যায়। (২য় গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)। এই ভোগের জন্যই চ্যবনকে যৌবন গ্রহণ করতে হয়। যৌবন ইন্দ্রিয়ের দাস নহে, ইহা কর্মের মহোৎসব, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক,—

গ্রহাচার্য—বার্ধক্য হতে যৌবন কোন অংশে হীন নয়, বরং শ্রেষ্ঠ। বার্ধক্যের প্রেম এক ঈশ্বর; যৌবনের প্রেম পত্নী, পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, নদ, নদী, ফল, ফুল, অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত প্রসার—অনন্ত হয়ে ছড়িয়ে। বার্ধক্য চায় আত্মত্রাণ;

যৌবন জগৎ নিয়ে উন্মত্ত। বার্ধক্য জল; যৌবন অগ্নি, সব শুষ্ক করে—সলিলের যা সাধ্যাতীত। তবে যে তাতে গৃহ দগ্ধ হয়, সে শুধু গৃহীর কর্মফল।···সতেজ সব-ইন্দ্রিয় ব্যতীত ঈশ্বর লাভ হয় না, শুষ্ক প্রাণে এ রসের আস্বাদ চলে না; ত্যাগীর প্রেমের রাজ্যে অনধিকার। ঈশ্বর প্রেমময়—ঈশ্বর চির নবীন—তাঁর যত মূর্তির যত ধ্যান—সব নবযৌবন সম্পন্ন। (১ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)। গ্রহাচার্য ছদ্মবেশী সূর্য। পুত্রদ্বয়ের প্রতি জীবনের অবসান কল্পে মর্তে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাট্য কাহিনীর মূল লক্ষ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যজ্ঞাহুতির অংশ লাভ। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গ্রহাচার্য নানা ঘটনার মধ্য দিয়া নাট্য কাহিনীকে অগ্রগতি দান করিয়াছেন। গ্রহাচার্য নাট্যকাহিনীর চালক চরিত্র। তিনি যৌবনের জয়গান করিয়াছেন চ্যবন মুনিকে প্রকৃত সংসারী করিয়া কার্যোদ্ধার করিবার জন্য। শর্যাতি পুত্র আবর্তের স্ত্রী দক্ষিণা চরিত্রটি বাৎসল্য ভাব লইয়া অঙ্কিত হইয়াছে। দেবরপুত্র মাতৃহীন 'চঞ্চলের' প্রতি তাহার অগাধস্নেহ। দ্বারবতীর সম্রাট পুত্র সেনাপতি 'আনর্ত' বীরত্ব ও মাতৃস্নেহের আধার। দ্বারবতীর করদ রাজা বারিদসিংহের বীরত্ব, বিপন্ন রক্ষায় উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান হীনতা এবং আত্মত্যাগ ইন্দ্রকেও মুগ্ধ করিয়াছে। তাহার এই উদারতামূলক হৃদয় বৃত্তির নিকট সমাজগত বৈষম্য দৃষ্টি সম্পন্ন ইন্দ্র পরাজিত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেব সমাজে তুলিয়া লইলেন। নাটকে হাস্যরস পরিবেশনের জন্য চ্যবন-শিষ্য 'সেবক রাম' চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। সূর্য পুত্র 'কাল' ছদ্মবেশে রুদ্রানন্দস্বামী হইয়াছেন। এই চরিত্র সংগীতের জন্য নাটকে আনা হইয়াছে। রুদ্রানন্দ গানে গানে কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা যোগায়—অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। নাট্যকার রচনার মধ্য দিয়া শরণাগতকে আশ্রয় দান, সতীধর্ম মাহাত্ম্য, ব্রহ্মশক্তি ও যৌবনের জয়গান প্রচার করিয়াছেন। আদি, বাৎসল্য, বীর ও ভক্তিরস নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে।

কালচক্র—ক্ষত্রিয়রাজা বিশ্বামিত্রের ঐকান্তিক সাধনায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ এবং বশিষ্ঠের সত্যনিষ্ঠা ও ক্ষমাশীলতাকে অবলম্বন করিয়া এই পৌরাণিক নাটক রচিত হয়। গণেশ অপেরায় অভিনীত এই নাটক রৌদ্র, করুণ, শান্ত ও ভক্তিরস প্রধান। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ড হইতে ইহার কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে।

জগদ্ধাত্রী—জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া জগজ্জননীর কাছে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব হয়—এই ভাব অবলম্বনে পৌরাণিক

নাটকখানি রচিত হইয়াছে। উদার ও ভক্ত করীন্দ্রাসুর এই মনোভাবাপন্ন হইয়া জগদ্ধাত্রীর কৃপালাভে সমর্থ হইয়া ছিলেন। বীর ও ভক্তিরস প্রধান এই যাত্রা নাটকও গণেশ অপেরা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হয়।

গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত হইবার জন্য 'নরকাসুর' (১৯২৪), 'জরাসন্ধ' ও বজ্রসৃষ্টি নামক পৌরাণিক নাটকত্রয় এবং 'অজাতশত্রু' নামে একখানি ঐতিহাসিক নাটকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাহার রচিত 'প্রিয়ব্রত' নাটক শশিভূষণ অধিকারীর গ্রাণ্ড অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়। ভোলানাথ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রাণে প্রাণে' নামে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ

তিনি বাঁকুড়া জিলার বেলতা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যাত্রা নাটক রচনা করেন। যাত্রায় হাস্যরসের অবতারণা করা নিতান্ত প্রয়োজন ; এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সাধারণত ভাঁড়ামির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। রামদুর্লভের হাস্যরস অনেকটা এই দোষমুক্ত। তাহার নাটকের ভাষাও অনেকটা সরল। নাট্য রচনায় সঙ্গীতের উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেন। যতদূর জানা যায় 'পুষ্কলমোচন' (১৯১৮) তাহার প্রথম নাট্য রচনা। রামদুর্লভ রামকিঙ্কর তর্করত্নের সংস্কৃত-ছাত্র। কৃতজ্ঞতার স্বরূপ তিনি 'পুষ্কলমোচন' তাহাকে উৎসর্গ করেন।

পুষ্কলমোচন (১৯১৮)—পদ্মপুরাণের রাজা বীরমণি কর্তৃক শিবের তপস্যা ও বরলাভ এবং রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব ধরিবার ফলে রামের ভ্রাতুষ্পুত্র পুষ্কলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাটকের মূল ঘটনা। ইহা দৃশ্য বিভাগহীন আটটি অঙ্কে বিভক্ত। প্রস্তাবনার পরে নাট্যারম্ভ হইয়াছে। ইহাতে গণের গান, যাত্রা ব্যালে, জুড়ির গান প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। তাহার 'পুষ্কলমোচন' ও 'সহস্র স্কন্ধ রাবণ বধ' নাটকের কাহিনী সাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নহে।

ভীষ্মবিজয়—মহাভারতের কাহিনী লইয়া এই নাটকখানি রচিত হয়। ভক্তি ও বীর রসাত্মক এই নাটকে পরশুরাম ও ভীষ্মের যুদ্ধকাহিনী মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে। যাত্রানাট্যে কাপালিক চরিত্রে বীভৎস ভাব ও ষড়যন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নাটকে প্রতিহিংসা

পরায়ণা নারীর মর্মজ্বালা ও কর্মপ্রবণতা লইয়া অম্বা চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। ইহা যামিনী ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত হয়।

✓ মহারণে রামানুজ (১৯২১)—রামায়ণের লঙ্কা কাণ্ড হইতে নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকে আদি, বীর ও ভক্তি রস প্রাধান্য পাইয়াছে। নাটকটি সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হয়। প্রথমে একখানি সঙ্গীতে নাটকের প্রস্তাবনা করা হইয়াছে। এই গানে বিঘ্ন বিনাশন রামচন্দ্রের শরণ লওয়া হইয়াছে; ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় ষাট। নাটকে রাবণ, বিভীষণ, মন্দোদরী, সরমা, সীতা, রাম প্রত্যেকের জন্যই সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

রাবণ—অহো! মর্মস্থল ছিন্ন হও, শ্রবণ শক্তি বিলোপ হও, নয়ন অন্ধ হও, প্রাণ বহির্গত হও। আমার এই জ্বালাময়ী ঘটনা দেখতে থেকো না। হায়! আমার ভাগ্যে এই ছিল।

গীত

"হায় এ কি হল কি ঝড় উঠিল
তরি ডুবে গেল ডুবিলাম অগাধে।

ভাগ্য বিপর্যয়, একিরে উদয়, আমার সব বল ক্ষয় শেষে গো অগাধে॥

এই সকল গান জুড়ি দ্বারা গাওয়ান হইত বলিয়াই মনে হয়। এই নাটকে গণের গানও রহিয়াছে। ভক্ত রাবণ তাহার গুপ্ত কৌলপীঠস্থানে রামচন্দ্রকে নিরস্ত্র অবস্থায় আগমনের জন্য আহ্বান জানাইলেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে পথ দেখাইয়া পীঠমঞ্চে লইয়া গেলেন। সঙ্গে লক্ষ্মণ গেলেন রামের রক্ষার জন্য! অদ্বিতীয় মহাপুরুষ শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট ভক্ত রাবণ রামচন্দ্রকে নানা আভরণে ভূষিত করিয়া অন্তরের ভক্তি নিবেদন করেন। লক্ষ্মণ রাবণকে ভুল বুঝিয়া হিংসা ভাব মনে লইয়া কুক্ষিমধ্যে জৃম্ভকাস্ত্র লুকাইয়া এই পবিত্র পরিবেশে গমন করেন। ইহাতে ভক্তের নিকট রামচন্দ্র ছোট হইয়া গেলেন। তাই লক্ষ্মণকে তিনি অভিশাপ দিলেন,—"রাবণের মহাশক্তি পূজায় তুই যেমন মহাশক্তির অবমাননা করলি, তেমনি মহাশক্তি অস্ত্রে তোর মহাশক্তি বিলুপ্ত হবে" (২য় গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)। ইহার ফলেই রাবণের সঙ্গে মহারণে লক্ষ্মণকে পরাজিত হইতে হয়। নাটকে রাবণ চরিত্রে বীর, করুণ ও ভক্তিভাব লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অস্ত্রহীন মেঘনাদকে অস্ত্র দিয়া সাহায্য

করেন এবং যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। ইহার মধ্যে লক্ষ্মণের অধিক বীরত্ব প্রমাণিত করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে। নাটকের চরিত্রগুলি আকর্ষণীয় হইয়া উঠে নাই; ঘটনা সংস্থাপনেও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

বাচস্পতি (১৯২২)—অষ্টম শতাব্দীর অদ্বৈতবাদী এবং ষড় দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের শেষ জীবন লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। সদাশিব রচিত 'মহাদেব তন্ত্রে' শনিমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বাচস্পতি ও বীর সেনের শনিপীড়া বর্ণনা এবং মহামহোপাধ্যায় কেদারনাথ বিদ্যাবাচস্পতির 'শনৈশ্চর সিন্ধুরাজচরিত' নামক তন্ত্রোক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে নাটক রচিত হইলেও রচনায় বাচস্পতি মিশ্রের সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তী ও পরিহার করা হয় নাই। সিন্ধুরাজ বীরসেনের সঙ্গে কিরাতরাজ মিহিরচাঁদের কন্যা বীরার মিলনের জন্য পঞ্চাঙ্ক নাটকের শেষে একটি মিলনাঙ্ক সংযোজিত হইয়াছে। 'বীরসেন' শিবাংশে এবং 'বীরা' শক্তি-অংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বাচস্পতি রূপে অবতীর্ণ দেবগুরু বৃহস্পতি উভয়ের মিলন ঘটাইয়া নিজধর্ম সম্পূর্ণ করেন। ইহার পর লক্ষ্মীনারায়ণ তাহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। নাটকে আদি, বীর, বাৎসল্য করুণ, বীভৎস ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পাণ্ডিত্য, ভাবগাম্ভীর্য, ধৈর্য ও ভক্তিভাব লইয়া 'বাচস্পতি' চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। সিন্ধুরাজ সেনাপতি শূর সেনের দেশপ্রেম ও কম্বোজপতির পুত্র সেলিহানের হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যের প্রচেষ্টা তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যান্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এই নাটকে নাট্যকারের যুগচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কম্বোজপতি অত্যাচারী, লম্পট ও পররাজ্যলোভী। কিন্তু সেলিহান বীর, উদার ও ন্যায়পরায়ণ। তাই পিতার হিন্দু-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাইয়াছে—"পিতা, একবার হিন্দু মুসলমানের শত্রুতা মুছে দিয়ে হৃদয়ে হৃদয় মিশিয়ে দেখুন, এমন শান্তি অমন পবিত্রতা দুনিয়ায় আর কোথাও মিলবে না।" (৫ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)। ভক্ত ও প্রজাপালক সিন্ধুরাজ বীরসেন শনির প্রকোপে পড়িয়া রাজ্য হারা হইয়া অশেষ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করিবার কালে শনির প্রভাবে পুত্র হত্যায় উদ্যত হলেন। শনির প্রকোপ শেষ হইলে কিরাত রাজের সাহায্যে তিনি স্বরাজ্য উদ্ধারে সক্ষম হইলেন। বীরাচারী 'ভৈরবনাথ কাপালিক' (ছদ্মবেশী শনি) চরিত্রে বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে। সিন্ধুরানী হেমলতা মাতৃত্ব ও বাৎসল্য রসের আধার। কিরাত রাজ মহিমচাঁদের কন্যা বীরা চরিত্র বীরাঙ্গনা রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বীরা সম্মুখ সময়েও পশ্চাদপদ নহেন। তাই বীরসেনকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার শত্রু কম্বোজপতিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন ;—

কম্বোজপতি—চমৎকার রমনী! তুমি ভীষণ—তুমি সুন্দর! তোমার এ বীরত্ব উপভোগ করবার। এস—এস সুন্দরী। এস আদরিনী। তোমার সহায়তায় আমি দুনিয়া জয় করে একটা বেহেস্ত সৃষ্টি করি। (আলিঙ্গনোদ্যত হইয়া বাহু প্রসারণ)

বীরা—সাবধান—কামান্ধ, কুকুর!
অস্ত্র ধর, বুঝহ সংগ্রামে।
পার যদি বিজয় লভিতে,
যবনের ইতিহাসে রহিবে গৌরব,—
নয় কম্বোজের ছিন্ন মুণ্ড লয়ে
কিরাত-নন্দিনী খেলিবে গেণ্ডুয়া। (৯ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)

নাটকের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে বৃহস্পতি বাচস্পতিরূপে সিন্ধুদেশে অবতীর্ণ হইয়া লুপ্ত বেদাদিশাস্ত্র উদ্ধার করিয়া শিক্ষাবিস্তারে এমন বিভোর হইয়াছেন যে স্বর্গের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই শনৈশ্চরের প্রভাবে তাহার কর্ম সমাপন করাইয়া তাহাকে স্বর্গে ফিরাইয়া লইবার জন্য নারায়ণ ব্যস্ত হইয়াছেন। কর্ম সমাপনান্তে তাহাকে স্বর্গে যাইতে হয়। প্রস্তাবনায় নাটকের এই মূল বিষয়টি প্রকাশিত হইয়াছে।

সিন্ধুরাজকুমার মধুমঙ্গল নাটকের একানে বালক চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্য দিয়া ভক্তি ও করুণ রসের সঞ্চার করা হইয়াছে। ইহার গানের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। গণের গান ও যাত্রা-ব্যাঙ্গে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাটকখানি 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজে' অভিনীত হয়।

মহামায়া (ঘোরাসুর)—পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের ৭৫তম অধ্যায় হইতে নাটকের মূল কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে। বিষ্ণুভক্ত ঘোরাসুরের অত্যাচারে দেবগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। অত্যাচারীকে নিধন করিবার জন্য মহামায়ার প্রভাবে ভক্ত নারদ তাহাকে মত্তপ করিয়া তুলিলেন। বিন্ধ্যপর্বতে অপূর্ব অনিন্দ্য সুন্দরী নারী রূপে বিরাজমানা মহামায়ার কাছে নারদ নারীলোলুপ দৈত্যরাজকে লইয়া গেলেন। কামনা চরিতার্থ করিবার বাসনায় লুব্ধ ঘোরাসুর মহামায়া দেবী ভগবতী কর্তৃক নিহত হইলেন। ইহাই নাটকের মূল ঘটনা।

সহস্রস্কন্ধরাবণ (১৯২৬)—অদ্ভুত রামায়ণের [১]ত্রয়োবিংশ সর্গের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত হয়। নাটকটি দৃশ্য বিভাগহীন আট অঙ্কে সমাপ্ত। প্রস্তাবনার শেষে নাট্যারম্ভ হইয়াছে। দধি সমুদ্রের অন্তর্গত পুষ্করদ্বীপের অধিপতি সহস্রস্কন্ধ রাবণ লঙ্কার রাজা রাবণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাতামহ—মাল্যবানের নিকট লঙ্কার ধ্বংসকাহিনী শুনিয়া শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদনের প্রতিশোধ লইবার জন্য অযোধ্যাপতি রামের সঙ্গে যুদ্ধ, এই নাটকের মূল বিষয়। সীতাকে আদ্যাশক্তির অবতাররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। রামায়ণের সীতা আর এই সীতা চরিত্রে পার্থক্য রহিয়াছে। পতিপ্রেমিকা সেই শান্ত-স্নিগ্ধা সীতা এখানে কর্মচঞ্চল। সীতার কর্ম প্রবণতার ফলে সহস্রস্কন্ধ রাবণের জীবন নাট্যের সমাপ্তি ঘটে। সীতা নানা মূর্তিতে রাবণের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলে শক্তিধর রাবণও ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়েন,—

রাবণ—এ কি রমণী হলে আবার পুরুষ
নব জলধর কান্তি শ্যামঅঙ্গ আভা।

* * *

[২]প্রচণ্ড খর্পর খাণ্ডা ধরিয়া স্বকরে
শ্যামা দিগম্বরীরূপে নাচিতে নাচিতে
গলদ্রক্ত ধারা বহিছে চৌদিকে। (৭ম অঙ্ক)

সীতা অসিতারূপে (কালীরূপে) রাবণের হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করেন,—

সীতা—আমি হইয়াছি সীতা অসিতা মূরতি। (৮ম অঙ্ক)

বিশ্রবামুনির সঙ্গে হনুমানের দ্বন্দ্ব ঘুচাইবার জন্য রামও একবার নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করেন। সীতা রামের রঙ্গলীলা-মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য রামবিদ্বেষী রাবণের পাপমুক্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চিরাচরিত কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া সীতা-রামকে নূতনভাবে উপস্থাপিত করিবার জন্যই নাট্যকার অপ্রচলিত অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী লইয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। ভরত চরিত্র মাতৃভক্তি ও বীরত্বে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে।

১। শিরাংসি রাবণস্যাশু নিমিষান্তরমাত্রতঃ। খড়্গেন তস্য চিচ্ছেদ সহস্রাণি হি লীলয়া। ২৩। ১৩ অদ্ভুতরামায়ণ।

২। ননর্ত জানকীদেবী ঘোরকালী মহাবলা। তদাচকম্পে পৃথিবী নৌরিবানিল চালিতা। ২৩। ৬৩ অদ্ভুতরামায়ণ

রাবণপুত্র বিরাধের মধ্য দিয়া ভক্তিরস ফুটাইবার জন্য নাট্যকার তাহাকে রামভক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। নাটকে শিব, যম, ভরত, হনুমান, বিভীষণ, রাবণ ও তাহার পত্নী সুলোচনার জন্য জুড়ির গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও ভক্তিরস প্রধান নাটক। নাটকখানি যামিনী ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত হয়।

ভুবনেশ্বরী—কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বিনাশ সাধনের জন্য প্রহ্লাদের অলৌকিক ভক্তিবলে স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাবের কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। দেবী ভাগবতেও এই কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। নাটকখানি নিউ শঙ্কর অপেরা ও ভোলানাথ অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়। ইহা রৌদ্র, করুণ ও ভক্তিরসের নাটক।

সত্যভামা (১৯৩০)—ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় চল্লিশ। ইহাতে কৃষ্ণসঙ্গীগণ, রাখাল সখাগণ, রাখালগণ প্রভৃতির জন্য গণের গানও সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বারকাপতি কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার পরীক্ষা নাটকের মূল বিষয়। কৃষ্ণ-প্রেমমূলক একটি গানে নাটকের প্রস্তাবনা অংশ সমাপ্ত হইয়াছে। নাট্যকার দেখাইয়াছেন যে দ্বারকার রানী অপেক্ষা বৃন্দাবনের গোপিনী ও গোপগণই প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। পরীক্ষার জন্য বৈদ্যরাজ অসুস্থ কৃষ্ণকে পদরজ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের বিধান দিলেন। এই ব্যবস্থা ছাড়া কৃষ্ণকে সুস্থ করিবার অন্য উপায় নাই। সত্যভামার পক্ষে এই কাজ সম্ভব হইল না,—

সত্যভামা—ওগো! তোমরা যে ছিনালি আরম্ভ করলে গো। বলি স্বামীকে কেউ কি পায়ের ধুলো দিতে পারে, না উচ্ছিষ্ট দিতে পারে। পতি যে পরম গুরু, মাগো মা, কি সব ছিনালের দল। (২য় দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)। কিন্তু ব্রজবাসীরা রাধার পদরজ ও উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণকে দিয়া তাহার রোগমুক্তির ব্যবস্থা করেন। কারণ "ব্রজ গোপীরা এমন সংকীর্ণ ভালবাসা রাখে নাই যে সঙ্কোচ বোধ করবে। ব্রজবাসীর হৃদয় উন্মুক্ত" ললিতা—২য় দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)। এই-ভাবে নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে প্রেমের দিক হইতে কৃষ্ণ চিরকালই ব্রজবাসীর। ইহা শৃঙ্গার ও ভক্তিরসপূর্ণ নাটক। শিশুপাল, জরাসন্ধ ও ভীম চরিত্রে বীর রসের অবতারণা করা হইয়াছে। 'ইকিরমিকির' ও 'মটরু' চরিত্র-দ্বয় হাস্যরস পরিবেশনের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে। নাটকখানি অত্যন্ত শিথিল বন্ধ ও ক্লান্তিকর। ইহা সত্যেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হয়।

তিনি 'পাঞ্চালী' (১৯২৩) ও 'ভার্গব বিজয়' (১৯২৬) নামে আর দুইখানি নাটক রচনা করেন। পরশুরামের নিক্ষত্রিয় করণের কাহিনী লইয়া 'ভার্গব বিজয়' রচিত হইয়াছে। ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ১৫শ-১৬শ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে; বীর ও করুণ রসাত্মক এই নাটক গণেশ অপেরা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হয়।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জিলার সোনামুখী গ্রামে তাহার পৈত্রিক নিবাস ছিল। মন্মথমোহন বসুর কাছে তাহার নাট্যরচনার হাতে খড়ি হয়; ইহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত তাহার 'পিয়ারে নজর' নাটক (১৩২৩ সাল) মন্মথবাবুর নামে উৎসর্গ করেন—"নাট্যরচনায় যাহার কাছে আমার হাতে খড়ি সেই গুরূপম শ্রদ্ধাস্পদ, সাহিত্যানুরাগী প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম. এ মহোদয়ের করকমলে এই ক্ষুদ্র নাটকখানি উৎসর্গ করিলাম।" (পিয়ারে নজরের উৎসর্গ অংশ)। নাট্যকার পৌরাণিক, ভক্তি-মূলক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার আধিক্য, দেশপ্রীতি ও হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যের পরিচয় রহিয়াছে। তাহার নাটকে জমিদার ও সমাজপতিদের অত্যাচারও তুলিয়া ধরা হইয়াছে। পাঁচকড়ি বাবু নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার সংলাপ যোজনা করিয়াছেন; সংলাপের ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে তিনি সারল্য ও মাধুর্য্যের প্রতি নজর রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাট্যকার তাহার নাটকে উত্থাপিত সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। অনেক স্থানে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন।

শিবশক্তি—ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। ব্যাসদেবের মহাভারতের বন-পর্বের ১৬৭তম-১৭৪তম অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে। উর্বশীর প্ররোচনায় দৈত্যরাজ নিবাত স্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবরাজকে বিব্রত করিয়া তোলেন। এই বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ইন্দ্রকে মর্তের মানুষ অর্জুনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশুপত অস্ত্রের সাহায্যে অর্জুন দৈত্য রাজকে নিহত করিয়া সুরপতির রাজ্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। দৈত্যরাজ নিবাত, তৎপুত্র সুন্দর ও অর্জুন চরিত্রে বীরত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নারী জনোচিত সুকোমল বৃত্তি এবং প্রেম অবলম্বনে দৈত্য-কন্যা সুনন্দা চরিত্র

রূপায়িত হইয়াছে। গন্ধর্বরাজ চিত্রধ্বজ চরিত্রে পৈশাচিক বৃত্তির সমাবেশ করা হইয়াছে। নাটকখানি শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস ও ভক্তি রস মূলক। ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ।

দ্বিজদস্যু—এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সমাজের অবিচারে ব্রাহ্মণ সন্তান অজামিলের দস্যুতে পরিণত হইবার কাহিনী নাটকে অবলম্বিত হইযাছে। ছিদ্রান্বেষী নিষ্ঠুর সমাজপতি ন্যায়রত্ন ও শিরোমণি সতীত্বনাশের মিথ্যা অপবাদ দিয়া অজামিলের সতী স্ত্রী সাবিত্রীকে সমাজচ্যুত করেন। ইহার ফলে সাবিত্রী ও অজামিলকে অশেষ লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয়। অবিবেচক হৃদয়হীন সমাজপতিরা যে একসময়ে বঙ্গসমাজে অত্যাচার চালাইয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেন নাটকে তাহারই পরিচয় রহিয়াছে। উচ্চ সমাজের লোক অপেক্ষা নিম্ন সমাজের মানুষের মধ্যে নাট্যকার অনেক সদ্‌গুণের সন্ধান পাইয়াছেন। সামাজিক অত্যাচারের ফলে নিষ্ঠাবান অজামিল উচ্চ সমাজ ছাড়িয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে নিম্ন সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে আসিয়া অবহেলিত মানুষের মনুষ্যত্ব বোধের পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হইলেন। দস্যু অজামিলকে বাঁচাইবার জন্য ভীল বন্ধু বসন্তক নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়াও কান্যকুব্জরাজ প্রসেনজিতের বন্দিত্ব গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কান্যকুব্জরাজ-কন্যা মঞ্জুলিকা বসন্তকের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন। ভীলকন্যা ফুলিয়া বসন্তককে ভালবাসিত। বসন্তক রাজপুরবাসী হইলে ফুলিয়ার জীবন বার্থ হইবে ভাবিয়া মঞ্জুলিকা তাহার প্রেমের মর্যাদা দিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি ফুলিয়াকে সপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। নারীর পক্ষে স্বেচ্ছায় সপত্নী গ্রহণের দৃষ্টান্ত বিরল। মনে হয় এই পরিকল্পনায় পাঁচকড়ি দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হেলেন'ও 'ছায়ার' দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাকে স্বেচ্ছায় সপত্নীরূপে গ্রহণ করেন,—[১]"হেলেন—এস বোন, আমরা দুই নদী একই সাগরে গিয়ে লীন হই। সূর্যকিরণ ও বৃষ্টি মিলে মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা করি। কিসের দুঃখ বোন—একই আকাশে চন্দ্র সূর্য ওঠে নাকি এস বোন—" (৫ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)। ইহা শৃঙ্গার, বীর, করুণ ও ভক্তি রস প্রধান নাটক।

জয়মাল্য (১৩৩২)—এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি কাশীরাম দাসের

১। চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯১১

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। যাত্রা ডুয়েট ও যাত্রা ব্যালে সহ ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ। মণিপুর সেনাপতি দুর্জনসিংহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বন্দ্ব দেখাইবার জন্য নাট্যকার সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি নামক রূপক চরিত্রদ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ইহারা দুর্জনসিংহের মানসিক রূপের পরিচায়ক। সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি গানে ও কথায় তাহাদের বক্তব্য পরিবেশন করিয়াছে। জগা পাগলা গানে গানে দুর্জনসিংহকে বিবেকের বাণী শুনাইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরায় মণিপুররাজ বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত উলূপীর সাহায্যে নাগলোক হইতে আনীত মণির স্পর্শে পরাজিত ও নিহত অর্জুনের পুনর্জীবন লাভ ঘটে। অর্জুনের প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্য পরায়ণতা লইয়া নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীর চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। বভ্রুবাহনের রাজোচিত বীরত্ব ও পিতৃভক্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যশেষে একটি ক্রোড়াঙ্ক সংযোজিত হইয়াছে। এই অংশে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির আবির্ভাব দেখান হইয়াছে। লোকরঞ্জনের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিবার ফলে ইহাতে অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশ দেখা দিয়াছে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

নটীর অভিশাপ—কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রাব্যালে ও গণের গানসহ ইহার গীতিসংখ্যা বিশের অধিক। কলম্বাসুর ইন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। দেবতাগণ বহু চেষ্টা করিয়াও যখন তাহাকে স্বর্গ হইতে বিতারিত করিতে পারিলেন না তখন তাহারা অর্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। অর্জুন পাশুপত অস্ত্রের সাহায্যে দৈত্য-রাজকে নিহত করিলেন। আনন্দিত দেবরাজ স্বর্গে দৈত্য-বিজয়োৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। উৎসবে নৃত্যরতা উর্বশী অর্জুনকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া প্রেম নিবেদন করেন। অর্জুন স্বর্গনটীর প্রেম গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় উর্বশী তাহাকে ক্লীবত্ব প্রাপ্তির অভিশাপ দান করেন। নাটকে এই কাহিনী বিধৃত হইয়াছে। অর্জুন ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে রক্ষীরা তাহাকে বাধা দান করে। অর্জুন জরাসুরের সাহায্যে স্বর্গরক্ষীদের দেহে রোগ ছড়াইয়া যুদ্ধে তাহাদের পরাস্ত করিয়া বাসবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইলেন। দেবরাজ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করায় পরাস্ত দেবতারা অসন্তুষ্ট হইয়া কার্তিকেয়র অধিনায়কত্বে ধর্মঘট করিতে মনস্থ করিলেন ;—

কার্তিকেয়—অন্যায়ের প্রতিকার হেতু
আছে পন্থা এক—নাহিক দ্বিতীয়।
সর্বক্ষেত্রে অসহযোগ মূল মন্ত্র ধরি
হও যদি অগ্রসর হে অমর কুল,
প্রতিকার হবে সুনিশ্চয়!

দেবগণ—ঠিক ঠিক! আমরা ধর্মঘট করবো—আমরা ধর্মঘট করবো।

(৫ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

নাট্যকার সমসাময়িককালে অনেক ধর্মঘট দেখিয়াছেন। নাটকে তাহারই প্রভাব পড়িয়াছে। শনৈশ্চর চরিত্রটি হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। দুইটি বিবাহ করিলে যে জীবনে অনেক অশান্তি পাইতে হয় কশ্যপ চরিত্রে তাহারই পরিচয় রহিয়াছে। দৈত্যপতি কলম্বাসুরের বীরত্ব আছে, নারীর সতীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং লক্ষ্মীর প্রতিও অচলা ভক্তি আছে। তিনি প্রজা দরদী কর্তব্যপরায়ণ সম্রাট; তাই তাহাদের মধ্যে অন্নাভাব দেখা দিলে রাজপুরীর সমস্ত নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি প্রজাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। কশ্যপ পত্নীদ্বয় অদিতি ও দিতির মধ্যে সপত্নী বিদ্বেষ এবং আপন আপন সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। গন্ধর্ব নন্দিনী মানসী ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের প্রেমে ব্যর্থ হইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য দানব মহিষী হইলেন। কিন্তু প্রতিহিংসা দুরীভূত হওয়ার তিনি পতি-প্রেমিক নারী ও প্রজা-দরদী রানীতে রূপান্তরিত হইলেন। ভক্তি, রৌদ্র, হাস্য, বাৎসল্য রস থাকিলেও ইহা বীর ও শৃঙ্গার রসপ্রধান নাটক।

চাঁদ সদাগর (১৩৩৭)—এই পঞ্চাঙ্ক ভক্তিমূলক নাটকখানি শশিভূষণ হাজরার শান্তি অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রাব্যালে. যাত্রাভুরেট গণের গান সহ নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় তেইশ।

নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। চাঁদসদাগরের স্ত্রী মেনকার মধ্যে কোন ব্যক্তিত্ব নাই। সাধারণ বঙ্গ ললনার মত স্বামীর প্রতি ভালবাসা, সন্তান-স্নেহ ও ভক্তিভাব অবলম্বনে এই চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। মাতৃস্নেহ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি গোপনে মনসাপূজা করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। নৃত্য পটীয়সী বেহুলা চরিত্রে গভীর পতি-প্রেমের দিকটি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কর্মপ্রবণতার দিক হইতে মনসার সহচরী

নেতা নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। চাঁদের মহাজ্ঞান মণিহরণ, ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটানো, সপ্তডিঙ্গা ডুবানো, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর চন্দ্রধরের লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রভিক্ষা করানো, ধন্বন্তরির মৃত্যু ও বিবাহ বাসরে লখীন্দরের প্রাণনাশ ইত্যাদি যাবতীয় কর্মের ব্যবস্থা নেতাকে করিতে হয়। মনসা মর্তে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। এই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি নীরবে শত অপমান সহ্য করিতেও রাজী। চন্দ্রধরের হস্তে পূজা গ্রহণ করিতে না পারিলে মনসার মর্তে প্রতিষ্ঠা লাভ অসম্ভব। শৈব চন্দ্রধর অনার্য নাগ-অধিশ্বরীকে কোনমতেই পূজা করিতে সম্মত নহেন। সুতরাং প্রতিহিংসার উন্মাদনায় মনসা অনেক সময় আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার চরিত্রে দেবত্ব ও নারীত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। চন্দ্রধরের কাছে মনসা পরাজিত।

ধর্মপথ—ইহা পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। সুরেন্দ্রনাথ সাহার দলে নাটকটি অভিনীত হয়। ইহার গীতি সংখ্যা ত্রিশের অধিক। জেলে জেলেনীর আদি রসাত্মক যাত্রা ডুয়েট, ব্যালে প্রভৃতি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। জেলে চরিত্রকে ক্ষীণ ভাবে নাটকের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ সমাজের অবিচারে মুসলমান কালাপাহাড়ে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দু বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। কালাচাঁদের এই রূপান্তর কাহিনী ও অত্যাচার নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। সমাজপতি ও জমিদারের অত্যাচার হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য এবং ধর্মবিদ্বেষ দূর করিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটক রচিত হইয়াছে। সমাজপতিদের অবিচার অত্যাচারের কাহিনী 'দ্বিজদস্যু' নাটকে ও নাট্যকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। অত্যাচারী জমিদার 'নরেন্দ্রনারায়ণ' সমাজপতি 'ন্যায়চঞ্চু' ও 'তর্কচঞ্চু'র সহায়তায় দেশে যে ব্যভিচারের স্রোত বহাইয়া দিলেন তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া কালাচাঁদ গৌড়ের নবাব সুলেমান সাহেবের দরবারে বন্দী রূপে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জমিদারের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায় কালাচাঁদ শক্তি, সাহস ও সত্যনিষ্ঠা বলে নবাবের সেনাপতি পদে বৃত হইলেন। সেনাপতির শৌর্যবীর্যে মুগ্ধ নবাবকন্যা 'দোলেনা' তাহার প্রেমাবদ্ধ, হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের মিলন অসম্ভব মনে করিয়া দোলেনা আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে নারী হত্যা বন্ধ করিবার জন্য কালাচাঁদ সংস্কার মুক্ত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। নাট্যকার এখানে ধর্মদ্বন্দ্ব-সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন,—

কালাচাঁদ—ধর্ম, রুচি, সংস্কার

কে বুঝিবে পার্থক্য কি বা কার!
তিন যেন হল হাহাকার

খুলে দাও জ্ঞানের নয়ন
নির্বিচারে সত্য ধর্মপথ। (৬ষ্ঠ দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

এই সমস্যার সমাধানে নাট্যকার বলিতে চাহেন যে আসলে সব ধর্মই সমান, মানুষ কেবল সঙ্কীর্ণতার জন্যই বিভেদ সৃষ্টি করে। মানুষের পক্ষে এই অকর্তব্যকে প্রশ্রয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে,—

নূরনীহার—ধর্মে ছোট বড় নাই সাহাজাদী, সব ধর্মই সমান; তবে সঙ্কীর্ণতা কেবল মনের ভানে (১ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)।

নবাবকন্যার সঙ্গে বৈবাহিক মিলনে কালাচাঁদ হিন্দু ধর্মাচরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। ইহার ফলে কালাচাঁদ হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন ও পৌরুষকে প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের উপর পীড়ন সুরু করিলেন; ক্রমে তাহার মধ্যে নাস্তিকতা দেখা দিল,—

কালাচাঁদ—ঈশ্বর কোথায়
স্বভাব সৃজিত বিশ্ব
ধ্বংসতার স্বভাব নিয়ম। (৪র্থ দৃশ্যের পরে দৃশ্যান্তর, ৫ম অঙ্ক)

কালাচাঁদ এখন কালাপাহাড়। মুসলমান ধর্মাবলম্বী কালাপাহাড় ([১] রাজু) হিন্দুধর্মবিরোধী অত্যাচারে মেদিনী কাঁপাইয়া তুলিল; এই অত্যাচার বঙ্গদেশ হইতে পুরীর মন্দির পর্যন্ত পৌঁছাইল। নাটকের শেষে কালাপাহাড়ের সম্বিৎ ফিরিয়া আসে এবং তিনি আস্তিক হইয়া উঠেন। ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বহুকল্পনা যুক্ত করিয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। দোলেনা প্রেমিকা, বিবাহিত জীবনে তিনি সেবা ও কর্তব্যপরায়ণতাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। নবাব সোলেমান (১৫৬৪—১৫৭২ খ্রীঃ) সুবিচারক, প্রজা দরদী, শৌর্য বীর্য ও ন্যায় নিষ্ঠার সম্মান দানে প্রয়াসী। নূরনীহার দোলেনার সহচরী, সাধারণ নারী হইলেও তাহার ধর্মবিদ্বেষহীন উদারতা ও মানবতাবোধ জাগ্রত রহিয়াছে। আদি, রৌদ্র, বীর, করুণ ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে।

1. Jalal Khan, Saiyid Huri, and Kalapahar whose name was Raju, now separated from Lodi, and divisions arose in Lodi's forces. Abul Fazal's Akbar Nama—Eng. Trans. By H M. Elliot & J. Dowson (3rd Edi. P. 42)

টিপু সুলতান (১৯৪৯)—ইহা অষ্টাদশ শতকের শেষের মহীশূর সুলতান টিপুর কাহিনী লইয়া রচিত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকেও কল্পনার আধিক্য রহিয়াছে। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন—"ঐতিহাসিক ঘটনার যতটুকু সম্ভব লইয়া তাহাতে রঙ ফলাইয়া এই নাটক লিখিয়াছি।" ইহাতে দেশাত্মবোধ ও হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য বোধ ধ্বনিত হইয়াছে। নাট্যকার প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। মহীশূর-শের হায়দর আলির দুই পুত্র, একজন সুলতান টিপু আর একজন করিমশাহ। ভ্রাতৃদ্রোহী ও দেশদ্রোহী করিমের বৈপরীত্যে ভ্রাতৃবৎসল দেশপ্রাণ টিপুর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বিধ্বংসী সংগ্রামপূর্ণ নাটকে টিপুর স্ত্রী রুনী বেগমের চরিত্র স্নিগ্ধতা লইয়া রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণাবাঈর মহাপ্রাণতা এবং সেনানায়ক মুসেঁলেলিনের (ফরাসী) রাজভক্তি ও যুদ্ধকৌশল চরিত্র দুইটিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। মুসেঁলেলিন চরিত্র রচনায় নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদের[১] 'রডা' চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই নাটকে গানের সংখ্যা কমিয়াছে। ইহার মূলে শ্রোতৃমণ্ডলীর রুচি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। পূর্বে ঐতিহাসিক নাটকেও প্রচুর গান সন্নিবেশিত হইত। ক্রমে গানের চাহিদা কমিতে থাকায় লোকনাট্যেও যুদ্ধোত্তরকালে গানের সংখ্যা বিশেষভাবে কমিতে থাকে। এই নাটকের গীতি সংখ্যা অনধিক পনের।

ভাণ্ডারী অপেরায় রভিনীত 'সপ্তরথী', শ্রীগৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সংঘে অভিনীত 'শম্বরাসুর', বীণাপাণি নাট্য সমাজে অভিনীত 'মানিনী সত্যভামা', শশিভূষণ হাজরার শান্তি অপেরায় অভিনীত ফুল্লরা-কালকেতুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'মা', সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত ভক্তিমূলক নাটক 'রামপ্রসাদ', বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত 'রাখীবন্ধন' (১৯২৫), সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত ঐতিহাসিক নাটক 'বেইমানের দেশ' এবং 'ভাস্কর পণ্ডিত' (১৯৩২) পালাগুলি নাট্যকার কর্তৃক রচিত হয়।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ (১৩০০-১৩৭৫)

হুগলী জিলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত গরলগাছা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৩০০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বর্তমান নিবাস সাঁতরাগাছি হাওড়া। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের পরে তিনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট কিছুকাল চিত্রাঙ্কন

১। প্রতাপাদিত্য, ক্ষীরোদপ্রসাদ, ১৯০৪

অভ্যাস করেন এবং গর্ভণমেণ্ট আর্ট স্কুল হইতে ড্রাপট্‌সম্যান্‌শিপ্‌ পাশ করেন। ফণিভূষণ দৃশ্যপট অঙ্কনেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সতের বৎসর বয়সে অযোধ্যাপতি অম্বরীষের কাহিনী লইয়া 'ক্ষত্রিয় গৌরব' (১৩১৭) নামে তিনি একখানি নাটক রচনা করেন। এই যাত্রা নাটক 'হৃষীকেশ সঙ্গীত সম্প্রদায়ে' অভিনীত হয়। পিতা রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে অভিনয় শিক্ষা করিয়া হাওড়া-শিবপুর বটকৃষ্ণ পালের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত সৌখিন যাত্রা ক্লাবে তিনি পিতার সঙ্গে অভিনয় করিতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে অভিনেতারূপে তিনি পেশাদারী যাত্রা-দলে যোগদান করিয়া লোকনাট্য রচনায় ব্রতী হইলেন। পেশাদারী যাত্রায় অভিনীত তাহার প্রথম নাটক 'পাষাণী'। ইহা তাহার জ্যেষ্ঠতাত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রামকৃষ্ণ নাট্য সমিতি' সংস্থায় অভিনীত হয়। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি অহল্যার কাহিনী লইয়া রচিত।

বাসুদেব (১৯২৬)—ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৬তম অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক ভাণ্ডারী অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। জনপ্রিয়তার জন্য নাটকখানির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় কুড়ি।

কৃষ্ণকর্তৃক নরকাসুর নিহত হওয়ায় দৈত্যরাজ পৌণ্ড্র বাসুদেব কৃষ্ণবিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং কৃষ্ণপূজার স্থলে দৈত্যরাজের পূজা প্রচলনের আদেশ ঘোষণা করেন। রাজ্যে কৃষ্ণপূজা বন্ধ হইলেও রাজপূজা প্রচলন সম্ভব হইল না। এ দিকে দ্বারকায় কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে পৌণ্ড্র বাসুদেব কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে অপহরণ করেন। সুতরাং অবিবেকী, অবিচারী, অত্যাচারী, দৈত্যরাজের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে বাসুদেবকে কৃষ্ণের হস্তে মৃত্যু বরণ করিতে হয়। কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাই রাবণের মত শত্রু রূপে কৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছেন ; কৃষ্ণকে পারের তরণীরূপে পাইবার জন্য মাতৃসম দেবী সত্যভামাকে তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন। ভক্তির জোরে দৈত্যরাজ পৌণ্ড্র বাসুদেব পরিণামে মুক্তিলাভ করেন। পৃথিবীতে মানুষ স্বকীয় কর্মফল ভোগ করে—ইহাই নাটকের মূল বক্তব্য। 'কর্মফল' চরিত্রের গানে গানে এই কথাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। অত্যাচারী 'ঘণ্টাকর্ণ' চরিত্রে বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহা বীর, করুণ ও ভক্তিরস প্রধান নাটক।

রামানুজ (১৯২৮)—কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অবলম্বনে এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রচিত হয়। ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত নাটকখানির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। সংগীত প্রধান এই নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। মর্তবাসী রামের গুণে মুগ্ধ। তাই রামহীন রাজ্য তাহাদের কল্পনাতীত। এদিকে পাতাল প্রবেশের পর সীতা দীর্ঘকাল রাম বিরহে মুহ্যমানা। সুতরাং স্বর্গেও রামের প্রয়োজন। দেবকুল রামরূপী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে নারায়ণী সীতার মিলন ঘটাইতে প্রয়াসী হইয়া উঠেন। ইহা লইয়াই নাট্য কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। সীতার পাতাল প্রবেশের পর কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা দেহত্যাগ করেন। রামচন্দ্র শোকোন্মাদ। এদিকে স্বর্গের দেবগণ রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া লইয়া বৈকণ্ঠের পূর্ণতা সাধন করিতে উদ্যোগী। মহাকাল রূপী মহেশ্বরের কৌশলে লক্ষ্মণ সরযূ গর্ভে বিসর্জিত হইলেন। রামচন্দ্র ভরত ও শত্রুঘ্নের হাত ধরিয়া সরযূর জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পরে বৈকুণ্ঠে চার ভাই একই মূর্তিতে সন্নিবেশিত হইলেন, সীতা-রাম লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠের শূন্যতা পূরণ করিলেন। সীতা-রামের মিলনের জন্য দেবগণের চক্রান্ত নাট্য কাহিনীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই কর্মে পৃথিবী ব্রহ্মা ও মহেশ্বর অগ্রণী হইলেন। লোকনাট্যে সাধারণতঃ নাট্যঘটনার মূল সূত্র প্রথমে প্রস্তাবনায় জানানো হয় এবং সেই অনুসারে নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠে কিন্তু এখানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নাটকে প্রস্তাবনা নাই। তৃতীয় অঙ্কে ত্রিদিববাসীদের কর্মসূচী নির্ধারিত হয় এবং তদনুযায়ী নাট্যঘটনা অগ্রগতি লাভ করিতে থাকে। প্রথম দুইটি অঙ্কে দেবতাদের কর্মসূচীর ভূমিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। নাট্যকার নাটকে একটি নূতন চরিত্রসৃষ্টি করিয়াছেন। এই চরিত্রটি ছায়া-সীতা। সীতা পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই নাট্যকার তাহাকে ছায়ারূপে নাটকে স্থান দিয়াছেন। ভবভূতি বিরচিত 'উত্তররামচরিত' নাটকের 'ছায়া নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ' হইতে নাট্যকার ছায়া সীতার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির [১]সীতা ছায়া রূপে রামচন্দ্রের অলক্ষে থাকিয়া তাহার দেহ স্পর্শ করিয়াছেন। রামচন্দ্র সে স্পর্শানন্দ অনুভব করিয়াছেন; ছায়া-

১। সীতা—অজ্জ উত্ত! ধরামি এব ধরামি।

রাম—আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈরন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতুন। সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়নকস্মাদানন্দাদপরবিধং তনোতিমোহম্॥ ৩৯ শ্লোক। ৩য় অঙ্ক, উত্তররামচরিত—ভবভূতি

সীতা সেখানে নিষ্ক্রিয় নহেন। 'রামানুজের' ছায়া সীতাও ক্রিয়াহীন নহেন। লবকুশের রক্ষার জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন। এই ছায়া সীতাও স্বামী-প্রেম ও পুত্রস্নেহের আধার। পৃথিবী মনে করিলেন, রামচন্দ্র লবকুশের স্নেহ মোহে সীতাকে ভুলিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তিনি লবকুশকে ধ্বংস করিয়া রামের মোহ ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু বাধা দিলেন স্নেহময়ী ছায়া সীতা। 'সুদর্শন' সীতার পরিচয় দিলে পৃথিবীর হাত হইতে লবকুশ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

পৃথিবী—কোথায় পালাবি লবকুশ অযোধ্যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোরা, তোদের রক্ত বিনা এ তৃষ্ণা মিটবে না। (লবকুশকে পুনর্বার আক্রমণ করিতে উদ্যত সহসা ছায়াসীতা আসিয়া পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইলে লবকুশ পলায়ন করিল)। কে তুমি ?

(গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ)

সুদর্শন—ওযে সীতা—ওযে সীতা,
রামের জায়া মায়া-কায়া ছায়ারূপে সীতা।
আপন রক্ত বিলিয়ে দিয়ে মা গড়েছে ছেলের প্রাণ,
কঠিন প্রাণে কালের হাতে মা কি দিবে এমন দান,
তাইমা এসেছে নিভিয়ে দিতে ছেলের মরণ-চিতা।
মা চিনে নেয় আপন ছেলে শতেক ছেলের মাঝে,
ছেলের দুঃখ সবার চেয়ে মায়ের প্রাণে বাজে,
ও লবের মা—কুশের মা—রামের সতী সীতা। [প্রস্থান]

(৩য় দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

নাটকে লক্ষ্মণ চরিত্রে ভ্রাতৃভক্তি, কর্তব্য ও ধর্মবোধ প্রাধান্য পাইয়াছে। সীতাহারা রামের ব্যাকুলতা, মাতৃহারা লবকুশের হাহাকার, ছায়া-সীতার আকুলতা, লক্ষ্মণ বর্জনে ঊর্মিলার বিলাপ সমস্ত লইয়া নাটকখানি করুণরস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। রামচন্দ্র অঙ্গীকারের পূজারী, ভ্রাতৃবৎসল ও সীতা প্রেমিক। সীতা বিরহে তাহার অন্তরের জ্বালাগ্নি অনির্বাপিত; অযোধ্যা তাহার কাছে তুচ্ছ মনে হইতেছে। বিরহী সীতা-পতি চিত্রশালায় অতীত জীবনের চিত্র দেখিয়া অন্তরাগ্নি নির্বাণের চেষ্টা করিতেছেন। এই সুযোগে সুদর্শন গানে গানে রামের পৃথিবী ত্যাগের প্রস্তুতি রচনা করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় নাট্যকারের উপর পণ্ডিত হারাধন রায়ের 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৩১১) নাটকের

প্রভাব পড়িয়াছে। এই 'লক্ষ্মণ বর্জন' নাটকের সপ্তম দৃশ্যে নিভৃত শয়নকক্ষে রামচন্দ্র সীতার ধ্যানে বিভোর,—

রাম—নির্জন আলয়ে বসি
জানকীরে আঁকিয়া হৃদয়ে—
কত কথা বলি প্রাণে প্রাণে ॥

তখন মায়া আবির্ভূত হইয়া গানের মধ্য দিয়া রামের মন বৈকুণ্ঠবাসী লক্ষ্মীরূপী সীতার প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলেন,—

আর কাঁদায়ো না দেবী কমলায়
গোলকে চলহ ভক্ত-রঞ্জন।

মূলভাবটি 'লক্ষ্মণ বর্জন' হইতে গ্রহণ করিলেও নাট্যকার ইহাকে অনেক বিশদ করিয়াছেন এবং ইহার জন্য অন্য পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। এই পরিবেশ রচনায় ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রথম অঙ্ক অবলম্বনে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' (১৮৬০)-এর প্রথম পরিচ্ছেদের আলেখ্য দর্শন অংশের অনুসরণ করা হইয়াছে। 'রামানুজ' লোকনাট্য হইতে এই পরিবেশের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

শ্রীরাম—ও কার চিত্র ?
মাতা কৌশল্যা দেবীর !
পরি চীরবল্কল বসন রাম যাবে বনে—
শুনি তাই হস্তে লয়ে আশীর্বাদ,
আকুল পরাণে করিছে রোদন !
নাহি কাঁদ স্নেহময়ী মাতা
এস অশ্রু তব দিব গো মুছায়ে।

(গীতকণ্ঠে সুদর্শনের প্রবেশ)

সুদর্শন—মায়ার অশ্রু মোছায়োনা প্রভু
মায়ায় ভুলিয়া থেকো না।
মায়া ছেড়ে, ছেড়ে নর কায়া
কে তুমি কোথা দেখনা।

শ্রীরাম—কি কহিছ শিল্পী, মিথ্যা অশ্রু ?
ও অশ্রু নহে মুছাবার—
মাত্র শিল্পের চাতুর্য ?

ভাল, পার্শ্বে তার ও কি শিল্পী ?
চতুর তৃষিত দৃষ্টি
নয়ন রঞ্জন স্বর্ণ-মৃগ এক
রহে স্থির অচঞ্চল,
দূরে রাম সীতা,
পার্শ্বে লক্ষ্মণ রামানুজ,—
রামে কহে সীতা ধরে দিতে মৃগ।
রাম, রামানুজ পুলকিত,
মুগ্ধ দোঁহে মৃগদরশনে !
ও--ওকিহে তোমারি অঙ্কিত শিল্পী ?
ভ্রম হয়, বল প্রাণ নাহি স্বর্ণ-মৃগে ?

(পূর্ব গীতাংশ)

সুদর্শন—প্রাণ চলে গেছে আছে শুধু স্মৃতি,
প্রাণ দিলে মিলে প্রাণের মূরতি,
প্রণ যদি চাও, আত্মপ্রাণ দাও,
প্রাণ রেখে ব্যথা পেওনা।

শ্রীরাম—কোথা প্রাণ ? প্রাণ যদি রবে,
হেন ব্যথা প্রাণে মোর ?
প্রাণ চলে গেছে। কীর্তিমান শিল্পী
রচিয়াছে স্মৃতিটুকু তার।
প্রাণমন আছে যার—
চিত্র দেখে চিত্ত তার দেখে প্রাণময়।
ওই—ওই অন্য চিত্ত এক—
চিতা-বহ্নি সম ধূধু জ্বলিছে অনল,
মধ্যে তার শুদ্ধ মতি
প্রেমময়ী সতী সীতা মোর !
অনলে নাহিক ভয়---
যুক্তপাণি ডাকে ভগবানে।
ত্রস্তভীত সবে অনলের দূরে
মুখে নাই ভাষা,

পুত্তলিকা প্রায় স্থির চঞ্চল !
নাহি মায়া নাহি দয়া,
স্বর্ণ লতিকা অগ্নিতাপে ভস্মবুঝি হয় !
সীতা, সীতা,
উঠে এস অগ্নি কুণ্ড হতে,
দিবনা পুড়িতে—
যার লাগি সাগর বাঁধিয়া
ব্রহ্মবধ করি
লইনু অখ্যাতি ব্রহ্মঘাতী রাম ।
সীতা, সীতা !

(পূর্ব গীতাংশ)

সুদর্শন—পুড়িবে না সীতা নহে কলঙ্কিনী
অনলে কি পোড়ে সতী শিরোমণি
উজলসিঁদুর আরো রে শোভিল,
অনলে বিজলি দেখনা ।

শ্রীরাম—পেয়েছি, পেয়েছি—সীতা—
এইবার পেয়েছি তোমারে ।
যুদ্ধক্লান্ত কাতর অবসন্ন শ্রীরাম
বসিয়াছে সভামাঝে—
বামভাগে স্বর্ণ সীতা রাজে ;
পার্শ্বে যজ্ঞাগার
দুটি কুমার তোমার
তৃপ্তি হেতু শ্রীরামের গাহে রামায়ণ-গান—
মধ্যে রাজ রাজরাণী তুমি ।
অন্য চিত্রে হেরি—
অভিমানে মাটিপানে চেয়ে আছে সীতা,—
ভিন্ন চিত্রে সরোদনে
প্রবেশিল পাতাল গহ্বরে ।
কি—কি—পাতালে লুকাবে সীতা
পাতাল সৃষ্টি না রাখিব তব ।

ভোগবতী নদনদী আদি গণ্ডুষে শুথাব—
জীব তার পলকে পোড়াব।
(পূর্ব গীতাংশ)

সুদর্শন—যদিও জানকী পাতালবাসিনী,
পাতালে রবে না বৈকুণ্ঠবাসিনী,
সেথা তোমারে ডাকিছে, তোমারে পূজিছে
তুমি কি দেখিতে যাবে না? (প্রস্থান, ৪র্থ দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

রামচন্দ্র পূর্বজীবনে অনেক অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ বর্জনের পূর্বে তাহার মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগিয়াছে,—অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে চাহিয়া ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র আরো সজীব হইয়া উঠিয়াছেন,—

শ্রীরাম—কি জানি কি স্বার্থে
করিয়াছি পূজা তোর ;
কি জানি কি কঠিন বন্ধনে
বদ্ধ করি হস্ত পদ মোর
রেখেছ কারায় যেন
যন্ত্র-পুত্তলিকা সম ঘুরি ফিরি নিরন্তর।
শোন্‌রে দানব! ইচ্ছা যদি করি,
ছিন্ন করি সহস্র বন্ধন
পারি তোরে শক্র সম করিতে বিনাশ।
নিতে চাস পরীক্ষা তাহার
শোন স্বার্থপর—
প্রাণের লক্ষ্মণে দিব না ছাড়িয়া—
চূর্ণ করি বক্ষ তোর বিক্রম আঘাতে
অঙ্গীকার পদলেহী
অপবাদ হেন বিসর্জিয়া বীরদর্পে,
চির আজ্ঞাবাহী চিরদাস প্রাণের লক্ষ্মণে
অন্তরে অন্তরে, মজ্জায় মজ্জায়
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে রেখে দিব সযতনে।
শত শক্র পারিবে না
কেশাগ্র ধরিতে তার।

লক্ষ্মণ—দাদা, ধর্মপ্রাণ তুমি,
রাজধর্ম করহ পালন—
শ্রীরাম—লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ !
শিখায়ে দেরে মোরে রাজধর্ম মোর।
রাজ্য লাগি ফিরিয়াছি বনে বনে,
রাজ্য লাগি দেহ মন করেছি পাষাণ—
শিখায়ে দেরে মোরে
রাজ্য হেতু আরো কি করিব। (৫ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

মায়াচক্র (১৯৩৩)—এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী কাশীরামদাসের মহাভারতে বনপর্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্যা প্রায় বিশখানি; ইহাতে যাত্রা ব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবিরাজার দান পরীক্ষার জন্য 'পৃথিবী' শিবিরাজপুত্র শ্রীকান্তের মাংস প্রার্থনা করেন। শিবি এই দান দিয়া সত্য রক্ষা করিলেন এবং পরিণামে পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী। নাটকে ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উশীনর অধিপতি শিবি রাজার দানব্রত অবলম্বনে এই দ্বন্দ্বের অবসানে অধর্মকে পরাজয় স্বীকার করায় নাটকের সমাপ্তি হয়,—

অধর্ম—নানা, আমি পরিত্যাগ কচ্ছি আমার আধিপত্য; মহারাজ শিবি, ধর্মের জ্যোতিতে অধর্ম আজ দগ্ধ হল, নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করে নিলে।
(২য় গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক)

নাটকখানি করুণরস প্রধান। কিন্তু শিবিরাজার চরিত্রে প্রচ্ছন্ন ভাবে ভক্তিরস আছে।

চণ্ডীদাস (১৯৩৩)—ইহা ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে নাটকখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আর্য অপেরায় নাটকটি অভিনীত হয়। ইহা সঙ্গীত প্রধান নাটক; ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ। ইহাতে আদিরসাত্মক যাত্রা ডুয়েট সংযোজিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামমণির প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে আদি ও ভক্তিরস প্রাধান্য পাইয়াছে।

মেদিনী (১৯৩৪)—ইহা মহাভারতের শান্তিপর্বের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক নট্টকোম্পানীতে অভিনীত

হয়। ইহা সংগীত প্রধান নাটক; ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে জাত মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয়ের মেদ লইয়া শ্রীভগবান মেদিনী সৃষ্টি করেন। এই পৌরাণিক কাহিনী নাটকের মূলে রহিয়াছে। মধু-কৈটভ ছাড়া অন্যান্য চরিত্র রূপক। মধুর পুত্র কাম, ক্রোধ ও লোভ; অহঙ্কার তাহার সেনাপতি; তাহার প্রহরী স্থূলবুদ্ধি; দৈত্যরাজ মধুর বড় রাণী সুমতি ও ছোটরাণী কুমতি। শান্তি হইতেছেন ধর্মপত্নী এবং সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের পত্নীগণ—শব্দ রূপা, অবিদ্যা ও মোহিনী। ইহা ছাড়া সুখ, দুঃখ, অধর্ম, জ্ঞানাগ্নি ও বিবেচক চরিত্র নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। জ্ঞানাগ্নি হইতেছেন ব্রহ্মা এবং বিবেক স্বয়ং পদ্মনাভ। জগতের সৃষ্টজীব কুমতির প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ দ্বারা চালিত হইয়া জীবনে নানা প্রকার অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেন। কিন্তু বিবেক ও বৈরাগ্যের সাহায্যে কুমতিকে জ্ঞানাগ্নিতে বিসর্জন দিতে পারিলে ধর্মের প্রভাবে সমস্ত দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ইহাই রূপক চরিত্রাশ্রয়ী নাটকের মূল বক্তব্য। ইহার পূর্বে ভোলানাথ রায়ের 'নরকাসুর' ১৩৩১) নাটকে নরকাসুরের ভৃত্য, পুত্র ও স্ত্রীকে রূপক চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। 'তীর্থ' দৈত্যরাজ নরকাসুরের ভৃত্য, 'নির্বাণ' পুত্র এবং 'স্বর্গ' তাহার মহিষী। মৃত্যুর সময় নরকাসুরকে তাহার মহিষী হস্তে ধারণ করেন। নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে সমস্ত জীবন 'তীর্থ'-সান্নিধ্যে বাস করিয়া দৈত্যরাজ অন্তিমে 'স্বর্গ'লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। ফণিভূষণ 'নরকাসুর' নাটকদ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়াছেন। অবশ্য সুমতি, কুমতি, বিবেক, আশা, লোভ প্রভৃতি রূপক চরিত্র লোকনাট্যে বহুপূর্ব হইতেই উপস্থাপিত হইবার রীতি প্রচলিত হয়। কিন্তু সাধারণ রক্তমাংসের চরিত্রকে রূপকে পরিণত করা হইয়াছে বলিয়া 'নরকাসুরের' মত 'মেদিনী' নাটকও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুসরণে মহাতাপচন্দ্র ঘোষ 'আত্মদর্শন' নামে একখানি রূপক নাটক রচনা করেন। নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। আত্মদর্শন বহু অভিনীত থিয়েটারী নাটক। নাটকের নায়ক 'মন'; ইহার মন্ত্রণা দাতা 'বুদ্ধি'; বিবেক, বৈরাগ্য, নিবৃত্তি, সুমতি, কুমতি, প্রবৃত্তি, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি রূপক চরিত্র লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। ভোলানাথ ও ফণিভূষণ এই নাটকদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। লোকনাট্যে রূপক চরিত্র চিত্রণের

আদর্শ মনে হয় মূলত কৃষ্ণ মিশ্রযতি প্রণীত ছয় অঙ্কে বিভক্ত [১]'প্রবোধচন্দ্রোদয়' (একাদশ শতক) হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। বহু রূপক চরিত্র লইয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইহার একটি চরিত্র 'বিবেক'; তাহার স্ত্রী 'মতি', দাসী 'ক্ষমা', ভৃত্য 'বস্তুবিচার', সহচর 'সন্তোষ', ভগ্নী 'শান্ত' এবং শত্রু 'মহামোহ'। মোহচরিত্রের স্ত্রী 'মিথ্যাদৃষ্টি', আমাত্যগণ 'কাম', 'ক্রোধ', 'লোভ', 'অহঙ্কার', 'দম্ভ'। কামপত্নী 'রতি', ক্রোধপত্নী 'হিংসা' ও লোভপত্নী 'তৃষ্ণা' প্রভৃতি চরিত্রও ইহাতে কল্পিত হইযাছে। বিভিন্ন রূপক চরিত্র অবলম্বনে রচিত এই রূপক নাট্যের মূল বক্তব্য হইতেছে, 'মোহ' অহঙ্কার, দম্ভ, লোভ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের বিবেককে পরাস্ত করিয়া মনকে বন্ধন-পাশে আবদ্ধ করিতে চায়, কিন্তু এই দ্বন্দ্বে বিচারবোধ, ক্ষমা, সন্তোষ প্রভৃতির সহায়তায় বিবেক জয়ী হইয়া মনকে শেষ পর্যন্ত বন্ধন মুক্ত করিতে পারে।

দৈত্যরাজ মধু স্ত্রী 'কুমতি', পুত্রত্রয়, 'কাম-ক্রোধ-লোভ' সেনাপতি 'অহঙ্কার', প্রহরী 'স্থূলবুদ্ধি' এবং রজ-তম-অধর্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযুদ্ধে বহুদুঃখ ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'বিবেকের' কষাঘাতে 'অহঙ্কার' পরাজিত হইলে এবং মহিষী সুমতি-পুত্র 'বৈরাগ্যের' অস্ত্রাঘাতে কুমতির পুত্রত্রয় কাম-ক্রোধ-লোভ নিহত হইলে তিনি জ্ঞানাগ্নিতে কুমতিকে বিসর্জন দিলেন। ইহার ফলে দৈত্যরাজের জীবনে ধর্মভাব প্রবল হওয়ায় অধর্ম পরাস্ত হইল। তাই দুঃখাতীত মুক্তিমার্গ তাহার নিকট উন্মুক্ত হইল। সুমতি কুমতির সপত্নী বিদ্বেষের মধ্য দিয়া নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে জ্ঞান দ্বারা কুৎসিত প্রকৃতির কুমতিকে জীবের মঙ্গলের জন্য ধ্বংস করা প্রয়োজন,—

মধু—জ্বাল তোমার ধ্বংসের আগুন। সেই আগুনে জ্বালিয়ে দেব তোমার ঐ সর্বনাশী মোহিনী রূপের সৌন্দর্যের ডালি। বিবেকের ইংগিতে আমি ফিরে পেয়েছি আমার চৈতন্য,—আমার অন্ধকার পথে জ্ঞানের গরিমময় পবিত্র আলোক। জ্ঞানাগ্নিতে আমি ধ্বংস করব কুমতির মায়া। কে আছ—

(অগ্নিদণ্ড হস্তে জ্ঞানরূপী ব্রহ্মার প্রবেশ)

১। "বন্দেলখণ্ডের চন্দেলবংশীয়, নরপতি কীর্তিবর্মার পরিতোষের জন্য ১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্মুখে ইহা প্রথম অভিনীত হয়।" পৃঃ ১৯০ জীবনীকোষ (ভারতীয় ঐতিহাসিক), ২য় খণ্ড ১৩৪৫, শশি ভূষণ

ব্রহ্মা—আমি আছি—আগুন জেলেছি মন্ত্রঃপূত করে কুমতি ধ্বংসের।
মধু—পুড়িয়ে মার, –ছাই করে দাও ছলপ্রকৃতি ঐ কুমতিকে—
ব্রহ্মা—তবে পুড়ে মর—তবে পুড়ে মর সর্বনাশী—(৫ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)

নাট্যকার নিম্নরূপে বিবেকের পরিচয় দিয়াছেন,—

বিবেক—জয় দিল যেবা, সেই পুরুষ পুঙ্গব
চিন্ময় অব্যয়—একাধারে—
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ আশ্রয়ী,
সাধ্য নাহি তব তাহারে করিতে জয়।
সোঽহং সোঽহং রূপান্তরে বিবেকবান্ধব।
যদি পরীক্ষা করিতে সাধ
চল আরো উর্ধ্বে জলের প্রথম স্তরে—
দেখিবে আমারে—
অনন্ত শয্যার নিদ্রাগত আমি সেই পদ্মনাভ।
(১ম গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক)

বিবেক—তাই জাগ্রত রহিব কষাহাতে
কষাহাতে নিদ্রাতুরে জাগ্রত রাখিতে!
জয়ী হবে নিদ্রাঘোরে কুমতি আশ্রয় করি—
হেন রীতি নহে মোর তরে।
(২য় গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক)

সেইজন্যই 'বিবেক' দৈত্যদের জাগ্রত করিতে চাহিয়াছেন,—
বিবেক—চাই কষাঘাতে তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে। চাই বিবেক আশ্রিত বৈরাগ্যের হত্যায় উদ্যত বীর পুঙ্গবকে তারই হত্যার রীতিতে ধ্বংস করতে। চাই শিক্ষা দিতে বধ্য শিশুর কোমল বুকের আধার ঘাতকের বুকেও ঠিক তেমনি বাজে কিনা!

কৈটভ—বাজবে—বাজবে বিবেকবন্ধু—তোমার একটি মাত্র কষাঘাতে এই বক্ষস্থল বুঝি চৌচির হয়ে ফেটে যাবে। (৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক)

বৈরাগ্য সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য হইতেছে, ইহা সহজপ্রথায় অন্তরকে বিগলিত করিয়া মানব জীবনের পাপতাপ দূরীভূত করে;—

(গীত)

বৈরাগ্য—যদি আমার শক্তি সত্য হয়
কাম ক্রোধ লোভ পায় শত ক্ষোভ
পরিণতি তার জয় ॥
আমি গরল দলি সরল প্রথায়,
নিরাশার হৃদি পুরাই আশায়
মতি গতি যে আমারে বিলায়
পাপতাপ তার ক্ষয় ॥ (১ম গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক)

বিবেক ও বৈরাগ্যকে জীবনে প্রাধান্য দেওয়া মানুষের প্রধান কর্তব্য। এই মতবাদই নাটকে প্রচারিত হইয়াছে। এই নাটকে বীর, করুণ, ভক্তি ও শান্তরস প্রাধান্য পাইয়াছে।

সাধু তুকারাম (১৯৩৭)—ইহা সপ্তদশ শতকের মারাঠা সাধু তুকারামের জীবনী অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক ভক্তিমূলক নাটক। আর্য অপেরায় ইহা অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। প্রস্তাবনা দৃশ্যে বলা হইয়াছে যে কৃষ্ণের ইচ্ছায় দাক্ষিণাত্যে শিবাজির রাজত্বে ধর্মস্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং ধর্ম তুকারাম রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। নাটকে দেখা যায় তুকারাম গৃহীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও হরি-সাধনাই তাহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। হরি-ভক্তির জোরে সাধু তুকারাম নিজের মৃতপুত্র বিশুকে সঞ্জীবিত করিয়া রামদাসের শিষ্য শিবাজীর রাজ্যে ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ফণিভূষণ তুকারামকে শিবাজীর মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন,—

শিবাজী—না পথিক—কুড়িয়ে পাওয়া পতাকা তোমার কাছেই থাক—তাতে তোমার মনে থাকবে গৈরিক রূপের পূজারী মহারাষ্ট্র অধিপতি শিবাজী স্বয়ং তোমার কাছে বর্তমান। (১ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক)

কিন্তু শিবাজী সিংহাসনারোহণ করেন ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।[1] সাধু তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহার মৃত্যু হয় ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে[২]। সুতরাং শিবাজীর রাজ্যে তুকারামের ধর্ম স্থাপন করা সম্ভব নহে। রাজ্য স্থাপনের জন্য শিবাজীর কর্মোদ্যোগ বিশেষ রূপে আরম্ভ হয় ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। শিবাজী প্রথমে জেধী নায়ক ও বান্দল নায়ক নামক দুইজন দেশমুখ (local chief) এবং অন্যান্যদের

1. Sivaji—P. 8, J. N. Sarkar, 6th Edi. 1961.

২। জীবনীকোষ (ভারতীয় ঐতিহাসিক), ৩য় খণ্ড, ১৩৪৫ শশিভূষণ

সহযোগিতায় একটি মাওলা দল গঠন করেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ[1] নাগাত যুদ্ধ ছাড়াই বুদ্ধি কৌশলে তিনি টোর্না দুর্গ অধিকার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন; এই অর্থ দ্বারা তিনি রাজগড় দুর্গ প্রস্তুত করেন। ইহার পরে ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দাদাজী কাণ্ডদেবের মৃত্যুর পরে তিনি পুনার জায়গীর লাভ করেন। ইহার পর হইতে কৌশলী বীর স্বাধীন মারাঠা রাজ্য স্থাপনে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠেন। সুতরাং তুকারাম প্রভাবিত শিবাজীর মানসিকতা পরবর্তীকালে তাহার রাজ্যের উপর প্রতিফলিত হইতে পারে মাত্র। মনে হয় ঐতিহাসিকতার দিক হইতে নাট্যকার বিষয়টি ভাবিয়া দেখেন নাই। তুকারামের স্ত্রী জিজাবাঈ চরিত্র মুখরতা ও স্বামীর প্রতি অনুরাগ অবলম্বনে চিত্রিত হইয়াছে। স্বার্থপর কানাইয়া ও তার স্ত্রী পিয়ারার অন্যায়ের শাস্তি বিধানে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ভক্তি ও করুণরস প্রধান নাটক।

চন্দ্রহাস (১৯৪০)—এই পালার মূলকাহিনী কাশীরামদাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক আর্য অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। জনপ্রিয়তার জন্য নাটকখানির অষ্টম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। যাত্রাব্যালে সহ পালার গীতি সংখ্যা প্রায় চব্বিশ। কৌন্তিল্য রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির চক্রান্তে কৌন্তিল্যরাজ দধিমুখ বনবাসী হইলেন এবং শিশু রাজপুত্র চন্দ্রহাস ভীলের ঘরে লালিত পালিত হইতে লাগিল। পরিশেষে পুত্রের মৃত্যুতে ধৃষ্টবুদ্ধির চেতনা ও বিবেক ফিরিয়া আসে এবং যুবক চন্দ্রহাসকে তাহার পিতৃরাজ্য তিনি ফিরাইয়া দেন। বনবাসী রাজা দধিমুখ ও রাজপুত্র চন্দ্রহাসের পুনর্মিলন ঘটে; ভক্ত চন্দ্রহাসের প্রার্থনায় কালীর প্রসাদে ধৃষ্টবুদ্ধি তাহার মৃতপুত্র মদন কুমারকেও ফিরিয়া পাইলেন। ইহাই নাট্য ঘটনা। চন্দ্রহাস চরিত্রে বীর, ভক্তি ও সখ্য ভাব এবং মদনকুমার চরিত্রে সখ্যভাব প্রাধান্য পাইয়াছে। নাটকখানি বীর, সখ্য ও ভক্তিরস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত 'ভাগ্যদেবী' (১৯২৪) ও 'তর্পণ' (১৯২৫), ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত 'সৈরিন্ধ্রী' (১৯২৮), 'চন্দ্রধর' (১৯২৯) ও

1. About 1646 he had taken Torna fort from its Bijapuri commandant by cunning device withot fighting. Here he found Government Treasure amounting to 2 Lakhs of hun···Five miles of it on the chrest of the same spur of hills, he built a new fort named Rajgarh and three walled redoubts (machi) on the lower terraces of the hill-side. p. 34. Sivaji, Sir J. N. Sarkar, 6th Edi. Calcutta, 1961.

'কুশধ্বজ' (১৯৩০), 'রূপসাধনা' (১৯৩৬), 'রামকৃষ্ণ' (১৯৩৬), 'হামির' (১৯৩৮), 'মায়ের দেশ' (১৯৩৮), কাল্পনিক নাটক 'পূর্ণিমা মিলন' (১৯৩৮)' কবি 'কালিদাস' (১৯৪০), মুচির ছেলে' (১৯৪২) প্রভৃতি লোকনাট্য ফণিভূষণ রচনা করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্র কুমার দে (১৯০৭)

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত গয়ধর গ্রামের অধিবাসী হরিকিশোর দের পুত্র ব্রজেন্দ্র কুমার দে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. এবং বি. টি পাশ করিয়াছেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহার শিক্ষক জীবনের সূত্রপাত হয়। একাধিক স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পরে ব্রজেন্দ্রকুমার ইছাপুর নর্থল্যাণ্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার বর্তমান বাসস্থান ইছাপুর (২৪ পরগণা জিলা)। আঠার বৎসর বয়সে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বর্ণলঙ্কা' নামে তিনি প্রথম যাত্রানাট্য রচনা করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটক প্রকাশিত হয়। নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশে ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রানাট্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে তাহার 'ধরার দেবতা' নাটকের উৎসর্গ পত্রে বলা হইয়াছে,—"যাহার আদেশ মাথায় লইয়া বিশ বছর আগে আমার অক্ষম লেখনী যাত্রার নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ যাত্রাভিনয় আমার হাতে আবর্জনামুক্ত হোক—এই ছিল যাঁহার একান্ত কামনা, আমার সেই পরমারাধ্য শিক্ষক স্বর্গীয় নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাম স্মরণে 'ধারার দেবতা' উৎসর্গ করিলাম"। গণেশ অপেরা যাত্রাদলের লেখক ভোলানাথ রায়ের অবসর গ্রহণের পরে ব্রজেন্দ্র কুমার পেশাদার যাত্রাদলের জন্য প্রথম 'বজ্রনাভ' (১৯৩২) নাটকটি রচনা করেন।

লোকনাট্যে হাস্যরসের অবতারণা করিবার জন্য নাট্যকারগণ বয়স্য বা ভাঁড় জাতীয় চরিত্র আমদানি করেন। মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে সাধারণত ইহাদের কোন যোগ থাকে না। বর্তমান লেখক এই শ্রেণীর চরিত্র তুলিয়া দিয়া নাট্য-ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত চরিত্রে কিছু কিছু কমিক উপাদান সংযোজিত করিয়া যাত্রা শ্রোতার হাস্যরস পিপাসা চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে সুরথ ('স্বামীর ঘর'-১৯৪৫), কন্দর্প নারায়ণ ('গাঁয়ের মেয়ে'—১৯৫০), রূপ চাঁদ ('সোনার ভারত'—১৯৬১) প্রভৃতি চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাত্রার আসরে

সহস্র সহস্র শ্রোতার শ্রুতি-রঞ্জনের জন্য নাটকে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহারের রীতি বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্র কুমার তাহার নাটকে দীর্ঘ সংলাপের পরিবর্তে স্বল্লায়তন সংলাপ যোজনা করিয়া শ্রোতা ও অভিনেতা উভয়কে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই জাতীয় সংলাপ ব্যবহারে নাটকের গতি কিঞ্চিৎ দ্রুততাপ্রাপ্ত হয়। উনবিংশ শতকে গোবিন্দ অধিকারীর নাট্য সংলাপে এই রীতি লক্ষিত হয়, পূর্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ শতকের শেষে ধনকৃষ্ণ সেনও তাহার নাটকে কিছু কিছু ছোট সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। তথাপি দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহারই যাত্রার প্রচলিত রীতি ছিল। পূর্বে ইহার বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে বিংশ শতকে রাইচরণ সরকার তাহার পালায় অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট সংলাপ ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। তবুও একথা বলা যায় যে এই শতাব্দীতে যাত্রা নাট্যে সংক্ষিপ্ত সংলাপ সংযোজনারীতির বিশেষ প্রচলনের কৃতিত্ব ব্রজেন্দ্র কুমারের। 'মায়ের ডাক' (১৯৪৭) পালা হইতে তিনি ছোট ছোট সংলাপ ব্যবহারের বিশেষ রীতি অনুসরণ করিতে থাকেন। ইহার পর হইতে অন্যান্য নাট্যকাররা ও তাহার এই রীতির অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন।

নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকার আরও একটি কৌশল অবলম্বন করেন। মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মোন্মাদনা ও দোষ ত্রুটির কথা মুসলমান চরিত্রকে দিয়া বলাইতে চেষ্টা করেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অবকাশ কমিয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ মোবারক ('বাঙ্গালী' ১৯৪৮), ফরিদ খাঁ ('ধর্মের বলি'—১৯৫৬), হাসেম ('কবি চন্দ্রাবতী'—১৯৬১), ইসলাম ('রাজা দেবিদাস'—১৯৫৭) প্রভৃতি চরিত্রগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ব্রজেন্দ্রকুমার অনেক নাটকে ছদ্মবেশে চরিত্র উপস্থাপিত করিবার রীতি গ্রহণ করেন; উদাহরণ স্বরূপ হোসেনসাহ ('সোনাই দীঘি'), জাহান্দার ('সম্রাট জাহান্দার') বিক্রমাদিত্য ('বিচারক') মোবারক ('বাঙ্গালী'), গৌতম ('যাদের দেখে না কেউ') প্রভৃতি চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কতগুলি বিশেষ কথাও তিনি নাটকে বহু ব্যবহার করেন—যেমন, 'মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া', 'হাই তোলা তুড়ি দেওয়া', 'অঙ্গুলিহেলন', 'তালপুকুরে ঘটি ডোবে না', 'নিষ্ঠীবন ত্যাগ', 'বিদ্যা নয় বিষ্ঠা' ইত্যাদি। বিভিন্ন পালায় একই কথা ব্যবহারের একঘেয়েমি নাট্যকারের পক্ষে প্রশংসনীয় এ কথা বলা যায় না। ব্রজেন্দ্রকুমার পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক কাহিনী এবং রূপক ও

পল্লীগাথা অবলম্বনে লোকনাট্য রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন অধিক। হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতির কর্মপ্রবণতা, সমাজপতিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজশক্তির দম্ভে জাতির দুর্দশা, শাসকের অদূরদর্শিতার পরিণাম, গণজীবনের দুর্দশার সন্ধান প্রভৃতি ভাব অবলম্বনে তিনি বহু নাটক রচনা করিয়াছেন। সংলাপ সংযোজনা, চরিত্র রূপায়ণ ও রসসৃষ্টির দিক হইতে বর্তমান লোকনাট্যকারদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার অগ্রগণ্য।

স্বর্ণলঙ্কা (১৯২৫)। ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। বাণী নাট্যসমাজে অভিনীত এই নাটকে গানের সংখ্যা পঁয়ত্রিশের অধিক, ইহাতে যাত্রাবালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সীতাহরণের পরে তরণী, মেঘনাদ ও রাবণ বধ, সীতার উদ্ধার এবং অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। ভয়ঙ্কর স্বভাব রাবণের মধ্যে নাট্যকার স্নেহ-সিক্ত হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। নাটক পাঠে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' প্রভাব অনুভূত হয়। ইহা ভক্তি, বীর ও করুণ রস প্রধান রচনা।

লীলাবসান (১৯৩৬)—কাশীরাম দাসের মহাভারতের মৌষলপর্ব হইতে এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা গণেশ অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। নাটকটি সঙ্গীত প্রধান, ইহার গানের সংখ্যা প্রায় আটত্রিশ, ইহাতে যাত্রাবালেও রহিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, কুরুবংশ ধ্বংসের জন্য প্রধানত কৃষ্ণের কূটকৌশলকে গান্ধারী দায়ী করেন,—

গান্ধারী। তুমি যদি নিরপেক্ষ হতে।
বাধিতনা কুরুক্ষেত্র রণ
মজিতনা সংবংশে কৌরব। (প্রস্তাবনা)

এই মনোভাব লইয়া পুত্র শোকাতুরা গান্ধারী দ্বারকাপতি কৃষ্ণকে যদুবংশ ধ্বংসের অভিশাপ প্রদান করেন। অভিশাপের ফলে পিতাপুত্র, পতি-পত্নী ও ভ্রাতা-বন্ধুর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহারই জ্বলন্তশিখায় পুড়িয়া দ্বারকায় যাদবগণের মহাশ্মশান সৃষ্ট হয়, সর্বশেষে বিদ্রোহী ব্যাধ 'জরার' শরে যদুপতি কৃষ্ণের লীলাবসান ঘটে। এই হইল নাট্য ঘটনা। প্রস্তাবনার শেষে নাট্যারম্ভ। রুদ্রদেবের ভয়ঙ্কর রূপের প্রকাশে স্বর্ণপ্রসূ সাগর-মেখলা দ্বারকায় যে মহাশ্মশানের সৃষ্টি হয় নাটকের প্রথমাংশে দুন্দুভির প্রলয়ঙ্কর সুরে তাহারই পটভূমিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে,—

দেবল—অকস্মাৎ একি মহাপ্রলয়। শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত সব ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত এসে আক্রমণ করছে। দরিদ্রের পর্ণ কুটীর ধনীর প্রাসাদের সঙ্গে এক মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। একি ভয়াল মূর্তি তোমার রুদ্রদেব! এত ক্ষুধা যদি তোমার, আমায় গ্রহণ কর রাক্ষস, দ্বারকাকে বাঁচতে দাও। হায় দ্বারকা! স্বর্ণপ্রস্থ সাগর-মেখলা জননী আমার বুঝি আজ তোর সব শেষ! (গীতকণ্ঠে দুন্দুভির প্রবেশ।

দুন্দুভি— গীত

আমি গাহিব শেষের গান।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দলিয়া মথিয়া গরল করিব পান ॥
আমি চুমুকে শুষিব সিন্ধু,
আমি বজ্র নিপাতে পূর্ণিমারাতে নিভাইব সুধাইন্দু;
শেষে প্রলয় প্লাবণে ভাসিয়া—
আমি খলখল যাব হাসিয়া,
স্মৃতির পাতায় স্বপনের রেখা রহিবে বর্তমান ॥

(প্রস্থান ৩য় দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

নাটকে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনকারী আর্যের সঙ্গে অনার্য শূদ্রের বিরোধ দেখা দিয়াছে। আর্যের সঙ্গে অনার্য শূদ্রেরও যে সমাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় অনার্য সর্দার 'জরা' চরিত্রে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকে আদি, রৌদ্র, বীভৎস ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

আকালের দেশ (১৯৪৫) এই পঞ্চাঙ্ক নাটক নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত হয়। ইহার গানের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ। রাজমাতা মন্দাকিনীর প্রশ্রয়ে এবং সেনাপতি সুদর্শনের সহযোগিতায় স্বর্ণপুরের রাজা 'সুকণ্ঠ' নারীসুধাপান ও বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দেন। এই বিলাসে বাধা পড়ায় প্রজাদের উপর চলে অকথ্য অত্যাচার, বাঁধ কাটিয়া শস্য নষ্ট করা, অগ্নিসংযোগে ভস্মস্তূপ সৃষ্টি করা, হত্যার তাণ্ডবলীলা চালানো কিছুই বাদ পড়ে না। বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত শস্য মজুত করিয়া কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি পূর্বক অসংখ্য প্রজার জীবন নাশ ও চরম দুর্ভোগ ডাকিয়া আনিতেও রাজশক্তি পিছাইয়া পড়ে নাই। দর্পিত রাজশক্তির অন্যায়ের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়া সুকণ্ঠের স্ত্রী 'বাণী' নির্বাসিতা হইলেন এবং রাজপুত্র 'নীলকণ্ঠ' গুলির আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। স্ত্রীর নির্বাসন ও

পুত্রের মৃত্যুতে মর্মাহত সুকণ্ঠের বিবেকের উদয় হয়। তাই তিনি বুঝিতে পারেন যে রাজবংশধর হইলেই সিংহাসনের অধিকারী হওয়া যায় না। সিংহাসন আরোহণের প্রথম সোপান প্রজাদরদ। এই অনুভূতি লইয়া প্রজার প্রতিনিধিরূপে তিনি রাজ্য পরিচালনায় ব্রতী হইলেন। এই কাহিনী লইয়া স্বাধীনতার পূর্বে নাটকখানি রচিত হয়। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে চোখের উপর যে শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছি, নিরন্ন জনসাধারণের হাহাকারে শাসকের ঔদাসীন্য ৩৫ লক্ষ বাঙালীর মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারই একটু প্রকাশ এই আকালের দেশ।" যথেষ্ট শস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও শাসকের তৈরি এই দুর্ভিক্ষে "দেশের মানুষও পশুতে কোন ভেদ নেই, একই খাদ্যের জন্য মানুষে কুকুরে কাড়াকাড়ি কচ্ছে। অনাহারে কত মানুষ মরেছে, পোড়াবার কেউ নেই" (অঙ্কুর—৩য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)। এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে রাজশক্তির কর্ম পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় মন্দাকিনী ও বাণীর সংলাপে (৪র্থ দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)। এই নাটকে দুর্ভিক্ষের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে এবং নাটকের কয়েক জায়গায় ইহার স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত জীবনের মূল্যবোধের পরিবর্তনের পরিচয় দিয়া দুর্ভিক্ষের সমাজের বিভীষিকাময় নগ্নরূপের জীবন্ত চিত্র তুলিয়া ধরা 'আকালের দেশে' সম্ভব হয় নাই। প্রজার পঞ্জরে নল বসাইয়া পৈশাচিক উপায়ে রাজশক্তির রক্ত শোষণের বিরুদ্ধে, চাষী সম্প্রদায়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার প্রতি নাট্যকার 'আকালের দেশে' দৃষ্টি দিয়াছেন অধিক। দেশের চাষী যদি মানুষ হইত তাহা হইলে তাহাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ফলান ফসল মজুত করিয়া সরকার তাহাদেরই নিরন্ন করিতে পারিতেন না। চাষীদের সংঘবদ্ধভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার মধ্যে- অধিকার বোধকে জাগ্রত করিবার মধ্যে মানুষ হইয়া উঠিবার মধ্যে লেখক ইহার প্রতিকারের সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন। উজানগাঁয়ের চাষী নাটকে বহুবার গীতকণ্ঠে দেখা দিয়াছে চাষীদের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা জাগাইবার জন্য, আশার আলো তুলিয়া ধরিবার জন্য। সুকণ্ঠ সুবর্ণপুরের রাজশক্তির অধিকারী হইলেও তিনি রাজমাতা মন্দাকিনীর হাতের পুতুল মাত্র। অত্যাচারী রাজশক্তির প্রকৃত চালক চরিত্র মন্দাকিনী। রাজা মণিকণ্ঠের অনুপস্থিতিতে দেশে যে পীড়া ও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করা হইয়াছিল তিনি তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার প্রতিকারে মনোযোগী হইলে

মন্দাকিনী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে তিনি প্রকৃত রাজা নহেন, প্রতিনিধিমাত্র। সুবর্ণপুরের পরলোক গত রাজা পৌত্র সুকণ্ঠকেই রাজ্যাধিকার দান করিয়াছিলেন, পুত্র মণিকণ্ঠকে নহে। তাই প্রজা দরদী মণিকণ্ঠ অনধিকারে হস্তক্ষেপ করায় কারাকক্ষ তাহার উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দেশিত হয়। বংশ-মর্যাদা-বোধ ও রাজশক্তির দম্ভ মন্দাকিনীর নারীত্বের কোমলতা শুষিয়া লইয়াছে। তিনি কেবল সুকণ্ঠের মাতা, সকলের মাতা নহেন। এই মন্দাকিনীর জন্যই 'বাণী' নির্বাসনে ও রাজপুত্র নীলকণ্ঠ মৃত্যুর পথে গমন করেন। শেষ পর্যন্ত মন্দাকিনী উন্মাদ হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। মাতার স্বরূপ ধরা পড়িবার পরে সুকণ্ঠের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি বুঝিলেন যে প্রজাই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী, রাজা প্রতিনিধি মাত্র। রাজ্যশাসনে দৃষ্টি ভঙ্গীর এই পরিবর্তনই চরিত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। উদার, কর্তব্যপরায়ণ, জনদরদী ও ধৈর্যগুণের অধিকার রূপে 'জনার্দন' চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। সুকণ্ঠের স্ত্রী চাষীর কন্যা। তাই শ্বশ্রূমাতা মন্দাকিনী এবং নারী-বিলাসী স্বামীর নিকট হইতে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা পাইয়াও তাহার স্বামীর প্রতি ভক্তি অটল ছিল। নন্দীপুরের রাজা ধনপতির কন্যা 'লক্ষ্মী' শিক্ষিতা। আভিজাত্যের আস্ফালন হইতে মুক্ত। আদর্শ চরিত্র জনার্দনের পাশে দাঁড়াইবার মত তাহার শক্তি আছে। কৃশাঙ্গী ও মাতঙ্গ চরিত্রদ্বয় প্রধানত হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রগীতির 'মানুষ মোরা নহিতো মেষ' এই পংক্তি দ্বারা নাট্যকার বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। পংক্তিটির বহুল ব্যবহারে তিনি ইহার পরিচয় দিয়াছেন। আদি, রৌদ্র, বীভৎস ও করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। জনপ্রিয়তার জন্য ১৩৭১ সালে ইহার দশম মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবতার গ্রাস (১৩৪৬) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ১২শ—২১শ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত হয়। যাত্রাব্যালে ও গণের গানসহ ইহাতে প্রায় বাইশখানি গান রহিয়াছে। যাত্রায় পৌরাণিক পালা রচনায় গদ্য এবং পদ্য সংলাপ উভয়ই সাধারণত সংযোজিত হয়। কিন্তু এই নাটক কেবলমাত্র গদ্য সংলাপে রচিত হইয়াছে। বিষ্ণুভক্ত বিদিশাপতি ধর্মধ্বজের কন্যা তুলসীর স্বয়ম্বর সভায় বিষ্ণু বিদ্বেষী দৈত্যরাজ শঙ্খচূড় আহূত না হওয়ায় তিনি আসুর বিবাহের নিয়ম অনুযায়ী স্বয়ম্বর সভা হইতে তুলসীকে হরণ করিয়া বিবাহ

করেন। ইহার পর স্বর্গজয়ী দৈত্যরাজকে মহাদেব স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন ; কিন্তু স্বর্গের সম্পদ দিয়া মর্ত্তকে গড়িয়া তুলিবার জন্য শঙ্খচূড় মহাদেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং দেবগণ দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে বিদিশাপতি ধর্মধ্বজ শঙ্খচূড় কর্তৃক তুলসী-হরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য দেবপক্ষ অবলম্বন করেন। তুলসীর আরাধনায় বিষ্ণু দৈত্যরাজগৃহে আশ্রয় লইয়া শঙ্খচড-রূপে তুলসীকে প্রতারণা করেন। ইহাতে দ্বিচারিণী দোষে দুষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া তুলসী প্রাণ ত্যাগ করিয়া গণ্ডকী নদীর স্রোতে মিশিয়া গেলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুলসী দ্বিচারিণী নহেন, কারণ বিষ্ণু আর শঙ্খচড় অভিন্ন। সতী তুলসীর মৃত্যুর পরে শঙ্খচূড় বৈষ্ণবীয় বাণে নিঃ ‧ হইয়া বিষ্ণু দেহে লীন হইয়া গেলেন। এই কাহিনী লইয়া নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজা ধর্মধ্বজকন্যা তুলসী ও দৈত্যেশ্বর শঙ্খচূড়-এর কাহিনী অবলম্বনে ১৩১০ সালের পূর্বে অহিভূষণ ভট্টাচার্য পূর্বে আলোচিত 'তুলসী লীলা গীতাভিনয়' নামে একখানি যাত্রা নাট্য রচনা করেন। গোলকে রাধার সখী ও বিষ্ণুসখা শীদাম প্রণয়াবদ্ধ হওয়ায় রাধা-শাপে তাহারা যথাক্রমে তুলসী ও শঙ্খচড-রূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করিয়া মিলিত হইলেন।

বর্তমান নাট্যকার তুলসী ও শঙ্খচূড সম্পর্কে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য নাট্যকার আভাস দিয়াছেন যে শঙ্খচূড বিষ্ণু অংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণামে বিষ্ণুদেহে লীন হইলেন। অহিভূষণের তুলসী মৃত্যুর পরে গোলকধামে গমন করিলে তাহার পুণ্যদেহ হইতে গণ্ডকী নদী সৃষ্ট হয়। ব্রজেন্দ্র কুমারের নাটকে তুলসীর চোখের জলে গণ্ডকীর সৃষ্টি করা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্র কুমার তাহার নাটকে বলিতে চাহিয়াছেন যে মর্তবাসী যখনই পৃথিবীতে মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে তখনই দেবতার গ্রাস তাহাকে নিঃশেষ করিতে চাহিয়াছে। নাটকে স্বাধিকার বোধ ও মর্ত-প্রীতি বিশেষ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই দেবতার গ্রাসের বৈশিষ্ট্য। দৈত্যরাজ পুরোহিত 'বিন্নন' বিষ্ণুভক্ত। কিন্তু তাহার বিষ্ণুভক্তি তাহাকে সাধারণের মত অকর্মা করিয়া তোলে নাই। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাহার ধর্মাদর্শ ; এই আদর্শ লইয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী রাজশক্তিকে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত মানিতে চাহেন যতক্ষণ ইহা প্রজার প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে কর্মরত থাকিবে,—

বিন্নন—রাজা আমাদের, রাজা শুধু আমাদের ধন-প্রাণ-মানের রক্ষক।

যদি তার হাতে আমাদের সুখশান্তি ব্যাহত হয়, আমরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব না, তাকেই সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দেব। (১ম দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

সেনাপতি কঙ্কণ কর্তব্যপরায়ণ, রাজভক্ত, বীর ও প্রেমিক রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। শঙ্খচূড়ের ভ্রাতা চন্দ্রচূড় অত্যন্ত সরল ও দরদী। ভগ্নী গঙ্গাজল ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দৈত্যরাজের উপর যেমন তাহার দরদ রহিয়াছে তেমনি আছে প্রজাদের উপর। এই দরদ বোধের জন্যই নারীর প্রতি অন্যায় সমাজ বিধানের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। চন্দ্রচূড় বিষ্ণুবিদ্বেষী নহেন, দৈত্যরাজের অসাক্ষাতে মাঝে মাঝে তিনি বিষ্ণুপ্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিদিশাপতি ধর্মধ্বজ বিষ্ণুভক্ত। কিন্তু তাহার বিষ্ণুভক্তি তাহাকে দাম্ভিক করিয়া তুলিয়াছে। এই দম্ভ হইতে ক্রোধ আসিয়াছে। ক্রোধের বশে পিতৃস্নেহ দূরীভূত করিয়া কন্যাকে অভিশপ্ত করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। রাজা ধর্মধ্বজের একটি সংলাপ চাণক্যের একটি সংলাপকে স্মরণ করাইয়া দেয়,—

ধর্মধ্বজ— কান পেতে শোন মূর্খ জগৎ। কন্যা পিতাকে বলছে তার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে। (১ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

"চাণক্য—কলির ব্রাহ্মণ! কানপেতে শোন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বলছে বেরিয়ে যাও এখান থেকে"। (৩য় দৃশ্য, ১ম অঙ্ক, চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল)। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দৈত্যরাজ রাজপুরীর অন্তঃপুর পথে প্রহরী রক্ষক অস্ত্রধারী কঙ্কণের সম্মুখে বিনা বাধায় বিদিশাপতি ধর্মধ্বজ একাধিকবার অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহার মহিষী জয়ন্তীকে হত্যা করেন। ইহাকে ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা কষ্টকর। প্রথম অস্ত্রাঘাত অতর্কিতে হইলেও দ্বিতীয় অস্ত্রাঘাত নিশ্চয়ই প্রতিহত হওয়া উচিত ছিল। এই হত্যাকাণ্ডের পর বিদিশাপতি অনায়াসে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন, ইহাতে দৈত্য পুরীর রাজমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তুলসীর সখী যমুনা প্রেমিকা নারী। বিদিশার রানী জয়ন্তী স্নেহশীলা মাতা। কিন্তু মহাদেব কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কবচ লইয়া জয়ন্তীর দৈত্য প্রাসাদে শঙ্খচূড় সকাশে আগমন আকস্মিকতাপূর্ণ। নাট্য সমাপ্তির পথে নাট্যকার যে গুরুত্ব-গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে অপ্রয়োজনীয় ভাবে নারীগণের সংস্থাপনা ও তাহাদের হালকা বিবাদ তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। তুলসী বিষ্ণুভক্তি পরায়ণা, সতীত্ব রক্ষা তাহার জীবনের প্রথম ব্রত। বিষ্ণু বিদ্বেষী শঙ্খচূড়ের

মধ্য দিয়া তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছেন, তুলসী একই সঙ্গে দেব-দানবের সাধনা করিয়া সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। নাটকের প্রধান চরিত্র শঙ্খচূড। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শক্তিমান দৈত্যরাজ মর্তে এক নূতন মানবজাতি গড়িতে চাহেন। তাহার ধর্ম হইবে বাহুবল ও দেবতা হইবে দেশ। এই বাহুবলের সাহায্যে শিল্পোন্নতি প্রভৃতি নানাকর্মের মধ্য দিয়া পৃথিবীকে নবরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কাজের জন্যই মেরুদণ্ডহীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে দশপ্রহরণ ধারিণীর পূজা করিয়া শক্তিমান হইতে বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিলাসী দেবতা বিষ্ণুর পূজা করিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, ইহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এইভাবে জাতির একটি বড় অংশ পঙ্গু হইয়া পড়ায় শঙ্খচূড় বিষ্ণুব বিদ্বেষী হইলেন। স্বর্গের দিকে তাকাইয়া মানুষ যেন মাটির পৃথিবীকে ভুলিয়া না যায়—ইহাই ছিল দৈত্যরাজের আদর্শ। দেবতার চক্রান্তে বৈষ্ণবীয় বাণে মৃত্যুবরণ করিবার সময় বিষ্ণু ও মহাদেবকে উক্ত সংলাপে দৈত্যরাজ কণ্ঠে মর্তপ্রীতিই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই মর্তপ্রীতিতে বাধা দিবার জন্যই দেবদানবে চিরবিরোধ। শঙ্খচূড় চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকারের আধুনিক যুগোচিত শিল্পবোধ ও দেশোন্নতিমূলক ধারণা প্রকাশিত হইয়াছে। অহিভূষণের 'তুলসী লীলার' নাট্য পরিকল্পনা ও বর্তমান লেখকের 'দেবতার গ্রাসের' নাট্য পরিকল্পনা পৃথক। এই নাটকে আদি, বীর, করুণ, ও ভক্তিরস প্রাধান্য পাইয়াছে।

বাঙালী (১৯৪৮) ইহা আর্য অপেরা ও নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। যাত্রাব্যালে ও গণের গানসহ ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় সতের। হিন্দু-মুসলমানে সমদৃষ্টি সম্পন্ন প্রজানুরঞ্জক পাঠান নবাব দায়ুদখাঁ জন্মের অধিকার অপেক্ষা কর্মের অধিকারে অধিক বিশ্বাসী বলিয়া সহিস পুত্র মোবারকের নাজিরের পদ হইতে ক্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে। মুসলমান নবাবের রাজত্বে মুসলমানের প্রতি পক্ষপাত দৃষ্টির অসমর্থন এবং নবাবপুত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া সহিস পুত্রের পদোন্নতি দায়ুদ-পুত্র নাসিরখাঁকে পিতৃদ্রোহী করিয়া তুলে। মোগল সম্রাট আকবরের কর আদায়কারী রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বাঙ্গলার নবাব দিল্লীর কর বন্ধ করেন। দিল্লী সরকারের সেনাপতি মুনীমখাঁ এই বিদ্রোহদমনে বাংলায় আসেন। নাসিরখাঁ বাঙ্গলার উজীরের পদলোভে মুনীমখাঁকে হিন্দুনারী উপঢৌকন পাঠাইয়া যুদ্ধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। যথাসময় রাজমহল-যুদ্ধে দায়ুদখাঁর

দশহাজারী মনসবদার নাসিরখাঁ সসৈন্যে মোঘল পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অস্ত্র মুখে পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ হয় এবং পিতৃঅস্ত্রে পুত্র নাসির মৃত্যুবরণ করেন। এই যুদ্ধেই বাঙ্গলায় পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটে। নাটকের ইহাই মূল ঘটনা। পাঠান সোলেমান কররানীর পুত্র রাজ্য-ধনগর্বী, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, দাম্ভিক ও শাসনকার্যে অপটু দায়ুদখাঁকে (১৫৭৩-১৫৭৬ খ্রী:) অবলম্বন করিয়া নাটকে যে ঘটনাবলীর অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে ইতিহাসের মর্যাদা সংরক্ষিত হয় নাই। ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রকৃতি ও পরিণতি সম্পর্কে পাঠক ও দর্শকদের মনে পূর্ব-ধারণা থাকে। কাজেই নাট্যকারের ঐতিহাসিক চরিত্র যদি পাঠক-দর্শকদের ঐতিহাসিক জ্ঞান, বাস্তবতাবোধ এবং ঔচিত্যবোধের বিরোধিতা করে তাহা হইলে ইহা রস-নিষ্পত্তির পরিপন্থী হইয়া উঠে। তাই ঐতিহাসিক নাটকের ঘটনা সন্নিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টিতে ঐতিহাসিকবোধ ও ঔচিত্যবোধকে কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ করা বাঞ্ছনীয় নহে। অবশ্য একথা সত্য যে কেবমাত্র সংলাপে ইতিহাসের প্রাণহীন চরিত্র ও ঘটনা তুলিয়া ধরিলেই তাহা ঐতিহাসিক নাটক হয় না। ঐতিহাসিক নাটক শুষ্ক তথ্যপঞ্জীর বিবৃতিমাত্র নহে। ঐতিহাসিক নাট্যকারের কর্তব্য অন্যরূপে সম্পন্ন করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে Encyclopaedia Britannica (Cambridge Edition) গ্রন্থে বলা হইয়াছে- "His task is, not to paint a copy of some contemporary or historical personage, but to conceive a particular kind of man, acting under the operation of particular circumstances. This conception growing and modifying itself with the progress of the action, also invented by the dramatist, will determine the totality of the character which he creates." সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনা ও নাট্যকল্পনার মিশ্রণে নাট্যকারকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। যে যুগের ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে নাটক রচিত হইবে তদানীন্তনকালের ন্যায়, ধর্ম, রীতি, নীতি ও বাস্তববোধকে বজায় রাখিয়া যেমন সেই ঐতিহাসিক যুগ-পরিবেশটি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তেমনি ঐতিহাসিকতাকে অবিকৃত রাখিয়া ঐ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নানা পরিস্থিতির অবতারণা করিয়া কবি-কল্পনা বলে জীবনের সম্ভাব্য রস-রূপকে প্রকাশ করিতে হইবে। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়া মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য

রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ; ইতিহাসের বিশেষ চরিত্রের মধ্য দিয়া নির্বিশেষে আবেদন সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রসঙ্গত G. A. Lessing-এর 'Humburg Dramaturgy' (1769) গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি স্মরণ যোগ্য,—[1] "From the stage we are not to learn what such and such an individual man has done, but every man of a certain character would do under certain given circumstances." সর্বোপরি সমস্ত কিছুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক (relation of cause and effect) বজায় রাখিতে হইবে। ঐতিহাসিক নাটক রচনার সময় ইহা নাট্যকারের মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

দায়ুদখাঁ, বিক্রমাদিত্য, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে 'বাঙ্গালী' একখানি কাল্পনিক নাটক। বাঙ্গলার শাসনকর্তা যেভাবে চলিলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীভূত হইয়া হিন্দুমুসলমান নিঃসঙ্কোচে পাশাপাশি বসবাস করিতে পারে সেই ভাব লইয়া একটি শাসক চরিত্র সৃষ্টি করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এই নাটকে ঐতিহাসিক রঙ আছে কিন্তু ঐতিহাসিকতা নাই। ঐতিহাসিক নাটকে মূল ইতিহাস বজায় না রাখিলে ইতিহাসে অনভিজ্ঞদের ভুল ইতিহাস শিক্ষা দিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। লোকনাট্যকার একজন লোক-শিক্ষকও বটেন। ঐতিহাসিক চরিত্র প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি ঐতিহাসিক সত্যের প্রশ্ন একেবারে এড়াইয়া চলিতে পারেন না। সুতরাং সতর্কতার সঙ্গে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। প্রসঙ্গত Gustav Freytag-এর 'The Technique of the Drama' (1863) গ্রন্থের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে,—[2] "Indeed the poet will have to be on his guard, lest, in his invention, there be made to appear what to his contemporaries may seem the opposite of historical truth." আদর্শ ভাবের উপযুক্ত বাহক চরিত্র যদি ইতিহাস খুঁজিয়া না পাওয়া যায় তাহা হইলে ভাবাদর্শ অনুযায়ী কাল্পনিক দেশের কাল্পনিক শাসক চরিত্র লইয়া নাটক রচনা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

বিক্রমাদিত্য দায়ুদের অমাত্য। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি লইয়া দায়ুদের উজীর হইলেন। দেশপ্রেম ও আত্মমর্যাদা বোধ অপেক্ষা

1. Quoted in p. 259 in European Theories of the Drama—B. H. clark, 1947
2. „ 357

অর্থ-বোধ তাহার প্রবলতর। সকলকে খুশি রাখিয়া নানা ফিকির ফন্দীতে কিছু কিছু জমিজমা করিয়া লওয়ার প্রতিই তাহার প্রধান লক্ষ্য। এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য মাথা নত করিয়া জীবন ধারণে তিনি একেবারেই অরাজি নহেন। তিনি আবার কায়স্থ সমাজপতি। এই চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার বিচারহীন সমাজপতিদের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রতাপ দেশপ্রেমিক কিন্তু উদ্ধত। তথাপি প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ভাণ্ডার রাজ প্রাসাদে নবাব দায়ুদের সম্মুখে সে যে ভাষায় কথা বলিয়াছে তাহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় রহিয়াছে। প্রতাপ অমাত্যপুত্র হইলেও রাজপ্রাসাদে তাহার আগমনে নবাব কন্যা যুবতী আশমানের উপস্থিতি নবাবী ঐতিহ্যের বিরোধী। আশমানের মধ্যে প্রথমে মুসলমান পক্ষপাতিত্ব প্রকাশিত হইলেও পরবর্তীকালে তাহার চরিত্রে দেখা দিয়াছে ধর্ম বিদ্বেষহীন নারী-দরদী মানসিকতা। মোবারকের প্রতি তাহার বিদ্বেষ আকর্ষণের নামান্তর। তাহার শৌর্য, বীর্য ও ব্যক্তিত্বকে আশমান ভাল বাসিয়াছেন। আশমান প্রেমিকা নারী। নাসির খাঁ উদ্ধত হিন্দুবিরোধী ও পিতৃদ্রোহী নবাবপুত্র। এই অক্ষম অপদার্থকে পদলোভ বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করিয়াছে। সম্রাট আকবরের শিপাহশালার মুনীম খাঁকে তিনি হিন্দুনারী সওগাত দিয়া খুসী করিতে চাহেন। যুদ্ধে মুনীমকে সাহায্য করিবার ইহাই প্রথম সোপান। দেশদ্রোহিতা দ্বারা শত্রুপক্ষের সহযোগিতা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য যুদ্ধান্তে নাসির খাঁর উজীরীপদ লাভ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সম্মুখ যুদ্ধে নাসিরকে পিতৃ হস্তে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। আকবরের তহশীলদার আলিমনসুর গোঁয়ার, লম্পট ও ঘুষখোর। নারীলোলুপতা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি কোন কাজেই পশ্চাৎপদ নহেন। পৈশাচিক প্রতিহিংসা গ্রহণেও তিনি পটু। তাই প্রার্থনার দিনে বীর, কর্তব্য পরায়ণ ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল সেনাপতি মুনীম খাঁর যুদ্ধ বন্ধের আদেশ অমান্য করিয়া অস্ত্রহীন অবস্থায় দায়ুদ খাঁ ও মোবারককে হত্যা করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। নাট্যকার তাহার এই পৈশাচিক পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে নাট্যকার ঐতিহাসিক কাহিনী অনুসরণ করেন নাই। রাজমহলের শেষ যুদ্ধে মুনীম খাঁ সেনাপতিত্ব করেন নাই। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আশী বৎসর বয়সে মুনীম খাঁ পরলোক গমন করেন। ইহার পরে আকবর শাহ অন্য সেনাপতি মুজঃফরখাঁকে দায়ুদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। যুদ্ধে দায়ুদের সেনাপতিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন

কালাপাহাড় ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা কোতুল খাঁ। [1]যুদ্ধ করিতে করিতে দায়ুদ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। [2]বন্দী অবস্থায় সুদর্শন সুলতানের শিরচ্ছেদ করিয়া সম্রাট আকবরের নিকট পাঠানো হয়। মোবারক সহিস পুত্র হইয়াও গুণপনা ও কর্মবলে নবাবের সিপাহশালার হইলেন। তিনি ধর্মবিদ্বেষ হীন, ন্যায়পরায়ণ বীর। মোবারক নারীর মর্যাদা বজায় রাখিতে জানেন। মোবারকের সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের যশোবন্ত সিংহের একটি সংলাপ মনে করাইয়া দেয়,—

মোবারক—এই সহিসের বাচ্ছা তার রক্ত চক্ষু আর বিলোল কটাক্ষকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে। (২য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

"যশোবন্ত—যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।" (৫ম দৃশ্য, ২য় অঙ্ক, সাজাহান)

নবাবের বালক পুত্র বুলবুল। উচ্ছল আবেগপূর্ণ এই চরিত্রে বাংলার প্রতি দরদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বুলবুলকে নাটকের 'একানে বালক' চরিত্র রূপে গ্রহণ করা যায়। নবাবপুত্র এবং গ্রামের জমিদার পুত্রের পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং তৎকালীন বাংলার নবাবপুত্র বাবাজীর আখড়ায় গিয়া গান শিখিয়া আসিতে থাকিবে—ইহার বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয়হীন হওয়া যায় না। তৎকালীন বঙ্গের নবাবপুরীতে 'শ্যাম-রাধা' সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া নাট্যকার আখড়ায় গিয়া বাবাজীর নিকট নবাবপুত্রের গান শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—"বাবাজীর আখড়ায় গিয়ে কি ছাই গান শিখে আসিস্।" (আশমান—২য় দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক) দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান নাটকের চতুর্থ অঙ্কে টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদ কক্ষে পিয়ারা বেগমকে দিয়া শ্যাম বিষয়ক সংগীত পরিবেশন করাইয়াছেন। মনে হয়, ইহার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে বর্তমান

1. **Kalapahar was wounded on the field, and after a vigorous fight the imperialists won. Daud, whose horse had been bogged, was brought in a prisoner. P. 104 Akbar the Great Mogul—V. A. Smith (Delhi, 1962)**

2. **The Khan was desirous of saving his life for he was very handsome man, but nobles urged that if his life were spared suspcions might arise as to their loyalty. So he orderd him to be beheaded. His execution was a very clumsy work, for after receiving two chops he was not dead, but suffered great torture. At length his head was cut off. It was then crammed with grass and anointed with fumes, and placed in charge of Saiyid Abdulla Khan. P. 238, Abdul Kadir's Tarikh-i Badauni Vol. II—Eng. Trans. by H. M. Elliot & J. Dowson (1875)**

নাট্যকার সচেতন। সেই জন্যই সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে নবাব পুরীর বাহিরে বাবাজীর আখড়ায়; এবং গানকে কেবল গান রূপেই গ্রহণ করিয়া নবাব প্রাসাদে (১ম দৃশ্য, ২য় অঙ্ক) নাট্যকার ইহা পরিবেশন করাইয়াছেন। কিন্তু গানকে কেবল গানরূপে দেখিলেও ইহার পরিবেশনে যুগোচিত সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্যতা বজায় রহিয়াছে কি? নাজামুদ্দিন আহমদ্ 'তবকৎ-ই-আকরবী' গ্রন্থে সুলেমান করবানীর পুত্র দায়ুদ খাঁ সম্পর্কে বলিয়াছেন [1]"But Daud was a dissolute scamp, and knew nothing of the business of governing."

কিন্তু বর্তমান নাটকের নবাব দায়ুদ খাঁ সুশাসক ও জাতির চালক। তাই তাহার মধ্যে ধর্মান্ধতা নাই,—

দায়ুদ—ধর্ম! ধর্ম! কোথায় ধর্ম, ধর্ম আছে এই অন্তরের মধ্যে। অন্তরকে হিংসায় কলুষিত রেখে জীবনভোর নমাজ পডলেও খোদার দোয়া মিলবে না, শতজন্ম নাম জপ করলেও ভগবান দেখা দেবেন না। খোদা আর ভগবানে কোন বিরোধ নেই, যত বিরোধ এই মাটির মানুষ রাম আর রহিমের মধ্যে। (৩য় দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

দায়ুদ খাঁ সুশাসক ও সুবিচারক বলেই সে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, সম্প্রদায়ের চেয়ে দেশ ও জাতি তাহার কাছে বড। সুতরাং তাহার প্রধান পরিচয়, সে বাঙালী ও বাংলার শাসন কর্তা,—

আশমান এ রাজত্ব কি মুসলমানের না হিন্দুর?

দায়ুদ— মুসলমানের ও নয় হিন্দুর ও নয়, এ রাজত্ব বাঙ্গালীর। (৩য় দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, তাহার পরেও দুই দেশেই উভয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যাহাতে প্রশমিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লোকনাট্যকারগণ নাটক রচনা করিয়াছেন বলিয়া ঐতিহাসিক চরিত্রেও এ জাতীয় কল্পনার রঙ মাখানো হইয়াছে। দায়ুদখাঁকে খুশিমত রূপান্বিত করিয়া নাট্যকার তাহার মধ্য দিয়া আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। দায়ুদখাঁ ইতিহাসের চরিত্র নহে, নাট্যকারের কল্পনা। আকবর শাহ হিন্দুমুসমান-ঐক্যের

1. Tabakat-i Akbari Vol. V p. 373, Khaja Nizam Uddin Ahmed, Eng. Trans. (P. II) by H. M. Elliot & J. Dowson (3rd Edition, Calcutta)

জন্ত 'দীন ইলাহি' ধর্ম প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া ব্রজেন্দ্রকুমার এই নাটকে মুসলমানের আজানের ধ্বনির সঙ্গে হিন্দুর কাঁশর ঘণ্টাধ্বনি মিলাইয়া এক নূতন সঙ্গীতপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। এই নূতন সংগীত প্রবাহ সৃষ্টির পরিকল্পনা রজনীকান্তের একটি কবিতাকেও স্মরণ করাইয়া দেয়—

> [১] "আয় ছুটে ভাই হিন্দুমুসলমান!
> ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দু নয়ান।
> আজ এক করেদে সন্ধ্যা নমাজ
> মিশিয়ে দে আজ বেদ কোরাণ!"

এই মনোভাব লইয়াই 'সত্যপীর' চেষ্টা করিয়াছে এক নবধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে। সত্যপীর মতিচ্ছন্ন যুবক, সে হিন্দুরও নহে, মুসলমানেরও নহে,—সে মানুষের। সত্যপীর হিন্দুলাম (হিন্দু+ইসলাম) ধর্মাবলম্বী, খোদাবানে (খোদা+ভগবান) বিশ্বাসী এবং পূমাজ (পূজা+নামাজ) তাহার ধর্ম-কর্ম। বাঙ্গালীকে ক্লেদমুক্ত করিয়া উদ্ধার করিবার জন্য সে টিকি ও দাড়ি রাখিয়া অবতার সাজিয়াছে; মানুষকে ভালবাসাই তাহার প্রধান কাজ। মনুষ্যত্ব-লইয়া বঙ্গজননীকে ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে স্থাপন করিয়া পূর্ণমাত্রায় বাঙ্গালী হইতে না পারিলে এ জাতির আশা ভরসা নির্মূল হইবে। ইহাই নাটকের মূল বক্তব্য,—

সত্যপীর—কি করে বাঁচবো? আমি হিন্দু না মুসলমান?

দায়ুদ—তুমি বাঙ্গালী।

সত্যপীর—আমার ধর্মটা কি?

দায়ুদ—মানুষের ধর্ম।

সত্যপীর—মানুরে ধর্ম!

দায়ুদ—হ্যাঁ সত্যপীর! তুমি হিন্দু বা মুসলমান হতে যেয়ো না। তুমি হবে মানুষ। তোমার দেবতাকে তুমি আরাধনা না করেই পেয়েছ।

সত্যপীর—কে সে দেবতা যাকে চাওয়ার আগেই পাওয়া যায়?

দায়ুদ—তোমার জন্মভূমি। এই সুজলা সুফলা বঙ্গ জননী—তোমার সে আরাধনার ধন। এর মধ্যে খোদাও আছেন, ভগবান আছেন,। তোমায়

১। 'মিলন'—বাণীগ্রন্থ, রজনীকান্ত

নামাজ পড়তে হবে না, পূজোও করতে হবে না; তুমি বাঙ্গলা মায়ের সেবা কর। (৪র্থ দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

হিন্দুর মধ্যে যেমন ভাল মন্দ দুই প্রকারের লোক আছে, মুসলমানের মধ্যেও তেমনি উভয় প্রকারের লোকের অভাব নাই। দায়ুদখাঁর নাজির (পরে সিপাহশালাব) কর্তব্যপরায়ণ, কৃতজ্ঞ ও জনদরদী 'মোবারক' এবং আকবর বাদশাহের তহশীলদার শয়তান 'আলি মনসুরের' মধ্য দিয়া নাট্যকার ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। মুসলমানকে হিন্দু যে কথা বলিলে তাহার দম্ভ আহত হইতে পারে নাট্যকার মুসলমান চরিত্রের মুখেই তাহা বলাইয়াছেন। এই কৌশল অবলম্বন করায় বক্তব্য প্রকাশে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

দায়ুদের দশহাজারী মনসফদার মোবারক ও আকবরের তহশীলদার আলিমনসুর পরস্পরের পরিচিত। এইরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যপরিস্থিতি রচনায় বেদেনীর বেশে মোবারকের বিপক্ষের শিবিরে প্রবেশ এবং আলি মনসুরের নিকট দাওয়াইর গুণাগুণ বর্ণনা ও শিবিরস্থ গণপতি-ভগ্নী 'ছবির' প্রতি বশীকরণ প্রয়োগ-ব্যবস্থার জন্য আলিমনসুরের সঙ্গে গমন করিবার পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না।

দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু নাটকে ইহার পরেও একদৃশ্যে সমাপ্ত একটি অঙ্ক যুক্ত হইয়াছে। এই অঙ্কে মোগল সেনাপতি মুনীম খাঁর আদেশ অমান্য করিয়া আলি মনসুর তাহার বীভৎস জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণপতি ও মোবারককে অস্ত্রহীন অবস্থায় হত্যা করেন। মোবারক মৃত্যুর পূর্বে মিলিত হিন্দু-মুসলমানের শক্তির হুঙ্কারে দিল্লীর সিংহাসন টলাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালীর জাতি-ধর্ম-বিদ্বেষ হীনতা ও দেশপ্রেমের মনোভাব নাটকে পূর্বেও নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই অঙ্কে নতন করিয়া ইহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই অঙ্কে মুনীম খাঁ আলি মনসুরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। অন্যায়কারীর ও পাপাচারীর শাস্তিবিধান লোকনাট্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই মুনীম খাঁর আদেশে বান্দা ও বাঁদীর নৃশংস ছুরিকাঘাতে আলি মনসুরের জীবন-দীপ নির্বাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দায়ুদের মৃত্যুর পরে এই বাকি কাজ শেষ করিবার জন্য পঞ্চম অঙ্কটি নাটকে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নাটকে আদি, করুণ, বীভৎস ও বীররস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 'বাঙ্গালী' নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে বলিয়া বর্তমানে

ইহার দশম মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'লালপাঞ্জা' নামে ইহার সংক্ষিপ্ত রূপ 'রঙ মহল' মঞ্চে কয়েকবার অভিনীত হয়। [1]হিস্ মাষ্টারস্ ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই লোকনাট্যের রেকর্ড করা হয়।

ধরার দেবতা (১৯৪৯)-- বাণিজ্য করিতে আসিয়া ঘরভেদী বিভীষণ সৃষ্টি পূর্বক কীর্তিধ্বজ কাঞ্চনগিরির রাজদণ্ডের অধিকারী হইলেন। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় তিনি সরকারী তাবেদার, অর্থগৃধ্নু ও অসাধু শ্রেষ্ঠীর সাহায্যে কাঞ্চনগিরিতে অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ চালাইতে থাকেন। দেশকে এই দুর্দশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য অহিংস আন্দোলনের হোতা 'শুকদেব' বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে অভূতপূর্ব জাগরণের তরঙ্গ তুলিয়া জনচক্ষের নিদ্রা দূরীভূত করিতে সচেষ্ট হইলেন। বিদেশী পণ্য বর্জন ও দেশছাড় আন্দোলনে কীর্তিধ্বজের সিংহাসন তিনি কাঁপাইয়া তুলিলেন। দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মবিদ্বেষ ছড়াইয়া কীর্তিধ্বজ এই আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। বহু রক্তপাতের পরে শুকদেবের প্রভাবে এই ধর্মদ্বন্দ্বের অবসানে কীর্তিধ্বজ সর্বরক্ষার জন্য শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করায় শুকদেব অম্বরকে দিয়া দেশলক্ষ্মী 'নন্দিনী'র আবাহন করিলে কাঞ্চনগিরি শৃঙ্খলমুক্ত হয়। দেশলক্ষ্মীর এই বন্ধন মোচনের পরে আততায়ীর গুলিতে শুকদেব জীবন বিসর্জন দেন। এই কাহিনী লইয়া ধরারদেবতা লোকনাট্য রচিত হইয়াছে। এই রূপক নাট্যের প্রধান অবলম্বন অহিংস-আন্দোলনের উদ্‌গাতা মহাত্মা গান্ধী। নাটকের 'শুকদেব' চরিত্র গান্ধীজী, 'সব্যসাচী' সুভাষচন্দ্র, 'অম্বর' জওহরলাল, 'কীর্তিধ্বজ' ইংরেজ শাসক, বৈষ্ণব সমাজপতি 'চারুভদ্র' হিন্দু, শাক্ত সমাজপতি 'মহানাদ' মুসলমান, 'নন্দিনী' দেশলক্ষ্মী এবং কাঞ্চনগিরি ভারতরূপে কল্পিত হইয়াছে। নাট্যকাহিনীতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের 'অসহযোগ আন্দোলন', ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারত ছাড় আন্দোলন', ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, দেশের মুক্তির জন্য সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ ও স্বাধীনতা লাভের পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে গান্ধীজীর জীবদ্দশায় ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগের সত্য নাটকে বিশেষভাবে ধরা পড়ে নাই। গান্ধী পরিচালিত বিদেশী শিক্ষা বর্জন লবণ আইন ভঙ্গ, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন এই নাটকে গৃহীত হয় নাই। স্বাধীনতা লাভে মহাত্মা গান্ধীর

1. Set No. 407—(N83188—N83193—H.M.V. Records)

কয়েকটী কর্মপদ্ধতি ও মূল অহিংস-নীতি অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। আদি, করুণ, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস ভাবকে প্রাধান্য দিয়া রচিত এই পঞ্চাঙ্ক নাটক নিউ গণেষ অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রা ব্যালেসহ ইহাতে প্রায় বিশখানি গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রাজা কীর্তিধ্বজ বিদেশী শাসক, তিনি অত্যাচারী ও শোষণকারী। তিনি দেশবাসীকে শান্ত রাখিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না। বৈষ্ণব শাক্তের মধ্যে ধর্ম লইয়া গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া শেষ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব কায়েম করিবার চেষ্টা করেন। আর এই কাজে অর্থলোলুপ তাবেদার ও শান্তশীলের মত ধনপিশাচ শ্রেষ্ঠীরা রাজশক্তির প্রধান সহায়তা করেন। কীর্তিধ্বজের প্ল্যান বাস্তবে রূপায়িত হইয়া দেশে রক্ত গঙ্গা বহাইয়া দেয়। কীর্তিধ্বজ অত্যাচারী শাসক হইলেও রাজনৈতিক কৌশল তাহার আয়ত্তে। লোক চরিত্রেও তাহার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তিনি বলবন্ত ও শান্তশীলকে যেমন চিনিয়াছেন তেমনি ধরার দেবতা 'শুকদেবকে' চিনিতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই শাসক কাঞ্চনগিরির সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্পর্ক ও মানদণ্ড বজায় রাখিবার জন্য সময় থাকিতে শাসন দণ্ড পরিত্যাগ করেন,—

কীর্তিধ্বজ—সাগর পেরিয়ে আসছে সব্যসাচী, অনশনে বাতাসে আগুন ধরিয়েছে শুকদেব, আজ যদি দাম না দিই, কাল রাজদণ্ড যাবে, মানদণ্ডও পাব না। ওরে মূর্খ, আমরা বেনে -সিংহাসন আমাদের চাই না, শুধু চাই দাঁড়ি-পাল্লা। (২য় দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক)

'মহানাদ' শাক্ত সমাজপতি, গোঁয়ার, নির্বোধ ও ধর্মান্ধ। 'চারুভদ্র' বৈষ্ণব সমাজপতি; প্রবল ধর্মবিশ্বাস, নারীর প্রতি মর্যাদা বোধ, স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা ও উদার মনোভাবের পরিচয় তাহার চরিত্রে রহিয়াছে। মহানাদের স্ত্রী 'এলোকেশী' স্নেহপ্রবণ নারী, প্রয়োজনের সময় তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারেন। দেবতা অপেক্ষা স্বাধীনতা তাহার কাছে অনেক বড়। তিনি মহানাদকে ধর্মদ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করাইবার চেষ্টা করেন। অত্যাচারী, স্বার্থপর, ও হৃদয়হীন সেনাপতি বলবন্তের কন্যা 'ভ্রমর' শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও হৃদয়বৃত্তির দিক হইতে তিনি পিতৃবিরোধী। তাহার নারীসুলভ কোমলতার যেমন অভাব নাই তেমনি তিনি বিচারবোধ হইতেও বঞ্চিত নহেন। যে দেশের নুন খাইয়াছেন সে দেশের ক্ষতি করিবার বাসনা তাহার নাই। কীর্তিধ্বজের অত্যাচার-যন্ত্র সেনাপতি 'বলবন্ত' এবং

ঘরভেদী বিভীষণ অর্থপিশাচ 'শান্তশীল'কে অপঘাত মৃত্যুর মধ্য দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শুকদেব ধরার দেবতা; অন্যায়, অত্যাচারও অবিচার সহ্য করিয়াও অহিংসা নীতি তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। তাহারই কর্মোদ্দীপনায় দেশে ব্যাপক জনজাগারণ সম্ভব হইয়াছে এবং প্রধানত তাহারই আন্দোলন প্রচেষ্টার ফলে দেশকে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিয়া কীর্তিধ্বজকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ক্ষমাশীল শুকদেব শত্রুমিত্রকে সমভাবে ভালবাসিতে জানিতেন। যে জহ্লাদ তাহাকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দেয় মৃত্যুর সময় তাহাকেও তিনি অভিশপ্ত করিতে পারেন নাই। তিনি স্বাধীনতা-সমুদ্রমন্থনের গরল পায়ী সর্বত্যাগী শক্তিমান শংকর।

বিচারক (১৩৬৩):—এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক নবরঞ্জন অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। ইহার গানের সংখ্যা সতের। উজ্জয়িনীর সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে (৩৮০—৪১৩খ্রীঃ) অবলম্বন করিয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। বত্রিশ সিংহাসনের অধিকারী বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আদর্শ বিচারক ছিলেন। নাটকে সম্রাটের বিচার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে বিচারক। নাটকে ঐতিহাসিকতা অপেক্ষা কল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সূচনা অংশে বলা হইয়াছে যে বিক্রমাদিত্যের নিরপেক্ষ বিচার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দেবগুরু বৃহস্পতি শূদ্র পণ্ডিত 'জগন্নাথ' রূপে এবং দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রী 'বিনায়ক' রূপে মর্তে আগমন করেন। সম্রাট বিচারে সমদর্শী,—

বিক্রমাদিত্য—বিচারকের কাছে পুত্র বা দৌহিত্র কেউ নেই। এই মাত্র আমি আমার পুত্রের প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছি। (৪র্থ দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

নাট্য পরিণতিতে দেখান হইয়াছে যে ধর্ম বজায় রাখিয়া পক্ষপাতহীন বিচার করিবার ফলে বিক্রমাদিত্য বত্রিশ সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। বিক্রমাদিত্য চরিত্রে অপত্য স্নেহ ও রাজকর্তব্যের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বে কর্তব্যের জয় ঘোষিত হইয়াছে। সম্রাট বিক্রমাদিত্যের পুত্র 'সোমনাথ' লম্পট ও উচ্ছৃঙ্খল। কারারুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যুর পরিবর্তে তাহার পুত্র 'স্কন্দের' জীবন-দান-বাসনা ও অনুচর 'পক্ষিরাজের' মৃত্যু বরণের প্রচেষ্টা দেখিয়া তাহার চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সোমনাথের রুগ্ন বালকপুত্র 'স্কন্দ' চরিত্র পিতৃভক্তি ও আত্মত্যাগের মহিমা লইয়া রূপায়িত হইয়াছে। পক্ষিরাজ ও তাহার স্ত্রী 'ভূতি' চরিত্রদ্বয় প্রধানত হাস্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে নাটকে সংযোজিত

হইয়াছে। কিন্তু পক্ষীরাজকে নাট্যকার দুইটি দিক হইতে নাটকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রথমত যে শিশু হত্যার জন্য সোমনাথ অভিযুক্ত সে হত্যার অনুষ্ঠাতা পক্ষিরাজ, আদেশদাতা সোমনাথ, দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ-সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেনাপতি 'দারুমুখ' যে চক্রান্ত করিয়াছেন পক্ষিরাজ তাহা প্রকাশ করায় বিক্রমাদিত্য সেনাপতি সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইতে পারেন। পক্ষিরাজ পরবর্তী জীবনে নিস্পৃহ হইয়া ধর্মপথের যাত্রী হইলেন। ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক ও লুব্ধ সেনাপতি দারুমুখের পুত্র কমলাক্ষ বীর, বিশ্বস্ত, কর্তব্যপরায়ণ ও প্রেমিক, সম্রাট-নন্দিনী প্রভার প্রতি তাহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল বলিয়া তাহার তুষ্টিবিধানে নিজের ছিন্ন শির উপহার দিয়া উজ্জয়িনী ও বিদর্ভের দ্বন্দ্ব সমাপ্ত করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রভা তেজস্বিনী বিদর্ভরানী, পিতৃভক্তি অপেক্ষা বংশের মান তাহার কাছে বড়। তাই স্বামিহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিক্রমাদিত্যের বিরোধিতা করিতে তিনি শঙ্কা বোধ করেন নাই। কমলাক্ষের আত্মত্যাগে তাহার মনের কালিমা দূরীভূত হয় এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে। শূদ্র পণ্ডিত জগন্নাথের স্ত্রী মহামায়া একমাত্র বালকপুত্র 'বলাইর' হত্যার পরে শোকে উন্মাদিনী হইয়াছেন। পক্ষিরাজের একাধিক অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত পুত্রের ছবিটি তাহার সমগ্র মানসচেতনা অধিকার করিয়াছে। শোকাভিভূত মাতৃমনের এই অবস্থা লইয়া নাট্যকার একটি করুণ নাট্য পরিবেশ রচনা করিয়াছেন,—

(কুটীর, মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া—কে ডাকে? মা মা বলে কে ডাকলে? সেই কণ্ঠ, তেমনি পাগল করা সম্বোধন! বলাই এসেছিস আয় বাবা আয়। ভাত রেঁধে কতক্ষণ ধরে বসে আছি। ক্ষিধে পায় নি? বেলা যে গড়িয়ে গেল!

(রক্তাপ্লুত বালকমূর্তির প্রবেশ—গীত)

বালক—মাগো, আকাশ-গাঙ্গে মিলছে না পার যত চলি সরে যায়।
একা একা আর পারিনা চলিতে আয় তুই সাথে আয়।

মহামায়া—আমি যাবো, আমি যাবো।

বালক—(পূর্ব গীতাংশ) রেঁধেছিলি ভাত, পাইনি মা খেতে
ক্ষুধার আগুন জ্বলে জঠরেতে
পিপাসায় জ্বলি আর কারে বলি বুক ফাটে বেদনায়।

মহামায়া—যাদু আমার, সোনা আমার—

বালক—(পূর্ব গীতাংশ) কবে নিবি কোলে কবে খাবি চুমো
রূপকথা বলে বলিবিমা, 'ঘুমো'
কাটে না যে দিন শূন্যে জননী কূলহারা দরিয়ায়।

মহামায়া—বলাই, বলাই—(ছায়াকে আলিঙ্গন করার বৃথা চেষ্টা,
বালক মূর্তির অন্তর্ধান, মহামায়ার পতন, ৫ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)

মহামায়া ইন্দ্রসভার অপ্সরা, সাপভ্রষ্ট হইয়া তিনি মর্তে আসেন। সতীত্ব, বাৎসল্য ও প্রবল প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছা লইয়া এই চরিত্র রূপায়িত। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মৃতপুত্রের অস্থি তিনি সঙ্গে করিয়া বেড়ান। এই চরিত্রে বীভৎস ভাবেরও অবতারণা করা হইয়াছে। নাট্যরচনায় আদি, বাৎসল্য, বীর, বীভৎস ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

সোনাই দীঘি (১৯৬১) পল্লীগাথার নাট্যরূপ এই পঞ্চাঙ্ক রচনাটি সত্যম্বর অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। যাত্রা ব্যালেসহ ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত সোনাই নামক প্রাচীন পল্লীগাথার নাট্যরূপ এই সোনাই দীঘি।" দেওয়ান ভাবনাকাজি হিন্দুবিদ্বেষী, অত্যাচারী ও নারী লোলুপ। মাতাপিতৃহীন দুঃখিনী পল্লীবালা সোনাই দুর্দান্ত ভাবনাকাজির লোলুপ দৃষ্টির বাইরে থাকিয়া স্বামী প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বিষ পানে আত্মহত্যা করেন এবং দেওয়ান ভাবনা নবাব প্রদত্ত মৃত্যু বরণ করিয়া ইহজীবনের অত্যাচারলীলা সমাপ্ত করেন। নাটকের ইহাই মূল কাহিনী। গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের রাজত্বের (১৪৯৩—১৫১৮ খ্রী) পটভূমিকায় নাট্যকাহিনী উপস্থাপিত হইয়াছে। রাজ্যে সুশাসন পরিচালিত করিতে হইলে শাসনকর্তার বিশেষ কোন একটি লোকের কাজের উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়া কীর্তন-কবিত্বে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। রাজ্যপরিচালনার জন্য একাধিক বিশ্বস্ত ও দায়িত্বপূর্ণ লোকের উপর যেমন কার্যভার প্রদান করা প্রয়োজন তেমনি দশটা চোখ সদা জাগ্রত রাখিয়া শাসকদের শাসনকার্যে ব্যাপৃত থাকা কর্তব্য। নাট্যকারের ইহাই মূল বক্তব্য। নবাব হোসেন শাহ এবং দীঘল হাটির রাজা প্রতাপ রুদ্রের পুত্র মাধবের সংলাপে এই বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে (১ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)। দীঘল হাটির রাজপুত্র মাধব রায় একনিষ্ঠ প্রেমের জন্য হাসিমুখে রাজ্যের দাবি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি কর্মতৎপরতা, সাহস ও

বীরত্বের অধিকারী। তথাপি বঙ্গেশ্বর নবাব হোসেন শাহের সম্মুখে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে উক্ত—"আবার আসবো আমরা বঙ্গেশ্বর। বিচার যখন পেলাম না, তখন আমরা আপনাকে টেনে সিংহাসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।" —এই সংলাপে যুগোপযোগী সম্ভাব্যতার মাত্রা বজায় হিয়াছে একথা বলা যায় না। প্রতাপরুদ্র বিবাহ ব্যাপারে পুত্রের উপর অবিচার করিলেও পিতৃভক্তিকে মাধব মন হইতে মুছিয়া ফেলেন নাই। ভ্রাতৃপ্রেম, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়বোধ ও দরদী মন অবলম্বনে রাজভাগিনেয় যাদব চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। রামরহিমে ভেদ জ্ঞানহীন, সাহিত্য-সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও প্রজাপালক বঙ্গেশ্বর নবাব হোসেন শাহের রাহুগ্রহ 'দেওয়ান ভাবনা কাজি'। হিন্দুবিদ্বেষী, লম্পট ও অত্যাচারী ভাবনা সমস্ত রাজকার্যে ইস্তফা দিয়া হিন্দুনারীর রূপসেবা করেন। তাহার জন্য হিন্দুনারীর ঘরের বাহিরে আসা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহার অন্তরের কামুক হিংস্র পশুটা যেন সর্বদাই দাঁত খিঁচাইয়া থাবা উদ্যত করিয়া রহিয়াছে। ভাবনা কাজির অস্ত্র মুসলমানের শিরচ্ছেদ করে না বটে কিন্তু হিন্দুরা ইহার ভয়ে ত্রস্ত। তাহার চরিত্র সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অধিগত হওয়ায় নবাব তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে প্রজাপুঞ্জ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পরে মামার বাড়ীতে বাসন মাজিয়া, রান্না করিয়া, ঝাঁট দিয়া, গোসেবা করিয়া এবং মামীর নির্যাতন সহ্য করিয়া সোনাইকে দিন কাটাইতে হয়। সোনাই দুঃখের আগুনে পুড়িয়া নিখাদ সোনা লইয়া উঠে। নারীত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ ও প্রেমনিষ্ঠা তাহার যেমন প্রবল ছিল, দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতাও তাহার তেমনি অসীম ছিল। মামার বাড়ীতে দুঃখের কটাহে ভর্জিত এবং শ্বশুরবাড়ীতে দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া কেবলমাত্র মাধবের ভালবাসা সম্বল করিয়া সে দিন কাটায়। সেই মাধবের বিপন্ন জীবন রক্ষা ও নারীত্বের লাঞ্ছনার নিষ্কৃতির জন্য সোনাই বিষপান করিয়া জীবনের সমাপ্তি-রেখা টানে।

'মুক্তকেশী' ভাটুক ঠাকুরের মুখরা স্ত্রী। ভাটুকের ভাগ্নী সোনাইকে তিনি অনেক কষ্ট দিয়াছেন, দিবারাত্র কটুকথাও শুনাইয়াছেন। কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকাশের কাঠিন্যের আবরণের অন্তরালে সোনাইর জন্য তাহার আন্তরিক স্নেহ সঞ্চিত ছিল। ভাইফোঁটার দিনে রাজবাড়িতে সোনাইর জন্য তিনি হার, নাড়ু পাঠাইতে ভোলেন নাই এবং সোনাইর প্রতি সমাজপতি বাচস্পতির অবিচারের জন্য ঝাঁটা দেখাইতেও দ্বিধা করেন নাই। সোনাইর বিরুদ্ধাচরণকারী

'অবতারকেও' তিনি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সোনাইর চরিত্র সম্পর্কে মুক্তকেশীর উচ্চ ধারণা ছিল। বাহিরে কঠিন অন্তরে পেলব মুক্তকেশীর চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব ছিল না। অন্যায়ের প্রতিবিধানে তিনি সম্মার্জনি-অস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণা। প্রতাপরুদ্রের ভগ্নী মল্লিকা চরিত্র অকৃতজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণ্য স্বার্থপরতা লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। ভাটুকঠাকুরের শ্যালক নিষ্কর্মা ও অর্থলোভী। অর্থের জন্য তিনি যে কোন জঘন্য কাজ করিতে পারেন। প্রধানত এই চরিত্রের মধ্য দিয়া হাস্যরস পরিবেশন করা হইলেও নাট্যকার ইহাকে নাট্যঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়াছেন। ভাটুকের শ্যালক 'অবতার' স্থূল হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। এই রস পরিবেশনে দুই একটি জায়গায় সংযম-বন্ধন রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—

(ক) আগাবাসী খাঁ—বাজে কথা রেখে দাও শালাঠাকুর।

অবতার—শালাঠাকুর বলছ কেন মিঞা? বরং বোনাই ঠাকুর বলতে পার। শালা আমি একজনেরই, আর কারো শালা হবার উপায় নেই। বুঝলে হাগা খাঁ? আচ্ছা বড় মিঞা, এত খাবার জিনিষ থাকতে তোমার নাম হাগা খাঁ হল কেন? রসগোল্লা খাঁ, সন্দেশ খাঁ, চাইকি ছাগী খাঁও হতে পারত, তা নয়, একেবারে হাগা খাঁ!

আগা—হাগা খাঁ কে বললে? আমার নাম আগাবাসী খাঁ।

অবতার—তাই বলো—আগাবাসী খাঁ। খুব চালাক তুমি, গোড়া না খেয়ে একেবারে আগায় থাবলা দিয়েছ। তবে তা টাটকা না খেয়ে বাসী করে খেলে কেন? ভাবনা কাজির জন্য যত মাল নিয়ে যাও, সবারই আগা খাও নাকি তুমি হাগা খাঁ? (৪র্থ দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

(খ) অবতার—বাড়িতে জরু আছে?

আগাবাসী—তাতো আছেই; তবে পাঁচ বছর দেখা হয়নি।

অবতার—সেকি আর তোমার আছে মিঞা? তোমার খেয়ে সে এখন হয়ত অপরের গুণ গাইছে।

আগা—অ্যাঁ!

অবতার—অ্যাঁ কি! পাঁচ বছর ফেলে রাখলে জরু আর গরু ঠিক থাকে? ছেলেপিলে আছে?

আগা—তিন বছরের একটি ছেলে আছে।

অবতার—তিন বছরের ছেলে! আহা, বেঁচে থাক, বাপের নাম উজ্জ্বল করুক। এর নাম রেখো জারজ আলি খাঁ। খুব লাগতাই নাম হবে।

আগা—তাত হবে, কিন্তু অর্থ টা কি হল ?

অবতার —সে তুমি বুঝবে না, ছেলের মাকে জিজ্ঞেস কর।

(৪র্থ দৃশ্য, ১ম অঙ্ক)

উল্লিখিত সংলাপের সঙ্গে নাট্য ঘটনার অবশ্য সংযোগ নাই। শুধু হাস্যরস পরিবেশন ইহার উদ্দেশ্য। যাহাদের লক্ষ্য করিয়া লোকনাট্য রচিত হয় তাহাদের পক্ষে যদি স্থুল হাস্যরস গ্রহণ খুব সহজ হয় তাহা হইলেও সচেতন-ব্যক্তি রচিত পালায় সেই স্থুল হাস্যরসে কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকা অবাঞ্ছিত নহে। ভাবনা কাজির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মধ্য যুগের বাংলার নবাব হোসেনশাহের ভিখারীর ছদ্মবেশে ভাটুকের গৃহ সম্মুখে আসিবার পরিকল্পনায় ঐতিহাসিকতা ও সম্ভাব্যতার মাত্রা বজায় নাই। হোসেনশাহ কাল্পনিক চরিত্র নহে, তিনি বাংলার নবাব। কাজেই এই চরিত্রে তৎকালীন নবাবোচিত সম্ভাব্যতা বজায় রাখা দরকার। রূপকথার রাজা আর ঐতিহাসিক নবাবের কর্মপন্থা এক রকম নহে। নাটকের চরিত্র চিত্রণে সম্ভাব্যতাও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখিতে হইবে—[1]"...the paramount significance of characterisation in modern drama⋯ ⋅ securing the effect of probability and therefore of credibility. ·········The action he represents must seem to be within probability·· ···"

নাটকের গল্পাংশ গঠনের সময় নাট্যকার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দর্শকের কথা ভাবিয়া থাকেন, নাট্যকারের গল্প গঠন সম্পর্কে বলা যায়,—
[2] "Story telling is necessarily relative to audience to whom the story is to be told. One must assume an audience of a certain status and characteristics before one can rationally discuss the best methods of appealing to its intelligence and its sympathies." এখানেও এই লোকনাট্যকার হয়ত অশিক্ষিত বা

1. Shakespearian Comedy—P. 132 H. B. Charlton (Lond. 1967)
2. Playmaking—A Manual of Craftsmanship—P. 11
William Archer (New York—1926)

শিক্ষিত-কল্প পল্লী-দর্শকদের নবাবের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করিবার জন্য এইভাবে ঘটনা-পরিকল্পনা করিয়াছেন।

'সোনাই দীঘি' জনপ্রিয় লোকনাট্য। আদি, বীর, রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য ও করুণ রসের অবতারণা করিয়া 'সোনাই দীঘি' রচিত হইয়াছে। হিজ মাস্টারস্ ভয়েস্ গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক এই লোকনাট্যের রেকর্ড করা হইয়াছে।

সম্রাট জাহান্দার (১৩৬৯) ইহা নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ব্যালের গান সহ ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় তের। আলমগীরের পুত্র বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হোসেন ও আবদুল্লার প্রচেষ্টায় বাহাদুর শাহের (১৭০৭ ১৭১২ খ্রী) পুত্র মইজুদ্দিন জাহান্দার শাহ (১৭১২ -১৭১৩ খ্রী) নাম ধারণ করিয়া এগার মাসের জন্য দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করেন। সৈয়দ ভ্রাতাদের সংগে মতের অমিল হওয়ায় সৈয়দ হোসেনের চক্রান্তে জাহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোকশিয়ার তাহাকে হত্যা করিয়া ময়ূর-সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে দিল্লীর বাদশাহী লইয়া উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি চলিতে আরম্ভ হয়। জাহান্দার মাত্র এগার মাসের জন্য দিল্লীর তক্তে বসিয়া ঐ বিবাদের ফল ভোগ করেন। শাকী ও সুরার স্রোতে ভাসমান খেয়ালী, [১]"অতিশয় বিলাসী, কর্মবিমুখ ও আত্মপরায়ণ" এবং [২]"লালকুমার নামক নর্তকীর অতিশয় অনুগত" জাহান্দারকে রূপায়িত করিতে গিয়া নাট্যকার ঐতিহাসিকতা অপেক্ষা কল্পনাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন। নাট্যকার বাদশাহকে সাম্প্রদায়িকতাহীন, প্রজাদরদী ও হৃদয়বান শাসকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। জাহান্দার ভ্রাতৃহত্যা করিয়া দিল্লীর তক্তে বসেন। ইতিহাসকার তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

[৩] "...threw himself into sensual pleasures to the neglect of all business of Government. Although he was 51 years of age at the time of his accession and have sons and grandsons he spent his time in the company of a concubine named

১। জীবনীকোষ (ভারতীয় ঐতিহাসিক), পৃ ৬৯২, ৩য় খণ্ড, ১৩৪৫

২। ঐ, শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার।

3. The Mughul Empire, p. 424, 4th Edi. Dr. A. L. Srivastab; (1964-Agra.)

Lal Kumari…Jahandar Shah spent his days in baffoonary and nights in drunken frolics.

নাট্যকার কল্পনা করিয়াছেন যে জাহান্দার খেয়ালিপনা চরিতার্থ করিবার জন্য "বস্তীতে বস্তীতে চানাচুর বিক্রি করছে" (২য় দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)। হোসেন কর্তৃক সম্রাটের বিরোধিতার অন্যতম কারণ এই সম্ভ্রমহীন খেয়ালিপনা। আকাশের মত উদার, শিশুর মত সরল মাতৃভক্ত জাহান্দার স্নেহ ও ক্ষমাগুণের অধিকারী বলিয়া অপরাধী ফেরোককে তিনি মুক্তিদান করেন। ইহা নাট্যকারের পরিকল্পনা। নাটকের জাহান্দার চরিত্রে বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও তাহার রাজনীতি-বোধে অধিকার ছিল না। হোসেন কূটকৌশলী ও হৃদয়হীন। তাহারই চক্রান্তে হিংস্র, ক্রুর, উদ্ধত, অকৃতজ্ঞ ও সিংহাসনলোভী জামাতা ফেরোকশিয়ার ময়ূর সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। হোসেন 'King-maker' রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। জুলফিকার বীর, বুদ্ধিমান ও কৃতজ্ঞ। কিন্তু পিতা উজীর আসাদখাঁর অতিরিক্ত অর্থ লালসাই তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। জাহান্দারের স্ত্রী হাসিনা বেগম আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সচেষ্ট। তিনি যে একজন আতর ওয়ালীর কন্যা ছিলেন এই স্মৃতিই তাহাকে .বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা দান করিয়াছে। তাহার পূর্বজীবনেতিহাস ভুলাইয়া দিবার জন্য তিনি সতত ক্রুদ্ধ, ও উদ্ধত ব্যবহারে রত। তাহার মধ্যে নারীত্বের স্নেহশীতল স্পর্শের অভাব রহিয়াছে। বৃথা মর্যাদাবোধ ইহার কারণ। মনসফদার সোমেশ্বর-পত্নী 'লালকুমারী' পতিগত প্রাণা। কৃতজ্ঞতা বোধের জন্যই তিনি সম্রাটের মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত। কিন্তু সোমেশ্বর ভুল বুঝিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া অনুতাপ দগ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। লালকুমারী চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার ঐতিহাসিকতা বজায় রাখিতে পারেন নাই। নাটকে পরিস্থিতি রচনায় কোন কোন স্থলে আকস্মিকতার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু নাট্য রচনায় ইহা পরিত্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বন্দী সোমেশ্বর আনীত হইবার পরে লালকুমারীর প্রবেশ আকস্মিক ও অবান্তর। দিল্লীর লালকেল্লায় বন্দীর বিচারস্থলে খুশিমত যে কোন লোকের প্রবেশ অধিকারে সম্ভাব্যতার মাত্রা বজায় থাকে না। জাহান্দারের ভূতপূর্ব সহপাঠী 'শোভন' গীতকণ্ঠে দিল্লীর প্রাসাদে একাধিকবার প্রবেশ করিয়াছে— ইহা বাস্তবের পরিপন্থী। তাই ইহা একেবারেই মানিয়া লওয়া যায় না। এই সকল স্থলে লোকনাট্যে বিবেক, বিচারক, ভুল, অদূরদৃষ্টি, ভবিতব্য ইত্যাদি

জাতীয় রূপক চরিত্র সংযোজিত হইলে সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আর প্রশ্ন থাকে না। আদি, বাৎসল্য, বীর, বীভৎস ও করুণ রস অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে।

যাদের দেখেনা কেউ (১৯৬২)—এই পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত হয়। ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ। খঞ্জনপুরের রাজা মকরকেতুর ভগ্নি শ্যামলী রাজমাতা হইবার লোভে অন্তঃসত্ত্বা রাণীকে গলাটিপিয়া হত্যা করেন এবং তাহার গলার বিশসহস্র টাকা মূলের হার ও দশসহস্র মোহর অপহরণ করেন। হারচুরির অজুহাতে ধৃত গোকুলাচার্যের শিরশ্ছেদ হুকুম হইলে কদমতলী নিবাসী নিরপরাধ আচার্যকে শ্যামলীর পুত্র গৌতম গোপনে মুক্ত করিয়া দেয়। রাজ্যের সুন্দরী মহিলাদের ধরিয়া অনিয়া বিলাসলীলায় ব্যস্ত সেনাপতি বজ্রসেন গৌতমের এই কার্যে অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন; কারণ তাহার নারীহরণের অন্যতম অন্তরায় গোকুল আচার্য। অপুত্রক মকরকেতন আঠার বৎসর পূর্বে কদমতলীর এক নিরন্ন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে 'অশোক' রূপী বালক 'নকুল'কে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্ব পরিচয় প্রকাশিত হইলে যুবক অশোক কদমতলী ফিরিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় মকরকেতন ঐ গ্রামটি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চাহেন। তাই সহজ পথে মহাল যাইবার অছিলায় তিনি কদমতলীর বস্তীর উপর দিয়া একটি প্রশস্ত খাল খননের ব্যবস্থা করায় অবহেলিত জনগণের নেতা গোকুলের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। রাজার এই অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা কল্পে গৌতম নিরস্ত্র গোকুলকে গোপনে অস্ত্র সাহায্য করায় মকরকেতন পরাজিত হইলেন এবং কদমতলীর বস্তীও রক্ষিত হইল। শত্রুপক্ষকে অস্ত্র সাহায্য করা এবং মাতা কর্তৃক হার ও মোহর চুরির অপরাধের বোঝা আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইবার জন্য গৌতমের শিরশ্ছেদ হয়; আর এই কার্যের নেতৃত্ব করেন অসন্তুষ্ট সেনাপতি। ইহার পর পরিত্যক্তশ্যামলীর স্বামী বীরনগরের রাজা রত্নসেন অপুত্রক রাজার সিংহাসন লোভে খঞ্জনপুর আক্রমণ করিলে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি বজ্রসেন তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়া মকরকেতনকে হত্যা করেন। কিন্তু গোকুলের সহযোগিতায় অশোক রত্নসেনকে পরাজিত করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন। প্রতিদানে গোকুল সমগ্র প্রজার হইয়া রাজ-প্রতিনিধির শাসন প্রবর্তন দাবী করেন। এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত অশোকের সঙ্গে গোকুল যুদ্ধে নিহত হইলেন। মৃত্যুর পূর্বে অশোকের সঙ্গে গোকুলের

পূর্ব ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রকাশিত হয়। এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। নাটকের মূল বক্তব্য, দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ রামা মুচি ও হাসিম শেকের দলের কর্ম-ভিত্তির উপরে সভ্যতার ইমারত গড়িয়া উঠিলেও সমাজের উপরতলার সভ্যতার ধারক ও বাহকগণ নিজেদের লইয়া এতই ব্যস্ত যে এই জনসম্প্রদায়ের ভালমন্দ সম্পর্কে তাহাদের চেতনা একেবারেই নিষ্ক্রিয়। "মাঝে মাঝে দুই একটা পাগল ক্ষীণকণ্ঠে ইহাদের জন্য দাবী জানায়, অমনি 'শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি" (ভূমিকা)। সুতরাং তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া দিন গুজরান করিতে থাকে। সভ্যতার শকট কিন্তু ঘরঘর ধ্বনি তুলিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি এই অবহেলা আমাদের সমাজের একটি বড় সমস্যা। এই অবহেলার অবসানকল্পে তাহাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শন করিয়া নাট্যকার সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করেন নাই। নাটকের ঘটনা আবর্তিত হইয়াছে প্রধানত সিংহাসন-লোভ এবং রাজা মকরকেতুর খাল কাটিবার খেয়ালকে কেন্দ্র করিয়া। নাটকে যে দুইটি বড় যুদ্ধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার একটি খালকাটা অবলম্বনে, অন্যটি বীরনগরের রাজা রত্নসেনের খঞ্জনপুরের সিংহাসন-লোভ লইয়া। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে নিরন্ন গরীবের দুঃখ, রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণের আত্মরক্ষার চেষ্টা এবং নাটকের একেবারে শেষ অংশে প্রজাদের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য-শাসনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য খঞ্জনপুরের হবুরাজার বিরুদ্ধে এক মুহূর্তের জন্য গোকুলের একক সংগ্রাম ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মকরকেতুর রাজশক্তি গোকুলের গৃহে অগ্নি সংযোগ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে জলধারা নামিয়া সেই অগ্নি নির্বাপিত করিল—ইহা অত্যন্ত আকস্মিক। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রামেশ্বর ও মহাকালের অংশ নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অশোকের কন্যা লহরী অশোকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল সম্পর্কে অনেক কথা বলিল, কিন্তু গোকুলের নামটি বলিল না। অশোকের পূর্ব জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা এই ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সে লহরীর নিকট হইতে নামটি জানিয়া লইবার চেষ্টা করিল না ইহা স্বাভাবিক নহে। অশোক গোকুলের নাম জানিলে নাটকের পরিণতি অন্য রকম হইত। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজা রত্নসেন যুদ্ধে আসিয়া গোলাবারুদ ঘরে

তুলিবার জন্য নিজে কুলির সন্ধান করিলেন, তাহার সৈন্য সামন্ত লোকজন কোথায় গেল—এই দৃশ্যে এই প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে মনে আসে। এই দৃশ্যে রাজা মকরকেতুর ভগ্নী শ্যামলীর আগমন অতি নাটকীয়, রাজভৃত্য গদাধরের প্রবেশ ও আকস্মিক।

গোকুলাচার্য গরীব কিন্তু নির্লোভ। অন্ন সংস্থান করিতে না পারিয়া তিনি ছোট ভাই নকুলকে ধনীর হাতে সঁপিয়া দেন। কিন্তু নকুলের প্রতি তাহার স্নেহের অভাব ছিল না। তিনি নকুলের স্মৃতিচিহ্ন আঠারো বৎসর বুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। গোকুল জনদরদী ছিলেন বলিয়াই জনসাধারণকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়া তাহাদের রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া তাহাদের সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় অশোককে উক্ত তাঁহার শেষ সংলাপে ও এই দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

গোকুল— তোমার কাজ শোষণ নয়, পোষণ। মনে রেখ, এ দেশ সকলের দেশ, তুমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন কর। তুমি প্রজাদের রক্ষক, তাদের দাসানুদাস। যাদের কেউ দেখে না—তুমি তাদের দেখো। (১ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)।

খঞ্জনপুরের রাজা মকরকেতুর কন্যা 'চন্দনা' স্বামীর পূর্ব দারিদ্র্যের কথা ভাবিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে রাজশক্তির হৃদয়হীন রাজ্য পরিচালনার ফলেই দরিদ্র জনগণের দুরবস্থার অবসান হইতেছে না। তাই কর্তব্য হীন রাজার বিরুদ্ধে চন্দনা অভিযোগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রাজপুরীর পাপ-পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া কদমতলীতে দরিদ্র গোকুলের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেও তিনি পশ্চাদপদ হইলেন না। চন্দনার কাছে ন্যায় ও আদর্শ বড়। রামেশ্বর চরিত্রটির সঙ্গে নাটকের মূল ঘটনার সম্পর্ক নাই। লম্পট সেনাপতির জন্য অর্থের বিনিময়ে নারী সংগ্রহ করা, গোকুলের কন্যা স্মৃতিকে বিবাহ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো, মহাকাল পাত্রকে মুটেগিরির মজুরী না দেওয়া ইহাদের কোনটির সঙ্গে নাটকের মূল ঘটনার অবশ্য যোগ নাই। রামেশ্বর গোকুলকে ধরাইয়া দিয়াছে মিথ্যা চুরির দায়ে। ইহার জন্য বজ্রসেনের অধীনে বহু লোক আছে; তাহাছাড়া সেনাপতি বজ্রসেনের দুই একটি সংলাপেও মিথ্যা চুরির অভিযোগ দাঁড় করান যাইতে পারিত। তথাপি কদমতলীর অধিবাসী রামেশ্বর যে নাটকে স্থান পাইয়াছে তাহার আসল উদ্দেশ্য এই চরিত্রের মধ্য দিয়া হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থা করা।

'শ্যামলী' বীরনগরের লম্পট ও মদ্যপ রাজা রত্নসেনের স্ত্রী। স্বামীর অবহেলার ফলে পুত্র গৌতমকে লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ভ্রাতা মকরকেতুর প্রাসাদে বসবাস করিতেছেন। শ্যামলীর রাজমাতা হইবার আকাঙ্ক্ষাই জীবনের মূল কথা। ইহার জন্য তিনি রাণীকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছেন ; কার্যোদ্ধারের জন্য ভবিষ্যতে অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া রাণীর বহুমূল্য হার এবং দশ সহস্র মোহর ও তিনি চুরি দ্বারা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী রাজার পালিত পুত্র অশোকের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতেও তিনি খুবই উৎসুক। অপুত্রক রাজার একমাত্র কন্যা চন্দনাকে রাজপুরী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য তিনি অনেক ফন্দী আঁটিয়াছেন। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর পরে তাহার সকল কুক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ায় রাজদণ্ডে মৃত্যুবরণ করিয়া তাহাকে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 'সোনাইদীঘি' নাটকের দীঘলহাটির রাজা প্রতাপরুদ্রের বিধবা ভগ্নী 'মল্লিকা'ও 'শ্যামলী'র মত রাজমাতা হইবার বাসনায় আত্মহারা। ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে রাজপুত্র মাধবের জীবনাবশান ঘটাইতেও তিনি পশ্চাদপদ নহেন। সোনাইকে গঞ্জনা দিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 'শ্যামলী' 'মল্লিকা' অপেক্ষা আরও কঠিন। পুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য নিরপরাধ গোকুলকে চুরির দায়ে হত্যার পথে ঠেলিয়া দেওয়া এমনকি সহস্তে নরহত্যা করা তাহার কাছে অতি তুচ্ছ বিষয়। 'সোনাইদীঘির' রাজ ভাগিনেয় 'যাদব' কর্তব্যবোধ, কৃতজ্ঞতা, স্নেহপরায়ণতা এবং স্বার্থহীনতা অবলম্বনে মাতৃ-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিয়াছেন। মাধবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। যাদব মায়ের স্বরূপ জানিতেন। 'যাদের দেখে না কেউ' নাটকের রাজভাগিনেয় 'গৌতম' চরিত্র 'সোনাইদীঘির' রাজ ভাগিনেয় 'যাদব' অপেক্ষাও অধিক সক্রিয়। মাতার সঙ্গে তাহার নাড়ীর যোগ থাকিলেও হৃদয়ের যোগ ছিল না। মাতার পৈশাচিক বৃত্তির প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুর মুখোমুখি থাকিয়াই তিনি অনবরত অন্যায়ের প্রতিকার করিয়া চলিয়াছেন। গৌতম মূর্খ কিন্তু ধর্মবোধে শক্তিমান, উদার, স্নেহশীল, ন্যায়পরায়ণ ও নির্লোভ। তিনি হাজার চেষ্টা করিয়াও মাকে ধর্মের বাণী শুনাইতে পারেন নাই। তাই মাতৃ পাপের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া গৌতম জীবন বিসর্জন দিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নাই।

কর্তব্য বোধের জন্য তিনি পিতা রত্নসেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেও কুন্ঠিত নহেন। পরার্থ ও ন্যায়ের জন্য জীবন দান গৌতম-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আদি, বাৎসল্য, বীর ও করুণরসকে প্রাধান্য দিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে।

রক্তের নেশা (১৯৬৩)—ইহা পঞ্চাঙ্ক দেশাত্মবোধক নাটক। তরুণ অপেরা কর্তৃক অভিনীত এই নাটকে গণের গান, একানে বালকের গানও যাত্রা-ব্যালে গীতি সহ প্রায় পনের খানি সংগীত সংযোজিত হইয়াছে। নাটকে রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রূপক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহা চৈনিক আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। ইহাতে ভারত 'অলকাপুরী', পাকীস্তান 'পীরনগর', চীন 'পলাশপুর', এবং কাশ্মীর 'গুলবাগ' রূপে কল্পিত হইয়াছে। অলকাপুরী পলাশপুরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইবার পরে দেশের প্রতিরক্ষায় যথেষ্ট জোর না দিয়া দেশ গড়িবার কাজে ব্যস্ত হয়। পলাশপুর পীরনগরের সংগে সংযোগ স্থাপন করিয়া এবং অলকাপুরীর প্রতিরক্ষক ও অমাত্যের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ লইয়া অলকাপুরী আক্রমণ করে। পূর্বচুক্তিলঙ্ঘন করিয়া অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অলকাপুরীর কিছু অংশ পলাশপুর অধিকার করে। অমাত্য ও প্রতিরক্ষক পদচ্যুত হইবার পরে অলকাপুরীর সেনাপতি জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সাহায্যে প্রতি-আক্রমণ করিয়া হানাদারদের বিতাড়ন পূর্বক দেশের জমি পুনরুদ্ধার করেন। ইহার পর হইতে শান্তিকামী অলকাপুরী দেশ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়া উঠে। এই নাট্যকাহিনীর অন্তরালে রহিয়াছে চীনের সহিত ভারতের পঞ্চশীল চুক্তি, প্রতিরক্ষায় ভারতের যথেষ্ট মনোযোগের অভাব, পাকিস্তানের কাশ্মীরের প্রতি লক্ষ্য ও চীন-পাকিস্তানের যোগস্থাপন, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ, ভারতের যুদ্ধ, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অপসারণ এবং প্রতিরক্ষায় ভারতের তৎপর হইবার কাহিনী। যুদ্ধের করাল বাস্তবতা, বিভীষিকা, বীভৎসতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের চলোর্মি আঘাতে ঐক্যবদ্ধ জনচেতনার মাহাত্ম্য বিশেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নাটক রচিত হয় নাই। যুদ্ধে চীন ও পাকিস্তানের স্বরূপ, শান্তিকামী ভারতের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব, এবং দেশরক্ষায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ত্রুটির পরিচয় দিয়া নাটক রচনা করা হইয়াছে। যুদ্ধের বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি ও বিচার বিশ্লেষণ অপেক্ষা—যাহা ঘটিয়া গিয়াছে

নাটকে যেন তাহারই বিবৃতি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রের উন্নতি ও রাষ্ট্ররক্ষা দুইয়ের প্রতিই রাষ্ট্রনায়কের সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন এবং শান্তিকামী রাষ্ট্রেরও দেশের স্বার্থে সময় সময় বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে—এই সাধারণ ভাবটি নাটকে প্রকাশিত হইয়াছে।

অলকাপুরীর রাষ্ট্রনায়ক 'তিলকরুদ্র' শান্তিকামী; পররাষ্ট্র আক্রমণ ও যুদ্ধ প্রভৃতির সে একেবারেই বিরোধী। নারীর প্রতি সম্ভ্রম বোধ ও মানুষকে সহজ দৃষ্টিতে দেখা তাহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখিয়া রাজকোষের অর্থ তিনি গঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করিবার পক্ষপাতী। এই সকল সত্ত্বেও রাজ্য পরিচালনায় তাহার রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ভুল রহিয়াছে বলিয়া দেশকে ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। আঘাতের মধ্য দিয়া দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে তিনি সচেতন হইয়া উঠেন। পলাশপুরের নূতন শাসক মধুকণ্ঠ আফিং-এর নেশা যেমন ছাড়িয়াছেন তেমনি ঘুম পাড়াইয়া রাখা ধর্মের নেশাও তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শান্তিকামী নহেন, রাজ্যবিস্তার কামনা তাহার প্রবল। এই রাজ্য বিস্তারের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য 'যার লাঠি তার মাটি' এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমগ্র পৃথিবীকে একই আদর্শে চালিত করা,—

মধুকন্ঠ—স্বপ্নবিলাসী শান্তিবাদী কাপুরুষের দলকে উচ্ছন্ন করে পৃথিবীটাকে আমি নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দেব। ধর্মকে আমি কবর দেব। দেবতাদের আমি নির্বংশ করব। সমগ্র দুনিয়া একই আদর্শে চালিত হবে—যার লাঠি, তার মাটি। (১ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)।

এই যুদ্ধবাজ দেশনায়ক রাজ্য বিস্তারের চক্রান্তে বিদেশেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। যুদ্ধে পরাজিত, নারী লোলুপ, পিতৃদ্রোহী ও হৃদয়হীন মধুকণ্ঠ প্রতিহিংসা-লালিত হইয়া উঠেন এবং শেষ পর্যন্ত পীর নগরের কর্ণধার গুলমহম্মদের স্ত্রী পিয়ারার গুলিতে নিহত হইয়া তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। অলকাপুরীর প্রতিরক্ষক সুজনসিং অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী। তাহার কন্যা 'পদ্মিনী' অন্য ধাতুতে গড়া। তাহার দৈহিক সৌন্দর্য নাই, বাক্‌মাধুর্য্যও তাহার আয়ত্তের বাহিরে; কিন্তু দেশপ্রাণতা হইতে তিনি বঞ্চিত নহেন। পাপ অর্জিত পিতার সমস্ত ধনসম্পদ তিনি দেশের প্রতিরক্ষায় দান করিয়া পিতৃপাপের বোঝা লঘু করিবার চেষ্টা করেন। তিলকরুদ্রের মাতা সুমিত্রা দেশ ও স্বধর্মের মর্যাদারক্ষা করিতে জানেন। স্নেহ

অপেক্ষা কর্তব্য তাহার কাছে বড়। তাই সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করিয়া তিনি তিলকরুদ্রকে প্রজার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজার মত রাজ্য পরিচালনা করিতে উপদেশ দান করেন। 'অঙ্কুশ' অলকাপুরীর সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অপ্রিয়ভাষণে তিনি নিরঙ্কুশ। বীরত্ব, দেশপ্রেম, লোভহীনতা ও অটল কর্তব্য বোধ লইয়া এই চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। গুলমহম্মদের পুত্র 'রসুল' নাটকের একানে বালকের দৃষ্টান্ত। পীরনগরের অধিপতি গুলমহম্মদের শ্যালক 'দিলবাহার' চরিত্র নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই চরিত্রের মধ্য দিয়া কিছু কিছু হাস্যরস পরিবেশন করা হইয়াছে। নাটকের সূচনা-অংশে অলকাপুরীর রাজপ্রাসাদে হঠাৎ গীতকণ্ঠে ভৈরব চরিত্রের প্রবেশ স্বাভাবিকতার বিরোধী। আদি, করুণ, বীর, বীভৎস ও হাস্যরস অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হইয়াছে।

গণেশ অপেরায় অভিনীত বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় লইয়া রচিত 'বঙ্গবীর' (১৯৩৬) ও 'প্রবীবার্জুন', ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত 'দানবীর', নট্টকোম্পানীতে অভিনীত 'চাঁদের মেয়ে' (১৯৩৮), রঞ্জন অপেরায় অভিনীত ও সবার উপরে মানুষ সত্য এই আদর্শ লইয়া রচিত 'রাজ নন্দিনী' (১৯৪২), নট্টকোম্পানীতে অভিনীত ও শরণাগতকে আশ্রয় দানের নীতি লইয়া রচিত 'মায়ের ডাক' (১৯৪৭), 'দাসী পুত্র' (১৯৫৩), নট্টকোম্পানীতে অভিনীত 'লোহার জাল' (১৯৬১), আলেকজাণ্ডার ও পুরুর কাহিনী লইয়া রচিত 'ধূলার স্বর্গ' (১৯৬৩), নট্টকোম্পানীতে অভিনীত ও আপাতমন্দের মধ্যেও ভালর সন্ধান পাওয়া যায় এই আদর্শ লইয়া রচিত নাটক 'প্লাবন' (১৯৬৪), গিয়াসুদ্দিন তোঘলকের মিথিলা আক্রমণ অবলম্বনে রচিত 'দেশের ডাক' (১৯৬৫), ভারতী অপেরায় অভিনীত 'মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন' (১৯৬৯), বৈকুণ্ঠ-যাত্রা সমাজে অভিনীত 'পতিঘাতিনী সতী' (১৯৬৯), জনতা অপেরার জন্য রচিত 'নবাব হোসেন শাহ' (১৯৭০) প্রভৃতি ব্রজেন্দ্র কুমারের অন্যান্য লোকনাট্য।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (১৩০২—)

হাওড়া জিলার কল্যাণপুরের অধিবাসী পশুপতি ১৩০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোকনাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পরে তিনি যাত্রার দল পরিচালনায় ব্রতী হইয়া নাট্যরচনায়

মনোযোগ দেন। ইহার পূর্বে সতের বৎসর বয়সে তিনি রাবণবধের কাহিনী লইয়া 'অকালবোধন' নামে (১৩১৯ সাল) একখানি পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। এই নাটকটি সাঁতরা কোম্পানীতে অভিনীত হয়। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি 'গৌরাঙ্গ অপেরার' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যোগ্যতার সঙ্গে কিছুকাল দল পরিচালনার পরে যাত্রার দল ছাড়িয়া তিনি কেবল নাটক রচনা করিতে থাকেন। দুই একখানি ছাড়া তাহার নাটকগুলির অধিকাংশই পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রচিত। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লেখক সরকারী সাহিত্যিক অবসরবৃত্তি মাসিক ৫০ টাকা ভোগ করিতেছেন। তাহার রচিত অধিকাংশ নাটকেই জনরুচি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যালে, আদি রসাত্মক দ্বৈতগীতি প্রভৃতি ব্যবহার করিলেও এই সকল পালায় গানের সংখ্যা বেশি নহে।

বিজয় বসন্ত (১৩৩৫) —বিজয় বসন্তের প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই পঞ্চাঙ্ক নাটক ষষ্ঠী অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রা ব্যালের গান সহ নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় বাইশ। ব্রহ্মচারী রামানন্দ স্বামীর শিষ্য চিন্ময় নাটকে বিবেকের বাণী শুনাইয়াছে।

জয়পুরের বিপত্নীক রাজা জয়সেন বৃদ্ধবয়সে তরুণী দুর্জময়ীকে রাণী রূপে গ্রহণ করেন। দুর্জময়ী সপত্নী পুত্র যুবক বিজয়ের প্রেম কামনা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইলে প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হইলেন। প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে গিয়া রানী দুর্জময়ী রাজপরিবারকে উচ্ছন্নে দিয়া শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হইয়া আত্মহত্যার দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। নাটকে বৃদ্ধ বয়সে দারপরিগ্রহের কুফল দেখানো হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া পূর্বেও যাত্রা নাট্য রচিত হইয়াছে। বাংলা দেশে এই জাতীয় সামঞ্জস্যহীন বিবাহ ও ইহার কুফল ভোগের বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য ছিল। মনে হয় সেই জন্যই জনপরিচিত বিষয় অবলম্বনে রচিত একাধিক নাট্যকারের 'বিজয় বসন্ত' পালা লোক-সমাজে আদৃত হইয়াছিল। জনপ্রিয়তার জন্য এই নাটকটিরও পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে। আদি, রৌদ্র, বীভৎস ও করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে।

সতী (১৩৪০)—ইহা ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ১০ম অধ্যায়ের কাহিনী লইয়া রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা কর্তৃক এই নাটক অভিনীত হয়। ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় দশ। প্রথমেই প্রস্তাবনায় একখানি

গণের গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গানে ভক্তগণ শিবের স্তুতি করেন। জনরুচি চরিতার্থ করিবার জন্য নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় আদিরসাত্মক যাত্রা ডুয়েট ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে (২য় দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক)। নাটকের প্রত্যেক অঙ্কের শেষেই ঐকতান বাদনের নির্দেশ আছে। দক্ষযজ্ঞের কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। নটকের প্রধান বক্তব্য দৈবলিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, এমনকি স্বর্গবাসী সতী ও দৈবলিপির অধীন।---

সতী কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা এই দশ মহাবিদ্যার রূপ দেখাইয়া শিবের অনুমতি লইয়া শিবহীন যজ্ঞে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনিও দৈবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। নাটকে দশটি মহাবিদ্যার আবির্ভাব ও স্তব সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা রৌদ্র, বাৎসল্য ও করুণরস প্রধান নাটক।

লায়লা মজনু (১৩৫৫)—আরব দেশের লায়লা মজনুর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এই পঞ্চাঙ্ক নাটক রচিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরায় ইহা অভিনীত হয়। নাটক প্রকাশের কাল ১৩৬৬ সাল। নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় তের; এই নাটকেও অঙ্কের শেষে ঐকতান বাদনেব নির্দেশ রহিয়াছে প্রীতির নির্ঝর ও করুণার সমুদ্র লায়লার জন্য প্রেমোন্মাদ মজনু বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সহমৃত্যুর মধ্য দিয়া পরপারে প্রেয়সীর সঙ্গে মিলিত হয়। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী। লায়লা মজনুর প্রেম-পথের কণ্ঠক সহপাঠী জিয়াদ এবং লায়লার মাতা রহিমা বেগমের বাঁদী জুলিয়া আপন আপন শয়তানি কর্মের উপযুক্ত ফল ভোগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। লায়লা মজনুর স্বর্গীয় প্রেম কাহিনী রূপায়িত করিবার প্রসঙ্গে নাট্যকার দেখাইয়াছেন যে মানুষ কৃতকর্মের ফলভোগী হয়।

বাঙ্গলার বপ্লবী ছেলে ক্ষুদিরাম (১৩৫৬)—ক্ষুদিরামের কিংসফোর্ড হত্যার প্রচেষ্টা অবলম্বনে ইহা দেশাত্মবোধক পঞ্চাঙ্ক নাটক। দীর্ঘ সংলাপযুক্ত নাটকে সন্ত্রাসবাদীদের ও ক্ষুদিরামের দেশপ্রেম এবং নির্ভীক চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার দিকে নাট্যকার লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

'কংস' (১৩৩০), 'তাপসকুমারী' (১৩৪৫), 'রঙ্গগঙ্গা' (১৩৪৭), 'শৈশবসাধনা' (১৩৪৮), এবং 'অভিশপ্ত সিংহাসন নামে' (১৩৬০) পশুপতি আরো কয়েকটি নাটক রচনা করেন।

পঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন (১৮৮৭ ১৯৫৪)

তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার হাতীবাগানে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পৈত্রিক নিবাস বর্ধমান জিলার দিকপাড়া গ্রামে। তাহার প্রকৃত নাম ফণিভূষণ রায়। পঙ্কজভূষণ ছদ্মনাম। তিনি যাত্রায় অনেককাল অভিনয় করিয়াছেন ও অভিনয় শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি কালিকা থিয়েটার প্রভৃতি মঞ্চ ও চিত্রাভিনয়ে যোগদান করেন। চিত্রাভিনেতা-রূপে তাহার সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে। পঙ্কজভূষণ প্রথমে সখের যাত্রাভিনয় করিতেন। পরে তিনি রয়েল বীণাপাণি অপেরায় পেশাদাররূপে যোগদান করেন। তিনি বীর, ভক্তি ও করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়া কয়েকটি যাত্রানাট্য রচনা করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় (কালীঘাট) পরলোক গমন করেন।

তিলোত্তমা (১৯৩৪) -সুন্দ-উপসুন্দ দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয় স্বর্গ আক্রমণ করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করেন, তিলোত্তমার সৃষ্টিতে নারীলোলুপ দৈত্যদ্বয় ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে নিহত হইলে ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গের সিংহাসন আরোহণ করেন। এই কাহিনী অবলম্বনে 'তিলোত্তমা' নাটক রচিত হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্ব হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পালা ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত হয়।

দেবাসুর (১৩৪২)—ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। দধীচির তনুত্যাগ ও ত্বষ্টাপুত্র দৈত্যসম্রাট বৃত্রাসুর বধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকের চালক চরিত্র ত্বষ্টা। এই চরিত্রে রৌদ্র ও বাৎসল্য রস বিশেষ রূপে প্রস্ফুরিত হইয়াছে। কর্তব্যপরায়ণ ত্বষ্টার মধ্য দিয়া দেখান হইয়াছে যে সমাজে সামঞ্জস্য বিধান করাই ব্রাহ্মণের প্রধান কাজ। এই নাটকের গীতিসংখ্যা ত্রিশের অধিক। ইহাতে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের দৈত্যপ্রাসাদ মধ্যস্থিত উদ্যানে নর্তকীগণের যাত্রা-ব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও এই নাটকে আরো কয়েকটি ব্যালে রহিয়াছে। আদি রসাত্মক দ্বৈতগীতিও নাটক হইতে বাদ পড়ে নাই। ইহা প্রধানত রৌদ্র, বীর ও করুণ রসাত্মক নাটক। ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের ৮ম ও ৯ম অধ্যায় হইতে ইহার মূলকাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা রয়েল বীণাপাণি অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়।

মুক্তবাণ (১৩৪৪)—বিষ্ণুপুরাণ (বাংলা সং) হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। অরুণ অপেরায় অভীনিত এই পৌরাণিক নাটকের

গীতি সংখ্যা প্রায় পঁচিশ। ইহাতে আদি রসাত্মক দ্বৈতগান ও কয়েকটি বাল্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দৈত্যরাজ বাণের কন্যা ঊষা পিতার অনুমতি ছাড়াই যদুবংশের কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে প্রেমাবদ্ধ হইলেন। ফলে যাদবগণের সঙ্গে দৈত্য রাজের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। দ্বন্দ্বে কৃষ্ণহস্তে বাণের জীবনাবসান ও মুক্তিলাভ ঘটে। বহুবিচিত্র ঘটনা ও বহুযুদ্ধ সমাবেশে নাটকখানি রচিত। নাটকের মূল কথা হইতেছে—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি তিনটিই জীবনে প্রয়োজনীয়, তথাপি নিয়তিদ্বারাই জীবন চালিত হয়।

প্রেম ও সতীত্ব অবলম্বনে বীরাঙ্গনারূপে ঊষা চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নারীর অধিকার বোধের জাগ্রত চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যাচারী সম্রাট বাণের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত তেজস্বিতার অধিকারিণী দৈত্য কন্যা ঊষা। নাটকখানি বীর, ভক্তি ও শৃঙ্গার রস প্রধান।

মহামানব (১৩৫৯ তৃতীয় সংস্করণ)--কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্বের কাহিনী লইয়া এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছে। বয়েল বীণাপাণি অপেরা কর্তৃক ইহা অভিনীত হয়। নাট্যকার ভূমিকায় নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "মানব যখন ধর্মে, রাজনীতিতে, ন্যায় দর্শনে, বর্ণাশ্রমে, সর্ববিষয়ে আদর্শ হইয়া উঠেন তখনই তিনি নররূপী নারায়ণ বা মহামানব"। মাতৃপিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, আর্তত্রাণ, কর্তব্যবোধ ও অসাধরণ শক্তি লইয়া সাধক ভৃগুরামের চরিত্র নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন। জমদগ্নিপুত্র ভৃগুরাম কর্তৃক মাতা 'রেণুকার' (প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা) মস্তক ছেদন এবং মাহেস্মতীপুরীর হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জ্জুনবধ ও একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়করণের কাহিনী লইয়া 'মহামানব' নাটক রচিত হইয়াছে। ভৃগুরাম শিবের নিকট অস্ত্রাভ্যাস করিয়া মাতৃভক্তির আকর্ষণে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন ; কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে মাতৃদত্ত, 'পিতাসর্গঃ পিতাধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপতঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা'—এই মন্ত্রের প্রভাবে পিতৃআদেশে তিনি মাতৃহত্যা করেন। মাতৃভক্তির প্রাবল্যেই আবার তিনি মাতাকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম হইলেন। রাজা কার্তবীর্য পদাঘাত ও একুশটি অস্ত্রাঘাতে আশ্রমে জমদগ্নিকে হত্যা করেন। পিতৃ আদেশে ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য ভৃগুরাম একবিংশতিবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পদাঘাতে কার্তবীর্যসংহার করেন। কর্তব্যে অটল, পাষাণ-দৃঢ় ভৃগুরাম কখনো অন্যায়ের সঙ্গে রফা

করিতে চেষ্টা করেন নাই। অন্যায় করা আর অন্যায় সহ্য করা দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং অন্যায়ের প্রতিকার অবশ্য কর্তব্য। অপাত্রে ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়া ক্ষমা ধর্মের অবমাননা করা ভৃগুরামের নীতিবিরুদ্ধ,—

ভৃগুরাম—ক্ষমা! হাঃ—হাঁঃ—হাঃ
তুমি অবিরত বেত্রাঘাতে
জর্জরিত করিবে আমায়,
আমি যদি পরিহরি নিরীহ মেষেরপন্থা
শৃঙ্গ তুলি দাঁড়াই বারেক
অমনি চাহিবে ক্ষমা,
ভুলে যাবো অত্যাচার
এই লোকসমাজের আপ্যায়িত ভাষা
'ক্ষমা' মাত্র শুনি? চমৎকার! (৪র্থ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)

কুলিশকঠোর ভৃগুরামের চরিত্রে আর্দ্রতাও ছিল,—

ভৃগুরাম—ফেলেছে, ফেলেছে রাম
দুই বিন্দু অশ্রু তার মরু-চক্ষু হতে। (৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

জমদগ্নি-পত্নী রেণুকার চরিত্রে নাট্যকার শক্তির জয় ঘোষণা করিয়াছেন।

নাটকখানি বীর, করুণ, শৃঙ্গার ও ভক্তিরসপ্রধান।

শান্তনু—ইহা কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনী লইয়া রচিত পৌরাণিক নাটক। প্রথমে গঙ্গা, পরে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে রাজা শান্তনুর বিবাহ এবং শান্তনু-পুত্র দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা ও ভীষ্ম নাম গ্রহণ ইহার মূল কহিনী। ইহা রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত হয়।

রক্তাঞ্জলি—কৃত্তিবাসের রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড হইতে এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। সীতা-রামের চিরনূতনকীর্তি প্রচার যে নাটকের মূল উদ্দেশ্য তাহা প্রস্তাবনা অংশেই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা সংগীত প্রধান নাটক। ইহার গীতিসংখ্যা বত্রিশের অধিক। এই নাটকে কয়েকটি যাত্রা-ব্যালে এবং 'সাগর' ও লহরীর' শৃঙ্গাররসাত্মক দ্বৈত গান সংযোজিত হইয়াছে। সীতাহরণের পর হইতে বিভীষণপুত্র বীর-ভক্ত তরণীসেনের বধ পর্যন্ত নাটকের কাহিনী বিস্তৃত। বীরত্ব, কর্তব্যবোধও রামভক্তি অবলম্বনে 'তরণী' চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। সীতাহরণের জন্য রাবণের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া ধর্মরক্ষার্থে বিভীষণ রামের পক্ষ অবলম্বন

করেন। তরণীর সঙ্গে যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলে বিভীষণ প্রদত্ত ব্রহ্মবাণে রাম তরণীকে নিহত করেন ; তরণীও রামহস্তে মৃত্যুবরণ করিয়া মুক্তি লাভ করে। রামের মনোবাঞ্ছা পূরণে পুত্রহত্যার ব্যবস্থা করিয়া বিভীষণ রামের চরণে হৃদয়-রক্ত-রঞ্জিত অঞ্জলিই প্রদান করিলেন। তাই নাটকের নাম হইয়াছে রক্তাঞ্জলি। ইহা বীর, ভক্তি ও করুণ রসাত্মক নাটক। এই পালা অরুণ অপেরাপার্টিতে অভিনীত হয়।

ভোলানাথ অপেরার জন্য 'তিলোত্তমা', রয়েল বীণাপাণি অপেরার জন্য 'নারীঋষি', 'রাণী ভবানী,' 'দুর্গোৎসবে সমাধি'-ও নাট্যকার নাট্যবীথি যাত্রাপার্টির জন্য 'কৃষ্ণ-ভারতী' নামে আরো কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। 'কৃষ্ণভারতী' নাটকে দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়

তিনি বর্ধমান পিপলং-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'অজামিল উদ্ধার', 'রুক্মিণীহরণ', দেবব্রত', শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত 'দুষ্মন্তকীর্তি', 'শ্রীকৃষ্ণের শাকান্নভোজন' প্রভৃতি যাত্রাপালা রচনা করেন।

গজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান পিপলং-এর এই নাট্যকার 'মহিষাসুর', শংকর অপেরা পার্টিতে অভিনীত 'রাণীভবাণী', রাধাকৃষ্ণ নাট্যসমাজ অপেরা পার্টিতে অভিনীত 'কৃষ্ণমাতা' ও 'বাল্মীকি' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন।

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (বি, এ.)

তিনি হুগলী জিলান্তর্গত সোমড়া-র অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত পালার নাম 'দক্ষিণা' ও 'ভদ্রাপরিণয়'। 'দক্ষিণা' পালা বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত হয়। ব্যাধপুত্র একলব্যের অস্ত্রগুরু দ্রোণকে দক্ষিণা দান ও কুরু-পাণ্ডবের সহিত তাহার যুদ্ধ অবলম্বনে এই নাটক রচিত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন নন্দী

তিনি নদীয়া শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। 'ধুন্ধুমার', 'দুর্গমাসুর', 'ত্রিপুরারি', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'বল্লালসেন' 'অতিথি সৎকার', 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি যাত্রানাট্য তিনি রচনা করেন।

ভূপতিচরণ স্মৃতিতীর্থ

দস্যু রত্নাকরের মহাকবি বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হইবার কাহিনী লইয়া তিনি রচনা করেন 'রত্নাকর'। এই পালাটি সতীশ মুখার্জির দলে অভিনীত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম লইয়া রাজা শশাঙ্ক ও হর্ষবর্দ্ধনের দ্বন্দ্ব অবলম্বনে এই নাট্যকার রচিত 'রাজশ্রী' পালাটিও ঐ দলে অভিনীত হয়। তিনি 'তুলসী দাস' নামে অরো একটি পালা রচনা করেন।

অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক

আর্যঅপেরায় অভিনীত এবং ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্বের ভাব অবলম্বনে রচিত 'পুণ্যবল', নাটকটি তিনি রচনা করেন। তাহার অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'অতিকায়' উল্লেখযোগ্য। অতিকায়ের রামভক্তি অবলম্বনে রচিত এই পালায় ভক্তির প্রাবল্যে অতিকায়ের ছিন্নমুণ্ডেও রাম নাম উচ্চারিত হয়। ভক্তিরস প্রধান এই পালাটি শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত হয়।

কানাইলাল শীল (১৮৯১-১৯৬৩)

তিনি কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। পুস্তক ব্যবসায়ে রত থাকিয়া কানাইলাল নাট্যরচনা করেন। ধর্ম ও ভক্তিভাব অবলম্বনে পৌরাণিক, কর্তব্য ও বীরত্ব লইয়া ঐতিহাসিক এবং স্বাধিকারবোধ ও জনজাগৃতিকে প্রাধান্য দিয়া তিনি সামাজিক পালা রচনা করিয়াছেন।

নিয়তি (১৯৩৩)—শ্রীমদ্‌ভাগবতের (বাংলা সং) নবম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী লওয়া হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি নাট্যকারের প্রথম রচনা। নাটকটি রয়েল বীণাপাণি অপেরা ও বিলগাঁও নট্টকোম্পানী কর্তৃক অভিনীত হয়। ইহাতে প্রত্যেক অঙ্কের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ রহিয়াছে। যাত্রা ব্যালে ও গণের গানসহ ইহার গীতিসংখ্যা ছত্রিশ। পুরুষকার অপেক্ষা দৈব বড় এই ভাব লইয়া দুর্বাসা ও নিয়তির দ্বন্দ্বে নাটকের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথমেই নিয়তি তাহার শক্তির কথা ঘোষণা করিয়াছে।

নিয়তির এই শক্তির কাছে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ দুর্বাসাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। দুর্বাসার অভিশাপে রচিত 'রুদ্রশক্তির' একটি গানে নাট্যকার অভিশাপের প্রকৃতি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—

অম্বরীষ—অভিশপ্ত রাজা অম্বরীষকে চির অবসর দিতে হবে—চির অবসর দিতে হবে। একটুখানি শান্তি একটুখানি শান্তি—

(প্রস্থানোদ্যোগ)

[সহসা গীতকণ্ঠে রুদ্রশক্তির আবির্ভাব]

রুদ্রশক্তি— (গীত) বাজ পড়েছে শান্তির ঘরে জ্বলে শুধু হল ছাই।
চৌদিকে তার আগুনের বেড়া পথ নাই পথ নাই॥

অম্বরীষ— কে তুমি, কে তুমি?

রুদ্রশক্তি— (পূর্বগীতাংশ)

আমি সর্পের বিষ, আগুনের জ্বালা মরুভূমি খরতাপ
বজ্রের ঘা, সিংহের থাবা, দুর্বাসা অভিশাপ।
আমি ললাট বহ্নি ধূর্জটির, ধূমের পাহাড় কুজ্ঝটির
নন্দন বনে কুসুম বিতানে ঝটিকা বহায়ে যাই।

(২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

নাটকের সংলাপ রচনায় গদ্য এবং পদ্য উভয় রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। এই নাটক হইতে গৈরিশ ছন্দে রচিত একটি আবেগময় পদ্য সংলাপের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,—

যুধাজিৎ—(দৃঢ়স্বরে) পুণ্ডরীক!

পুণ্ডরীক—রাখ সম্ভাষণ,
বলে দাও কোথায় দুর্বাসা।
পুণ্য শ্লোক রাজা অম্বরীষ—
আজীবন দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ,
তারে আজি চণ্ডালত্ব করিয়াছে দান।
হোক সে ব্রহ্মর্ষি,
হেন হীনজনে রাখিব না জীবিত ধরায়।

যুধাজিৎ—রাখ অস্ত্র পুণ্ডরীক!

পুণ্ডরীক—বলি চাই—ব্রহ্ম বলি।
লক্ লক্ রসনা মেলিয়া
করালী চাহিছে আজি শোণিতের ধারা,
পৃথিবীর রোমে রোমে পশিয়াছে ক্লেদ,

তপস্বীর তপোবন
পরিণত রৌরব নরকে !
নহে পুণ্যবাণ ধরণী-ঈশ্বর
ওঃ, তুমি বুঝিবে না--
বুঝিবে না অনার্য-ভূপাল,
কতজ্বালা জ্বলিছে অন্তরে।
ওঃ, পিতা, পিতা !
তুমি আজ অস্পৃশ্য চণ্ডাল !

(মুখ ঢাকিলেন, শিথিল হস্ত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল—৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

দুর্বাসা ও নিয়তির দ্বন্দ্বের বলিরূপে অযোধ্যার প্রজারঞ্জনকারী রাজা হরিভক্ত অম্বরীষের চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। দুর্বাসার অভিশাপে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরিণামে দৈবের প্রভাবে তিনি মুক্তি লাভ করেন। রাজপুত্র পুণ্ডরীক চরিত্রে বীরত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শৌর্যবীর্যের বলে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। অনার্যরাজ যুধাজিৎ অত্যাচারী ও কামান্ধ। অম্বরীষের রাজ্য অধিকার করিয়া তিনি সেখানে যথেচ্ছাচার চালাইতে থাকেন। যুধাজিৎ-পত্নী 'অরুন্ধতি' চরিত্রে আত্মত্যাগের মহিমা প্রকাশিত ; 'অতসী' চরিত্র নারীত্বের গৌরব বহন করে। আদি, বীর, রৌদ্র, করুণ ও ভক্তিরসপ্রধান এই নাটকে শেষপর্যন্ত দুর্বাসাকে নিয়তির কাছে পরাজয় বরণ করিতে হয়। জনপ্রিয়তার জন্য নাটকটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ সালে।

বীরপূজা (১৩৪২) এই পঞ্চাঙ্ক ধর্মমূলক নাটক আর্য অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় ত্রিশ। নাট্য কাহিনী গঠনে পূর্বালোচিত অহিভূষণের 'রঞ্জাবতী' বা 'ধর্মলীলা গীতাভিনয়ের' অনেকাংশ অনুসৃত হইয়াছে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ও রঞ্জাবতী গীতাভিনয়ের সঙ্গে এই নাটককে মিলাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বর্তমান নাটকে কর্ণসেনের চরিত্রে কর্তব্যের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। উদারতা, শক্তি, ধর্মবোধ ও প্রভুভক্তি লইয়া কালুডোম চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। এই চরিত্রের সঙ্গে তুলনায় রঞ্জাবতী-ভ্রাতা স্বার্থপর 'মহানদ' অনেক নিম্নস্তরের মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন। প্রেম ও নিস্বার্থপরতা লইয়া রাজকুমারী 'যমুনা' চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। নাটকে আদি, বীর, করুণ ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দেওয়া

হইয়াছে। এই নাটক রচনায় কানাইলাল নাট্যকার ব্রজেন্দ্র কুমারের নিকট অনেক সাহায্য লইয়াছেন—নাট্যকার ভূমিকায় ইহা স্বীকার করিয়াছেন.-- "সুহৃদয় শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে, এম. এ. বি. টি. মহাশয় এই নাটকখানির আদ্যোপান্ত সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

ব্রহ্মতেজ (১৩৪৭)—বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ড হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক আর্য অপেরায় অভিনীত হয়। নাটকের মূল বক্তব্য হইল—শক্তি লাভের প্রধান উপায় একনিষ্ঠ সাধনা। ঋষি বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত হইলেন এবং ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য তিনি কঠোর সাধনায় ব্রতী হইলেন। ক্ষমাশীল বশিষ্ঠের সঙ্গে বৈপরীত্য রক্ষা করিয়া উগ্র তপস্বী প্রতিহিংসা পরায়ণ বিশ্বামিত্র চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র শেষ পর্যন্ত তপস্যাবলে ব্রাহ্মণের যোগ্যগুণ ক্ষমার অধিকারী হইলে বশিষ্ঠ কর্তৃক ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃতি পাইলেন।

দলমাদল (১৯৪৯)—ইহা বর্গীর আক্রমণ কাহিনী (১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে) লইয়া রচিত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। রঞ্জন অপেরা কর্তৃক নাটকখানি অভিনীত হয়। মারাঠা সেনা নায়ক ভাস্কর বর্গীর হাঙ্গামার অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করেন। লুণ্ঠন, হত্যা, নৃশংসতার কঠোর শকট অক্লান্ত অবাধ গতিতে চালাইয়া ভাস্কর এক নূতন ইতিহাস রচনা করেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরাধিপতি গোপাল সিংহের জ্বলন্ত বীরত্ব এবং নবাব আলিবর্দির (১৭৪৮—১৭৫৬ খ্রীঃ) প্রজা বাৎসল্য ও ধর্মতৎপরতা লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। ভাস্কর অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী হইলেও মানবতাবোধ একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নাই বলিয়া এই দোর্দণ্ড বর্গীনায়কের হৃদয়ে নারীর প্রতি মাতৃত্ববোধ এবং পিতৃস্নেহ মরূদ্যানের মত ছায়াশীতল নীড় রচনা করিতে পারিয়াছিল। এই জন্যই বিষ্ণুপুরের যুদ্ধরত মহিষী 'মমতাময়ীর' প্রতি,— জগন্মাতার অংশভূতা নারীর প্রতি,—ভাস্কর সম্ভ্রম দেখাইতে পারিয়াছিলেন। মোহনলাল যেমন বীর ও কর্তব্য পরায়ণ মীর হবিব তেমনি বিশ্বাসঘাতক। নাটকের 'রমা' চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার সেবাধর্মের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বাঁকুড়ার বিষ্ণুমন্দিরস্থিত [১]"কামানটির

১। বাঁকুড়ার মন্দির—পৃঃ ২৬, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা—১৩৭১

অগ্রদ্বীপে একদা বর্গীর দল মর্দিত হয়েছিল বলে এর নাম দলমর্দন ; স্থানীয় লোকেরা চলতি কথায় দল-মাদল বলে।" এই রক্ষাকারী কামানটির নাম অনুসারে বর্তমান নাটকের নামকরণ করা হয় 'দলমাদল'।

দেশের দাবী (১৩৫৬)--ইহা রঞ্জন অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় বিংশতি। নাটকে প্রজাদরদী স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ জমিদার ধনঞ্জয়ের পুত্র 'নিশীথ' ও বকধার্মিক নায়েব 'হরবল্লভের' শোষণ, পীড়া, গৃহে অগ্নিসংযোগ, নালানদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া প্রজাদের পানীয় ও চাষের জল বন্ধ করা, মুনাফাখোর ও মজুদদার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া কৃত্রিম দুর্ভিক্ষসৃষ্টি প্রভৃতির মধ্য দিয়া দেশে অত্যাচার ও অবিচারের তাণ্ডব নর্তন দেখানো হইয়াছে। ইহার পটভূমিকায় গণআন্দোলনের সূচনা নাটকের মূলকথা। স্বামী 'যোগানন্দ' প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সদস্য পল্লী যুবক 'সমীর' জনগণকে অত্যাচার মুক্ত করিবার জন্য জমিদারের নিকট হইতে নিজেদের দাবী আদায় করিতে চায়। এই জনজাগৃতির চারণ কবি স্বামী যোগানন্দ। হরিজনদের অশিক্ষা দূরীকরণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য স্থাপন ও স্বাধিকার বোধের উদ্বোধন করিতে পারিলে দেশ ক্লেদমুক্ত হইতে পারে। এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া যোগানন্দ স্বামী জনজাগৃতির কাজে ব্রতী হইয়াছেন। নাটকে যুদ্ধোত্তর কালের সমাজ-চেতনা প্রতিফলিত হইয়াছে। নিশীথের অত্যাচার কেবল বাহিরে নয়, গৃহেও চলে, তাই তাহার স্ত্রী আনন্দময়ী পরিত্যক্তা। আনন্দময়ী স্নেহ, জনদরদ, সেবা ও অহিংসা-ব্রত লইয়া স্বামীর দেওয়া সব দুঃখ এবং মনের অভাব ঘুচাইবার জন্য চেষ্টিতা। ইহা রৌদ্র, বীর ও করুণ রস প্রধান নাটক।

মুক্তিরমন্ত্র—ইহা ঐতিহাসিক নাটক। নৃশংস দস্যু হাম্বীর নিজের শক্তিতে হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া উঠেন এবং দস্যুবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইহাই নাটকের মূল ঘটনা। কর্তব্য পরায়ণতা ও প্রভুভক্তি লইয়া দস্যু সর্দার 'চিমনলালের' চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। বীর ও ভক্তি রসাত্মক এই নাটকে প্রায় বিশখানি গান সংযোজিত হইয়াছে। এই নাটকখানি আই. এন. এ. পিকচার্স কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ছায়াছিত্রে রূপায়িত হইয়াছে।

'মুক্তি তীর্থ' (১৩৪৫ ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত), নামক ভক্তি মূলক নাটক, 'অমরাবতী' (১৯৪৬), 'রামরাজ্য' (আর্য অপেরায় অভিনীত),

'চক্রী' (রঞ্জন অপেরায় অভিনীত) নামক পৌরাণিক নাটক এবং 'ধাত্রী-পান্না' নামক ঐতিহাসিক নাটকও কানাইলাল রচনা করিয়াছেন।

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৩০৭–)

২৪ পরগণা জিলার বারইপুর থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে ১৩০৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বর্তমান নিবাস বারইপুর। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ আই, এ. দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশ স্বাধীন হইলে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়। সৌরীন্দ্রমোহন কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী স্কুলে প্রায় ৩৬ বৎসর কাল শিক্ষকতা করিয়া ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। রামনগর মধ্য ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় 'কল্লোল', 'সারথি', 'ধূপছায়া', 'সচিত্র শিশির', 'প্রগতি', 'নবশক্তি' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রথম নাটক 'ধর্মবল' (১৩৪৩); ইহা ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত হয়। নাট্যকার পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছেন। পৌরাণিক নাটকের কোন কোনটির মধ্যে আধুনিক যুগোচিত সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে। সংগীত রচনায় ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্য বিধানে শ্রুতিরঞ্জকতা সৃষ্টির দিক হইতে সমসাময়িক যাত্রানাট্যকারদের মধ্যে তাঁহার কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক।

মহিসাসুর (১৩৪৬)—ইহার মূল কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে সংগৃহীত হইয়য়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি ভাণ্ডারী অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়। ব্যালে ও গণের গান সহ নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় ত্রিশ। পুরাণের মহিসাসুর ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করেন; এই নাটকে তিনি আদ্যাশক্তির নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছেন। অমরত্ব ও যজ্ঞ ভাগ লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়া মহিসাসুর আদ্যাশক্তির কাছে নারী-হস্তে নিধনের বর লাভ করেন। তাই ক্রুদ্ধদৈত্যরাজ স্বর্গ অবরোধ করিয়া নারীদের বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য বৃহস্পতির পরামর্শে সকল দেবতার পূর্ণ তেজ অবলম্বনে মহালক্ষ্মী নামক এক নারী সৃজন করিয়া ব্রহ্মা কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে তাহাকে রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর দেব-দৈত্যের যুদ্ধে এই নারীর সঙ্গে মহিষাসুরের দ্বন্দ্ব শুরু হইলে নারী মহামায়ার রূপ ধারণ করিয়া দৈত্যকে পরাজিত করেন

এবং তাহার পদতলে রাখিয়া যজ্ঞভাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। বজ্রধরইন্দ্র শক্তিমান হইলেও ঈর্ষাকাতর ও অন্যায় আচরণকারী রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। দৈত্যপক্ষও অনেক অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উভয় পক্ষকেই এই অন্যায়ের শাস্তি পাইতে হয়। অন্যায় করিলেই যে শাস্তি ভোগ করিতে হয় বৃহস্পতির সংলাপে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—

বৃহস্পতি—দেবতা, দানব, কিম্বা গন্ধর্ব, মানব,
অন্যায় যে করে,
দণ্ড তার তোলা থাকে কালের ভাণ্ডারে। (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

মহিষাসুর বীর ও সাধক। দেবতার সঙ্গে বৈরা-ভাবের অন্তরালে ফল্গুধারার মত তাহার অন্তরে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত ছিল। তাই দেবীর চরণে সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া তিনি দৈত্যজীবনের অবসান ঘটাইতে ও যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। দৈত্যরাজ শত্রু ভাবে মায়ের আরাধনা করিয়াছেন। 'মেধস' চরিত্র নাটকে গানে গানে ভক্তি ভাব প্রচার করিয়াছেন। কাত্যায়ণ ঋষির শিষ্য মেধসের একটি ভক্তি গীতি উদ্ধৃত হইল,—

মেধস—কবে মা তোর চরণ তলে সদ্য ফোটা জবার মত
ব্যথায় রাঙা হৃদয় আমার লুটিয়ে রবে অবিরত।
তোমায় চেয়ে শবাসনা প্রদীপ হয়ে মোর কামনা
জ্বলবে দেহের দেউল তলে কবে মাগো নিমেষ হত
ও তোর রূপের আলোর বানে বাঁধ ভেঙ্গে মা আমার প্রাণে
এবার যেন যায় গো ভেসে আমার চাওয়া—পাওয়া যত।
(৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুর বীর, পিতৃভক্ত প্রতিজ্ঞতায় ভীষণ ও নির্মম। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই নিজের পুত্রকে তিনি নিহত করেন। কিন্তু নাট্যকার এই চরিত্রে স্নেহ, দয়া, মায়ার সঙ্গে কর্তব্য ও প্রতিজ্ঞা রক্ষার দ্বন্দ্বের অবতারণা করিয়াছেন। এই দ্বন্দ্বের জন্যই চরিত্রটি নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। 'প্রলম্বাসুর' ও তাহার ক্রীতদাস 'বাস্কল' চরিত্রদ্বয় হাস্যরস পরিবেশনের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে। নাট্য কাহিনীর সঙ্গে তাহাদের অবশ্য যোগ রক্ষিত হয় নাই। রক্তাসুরের স্ত্রী 'কল্যাণী' চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে স্ত্রী হওয়া অপেক্ষা মাতা হইবার মধ্যে নারী জীবনের সার্থকতা

অধিক। কল্যাণী বীরাঙ্গনা হইলেও বাৎসল্য ভাবই তাহার মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। মহিষাসুর-স্ত্রী 'কীর্তিমতী' নারীর প্রতি সমবেদনাবোধ ও স্বামীর অন্যায় অত্যাচারের বিরোধিতা করিবার মত সাহস ও শক্তি লইয়া রূপায়িত হইয়াছে। নাটকের সংলাপ রচনায় সৌরীন্দ্রমোহন মাঝে মাঝে নাট্যকার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থিয়েটারী নাটক 'সরমা' (১৩৪১) দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন এবং ইহার কিছু সংলাপ গ্রহণ করিয়াছেন,—

শচী পাষাণো ফাটিয়া যায় খর রৌদ্রতাপে,
ক্ষয় হয় সলিলধারায়। (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

"মন্দোদরী—হায় অন্ধ !
দেখনাই—প্রস্তর ফাটিয়া যায় খররৌদ্র তাপে
ক্ষয় হয় সলিল ধারায়।" (৭ম দৃশ্য, সরমা)

বস্তুত কীর্তিমতী, শচী, ও মহিষাসুর চরিত্র পরিকল্পনায় এবং তাহাদের সংলাপ রচনায় সৌরীন্দ্রমোহন 'সরমা' নাটক হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। শচী, কীর্তিমতী ও মহিষাসুরকে লইয়া রচিত কারাগারের দৃশ্যটি (২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য) 'সরমা' নাটকের অশোক কাননের দৃশ্যের (৩য় দৃশ্য) অনুকরণে রচিত হইয়াছে। এই দৃশ্যের বহু সংলাপ 'মহিষাসুর' নাটকে গৃহীত হইয়াছে। এখানে কীর্তিমতী মন্দোদরীর, শচী সীতার এবং মহিষাসুর রাবণের অন্যতম সংস্করণ। নাট্যকার কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের 'সরমা' নাটকের ঋণ স্বীকার করেন নাই। বাৎসল্য, করুণ, বীর ও ভক্তিরস এই নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। জনপ্রিয়তার জন্য ১৩৬৭ সালে এই নাটকের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নাট্যরচনায় বন্ধু বসন্ত কুমার মাহাতোর নিকট সৌরীন্দ্র মোহন সাহায্য লাভ করিয়াছেন—"তাহার কল্পনা ঐশ্বর্য্যের কিছুনা কিছু দানে আমার প্রত্যেকখানি নাটক সমৃদ্ধ" (মহিষাসুরের ভূমিকা ১৩৪৬)।

আত্মাহুতি (১৩৪৭)—বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ঊনবিংশ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক প্রথমে রায় অপেরা ও পরে রঞ্জন অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় পঁচিশ। ইহাতে যাত্রা-ব্যালে ও গণের গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিবাহ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া উপায়হীনা হিন্দুনারীকে যে কিভাবে সমাজ ও শাস্ত্রের যুপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে হয় তাঁহার করুণ কাহিনী লইয়া নাট্যকার অসবর্ণ বিবাহের সমস্যা এই নাটকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নাট্যকার ভূমিকায়

জানাইয়াছেন যে যাত্রায় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলা বিপজ্জনক বলিয়া এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি চেষ্টিত হইলেন না। কোশল সম্রাট ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত ও জনদেব শর্মার কণ্যা শ্রীলেখা পরস্পরকে ভালবাসেন; কিন্তু সামাজিক রীতি তাহাদের মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। শেষপর্যন্ত শ্রীলেখা পিতার ক্রোধাগ্নি হইতে প্রেমাস্পদকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন বিসর্জন করেন। এই মূলকাহিনী ছাড়া নাটকে আর একটি উপকাহিনী আছে। কেকয় রাজকন্যা ইলা ভাগ্যচক্রের আবর্তনে দস্যু সর্দার বিরাধের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিরাধ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন সম্ভব নহে বলিয়া সর্দার ইলার মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণদান করেন। উভয় কাহিনীতে মৃত্যুবরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু সমস্যার সমাধান নহে। নাট্যকার কেবল সমস্যাটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহার সমাধান করেন নাই। ভোলানাথ রায়ের সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহনের এইখানে পার্থক্য রহিয়াছে। ভোলানাথ নাটকে সমস্যা উপস্থাপিত করিলে তাহার সমাধানেরও চেষ্টা করিতেন। বর্তমান নাটকের মূল বক্তব্য এই, প্রণয়াস্পদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করাও সম্ভব। নাটকে জনদেব একটি প্রধান চরিত্র। কন্যা শ্রীলেখার সঙ্গে অযোধ্যার রাজা ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রতের বিবাহ প্রস্তাবে প্রচলিত সংস্কারপন্থী জনদেব অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। প্রতিলোম বিবাহ বন্ধ হইল কিন্তু জনদেবের ক্রোধ প্রশমিত হইল না। তিনি কন্যা শ্রীলেখা ও সত্যব্রতকে হত্যা করিয়া সামাজিক অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করেন। ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পৈশাচিকতা অবলম্বনপূর্বক জনদেব তাহার প্রতিহিংসাচরিতার্থ করিবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি উন্মাদ হইয়া গেলেন। সত্যব্রত বীর, প্রেমিক ও উদার। আশ্রিতের রক্ষণ, মনুষ্যত্ববোধ ও পিতৃভক্তি এই চরিত্রে স্থান পাইয়াছে। নারীর প্রতি সম্ভ্রম বোধ, কথা দিয়া কথা রাখিবার গুণপনা, প্রেম ও ঔদার্য অবলম্বনে দস্যু সর্দার বিরাধ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রেমের প্রতিদান পাওয়া অসম্ভব হওয়ায় 'বিরাধ' আত্মাহুতি দিয়া প্রেমিকার পথ কন্টকহীন করিয়া দেয়। এই চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার সাম্রাজ্যবাদের ফলে সৃষ্ট অর্থ নৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীলেখা প্রেমিকা। পিতার শত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহার জীবন রক্ষায় সতত ব্যস্ত, যেমন ব্যস্ত হইয়াছিলেন প্রেমাস্পদ সত্যব্রতের জীবনরক্ষায়। সত্যব্রতকে রক্ষা করিতে

গেলেও পরিশেষে পিতৃহস্তেই তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয়। ত্রয্যারুণের শ্যালক 'মকরন্দ' লম্পট ও সিংহাসন লোভী। এই অকৃতজ্ঞ চরিত্রটি এবং তাহার মোসাহেব 'গুণধর' প্রধানত হাস্যরস পরিবেশনের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে। নাট্যকার অবশ্য চরিত্র দুইটিকে কাহিনীর সঙ্গে জড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নাট্য ঘটনায় প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে মকরন্দ ও গুণধরের অংশটি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে নাই। প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে রাজসভায় শ্রীলেখার আগমন যেমন আকস্মিক তেমন অস্বাভাবিক হইয়াছে। এই নাটকে শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রস প্রাধান্য পাইয়াছে।

ব্যথার পূজা (১৩৫২)—ইহার মূল কাহিনী পদ্মপুরাণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রঞ্জন অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রাব্যালেসহ ইহাতে প্রায় একুশখানা গান আছে।

এই নাটকেও মহিষাসুরের মত অভিমানী ভক্ত সুরথ বৈরীভাবে উপাস্য দেবতার সাক্ষাৎ পাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার শুনিয়া কুণ্ডলের বিষ্ণুভক্ত বৃদ্ধ রাজা সুরথ ইষ্টদেবের জীবন্ত মূর্তি চক্ষে দেখিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া অযোধ্যায় গেলেন। শ্রীরাম স্বর্ণসীতা রচনায় ব্যস্ত থাকায় শত্রুঘ্ন শ্রীরাম দর্শনে সুরথকে বাধা দিলেন। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সুরথ স্বরাজ্যে ফিরিলেন। পরে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে শত্রুঘ্ন ও পুষ্কলকে সুরথ বন্দী করেন। শেষে রামচন্দ্র কুণ্ডলে গিয়া ভক্তকে দেখা দিলেন; শত্রুঘ্ন ও পুষ্কলও মুক্ত হইলেন। এই নাট্যকাহিনীতে কুণ্ডলরাজ সুরথের ভ্রাতা অত্যাচারী, কামান্ধ ও ভ্রাতৃদ্রোহী 'বিরথ' শত্রুঘ্নের ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া নূতন শিক্ষা লাভ করেন। ইহার ফলে তাহার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে। নাট্যকার কিন্তু ঘটনা পারম্পর্যের মধ্য দিয়া এই পরিবর্তনকে অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই। ইহা আকস্মিক হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের উপকাহিনীতে শূদ্র-তাপস শম্বুকের কন্যা তপতীকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সুরথের পুত্র চম্পকের প্রতি প্রেম ও রামের উপর বৈরী ভাব লইয়া এই চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে। পিতৃভক্তির জন্যই পিতৃহন্তা রামের প্রতি 'তপতী' রূঢ় মনোভাব গোপন করিয়াছিল। রামের ভ্রাতুষ্পুত্র 'পুষ্কলের' অস্ত্রাঘাতে অসহায় নারী তপতীকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। এই অহেতুক নারী হত্যায় রামচন্দ্র পুষ্কলকে চিরদিন অস্ত্রহীন করিয়া দিলেন। পুষ্কলের কলঙ্কিত কর্মে এবং তপতীর মৃত্যুতে রামের অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়,—

রাম—পুষ্কল যা করিয়াছে, হেরি তাহা আজ—
ইচ্ছা হয় মোর—
অশ্রুজলে গলে যাক অস্তিত্ব আমার। (৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

শম্বুক-হত্যায় রাম নিষ্করুণ ছিলেন, তপতীহত্যায় তিনি করুণার্দ্র হইলেন। আর রামের নয়ন-ঝরা ওই অশ্রুজলে মৃত্যুর পূর্বে 'তপতী' পিতৃতর্পণ করিল। রাজা সুরথের পুত্র 'চম্পক'বীর, দেশপ্রেমিক ও কর্তব্যপরায়ণ। শত্রুর কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া তপতীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসার জোরে তপতীর সঙ্গে চম্পক নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। রাজা বিরথের পার্শ্বচর 'ভোগেশ্বর' কামুক ও বিবেকহীন। এই চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। ঘটনা সন্নিবেশে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শ্রীরামের বিশ্রাম কক্ষে তপতীর প্রবেশ খুবই আকস্মিক। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে 'কালকেয়র' উদ্যত ছুরিকাহস্তে শত্রুঘ্নের শিবিরে উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক। কুণ্ডলের নরপতি সুরথ সমস্ত প্রিয়জনকে উৎসর্গিত করিয়া ইষ্টের প্রতি তাহার ব্যথার পূজা সমাপণ করেন এবং ইষ্টের দর্শনলাভে ভক্তজীবন চরিতার্থ করেন। তাই নাটকের নামকরণ করা হইয়াছে 'ব্যথার পূজা'। নাট্যরচনায় আদি, বীর, বীভৎস, করুণ ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

পলাশীর পরে (১৩৫৩) -ইহা রঞ্জন অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকে কয়েকটি যাত্রা-ব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় একুশ। বাংলার নবাব মীরকাসিমের সঙ্গে অষ্টাদশ শতকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষ, দেশীয় বেইমানদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার পরাজয় এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, কাউন্সিলর ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর দৌরাত্ম্যের বিরোধিতা করায় মহারাজ উপাধিধারী নির্দোষ দেওয়ান নন্দকুমারের অন্যায় ও বেআইনী ফাঁসির কাহিনী লইয়া নাট্য রচনা করা হইয়াছে। মহারাজ নন্দকুমার কর্মঠ ও দেশপ্রেমিক। সিরাজদ্দৌলার সময় বাংলার বুকে যে বিশ্বাস ঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার তরঙ্গ উঠিয়াছিল তিনি তাহার অবসান ঘটাইতে চাহেন। নন্দকুমার মীরজাফর আলির দেওয়ানি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারের অবসান ঘটাইবার সুযোগ গ্রহণের জন্য। কিন্তু শেখ কামালুদ্দিন (হিজলীর নিমক মহালের ইজারাদার) ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং প্রমুখের শঠতার সাহায্যে ওয়ারেন হেষ্টিং ফাঁসির রজ্জু দিয়া ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার সে প্রচেষ্টার সমাধি রচনা করেন। কাউন্সিলর

ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বার্থান্ধ, অর্থলোলুপ, অত্যাচারী ও ক্রূর। তিনি যে কোন প্রকার জঘন্য অন্যায়ের নিপুণ কর্মকার। তাহার জন্য মীরজাফর কামালউদ্দিন, নবকৃষ্ণ, কান্তমুদী, গঙ্গাগোবিন্দ সিং, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ ও জগৎশেঠকে লইয়া এক বেইমান সম্প্রদায়ও সহজেই গঠন করিতে পারিয়াছিলেন। মীরকাসিম চরিত্র স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক নবাব রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের মীরকাসিম ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়া [১]"অত্যাচার উৎপীড়নে তিন বৎসরকাল এই বর্ধিত রাজস্ব আদায় করিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে এই অত্যাচারী নবাব রাজকার্য পরিচালনা করেন"। বিশ্বাসঘাতকতার রন্ধ্রপথে উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া (১৭৬৪) বাংলার বাহিরে তিনি যখন অভুক্ত অবস্থায় উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন তখনও বাংলার ভুবন-ভুলান শ্যামলরূপের কথা ভাবিয়া তিনি আত্মহারা হইয়াছেন,—

"মীরকাসিম—কতদিন হল আমি তাকে ছেড়ে এসেছি, তবু আজও—আজও ভুলতে পারলাম না তার সেই ভুবন ভোলানো শ্যামলরূপ। সেই ছায়া ঢাকা গ্রাম্য পথ, পাতা কাঁপা বেণুবন, সেই দিগন্ত ছোঁওয়া সবুজ মাঠ, সারিগান গাওয়া নদী। সে যেন একটা বিস্মৃত প্রায় সুখ স্বপ্ন! বাংলা—বাংলা—আমার সোনার বাংলা"—("৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক, দিল্লীর রাজপথ)।

সিংহাসন চ্যুত হইবার পরে মীরকাসিম উত্তর ভারতে রোহিলাখণ্ড, বেরিলি, গোয়ালিয়র, রাজপুতনা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে তের বৎসর কাল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ইহার পর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহানবাদে উদরীরোগে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এখানে নাট্যকার তাহার জীবন-যবনিকাপাত প্রদর্শনে কিছুটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা অনুযায়ী তিনি মীরকাসিমের মৃত্যু দেখান নাই। মীরজাফরআলি খাঁ দুর্বল, ভীরু ও কাপুরুষ। উপপত্নী নর্তকী মণিবিবির অনুগত বলিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে অন্যায় করিতে হয়। তিনি মণিবিবির চাপে পড়িয়াই জামতা মীরকাসিমের সর্বনাশে উদ্যোগী হইয়াছেন। নাট্যকার চিরঘৃণিত মীরজাফর চরিত্রে অনুতাপের স্থান দিয়াছেন। শয়তান চরিত্রে অনুশোচনা না আসিলে যে পাপেরই জয় হয়। কিন্তু লোকনাট্যে পাপের পরাজয় প্রয়োজনীয়। তাই মীরজাফরের অনুশোচনা দ্বারা নাট্যকার যেমন লোকনাট্যের রীতি বজায়

১। বাংলার ইতিহাস পৃঃ ৪৩২-৪৪৩, প্রভাসচন্দ্র সেন, ১৩৭২।

রাখিয়াছেন তেমনি হয়ত তাহার প্রতি দর্শকদের কিঞ্চিৎ সহানুভূতি আকর্ষণেরও চেষ্টা করিয়াছেন। অনুতপ্ত জাফর আলি মৃত্যু কামনাও করিয়াছেন। অর্থাভাব, কোম্পানীর রক্তচক্ষু, [১]কুষ্ঠরোগাক্রমণ, রোগশয্যাশায়ী অহিফেনসেবী, বিশ্বাসঘাতক ক্লাইভের গাধার অনুতাপ হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নহে। নন্দকুমারের স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী চরিত্র পতিভক্তি ও দেশপ্রাণতা লইয়া রূপায়িত করা হইয়াছে। মীরজাফরের উপপত্নী নর্তকী মণিবিবি আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মীরকাসিমকে সরাইয়া মীরজাফরকে নবাবী গ্রহণে উদ্যোগী করিয়া তুলে। মীরজাফরের পরে মণিবিবির পুত্র নবাবী পাইলে মণিবিবি হইবে নবাব মাতা—এবং তাহার ছেলেরও নর্তকীপুত্র এই দুর্নাম লুপ্ত হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া মণিবিবি ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর চক্রান্তে যোগ দেয়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মীরজাফরের বিলাস কক্ষে হঠাৎ দরবেশ চরিত্রের উপস্থিতি আকস্মিক। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মুঙ্গের দুর্গে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও মীরকাসিমের কথোপকথনের মধ্যে নবাব-বেগম ফতেমার আকস্মিক প্রবেশে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয় নাই।

এই ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিতে গিয়া সৌরীন্দ্রমোহন মঞ্চনাট্যকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'মহারাজা নন্দকুমার' (১৯৪৩) নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। নাটকের সংলাপ রচনায় ইহার নিদর্শন রহিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক এবং মহেন্দ্রনাথের উল্লিখিত নাটকের যথাক্রমে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য, প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য ও দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এখানে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হইল,—

(ক) নন্দকুমার---এবার মনে করছি গুরুদাস, ঐ জহরত বিক্রি করে যে মূল্য পাওয়া যাবে বুলাকিদাসকে দিয়ে সেই টাকা লগ্নী খাটিয়ে আমার হৃতভাগিনী গুরুকন্যার ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান করে দেব। (১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক, 'পলাশীর পরে')

"নন্দকুমার---মনে আশাছিল, ঐ জহরৎ বিক্রি করে যে মূল্য পাওয়া যাবে,

---

১। "নবাব পুনরায় কলিকাতায় আসিলে কোম্পানী টাকার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করিল। অর্থাভাবে নবাব রাজধানিতে ফিরিয়া আসিয়াই শেষ শয্যায় শয়ন করিলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ জানুয়ারী ৭৬ বৎসর বয়সে বিশ্বাসঘাতক, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, অহিফেনসেবী বৃদ্ধনবাব মীরজাফর পরলোক গমন করেন।" ঐ, পৃঃ ৪৫৩

সেই টাকা লগ্নি খাটিয়ে বুলাকীকে দিয়ে হতভাগিনী গুরুকন্যার ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান করে দেব। মুর্শিদাবাদে বুলাকীর কারাবাসের সঙ্গে সে জহরৎ লুঠ হয়ে গেছে।" (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য, 'মহারাজা নন্দকুমার')

(খ) ওয়ারেন---Excuse me my friends, মেরা তবিয়াৎ আচ্ছা নেহি। Very tired---am very tired---(৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক, 'পলাশীর পরে') "হেষ্টিংস --Excuse me my friends! তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়! হামি কোঠি চলিয়া যাইবে। Very tired, I am---very tired!" (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য---'মহারাজা নন্দকুমার')

করুণ, বীভৎস, রৌদ্র ও বীরভাব নাটকে স্থান পাইলেও দেশপ্রেমই ইহার প্রধান উপজীব্য বিষয়। নাটকখানি যাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৩৭০ সালে ইহার অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

মাটির মা (১৩৫৫)---ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত এই ঐতিহাসিক নাটক অঙ্কবিভাগহীন চৌদ্দটি দৃশ্যে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় বিশ, যাত্রা-ব্যালেও ইহাতে সন্নিবেশিত হইযাছে। ষোড়শ শতকের অন্যতম ভুঁইয়া ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে আরাকানের মগরাজ মৌসং ও পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের সংঘর্ষ অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে। নাট্য রচনায় কল্পনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মণ মাণিক্যের নিমন্ত্রিত কায়স্থ সমাজ কর্তৃক কুলচ্যুত হওয়ায় দেওয়ান চক্রধর দত্ত মগরাজ মৌসং ও জলদস্যু গঞ্জালেসের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যের ভুলুয়া ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। মদ্য ও এক সুন্দরী নারীর সাহায্যে রাজভ্রাতা রামানুজকে বন্দী করিয়া চক্রধর রাজজামাতা পরমানন্দ ঘোষের সহায়তায় তাহাকে মৌসং-এর শিবিরে পাঠাইয়া দেন। ভুলুয়া রাজ্যের উপর হইতে মগ আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য লক্ষ্মণমাণিক্য সন্ধির প্রস্তাব করিলে চক্রধর রামানুজের নামে জালপত্রে মুকুট-দণ্ড চাহিয়া পাঠাইলেন ও রাজাকে রাজ্য ত্যাগ করিতে বলিলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য ইহাকে সত্য পত্র মনে করিয়া রামানুজের বাসনা পূরণ করেন। কাজেই দেশ রাজাহীন হওয়ায় চক্রধর মগও পর্তুগীজ-দ্বারা ভুলুয়ায় যৌথ আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করেন। পরপর যুদ্ধ জয়ে আরাকান রাজবন্দীতে ভরিয়া গেল; ফলে সেখানে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় মৌসং সব বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করেন। রামানুজও এই সুযোগে মুক্ত হইয়া লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে যোগদান করেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের কাছে চক্রধরের

চক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। রামানুজ ও লক্ষ্মণমাণিক্য সোনার গাঁয়ের অধিপতি ঈশাখাঁর (মৃত্যু—১৫৯৯ খ্রীঃ) সহায়তায় মগ ও জলদস্যুদের পরাজিত করিয়া বাংলাকে অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। এই নাট্য কাহিনীতে লক্ষ্মণমাণিক্যের চরিত্রে দেশপ্রেমের পরিচয় থাকিলেও ভ্রাতৃপ্রেম তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করায় তাহার মধ্যে রাজনীতিবোধ ও দূরদৃষ্টির অভাব লক্ষিত হয়। লক্ষ্মণমাণিক্যের একটি সংলাপে 'out of the frying pan into the fire'—এই প্রবাদ কথার অনুসরণ করা হইয়াছে ; কিন্তু ইহার বাংলা রূপদানে নাট্যকার ভাষার কাঠিন্য মুক্ত হইতে পারেন নাই,—

লক্ষ্মণ—কী করলুম—কী করলুম শঙ্কর, এ আমি কী করলুম! উত্তপ্ত কটাহ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার প্রজাগণকে শেষে আমি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলুম। (অষ্টম দৃশ্য)

রামানুজ শক্তিমান, ভ্রাতৃপ্রেমিক ও স্বদেশপ্রেমী। কিন্তু দেওয়ান চক্রধরের জালে আবদ্ধ হওয়ায় তাহার সম্পর্কে লোক-মানসে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। শৃঙ্খলিত অবস্থায়ও তাহার প্রেমিকা পদ্মাকে চক্রান্তকারী, দুর্নীতিপরায়ণ দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি কারাগৃহে গমন করেন। কারামুক্তির পরে রামানুজ আবার জ্যেষ্ঠের পদতলেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওয়ান চক্রধর সার্থকনামা. তিনি পিশাচের মত নির্মম চক্রান্তকারী। ব্যক্তিগত কারণে সমগ্র দেশকে তিনি দস্যুর হাতে তুলিয়া দিতে পশ্চাৎপদ নহেন। শেষ পর্যন্ত পদ্মার প্রতিপালক রাজেশ্বরের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়া তাহাকে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দেওয়ানপুত্র মীনধ্বজ পিতৃচরিত্রের বিরোধীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। অনুপ্রাসমূলক সংলাপের সাহায্যে নাট্যকার এই চরিত্রে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। পরিব্রাজক ফকির সাহেব গানে গানে দেশপ্রেম ও হিন্দুমুসলমান-ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সোনার গাঁয়ে ইসমাইল খাঁর বিলাসগৃহে (দশম দৃশ্য) গীত কণ্ঠে তাহার উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিকতা বিরোধী। নাট্যরচনায় আদি, বীভৎস, বীর ও করুণরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ বিষয় লইয়া মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'সোনার বাংলা' (১৯৩৯) নাটকের দেওয়ান কীর্তিধর, রঘুনাথ ডাকাত, নর্তকী অনুরাধা চরিত্র দ্বারা যথাক্রমে দেওয়ান চক্রধর, রাজেশ্বর ডাকাত ও সঙ্গীত-নৃত্যকুশলা পদ্মা চরিত্র কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইলেও ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্যও রহিয়াছে।

রক্তবীজ (১৩৫৮)—ইহার মূল কাহিনী হরিবংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রঞ্জন অপেরায় অভিনীত হয়। নাটকে ব্যালের গান সহ প্রায় বিশখানা সঙ্গীত রহিয়াছে। সমুদ্র মন্থন হইতে যে সকল ঐশ্বর্য্য উত্থিত হয় দৈত্যদের বঞ্চিত করিয়া দেবতারা তাহা সকলই স্বর্গে লইয়া গেলেন। কঠোর পরিশ্রম করিয়াও বঞ্চিত দানবগণ নিজেদের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কেবল লক্ষ্মীকে দৈত্যপুরীতে আনিতে চাহিলেন। কিন্তু দেবগণ ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন। দৈত্যপতি শুম্ভ ও তাহার ভ্রাতা নিশুম্ভ এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য দৈত্য সর্দার রক্তবীজকে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ও দৈত্যদের জন্য সঞ্জীবনী লাভার্থ কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। এই অবসরে বিষ্ণুর প্রবঞ্চনা ও দেবগুরু বৃহস্পতির শঠতায় দৈত্যপুরে ছদ্মবেশে হত্যা প্রভৃতি অনর্থ ঘটিতে থাকে। শুক্রাচার্য ও শুম্ভ-নিশুম্ভ তপস্যা হইতে ফিরিয়া আসিলে দেব দানবে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে দৈত্যরাজ জয়লাভ করিয়া স্বর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন; কিন্তু চণ্ড, মুণ্ড ও সর্দার রক্তবীজ আদ্যাশক্তির প্রচেষ্টায় নিহত হইলেন। দেবদানব দ্বন্দ্বের এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটি যুগোচিত সমস্যা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সমস্যা হইতেছে ধনিক ও শ্রমিক, শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষ। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কুবের বলেন, "দারিদ্র্যের দাবী আগুনের মত"। সুতরাং তাহাকে বন্ধ করিবার জন্য ধনিকরা স্বার্থবুদ্ধি অনুযায়ী বিবেক ও ন্যায় বোধকে চালনা করেন। ইহারই ফলে জনগণের দারিদ্র্য বাড়িয়া চলে। অথচ দারিদ্র্যের অধিক প্রয়োজন লক্ষ্মীর অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের। তাই দানবরাজ রক্তবীজ সমুদ্র মন্থনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেবগণকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল লক্ষ্মীকে চাহিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের স্তূপে বসিয়া দারিদ্র্যের হাহাকারে ব্যথিত হওয়া ধনীর পক্ষে সম্ভব নহে। তাই রক্তবীজ লক্ষ্মীলাভে বঞ্চিত হইলেন এবং মৃত্যুকালে একটি ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গেলেন, "ধনী আর দরিদ্র পাশাপাশি থাকতে জগতে শান্তি কোনদিন আসবে না। আমি গেলুম, কিন্তু আরো আসবে লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে দুঃখপাগল দৈত্যের দল। যুগে যুগে দেশে দেশে অনন্তকাল ধরে আপ্রলয় চলবে এই সংগ্রাম"। (৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। নাট্যকার দেবগণকে ধনিক ও দৈত্যদের দরিদ্ররূপে দেখিয়াছেন। ধনী ও দরিদ্রের এই দ্বন্দ্ব থাকিতে সমাজের গণবিক্ষোভ দূরীভূত হওয়া সম্ভব

নহে। সাম্রাজ্যবাদী নিয়ম অনুযায়ী যে "একজন করবে পরিশ্রম, আর অন্যে করবে তার ফলভোগ—এই বিধান চলতে পারে না"—(রক্তবীজ, ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিতে হইলে মানুষকে মানুষের অধিকার ফিরাইয়া দিতে হইবে। আর ইহার জন্য সম্পদের সমবণ্টন ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইহাই নাটকের প্রধান বক্তব্য। নাটকটি ঘটনা প্রধান। ইহাতে বৃহস্পতি চরিত্রে দেখান হইয়াছে যে শিক্ষা ও বুদ্ধি বলে উচ্চস্তরের লোক সমাজে অত্যাচার চালায়। এই অবস্থার অবসান কল্পে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রকে শিক্ষা ও সংঘ শক্তিতে বলীয়ান হইতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। সেই জন্যই রক্তবীজ তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বলিয়াছেন "সরস্বতীর করুণাই আমাদের আগে দরকার" এবং "সঙ্ঘেই শক্তি"। রক্তবীজ জাতির প্রভাতের জন্য রাত্রির তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। এই তপস্যায় তিনি শিক্ষা ও সঙ্ঘশক্তিকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন। স্নেহপ্রবণ ও বীর দৈত্যপ্রধান রক্তবীজ জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য সমবণ্টন নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী। নাট্যকার 'ইন্দ্র' চরিত্র সৃষ্টিতে কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। যাত্রানাট্যের 'ইন্দ্র' দৈত্যশ্রীকাতর, দানবশক্তিতে ঈর্ষা পরায়ণ এবং ছলে বলে কৌশলে দৈত্য সংহারে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু এই নাটকের ইন্দ্র দৈত্যদের প্রতি দেবগণের অন্যায় অবিচারকে সমর্থন করেন না। দেব সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া তিনি ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু এই অন্যায় আচরণে যে তাহার কোন সমর্থন নাই ইহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দেবভ্রাতা দৈত্যদেরও অবস্থার উন্নতি কামনা করেন। ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীও তাহার পিতৃমতের অনুগামিনী। রক্তবীজের স্নেহপরায়ণা কন্যা 'অরুণার' কণ্ঠেও দেবগণের অন্যায় আচরণের প্রতিকারের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। দৈত্য রাহু অমর হইবার লোভে এবং গ্রহপতির পদ লাভের বাসনায় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া দেবপক্ষে যোগদান করেন। তাহার চরিত্রে জাতিদ্রোহিতার পরিচয় রহিয়াছে; কিন্তু তাহার পুত্র 'মেঘহাস' পিতৃ অনুগামী নহে। অরুণার প্রেমমুগ্ধ মেঘহাস স্বজাতির প্রতি কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। এই নাটক রচিত হইবার বহু পূর্বে গণেশ অপেরায় অভিনীত ভোলানাথ রায়ের 'জগদ্ধাত্রী' নাটকে ইন্দ্রচরিত্রে দেবোপম প্রবৃত্তিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। রক্তবীজ নাটকের ইন্দ্র চরিত্র রূপায়ণে ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিবার বিষয়ে সৌরীন্দ্রমোহন উল্লিখিত নাটক হইতে পূর্বধারণা সঞ্চয় করিয়া

থাকিবেন। ছোট বড় বিচারের মাপকাঠি ঐশ্বর্য নহে, মহত্ত্ব। শুক্রাচার্যের মহত্ত্ব জগতের বিস্ময়। নাট্যকার এই চরিত্রের মধ্য দিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে যাহারা নিঃস্ব, নিষ্পেষিত তাহাদের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার বৃত্তি দেবত্বেরও ঊর্দ্ধে। শুক্রাচার্য শোষিত দৈত্যদের দুর্দশা দূর করিবার জন্য তাহাদের গুরুর পদে বৃত হইয়া যে কঠোর সাধনা ও কর্ম করিয়াছেন তাহাতেই তাহার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'অঘাসুর' চরিত্র নাটকে হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছে। নাট্য রচনায় আদি, বাৎসল্য, করুণ, বীভৎস ও বীর রস প্রাধান্য পাইয়াছে। নাটকে দেব ও দৈত্যের দ্বন্দ্ব রূপক, এই রূপকের অন্তরালে নাট্যকার ধনী ও দরিদ্রের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই নাটকটির বৈশিষ্ট্য।

চক্রছায়া (১৩৬০) মহাভারতের কাহিনী লইয়া রচিত এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রঞ্জন অপেরা ও নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত হয়। নাটকের গীতিসংখ্যা দশ। ইহাতে গণের গান ও যাত্রা-ব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কুরুপাণ্ডবের দ্বন্দ্বে ভীষ্ম, অভিমন্যু ও জয়দ্রথ বধের ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে। এই নাটকে 'স্মৃতিবাক' রূপক চরিত্র গানে ভীষ্ম ও অভিমন্যুর পূর্বজীবনস্মৃতি মনে জাগরিত করাইয়া তাহাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে ভীষ্ম শরশয্যাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু অভিমন্যু পার্থিব জীবনের আকর্ষণ দ্বারা এই চাঞ্চল্য জয় করিবার চেষ্টা করেন। অন্ধ কারাগারে আবদ্ধ শতভ্রাতা ও পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় পিতৃঅস্থি বহনকারী শকুনি চরিত্র চিত্রণে পূর্বালোচিত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিদুর' (১৩২০) নাটকের ঐ চরিত্র দ্বারা নাট্যকার প্রভাবিত হইয়াছেন। অর্জুনপত্নী স্নেহশীলা সুভদ্রা চরিত্রে জাতিভেদ সমস্যার কুফলের কথা ধ্বনিত হইয়াছে। নাট্য রচনায় শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

নূতন জীবন (১৩৬১) ইহা পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। অঞ্জনার জমিদার দুর্গাশংকর ও তাহার নায়েব গোপীনাথ সরকারী কর ফাঁকি দিয়া এবং পুলিশকে হাত করিতে চেষ্টা করিয়া কিভাবে শোষণ ও পীড়নে প্রজাদের জর্জরিত করেন তাহার পরিচয় দিয়া নাট্যকার পচনশীল দুষ্ট ব্রণের মত সমাজদেহে বিরাজমান জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন দ্বারা শোষণহীন সমাজের ও নূতন জীবনের আগমনী গাহিতে চাহিয়াছেন। নাটকখানি

পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখায় অভিনীত হইবার জন্য যাত্রা টেকনিকে রচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার তৎকালীন প্রোডাকসন্ অফিসার নাট্যকার মন্মথ রায়ের অনুরোধে এই নাটক রচিত হয়। ভূমিকায় সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, "আলাপ আলোচনার পর তিনি আমাদের প্রত্যেকের কাছেই নাটকের প্রাথমিক কাঠামো হিসাবে একটি করিয়া গল্প চান। কথা থাকে যে মনোনীত গল্পটিকে নাটকে রূপান্তরিত করা হইবে। ইহার ফলে আমারই গল্পের নাট্যরূপ এই 'নূতন জীবন'।" শেষ পর্যন্ত লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক এই নাটকের অভিনয় সম্ভব হয় নাই।

নাটকে এগারখানি গান সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে গণের গানও রহিয়াছে। দুর্গাশংকর ডাকসাইটে জমিদার। কিন্তু তাহার পুত্র তারাশংকর উদার দৃষ্টি সম্পন্ন আধুনিক যুবক। তিনি পিতার অন্যায় অত্যাচারের বিরোধী। পাঠশালার পণ্ডিত শিবনাথ পরহিতৈষী ও গান্ধির আদর্শে বিশ্বাসী কংগ্রেসপন্থী যুবক। তিনি চাষী মজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। জমিদারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে দুর্গাশংকরের গুলিতে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। এদিকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জমিদারী প্রথা বিলোপের ঘোষণা করায় দুর্গাশংকর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাহার জমিদারী আভিজাত্য বিলুপ্ত হইবে। পুলিশি গ্রেপ্তার হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত বিষপান করিয়া তিনি মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি শোষণ পীড়নহীন নূতন জীবনের প্রতি শুভ কামনা জানাইবার মত উদারতার পরিচয় দেন। নাটকের গোপীনাথ স্বার্থপরতা, শঠতা ও প্রবণতা অবলম্বনে টাইপ চরিত্ররূপে চিত্রিত হইয়াছেন। তিনি একটি বাস্তু ঘুঘু, অন্যায় কর্মে তিনি সিদ্ধহস্ত।

মাটির মানুষ (১৩৬৭)---কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি পর্বের তপতী ও রাজা সংবরণের কাহিনী লইয়া এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছে। ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় বিশ; নাটকটি সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়। হস্তিনার নৃপতি সংবরণ মৃগয়া করিতে গিয়া রাক্ষসের অত্যাচার হইতে তপতীকে উদ্ধার করায় তপতী তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করেন। গ্রহপতি সূর্যের কন্যা তপতী এই ভাবে মানুষকে পতিত্বে বরণ করায় দেবরাজ ও সূর্যপুত্র যম অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। ফলে যম ও দেবগণের চক্রান্তে হস্তিনারাজ্যে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দেয়। ইহার অবসান কল্পে সংবরণ আত্মকৃত

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত মানসে ভগ্নী ইন্দিরাকে রাজ্যের ভার দিয়া তপতী সহ বনগমন করেন। এই অবসরে হস্তিনামন্ত্রী বৌধায়ন ও যমের সহযোগিতায় পাঞ্চালরাজ হিরণ্যবর্মা হস্তিনা জয় করিয়া বিবাহের উদ্দেশ্যে ইন্দিরাকে স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন এবং হস্তিনাকে করদ রাজ্য করিবার জন্য বৌধায়নের হস্তে সিংহাসন ভার ছাড়িয়া দিলেন। প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিংহাসনে বসা বিপদজনক মনে করিয়া বৌধায়ন রাজভ্রাতা ও নিজের জামাতা উদয়ণকে পুত্তলিকাবৎ রাজা করিয়া নিজেই প্রকৃত রাজ্যভার গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু বন্দী উদয়নকে শত অত্যাচারেও সংবরণ জীবিত থাকিতে হস্তিনার সিংহাসন গ্রহণে শ্বশ্রূ বৌধায়ন রাজী করাইতে পারেন না। ইহার পর উদয়নের সহচর গুণময় উদয়নকে বন্দিদশা হইতে মুক্ত করায় তিনি হস্তিনা উদ্ধার করিয়া তপতী ও সংবরণকে হস্তিনায় ফিরাইয়া আনেন এবং পাঞ্চাল জয় করিয়া ইন্দিরাকে উদ্ধার করেন। সংবরণ ইন্দিরার সঙ্গে সূর্যপুত্র সাবর্ণির মিলন ঘটাইয়া দিলেন। হস্তিনার প্রজা দরিদ্র ব্রাহ্মণ সত্যশীলের হৃত চক্ষুর উদ্ধার ও একমাত্র পুত্রের পুনর্জীবন লাভের জন্য বনবাসকালে সংবরণ নিজের চক্ষু ও পুত্রের জীবন দান করেন। মর্ত্যমানবের এই দান ও আত্মত্যাগে দেবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাই যম সংবরণের অন্ধত্ব দূর করিয়া মৃত পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন এবং স্বীকার করিলেন যে মানুষ দেবতা অপেক্ষা ছোট নহে। সংবরণের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের মধ্য দিয়া নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তাহা হইলে দেবতা অপেক্ষা সে কোন অংশে হীন নহে।

মনুষ্যত্ববোধ ও ত্যাগের মহত্ত্বের মধ্য দিয়া মাটির মানুষ রাজা সংবরণ তাহার বিবাহে দেবস্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হইলেন এবং প্রমাণ করিলেন যে দেবতা অপেক্ষা মানুষ ছোট নহে। সংবরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়ন মন্ত্রী বৌধায়নের শঠতায় মদ্যপ হইয়া ক্রমে মেরুদণ্ডহীন হইতে থাকেন। কিন্তু তাহার অন্তরে ভ্রাতৃভক্তি ও কর্তব্যবোধ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত সাময়িকভাবে লুপ্ত হইয়া পড়িলেও ইহাদের প্রভাবেই মন্ত্রীর অত্যাচার শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিপথে চালিত করিতে পারে নাই।

মন্ত্রী বৌধায়ন চরিত্রে ব্রজেন্দ্র কুমার রচিত 'বিচারক' নাটকের (১৩৬৩) সেনাপতি দারুমুখ চরিত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। দারুমুখ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র সোমনাথকে চরিত্রহীন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করেন। দারুমুখ -

ষড়যন্ত্র করিয়া জামাতা সোমনাথকে পুত্তলিকাবৎ সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে দারুমুখ রাজার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন। নাট্যকারের বৌধায়ন চরিত্রের পরিকল্পনাও অনেকটা এই প্রকারের। 'বিচারক' নাটকের সোমনাথের সহচর পক্ষিরাজ চরিত্রদ্বারা উদয়নের সহচর গুণময় চরিত্র কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়াছে। গুণময় প্রধানত হাস্যরস পরিবেশন করিলেও নাট্য কাহিনীতে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সরলতা ও প্রভুভক্তির সঙ্গে এই চরিত্রে ভগবদ্‌ভক্তিও সংযুক্ত হইয়াছে। সূর্যকন্যা তপতী প্রেমের মর্যদা দিতে পারিয়াছেন। তাহার প্রেমে মহত্ত্বের স্পর্শ রহিয়াছে। তপতীর প্রেম সংবরণকে কর্তব্যচ্যুত করে নাই, সংবরণ সাময়িক ভাবে মোহাচ্ছন্ন হইলেও তপতী তাহাকে কর্তব্য কর্মে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই অংশে সংবরণ ও তপতী চরিত্র রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' (১২৯৬) নাটকের জালন্ধর রাজ বিক্রমদেব ও মহিষী সুমিত্রাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। তপতীর সংলাপ রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব রহিয়াছে,—

তপতী—তোমার এ প্রেম
ঝড়ের মেঘের মতো মধ্যাহ্ন আকাশে
ঢাকিয়া ফেলেছে তব দীপ্তি গৌরবের। (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

"সুমিত্রা—একি ভালবাসা! এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব।" (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য, 'রাজা ও রাণী)

রৌদ্র, হাস্য, ও ভক্তিরস থাকিলেও 'মাটির মানুষ' নাট্যরচনায় আদি, বীর ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

'ধর্মবল', 'শাপমুক্তি', 'ভক্ত হরিদাস' 'সম্রাট অশোক', 'রাজা রামমোহন' (১৯৭০) প্রভৃতি আরো কয়েকটি লোকনাট্য তিনি রচনা করেন। সৌরীন্দ্র মোহন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর', ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসত্রয়ের যাত্রা-নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। বিভিন্ন যাত্রাদলে এইগুলি অভিনীত হইয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। সৌরীন্দ্রমোহন উপন্যাসের যাত্রা-নাট্যরূপ রচনার প্রথম পথ-প্রদর্শক।

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯০২—১৯৬৬)

হুগলী জিলার পাকড়ি গ্রামনিবাসী বিনয়কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য করিতেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। এই কার্যের জন্য তিনি ১৯৬৪ খ্রীঃ সরকারী পুরস্কার লাভ করেন। বিনয়কৃষ্ণ বহু লোকনাট্য রচনা করিয়াছেন। দেশপ্রেম, হিন্দুমুসলমান-ঐক্য, কালোবাজারী-চোরা-কারবারীর কুফল প্রভৃতি সমকালীন সমাজ সমস্যা তাহার নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্কট রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রক্তকমল (১৩৫০)—হরিবংশের হরিবংশ পর্ব (৩০শ ৩২শ অধ্যায়) হইতে এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রাব্যালে সহ ইহাতে পঁচিশখানার অধিক গান আছে। ইহাতে আদিরসাত্মক দ্বৈতগীতি ও রহিয়াছে। লক্ষ্মী উচ্চৈঃশ্রবা-অশ্বের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ায় নারায়ণের প্রশ্নের জবাব দিতে ভুলিয়া গেলেন। ইহাতে নারায়ণ অসন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে অভিশপ্ত করেন। নারায়ণের শাপে লক্ষ্মী মর্তে অশ্বিনী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু 'একবীর' নামক পুত্র-জন্মের পরে শাপমুক্ত হইয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। হস্তিনায় যযাতির পুত্র রাজা তুর্বসু অপুত্রকছিলেন। বনদেশে অনাথ একবীরকে পাইয়া তিনি পুত্ররূপে তাহাকে প্রতিপালিত করিতে থাকেন। তুর্বসুর মৃত্যুর পরে একবীর হস্তিনার সিংহাসনে বসেন। এদিকে সভ্যরাজ সুবাহুর কন্যা একাবলীকে দানব সম্রাট কালকেতু হরণ করিতে উদ্যোগী হইলে একবীর তাহাকে আশ্রয় দেন। ইহা লইয়া দৈত্যরাজ ও হস্তিনারাজের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বে 'কালকেতু' নিহত হইলে একাবলীর সঙ্গে একবীরের মিলন ঘটে। ইহাই মোটামুটি নাট্য কাহিনী। কালকেতুর মৃত্যুর মধ্য দিয়া নাটকে নারী নির্যাতনের কুফল ঘোষিত হইয়াছে। আশ্রিত রক্ষণের মাহাত্ম্য-ও ইহাতে প্রচারিত হইয়াছে,—

একবীর—প্রাণ যদি যায় আশ্রিত রক্ষায়,
কিবা ক্ষতি তায়
হবে তাহা জীবনের গরিষ্ঠ সাধনা।
সে সাধনা ধরণীর স্মৃতির মন্দিরে
আপ্রলয় পাইবে অর্চনা। (২য় অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য)

নাটকে বীর, করুণ ও আদিরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

সংগ্রাম (১৩৫২)—শ্রীমদ্‌ভাগবতের (বাংলা সং) অষ্টম স্কন্ধের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত হয়। নাটকে ব্যাণ্ডের গান সহ বিশখানার অধিক গীতি সংযোজিত হইয়াছে। দুর্বাশার আশীর্বাদ মাল্যের অবমাননা করায় দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষীহারা হইলেন। লক্ষ্মী ক্ষীরোদসাগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেববিদ্বেষী দানবসম্রাট চণ্ডাসুর লক্ষ্মীহীন স্বর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। পুনরুদ্ধারের জন্য দেরাজ ইন্দ্র তপস্যাদ্বারা নারায়ণকে তুষ্ট করিলেন এবং নারায়ণের বুদ্ধিতে লক্ষ্মীও অমৃতলাভ কবিবার জন্য ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উদ্যোগী হইলেন। অমৃতলাভের জন্য দানবগণও সাগরমন্থনে যোগদান করেন। মন্থনের ফলে লক্ষ্মী সমুদ্রোত্থিতা হইলে নারায়ণ তাঁহাকে লইয়া স্বর্গে গমন করেন। দেবতাগণ নানাপ্রকার চক্রান্ত করিয়া মন্থনোদ্‌ভূত ঐশ্বর্যসমূহ স্বর্গে লইয়া গেলেন। শিব মন্থনের গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন। শেষে ধন্বন্তরি সুধাপাত্র লইয়া সাগর হইতে উঠিলে অমৃতলাভে দেবদৈত্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই অবসবে রাহু অমৃত হরণ করিয়া পান করিতে শুরু করিলে তাহাকে হত্যা করিয়া দেবগণ অমৃতপায়ী হইলেন। এই হইল নাট্য ঘটনা। এই নাটকে নাট্যকার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন এবং দৈত্যরাজ চণ্ডাসুরের কণ্ঠে ইহার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে,—

চণ্ডাসুর—সেই হেতু এই অভিযান
চাই বিশ্বে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

নাটকে বীর ও ভক্তি রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

মাটির প্রেম (১৩৫৫)—এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়। কয়েকটি ব্যালে সহ ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় পঁচিশ। অষ্টম শতকের দ্বিতয়ার্ধে শিলাদিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হূন বিরোধী এই শাসকের রাজধানী ছিল বল্লভীনগরে। তিনি অন্তত ৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই শিলাদিত্য ও হূন-দ্বন্দ্ব লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। বল্লভীপুরের রাজা শিলাদিত্য মন্ত্রী রতনরাওর চক্রান্তে স্বাধীনতা হারাইলেন। সূর্যকুণ্ড নামে রাজার এক দীঘি ছিল। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে সেই দীঘির জলে সূর্য পূজা করিয়া যুদ্ধে গেলে রাজা অপরাজেয় থাকিতেন। কিন্তু রাজ্যলোভে বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী হূন রাজাকে যুদ্ধে জয়ী করিবার জন্য গোরক্ত মিশ্রিত করিয়া দীঘির জল অপবিত্র করিবার ব্যবস্থা করেন। অপবিত্র জলে সূর্য পূজা হইল

না বলিয়া শিলাদিত্য হুন রাজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। কিন্তু মন্ত্রীর রাজ্যলাভ সম্ভব হইল না, অধিকন্তু তাহাকে অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দেশপ্রেমকে প্রাধান্য দিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। 'শিলাদিত্য' ও তাহার শিপাহশালার 'চন্দ্রনাথ' চরিত্র দুইটি বীরত্ব ও দেশপ্রেম অবলম্বনে চিত্রিত হইয়াছে। নাটকে আদি, বীর, করুণও বীভৎস রস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। দেশভক্ত রামদাস এই নাটকে সংগীতের মধ্য দিয়া বিবেকের বাণী শুনাইয়াছেন।

নাটকে যে সূর্যকুণ্ডের সূর্যোপাসনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিকতা পাওয়া যায় না। ইহা কিংবদন্তী বলিয়া মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' হইতে নাট্যকার ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন,—[১]"যখনই কোন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন,······শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী······তাঁর সর্বনাশ করলে।······পারদ নামে একদল অসভ্য যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গোরক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মত নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না।"

বেইমান (১৩৫৭)—ইহা বীর, করুণ ও বীভৎস রসপ্রধান পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক। বীণাপাণি অপেরায় ইহা অভিনীত হয়। ব্যালেসহ নাটকে প্রায় পনেরখানি গান রহিয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক অঙ্কের শেষে ঐকতান বাদনেরও নির্দেশ আছে। বিদেশীরা এই দেশে স্বার্থপর বেইমানের দল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সাহায্যে রাজত্ব কায়েম করিতে চাহে। যুদ্ধের সময় এই সব বেইমানদের সহযোগিতায় দেশে কালোবাজারী ও চোরা কারবারীরা বাড়িয়া উঠে। ইহাদের হাত হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। ইহাই নাটকের মূল বক্তব্য। যে বিদেশী সরকার দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া স্বার্থান্বেষী কিছুসংখ্যক অপদার্থের সহযোগিতায় শাসনের নামে শোষণ, অত্যাচার ও খাদ্য থাকিতেও মজুতদার সৃষ্টি করিয়া কৃত্রিম খাদ্যাভাবে প্রজাপীড়নের ব্যবস্থা করে—জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠায় সে দৈত্যসরকারকে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া

১। রাজকাহিনী পৃঃ ১২—১৩, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা—১৩৫৭।

যাইতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু এই দানব-রাজ এমনই কৌশলী যে দেশত্যাগের পূর্বে জনগণের মন হইতে খারাপ ধারণা মুছিয়া ফেলা ও পরবর্তী কালে যোগাযোগ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি দেশবাসীর বন্ধুত্বলাভের কামনা জানাইতে থাকেন। এইদেশের স্বার্থান্ধ বেইমানদের নগ্নরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়া পরদেশী সরকার দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণেরও চেষ্টা করেন। রত্নপুরের বিদেশী রাজা বিশ্ববল ও স্বদেশী মন্ত্রী সুরসেন-এর সংলাপে ইহার পাওয়া যায় (৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। যুদ্ধের সুযোগে যে কালোবাজারীর দল উর্ধ্বতন সরকারী মহলের সহযোগিতায় বাড়িয়া উঠে নাট্যকার তাহাব পরিচয় দিয়াছেন ব্যবসায়ী দুঃখহরণ ও খাদ্যমন্ত্রী হুতাশনশেঠের চরিত্রের মধ্য দিয়া।

বীরাঙ্গনা (১৩৫৮)--ইহা চণ্ডী অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে প্রায় আঠার খানা গান আছে, ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ব্যালেগীতি। এই নাটকেও প্রতি অঙ্কের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ আছে। বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে দিল্লীর বাদশাহ আকবরের সঙ্গে গড়মণ্ডলের অধিশ্বরী রাণী দুর্গাবতীর যুদ্ধকাহিনী নাটকের অবলম্বন। হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য এবং দেশাত্মবোধ নাটকে বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বীর, করুণ ও আদিরস প্রধান রচনা। [1]বৈরামখাঁকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজ্য ছাড়িয়া মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হয়; ইহার মূল কারণ বৈরাম কর্তৃক আকবরের বিরোধিতা করা। মক্কা যাইবার পথে ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে বৈরাম খাঁ মুবারক খাঁ দ্বারা নিহত হইলেন। গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতীর বিরুদ্ধে আকবরের যুদ্ধ হয় ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই যুদ্ধের প্রধান চালক ছিলেন আসাফ খাঁ। ইতিহাসের সত্য রক্ষা করিয়া নাট্যকার এই নাটক রচনা করিতে পারেন পাই। [2]দুর্গাবতীর স্বামী দলপতের মৃত্যুকালে পুত্র বীর নারায়ণের বয়স

---

1. Bairam Khan, accepting his fate, marched accross Rajputana towards the coast, in order to proceed to Mecca.…The ex-protector was stabbed to death, and his corpse was left on the ground. Some Fakirs and poor people charitably gave it burial. P. 34—Akbar the Great Mogul—V. A. Smith Delhi, 1962.

2. When he died he left a son, named Bir Narayan, only Five Years of age. With the assistance of Adhar Kayath, the Rani assumed the Government, showing no want of courage and ability, and managing her foreign relations with judgement and prudence. P. 34 Abul Fazal's 'Akabar-Nama' Eng. Trans. by H. M. Elliot & J. Dowson, 3rd Ed.

মাত্র পাঁচ বৎসর ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পরে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের নামে দুর্গাবতী অধরকায়স্থের সহযোগিতায় স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে আকবরের সঙ্গে দুর্গাবতীর যুদ্ধ হয়। বর্তমান নাটকে দলপতকে যুদ্ধের সময় সক্রিয় দেখা যায়। নাট্যকার স্বদেশ-প্রীতি, শক্তি-মত্তা, বুদ্ধি, রণকৌশল এবং আত্মসম্মান বোধ লইয়া দুর্গাবতী চরিত্র রূপায়িত করিয়াছেন। আকবর চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক কল্পনার অতিরিক্ত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে এই চরিত্রের ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই। নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে হৃদয়বান আকবর যুদ্ধ বন্ধ করিয়া রাণী দুর্গাবতীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছেন,--

আকবর--আমি তোমার স্বদেশের স্বাধীনতাকে চির অক্ষুণ্ণ রাখতে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু সব আমার ব্যর্থ হল। এ কি করলে মাহারাণী। (৫ম অঙ্ক, শেষ দৃশ্য)

কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারে উন্মুখ আকবর সম্পর্কে ইতিহাসে বলা হইয়াছে, [1]"Once he had begun a quarrel he hit hard aud without mercy." সম্রাটের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাহার মনোভাবও লক্ষ্য করিবার মত, [2]'আইনী আকবরি'তে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে; রাজ্যজয়ের সংকল্প তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

কালযবন (১৩৬০)—ইহার মূল ঘটনা হরিবংশের (বাংলা সং) বিষ্ণুপর্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক নিউ নারায়ণ অপেরায় অভিনীত হয়। ব্যালে-গীতি সহ ইহার গানের সংখ্যা পনেরর অধিক। অস্পৃশ্য যবন রাজনন্দিনী গোপালীর পুত্র কালযবন গর্গের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। আভিজাত্যের ভয়ে গর্গ গোপালী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করেন। যৌবনে কালযাবন রাজা হইয়া যোগ্যতার সঙ্গে যবন রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু পিতৃ পরিচয়হীন বলিয়া তিনি অবজ্ঞাত। ঋষি গর্গের নিকট পিতৃ-পরিচয়ের দাবী জানাইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইলে কালযবন ঋষিকে অন্যায়ের জন্য কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের সহায়তায় গর্গ কারামুক্ত হওয়ায়

---

1. Akbar the Great Mogul, V. A. Smith, P. 51 (Delhi, 1962)

2. A monarch should be ever intent on conquest otherwise his neighbours may rise in arms against him. P. 399 (Vol. III) Abul Fazal Allamis 'Ain-i Akbari', Eng. Trans. by H. S. Jerrott 'Happy sayings of his Majesty' অংশ (Asiatic Society of Bengal)

কালযবন দ্বারকা অক্রমণ করেন। দ্বারকাধিপতি কালযবনের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করেন। মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ দৈত্য জয়ের পরে রণক্লান্ত হইয়া হিমালয়ের এক গুহায় নিদ্রাযাপন করিতেছিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্বে মহেশ্বরের কাছে তিনি বর লাভ করেন যে, যে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে সেই মুচুকুন্দের নেত্রানলে ভস্মে পরিণত হইবে। সুতরাং কেহই ভয়ে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিতে সাহস করিত না। কালযাবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইতে থাকিলে কৃষ্ণ গুহার নিকট পর্যন্ত যুদ্ধস্থল প্রসারিত করিয়া কৌশলে গুহার মধ্যে প্রবেশ পূর্বক অদৃশ্য হইলেন। কালযাবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করিয়া নিদ্রিত মুচুকুন্দের নিকটবর্তী হইলেন। যবন রাজার আস্ফালনে মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রোত্থিত ক্রুদ্ধ মুচুকুন্দের নেত্রানলে কালযবন ভস্মে পরিণত হইলেন। ঘটনাবহুল নাটকের ইহাই মূল কাহিনী। যবনকন্যা 'গোপালী' ও 'কালযবনের' প্রতি অন্যায় আচরণ করায় ঋষি গর্গকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সৃষ্ট জীবকে যে অবশ্যই কর্মফল ভোগ করিতে হইবে ইহাই নাটকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। নাটকটি বীভৎস, বীর ও করুণ রসপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

ভুলের কাজল (১৩৭০)—এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি চণ্ডী অপেরায় অভিনীত হয়। ইহাতে প্রায় বিশখানা গান রহিয়াছে, যাত্রা-বালেও এই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৫ম অঙ্কের ১ম দৃশ্য রূপনগরের রাজা দেবরায়ের সংলাপে নাটকের মূল কথাটি প্রকাশিত হইয়াছে,—"কর্মই মানুষকে বড় আসন দেয়, জন্ম দেয়না"। দস্যু সর্দার আদম খাঁর চরিত্রের কর্মাবলীর মধ্য দিয়া এই মূল ভাবটি নাটকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আদম খাঁ রক্তশোষক মহাজন, চোরাকারবারী সয়তান ও অর্থপিশাচদের ঘরে ডাকাতি করিয়া দেশের ও শোষিতদের মধ্যে লব্ধ সম্পদ বিলাইয়া দেয়; সে বিশ্বাসঘাতক ও বেইমানদের সমুচিত শিক্ষা দেয়। ন্যায়ের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য আদম খাঁ সকল স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে। বস্তুত আদর্শের জোরেই মানুষ বড় হয়। আদমখাঁর সাহায্যেই রাজা দেবরায়ের চোখ হইতে ভুলের কাজল অপসৃত হয় এবং পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে। হিন্দুমুসলমান-ঐক্যের কথাও নাটকে ধ্বনিত হইয়াছে। চাষীরাই যে দেশের প্রকৃত বন্ধু ও আশাভরসাস্থল তাহাও নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে,—

চাষী—(গীত) ভাই, অসভ্য নয় চাষা।
ওরাই ফলায় মাটির বুকে সোনার ফসল খাসা॥
চাষা যদি থাকত না ভাই, থাকত কোথায় বাবুর দল,
কে জোগাতো তাদের ঘরে দুটি বেলা অন্নজল,
চাষার গায়ের রক্তেতে ভাই মালক্ষ্মী পাতে বাসা॥
তারা নয়কোরে দীন, নয়কোরে হীন
তারাই যে হয় বন্ধু দেশের, তারাই দেশের আশা॥

(৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

নাটকখানি আদি, করুণ, হাস্য ও বীভৎস রস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বিনয়কৃষ্ণ 'রক্তপূজা', 'মায়ের ছেলে', 'পণমুক্তি', 'ত্রিধারা', 'হিন্দুমুসলমান', 'রক্ততর্পণ', 'ভারতনারী', 'দর্পহারী', 'মারাঠা-মোগল' প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেন।

নন্দগোপাল রায়চৌধুরী (১৯১২—)

কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দগোপাল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নারিকেলডাঙ্গায় (কলিকাতা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাওড়া বাজে শিবপুরে থাকিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বর্তমানে তিনি হুগলী উত্তরপাড়ার অধিবাসী। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী পলাতক বিপ্লবীর সঙ্গে মেলামেশা করিয়া ইংরেজ সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের অপরাধে তিনি কয়েক মাস জেল হাজতে বাস করেন। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় হাজত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নন্দগোপাল একটি জার্মান কোম্পানীতে চাকুরি গ্রহণ করেন। রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত বলিয়া তাহার চাকুরি চলিয়া যায়। ইহার পরে তিনি পেশাদারী যাত্রার দলে যোগদান করিয়া পঙ্কজভূষণ রায়ের অধীনে অভিনয় শিক্ষা করিতে থাকেন। প্রায় পনের বৎসর অভিনয় করিবার পরে তিনি নাট্যরচনায় ব্রতী হইয়া শিশুপাল বধের কাহিনী অবলম্বনে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'যুগনেতা' নামে একখানি যাত্রা নাট্য রচনা করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটক 'শিশুপাল বধ' নামে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের পল্লীমঙ্গল আসরে অভিনীত হয়।

কবির কল্পনা (১৩৫৮)—ইহা রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। ইহাতে যাত্রা-ব্যালে গীতিসহ প্রায় পঁচিশখানি

গান আছে। নাটকখানি 'ষ্টার অপেরায়' অভিনীত হয়। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন—"কৃত্তিবাসী রামায়ণে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র চরিত্রে বহুস্থানে কলঙ্কপাত করিয়াছে; যথা—সীতার অগ্নিপরীক্ষা, শম্বুক বধ, সীতার বনবাস ইত্যাদি। তাই আমি কল্পনা দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের যথাসম্ভব নির্মলতা রক্ষা করিয়াছি; তাহা ছাড়া রামায়ণে শম্বুক চরিত্রের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না; আমি কল্পনা দ্বারা এই চরিত্রের পূর্ণ রূপ অঙ্কিত করিয়াছি, কবির কল্পনা নাম করণের এও আর একটি কারণ"। নাটকে রাম ও শম্বুক চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নাট্যকার রাম চরিত্র চিত্রণ করিতে গিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে কঠোর সমাজ শাসনের চাপে মানবহৃদয়বৃত্তির যথাযথ স্ফুরণ সকল সময় সম্ভব হয় না। তাই তাহার অন্তর অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্র রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সমাজ-বিধানানুযায়ী নিষ্পাপ রামভক্ত শম্বুককে প্রাণদণ্ড দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহার ভক্তিকে স্বীকৃতি দিলেন। এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া নাট্যকার রামচরিত্রে শম্বুক হত্যার কলঙ্ক অপনোদন করিবার চেষ্টা করেন। শম্বুক হত্যার জন্য রাম মনে মনে অনুতপ্ত। তাই হত্যার দৃশ্য রামের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়,—

(স্বপ্নোত্থিত শ্রীরাম সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল)

শ্রীরাম—রক্ত—রক্ত—রক্তস্রোতে প্লাবিত
করিল মোরে। ঐ বুঝি শম্বুকের
উষ্ণ রক্ত শ্রাবণের ধারা সম বরষে চৌদিকে,
উষ্ণ রক্তে পুড়ে গেল সর্বাঙ্গ আমার।
(পলায়নোদ্যত হইলে যেন বাধাপ্রাপ্ত হইলেন)
ঐ—ঐ শূদ্রাণীর তীব্র অভিশাপ
বিকট আকারে করাল ব্যাদান মেলি
আসিতেছে গ্রাসিতে আমারে।
ঐ যে শম্বুকের ছিন্নমুণ্ড অট্টহাস্যে
ভুবন কাঁপায়। কে আছ কোথায়
ত্বরা এস রক্ষিতে আমায়। (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

বিনাদোষে অগ্নিশুদ্ধা সীতাকে রামচন্দ্র বনবাসের আদেশ দিয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু সমাজ বিধান অনুসারে ইহা ছাড়া প্রজানুরঞ্জনের আর

কোন উপায় ছিল না। এই কাজেও রামচন্দ্র অপেক্ষা অন্ধ সমাজবিধির দায়িত্ব অধিক। এই নাটকখানি প্রধানত বীর, ভক্তি ও করুণ রসাত্মক; রামচন্দ্র ও বাল্মীকি চরিত্রে শান্তরসেরও অবতারণা করা হইয়াছে।

আগুন (১৩৬০)—ইহা পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে প্রায় তের-চৌদ্দখানি গান আছে; যাত্রা-ব্যালেও এই নাটকে রহিয়াছে রাণা উদয়সিংহের ঔদাসীন্যের সুযোগে মুঘলসম্রাট আকবর চিতোরে এক ধ্বংস যজ্ঞের আয়োজন করেন (১৫৬৭-১৫৬৮ খ্রীঃ)। এই জীবন যজ্ঞে চিতোরের মৃত জওয়ানদের [1]উপবীতের ওজন হয় ৭৪॥০ মণ; এই যুদ্ধের স্মৃতি অনুযায়ী প্রেমিক-প্রেমিকারা গোপনপত্রে ৭৪॥০ লেখার প্রচলন করেন। নাটকখানির মূল বক্তব্য—বিলাসিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাই জাতিকে ধ্বংসের পথে টানিয়া আনে। আদি, রৌদ্র ও ভয়ানক রসের এই নাটকে দেশাত্মবোধ প্রাধান্য পাইয়াছে। চারণ কবি নারায়ণ ভট্ট গানে গানে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা ছড়াইয়াছে। এই চরিত্রটি নাটকে বিবেকের বাণীও শুনাইয়াছে। চিতোর যুদ্ধে বহু রাজপুত বীর ও দেশপ্রেমিক জীবনদান করিয়াও পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। এই পরাজয়ের প্রধান কারণ রাণা উদয়সিংহের বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া। নাটকখানি শৃঙ্গার, বীর ও রৌদ্ররস প্রধান। আকবর চরিত্রে আদি বীর ও রৌদ্ররসের সঙ্গে ভয়ানক রসেও অবতারণা করা হইয়াছে।

আলোর ডাক (১৩৬৩)—বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের একাদশ হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছে। ভক্তি ও করুণরসপ্রধান এই নাটকটি সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়। ইহাতে প্রায় বাইশখানি গান আছে। ভারতেশ্বর উত্তানপাদ রাজার কনিষ্ঠা মহিষী সুরুচির সপত্নীবিদ্বেষ ও চক্রান্তের ফলে নির্বাসিতা জ্যেষ্ঠামহিষী সুনীতির পুত্র ধ্রুব কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়। এই সাধনার ফলে রাজ্যহারা উত্তানপাদ স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং বড় রাণী ও পুত্রের সঙ্গে তাহার পুনর্মিলন ঘটিল। সুরুচি কৃতকর্মের জন্য উন্মাদ হয়। ইহাই নাটকের ঘটনাবস্তু। এই নাটকে দ্বিবিবাহের কুফল দেখান হইয়াছে।

শহীদবীর (১৩৬৪)—ইহা তরুণ অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক

---

1. The recorded amount was 74½ Mds of about 8 lbs. each. P. 65. Akbar the Great Mogul—V. A. Smith, Delhi, 1962.

নাটক। ইহাতে ষোল খানার অধিক গান রহিয়াছে। এই নাটকে যাত্রা ব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজনীতির পেষণ ও ধনিক সম্প্রদায়ের শোষণে জর্জরিত জনগণের জাগরণের মধ্য দিয়া আশাবাদী নাট্যকার পেষণ ও আভিজাত্যের অহঙ্কার দূরীভূত করিয়া সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। 'রূপক' চরিত্রে শ্রেণীসংঘাতের মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

রূপক—কেউ সুখে নেই হেডুয়া—কেউ সুখে নেই। কঠোর রাজনীতি পেষণে আজ ইতর ভদ্র সব জাতিই নিষ্পেষিত, ধনীর দল আজ দরিদ্রের বুকের রক্ত শোষণ করছে, নিরন্ন দেশবাসী আজ নব নব করভারে জর্জরিত। তাই আজ আমি এসেছি তোমাদের মত বলশালী জাতিকে জাগিয়ে দিয়ে দেশের বুক থেকে এই পাশবিক নীতির উচ্ছেদ করতে। (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

এই নীতির উচ্ছেদ করিতে হইলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমান অধিকারের দাবী জানাইতে হইবে, প্রয়োজন হইলে নিষ্পেষিতদের বীরের মত অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে, ; সমস্যা সমাধানের ইহাই শেষ পন্থা,—

চারণ—(গীত) ও ভাই, দাবিজানা ধনীর দ্বারে।

হিংসাদ্বেষ সব ঘুচিয়ে দিয়ে ভায়ের পাশে দাঁড়া ফিরে॥
মাথার ঘামটা পায়ে ফেলে সোনার ফসল আনবি তুলে,
খাটাই তোদের সার হল ভাই, ওদের গোলা দিলি ভরে॥
অন্নাভাবে মরিস তোরা,—তা দেখে আজ হাসে ওরা
ওই হাসি ভাই থামিয়ে দেনা বীরের মত অস্ত্র ধরে॥

(১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

ইহা দেশপ্রেম ও বীররস প্রধান নাটক।

মিলনসেতু (১৩৬৭)—ইহা পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক। ইহাতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও সে চরিত্র সৃষ্টিতে ইতিহাস অনুসরণ করা হয় নাই। নাটকে গানের সংখ্যা পনের। ইহাতে যাত্রা-ব্যালে রহিয়াছে। নাট্যভারতী যাত্রাদলে নাটকটি অভিনীত হয়। হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করা নাটকের মূল উদ্দেশ্য। 'ইমান আলি' কাহিনীর পরিচালক। শত বাধা অতিক্রম করিয়াও সে বাংলাদেশের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। ধর্মের গোঁড়ামির জন্য ধর্মগুরুরাই হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যের অন্তরায়। গ্রাম্য ইসলাম গুরু 'পীর সাহেবের' চরিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। ইহা করুণ, বীর ও ভয়ানক রসপ্রধান নাটক।

সন্ধিপূজা (১৩৭০)—ইহা ভক্তি ও করুণরস প্রধান পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটকখানি প্রথমে 'মাতৃদ্রোহী' নামে নিউ ভোলানাথ অপেরায় এবং পরে 'সন্ধিপূজা' নামে জনতা অপেরায় অভিনীত হয়। অহিভূষণ ভট্টাচার্য প্রবর্তিত চন্দ্রবংশের রাজা সুরথের দুর্গোৎসব কাহিনী লইয়া অনেকেই লোকনাট্য রচনা করিয়াছেন, এখানেও নাট্যকার সেই প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন।

নন্দগোপাল 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' (১৩৫৮), 'স্বাধীনতার বলি' (১৩৬২), 'বন্দীর ছেলে' (১৩৬৩), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩৬৪), 'যাদব বিজয়', 'সাধক কমলাকান্ত' (১৯৭১) প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাটক রচনা করিয়াছেন।

জিতেন্দ্রনাথ বসাক (১৩২৪—)

তিনি ১৩২৪ সালে ময়মনসিংহ জিলার জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করিবার পরে তিনি 'যশোহর সাহিত্য সংঘের' 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধি পরীক্ষা এবং কুচবিহার বেসিক ট্রেনিং কলেজ হইতে বেসিক ট্রেনিং পরীক্ষা পাশ করেন। জিতেন্দ্রনাথ হলদিবাড়ী নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত আছেন। দেশ বিভাগের পরে নিঃস্ব অবস্থায় তিনি হলদিবাড়ীর (কুচবিহার) অধিবাসী হইয়াছেন। তাহার প্রথম নাটক 'মানুষ' (১৩৫৪)। সমসাময়িক নানা সমস্যাদ্বারা তাহার নাটক প্রভাবিত। নাট্যকার সমাজ সচেতন। কিন্তু তাহার বহু নাটকে একই সমস্যা প্রতিফলিত হইয়াছে। বিভিন্ন নাটকের সমস্যায় পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

মানুষ (১৩৫৪)—নাটকখানি নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত হয়। ইহাতে প্রায় একুশ খানি গান আছে। নাটকে যাত্রা-ব্যালে ও রহিয়াছে। আদি ও করুণরস প্রধান এই নাটকখানি জনপ্রিয়তার জন্য অষ্টম সংস্করণে পদার্পণ করে। 'প্রস্তাবনা', 'প্রারম্ভ' ও 'পরিণতি' এই তিনটি ভাগে নাটকটি বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে কয়েকটি করিয়া উপবিভাগ রহিয়াছে। প্রস্তাবনা অংশে নাট্যবীজের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রারম্ভে ঘটনার বিস্তার ও পরিণতি অংশে নাট্য ফলাফল প্রতিষ্ঠিত। নাটকের ভাব ও বিষয়বস্তু সংস্থাপনাক্রম অনুসারে বিভিন্ন অংশের নাম দেওয়ার রীতি রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকে দৃষ্ট হয়। নাটকটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। সূচনা অংশের পরে এই নাটকে চারটি দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে এবং ইহাদের নাম দেওয়া

হইয়াছে যথাক্রমে 'সূত্রপাত', 'সন্ধান', 'সন্দেহ' ও 'প্রকাশ'। জিতেন্দ্রনাথ এই রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নাটককে অংকে বিভক্ত না করিয়া ঘটনাক্রম অনুযায়ী নাম-চিহ্নিত তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

বর্ণাশ্রম রাজ্যের রাজা শক্তি সিংহ চণ্ডাল কন্যা সীতার প্রেম মুগ্ধ হইয়া ফুলমণি নামক কন্যার পিতৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু সমাজের ভয়ে রাজা সীতা তথা কন্যাকে পরিত্যাগ করেন। নাটকে দেখান হইয়াছে যে সীতা উচ্চ বর্ণের লোকদের অপেক্ষা মনুষ্যত্ববোধ ও হৃদয়বৃত্তির দিক হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, সীতার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া রাজা তাহাকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেন। অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং মনুষ্যত্বের আদর্শের উপর নাট্যকার নাটকটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান-ধর্মবিদ্বেষ ও জাতিভেদ সংস্কারের উর্ধ্বে উঠিয়া বর্তমান মানুষ যদি মনুষ্যত্বের পূজারী হয় এবং সেবা ধর্মকে প্রাধান্য দেয় তবেই সমাজের মঙ্গল সাধন সহজ হইয়া উঠিবে। দরবেশ চরিত্রের মধ্য দিয়া এই ভাবটি খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,

দরবেশ—মন্দির, মর্জিদ, গীর্জা, বোধিতরুমূলে খুঁজি আমি
প্রকৃত মানুষে! নাহি ধ্যান, নাহিক ধারণা, নাহি
কোন মূল মন্ত্র, আবাহনরীতি, ধ্যান, জ্ঞান, আবাহন,
মূল মন্ত্র মোর মানবের সেবা। উচ্চ কণ্ঠে
প্রচারি জগতে—শোনরে মানুষ ভাই,
'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।
এস মাতা, আশ্রম আবাসে মোর
প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমা মানবের মাতা,
উচ্চ কণ্ঠে করিব প্রচার,
শোনরে মানুষ ভাই—
'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।
শোনরে মানুষ ভাই,—
সবার উপরে জননী মোদের তাহার উপরে নাই।
শোনরে মানুষ ভাই,—
সবার উপরে সেই সে মানুষ—ভেদাভেদ যার নাই।

(প্রস্তাবনা—চতুর্থস্তর)

বৃটিশ চক্রান্তে দেশ বিভাগের পূর্বে ধর্মান্ধতা লইয়া দেশে যে উন্মাদনা

দেখা দিয়াছিল ভুক্তভোগী জিতেন্দ্র নাথ তাহার কুফল হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাহার নাটকে সেই ধর্মান্ধতা পরিত্যাগের কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন।

বিদ্রোহীবাঙ্গালী (১৩৫৮)—ইহা দেশাত্মবোধমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহাতে বীর, বীভৎস ও করুণরস প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহাতে গানের সংখ্যা প্রায় ষোল; দুইটি ব্যালেও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাটকখানি 'নবপ্রভাত অপেরায়' অভিনীত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হইয়াছে। নেতাজী স্বনামে নাটকে উপস্থিত নাই। বাঙ্গালী উকিল সতীনাথের পুত্র সর্বদমনই নেতাজী। সর্বদমন পুরুষকারের সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ছদ্মবেশে ভারত পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে আজাদী সংগ্রামের সৈনিক সংগ্রহ করিয়া বাহির হইতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারত আক্রমণ করা ছিল সর্বদমনের লক্ষ্য। নজরবন্দী অবস্থায় দেশত্যাগের পূর্বে কানাইলাল ও ক্ষুদিরামের ফাঁসির কথা শুনাইয়া মাতৃ-অনুমতি লাভ করেন সর্বদমন। বক্তব্যে প্রত্যয় সৃষ্টির জন্য রূপক-দৃশ্যের অবতারণা করা লোকনাট্যের একটি রীতি।

সেই রীতি অনুযায়ী নাট্যকার সর্বদমনের মাতা অরুন্ধতীর অনুমতি লাভের বিশেষ মুহূর্তটি যেভাবে রূপায়িত করিয়াছেন এখানে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,--

অরুন্ধতী--তুই বুঝবিনে বাবা, সন্তানের জন্য মায়ের বুকে কি ব্যথা। কোথায় কোন অজানা টানে দুর্গমপথে অনাহারে অনিদ্রায় ছুটে বেড়াবি--আর আমি মা হয়ে নিশ্চিত আরামের মাঝে বসে থাকবো! না, না, তা হয়না-- তা—হয়—না!

সর্বদমন—ভারতে আমিই তোমার একমাত্র পুত্র নই না। অন্তর চক্ষু উন্মীলন করে দেখ মা--, কত শত মায়ের অঞ্চলের নিধি—বীর সন্তানের দল— কানাইলাল, ক্ষুদিরাম যারা—

(সহসা মূর্ত হইয়া উঠিল এক অশরীরী সঙ্গীত, আবির্ভূত হইল
ফাঁসি বদ্ধ দুইটি ছায়া মূর্তি! ফাঁসির দড়ি দুইটি
ছায়ামূর্তি সজোরে টানিয়া ধরিয়া আছে। ফাঁসবদ্ধ
মূর্তি দুইটি যন্ত্রণায় ছুটাছুটি করিতেছে)

গীত

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।
ভাবো একবার তাদের কথা তারাও মায়ের প্রাণ ॥
কত রমণীর ললাট হইতে সিঁন্দুর মুছিয়া গেল,
কত জননীর বুক খালি করে পুত্র বিদায় নিল।
শহিদের খুনে স্বরু যে প্লাবন আজো হয়নিকো অবসান ॥
শহিদ আত্মা ঘুরিছে শূন্যে উপেক্ষী তাহারা বিনা তর্পণে ॥
না দিলে প্রেরণা মায়ের জাতেরা কোথা কবে জাগে বীর সন্তান ॥

(সব অদৃশ্য হইয়া গেল, ৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)।

ইহার পর অরুন্ধতী সর্বদমনের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত ত্যাগে অনুমতি দিলেন। নানাদেশ ঘুরিয়া বিদেশে থাকিয়া মুক্তি ফৌজের দল গঠন করিয়া ইম্ফল যুদ্ধের পরে সকলের নিকট হইতে সর্বদমন বিদায় গ্রহণ করিলে নাটক সমাপ্ত হয়। ভারতীয়ের কুলগুরু 'কশ্যপ' চরিত্রে মহাত্মাগান্ধীকে রূপায়িত করা হইয়াছে,—

"কশ্যপ—কিন্তু মনে রেখো সৈনিকগণ! তোমরা সবাই সত্যাগ্রহী—সবাই অহিংসাব্রতী। অসহযোগও আইন অমান্যই তোমাদের একমাত্র আন্দোলন।"

(২য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক)

নাটকে হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যের কথাও ধ্বনিত হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম করিতে হইলে প্রয়োজন কাপুরুষতাকে বিসর্জন দিয়া লোভ, মোহ ও মৃত্যুভয় উত্তীর্ণ হওয়া। ইহার জন্য চাই একতা, বিশ্বস্ততা ও আত্মোৎসর্গ। সংগ্রামীদের আবার দেশদ্রোহীদেরও কঠিন শাস্তি দেওয়া কর্তব্য। ইহাই নাটকের মূল বক্তব্য।

কাজলগড় (১৩৬০)—এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত হয়। ব্যালেসহ ইহাতে প্রায় তেরখানি গান আছে। অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা 'মানুষ' নাটকেও রহিয়াছে। এই নাটকেও ইহার উপর বিশেষ জোর দিয়া ইহা বর্জনের উপায় নির্ধারিত করা হইয়াছে। অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজকে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে সুশিক্ষাদ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে হইবে। সুশিক্ষাই অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রধান উপায়। রতনগড়ের রাজা সুরঞ্জনের পুত্র অঞ্জনের পত্নী ধীবর কন্যা কাজলের চরিত্রে এই বাক্তব্যই ধ্বনিত হইয়াছে,—

কাজল—শিক্ষিতা আমি—তাইতো জানি আমরা পতিত নই, কারও চেয়ে হীন নই—ছোট নই।

চক্রপানি—ছোটলোকের শিক্ষা এই বলে নাকি ?

কাজল—হ্যাঁ, ছোটলোকের শিক্ষা এই কথাই বলে। সৃষ্টির প্রথমে ছিল সবাই মানুষ। তারপর ক্রমবিকাশ ও ক্রমবর্ধনের ফলে শিক্ষিতেরা অভিজাত, আর অশিক্ষিতদের করা হল -পতিত—দাস। শিক্ষাই মানুষকে দিয়েছে এই ব্যবধান, আবার শিক্ষাই করবে এর অবসান। (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) নাটকখানি আদি, বীর ও করুণ রসপ্রধান।

রক্তের লেখা (১৩৬২)—এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি রঞ্জন অপেরায় অভিনীত হয়। ব্যালে-গানসহ নাটকে প্রায় তেরখানি গীতি আছে। বুকের রক্ত দিয়া যাহারা ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়াছে অথচ মুক্ত ভারতে যাহারা সর্বহারা সেইসব হতভাগ্য ছিন্নমূল মানুষের মর্মন্তুদ কথা নাটকের রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। নাট্য ঘটনাস্থল 'লক্ষ্মীপুরই' অবিভক্ত বঙ্গদেশ, 'হাম্বীর' বিদেশী শাসকের সেনাপতি, 'বৈষ্ণব' হিন্দু সম্প্রদায়, 'শাক্ত' -মুসলমান সম্প্রদায়, 'ললিত' হিন্দু প্রতিনিধি ও 'ভৈরব' হইতেছে মুসলমান প্রতিনিধি। বিদেশী শাসক শাক্ত ও বৈষ্ণবের আত্মঘাতি সংগ্রাম সৃষ্টি করিয়া দেশবিভাগের ব্যবস্থা করেন,—

ললিত—লক্ষ্মীপুরের মানচিত্র !

হাম্বীর - হ্যাঁ, পূর্ণ মানচিত্র ! আমার এই তীক্ষ্ণ ছুরির ফলাকায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। (ছুরি দিয়া মানচিত্র দুই টুকরা করিয়া ফেলিল)

ভৈরব ও ললিত - (আর্তকণ্ঠে) সেনাপতি !

হাম্বীর– হাঃ –হাঃ –হাঃ, আনন্দ করুন কুমারদ্বয়, আনন্দ করুন। ধরুন ছোট কুমার এই পূর্বার্ধ—আর আপনি গ্রহণ করুন এই পশ্চিমার্ধ। (উভয়ে গ্রহণ করিল) আজ থেকে পূর্বার্ধের নাম হোক ভৈরব নগর, আর পশ্চিমার্ধের নাম হোক ললিত নগর। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

প্রাকৃতিক সীমানার কথা বিচার করা বা জনগণের সুবিধা অসুবিধার কথা বিচার করিয়া দেশ বিভাগ হয় নাই; দেশকে ছুরির ফলাকা দ্বারা অন্ধের মতই দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। দেশবিভাগের পরে বিদেশী রাজনীতির প্ররোচনায় 'ভৈরব নগরবাসী ধর্মের নামে মানবতাকে বিসর্জন দিল, মানুষের অন্তর পশুর আবাসস্থল হইল। ধর্মান্তরিকরণ, সম্পদ হরণ,

নারী নির্যাতন, রাষ্ট্রত্যাগ প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভৈরব নগরবাসী অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া বৈষ্ণবদের পঙ্গু করিয়া রাখিতে চাহে। বৈষ্ণবগণ নিরুপায় হইয়া হয় ইহা সহ্য করে, না হয় ছিন্নমূল হইয়া দেশত্যাগ করে। নাট্যকার ইহাও দেখাইতে ভুলেন নাই যে ভৈরব নগরেও 'বাহারের' মত মানুষ দুই এক জন আছে যাহারা রাজনীতি ও ধর্মোন্মাদনায় মনুষ্যত্ব হারায় নাই। ইহা বীভৎস ও করুণ রস প্রধান নাটক। হিন্দু ও মুসলমানকে যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়রূপে কল্পনা করিবার মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'ধরার দেবতা' (১৯৪৮) নাটকের প্রভাব রহিয়াছে।

ধর্মবিপ্লব (১৩৬৪)—ইহা আদি ও করুণরসপ্রধান পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। নিউ প্রভাস অপেরায় ইহা অভিনীত হয়। ব্যালেসহ ইহাতে প্রায় বিশখানা গান রহিয়াছে। রাজা গণেশ নারায়ণের পুত্র রাজা যদুর (১৪১৮—১৪৩১ খ্রীঃ) জেলালুদ্দিন নাম গ্রহণের কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু সমাজের সমাজপতিদের সংকীর্ণতার প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাঘব আচার্যের ন্যায় হিন্দুসমাজপতিদের বিচারহীন সংস্কার মানুষের স্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে,—

গোবর্ধন—সংস্কারের কাছে তোমাদের মস্তক বিক্রীত বলেই আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক ভাবছ ঠাকুর। স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা যদি তোমাদের থাকত—তাহলে বুঝতে পারতে কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়।

রাঘব—ন্যায় অন্যায় বুঝি না, বুঝি শুধু শাস্ত্র—জানি শুধু সমাজের বিধান। (৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

নবাব আজিম শাহের কন্যা শাহাজাদি 'আশমানকে' রাজা যদু আশ্রয় দিলেন ও তাহার প্রেম মুগ্ধ হইলেন। ফলে রাঘবাচার্যের হিন্দুসমাজের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'জেলালুদ্দিন' নাম গ্রহণ করেন—

রাঘব—চল উদয়নারায়ণ, এই চণ্ডালের সংস্পর্শ আমরা পরিত্যাগ করি।

যদু—চণ্ডাল! না না রাঘরাচার্য—আমি চণ্ডাল নই—আমি মুসলমান। আজ থেকে রাজা যদুনন্দন—নবাব জেলালুদ্দিন খাঁ। (৩য় অঙ্ক ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

নাটকে নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন, "ধর্মের আসল তত্ত্ব হিন্দুমুসলমান সবাই একেবারে ভুল করে বসে আছে। আজ যার যতবড় টিকি সে ততবড় হিন্দু, যার যতবড় দাড়ি সে ততবড় মুসলমান" (৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য

—গোবধনের উক্তি)। তবু মুসলমান সমাজে যে গ্রহণের উদারতা আছে হিন্দু সমাজে তাহাও নাই। হিন্দু সমাজ যদি উদার হইত তবে বাঙ্গলার ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত। এই নাটকেও নাট্যকার হিন্দুমুসলমানের ঐক্য স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

জয়যাত্রা (১৩৬৪)—আদর্শ শিক্ষকের মহত্ত্ব অবলম্বনে এই পঞ্চাঙ্ক নাটক রচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় বিশখানা গান আছে। যাত্রা-ব্যালেও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। নট্টকোম্পানীতে নাটকখানি অভিনীত হয়। অবহেলিত শিক্ষক সমাজ অমৃত বিতরণ করেন, কিন্তু নিজে পান করেন বিষ। এই বিষপানকারী আদর্শ শিক্ষকের স্থান আভিজাত্যের অহঙ্কারে মত্ত রাজা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। রাজশক্তির দম্ভে মানুষ অমানুষ হইয়া উঠে। কিন্তু শিক্ষকের শিক্ষায় পশুত্বের বেদীমূলে হয় মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। রূপমংলের রাজা 'কীর্তিধর' ও পাঠশালার প্রধান শিক্ষক 'সতীনাথ' চরিত্র দুইটির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নাট্যকার এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজা অপেক্ষা শিক্ষক বড়। করুণ ও বীভৎস রসপ্রধান এই নাটকের দ্বন্দ্বাবসানে রাজা ইহাকে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। রাজা স্বদেশে পূজিত, বিদ্বান সর্বত্র বন্দিত—নাটকখানি চাণক্যের এই উক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দ্বিতীয় পানিপথ (১৩৭০)—হিন্দুমুসলমান-ঐক্য ও স্বদেশ-প্রেম অবলম্বনে রচিত এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধের অন্যতম নেতা চুনার-অধিপতি পাঠান সম্রাট আদিলশাহের হিন্দুমন্ত্রী হিমুবাকাল চরিত্রকে নাটকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই বেঁটে-খাটো সাধারণ চেহারার ('puny physique') লোকটি তেজ ও বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। হিমুচরিত্রে নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে জাতিধর্ম এমনকি জীবনের চেয়েও দেশ বড়। আদি ও বীররস নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। রচনার দিক হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক 'হিন্দুবীর (১৩২৬) দ্বারা জিতেন্দ্রনাথ প্রভাবিত হইয়াছেন।

ডাকিনীর চর (১৩৭১)—ইহা নট্টকোম্পানীতে অভিনীত বীর, বীভৎস ও করুণরস প্রধান পঞ্চাঙ্ক নাটক। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীর লইয়া বিজয়নগর ও বিজাপুরের মধ্যে সীমান্তসংঘর্ষের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সীমান্তসংঘর্ষের রূপকআলেখ্য 'ডাকিনীর চর'। নাটকের

রূপক বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, শান্তিকামী ভারতকে দুর্বল ভাবিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান যে বারবার তাহাকে আঘাত হানিয়া চলিয়াছে তাহার প্রতিকার অবশ্য বাঞ্ছনীয়; তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে ভারত শান্তিকামী হইলেও দুর্বল নহে। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব ও বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহের সেনাপতি ইমান আলির কথোপকথনে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় (৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। নাট্যকার ইহার জন্য গেরিলা যুদ্ধেরও প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। হিন্দুস্থান পাকিস্তানের প্রধান যুদ্ধের (১৩৭২ সাল) পূর্বেই নাটকখানি রচিত হয়। মনে হয় নাট্যকারের বাসনা কিঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছে।

'সিপাহীবিদ্রোহ' (১৩৫৭), 'সম্রাট অশোক' (১৩৬৫), 'লালবাঈ' (১৩৬৭), 'কৃষ্ণ-কালিন্দী' (১৩৬৮), 'শঙ্খবাসর' (১৩৬৯) প্রভৃতি কয়েকটি নাটকও নাট্যকার রচনা করিয়াছেন। জিতেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৩৬২) ও 'আনন্দমঠকে' (১৩৬৫) যাত্রানাট্যে রূপান্তরিত করেন।

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩২৯)

হুগলী-গোপালপুর নিবাসী আনন্দময় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শিয়াখালা বেণীমাধব উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল চাকুরী করিবার পরে তিনি নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং যাত্রার দলে যোগ দেন। বর্তমানে আনন্দময় নাট্যকার ও অভিনেতা রূপে যাত্রার দলে কাজ করিতেছেন। তাহার প্রথম নাটক 'পাষাণের মেয়ে' সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়; 'কুমার সম্ভব' হইতে (কালিদাস) ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হয়। আনন্দময় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক যাত্রানাট্য রচনা করিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ (১৯৪৯) ইহা নিউগণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে ব্যালের গানসহ প্রায় আঠার খানা গীতি রহিয়াছে। দিল্লীর সম্রাট ইতিহাস প্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজ চৌহানের (১১৭৮—১১৯২খ্রীঃ) বিরুদ্ধে গজনিপতি মহম্মদঘোরির (১১৭৫—১২০৬ খ্রীঃ) অভিযান ও পৃথ্বীরাজের শ্বশুর কনৌজাধিপতি জয়চাঁদের (১১৭৬—১১৯৩ খ্রীঃ) বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরি পরাজিত হইলেন। ইহার পরে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায়

তাহার সঙ্গে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হয়। অদ্বিতীয় বীর হওয়া সত্ত্বেও জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পৃথ্বীরাজ এই দ্বিতীয় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

নাট্যকার তাহার নাটকে অস্পৃশ্যতা বর্জন ও বিধবা বিবাহ সমস্যা তুলিয়া ধরিয়াছেন। সমাজপতিদের কুসংস্কার, স্বার্থবুদ্ধি ও অবিচারের ফলে এই দুইটি সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতেছে না,—

মীরাবাঈ—স্বার্থে আঘাত লাগবে। তাই চতুর ব্রাহ্মণগণ, রাজশক্তির সাহায্যে ভেদনীতি সৃষ্টি করে নীচ অন্ত্যজের নামে একটা বিরাট জাতিকে পায়ের তলায় ফেলে রাখতে চায়।

মহম্মদ ঘোরি—বিধবা বিবাহ দিলে তাদের ক্ষতি কি ?

মীরাবাঈ—বিধবার বিবাহ হলে সমাজে পাপের ছোঁয়াচ লাগবে। কিন্তু সেই বিধবার সঙ্গে গোপনে পাপাচার করতে সমাজপতিদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না।

মহম্মদঘোরি—কুতুব—

কুতুবুদ্দিন—জাঁহাপনা, আমিই তার জীবন্ত প্রমাণ! অস্পৃশ্য বিধবা চাঁড়াল মেয়ের গর্ভে সমাজপতির ব্যাভিচারে আমার জন্ম। সমাজপতি জাতিচ্যুত হল না, আমার মা হলেন ভ্রষ্টা—আর জন্মদাতা পিতা বর্তমানে—আমিই হলুম জারজ। (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

এইভাবে অন্যায়ের পথে সমাজ যাহাদের মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের সহযোগিতায় মহম্মদ ঘোরি খাইবার গিরিপথে ভারতে প্রবেশ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই নাট্য ঘটনার অন্তরালে নাট্যকারের মূল বক্তব্য হইল, রাজশক্তি ও সমাজপতিরা যদি দেশবাসীকে ঘৃণা করিয়া পিছনে ফেলিয়া না রাখিয়া তাহাদের অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন এবং মানুষের অধিকারে ভূষিত করিতেন তাহা হইলে বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারত পর্যুদস্ত হইত না। বঞ্চিতদের অধিকার দানের প্রলোভন দেখাইয়া বিদেশীরা কার্যোদ্ধার করিয়াছে। মহম্মদ ঘোরি সুলতান মামুদের মত ভারতে লুণ্ঠন করিতে আসেন নাই। এই কৌশলী তুর্কী দূরদর্শিতা লইয়া ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। মহম্মদ "ভারতবাসীকে পীড়ন করে নয়—তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করে—ধর্মের মহিমা দেখিয়ে তাদের মন জয় করতে" চাহিয়াছেন (৩য়

অঙ্ক, ১ম দৃশ্য মহম্মদের সংলাপ)। মহম্মদ ঘোরির সংলাপ রচনায় নাট্যকার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন,—

মহম্মদ—সুদূর তুর্কিস্তান থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে কত জনপথ নদনদী, গিরি-কান্তার অতিক্রম করে অবিরাম গতিতে ঝঞ্ঝার মত ছুটে এসেছি ভারতবর্ষে। দিনের পর দিন দেশের পর দেশ জয় করেছি, কেউ বাধা দেয় নি বাধা পেলুম এই সরস্বতী তীরে। (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

"সেকেন্দার—দূর ম্যাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে......ঝঞ্ঝারমত এসে......অর্ধেক এশিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রু তীরে।" (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল)

শৌর্যবীর্য ও দেশাত্মবোধ লইয়া পৃথ্বীরাজ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। তাহার শেষ পরিণতিতে নাট্যকার ইতিহাসের আনুগত্য বজায় রাখেন নাই। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া [1]পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়াছিলেন। তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। বর্তমান নাটকে পৃথ্বীরাজ প্রকাশ্য পথে একলা চলিতে চলিতে জয়চন্দ্রের শঠতায় ছুরিকাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পতিপ্রেম, বীরত্ব ও দেশাত্মবোধকে প্রাধান্য দিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইহা শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রসপ্রধান নাটক।

শিবাজী (১৯৫০)- ইহা নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত আদি ও বী রসপ্রধান পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে গানের সংখ্যা প্রায় আঠার যাত্রাব্যালেও নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ভারত-সম্রা ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে মারাঠা বীর শিবাজীর অভ্যুত্থানের কাহিনী অবলম্ব নাট্য রচনা করা হইয়াছে। শিবাজীর বীরত্ব, বুদ্ধি কৌশল ও সাংগঠনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়া নাট্যকার এই চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। প্রস্তাবনা অত্যাচারী শাসকের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া পতিত জাতিকে উদ্ধা করিবার জন্য মাতৃভক্ত শিবাজীর প্রতিশ্রুতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পাহা মাওলাদের যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া, ও কৌশলে দিল্লীর কারাগার হই পলায়ন (১৬৬৬ খ্রীঃ) করিয়া আট বছরের প্রচেষ্টার ফলে শিবাজী ১৬ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে এক শক্তিশালী স্বাধীন মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে

1. Prithviraj himself was taken prisoner and killed in cold blood. p. 34 Ancient India, Dr. R. C. Mazumder, Delhi- 1960.

দীন দরিদ্র জাতির সেবকরূপে শিবাজী (১৬৭৪--১৬৮০ খ্রীঃ) রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

আগ্রায় ঔরঙ্গজীবের জন্মোৎসবের দিনে শিবাজীর মোঘল দরবারে উপস্থিত হওয়া একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনাটির ঐতিহাসিকতা বজায় রাখিয়া নাটকে ইহাকে স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমান নাটকে ইহা সম্ভব হয় নাই। ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে শিবাজীর বাক্য বিনিময় না হওয়াই ঐ দরবারের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আনন্দময় এই নাটকে যেভাবে দরবারে উভয়ের মধ্যে বাক্য বিনিময় করাইয়াছেন তাহাতে কূট ঔরঙ্গজীবের এবং কৌশলী শিবাজীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় নাই। প্রসঙ্গত একটি সংলাপ উদ্ধার করা যাইতেছে,--

শিবাজী---এই কি সম্রাটের বন্ধুত্ব স্থাপনের নমুনা।

ঔরঙ্গজীব--সিংহের সঙ্গে শৃগালের বন্ধুত্ব হয় না শিবাজী। (৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)

ঐ দৃশ্যটির সংলাপ অংশে [১]'গৈরিক পাতাকা' নাটকেরও অনুকরণ করা হইয়াছে,---

শিবাজী- বন্ধুগণ! আমি এই মোঘল দরবারে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, এবার মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে আমি এমন সমরানল প্রজ্বলিত করব, যার লেলিহান অগ্নিশিখায় দিল্লীর সৌধশিখর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। (৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য--- দেওয়ানি আম)

"শিবাজী---মুঘলের এই দরবারে দাঁড়িয়েই আমি বলে যাচ্ছি কুমার, মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে যে আগুন আমি জ্বেলে তুলব, তার লেলিহান শিখা দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী অবধি···সর্বস্ব পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেবে।" (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য, আগ্রার দেওয়ান-ই-আম, গৈরিক পতাকা)

'গৈরিক পতাকা' দ্বারা আনন্দময়ের পালাটি কিছুটা প্রভাবিত ও স্থানে স্থানে অনুকৃত হইয়াছে। ঔরঙ্গজীবের সংলাপ রচনায় নাট্যকার [২]'সাজাহান' নাটক দ্বারা মাঝে মাঝে প্রভাবিত হইয়াছেন,—

ক। ঔরঙ্গজেব---ওই রাজপুত জাতিটাকে আমি আজও চিনতে পারলাম না। (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

১। গৈরিক পতাকা, শচীন সেনগুপ্ত ১৯৩০ ২। সাজাহান, দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯০৯

"ঔরঙ্গজীব—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশী গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক চিনলাম না।" (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, সাজাহান)

খ। ঔরঙ্গজেব—ওকি বৃদ্ধ পিতার দীর্ঘশ্বাস! দারার ছিন্ন শির! সুজার শত ছিন্ন মলিন বসন! মোরাদের রক্তাক্ত কবন্ধ……(৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

"ঔরঙ্গজীব—ওকি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির—সুজার রক্তাক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ!" ··(৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য, সাজাহান)

শুম্ভ-নিশুম্ভ (১৯৫৬)—মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত (৫ম—১৩শ অধ্যায়) শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। ইহাতে প্রায় পনেরখানা গান আছে; যাত্রাব্যালেও ইহাতে রহিয়াছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্ধার করিবার জন্য মহামায়ার আবির্ভাব নাটকের মূল ঘটনা। দৈত্যসম্রাট শুম্ভের অন্তরে ছিল মুক্তি পিপাসা। তিনি শত্রুরূপে মহামায়ার আরাধনা করিয়া সেই পিপাসা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন। সেইজন্যই তিনি দেবরাজ্যে অত্যাচারের প্লাবন বহাইয়া দিয়াছেন। দেবদৈত্য একই পিতার সন্তান। কিন্তু "একজন স্বর্গসুখ করে উপভোগ" আর একজন "চির উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রবে দেবতার পায়ের তলায়"—(১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য) ইন্দ্রের নিকট দৈত্যরাজ শুম্ভকণ্ঠে এই অসাম্য ও অন্যায়ের যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে--পূর্বালোচিত বিনয়কৃষ্ণের 'সংগ্রাম' নাটকের দানবসম্রাট চণ্ডাসুরের সংলাপেও দেবরাজের নিকট তদনুরূপ প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মহামায়ার সংলাপের - 'রে অসুর! ধর্ম চায় পরাজয় কিন্তু সত্য চায় জয়'—এই অংশ ক্ষীরোদ প্রসাদের 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) নাটকেব কর্ণের সংলাপ হইতে আহৃত হইয়াছে,—

"কর্ণ - ……এক হস্ত
বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শরে--
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে!
মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা! বাসুদেব!
মর্ম ভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি,
শুনাতে আসিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা।" (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য, নরনারায়ণ)

শুম্ভ-নিশুম্ভ বীর ও ভক্তিরস প্রধান নাটক।

যুগের দাবী (১৯৬৩)—এই পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক জনতা অপেরায় অভিনীত হয়। ব্যালের গানসহ ইহাতে এগারখানি গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। পণপ্রথা অবলম্বনে নাটকটি রচিত হইয়াছে। পাত্রপক্ষের পণপ্রথার জুলুমে বহু নরনারীর জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং সমাজ সংস্কারের দিক হইতে এই যুগের প্রথম দাবী হইতেছে পণপ্রথার বিলুপ্তি। এই দাবী অনুযায়ী নাটকের নামকরণ হইয়াছে 'যুগের দাবী'। নাট্য সমাপ্তিতে বিষয়-লোভী জমিদার কর্তৃক বিতাড়িত জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র 'অখিলের' মুখেও এই দাবীই ঘোষিত হইয়াছে। এই পণপ্রথা উচ্ছেদকল্পে নাট্যকার নারীশিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা করিয়াছেন শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীরা স্বাবলম্বী হইতে পারিলে নিজেরাই হিন্দু সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধিরূপ পণপ্রথার বিরোধিতা করিতে পারিবে।

জমিদার মৃগেন্দ্র রায় অত্যাচারী ও অর্থ গৃধ্নু। মতের বিরোধিতা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। সংসারের বহু অনর্থের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে এই ঘৃণ্য অর্থ লোলুপতা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। জমিদার পুত্র 'বাসুদেব' পণ-প্রথার বিরোধী। ইহার উচ্ছেদের জন্য তিনি সচেষ্ট। 'অখিল' অন্নাভাব ও শিক্ষাভাবে কাশীর গুণ্ডাসর্দার হইয়াছে। বহু পাপ কার্য সাধিত করিলেও নারীর মর্যাদা রক্ষায় সে কখনও কার্পণ্য করে নাই। জন্মভূমি ও পিতৃপরিচয়ের প্রতিও তাহার প্রবল আকর্ষণ। ইহাই তাহাকে স্বগ্রামে ফিরাইয়া আনিয়াছে এবং বিষয়লোভী নৃপেন্দ্রের ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্র হত্যার প্রচেষ্টার কথা প্রকাশ করিয়া বংশ পরিচয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছে। অর্থের প্রভাবে ভণ্ড, প্রতারক ও লম্পটরা কিভাবে সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়া সমাজপতি হইয়া বসেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 'রজনী গোঁসাইয়ের' চরিত্রে। কৃষ্ণপুরের গরীব 'অনাথ পণ্ডিতের' কন্যা 'ভারতী' চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে শিক্ষালাভ করিলে মহিলারা আত্মমর্যাদা বজায় রাখিয়া নিজের জীবন চালাইতে সক্ষম হইতে পারেন। নাট্যরচনায় আদি, রৌদ্র ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

'মরেও যারা মরে না' (১৯৬৯) নাটকখানি সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৪) পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। ইহা নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। 'খেলাঘর', 'সত্যের জয়', 'পরিচয়' ও 'ফাঁসির মঞ্চে' (১৯৭০) প্রভৃতি আরো কয়েকটি নাটক নাট্যকার রচনা করিয়াছেন।

পূর্ণচন্দ্র দাস (১৩১০—১৩৭০)

তিনি কলিকাতা নিবাসী ছিলেন। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে পূর্ণচন্দ্র নাট্যরচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কয়েকটি পৌরাণিক, ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেন। তাহার নাটকে সমসাময়িক সমাজচেতনা ক্রিয়াশীল। ১৩৭০ সালে নাট্যকার পরলোক গমন করেন।

মাটির মায়া (১৩৫৬)—ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ব্যালে-সহ ইহাতে প্রায় ষোল খানা গান রহিয়াছে। রাণা রায়মল্লের পুত্র পৃথ্বীরাজ সঙ্গ ও জয়মলের সঙ্গে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া এবং রাজদ্রোহী পিতৃব্য সুরজমলকে পরাস্ত করিয়া বীরত্বের সাহায্যে চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেন। পাঠান কবল হইতে বন্দী স্ত্রী তারাবাঈকে উদ্ধার করিবার পরে ভগ্নীপতির দ্বারা বিষপ্রয়োগের ফলে তিনি প্রাণ হারাইলেন। এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। নাটকের মূল বক্তব্য, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, কাজেই রাজ্যাধিকার করিতে হইলে দৈব অপেক্ষা পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়। ইহাতে বীর, করুণ ও শৃঙ্গার রস প্রাধান্য পাইয়াছে।

সতীর সাধনা (১৩৫৭)—কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্বের সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী লইয়া এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক রচিত হয়। নাটকখানি 'ক্যালকাটা অপেরায়' অভিনীত হয়। এই নাটকে ব্যালে সংযোজিত হইয়াছে; ইহাতে প্রায় পনেরখানা গান আছে। শাল্বরাজ দ্যুমাৎসেন রাজ্যহারা হইবার পর রাজশক্তি দ্বারা নির্যাতিত শবর জাতির উত্থানের মধ্য দিয়া নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে, সমাজে উচ্চ নীচ সকলকেই মানুষের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

এই মর্যাদার জন্যই শবর সর্দার মঙ্গল সংঘবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ করিতে চাহিয়াছে।

শৃঙ্খল মোচন (১৩৫৭)—ইহা পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। জমিদারী প্রথার পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। ইহাতে সমসাময়িক কালের প্রচলিত কতগুলি মতবাদ, দুর্নীতি, চোরাকারবারী ও শ্রমিক মজদুর সমস্যার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার সমাধানকল্পে বিদ্রোহের কথাও বলা হইয়াছে। গঙ্গাচরণ পালের 'শিবদুর্গা অপেরায়' ইহা অভিনীত হয়। ইহার গানের সংখ্যা বার। নাটকে জমিদারী প্রথার কুফল দেখাইয়া ইহার বিলোপ

সাধনের মত ব্যক্ত হইয়াছে। হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ও নাটকে প্রকাশিত। শক্তিনাথ চরিত্র গানে গানে কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে।

স্বপ্ন সাধনা (১৩৫৮)—এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি 'রঞ্জন অপেরায়' অভিনীত হয়। নাটকখানিতে পনেরখানার অধিক গান রহিয়াছে। ১৯৪৩ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দেশের মুক্তিকামী আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত হইয়াছে। ইহাতে দেশপ্রেম প্রাধান্য পাইয়াছে।

ধ্বংসের দেবতা (১৩৫৯)—এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 'শিবদুর্গা অপেরায়' অভিনীত হয়। ইহাতে প্রায় বিশখানা গান রহিয়াছে। 'দক্ষযজ্ঞের' কাহিনী নাটকে স্থান পাইয়াছে। দক্ষচরিত্রে কন্যা-বিবাহের পাত্র সম্পর্কে পিতৃহৃদয়ের চিত্রটি নাট্যকার তুলিয়া ধরিয়াছেন,—

দক্ষ—পিতা হয়ে কোন প্রাণে
জেনে শুনে কুলগোত্রহীন
উলঙ্গ ভাণ্ডর করে সমর্পিব
এ হেন স্বর্ণ প্রতিমা মোর। (২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

রাজা দক্ষ সুশাসক ছিলেন। ইহার ফলে প্রজাগণ রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিতেন, তিনি কখনো কর্মচারীদের অপকর্মের জন্য দুর্নামের বোঝা মাথা পাতিয়া লইবার রীতিকে সমর্থন করিতেন না। নাটকখানি ভক্তি, রৌদ্র ও করুণরস প্রধান। ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে।

নরদানব (১৯৫৩)—রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 'বাণী নাট্যবীথি' কর্তৃক অভিনীত হয়। অযোধ্যাপতি মান্ধাতা ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যরক্ষাদ্বারা দেশকে রাজা লবণের দানবীয় প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া মানবশক্তির জয় ঘোষণা করেন। ইহাই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। সাগরপারের লোক যে এই দেশে আসিয়া এক শক্তিকে আর এক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা আধুনিক কালের একটি সমস্যা। নাটকের কাহিনীর অন্তরালে এই সমস্যাটি প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশীরা ওপার হইতে এখানে আসিয়া দেশের দুই শক্তির মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া অস্ত্র সাহায্যের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা শোষণ করিতে চাহে,—

লবণ—অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত কিছু দিয়ে সাহায্য করবো, বিনিময়ে আমরা চাই স্বর্ণমুদ্রা। (৪র্থ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপ্রথা যে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেছে তাহাও নাটকে প্রকাশিত হইয়াছে। নাটকে ছদ্মবেশী দৈব গানে গানে বিবেকের বাণী শুনাইয়াছেন। এই নাটকে প্রায় বিশখানি গান আছে; ইহাতে যাত্রা-ব্যালেও রহিয়াছে।

চিতোর গৌরব—ইহা পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। 'নবভারতী অপেরায়' ইহা অভিনীত হয়। ব্যালে-গীতি সহ নাটকে প্রায় পনের খানা গান রহিয়াছে। দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কি ভাবে চিতোরের রাণা রায়মলের পুত্র রাণা সংঘের (১৫০৯—১৫২৭ খ্রীঃ) হাত হইতে রাজপুত রাজ্য মোঘলের করে সমর্পিত হয় তাহাই নাটকের বিষয়বস্তুতে বিবৃত করা হইয়াছে। এই নাটকে দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—

হুমায়ুন—নাক কান কেটে প্রকাশ্য রাজপথের উপর দিয়ে পাদুকা প্রহার করতে করতে সারা নগর ভ্রমণ করাবি। এই দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের পরিণাম দেখে—এরই মত পশুগুলো যদি মানুষ হতে চেষ্টা করে। (৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)

নাট্যকার সম্রাট অশোকের হিংসার পথ ছাড়িয়া অহিংসাধর্ম গ্রহণের কাহিনী লইয়া 'অহিংসা', কালকেতুর কাহিনী লইয়া 'মা', কার্তিকের জন্ম ও স্বর্গ অবরোধকারী তারকাসুর বধের ঘটনা লইয়া 'নবশক্তি' এবং 'অভিমন্যু বধ' নামে আরো কয়েকটি নাটক রচনা করেন।

গৌরচন্দ্র ভড় (১৩২৪—)

হুগলী জেলার ধনিয়াখালি—সোমশপুরের অধিবাসী গৌরচন্দ্র ১৩২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি তাঁতের কাজে মনোনিবেশ করেন। লোকনাট্য রচনা তাহার অবসর সময়ের কাজ। ভক্তিভাব, ধর্মবোধ, দেশপ্রীতি প্রভৃতি অবলম্বনে তিনি কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে অধিকাংশই ঐতিহাসিক। এই সকল নাটকে ঐতিহাসিকতা অপেক্ষা কল্পনাকে অধিক মাত্রায় স্থান দেওয়া হইয়াছে।

কয়েদী (১৩৬২) —ইহা 'ক্যালকাটা অপেরায়' অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ব্যালের' গানসহ নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় উনিশ। অত্যাচারী হুণ সম্রাট মিহিরকুলের সংঙ্গে মালবরাজপুত্র যশোধর্মণের সংগ্রাম কাহিনী (৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। হুণরাজের রথচক্রের নিস্পেষণ এবং শ্যামকিশোরের জাগরণী সংগীত দেশে যে নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারই উপর দণ্ডায়মান হইয়া জনশক্তির সহায়তায় কালোসওয়ার দেশের শৃঙ্খল মোচন করিতে সক্ষম হইলেন। এই কালসওয়ারই ছদ্মবেশী মালবরাজপুত্র 'যশোধর্মণ'। দেশাত্মবোধক নাট্যকাহিনীতে স্বার্থান্ধ বেইমান দেশদ্রোহীদেরও শোচনীয় পরিণতি দেখান হইয়াছে। এই নাটকে বীর, বীভৎস, করুণ ও রৌদ্র রস প্রাধান্য পাইয়াছে।

গরীবের মেয়ে (১৩৬৮)- ইহা পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। নাটকখানি 'অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে' অভিনীত হয়। এই নাটকে যাত্রা-ব্যালে সহ প্রায় তেরখানি গান আছে। ইহা ঘটনা প্রধান নাটক। চন্দ্রপুরের রাজমন্ত্রী নীলকণ্ঠের শঠতা বিশ্বাসঘাতকতা ও নানাপ্রকার নীচতাব আশ্রয়ে সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা এবং দরিদ্র 'সদাশিবের' কন্যা 'সীতার' নানাপ্রকার অবিচার অত্যাচার সহ্য করিয়াও সতীধর্ম রক্ষার প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দিয়া নাট্য ঘটনা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কাহিনীতে গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য বাঙ্গালার বিলাসপ্রিয় নবাব সুজাউদ্দিনের রাজত্বের (১৭২৭ -১৭৩৯ খ্রীঃ) পটভূমিকায় নাট্য ঘটনাকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। ইহার প্রধান ঘটনাই কাল্পনিক। নাটকের প্রধান লক্ষ্য অধর্মের পরাজয় ও অন্যায়ের শাস্তি বিধান। ইহাতে আদি, বীব, বীভৎস ও করুণরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

মানুষের ঠাকুর (১৩৬৯) ইহা 'গোবর্দ্ধন অপেরায়' অভিনীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। ব্যালের গানসহ ইহাতে চৌদ্দখানি গীতি রহিয়াছে। নাট্যারম্ভের পূর্বে ইহাতে 'সূচনা অংশ' সংযোজিত হইয়াছে। ধর্মের সহায়তায় পাপকে পরাস্ত করিয়া মানুষের জয়গান করাই যে নাটকের উদ্দেশ্য তাহা এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। কোশল সম্রাট চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় পত্নী মোহিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া দুঃখ সাগরে পতিত হইলেন। শেষ পর্যন্ত সত্য, ধর্ম ও বিবেকেব দ্বারা চৈতন্য জাগ্রত হওয়ায় পাপকে পরাস্ত করিয়া তিনি আনন্দময় জীবনে পুনঃপ্রবেশ করিতে

সমর্থ হইলেন। এই নাট্য কাহিনীর মধ্য দিয়া নাট্যকার দেখাইয়াছেন, যুগধর্ম অনুসারে মিথ্যা, দুর্নীতি ও পাপের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আসে, কিন্তু ইহাতে শান্তি নাই। ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলিয়া মোহমুক্ত হইতে পারিলে শেষপর্যন্ত জীবনে শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। নাটকে শৃঙ্গার করুণ ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব হইতে কাহিনীর মূল সূত্র সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার বহু চরিত্র রূপক করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। রাজপুত্র 'ভক্তি' রূপে, মহিষী 'সাধনা', সেনাপতি 'পবিত্র', বন্ধু 'শ্রীজ্ঞান', কোশলবাসী ব্রাহ্মণ 'মোহময়' এবং তাহার স্ত্রী 'ছলনা'রূপে কল্পিত হইয়াছে। নাট্যচরিত্র পরিকল্পনায় গোরচন্দ্র ফণিভূষণের 'মেদিনী' (১৯৩৪) নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। মোহিনীর মায়ায় চিত্রাঙ্গদ সাধনা (স্ত্রী) ও ভক্তি (পুত্র) হীন হইয়া দুঃখভোগ করেন। সত্যধর্ম বন্ধু প্রভাবে মনুষ্যত্ববোধ জাগরিত হওয়ায় আবার তিনি সাধনা ও ভক্তি যুক্ত হইলেন (স্ত্রী পুত্র লাভ করেন) এবং মোহিনীর মায়া মুক্ত হইয়া সুখের মুখ দেখিতে পাইলেন। সুতরাং ধর্মই মানুষের প্রধান আশ্রয় ও প্রকৃত বন্ধু। শ্রীজ্ঞান নাটকে সত্য, ধর্ম ও বিবেকের বাণী শুনাইয়াছেন। এই বিষয়ে সংগীত তাহার প্রধান অবলম্বন।

'তাসের ঘর' (১৩৬৭), 'অগ্নিসংস্কার' (১৩৬৯), 'সোনারগা' (১৩৭১) এবং 'রাজতিলক' (১৩৭১) নামে গোরচন্দ্র আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। 'সাহেব বিবি গোলাম' নামে তিনি একখানি কাল্পনিক নাটকও রচনা করিয়াছেন।

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় (১৯২৫- ১৯৬৬)

তিনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগণা জিলার রাজারহাট—কাশীপুর। একসময় নাট্যকার চিত্র ও মঞ্চসাংবাদিকতা করিয়াছেন এবং 'রঙ্গালয় পত্রিকা'র সম্পাদনা কর্মেও তিনি কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। ১৩৬১ সালে তিনি প্রথম 'রঘুডাকাত' নামে একটি যাত্রানাট্য রচনা করেন। ইহার পরে বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে তিনি কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছেন। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত এবং মগকর্তৃক মণিপুর আক্রমণের কাহিনী লইয়া রচিত 'দস্যুকন্যা' (১৯৫৪) নাটকে তিনি একটি মগ নারী-বোম্বেটে চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই নাটকে মগ মাংবার, চীনা ওয়াংহো, উড়িয়া গুণধর,

মাড়োয়ারী ধরমদাস শেঠ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর চরিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'প্রিজনার্স অফ জেন্দা'র ছায়া অবলম্বনে সিংহগড়' (১৯৫৭)' 'বিক্রমোর্বশী'র কাহিনী প্রভাবিত 'নটীর প্রেম' (১৯৫৮), এবং ওড়িয়া গ্রন্থ 'কাঞ্চি-কাবেরী' অবলম্বনে 'মানুষের ভগবান' (১৯৫৯) রচনা করিয়া তিনি যাত্রাজগতে পরিচিতি লাভ করেন। এই নাটক তিনটি যথাক্রমে 'আর্য অপেরা', 'ভারতীয় রূপনাট্যম্'-ও 'নটবাণী অপেরায়' অভিনীত হয়। ঐতিহাসিক নাটকে তিনি হিন্দুমুসলমান-ঐক্যের কথাও শুনাইয়াছেন। এই শ্রেণীর নাটকে কিংবদন্তী ও কল্পনার উপর তিনি অধিক নির্ভর করিয়াছেন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জীবনাবসান হয়।

রঘুডাকাত (১৩৬১) ইহা 'রয়েল বীণাপাণি অপেরায়' অভিনীত পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহাতে প্রায় বিশখানি সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে। এই নাটকে ব্যালের জায়গায় একক নৃত্য সন্নিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যালের যাহা উদ্দেশ্য এই একক নৃত্যেরও উদ্দেশ্য তাহাই।

নাটকের প্রস্তাবনায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার কথা বলা হইয়াছে। নাট্য ঘটনার মূল বক্তব্য ও ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। একদা শাসনের নামে শোষণ ও পীড়ন পল্লী অঞ্চলে যে হাহাকার তুলিয়াছিল নাটকে তাহারই বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করিবার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের নায়ক শ্রীদাম চাষীর ছেলে 'রঘু' জায়গীদারের অত্যাচারের অবসানকল্পে এবং শোষিত পল্লীবাসীর ভরণ-পোষণের জন্য অত্যাচারী ধনীর অর্থ লুণ্ঠন করে। অন্যায়ের উচ্ছেদ ব্রত কেবল একা রঘুই গ্রহণ করে নাই, তাহার সঙ্গে পল্লীর অনেকেই হাত মিলাইয়াছে। তাহারা এক দল নবীন কর্মী, গোপন আড্ডায় মিলিত হইয়া তাহারা কর্মসূচী নির্ধারণ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের কুফল দূরীভূত করিবার জন্য এই কর্মী সম্প্রদায় গণতান্ত্রিক শসন নীতি প্রবর্তন করিতে চাহে,

কালাচাঁদ— শুধু আমি নই, আমাদের নবীন কর্মীরা সকলেই ডাকাত রঘু। শাসক-পীড়নে আজ দেশের লোক অতিষ্ঠ, তাই বাংলার ঘরে ঘরে তৈরী হয়েছে শোষক দমনকারী ডাকাত রঘু। এমনি করেই ডাকাত রঘু ধনতান্ত্রিক শোষণ-নীতির উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক নীতির প্রবর্তন করবে দেশের বুকে।

(২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

রঘুডাকাত সম্প্রদায়ের কার্যাবলী সাময়িক উত্তেজনা এবং কিছুলোকের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র; এই পথে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার কোন নজীর মিলিবে না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কঠিন সাধনার পথ ইহা নয়। নাট্য-পরিণতিতে কিন্তু শাসননীতি পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় না। রঘু জায়গীরদার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ধণতান্ত্রিক শাসকের অধীনেই কোতোয়ালের দায়িত্বভার লইল। কালাচাঁদের বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল। নাট্যকারের ডাকাতদল সৃষ্টির পশ্চাতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের ডাকাত সম্প্রদায়েব প্রভাব ক্রিয়াশীল। লোকনাট্যের রীতি অনুযায়ী খাবাপ চরিত্রের পরিবর্তন ও অন্যায়কারীর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা নাটকে করা হইয়াছে। হিন্দুমুসলমানের ঐক্যের কথাও নাটকে ঘোষিত হইয়াছে। রঘুর মত জনদরদী ডাকাতচরিত্র পূর্বেও লোকনাট্যে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রসঙ্গত সাবিত্রী মুখোপাধ্যায় রচিত 'উদয় ডাকাত' (১৯৫২) নাটকের উদয় চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রঘু ডাকাত নাটকে আদি, বীর ও বীভৎস রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

মসনদ (১৩৭০) এই নাটক 'নিউ গণেশ অপেরায়' অভিনীত হয়। ব্যালেগীতিসহ এই পঞ্চাঙ্ক নাটকে বারখানব অধিক গান রহিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক নাটক হইলেও নাট্যকার ইহাতে কল্পনার ফুলঝুরি ছুটাইয়াছেন। ইসলামপুরের বেগমসাহেবা রূপাবাঈ স্নেহ, আদর্শ ও পক্ষপাতশূন্যতায় মহীয়সী নারীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন; ন্যায়নিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য রূপাবাঈ পুত্র লতিফ খাঁকে স্বহস্তে মৃত্যুদান করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ঐতিহাসিক নায়িকারূপে চিহ্নিত যাত্রাপালায় মুসলমান শাসকের ন্যায়বিচারের পরিচয় দিবার জন্য প্রথম এই জাতীয় অনৈতিহাসিক কল্পনার অশ্রয়গ্রহণ করেন লোকনাট্যকার ব্রজেন্দ্রকুমার। তাহার 'বাঙ্গালী' নাটকে নবাব দাউদখাঁ ন্যায়নীতির মর্যাদা দিবার জন্য পুত্রহত্যা করিয়াছেন। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুমুসলমান-মৈত্রী স্থাপন। ইহার জন্য হিন্দুনারী রূপাবাঈ মুসলমানের গৃহিণী হইয়াছেন, কারণ মুসলমানকে ভালবাসিয়া তিনি হিন্দুমুসলমানকে একটা মহামিলনের আদর্শে গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের চিরকালের ভেদাভেদ দূর করিয়া দিতে চাহেন। ইসলাম পুরের নবাব ফিরোজখাঁ সুশাসক। তাহার কাছে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা বড় নহে। হিন্দু ও মুসলমানকে তিনি সমদৃষ্টিতে

দেখেন ; উভয় দলই তাহার কাছে মানুষ। বিচারের সময় নবাবের নিকট আত্মীয় অনাত্মীয় সবাই সমান। এই নাটকখানি শৃঙ্গার, বাৎসল্য, বীর ও করুণরস প্রধান।

মগের দেশ (১৩৭১)---ইহা 'নাট্যভারতী অপেরায়' অভিনীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইহাতে প্রায় চৌদ্দখানি গান আছে। কয়েকটি যাত্রা-ব্যালেও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দরবেশ চরিত্র গানে গানে বিবেকের বাণী শুনাইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল, -

মীরজুমলা আমার পথের কাঁটা নির্মূল করতে সুজাকে মরতে হবে। কেননা বাংলাকে আমার চাই-ই চাই। আমার মনের এই সংকল্পের পথ থেকে কেউ আমাকে এক চুল নাড়াতে পারবে না কেউনা। আমি এই গোপন সঙ্কল্পের পথে চির-মুশাফির।

(গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ)

দরবেশ মুশাফির, হায় মুসাফির, হওরে হুঁসিয়ার।
জাহান্নমের আঁধার পথে আগিও নাকো আর ॥

বক্তিয়ার---এই মরেছে। এ ব্যাটা মামদো আবার কোথা থেকে ধেই ধেই করতে করতে এসে জুটলো। আরে এই, কী চাস তুই ?

মীরজুমলা কী কথা ?

দরবেশ (পূর্বগীতাংশ)

তুমি ভাই হয়ে আর ভাইয়ের বুকে চালিওনাকো ছুরি
স্বার্থলোভে কর নাকো হত্যা জুয়াচুরি,
মানুষ তুমি, নওকো দানব, নওকো জানোয়ার ॥

মীরজুমলা বক্তিয়ার। ওকে তাড়াও বক্তিয়ার তাড়াও! ও কে তা আমি জানি না। জানি না কি যাদু আছে ওর সঙ্গে। ও আমাকে দুর্বল করে ফেলবে বক্তিয়ার. আমাকে ভুলিয়ে দেবে আমার এতদিনের সংকল্প।

ব্যক্তিয়ার শুনছিস, হুজুর আমার কি বলছেন ? খবরদার বলছি, আমার এমন মেহেরবান হুজুরকে অমন এক সৎকর্ম করতে বাধা দিসনে। যা, বেরো! এঃ, আবদার! ওর একটা মুখের কথায় হুজুর কিনা এত দিনের এত আশার অমন বড়িয়া ইনাম ছেড়ে দেবেন ?

দরবেশ—(পূর্বগীতাংশ) নাইবা পেলে তখৎ-এ-তাউস ইনাম শিরোপা,
খোদার দোয়ায় হতে পার হাজী মুস্তাফা
নয়কো ছোরায়, ভালবাসায় বাদশা দুনিয়ার।
(প্রস্থান)
[১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য, আরাকানের গুপ্ত আবাস]

সিংহাসনের পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য ঔরঙ্গজীব (সপ্তদশ শতাব্দী) কর্তৃক আরাকানে পলায়িত ভ্রাতা সুজাকে বন্দি করিবার প্রচেষ্টা অবলম্বনে নাট্য কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। আদি, বীর ও করুণ রসপ্রধান এই নাট্য রচনায় মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করিবার দিকে নাট্যকার লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

নাট্যকার 'সন্তুতুলসীদাস' (১৯৫৪), 'মহাকাল' (১৯৫৬) প্রভৃতি আরও অনেকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন।

কানাইলাল নাথ (১৯২৮—)

২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বনগ্রাম পূর্বপাড়ার অধিবাসী কানাইলাল ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দশম শ্রেণীর ছাত্ররূপে বিদ্যালয় পরিত্যাগ-পূর্বক তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে 'ভুতুড়ে কাণ্ড' নামে স্ত্রীভূমিকা বর্জিত একটি কৌতুক নাটিকা তিনি রচনা করেন। তাহার প্রথম যাত্রা নাটক 'আত্মদান' ১৯৪৬ সালে রচিত হয়। ইহা 'বনগ্রামবান্ধব নাট্য সমাজ' কর্তৃক অভিনীত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর হইতে তিনি যথারীতি যাত্রা নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক যাত্রানাট্য রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় কানাইলাল ইতিহাসের ছায়া অবলম্বন করিয়া খুশিমত কল্পনার খেলা দেখাইয়াছেন। একজনের সংলাপের শেষ অংশ পরবর্তী বক্তাকে দিয়া বলাইবার রীতি কানাইলালের বিভিন্ন নাটকে এত অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে যে তাহার নাটকে ইহা এক প্রকার একঘেয়েমিতে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানের আরো কোন কোন যাত্রানাট্যকারের নাটকে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবরের কান্না (১৯৫৮)—এই ঐতিহাসিক নাটকটি তিন ভাগে বিভক্ত 'প্রস্তুতি', 'বিস্তৃতি' ও 'পরিণতি'। প্রতিটি বিভাগে আবার কয়েকটি

উপবিভাগ রহিয়াছে। ১৩৫৪ সালে রচিত জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'মানুষ' নাটকেও অংক বিভাগের স্থলে এই ধরণের বিভাগ ('সূচনা', 'প্রারম্ভ', 'পরিণতি) ও উপবিভাগ ছিল। নাট্যকার তাহাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন; এই নাটকটি আয অপেরায় অভিনীত হয়। ব্যান্ডের গানসহ নাটকে প্রায় পনেরটি গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রস্তুতি অংশের এক-উপবিভাগটি নাটকের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। নাটকে যে একটি গল্প শুনান হইবে কেবল এই কথাটি বলিবার জন্য নাট্যারম্ভের প্রথমে ইহা সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছায়াচিত্র-রীতির প্রভাবের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়। লেখকের ভূমিকা হইতে বুঝা যায় যে তিনি ইতিহাসের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে কল্পনার প্রাবল্য আছে। এই অতিরিক্ত কল্পনার জন্য ঘটনার ঐতিহাসিকতা ঠিক বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের (সপ্তদশ শতাব্দী) রূপোন্মাদনা এবং মেহেরউন্নিসার ভারত সিংহাসনের আকর্ষণ এই নাট্য ঘটনার মূলে রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতাহীন মনোভাব, প্রজাদরদ, বীরত্ব, স্ত্রীর প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি এবং উদারতা লইয়া শের আফগান চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। বিদেশী আনারকলির ছায়া-চরিত্র পরিকল্পনায় ফণিভূষণের 'রামানুজ' নাটকের ছায়া সীতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আদি, বীর ও করুণরসকে নাটকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

মাটির প্রদীপ (১৯৫৯)—ইহা আর্য অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক। বীর, করুণ ও বাৎসল্য রসপ্রধান এই নাটকে ব্যান্ডে সহ প্রায় এগারখানি গান আছে। রাজপরিবারে পরিচিত সন্ন্যাসী সাধুজী গানে গানে বিবেক ও ধর্মানুসারে কর্তব্যের নির্দেশ দিয়া চলিয়াছেন। শিশুহত্যায় উদ্যত রঘুয়া ও মনসুককে লক্ষ্য করিয়া গাওয়া একটি গীতি হইতে ইহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

সাধুজী—নানা, ভুল বুঝোনা, ভুল বুঝোনা, ভুল বুঝোনা ভাই!

রঘুয়া—ভুল!

সাধুজী—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ভুল। (গীত)

ভুল করে আর ভুলের বোঝা এ জীবনে বাড়াবি কত,
কেউ নেবেনা অংশ যে তার দিনে দিনে বাড়বে যত।

মন—আরে, আগে বাড়্, আপনা কাম দেখ্!

সাধুজী (পূর্বগীতাংশ) যাওয়ার পথে যদি যেতে চাও
দুর্জনে আঘাত হান, দুর্বলে বাঁচাও,
মনের আঁখি দেখনা খুলে ও যে সদ্য ফোটা ফুলের মত ॥

(ভাবাবেশে বধূয়া নিজের অজ্ঞাতে কোলের শিশু সাধুজীর কোলে দিয়াছিল, গীত অন্তে শিশুকে লইয়া সাধুজী প্রস্থান করিলেন।

(১ম অংক, ২য় দৃশ্য)

অঞ্জনগড়ের রাজা জয়নারায়ণের শৈশবে পরিত্যক্ত কুরূপ পুত্র প্রদীপ চরিত্রের সাহায্যে নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে আভিজাত্যের অহঙ্কার ও রূপের চেয়ে মনুষ্যত্বের স্থান উঁচুতে। মৃত্যুর পূর্বে কুরূপ প্রদীপের প্রতি উক্ত উদয়নারায়ণের সংলাপে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে,

উদয় মিথ্যা রূপ আর আভিজাত্য নিয়ে যাদের অহংকার হয়ত তারাই তোমাকে আঘাত করবে। কিন্তু যারা প্রকৃত মানুষ, তারা তোমাকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করবে।

(৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

কে কাঁদে (১৯৬০) ইহা সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত পাঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক। ইহাতে বারখানা গান রহিয়াছে। নাটকটি ঘটনাপ্রধান। নাট্যকারের মূল বক্তব্য শিবসাগরের রাজা শিবনারায়ণের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে,

শিবনারায়ণ জন্মের দাবীতে মানুষের ছোটবড় হিসাব করতে যেওনা। যদি পার কর্মের অধিকারে কর। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

এই নাটকটি আদি, করুণ ও বাৎসল্য রসপ্রধান।

নাট্যকার সিন্ধুর রাণা দাহির-এর বিরুদ্ধে আরবের বাদশাহ হিজাজ আলির অভিযান অবলম্বনে হিন্দুমুসলমান-প্রীতি ও দেশপ্রেম মূলক একখানি নাটক রচনা করেন। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের নাম 'আহ্বান' (১৯৬০)। ইহা নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত হয়। ইহা ছাড়া 'রক্তে রাঙা মাটি' (১৯৫৯), 'আমি কে' (১৯৬১), 'সৈনিক খবর হাঁশিয়ার' (১৯৬২), 'মা ও ছেলে' (১৯৬৩) 'চণ্ডীতলার মন্দির' (১৯৬৮), 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৬৯), সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত 'শহর থেকে দূরে' (১৯৭০), 'সংগ্রাম' (১৯৭০) প্রভৃতি আরো কয়েকখানি নাটক কানাইলাল রচনা করিয়াছেন। 'সংগ্রাম' নাটকখানি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতিসংস্থার আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অম্বিকা নাট্য কোম্পানী দ্বারা ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ নাথ (১৩২৩—)

২৪ পরগণা জেলার বসির হাটে ১৩২৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে অল্প বয়স হইতে তিনি সংগীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে তিনি নাট্যকার ও অভিনেতা রূপে যাত্রা দলে কাজ করিতেছেন। নাট্যরচনায় ব্রতী হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কয়েকখানি ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক নাটক রচনা করিয়াছেন। দেশাত্মবোধ, হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য এবং শিল্পীর দাবীকে বিভিন্ন নাটকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যাত্রা হল সুরু (১৩৬৭) এই পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়। ব্যালে সহ ইহাতে দশখানি গীতি সংযোজিত হইয়াছে। কেবল যান্ত্রিকতার প্রসার ঘটাইয়া দেশকে উন্নত করা সম্ভব নহে। দেশকে উন্নত করিতে হইলে কলকারখানার সঙ্গে সাহিত্য ললিতকলাকেও উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে, সাহিত্য ললিতকলার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে স্রষ্টা শিল্পীকে বাঁচিবার যথোচিত অধিকার দিয়া তাহার জীবনকে দৈন্য দুর্দশামুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই নাটকের মূল কথা। সব্যসাচীর কণ্ঠে নাট্যকার এই কথাটিই ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন,—

সব্যসাচী—চিরবঞ্চিত শিল্পীদের তুমি বাঁচাও, আমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও আজ বলে উঠুক—হে যুগপ্রবর্তক! আমরা সুন্দরের পূজারী, ফুলের মত পবিত্র জীবন নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে দাও,—দুঃখের কণ্টকিত পথে আমাদের যাত্রা হোক শেষ। (৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

বাস্তব অবাস্তবের মিশ্রণে রচিত কাহিনীর মধ্য দিয়া নাট্যকার দারিদ্র্য দগ্ধ শিল্পীর জীবনকে দুঃখোত্তীর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য যাত্রা সুরু করিবার কথা বলিতে চাহিয়াছেন। বীর, রৌদ্র ও করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে।

সাতভাই চম্পা (১৩৬৯)—এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটকখানি ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত হয়। ব্যালের গানসহ ইহাতে এগারটি সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বাংলার নবাব হোসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীঃ) দেশে স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন; সে সময়ও বহিরাগত গাজীগণের ধর্মান্ধতা ও নারী লোলুপতা ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুটরায়ের বংশ কিভাবে ধ্বংস করিয়াছিল

তাহাই নাটকে দেখান হইয়াছে। হোসেনশাহ হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত তাণ্ডব লীলা দূর করিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন,—

হোসেন—নবাব হোসেন শাহ তার রাজত্বকালকে এক স্বর্ণযুগে পরিণত করতে চায়। তাই একদিকে ভেসে চলেছে শ্রীচৈতন্য ভক্ত হরিদাসের প্রেম-ভক্তির প্লাবন, আর একদিকে মসজিদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে আজানের ধ্বনি। (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

প্রচারবিদ্ জয়ঢাকের গানেও এই ভাবটি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে,—

জয়ঢাক—(গীত) আজানের ধ্বনি মিশে গেছে আজ মধুময় হরিনামে,

মন্দির আর মসজিদ হলো পুণ্য তীর্থ ধামে।
খোদা ভগবান একসাজে সাজি
নেমেছে মাটির পৃথিবীতে আজি
ধন্য হয়েছে গৌড়বঙ্গ ধন্য হোসেন নামে
মন্দির আর মসজিদ হল পুণ্যতীর্থ ধামে।

(২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ, প্রচারের জোরে অনেক সত্যই মিথ্যা এবং অনেক মিথ্যা সত্যে পরিণত হয়। জয়ঢাক চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার ইহাই বলিয়াছেন,

জয়ঢাক—ধরুন আপনি হোসেন শাহ বাংলার নবাব, দেশ জোড়া আপনার সুনাম। বলুন সাত দিনের মধ্যে আপনার সুনাম আমার জয়ঢাকের জোরে কবরস্থ করে দিচ্ছি।

হোসেন—তাঃ-তাঃ-তাঃ—বলকি ?

জয়ঢাক—আবার আদেশ করুন—যে মজঃফর শাকে হত্যা করে আপনি এই গৌড়ের সিংহাসনে বসেছেন, আমি সেই অত্যাচারী হিন্দু-মুসলমানের পরম শত্রুকে রাতারাতি একেবারে দেবতার আসনে বসিয়ে দিচ্ছি। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

আদি, বীর ও করুণরস প্রধান এই ঐতিহাসিক নাটকে অনেক কাল্পনি-কতাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ধর্মোন্মাদ কামান্ধ, গাজী বরখান-এর অত্যাচারী চরিত্র এবং হোশেন শাহের চরিত্র পরিকল্পনায় মাঝে মাঝে ব্রজেন্দ্র-কুমারের 'সোনাই দীঘির' (১৯৬১) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মুকুট রায়ের মৃত্যু-জীবকুণ্ড গাজী বরখান কর্তৃক গোরক্তে অপবিত্র করিবার সঙ্গে বিনয়কৃষ্ণ

রচিত 'মাটির প্রেম' (১৩৫৫) নাটকের রাজা শিলাদিত্যের সূর্যকুণ্ড গোরক্তে অপবিত্র করিবার ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিনয়কৃষ্ণ দ্বারা বর্তমান নাট্যকার প্রভাবিত হইয়াছেন।

· বাপ্পাদিত্য (১৩৭০)—আর্য অপেরা ও কুণ্ডুনাট্য কোম্পানিতে এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। যাত্রা-বালে সহ ইহাতে নয়খানি গান রহিয়াছে। ভীলের ঘরে লালিত পালিত গিহ্লোট (গুহিলোট) রাজকুমার বাপ্পাদিত্যের (অষ্টম শতকের প্রথমার্ধের বাপ্পারাওয়াল) চিতোর-সিংহাসন লাভের কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'র অন্তর্গত বাপ্পাদিত্য হইতে মূলগল্প সংগৃহীত হইয়াছে। শোলাঙ্কী রাজকন্যা লীলার সতীত্ব এবং বাপ্পাদিত্যের বীরত্ব ও দেশপ্রেমকে প্রাধান্য দিয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। চরিত্র চিত্রণে সূতপুত্ররূপে পরিচিত ক্ষত্রিয়নন্দন বীরকর্ণের সঙ্গে ভীল সন্তানগণ দ্বারা জ্ঞাত রাজপুত বীর বাপ্পাদিত্যের সাদৃশ্য কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় (মানরাজ কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক শক্ত সিংহ ও বীরসিংহকে উক্ত সংলাপ)—

মানরাজ—মহাভারতের এক বিরাট পুরুষ যার ত্যাগ, যার তিতিক্ষা, যার মহত্ত্ব, বীরত্ব পৃথিবীকে এক নূতন আদর্শে গড়ে তুলতে পারতো, তোমরা বিশ্বাসঘাতক—তোমরাই একদিন তাকে নীচ সূতপুত্র বলে আভিজাত্যের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছ। কিন্তু আমি আর সেই ভুল করবনা। মহাভারত যাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, পারে নি তার জীবন স্বপ্নকে সফল করতে আমি এই অজ্ঞাত কুলশীল বাপ্পার মধ্য দিয়ে কর্ণের সেই মহান আদর্শকে তুলে ধরব জগতের সামনে। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

নাট্যকার দৈব ও সতীধর্মকে অবলম্বন করিয়া 'রক্ত সন্ধ্যা' নামে একখানি পৌরাণিক নাটকও রচনা করেন; ইহা আর্য অপেরায় অভিনীত হয়। ইহা ছাড়া 'কবি কৃত্তিবাস' (১৯৬৯), নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত 'ভিয়েতনাম' (১৯৭০), নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত 'পেশোয়া বাজিরাও' (১৯৭১) প্রভৃতি নাটক নাট্যকার রচনা করেন।

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৩৩৭—)

প্রসাদকৃষ্ণ ১৩৩৭ সালে ২৪ পরগণাজিলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত শাসন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার পরে

অভিনয় করিবার জন্য তিনি সত্যম্বর অপেরায় যোগদান করেন। প্রায় ছয় বৎসরকাল সেখানে কাজ করিবার পরে শারীরিক কারণে যাত্রার দল ছাড়িয়া প্রসাদকৃষ্ণ পাঠশালায় শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। তিনি ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক নাটক রচনা করিয়াছেন।

মসনদকার (১৩৬৯) -ইহা পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকটি প্রথমে 'বিশালাক্ষী নাট্যসমাজে' এবং পরে 'কালুরায় অপেরায়' অভিনীত হয়। অত্যাচারে অতিষ্ঠ কারাগার-বন্দীদের গণের গান দিয়া নাটক স্থরু করা হইয়াছে। ইহাতে বালেসহ প্রায় সতেরখানি গান আছে।

নাসিরুদ্দিন কুতুবুদ্দিন মুবারককে (১৩১৬--১৩২০ খ্রীঃ) কৌশলে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন আয়ত্ত করেন এবং নাসিরুদ্দিনের (১৩২০ খ্রীঃ) হত্যার পরে গিয়াসুদ্দিন তোঘলক (১৩২০---১৩২৫ খ্রীঃ) নিজেকে দিল্লীর শাসনকর্তা বলিয়া প্রচার করেন। এই কাহিনীকে নাটকে রূপায়িত করা হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনা বা চরিত্র বিশেষ কল্পনারঙে জারিত হইয়া যাত্রানাট্যে স্থান পায় ; এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যে সকল হিন্দু ধর্মান্তরিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাহারা যাত্রা নাটকে সাধারণত অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী রূপে চিত্রিত হইয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ 'কালাপাহাড়', 'জালালুদ্দিন' (যদু) প্রমুখের কথা মনে করা যাইতে পারে। এই নাটকে নাট্যকার এই শ্রেণীর চরিত্রকে কিছুটা অন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। নিম্নজাতির সন্তান খসরু কুতুবুদ্দিনের অত্যাচারে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হইতে বাধ্য হইলেন। এই খসরুই একদিন নাসিরুদ্দিন রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নাসিরুদ্দিন হিন্দু বিদ্বেষী না হইয়া হিন্দুমুসলমানকে সমানভাবে ভালবাসিয়াছেন,--

নাসির-- আমি তোমার চরণ স্পর্শ করে শপথ করছি মা। কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলকামনাই হবে আজ থেকে আমার জীবনের ব্রত। আমার কাছে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, আছে শুধু একমাত্র পরিচয় ভারতমায়ের সন্তান। (৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

নাসিরুদ্দিনের স্ত্রী এবং আভিজাত্যগর্বে গর্বিত কাফের বিদ্বেষী বিদেশী মুসলমান ইব্রাহিম খাঁর কন্যা জাহানারার কণ্ঠে দেশ, জাতি ও ধর্ম বিদ্বেষমুক্ত মনোভাব ধ্বনিত হইয়াছে,—

ইব্রাহিম—তা হয় না কন্যা। এদেশের মুসলমানদের আমি মুসলমান বলে মনে করিনা।

জাহানারা—ঐ আভিজাত্যই তোমাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, ভারতের হোক, আরবের হোক সকলেই এক দুনিয়ার সন্তান। জাতি ধর্ম দেশের পরিচয় নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা উচিত হয় না বাপজান।

(৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

এই নাটকটি বীর, শৃঙ্গার ও করুণরস প্রধান।

প্রথম পানিপথ (১৩৭০) —এই পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটকে প্রথমে রাজপুত পুরনারীদের দেশাত্মবোধক গণের গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাটকে প্রায় চৌদ্দখানা গান আছে; ইহাতে যাত্রা-ব্যালেও রহিয়াছে। নাটকখানি 'ক্যালকাটা মিলনবীথি অপেরায়' অভিনীত হয়। দিল্লীর অত্যাচারী পাঠান সুলতান ইব্রাহিম লোদির (১৫১৭—১৫২৬ খ্রীঃ) জঘন্য অত্যাচার হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য পাঞ্জাবের সুবেদার পাঠান দৌলতখাঁ মোগলবীর বাবরকে আহ্বান জানাইলেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া বাবর ভারতে মোঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয় অবলম্বনে নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দুরাজ্যের শাসনকর্তা স্বাধীন নরপতি মেবারাধীশ্বর রানা সংগ্রামসিংহ চরিত্র বীরত্ব, দেশাত্মবোধ ও আশ্রিত রক্ষণের নীতি লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। নাটকের প্রধান চরিত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে নাট্যকার এক বীভৎস প্রকৃতি লইয়া রূপায়িত করিয়াছেন। তাহার অত্যাচার হইতে হিন্দুমুসলমান কাহারো নিস্তার নাই; সে মানুষের কান্নায় হাসে আর দুঃখে করতালি দেয়,—

ইব্রাহিম—মেহের পুড়বে—আমি দেখবো হা—হা—হা রিজিয়া। তোমার মেহেরকে আমি পুড়িয়ে মারছি—যদি দেখতে চাও ছুটে এস। ইব্রাহিমের কাছে কারো মাপ নেই, খোদারও না। সে যতক্ষণ দুনিয়ায় থাকবে শুধু অত্যাচার, অবিচার, আর্তনাদ, হাহাকার সব নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর ভয়ার্ত আবহাওয়াকে বুকে জড়িয়ে থাকবে। (৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

আদি, করুণ, বীর ও বীভৎস রসকে প্রাধান্য দিয়া নাটকটি রচিত

হইয়াছে। সর্বত্র-গতিসম্পন্ন 'ফকির' চরিত্র গানে গানে যেমন বিভিন্ন চরিত্রকে আশা-উদ্দীপনা যোগাইয়াছে তেমনি আবার ভবিষ্যদ্বাণীও শুনাইয়াছে,—

তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, দৌলতখাঁর প্রাসাদ, (খাতাপত্র বগলে লইয়া বিক্রমজিতের প্রবেশ)

বিক্রম—দুর্গা, দুর্গা অনেক কষ্টে সুলতানের মনোরঞ্জন করে পাঞ্জাবের সুবেদারিটা আদায় করেছি। গোয়ালিয়র তো আছেই, তার উপর পাঞ্জাব ; একেই বলে কপাল।

(গীতকণ্ঠে ফকির সাহেবের প্রবেশ)

ফকির—এবার পাশা উল্টে যাবে ভাঙবে নদীর আল।
গজের কিস্তি মাত হবে ভাই ভরবে না কপাল ॥

বিক্রম—এই যে ফকির সাহেব ! আচ্ছা, কেন বলতো ঘেয়ো কুকুরের মত আমার পিছনে দিনরাত তুমি ঘেউ ঘেউ কর। যাও মসজিদে গিয়ে নামাজ পরগে, পরকালের কাজ হবে।

ফকির—(পূর্বগীতাংশ) মসজিদে ভাই মন বসে না দেখে তোমার দশা,
হাতি নাকি গিলবে এবার তোমার মত মশা।
ব্যাঙ নাকি হায় স্বর্গপথে বাঁধবে কবে আল,
সমঝে চল, বলছি ভায়া, হয়ো না নাকাল।

(প্রস্থান)

অতিরিক্ত লোভে সব হারাইয়া এই বিক্রমকে বাবরের বন্দিত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

রিক্তা নদীর বাঁধ (১৩৭১)—এই পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত হয়। নাটকে যাত্রা-ব্যালেসহ বারখানার অধিক গান আছে। সিংহাসনের লোভে মন্ত্রী রুদ্রপ্রতাপের চক্রান্তে কমলগড়ের রাজ-পরিবারে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয় ; শেষ পর্যন্ত পাপের পরাজয়ে রাজ-পরিবার ঝঞ্ঝামুক্ত হয়। এই মূল ঘটনা লইয়া নাট্যকাহিনী বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কমলগড়ের রাজপুত্র 'প্রদীপ' নাটকের একানে বালকের দৃষ্টান্ত। এই ছোট ছেলেটির মৃত্যুতে নাটকে করুণ রসের সঞ্চার হইয়াছে। দেশের জনগণের দুঃখ, দুর্দশা, অন্নবস্ত্রাভাব ও হাহাকারের মূলে রহিয়াছে উপরওয়ালাদের বিলাসব্যসন, ধনীর কালোবাজারী মনোবৃত্তি, ঊর্ধ্বতন রাজ-কর্মচারীর গোপন পথে অর্থ আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি এবং স্বার্থান্বেষী

রাজপুরুষদের অত্যাচার। কাল্পনিক নাট্য কাহিনীতে লোকনাট্যকার এই ভাবধারার পরিচয় দিয়াছেন। শোষিত অর্থে ঐসব সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি। শক্তিমানদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য 'মংগল' ডাকাতি করে।

এই জাতীয় জনদরদী ডাকাত চরিত্র অনেক যাত্রানাট্যে পূর্বেও দেখা দিয়াছে। প্রসঙ্গত অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'রঘু ডাকাত' (১৩৬১) প্রভৃতি স্মরণযোগ্য। রিক্তা নদীর বাঁধ বাঁধার কথা লইয়া নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে। ইহা বীর, আদি, বাৎসল্য ও করুণ রসপ্রধান নাটক।

পানিপথ রণাঙ্গনে আহামদশা আবদালি ও বাজিরাওয়ের দ্বন্দ্ব অবলম্বনে 'বালাজী বাজিরাও' (১৩৭১) এবং হূনরাজের সঙ্গে স্কন্দগুপ্তের সংগ্রাম লইয়া 'সম্রাট স্কন্দগুপ্ত' (১৩৭২) 'রিক্সাওয়ালা' (১৯৬৬) 'রক্ত দিয়ে কিনলাম' (১৯৬৯) প্রভৃতি আরো কয়েকখানি নাটক নাট্যকার রচনা করিয়াছেন।

শম্ভুনাথ বাগ (১৯৩৬—)

বর্ধমানের অধিবাসী এই লোকনাট্যকার বি. এ. পাশ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি কিছুকাল যাত্রাভিনয়ও করেন। পরে তিনি যাত্রানাট্য রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। পালা রচনায় তিনি যাত্রার বাঁধা ছক হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিবার পক্ষপাতী।

ঘুমভাঙার গান (১৯৬৭)—এই নাটকখানি প্রথমে বর্ধমান নবনাট্য আন্দোলন গ্রুপ ও পরে তরুণ অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। অতিরিক্ত ধনতৃষ্ণার মোহে যাহারা প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া চোরা গলিতে বিচরণ করিয়া জনগণের দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার বোঝা বাড়াইয়া দিয়া সমাজকে ক্লেদাক্ত করিয়া তুলিতেছেন নাটকে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই যুগ-সমস্যার সমাধান কল্পে নাট্যকার তন্দ্রাচ্ছন্ন জনগণকে সচেতন করিতে, তাহাদের নৈতিকমান উন্নত করিতে ও অনাচারী শোষণবাদী ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন,—

ধীরাজ— ওই অনাচারী শোষণবাদী দাম্ভিক ধনীদের মুখের উপর পাল্টা জবাব দিতে দেশে দেশে গড়ে তুলবে এমনি নতুন বিপ্লবীর দল—যারা রক্ত নেবে, কিন্তু রক্ত দিতেও পিছিয়ে যাবে না, যারা

ধন আহরণ করবে কিন্তু সর্বস্ব দান করতেও বিলম্ব করবে না,
যারা শাস্তি দেবে কিন্তু ক্ষমার মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠা করবে না।
(১ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক)

এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের 'সূচনা' অংশের কয়েক বৎসর পরে নাট্যঘটনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে নয়টি গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। দরিদ্র গ্রামবাসী মহেশ ভট্টাচার্য বিপ্লবীর পিতা। অনুভূতি-প্রবণ এই চরিত্রটিকে নাট্যকার বহু রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তির সুযোগ দিয়াছেন। যাত্রায় চরিত্র-মুখে রবীন্দ্র-কবিতার উপস্থাপনা এই প্রথম দেখা গেল।

হিটলার (১৯৬৯)—নাটকখানি তরুণ অপেরায় ১৩৭৫ সালে অভিনীত হয়। ইহার রচনাকাল ১৩৭৪ সাল। পাশ্চাত্ত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত প্রথম যাত্রা নাটক 'হিটলার' 'উপক্রমনিকা', 'প্রথম পর্ব' ও 'দ্বিতীয় পর্ব' এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় পর্বের শেষ পর্বাংশকে 'উপসংহার' নামে বিশেষিত করা হইয়াছে। প্রথম পর্বে ও দ্বিতীয় পর্বকে কতগুলি পর্বাংশে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাতে ছয়খানি গীতি সংযোজিত হইয়াছে। এই নাটক প্রয়োজনায় শব্দ-যন্ত্র (tape recorder) ও বন্দুকাদির ব্যবহারে বাল্ব-ব্যাটারি প্রভৃতি ও যান্ত্রিকতার যাহায্য গ্রহণ করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সময় সম্ভবস্থলে আসরের বৈদ্যুতিক আলোর তীব্রতা হ্রাস করিবার ব্যবস্থা কঁরা হইত। শব্দ প্রয়োগে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক আলোক নিয়ন্ত্রণ এই সময় হইতে কোন কোন যাত্রা সংস্থায় দেখা যাইতে থাকে। 'হিটলার' নাটকের যান্ত্রিক ব্যবহার পরিচালনা করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের শিক্ষক অমর ঘোষ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মতিলাল রায়ের যাত্রায় আসরে চলন্ত নৌকা আনয়নে ও হরধনু ভঙ্গ-বিষয়ে যান্ত্রিকতার ব্যবহার করা হইত। ধর্মদাস রায়ের দলে 'রাবণ বধ' পালায় রাবণের ভূমিকায় নীলমণি বিশ্বাস বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে শিবলিঙ্গ মৃত্তিকায় (আসরের মধ্যে) প্রোথিত করিবার সময় যান্ত্রিকতার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। নট্টকোম্পানীর 'লক্ষ্মণ শক্তিশেল' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নামক অঘোরচন্দ্রের পৌরাণিক পালায় যথাক্রমে রাবণ ও হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় আকাদমী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবীণ নট সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক সময় 'নাগপাশ' ও 'দীপ্ত ত্রিশূলাস্ত্রের' ব্যবহারে যান্ত্রিকতা ও ইলেকট্রিক ব্যাটারীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পটভূমিকায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর অভিযান

অবলম্বনে 'হিটলার' পালা রচিত হইয়াছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বত্রাস হিটলারের যুদ্ধাভিযান, লালফৌজের মুক্তিসংগ্রাম, ষ্টালিনগ্রাদে পরাজয় এবং উপসংহারে হিটলারের মৃত্যুবরণ নাটকের মূলকাহিনীতে বিধৃত হইয়াছে। যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া হিটলার আত্মসমর্পণের চরম গ্লানি সহ্য করিতে চাহেন নাই। তাই জীবনের একমাত্র বিশ্বাসভাজন প্রেয়সী ঈভার হস্তে তিনি মৃত্যুবরণ করেন,—

হিটলার—অনেকদিন, অনেকদিন এই মাটির নীচে বুঙ্কারে আবদ্ধ আছি আমরা। এবার মুক্তি পাবো। বুঙ্কারের চিমনী দিয়ে আমাদের ভস্মীভূত দেহ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী হয়ে উঠে যাবে উর্দ্ধে—মুক্ত আকাশের বুকে। পৃথিবী হয়ত আরামের নিঃশ্বাস ফেলবে। ঈভা প্রস্তুত।

ঈভা—আমি প্রস্তুত!

[কপালে গুলি লাগতেই ভেঙ্গে পড়েন হিটলার, উপসংহার]

লেনিন (১৯৭০)—রাশিয়ার মহান বিপ্লবী নেতা লেনিন-এর কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়। তরুণ অপেরা কর্তৃক লেনিন শতবার্ষিকী বর্ষে (১৯৭০) এই নাটকটি যাত্রার আসরে ব্যাপক প্রচারিত হওয়ায় এই যাত্রা সংস্থা 'সোভিয়েট দেশ নেহেরু পুরস্কার' লাভের গৌরব অর্জন করে।

'দ্বিতীয় সেকেন্দার' (১৩৬৭)' তরুণ অপেরায় অভিনীত 'মহেঞ্জোদড়ো' (১৯৭১) এবং নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত 'রক্তাক্ত আফ্রিকা' (১৯৭১) প্রভৃতি আরো কয়েকটি যাত্রানাট্য নাট্যকার কর্তৃক রচিত হয়।

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৪১—)

বর্ধমান জিলায় মূলগ্রামের অধিবাসী এই লোকনাট্যকার প্রথমে 'নাচ-মহল' নামে একটি ঐতিহাসিক পালা রচনা করেন। ইহা নবযুগ নাট্য সংসদ-এ অভিনীত হয়। সাম্প্রতিকযুগের নানা সমস্যা অবলম্বনে ভৈরবনাথ রচনা করেন 'একটি পয়সা' (১৩৭৪)। অত্যাচার, অবিচার, নিপীড়ন, ভোট-আকাঙ্ক্ষা ও গণ আন্দোলন অবলনে লিখিয়াছেন 'পদধ্বনি' (১৩৭৫)। পালা দুইটি সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয়। ভৈরবনাথ রচিত 'সতী একাবতী' (১৯৭১) পালাটি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতিসংস্থার আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সত্যম্বর অপেরা দ্বারা ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত

হয়। 'অশ্রুজিলের লেখা', 'সাহারার কান্না', 'কি পেলাম' (১৯৬৯), 'কান্না যায় রক্ত' (১৯৭১) প্রভৃতি আরো কয়েকটি যাত্রানাট্য তিনি রচনা করেন।

সত্যপ্রকাশ দত্ত (১৩৩০—)

তিনি খুলনা জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাহার বর্তমান নিবাস ২৪ পরগণা জিলার গোবরডাঙ্গা-মসলন্দপুর। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পরে সত্যপ্রকাশ পেশাদারী যাত্রা দলে অভিনেতা রূপে যোগদান করেন। পরে অভিনয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি লোকনাট্য রচনায় এতী হইয়াছেন। তিনি প্রথমে 'অগ্নিবাসর' (১৩৭২) নামে একখানি ঐতিহাসিক পালা রচনা করেন। তরুণ অপেরায় অভিনীত 'পঞ্চ নদীর তীরে' (১৯৬৬), জনতা অপেরায় অভিনীত 'তামসী' (১৩৭৩) ও অঙ্গার (১৩৭৪) এবং নিউ আর্য অপেরায় অভিনীত 'বঙ্গবন্ধু মুজিবর' (১৯৭১) প্রভৃতি যাত্রাপালা তাহার পরবর্তী রচনা।

শান্তিরঞ্জন দে

এই লোকনাট্যকার দমদম অঞ্চলের অধিবাসী। তাহার 'রাক্ষসী পদ্মা' (১৯৬৮) শ্রীমা নাট্যকোম্পানীতে এবং 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' (১৯৬৯) নিউ আর্য অপেরায় অভিনীত হয়। তাহার ঐতিহাসিক পালা 'গঙ্গা থেকে বুড়ী গঙ্গা' (১৯৭১) নট্টকোম্প্রানীর জন্য রচিত হয়। তিনি নাট্য-ভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির জন্য প্রস্তুত করেণ 'মাতৃপূজা' (১৯৭১)। এই পৌরাণিক পালাটি ভোলানাথ রায়ের 'নরকাসুর' যাত্রানাট্যের বিশেষ অনুসরণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি সংস্থার আমন্ত্রণে এই নাটকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি কর্তৃক ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়।

সাম্প্রতিককালে কোন কোন থিয়েটারী নাট্যকার কিছু কিছু যাত্রানাট্য রচনা করিতে সুরু করিয়াছেন। যাত্রানাট্যের যুক্তিহীনতা ও অসম্ভাব্যতা দূর করিয়া এবং বিষয়বস্তুকে সাধারণ পল্লীবাসীর হৃদয়গ্রাহী করিয়া পরিবেশন করিবার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল নাট্যকার যাত্রানাট্য রচনা করিতে সচেষ্ট। থিয়েটারী নাট্যকারগণ যাত্রানাট্য রচনা করিতে সুরু করায় যাত্রানাট্যের বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণ, গঠনশৈলী ও উপস্থাপনা রীতির যে পরিবর্তন ঘটিতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যুগে যুগে যাত্রার পরিবর্তন

ঘটিয়াছে। একালেও ইহার পরিবর্তন ঘটিবে। যুগরুচি ইহার মূল কারণ। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই লোকনাট্য চলার শক্তি সংগ্রহ করিবে। সুতরাং ইহাকে সমর্থন না জানাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—যাত্রা যেন থিয়েটারের অন্ধ অনুকরণ অথবা ব্যর্থ অনুকরণে পর্যবসিত না হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে,—মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে যাত্রা মাধ্যমটি বিশেষ ফলপ্রদ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মুকুন্দদাস ইহা প্রথম বুঝিয়া ছিলেন। সাম্প্রতিক যাত্রানাট্যকারগণ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

থিয়েটারী নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য পেশাদার যাত্রাদলের জন্য প্রথম লোকনাট্য রচনায় ব্রতী হইযাছেন। তিনি নবরঞ্জন অপেরার জন্য 'মাইকেল মধুসূদন' (১৯৬৭) ও রাষ্ট্রবিপ্লব' (১৯৬৮), নিউ আর্য অপেরার জন্য 'ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র' (১৯৬৭) এবং লোকনাট্যের জন্য 'বিদ্যাসুন্দর' (১৯৭২) রচনা করেন। উৎপলদত্ত রচনা করেন 'রাইফেল (১৯৬৮), 'জালিয়ানওয়ালাবাগ (১৯৬৯), 'নীলরক্ত' (১৯৭০), 'দিল্লী চলো' (১৯৭০) ও 'জয়বাংলা' (১৯৭১)। এই নাটকগুলি যথাক্রমে 'নিউ আর্যঅপেরা', 'সত্যম্বর অপেরা', 'ভারতী অপেরা ও 'লোকনাট্য' যাত্রাদলে অভিনীত হয়। মন্মথরায় সত্যম্বর অপেরার জন্য নাদির শাহ অবলম্বনে ঐতিহাসিক পালা 'দিগ্বিজয়' (১৯৬৯) রচনা করেন। নাট্যকার নাদিরের মনোগতভাব ব্যাখ্যায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। দুর্ধর্ষ নাদির কর্তৃক আফগানদের নিকট হইতে পারস্য উদ্ধার, সিংহাসনারোহণ ও ভারত আক্রমণ ইহার প্রধান ঘটনা। তিনি নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির জন্য রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর যাত্রারূপ (১৯৭০) দান করেন। চিত্রনাট্যকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নবরঞ্জন অপেরার জন্য 'রক্তলেখা' (১৯৬৯) পালা রচনা করেন। জমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই 'রক্তলেখা' শৈলজানন্দের 'বন্দী' ছায়াচিত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

একদা ষ্টার থিয়েটারের নাট্যকারও অভিনেতা মহেন্দ্রগুপ্ত অধুনা যাত্রা সম্প্রদায়ে নাট্যকারও অভিনেতারূপে যোগদান করিয়াছেন। তিনি 'বন্দিনী (১৩৭৪), 'সিংহগড়' (১৩৭৫), 'দাদাঠাকুর' (১৩৭৫) প্রভৃতি লোকনাট্য রচনা করেন। নাটকগুলি নট্টকোম্পানীতে অভিনীত হয়। গ্রামোফোনও পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জনশাখার নাট্যকার নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী অগ্নিযুগের তিন বিপ্লবী চরিত্র

অবলম্বনে রচনা করেন 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' (১৯৬৯), 'সিপাহীবিদ্রোহ' (১৯৭০), ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' (১৯৭১)। নাটক তিনটি যথাক্রমে নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি, সত্যম্বর অপেরা ও নিউরয়েল বীণাপাণি অপেরা সংস্থায় অভিনীত হয়। ছবি বন্দোপাধ্যায় নিউ প্রভাস অপেরার জন্য রচনা করেন 'জলন্ত বারুদ' (১৯৬৯)। কুচক্রী ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত জনগণের বিক্ষোভ ইহার মূল বিষয়বস্তু। ঐই যাত্রা সংস্থার জন্য তিনি 'সিরাজের কান্না' (১৯৭০) নামে আরো একটি নাটক রচনা করেন। সুনীলদত্ত নিউরয়েল বীণাপাণি অপেরার জন্য রচনা করেন 'বারুদ' (১৯৬৯)। রমেন লাহিড়ী রচিত পালা 'রাহুমুক্ত রাশিয়া' (১৯৭১)। এই পালাটি নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত হয়।

পল্লীর কৃষ্ণযাত্রা

অভিনয়ের জন্য দীর্ঘ মহলাদেওয়া এবং পোষাকপরিচ্ছদ সংগ্রহ করা সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, আবার পালা রচনা করাও সহজসাধ্য নহে। মনে হয় এই জন্যই পল্লীতে পল্লীতে পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাট্যানুষ্ঠানের সংখ্যা কম। গানের আসরে খণ্ডাংশরূপে নাট্যের অবতারণা দ্বারা অথবা সংক্ষিপ্ত নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়া সাধারণত পল্লীবাসীর নাট্যরসপিপাসা চরিতার্থ হয়। কোন কোন স্থানে কৃষ্ণ যাত্রাভিনয়ের প্রচলন দেখা যায়। সে সকল স্থানেও নিজেদের রচনা নহে, মুদ্রিত গ্রন্থের হাতে লেখা কপি অভিনেতাদের সম্বল। মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যাল্পতার জন্যই পল্লী অঞ্চলে সাধারণত কৃষ্ণ যাত্রার ছোট ছোট মুদ্রিত পালা নকল করিয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ছোট পালা নকল করাও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার নহে। পূর্বপ্রচলিত গোবিন্দ অধিকারীর 'মানভঞ্জন', 'গোষ্ঠবিহার', 'কালীয়দমন', 'মাথুর', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'কৃষ্ণকালী' প্রভৃতি, অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থের 'মাথুর', 'নৌকা-বিলাস', 'মানভঞ্জন' 'অক্রূরসংবাদ', 'প্রভাসমিলন', 'ননী-চুরী', 'নিমাই-সন্ন্যাস' প্রভৃতি, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'মাথুর', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'নৌকা-বিলাস', 'সুবলমিলন', 'প্রভাসমিলন', 'কৃষ্ণ-কালী' প্রভৃতি এবং নিয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মানভঞ্জন', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'নৌকা বিলাস', 'রাসলীলা', 'ননীচোরা' প্রভৃতি মুদ্রিত পালা পাওয়া যায়। পালাগুলির রচনারীতি একই রকম; অল্পকিছু সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়া সংক্ষিপ্ত কাহিনী ইহাতে উপস্থাপিত। বাৎসল্য, সখ্য, শৃঙ্গার

ও ভক্তিরস এইসকল পালা রচনায় প্রাধান্য পাইয়াছে। কৃষ্ণযাত্রা রচনায় উল্লিখিত পালাকারদের আদর্শ গোবিন্দ অধিকারী। তাহার পালার অনুকরণে বৃন্দা, রাধা ও কৃষ্ণচরিত্র তিনটির প্রাধান্য বজায় রাখিয়া পালাগুলি রচিত হইয়াছে। ইহাতে সংগীতের প্রাধান্যও বজায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার সঙ্গে সংলাপের দিক হইতে এই সকল পালার পার্থক্য আছে। পালাগুলিতে কখনও গদ্য কখনও বা পদ্য সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে, গোবিন্দ অধিকারীর সংলাপ অপেক্ষা এই সকল পালার সংলাপ যথেষ্ট দীর্ঘ। যুগরুচি অনুযায়ী উল্লিখিত পালাকারগণ সংলাপে কিছু বেশি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, গোবিন্দের পালায় সংলাপের তেমন গুরুত্ব ছিল না। ঘটনার সূত্র, ধরাইয়া দেওয়াই ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কারণ তৎকালে অভিনয়ের উপর জোর দেওয়া হইত না। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গীতবহুল কৃষ্ণযাত্রার সংলাপ সংখ্যায় কম ও খুব ছোট ছোট। সংগীতের আধিক্যের জন্য গোবিন্দ অধিকারীর পালায় দীর্ঘ সময় লাগিত, অঘোরচন্দ্র, পশুপতি ও বিনয়কৃষ্ণের কৃষ্ণযাত্রা দুই ঘণ্টায় অভিনীত হইবার মত ক্ষুদ্রায়তন এবং এইগুলি সাত-আট বা দশ-বারটি ছোট ছোট দৃশ্যে বিভক্ত। উল্লিখিত পালাগুলি পল্লীবাংলায় কীর্তনীয়ারাও পরিবেশন করিয়া থাকেন। তবে তাহারা সাঙ্গীতিক ও ব্যাখ্যা-বক্তৃতামূলক পরিবেশন রীতি গ্রহণ করেন বলিয়া রূপসজ্জা অবলম্বনে চরিত্র আসরে উপস্থাপিত করাইবার প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণ যাত্রার পালা জটিলতাহীন অত্যন্ত ছোট ছোট এক একটি ঘটনা লইয়া রচিত। ঘটনাপ্রকাশে এবং পরিবেশ রচনায় সংলাপের কিছু গুরুত্ব থাকিলেও মোটের উপরে সংগীতের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ভাবের রসরূপদান কৃষ্ণ যাত্রার লক্ষ্য। এই সঙ্গীতের বাণীর মধ্যেই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূজারঘট, মঙ্গলঘট, বিবাহের পিঁড়ি-সরা, দেওয়ালচিত্র,* ঘরের চালের নক্সা, আলপনা, নানাপ্রকার ডাকের সাজ, মুখোস, খেলনা, আসন-কাঁথা সেলাই, কাপড়ের পাড়ের নক্সা প্রভৃতি পল্লীবাংলার শিল্প-পরিচয় বহন করে। ছৌ-নাচ, কাঠি-নাচ, নাটা-নাচ, ঘোড়া-নাচ, ফসল-কাটার-নাচ, এবং ঝুমুর, বুলবুলি (রাস), নীলগাজন প্রভৃতির মধ্য দিয়া গ্রামীণ নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ধাঁপান, করম, সাধু, অহিরা (কপিলামঙ্গল), বিহা (জলভরা ও বিদায়), ভাদু, চুয়া, টুসু, উধোয়া, বাউল, ভাটিয়ালি, সারি,

জারী, ভাওয়াইয়া, বিষহরার গান (মনসার গান), রামায়ণ গান, ফকিরের গান, রামপ্রসাদী, ভাঙাকীর্তন, প্রভৃতি বহুবিধ গীতে পল্লীর আসর ও মাঠ-ঘাট মুখর। কোন কোন গীতধারার সঙ্গে আবার নাটকের কিছু কিছু সংশ্রবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 'গম্ভীরা'ও 'আলকাপের' উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গম্ভীরা

গম্ভীরা শিব-মাহাত্ম্যমূলক গান। এই গানের সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক রহিয়াছে। গম্ভীরার শিব দেবাদিদেব মহাদেব নহেন। ইনি পল্লীর চাষ-ফসলের দেবতা, কিন্তু তাঁহার সাজসজ্জা গ্রহণে পুরাণের বর্ণনা অনুসরণ করিবার চেষ্টা থাকে। এই গানের নেতা অনেক স্থানে 'বালা' নামে অভিহিত হয়। চৈত্রমাসে সুরু হইয়া বৈশাখ মাসের প্রথম পর্যন্ত গম্ভীরা উৎসব চলে। ইহাতে সমগ্র বৎসরের কর্মাবলীর সমালোচনা ও অন্যায়কর্মের জন্য অনুতাপ করিবার রীতিও প্রচলিত। গম্ভীরা নৃত্যগীতে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীরা বিভিন্ন দেবতার সাজসজ্জা গ্রহণ করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের গম্ভীরা উৎসবের পরিচয় প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে,—

[1] "As now celebrated in this District, a shamiana or a hut open on three sides is put up and an image of Siva (Mahadeb) installed, before which there are dancing, singing, masquarading and general meriment."

গম্ভীরায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়। বর্তমানে ইহাতে পরিচিত লোকের গলদত্রুটি, বা কোন বিশেষ কর্মের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অথবা সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে খণ্ডঘটনার অবতারণাদ্বারা রঙ্গরস পরিবেশনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশের প্রয়োগে অঙ্গরচনা ও অলঙ্করণের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আবার এই অংশে কখনো গানে, কখনো বা সংলাপে কথোপকথন চলে। গম্ভীরার মূলসংগীতাংশেও অনেক সময় পারস্পরিক উক্তিমূলক গান থাকে। সুতরাং এই সব অংশ নাট্য লক্ষণযুক্ত—ইহা বলা যায়। উত্তরবঙ্গের মালদহ জিলায় গম্ভীরার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। পশ্চিম দিনাজপুরেও গম্ভীরা প্রচলিত। এই

1. Bengal District Gazetteers—Malda, P. 80, G. E. Lambourn 1918.

দুই জিলার রাজবংশী, চাই, কোচ, মহলী ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচলন অধিক। /

আলকাপ

আলকাপের অন্য নাম 'আলকাটাকাপ'। ইহা একপ্রকার পাঁচমিশালি নৃত্য-গীত। এই জন্য বীরভূম অঞ্চলে ইহাকে 'ছ্যাচড়া' নামেও অভিহিত করা হয়। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জিলায় ইহার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। একটি দল একক ভাবেও আলকাপ গায়, আবার দুইটি দলে প্রশ্নজবাবের অবতারণা করিয়াও ইহার গাওনা হয়। সাধারণত পৌরাণিক বিষয়বস্তু বিশেষত কৃষ্ণ-বিষয়ক ঘটনা ইহার অবলম্বন। এই সকল পালাগানের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রকারের উপদেশ দানের ব্যবস্থা থাকে। আলকাপে আদিরস ও রঙ্গরসের অবতারণা থাকিবেই। গম্ভীরায় আদিরস ও রঙ্গরসের অবশ্য প্রয়োজন নাই। আলকাপের কাপ-অংশটি রঙ্গরসের (কৌতুকের) দ্যোতক। ভারতচন্দ্রও রঙ্গরসকারী অর্থে কাপ (কপটাচারী) শব্দ (কপট > কাপ) ব্যবহার করিয়াছেন,—

[1] দূর হইতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গ-চিঙ্গা॥
কেহ বলে ঐ এল শিববুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥

রঙ্গরস সৃষ্টির জন্য আলকাপে সঙ্‌-এর উপস্থাপনা করা হয়। 'সঙ্‌-মাষ্টার' এই সঙ্‌ পরিচালনা করেন। সঙ্‌-মাষ্টারকে 'কোপ্যা' বলা হয়। সঙ্‌-এর বিষয়বস্তু অনির্দিষ্ট হইলেও ইহাতে লৌকিক ঘটনা অবলম্বিত হয়। এই অংশে নৃত্য-গীতের সঙ্গে সংলাপও সংযোজিত হয়। ইহাতে নর ও নারী উভয় প্রকার চরিত্র থাকে। আলকাপের সঙ্‌-নাট্যলক্ষণযুক্ত, বাকি অংশে শুধু নাচগানের মধ্যদিয়া কাহিনী পরিবেশিত হয়। আলকাপ [2]"নানাপ্রকার কাহিনী ও রঙ্গরস সহযোগে উপদেশ মূলক পালাগান।" আলকাপে ছোকরা ও দোহার থাকে। দিনেরবেলা আলকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোন বাধা না থাকিলেও সাধারণত রাত্রিকালে ইহা অনুষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া

১। অন্নদামঙ্গল—শিবের ভিক্ষাযাত্রা।

২। বাংলার পল্লীগীতি—পৃঃ ৬,—চিত্তরঞ্জন দেব (১৯৬৬)

ইহার গাওনা চলে। 'গম্ভীরা'ও 'আলকাপে'র অংশবিশেষ নাট্যলক্ষণযুক্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে ইহাদের নাটক বলা যায় না। আলকাপে বীরভূম জিলায় শীলগ্রাম-চাঁদপাড়া অঞ্চলের এককড়ি রাজবংশী ও রসিদ মণ্ডলের বিশেষ পরিচিতি রহিয়াছে।

পল্লীর নৃত্যনাট্য

ছৌ ও ঘোড়া নাচ—ছৌ এবং ঘোড়ানাচ নাটকীয়তাপূর্ণ। এই নৃত্যানুষ্ঠানে যুদ্ধাত্মক কাহিনী থাকে। ছৌ-নাচ মূলত যুদ্ধনৃত্য। ইহাতে সৎ ও অসৎশক্তির দ্বন্দ্ব দেখানো হয়। দ্বন্দ্বে অসৎশক্তির পরাজয় ঘটে। ছৌনাচে একএকটি ঘটনা থাকে। ইহা একক নৃত্য নহে বলিয়া একটি ছৌনৃত্যানুষ্ঠানে অনেক নৃত্য-শিল্পীর প্রয়োজন হয়। ছৌনাচ তাণ্ডব রীতির, লাস্য রীতির নহে। বলদৃপ্ত অঙ্গভঙ্গি ও পদসঞ্চালন ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীও ইহাতে তাণ্ডব রীতিতে নাচিয়া থাকেন। শিল্পীরা লোকনৃত্যের মধ্য দিয়া এই কাহিনী রূপায়িত করেন। নৃত্যের সঙ্গে ঢোল, কাঁশি, সানাই, ডগর, ঢাক প্রভৃতি পল্লীপ্রচলিত যন্ত্রাদি বাদিত হয়। ছৌ-নৃত্যে 'রাবণবধ', 'সীতাহরণ', 'ধুন্ধুমার', 'পরশুরাম', 'কিরাতার্জুন' প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী এবং ঘোড়ানৃত্যে বীরত্বব্যঞ্জক 'যুদ্ধকাহিনী' রূপায়িত করা হয়। বাঁকুড়া জিলার বড়জোড়া-মালিয়াড়া অঞ্চলের বাগদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোড়া-নাচ দেখা যায়। ঘোড়া-নাচের যুদ্ধ কাহিনীতে আদিরসাত্মক বিষয়ও থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুরুলিয়া জিলাঞ্চলে প্রচলিত 'পরীনৃত্য'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুন্দরী পরীকে লাভ করিবার জন্য অশ্বারোহী দুই বীরের দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বশেষে লাস্য নৃত্যরত পরী কর্তৃক বিজয়ীর কণ্ঠে মাল্যদান অবলম্বনে ইহার কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। খাটী নৃত্য-নাট্য গীতি ও কথাহীন নৃত্যের মধ্য দিয়া সংযোজিত হইবার কথা। এই দিক হইতে 'ছৌ' ও ঘোড়া-নাচ' পল্লীবাংলার অকৃত্রিম নৃত্যনাট্য। পুরুলিয়া জিলার বাগমুণ্ডী, গড়জয়পুর, ঝালদা ও বলরামপুর অঞ্চলে ছৌ-নাচের বিশেষ প্রচলন রহিয়াছে। বাগমুণ্ডী অঞ্চলের গম্ভীর সিং ও কলেবর কুমারের ছৌনাচের দল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরিচালনাধীনে এইদল ইংল্যাণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি দেশে ছৌ-নাচ পরিবেশনের (১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে) গৌরব অর্জন করিয়াছে। এই বিষয়ে গড়জয়পুর অঞ্চলের মধুরায় ও গোকুলরায়ের ছৌ-নাচও বিখ্যাত।

পুরুলিয়া জিলার মাহাতোমারার মথন কালিন্দীর দলের ঘোড়া-নাচের জন্য বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে।

টনসাযাত্রা

পশ্চিমবঙ্গে 'টন্‌সাযাত্রা' নামে এক প্রকার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। রামায়ণের চলিত কাহিনী ইহার প্রধান অবলম্বন। কদাচিৎ কৃষ্ণ-কাহিনীও ইহাতে পরিবেশিত হয়। এই যাত্রায় রাম-কাহিনীর এক একটি অংশ এক একদিন পরিবেশন করা হয়। ইহার গাওনা এক ক্রমে সাত-আট দিন এমনকি পনের দিন ধরিয়াও চলে। 'টনসাযাত্রার' পালা অলিখিত। উপস্থিত বুদ্ধিমত ইহাতে সংলাপ সংযোজনা করা হয়। অত্যন্ত প্রচলিত ঘটনা ইহাতে উপস্থাপিত হয় বলিয়া এই সংলাপ যোজনায় কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। গানের দিক হইতে সকলেই নিজের জানা গান বিষয় ও সুযোগ বুঝিয়া গাহিয়া থাকেন। সংগীত ও নৃত্য ইহার বিশেষ অঙ্গ। হারমোনিয়াম, ঢোলক, তবলা ও করতালি এই যাত্রায় বাদিত হয়। কদাচিৎ বাঁশীও ইহাতে বাজাইতে শুনা যায়। ঐকতান বাদনের পরে অধিকারী চামর হাতে করিয়া আসর বন্দনাগীতি গাহিবার পরে পালা আরম্ভ করা হয়। অভিনেতারা সকলেই স্বহস্তে অঙ্গরচনা ও অলংকরণ করেন। মাঝে মাঝে থালা হাতে লইয়া পেলা আদায় করিবার রীতি ইহাতে প্রচলিত। অনেকসময় অধিকারীর প্রতিনিধিরূপে চতুর কোন অভিনেতাও পেলা আদায়ের ভার গ্রহণ করেন। টনসাযাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহাতে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান প্রমুখ বিশিষ্ট চরিত্রের কণ্ঠ-দোলায়িত পুষ্পমালার 'ডাক' হয়। আসরে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যাহার ডাক অধিক হইবে তিনি ডাক অনুযায়ী অর্থ দিয়া মালা গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। টনসাযাত্রার মালার ডাকে পঞ্চাশ নয়া পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া দশ পনের টাকা পর্যন্ত ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। অনেক-স্থলে রেশারেশি ও মর্যাদাবোধের ফলে একশত টাকাও ইহার ডাক উঠিয়া থাকে। অবশ্য এইপ্রকার রেশারেশি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মুরারি মোহন পাল (উত্তর কলিকাতা), নন্দলাল দে (উত্তর কলিকাতা), দুখীরাম হাজরা (মধ্য কলিকাতা), শক্তিপদ রায় (পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা) প্রমুখ অধিকারী বর্তমানে 'টনসা যাত্রা'র দল পরিচালনা করিতেছেন। কলিকাতার পার্শ্ববর্তী

অঞ্চল ও বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-২৪ পরগণা জিলায় অধিকারীরা টপ্পাযাত্রা পরিবেশন করিয়া থাকেন। দালালরা ইহার বায়না সংগ্রহ করেন। শিল্পীরা আসরের আয় নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করিয়া লইয়া বাকি অংশ অধিকারীকে দেন। দৈনিক আর্থিক চুক্তিতেও কোন কোন শিল্পী এই যাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। ইহাতে বেতনের রীতি প্রচলিত নাই।

পালাটিয়া যাত্রা

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জিলায় নাচ, গান ও ছড়া অবলম্বনে এক ধরনের পালা গান প্রচলিত আছে। ইহা 'পালাটিয়া' নামে খ্যাত। রূপ-কথার কাহিনী, কিংবদন্তীমূলক ও সামাজিক কাহিনী ইহাতে পরিবেশিত হয়। আঞ্চলিক সংলাপে ও পল্লীগীতির সুরে ইহা প্রযোজিত হয়। প্রধান গায়কের সঙ্গে দোহার ও বাদকগণ ইহাতে সহযোগিতা করেন। 'পুষ্পমালার পালা', 'বিন্দুমতীর পালা', 'সত্যসাবিত্রী-পালা' (সামাজিক) প্রভৃতি পালাটিয়ায় পরিবেশিত হয়। যোগেশ ঠাকুর রচিত 'সত্যসাবিত্রী পালা' জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রচলিত। সত্যসম্ভব জমিদার ও তাহার স্ত্রী সাবিত্রীকে অবলম্বন করিয়া ধর্মপরীক্ষামূলক একটি কাহিনী এই পালায় বিধৃত। পালাটিয়া পালায় সাধারণত 'মহান' (মন্ত্রতন্ত্র জানা সাধু বা ফকির জাতীয় চরিত্র) এবং 'দেউনিয়া' (প্রধান অর্থাৎ Leader) চরিত্র সংযোজিত হয়। পালাটিয়া পালা রূপসজ্জা, নাচ, গান ও সংলাপযোগে যাত্রার মত আসরে পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী নৃত্য, গীত ও সংলাপ সহযোগে পূর্ণ পালা অভিনয় করেন। এই শ্রেণীর পালাভিনয় 'পালাটিয়া-যাত্রা' নামে খ্যাত। ইহার প্রযোজনায় প্রথমত ঐকতান, দ্বিতীয়ত বন্দনাগীতি, তৃতীয়ত পালাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতেও ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, অন্যায়ের শাস্তি প্রভৃতি দেখান হয়। যাত্রার সঙ্গে যেমন ইহার মিল রহিয়াছে তেমন আবার পার্থক্যও রহিয়াছে। যাত্রায় সামাজিক ও কাল্পনিক পালার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পালাও অভিনীত হয়। কিন্তু পালাটিয়ায় ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় না। যাত্রার মত ইহাতে রাগ সঙ্গীতের সুরও আরোপিত হয় না। অনেক সময় পালাটিয়া কেবল একজন গায়ক কর্তৃক নৃত্য ও দোহার যোগেও পরিবেশিত হয়। জলপাইগুড়ি জিলার ধুপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও পাহাড়পুর অঞ্চলে পালাটিয়া

প্রচলিত। কুচবিহার জিলার দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও হলদিবাড়ি অঞ্চলেও ইহার প্রচলন রহিয়াছে। পালাটিয়ায় নীতিমূলক কাহিনী অবলম্বিত হইলে তাহাকে 'মান পালাটিয়া' এবং প্রেমমূলক কাহিনী অবলম্বিত হইলেও তাহাকে 'খাস পালাটিয়া' বলে।

লেটোর পালা

বীরভূম, বর্ধমান ও হাওড়া জিলায় লেটোর বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। লেটোতে নৃত্য, গীত ও হাস্যরসের বিশেষ প্রাধান্য। ইহাতে গ্রাম্যজীবনের ছোটখাটো ঘটনা আঞ্চলিক সংলাপে নাট্যাকারে পরিবেশিত হয়। লেটোর গান বাঁধা থাকে; কিন্তু নাট্যাংশের সংলাপ উপস্থিত বুদ্ধিমত বিভিন্ন চরিত্র প্রয়োগ করিয়া থাকে। গ্রামের অশিক্ষিত নিম্নসম্প্রদায়ের মধ্যে লেটো প্রচলিত বলিয়া দর্শক রুচি অনুযায়ী ইহার নৃত্যগীতে যথেষ্ট অশ্লীলতা থাকে। সাধারণত মেলা বা বাজারের মত জনসমাবেশ স্থলে দীর্ঘ সময় ধরিয়া লেটো পরিবেশিত হয়। লেটোর অভিনেতব্য অংশ অলিখিত লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে লেটো অনেকটা মার্জিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকসময় ছোট ছোট বাঁধাপালাও পরিবেশিত হইতেছে। ইহার নৃত্যগীতের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে। বর্তমানে হাওড়া জিলার আব্দুল মজিদের দল এবং বর্ধমান জিলার মেমারি-ভাণ্ডারবাটীর বড়কর্তার দল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে পেশাদার সংস্থারূপে লেটো পরিবেশন করিয়া থাকে।

ডক্টর সুকুমার সেনের একখানি [১]গ্রন্থে 'বিষম সমস্যা' নামক সাম্প্রতিক কালের ছোট একটি লেটোর পালা প্রকাশিত হইয়াছে। 'আকাশে কি নাই' —এইসমস্যার সমাধান অবলম্বনে পালাটি রচিত হইয়াছে।

কুশানযাত্রা

কুচবিহারজিলার দিনহাটা, মাতালহাট, মাথাভাঙ্গা, ভোগরামগুড়ি, বলরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রামায়ণের অন্তর্গত লবকুশের কাহিনী অবলম্বনে 'কুশান পালা গান' প্রচলিত আছে। বিষয়বস্তু রামায়ণ হইতে লইলেও ইহার ছড়া ও গানের ভাষা আঞ্চলিক এবং ইহা পূর্ণরূপে পল্লীসুরে পরিবেশিত হয়। এই পালাগানে মূল গায়কের সঙ্গে দোহার ও বাদকগণ থাকেন। ইহাতে নৃত্য সংযোজিত হইয়া থাকে। কুশানগানে কুচবিহারে প্রচলিত

১। নট নাট্য নাটক—কলিকাতা (১৯৬৫)

'বেনা' নামক একপ্রকার তারযন্ত্র ছড় দিয়া বাজানো হয়। বেনা ছাড়া কুশান গান হয় না যেমন 'কুপা বাঁশি' ছাড়া 'বিষহরা-গান' গীত হয় না। বংশখণ্ডে প্রস্তুত কুপা বাঁশি কুচবিহারে বিশেষ প্রচলিত। বেহুলালখিন্দর ও মনসার কাহিনী লইয়া আঞ্চলিক ভাষায় গীত বিষহরা এই জিলার একটি বিশিষ্ট পালাগান। ইহাতে কেবলমাত্র পল্লীসুর আরোপিত হয়। নাচও খোল বাজনার উপর 'বিষহরায়' বিশেষ জোর দেওয়া হয়। মূল গায়কের হাতে চামর থাকে, দোহারগণ সমবেতভাবে নাচিয়া ও গাহিয়া মূল গায়কের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। 'কুশানপালা' নাট্যাকারেও আসরে পরিবেশিত হয়। লবকুশের অভিনয় যাহারা করেন তাহারা সঙ্গীত কুশলী হইয়া থাকেন। নাটকাকারে প্রযোজিত কুশান পালা 'কুশান-যাত্রা' নামে অভিহিত হয়। ইহাতে রূপসজ্জা গ্রহণ করা হয়। ইহার সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা এবং গানে পল্লী প্রচলিত সুর সংযোজিত হইয়া থাকে। 'কুশান যাত্রায়' প্রথমে 'গুরু বাইজ' অর্থাৎ ঐকতান বাদিত হয়—খোল করতাল, হারমোনিয়াম ও 'বেনা' যন্ত্রের সাহায্যে। ইহার পরেই 'বন্দনাগীতি'। বন্দনাগীতির পরে মূলপালা আরম্ভ হয়। 'কুশানযাত্রায়' বীর, করুণ, হাস্য ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দীর্ঘসময় ধরিয়া কুশান যাত্রার অভিনয় চলে।

গুণাইযাত্রা

বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা জিলায় কৃষিজীবী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 'গুণাবিবির যাত্রা' প্রচলিত। পল্লী-যুবতী গুণাই ও তাহার প্রেমাস্পদ পল্লীযুবক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু যুবকের সঙ্গীতসম্পন্ন চাচা গুণাইর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া কৌশলে ভ্রাতুস্পুত্রকে দূরে সরাইয়া দিবার জন্য তাহার কারাবাসের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইয়া উঠেন। অর্থের জোরে কিছু গ্রামবাসী ও পুলিশের লোককে হাত করিয়া তিনি যুবককে মিথ্যা খুনের দায়ে হাজতে পাঠাইতে সক্ষম হইলেন। ইহার পর গুণাই দুঃখ কষ্টপূর্ণ নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া লুব্ধ চাচার কুনজর হইতে কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া চলে। পরিণামে যুবক মিথ্যাদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া গুণাইর সঙ্গে মিলিত হয়; চাচাকেও তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পল্লীপ্রচলিত এই কাহিনী লইয়া 'গুণাবিবির যাত্রা' লিখিত।

পল্লীর চলিত ভাষায় ইহার সংলাপ রচিত। পালায় সংলাপ অপেক্ষা নৃত্য ও গীতেরই প্রাধান্য,—সঙ্গীত ইহার প্রাণ। পালার গানগুলি পল্লীসুরে গীত হয়। কতগুলি গানের সঙ্গে দোহারগণ সহযোগিতা করেন। ইহাতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির মধ্যে থাকে দোতারা, বাঁশের বাঁশি, হারমোনিয়াম, খঞ্জনি, ঢোল ও করতালি। অভিনেতারা চরিত্রানুযায়ী রূপসজ্জা গ্রহণ করেন। পুরুষই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেন। খরচা বহনে সমর্থ-লোকের বাড়ীতে অথবা গ্রাম্য মেলায় 'গুণাবিবির যাত্রা' অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চারঘণ্টা ধরিয়া ইহার অভিনয় চলে।

জাগের গান

কুচবিহারের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে মদন-রতির উৎসব উপলক্ষে বসন্তকালে (সাধারণত চৈত্রমাসে) সমস্ত রাত্রি জাগিয়া 'জাগের গান' অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী গীতি ও কিছু কিছু গদ্য সংলাপ সহযোগে নাটকের আকারে পরিবেশিত হয়। রাধাকৃষ্ণের কাহিনীতে সাধারণত পুরানের অনুসরণ না করিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কীয় প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর অনুসরণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'কৃষ্ণের মাছধরা' পালার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব পালার কাহিনীতে প্রেমের উপাদান থাকে।

খনের গান

উত্তরবঙ্গের রংপুর ও দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে পল্লীর সাময়িক ঘটনা লইয়া ছোট ছোট পালার আকারে 'খনের গান' অনুষ্ঠিত হয়। এইসব নাটকীয় পালায় গানের প্রাধান্য থাকে। গীতি সংলাপও গদ্য সংলাপ দুই-ই ইহাতে সংযোজিত হয়।

গ্রামাঞ্চলের যাত্রা

বর্তমানে বাংলার গ্রামাঞ্চলে পেশাদারী-যাত্রায়-অভিনীত পালাভিনয়ের প্রতি ক্রমেই আকর্ষণ বাড়িতেছে। নিকটবর্তী সহর হইতে কখনো বা কলিকাতার যাত্রাপুস্তকালয় হইতে পালা ক্রয় করিয়া অবসর সময় গ্রামবাসীরা মহলা দিতে থাকে। ফসল উঠিবার পরে শীতের প্রারম্ভ হইতে ইহার অভিনয় সুরু হইয়া যায়। এই সব অভিনয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের লোক একত্রিত হইয়া এক একটি সংঘ গঠন করেন। সংঘগুলির এক একটি করিয়া নাম ও দেওয়া হয়। এই সব সংঘ কর্তৃক প্রতিবৎসর মহলা দেওয়া মুদ্রিত যাত্রা নাটকের

একাধিক সৌখিন অভিনয় সম্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জিলা সমাজ-শিক্ষাধিকারিকের মারফত এই শ্রেণীর সংঘকে এককালীন বাৎসরিক অর্থসাহায্য প্রদান করেন। কোন কোন সংস্থা কর্তৃক অভিনীত যাত্রা নাটক কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের পল্লীমঙ্গল আসরে প্রচার করিবার ব্যবস্থাও করা হয়। সুতরাং দুইদিক হইতে উৎসাহ পাওয়ায় পল্লীঅঞ্চলে সৌখিন যাত্রাসংস্থা ও অভিনয় সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ইহার ফলে পেশাদারী যাত্রাভিনয়ের সংখ্যা কমিয়া যায় নাই বরং বাড়িয়াছে। কলিকাতার পেশাদারী যাত্রা সম্প্রদায়ের অভিনয়কে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই অনুকরণে পল্লীসংস্থাগুলি মুদ্রিত যাত্রানাটক অভিনয় করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে মৌলিক পালা রচনার প্রতি পল্লী-বাসীর আর তেমন ঝোঁক নাই। কাজেই গ্রামবাসী কর্তৃক রচিত মৌলিক লোকনাট্যের অভিনয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

পুরুলিয়া জিলার গড়জয়পুর অঞ্চলে একটি মৌলিক লোকনাট্যের আসর-অভিনয় আমরা দেখিয়াছি। ইহা সামাজিক নাটক, নাম 'ভাশুরার দ্বিরাগমন'। ইহার উপস্থাপনায় প্রচলিই যাত্রার আদর্শ ক্রিয়াশীল। প্রথমেই সমবেত বাজনা; তারপরে গণেশ বন্দনা। এই বন্দনাগানে ধুয়াব ব্যবহার আছে। ইহা টিমার কর্তৃক রচিত ঐ অঞ্চলের একটি প্রচলিত গণেশ বন্দনা-গীতি। বন্দনার পরে প্রস্তাবনায় পালার মূল বিষয়ের কথা জানাইয়া দেওয়া হয়। প্রস্তাবনার শেষে পালা আরম্ভ করা হয়। পালায় আঞ্চলিক ঝুমুর গান ও নাচ্‌নী নাচ প্রযোজিত হয়। নাচ্‌নী-নাচ-গানে একজন নাচ্‌নী (নিম্নশ্রেণীর নৃত্যগীত-কারিণী স্ত্রীলোক, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক বিশেষ বিশেষ পুরুষের অধীনে পালিত হয়) অংশগ্রহণ করে। অভিনয়ে নর-নারী উভয়প্রকার ভূমিকায় পুরুষরাই অংশ গ্রহণ করেন। আসরে যন্ত্রাদির মধ্যে ঢোল, মাদল, হারমোনিয়াম, বাঁশের বাঁশি ও করতালি ব্যবহৃত হয়। পালা ছোট বলিয়া ইহার অভিনয়ে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কখনো কখনো ইহার সঙ্গে আরো নাচ গান জুড়িয়া অভিনয়-কাল দীর্ঘকরা হইয়া থাকে।

ঐকতান বাদন, বন্দনাগীতি, প্রস্তাবনা, পালার মাঝে একক বা দ্বৈত নৃত্যের সংযোজনা · লোকনাট্যের প্রচলিত রীতি। আলোচিত যাত্রা পালাগুলি হইতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। 'ভাশুরার দ্বিরাগমন' লোকনাট্যে ও উল্লিখিত রীতি গৃহীত হইয়াছে। পুরুলিয়ার কুর্মীসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ভাষা অবলম্বনে এই পালার সংলাপ রচিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুও

পুরুলিয়ার পল্লীসমাজের এক অংশ হইতে আহরণ করা হইয়াছে। পালার চরিত্র সংখ্যা নয়টি—'গবরা' (গাঁয়ের লোক), 'সুন্দরী' (গবরার স্ত্রী), 'পিরী' (গবরার বিটি), 'ভান্তরা' (গবরার জামাই), 'পুরহুত' (গাঁয়ের পুরোহিত), 'লম্বোদরা' (উকিল), 'সিষ্টিধরা' (পুলিশ), 'হর‍্যা' (পেয়াদা) ও 'নাচ্‌নী'। গবরার কন্যা পিরীর বিবাহ হইয়াছে দশ বৎসর পূর্বে। এতদিনে পিরী বড় হইয়াছে। তাহার স্বামী ভান্তরা তাহাকে দ্বিরাগমন করাইয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে একহাঁড়ি গুড়পিঠা ছিল। ভান্তরা একজন বোকা সাধারণ চাষী। পথিমধ্যে তাহার হাঁড়িটি বেহাত হইয়া যায়। তাই শুধুহাতে শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইতে সে বাধ্য হয়। সঙ্গতিসম্পন্ন গবরার ইচ্ছা ভান্তরাকে কিছু লেখা পড়া শিখাইয়া ঘরজামাই করিয়া রাখে। কিন্তু ভান্তরা ইহাতে অস্বীকৃত, গবরাও মূর্খ চাষীর সঙ্গে কন্যা পাঠাইতে নারাজ। ভান্তরা স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া 'সাঙ্গা' করিবার ভয় দেখায়। কিন্তু ইহাতেও ব্যর্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ ভান্তরা আদালতের সাহায্যে স্ত্রী পিরীকে উদ্ধার করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত পালার কাহিনীতে পুরুলিয়া জিলার গ্রামাঞ্চলের নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অল্পবয়সে বিবাহ, ঘরজামাই রাখা, সাঙ্গাকরা, বিঘ্ননাশ করিবার জন্য স্বস্ত্যয়নাদিতে পাঁঠা ও পাঁঠী উৎসর্গ করা, পুরোহিতরা মূর্খ ও ব্যবসাদার হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের নির্দেশ মানিয়া চলা ও প্রণামী দেওয়া, কোষ্ঠীতে বিশ্বাস, বাসিভাত খাওয়া, কুটুমবাড়ি যাইবার সময় মিষ্ট দ্রব্যাদি সঙ্গে লওয়া, স্ত্রীর উদ্ধারকল্পে অদালতের সাহায্য গ্রহণ করা প্রভৃতি বহু রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিরাকল্ ও মর‍্যালিটি প্লে

যাত্রা প্রসঙ্গে Miracle ও Morality Play-র কথা উত্থাপিত হইতে পারে। 'Quem quoeritis (whom seek ye)' অর্থাৎ তিনজন খ্রীষ্টভক্ত কর্তৃক ন্যাজারেথ-এর ক্রুশবিদ্ধ [1]যীশুকে খুঁজিবার বিষয়টি অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে খ্রীষ্টোৎসবে গীর্জাপ্রাঙ্গণে Liturgical Play-র সূচনা হয়। [2]যীশুর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ভক্তদের সম্মুখে বাস্তবরূপে তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে গীর্জার ক্যাথলিক যাজকগণ এই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। প্রথমে এই সব অভিনয়ে [3]খ্রীষ্ট-পুরোহিতগণই অংশ গ্রহণ করিতেন।

Easter, Christmas-এর মত বড় বড় ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে Liturgical play অভিনীত হইতে থাকে। ইহাই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া [4]চতুর্দশ শতকে সৃষ্টির আদি হইতে বিচারের দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা সংযোগে cycles of playতে রূপান্তরিত হয়, ইহার সঙ্গে উপকথা ও খ্রীষ্টভক্ত সাধুসন্তের কথাও সংযুক্ত হইত। ইংলণ্ডের পূর্বাঞ্চলে cycle play-র খুব প্রচলন ছিল।

---

1. The Angels chanted : Whom seek ye in the sepulchre, O followers of Christ ? and the women or Marys responded that they had come in search of "Jesus of Nazareth, who was crucified," Thereupon the angels informed them that he was not here but had risen as he had foretold, and commanded them to "Go and announce that he is risen from the sepulchre". PP. 141—142

Masters of the Drama—J. Gassner (U. S. A. 1954)

2. Finding its basis in the symbolic nature of the service of the Mass, this new drama developed out of a desire on the part of the clergy to place the salient facts of Christ's life more realistically before their congregations.

P. 49, The Development of the Theatre,—A. Nicoll (Lond.), 1966

3. The earliest form of the Easter play in a piece of four-lined dialogue in which a couple of priests, arraying themselves in white as angels are confronted by two other priests whose robes show that they are women.

P—49. Ibid

4. By the fourteenth century we have the evolution of complete cycles of plays, covering the history of the world from the Creation to the Day of Judgement, and there is a common tendency to incorporate into them material from legend and the saints' lives. P. 62. A History of English Literature—E. Albert (Lond. 1962)

cycle play-র মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ cycle-এর সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারা হইতেছে 'chester cycle', 'york cycle' এবং 'Wakefield cycle'; Liturgical play-তে সাধু-সন্তর জীবন-উপাদানযুক্ত হওয়ায় ইহা দুইটি ধারায় পরিণত হয়। একটি উক্ত উপাদানহীন Mystery play এবং অন্যটি ঐ উপাদানযুক্ত [1]Miracle play। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে মধ্যযুগের এই দুই ধারা ইংলণ্ডে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হইত না। [2]Mystery নামটি ঐ শতকের পূর্বে ইংলণ্ডে প্রচলিত হয় নাই, বাহিরে অভিনীত সমস্ত Liturgical play-ই তখন সম্ভবত Miracle নামে অভিহিত হইত। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে মানসিক বৃত্তি সমূহের রূপক চরিত্র লইয়া নীতি-কেন্দ্রিক নাটক আর একটি ধারায় শাখায়িত হয়,—ইহাই Morality play; Miracle ও Morality play-র উৎসানুসন্ধান করিতে হইবে খ্রীষ্টোৎসবে। উৎপত্তির দিক হইতে যাত্রার সঙ্গে ইহাদের কিছু ঐক্য রহিয়াছে। যাত্রার সূচনাও ধর্মোৎসব হইতে। যাত্রার মত মিরাকল ও মর্যালিটি পালার উৎপত্তিতে সংগীতের স্থান ছিল মুখ্য। ধর্মগ্রন্থের জবাব-মূলক গীতির (antiphonal liturgical singing) মধ্যে এই সংগীতের পরিচয় রহিয়াছে।

মিরাকল ও মর্যালিটি পালার সঙ্গে যাত্রাপালার কিছু কিছু সাদৃশ্য ও বৈদৃশ্য রহিয়াছে। (ক) মিরাকল পালা ছোট ছোট; ইহাতে কখনও দৃশ্যবিভাগ থাকিত, কখনো বা থাকিত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'Noah's Flood' (Chester cycle) পালায় দৃশ্য বিভাগ নাই; 'The Fall of Man' (york cycle) পালা নরক (Hell) ও স্বর্গ (Paradise) এই দুইটি দৃশ্যে বিভক্ত। 'Herod the Great (Wakefield cycle) পালায় তিনটি দৃশ্য রহিয়াছে। উনিশ শতকের যাত্রায় দৃশ্য বিভাগহীন পালা এবং অংকদৃশ্য বিভাগযুক্ত পালা দুইয়েরই পরিচয় রহিয়াছে। মতিলাল রায়ের 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' (১৮৮৬, তৃতীয় সংস্করণ) পালাটি অংক বা দৃশ্যে বিভক্ত নহে। মাঝে মাঝে ইহাতে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ

1. It has long been the fashion to call the Biblical plays "msyteries" and those dealing with saints' lives "Miracles". P. 62. A History of English Literature—E. Albert (Lond. 1962)

2. We hear no play being called a "mystery" in England before the eighteenth century and seems probable that all out-of-door liturgical dramas in this country were known as miracles. P. 62 Ibid.

প্রস্থান উল্লিখিত হইয়াছে। কবিচন্দ্র প্রণীত শিশুবোধকের একটি উপাখ্যান অবলম্বনে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দাতাকর্ণ' (১৮৯৭) পালাটি অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভাগ করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর যাত্রা নাটক অংকদৃশ্যাদিতে বিভক্ত। (খ) মিরাকল প্লের সংলাপ পদ্যবন্ধে রচিত; 'Herod the Great' হইতে ইহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,—

Messenger—Most mighty Mahoun meng you with Mirth
Both of burgh and of town, by fells and by firth,
Both king with crown and barons of birth,
That radly will rown, many great grith
Shall behap :
Take tenderly intent
What sonds are sent,
Else harms shall ye hent,
And loaths you to lap. lines 1-9
Herod, the hend king—by grace of Mahoun
Of Jewry, surmounting sternly with crown
On life that are living in tower and in town,
Gracious you greeting, commands you be boun
At this bidding.
Love him with lewty ;
Dread him, that doughty !
He charges you be ready
Lowly at his liking. Lines 10-18
...............(Enter Herod)
Hail, lief lord ! Lo, thy letters have I laid ,
I have done I could do, and place have I prayed ;
Mickle more thereto openly displayed.
But rumour is raised so, that boldly they brade
Among them :
They carp of a king ;
They cease not such chattering 73-79

Herod—But I shall tame their talking,
And let them go hang them.
Stint, brodeles, your din—yea, everyone !
Lines 80-83
(Scene I—Before Herod's palace)

কিন্তু বাংলা গদ্য প্রচলনের পরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যে সকল যাত্রা পালা আমরা পাইয়াছি তাহাতে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ সংলাপের পরিচয় রহিয়াছে। (গ) মর‍্যালিটি প্লেতে মাঝে মাঝে অনুপ্রাসের ব্যবহার লক্ষিত হয়। উদ্ধৃত অংশেও হইার আভাস রহিয়াছে। উনবিংশ শতকের যাত্রাগানে ইহার বিশেষ ব্যবহার ছিল। গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রমুখের যাত্রা পালার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বিংশ শতকেও মতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ পালাকারগণের যাত্রাসঙ্গীতে অনুপ্রাসের পরিচয় রহিয়াছে। (ঘ) [1] বাইবেল ধর্মগ্রন্থের যে সকল প্রধান ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে মধ্যযুগের জনমানসে বিশেষ ধারণা ছিল সেইসব ঘটনা ও চরিত্র মির‍্যাকল প্লেতে স্থান পাইত। যাত্রায়ও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং চরিত্র চয়ন করিয়া পৌরাণিক পালা রচনা করা হইত। এই সকল পালার প্রধান প্রধান চরিত্র সম্পর্কে গণচিত্তে দীর্ঘকালসঞ্চিত ধারণা ছিল। নাট্যকারগণ তাহাকেই প্রাধান্য দিয়া রসসৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেন। একই বিষয় লইয়া বিভিন্ন রচয়িতা পালা রচনা করিয়া থাকেন। মির‍্যাকল প্লে-তে যেমন ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়, যাত্রাপালায়ও তেমনি ইহার অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়। এই দিক হইতে মির‍্যাকল প্লে ও প্রাচীন যাত্রাকে communal রচনা বলা যায়। (ঙ) [2]একটি ধর্মভাব অবলম্বনে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তুলিবার এবং নাগরিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে মির‍্যাকল প্লে রচিত হইত। এই প্রসঙ্গে chester cycle-এর উল্লেখ করা যায়। জনচিত্তে ভক্তি ও

---

1. "Select the leading facts of the scheme of Salvation, the Incarnation, Crucifixion, and Resurrection—and only those Old Testament episodes which to the medieval mind typified and prefigured them." P. IX Introduction to "Everyman And Medieval Miracle plays"—By A. C. Cawley (Lond. 1956)

1. "For as much as old time, not only for augmentation of the holy and Catholic faith of our Saviour, Jesu Christ and to exhort the minds of the common people to good devotion and holesome doctrine thereof, but also for the common wealth and prosperity of the city, a play and declaration of divers stories of the Bible, beginning with the Creation and Fall of Lucifer, and ending with the general judgment of the world, to be declared and played in the whitsun week......" P. IX. Introduction to 'Everyman And Medieval Miracle plays"—Opinion of William Newhall about Chester plays.

ধর্মবিশ্বাস উৎপাদন করা ও ধর্মীয় তত্ত্বের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়া মিরাকল প্লের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। যাত্রাপালারও মূল লক্ষ্য ছিল দর্শকচিত্তে ভক্তি ও ধর্মভাব জাগরিত করা। (চ) মিরাকল প্লে ও যাত্রায় অলৌকিক শক্তির স্থান রহিয়াছে। (ছ) যাত্রা পালায় জনরুচি অনুযায়ী হাস্যরসের জন্য চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। মিরাকল পালায়ও হাস্যরসের জন্য জনপ্রিয় চরিত্রের (popular comic role) অবতারণা করা হইত। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য হাস্যরসের চরিত্রের সঙ্গে Herod, Pilate, Pharaoh প্রভৃতি চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। (জ) অনেক সময় মিরাকল পালা [1]দ্বিতল গাড়িতে (two-decked cart or pageant) অভিনীত হইত। এই pageant-এর একতলায় একটি সাজঘর থাকিত; এই ঘরটি অভিনয়ের সময় নরকরূপেও ব্যবহৃত হইত। গাড়ির খোলা দ্বিতলে অভিনয় অনুষ্ঠিত হইত। যাত্রায় এই ধরণের অভিনয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। (ঝ) মধ্যযুগের এইসব পালার বিভিন্ন অংশ [2]পৃথক পৃথক মঞ্চে (Separately erected settings or mansions) ও মঞ্চের সম্মুখে অভিনীত হইত। অনেক সময় এইসব অভিনয়ে মঞ্চ-মায়া (Stage effects) সৃষ্টির ব্যাপক প্রচেষ্টা থাকিত। এই প্রসঙ্গে The Mystery of the Passion (১৫০১খ্রীঃ Mons-এ প্রযোজিত) পালার [3]মঞ্চ-মায়ার কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যাত্রায় এই রীতি

1. ···Each episode was performed on a two-decked cart or pageant. This pageant consisted of one enclosed room, which served both as Hell and a tiring room, and a second storey open to the sky, on which the action was performed. P. 63. A History of English Literature-E. Albert (Lond. 1962)

2. The plays followed the same tradition of the earlier church performances by having separately erected settings for each scene. P.34, The Theatre Through the Ages—James cleaver (Lond. 1948)

3. The stage directions for the Mons performance show the elaborateness of the stage effects. Besides mechanical animals, trapdoors, an oven that actually baked bread, 'Soft batons' to beat Jesus, a 'small boat to put in the water', and water brought 'from the river to be used as the sea on the stage', the scirpt includes these instructions regarding spectacular effects :

Joseph and Mary holding Jesus in her arms must pass before a temple and as soon as they pass, the idols fall to the ground. 'At this point' give a signal to the deputies working the secret of the deluge to let the water come.

There must be much light in Limbo and great brilliance and melody, and divinity, like a soul, covered with a tent of gauze must appear with two angels. Then a great sound is heard an the Holy Ghost descends in the form of Tounges of fire. P. 62—The Living Stage, K. Macgowan & W. Melnitz (U. S. A.—1965)

অপ্রচলিত। (ঞ) ইউরোপের কোন কোন স্থানে মধ্যযুগীয় অভিনয়ে [1]নারী অংশ গ্রহণ করিতেন। যাত্রায় এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে (১৮৪৯)।

মর‍্যালিটি পালায়—(ক) [2]পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ক্ষমা, জ্ঞান, সৎকর্ম শক্তি, সৌন্দর্য, বিজ্ঞতা, রসিকতা প্রভৃতি মানুষের বিভিন্ন গুণবাচক বৃত্তিকে রূপক চরিত্র করিয়া উপস্থাপিত করা হয়। এই চরিত্রগুলির মধ্যে আবার [3]ন্যায়পরতা, করুণা, ঔদারিকতা এবং পাপ-এর সংযোজনা প্রায় সমস্ত নাটকেই দেখা যায়। এই শ্রেণীর চরিত্র একমুখী ; ইহাদের মধ্যে জটিলতা থাকে না। যাত্রানাটকেও এই শ্রেণীর জটিলতাহীন একমুখী রূপক চরিত্র থাকে। বিবেক সুমতি, কুমতি, মোহ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, তৃষ্ণা প্রভৃতি চরিত্রে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রায় অন্যবিধ বহু চরিত্রের মধ্যে কিছু রূপক চরিত্রের অবতারণা করা হয়। কিন্তু মর‍্যালিটি পালায় God, Angel প্রভৃতি স্বল্প কয়েকটি চরিত্র বাদে প্রায় সকল চরিত্রই রূপক। 'Everyman' পালা হইতে এই শ্রেণীর রূপক চরিত্রের নমুনা উদ্ধার করা যাইতেছে,—

(Everyman comes to his grave)

Everyman – Why, Discretion will ye forsake me ? Lines 833
Discretion--Yea, in faith, I will go from thee,
For when Strength goeth before
I follow after evermore.
Everyman--Yet, I pray thee, for the love of Trinity.
Look in my grave once piteously.
Discretion--Nay, So nigh will I not come
Farewell everyone ! (Exit Discretion)
Everyman—O, all thing faileth, save God alone
Beauty, Strength, and Discretion ;

---

1. On the continent, however, women took part in the miracle plays from time to time, and at Metz in 1468 a young amateur actress appeared as St Catherine, and had a large number of lines to speak. P. 87. Theatre Through the Ages—J. Cleaver (Lond. 1948)

2. In the moralities all the persons introduced upon the stage are abstract figures, most of them representing vices and virtues. P. 164 World Drama—A. Nicoll (London—1964)

3. Abstractions such as justice, Mercy, Gluttony, and Vice were among the commonest characters. P. 66. A History of English Literature—E. Albert (Lond. 1962)

For when Death bloweth his blast,
They all run from me full fast.
Five-Wits—Everyman, my leave now of thee I take ;
I will follow the other, for here I thee forsake.
Everyman—Alas then may I wail and weep,
For I took you for my best friend.
Five-Wits—I will no longer thee keep ;
Now farewell, and there an end.
Everyman—O Jesu, help, all hath forsaken me !
Good-Deeds—Nay, Everyman, I will bide with thee,
I will not forsake thee indeed ,
Thou shalt find me a good friend at need.
Everyman—Gramercy, Good-Deeds ; now may I true friends see ,
They have forsaken me everyone ,
I loved them better than my Good-Deeds alone
Knowledge, will ye forsake me also ?
Knowledge—Yea, Everyman, when ye to death do go ;
But not yet for no manner of Danger.
Everyman—Gramercy, Knowledge, will all my heart.

Lines 861

(Everyman—About 1490)

(খ) মর‍্যালিটি পালায় অনেক সময় দৃশ্যাদি বিভাগ থাকে না। মাঝে মাঝে ঘটনা-স্থানের উল্লেখ করিয়া একটানা পালা রচিত হয়। উল্লিখিত Evnryman পালায় কোন প্রকার দৃশ্যাদি বিভাগ নাই। দৃশ্যাদি বিভাগহীন ও দৃশ্যাদি বিভাগযুক্ত যাত্রা পালাও রহিয়াছে। (গ) লোক-শিক্ষা যাত্রার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কাজেই ইহাতে নানা প্রকার উপদেশের ব্যবস্থা থাকে। মর‍্যালিটি পালার মধ্য দিয়াও ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশ দান করা হয়। Everyman পালার শেষ সংলাপ হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

(Enter Doctor)

Doctor—And remember Beauty, Five-Wits, Strength and Discretion,
They all at the last do everyman forsake,
Save his Good Deeds there doth he take.

অপেরা প্রসঙ্গ

যাত্রার গীতাভিনয়ের সংগে অপেরার (Opera) প্রভেদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রচনারীতি ও প্রয়োগের দিক হইতে যে কেবল ইহাদের মধ্যে পার্থক্য তাহাই নহে, ইহাদের রঙ্গস্থলও বিভিন্ন প্রকারের। যাত্রার গীতাভিনয় খোলা আসরে অভিনীত হয়। পাশ্চাত্ত্যে এ জাতীয় সহজ প্রযোজনার অভিনয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় Interlude play-তে, অপেরায় নহে,—[1]"And, finally, this simplification can be seen in its extremest form in the indoor presentation of some of the early interludes, when the players peform at one end of a hall, sometimes entering by whatever door or doors may be available, sometime pressing their way through the little crowed of spectators watching their display."

অপেরা একক গীতি, দ্বৈতগীতি, সমবেত গান, নৃত্য, ব্যালে-নাচ, আবৃত্তি, সংলাপ, মূক অভিনয়, সহযোগী সংগীত, আলোর খেলা, পোষাকের জৌলুষ, দৃশ্যাদির আকর্ষণ লইয়া এক শ্রেণীর জাঁকজমকপূর্ণ সংগীতাত্মক নাট্যানুষ্ঠান। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানে মূলত সংগীত সহযোগে নাটকীয় গল্পই পরিবেশন করা হয়। এ সম্পর্কে George Martin-এর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে—[2]"Opera set out merely to tell a dramatic story about persons in terms of music."—। নরকে Orfeo কর্তৃক Euridie এর অনুসন্ধানের কাহিনী লইয়া ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে Angelo Poliziano 'Orfeo' (The Fable of Orpheus) নামে একটি পালা ইটালীর মন্টুয়াতে প্রযোজনা করেন। এই নাট্যানুষ্ঠান হইতেই অপেরার সূচনা।

ষোড়শ শতকের শেষে আবিষ্কৃত হয় যে আদিতে গ্রীক নাটক সম্পূর্ণভাবে সংগীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হইত। এই সুপ্রাচীন রীতির অনুসরণে ভেনিস সহরে একটি ট্র্যাজেডি নাটক ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রযোজিত হয়। এই নাটকের চরিত্রগুলি কখনও একক, কখনও বা সমবেত ভাবে গানের মাধ্যমে বক্তব্য পরিবেশন করে। ইটালীতে তৎকালে এই শ্রেণীর নাটক খুব জনপ্রিয় হয়। ইহার ফলে প্রয়োগ কর্তাদের অপেরা প্রযোজনার প্রয়াস বাড়িয়া যায়। এই

1. The Development of the Theatre—P. 68, A. Nicoll (Lond. 1966)
2. Opera Companion—p. 111.—George Martin (Lond. 1962)

সময়ে অভিজাত Giovanni Bardi-র (Count of Vernio) সভাপতিত্বে ফ্লোরেন্স-এর কয়েকজন গুণী লইয়া একটি কবি-চক্র গড়িয়া উঠে। ক্লাসিকাল সাহিত্য চর্চার সঙ্গে গীতি-নাট্য (music-drama) প্রবর্তনের প্রতিও এই চক্রের দৃষ্টি ছিল। এই কবি-চক্রের সদস্যদের প্রচেষ্টায় ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'Dafne' নাটকের প্রয়োগ হইতে প্রকৃত অপেরা আত্মপ্রকাশ করে। এই অপেরার কথা-অংশ (Libretto) প্রস্তুত করেন চক্রের সদস্য Ottavio Rinuccini এবং সংগীত রচনা করেন অন্যতম সদস্য Jacopo Peri। ইহার পরে পেরি 'Euridice' এবং কবি-চক্রের আর একজন সদস্য Giulio Caccini 'The Rope of Cephalus' নামক অপেরা প্রয়োগ করেন। এইভাবে ক্লাসিকাল পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে তৎকালে ইটালীতে অপেরা অভিনীত হইতে থাকে। অপেরা নাট্য প্রয়োগে কবি-চক্রের সদস্যরা কাব্যাংশ ও সংগীতের সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।

পরবর্তী অপেরায় Libretto অংশের গুরুত্ব কমিতে সুরু করে। এবং সংগীতাংশের প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। কাব্যাংশ অপেক্ষা সংগীতাংশের প্রাধান্য নিশ্চিত করিয়া Claudio Monteverde (১৫৬৭-১৬৪৩ খ্রীঃ) মণ্টুয়ার কোর্ট থিয়েটারে ১৬০৭-১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'Orfeo' এবং 'Arianna' পালা দুটি প্রয়োগ করিয়া অপেরার নূতন রীতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরে এই রীতির অপেরা ইটালীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে, এবং অপেরা অভিনয়ের জন্য Venice সহরে ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সাধারণ Opera-house প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা বিষয়ে মঞ্চে যন্ত্রের ব্যবহার, দৃশ্যাদির জন্য বিরাট-বিশাল কাঠামো রচনা, দৃশ্যের চমৎকারিত্ব, পোশাকের জৌলুষ, মধুর-মনোহারী সংগীত পরিবেশন প্রভৃতি অবলম্বনে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীয় অপেরার জয়জয়কার হইল। ক্রমে ইটালী হইতে অপেরা ফরাসী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

অপেরায় প্রথমে দীর্ঘ আবৃত্তি (Long recitative) থাকিত এবং ইহার কাব্য সৌন্দর্য যাহাতে কোনক্রমে নষ্ট না হয় তাহার জন্য এই আবৃত্তির সঙ্গে দুই-তিনটি যন্ত্রের সাহায্যে সহযোগিতা করা হইত। ষোড়শ শতকের শেষে (১৫৯৭ খ্রীঃ) কবি-চক্র ফ্লোরেন্স-এ এই জাতীয় অপেরার প্রচলন করেন। ফ্লোরেন্সে এই আবৃত্তি-সঙ্গীতমূলক নাট্যানুষ্ঠানের (Florentine recitative musical performance) পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন বিভিন্ন রাজপুরুষেরা এবং

রাজার অধীনস্থ চিত্রী, সঙ্গীতজ্ঞ, মঞ্চশিল্পীরা ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। রোম মণ্টুয়া প্রভৃতি দেশের রাজপরিবারের উৎসব উপলক্ষে এইসব অপেরা অভিনীত হইত। গ্রীক পুরাণ কাহিনী ও ধর্মীয় ভাব ছিল ইহাদের অবলম্বন। এই সময়ের অপেরায় চরিত্র সৃষ্টির প্রতি নজর দেওয়া হইত না।

রোমে চার্চের প্রভাব অধিক হওয়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেরায় নূতনত্বের প্রবর্তন সম্ভব হয় নাই। ভেনিসের অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির প্রভাবে ধর্মীয় ভাবের গল্প ছাড়াও অন্যান্য ভাবের গল্প লইয়া সেখানে অপেরা নাট্য প্রযোজনা সম্ভব হয়। ভেনিসের অপেরায় চরিত্র সৃষ্টি ও নাটকীয়তার প্রতিও প্রয়োগ-কর্তাদের দৃষ্টি পড়ে। আবৃত্তি অংশের স্থলে ক্রমে গানের প্রাধান্য ঘটে। নৃত্যশিল্পীরা যুদ্ধাদিতে বাস্তবের মূক-অনুকরণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সংগীতের দিক হইতে মণ্টেভার্দি স্বর-কম্পনের (tremolo effect) উপর জোর দেন এবং ছড়ী দিয়া বাজাইবার (bow) যন্ত্রের পরিবর্তে আঙ্গুল দিয়া টানিয়া বাজাইবার (pluck) যন্ত্রের সাহায্যে নানাপ্রকার effect সৃষ্টি করিবার রীতি প্রবর্তন করেন। ভেনিসে প্রবর্তিত এই রীতির অপেরাই বর্তমানকালের অপেরার মূল ভিত্তি।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ইটালী হইতেই ফরাসী দেশে অপেরা আসে। ফরাসীতে প্রথমে রাজকীয় অনুষ্ঠান রূপে অপেরা অভিনীত হইত। Louis XIV (১৬৪৩—১৭১৫খ্রী) গান অপেক্ষা নাচবেশি পছন্দ করিতেন বলিয়া ফরাসীর অপেরায় ব্যালে নাচ প্রাধান্য পাইতে থাকে। ফরাসীর অধিবাসীদের দৃশ্যসজ্জার প্রতি আকর্ষণ অধিক। কাজেই ফরাসীতে নানা ধরণের বড় বড় চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করিয়া এক একটি অপেরা প্রযোজিত হইত। জর্জ মার্টিনের ভাষায় ফরাসীতে অপেরার সংজ্ঞা হয়—[1]"A play in verse set to music and song and accompanied by dances, machines and decorations". Louis XIV এই অপেরার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। প্যারী নগরে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম opera-house প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের সর্বত্র অপেরা সমাদৃত হয় এবং বিভিন্ন দেশের বড় বড় শহরে opera-house গড়িয়া উঠে। Naples-এ এই শতকে দুই শ্রেণীর অপেরা প্রচলিত হয়—(ক) Opera Seria (খ) Opera Buffa। প্রথম শ্রেণীর অপেরাতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু গৃহীত হয়।

1. Opera Companion—George Martin (Lond. 1962)

এই অপেরা ব্যয়বহুল। ইহাতে দৃশ্যাবলীর খুব আকর্ষণ, সংগীতের আকর্ষণ তাহা হইতেও বেশি। এই অপেরায় ত্রি-বিভাগ সমন্বিত গীতি পরিবেশন করিত খোজা গায়ক (Castrato)। প্রত্যেক দৃশ্যেই খোজাদের গান থাকিত; এই শ্রেণীর অপেরার ইহা একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এই অপেরার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়। ইহার পাশাপাশি Opera Buffa অভিনীত হইতে আরম্ভ করে। Opera Buffa Opera Seria অনুষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। কৃষক-সমাজ ও মধ্যবিত্ত-সমাজের দৈনন্দিন জীবন-কাহিনী লইয়া হাস্যরসাত্মক Opera Buffa রচিত হয়। কাজেই G. Federico রচিত কথা অংশ এবং G. B. Pergolesi রচিত সংগীত অংশ অবলম্বনে রচিত 'The Maid the Mistress' (১৭৩৩) অপেরা নাট্য এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য Opera Buffa সাধারণ দর্শকদের মধ্যে অধিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই অপেরা পরিবেশনের জন্য ক্রমে ক্রমে ভ্রাম্যমাণ দল গঠিত হয়, এই সব দল ইউরোপের নানা স্থানে Opera Buffa প্রযোজনা করিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। ইহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে comic-opera প্রচলিত হয়। আবার এই শতকেই Charels VI-এর রাজত্বে (১৭১১—১৭৪০ খ্রীঃ) ভিয়েনায় Baroque Opera প্রবর্তিত হয়। Baroque এক শ্রেণীর Stylized অপেরা—ইহাতে অত্যধিক ব্যয়বহুল দৃশ্যরচনা ও যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বিত হয়। ইহার কাহিনী পরিকল্পনায় হাস্যরসাত্মক Grotesque-এর সম্পর্ক আছে। এই শতকে ইংলণ্ডে Ballad Opera প্রচলিত হয়। এই অপেরায় সংলাপ, গান ও সাধারণ ভাবে সংগীত প্রযুক্ত হয়। John Gay প্রযোজিত 'The Beggar's Opera (১৭২৮) এই শ্রেণীভুক্ত। ইংলণ্ডে উনিশ শতকে অপেরা জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং Covent Garden-এ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী Opera-house প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশ হইতে Hector Berlioz ইংলণ্ডে অপেরা প্রযোজনা করিতে আসেন। অপেরার আদিক্ষেত্র ইটালীর Monteverde (সপ্তদশ শতক), Pietro Metastasio (অষ্টাদশ শতক), Rossini (উনবিংশ শতক), Leoncavello (বিংশ শতক), ইংলণ্ডের G. F. Handel (অষ্টাদশ শতক—জার্মানীর অধিবাসী), জার্মানীর Mozart (অষ্টাদশ শতক), Richard Wagner (উনবিংশ শতক), ফরাসীর Berlioz এবং Mayerbeer (উনবিংশ শতক) পাশ্চাত্ত্যের অপেরা জগতের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব।

অপেরা প্রসঙ্গে Ballet-র কথা উঠিতে পারে। ব্যালে সম্পর্কে George Balanchine-এর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে—[1]"What ballet does is to take movements we're all familiar with—running and jumping, turning and balancing, lifting and holding—and mold attitudes that underlie these actions into a spectacle that entertains". ব্যালে তিন প্রকার—(ক) Story ballet (খ) Mood ballet (গ) Pure movement ballet ; Pure movement ব্যালেতে কেবল shirts ও tights ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে সঞ্চালিত অঙ্গভঙ্গি স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ইহাতে গল্প বা মুড থাকে না, দৃশ্যাদিরও প্রয়োজন হয় না। ইহাকে acrobatic show বলা চলে। Effect সৃষ্টির জন্য, নাটককে উচ্চগ্রামে তুলিয়া দিবার জন্য অথবা নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতির জন্য অপেরায় যে কোন প্রকারের ব্যালে সংযোজিত হইতে পারে। সাধারণত নৃত্যশিল্পীরা যখন গায়কদের সঙ্গে নির্বাক অভিনয় করেন অথবা অতিথি আপ্যায়নের জন্য যখন কোন চরিত্র কর্তৃক party দেওয়া হয় তখন ব্যালের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। আবার স্বস্তির জন্যও অপেরায় দুই অঙ্কের মাঝে প্রমোদজনক 'divertissement' ব্যালে প্রযোজিত হয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের অপেরা প্রযোজিত হইয়া আসিতেছে। Opera Seria, Opera, Buffa, Ballad Opera, Baroque Opera-র কথা আগেই বলা হইয়াছে। পোড়া কর্ক দিয়া মুখে কালো রং করিয়া চারণগণ চার্চে এক ধরণের অভিনয় করিতেন ; ইহাকে বলা হইতে Cork-Opera। উনিশ শতকে জমকাল দৃশ্য ও অতিরিক্ত gesture প্রয়োগ করিয়া নানা ধরণের পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ পূর্বক ফরাসী দেশে Mayerbeer Grand Opera প্রবর্তিত করেন। ফরাসী বিদ্রোহের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দেশে Rescue-Opera প্রচলিত হয়। এই অপেরায় নায়ক বা নায়িকা বিশেষ কোন সদ্‌গুণের জন্য villain কৃত সর্বনাশের হাত হইতে শেষ পর্যন্ত মুক্তিলাভ করে। Ludwig Von Beethoven-এর 'Fidelio' (1805) এই শ্রেণীর অপেরার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিংশ শতকে ইটালীতে Leoncavello

---

1. Complete Stories of the Great Ballets—George Balanchine (New York, 1954)

বাস্তব রীতির Verismo Opera প্রবর্তিত করেন। এই জাতীয় অপেরায় প্রচণ্ডতা, অনুরাগ ও ভাবাবেগের প্রাধান্য থাকে।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থানে বিংশ শতকে Chamber Opera প্রযোজিত হইতে আরম্ভ করে। ইহাতে ছোট অর্কেষ্ট্রা পার্টি থাকে ও ইহার চরিত্র সংখ্যা কম; অনেক সময় ইহাতে কোরাস থাকে না। ছোট ছোট দল কর্তৃক এই অপেরা অভিনীত হয়। 'The Turn of The Screw' (1954) এই জাতীয় অপেরার দৃষ্টান্ত। সাতজন অভিনেতা ও তের জনের অর্কেষ্টা পার্টি নিয়ে এই অপেরা নাট্য মঞ্চস্থ হয়। সাংগীতিক পবিবেশ ও দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অপেরার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া প্রথমে overtrue ঐকতান বাদিত হয়। অপেরায় সংলাপ ও নাট্যক্রিয়া অপেক্ষা সংযোজিত সংগীতেরই প্রাধান্য। নাট্যক্রিয়ার গতি রুদ্ধ করিয়াও অপেরায় লিরিক উচ্ছ্বাস ও বিশেষ ধরণের সংগীত প্রয়োগ করা হয়।

অপেরার সঙ্গে যেমন গীতাভিনয়ের প্রভেদ রহিয়াছে, তেমনি গীতিনাট্যের সংগেও অপেরার পার্থক্য আছে। গীতিনাট্যে (music-drama) বিশেষ রীতির সংগীত প্রয়োগের জন্য নাট্যক্রিয়া ক্ষুণ্ণ করা হয় না—[1]"Music-drama implies melodic recitative in which Songs are not verses and drama is not sacrificed to create music forms"। গীতিনাট্যে গান ও নাটক দুইয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, ইহাতে গান নাটকের সহায়ক উপাদান রূপে গৃহীত হয়। অপেরায় অধিক জোর দেওয়া হয় 'aria' অংশের উপরে—"...stopping the action to allow a lyrical effusion and casting it into a specific music form." Aria বলিতে বুঝায় অপেরার জন্য ইটালি হইতে প্রচলিত ত্রি-ভাগ সমন্বিত এক প্রকার গীতি। এই গীতির সাহায্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মনোভাব (feelings) প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। অপেরায় সংগীতের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপের কারণ সম্পর্ক বলা যায় যে অপেরা [2]"is a staged drama in which the accompanying music is more than the words or actions of the drama."

1. Opera Companion—P. 180, G. Martin (Lond. 1962)

2. Ibid—P. 181

নাটক ও সংগীত

যাত্রায় নানাপ্রকারের সংগীত সংযোজনার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে নাটকের সংগে সংগীতের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ রহিয়াছে। জীবনের উপর সংগীতের প্রভাব অতি গভীর। সেই জন্যই সভ্যতার অগ্রগতির সংগে মানব সমাজে সংগীতের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হয়। অন্তত চার হাজার বৎসর পূর্বে আর্যসভ্যতার বৈদিক যুগে বিশেষ ধরণের সংগীত প্রচলিত ছিল। বৈদিক ঋষিদের আর্চিক, গাথিক, সামিক স্বররীতি সম্বলিত সংগীত-প্রথা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলে আর্যসংগীত কেবল সহজ সরল সামগানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মানবমনের বিভিন্ন সূক্ষ্মভাব প্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিতে থাকে। আর্যসংগীতের তিনটি ধারা—নৃত্য, গীত, বাদ্য। দেহভংগি ও মুদ্রার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ নৃত্য। ভাষা ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ গীত। বাদ্য বলিতে বুঝায়—তার জাতীয় তত-যন্ত্র, বাঁশি জাতীয় রন্ধ্রযুক্ত যন্ত্র, মৃদংগ, তবলা জাতীয় চর্মদ্বারা আবদ্ধ আনদ্ধ-যন্ত্র এবং নূপুর, কাঁসর, ঘণ্টা, করতাল জাতীয় ঘন-যন্ত্র। আনদ্ধ যন্ত্র আবার পাঁচভাগে বিভক্ত—সভ্য, বহির্দ্বারিক, গ্রাম্য, সামরিক, মাঙ্গল্য। সভাদিতে বাদিত হইবার জন্য মৃদংগ, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি সভ্য,—শোভা-যাত্রাদিতে বাদিত হইবার জন্য ঢাক, ঢোল, নাগরা, নহবৎ প্রভৃতি বহির্দ্বারিক,—গ্রামীণদের মধ্যে প্রচলিত মাদল, জোড়খাই, ডুবডুবি, ডমরু, খঞ্জনি, খোর্দক, হুড়কা, ঘুটুক প্রভৃতি গ্রাম্য,—দামামা, কাড়া, তাসা, ঢক্কা, জগঝম্প প্রভৃতি সামরিক,—টিকারা, কাড়া, নাগারা ডম্ফ, খোল প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যরূপে চিহ্নিত। নৃত্য, গীত, তার ও বাঁশি যেমন স্বতন্ত্ররূপে মনোভাব প্রকাশে সক্ষম তেমনি আনদ্ধ ও ঘন-র সাহায্যে স্থান-কাল অনুযায়ী স্বতন্ত্ররূপে ভাবপ্রকাশ সম্ভব হইলেও সাধারণত এই দুইটি সংগত ও তাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়। নাটকের সংগীতাংশে নৃত্য-গীত-বাদ্য এই ত্রিধারার ব্যবহারই প্রচলিত।

নাট্য-ইতিহাসের গোড়ার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশে নাট্যোদ্ভবের মূলে রহিয়াছে নৃত্য-গীত। দেব-পূজা বা উৎসব উপলক্ষে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত দক্ষলোক সাধারণের কাছে দেব-মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য নাচ-গানের মাধ্যমে ধারাবাহিক দেব-কাহিনী-চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। ইহার পরে বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্রমে পালাগানের প্রচলন হয়। এই পালাগানের স্তর অতিক্রম করিয়া নাটকের সৃষ্টি।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্বৈরশাসক পাইসিস্ট্রেটাস্‌-এর রাজত্বে ডায়নিসাস্‌ দেবতার উৎসব উপলক্ষে গ্রীসদেশে নাট্য ও মঞ্চ গড়িয়া উঠে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পেরিক্লিস্‌-এর রাজত্বে এথেন্স নগরী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই সময়ই গ্রীক নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণ-যুগ। সেই স্বর্ণযুগে ট্র্যাজেডি রচয়িতা ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস এবং কমেডি রচয়িতা এরিষ্টোফেনিস গ্রীকদেশকে অমূল্য নাট্যোপহার প্রদান করেন। এই মহান নাট্যকারদের নাটকে সংগীতের বিশেষ স্থান রহিয়াছে। 'কোরাস্‌' নাটকে 'strophe', 'antitrophe' ও 'epode'-এ বিভক্ত নৃত্য-গীতি পরিবেশন করিত।

পরবর্তীকালে এলিজাবেথীয় যুগে সেক্সপিয়ারের টেম্‌পেষ্ট, হ্যামলেট, ওথেলো প্রভৃতি নাটকে গীতির ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি ইহা বলা চলে যে তাঁহার নাটকে সংগীত কদাচিৎ কণ্ঠাশ্রয়ী। ঐ সময়ের নাটকের ছন্দোময় সংলাপ ও নাট্যপ্রয়োগে যন্ত্রীদের সহযোগিতায় সুরের অভাব দূরীভূত হইত। ইটালী দেশের নাটকে এক সময় সংগীতের প্রাচুর্য দেখা দেয়। সংগীতপ্রধান এই সকল অপেরা-নাট্য ক্রমে ফরাসীদেশে ও সেক্সপিয়ারের পরবর্তীযুগে ইংলণ্ডে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সর্বত্রই অপেরা সমাদৃত হয় এবং দেশের বড় বড় শহরে opera-house গড়িয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্যে মলিয়ের, ইব্‌সেন, বানার্ডশ, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, মেটারলিঙ্ক, পিরানদেলো, ইউজিন্‌ ও' নিল, আইওনেস্‌কো প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকে কণ্ঠসংগীতের তেমন ব্যবহার না থাকিলেও প্রয়োগরীতির নানাপ্রকার সংগীতের সাহায্যে সুরের অভাবপুরণ করিয়া নাটককে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। বেরটোল্ট ব্রেক্‌ষ্‌ট-এর The Good Woman of Setzuan, The Caucasian Chalk Circle প্রভৃতি নাটকে কিছু কিছু গানের উপস্থাপনা রহিয়াছে। জাপানের জনপ্রিয় 'কাবুকী' ও 'নো'-নাটকেও গীতির বিশেষ স্থান আছে।

আর্য ভারতে নিঃসংশয়ে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে রচিত কোন নাটক না পাওয়া গেলেও সেযুগে যে নাটক ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর পূর্বের ঋগ্‌বেদে অতিথি ইন্দ্রকে লইয়া রচিত নাট্য-কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় (সূক্ত ১০-২৮)। এই বেদে নাটকের প্রাথমিক অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের 'যম-যমী', 'উর্বশীপুরূরবা' 'ইন্দ্র-মরুৎ' প্রভৃতি

সংবাদসূক্তে কথোপকথন রহিয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের 'সোমযাগ' অনুষ্ঠানে সোমরস ক্রয়-বিক্রয়ের অভিনয় ও 'মহাব্রতযাগ' অনুষ্ঠানে শ্বেতচর্ম লইয়া বৈশ্য-শূদ্রের বিবাদ অভিনয়ে নাটকীয়তা রহিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনির 'ভিক্ষুঃ নটসূত্রয়োঃ' হইতেও প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে ভারতে নাট্যাভিনয় হইত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলির অষ্টাধ্যায়ী মহাভাষ্যে শিলালিন্ ও শোভানিকের অভিনয়ের কথা লিখিত রহিয়াছে। এই শোভনিকরা মূক অভিনেতা বা ছায়া অভিনেতা ছিলেন। শোভানিকদের অভিনয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"যে তাবদ্ এতে শোভানিকা নামৈতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি প্রত্যক্ষং বলিং বন্ধয়ন্তীতি চিত্রেষু কথম্।......গ্রন্থিকেষু কথম্ কেচিৎ কংসভক্তা ভবন্তি কেচিৎ বাসুদেবভক্তা......কেচিৎ কালামুখা ভবন্তি কেচিৎ রক্তমুখাঃ।" [১]হরিবংশে কৃষ্ণ, বলরাম প্রমুখ যাদব বীরদের জলযাত্রা উপলক্ষে ছালিকা (তদেব ছলিকং নাম সাক্ষাদ্ যদভিনীয়তে) নাট্যাভিনয়ের (জগুস্তথৈবাভিনয়ং চ চক্রঃ) উল্লেখ রহিয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রচনা খ্রীষ্টপূর্ব কালে, অথবা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পরে নহে। খ্রীষ্টপূর্ব যুগে নাট্যাভিনয় প্রচলিত না থাকিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐ রমক উন্নত নাট্যশাস্ত্র রচিত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক অন্যান্য দেশের মত ভারতেও নাট্যোৎপত্তির সূচনাকাল হইতেই ইহার সঙ্গে সংগীতের মিতালি ছিল। নাট্য সাহিত্যের সমুন্নতিকালেও মঞ্চপ্রয়োগে কণ্ঠ ও নেপথ্য সংগীতের সংগে নাটকের সংযোগ স্থাপিত হইত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকে সংগীত প্রয়োগের পঞ্চবিধ রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাবেশিকী, প্রস্তুতস্তুতিযোগ, ক্রামিকী, আক্ষেপনী ও প্রাসাদিকী এই পঞ্চবিধ পদ্ধতিতে নাটকে সংগীত প্রযুক্ত হইত। এই সকল সংগীত রীতিতে নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিশেষ বিশেষ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। নাট্যকার ভাস প্রতিমা নাটকে [২]নটীকৃত কণ্ঠসংগীত ব্যবহার করিয়াছেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের ঋতুবিষয়কগান ও হংসপদিকার গান, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের নেপথ্য সংগীত, নৃত্য ও মালবিকার চতুষ্পদ গীতি, 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের বৈতালিক-গীতি ও জম্ভালিকা-গীতির ব্যবহারে বুঝা যায় যে মহাকবি কালিদাসও নাটকে সংগীত সংযোজনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশাখদত্ত

১। বিষ্ণু পর্ব—৮৮-৮৯ অধ্যায়।

২। নটী—অম্বা। তহ (গায়তি)—স্থাপনা, প্রতিমানাটক।

'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে নেপথ্য-সংগীত ব্যবহার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর নাট্যকার শ্রীহর্ষদেবের 'রত্নাবলী' নাটকে বসন্তোৎসবে নেপথ্যে [১]চর্চরী-গীতি এবং মদনিকার জন্য মঞ্চে [২]দ্বিপদীগীতির সংযোজনা করেন। প্রাকৃত-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রাজশেখর খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে তাঁহার 'কর্পূর মঞ্জরী' নাটকে ও সংগীতের উপস্থাপনা করিয়াছেন। 'নান্দী' সংস্কৃত নাটকের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ—[৩]"তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে"। এই নান্দীর সঙ্গেও সংগীতের সম্পর্ক আছে বলা যাইতে পারে। নান্দীর ছন্দে, ধ্বনি সামঞ্জস্য ও মধ্যম স্বর সহযোগে পাঠ করিবার রীতিতে এই সম্পর্ক প্রকাশিত—"সূত্রধার পঠেন্নান্দীং মধ্যমং স্বরমাশ্রিতঃ।" সংস্কৃত নাটকে বিভিন্ন প্রকারের সংগীত ব্যবহৃত হইলেও একথা বলা চলে যে ইংরেজী নাটকের মত ইহাতেও কণ্ঠ সংগীতের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত স্বল্প।

পূর্বের বিভিন্ন অধ্যায়েরআলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে যাত্রা নাট্য সংগীত বহুল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে কলিকাতা নগরীতে দৃশ্যপট সহযোগে থিয়েটারী নাটকের অভিনয় হইতে থাকে। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে (১৮৭২ খ্রীঃ) কলিকাতায় সাধারণ রংগালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এতকাল ধরিয়া যাত্রা দ্বারা নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে সেই নাট্যরসিকদের জন্যইতো প্রধানত সাধারণ রংগালয়ের প্রতিষ্ঠা। কাজেই দর্শকদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য থিয়েটারী নাটকেও কণ্ঠ সংগীতের যথেষ্ট সংযোজনা হইতে লাগিল। কণ্ঠ সংগীত ও কদাচিৎ নৃত্যের ব্যবহার থাকিলেও নাট্যপ্রয়োগের দিক হইতে অন্যান্য রীতির সংগীত ব্যবহার প্রথম দিকের থিয়েটারী নাটকে তেমন স্থান পায় নাই। ইহাতে ঐকতান বাদন ও করুণরস পরিবেশনে বেহালায় নেপথ্য সংগীত প্রযোজিত হইত। এই সময়ের থিয়েটারী নাটকে গীতি যোজনার দিক হইতে স্থান-কাল-পাত্র প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রতি সর্বত্র তেমন সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমংগল ঠাকুর' নাটকের কয়েকটি গান, দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ভিক্ষুকের গান, সাধারণ রংগালয়ের বাইরে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের 'পৌষের গান' এবং আরো কোন,

---

১। সমন্তদো সুচ্ছন্দ মদ্দলোদ্দাম চচ্চরী সদ্দমুহর—প্রথম অঙ্ক, রত্নাবলী

২। মদনিকা (গায়তি)—কুসুমাউহপিঅদূঅও মউলাইঅবহূচুঅও—প্রথম অঙ্ক, রত্নাবলী

৩। সাহিত্যদর্পণ—২৩, ষষ্ঠ পরি, বিশ্বনাথ

কোন নাটকে স্থান বিশেষে গান সুপ্রযুক্ত হইলেও পূর্বের থিয়েটারী নাটকে ইহার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নাই। বাংলা নাটকে সংগীত যোজনায় দর্শকদের সংগীত প্রীতির কথাই অধিক ভাবা হইয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে যাত্রার প্রভাব। যাত্রায় অভ্যস্ত দর্শকদের সংগীত-প্রীতিকে উপেক্ষা করা মঞ্চ মালিকও নাট্যকারদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষে (১৯২৪ খ্রীঃ) নাট্য-সংগীতের পরিবর্তন ঘটে। নাট্যাচার্য শিশির কুমার কৃত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকের মঞ্চ প্রয়োগ হইতে অভিনয় রীতির পরিবর্তনের সংগে থিয়েটারী নাটকের সংগীত রীতির এই পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বের ঐকতান বাদন-রীতি বন্ধ হইয়া যায়; প্রচলিত হয়—দৃশ্য-পরিস্থিতির সংগে সংগতি রাখিয়া আবহসংগীত ও চরিত্রের মনোভাব ব্যঞ্জক আবেগ-সংগীত। কণ্ঠ সংগীতে প্রচলিত থিয়েটারী ঢং-এর পরিবর্তে নূতন সুর আরোপিত হইতে আরম্ভ করে এবং রবীন্দ্র-সংগীতের সুরানুকরণ ও সুরু হইয়া যায়। ষ্টার থিয়েটারে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা বিকাশ' নাটকে এবং ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলিবাবা' নাটকে সুনিয়ন্ত্রিত নৃত্য সংযোজিত হয়। কিন্তু নৃত্য ভংগিতে নূতনত্ব আরোপিত হয় 'সীতা' নাটকে। ঘটনা ও কালের সঙ্গে সংগতি রাখিবার জন্য প্রাচীন মন্দির গাত্র ও চিত্র শিল্প হইতে নানাপ্রকার মুদ্রা ও অংগ ভংগির অনুকরণ করিয়া নৃত্য-পরিকল্পনা করা হয় এই নাটকের প্রয়োগ ব্যবস্থায়। এই সময় হইতে থিয়েটারী নাটকে আবহ ও আবেগ সংগীত যোজনা পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই যুগেই সাধারণ রংগমঞ্চের বাহিরে কাব্য নাট্য ও রূপক-সাংকেতিক নাট্যের স্তর অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্র নাট্য নৃত্য-নাট্যে পরিণতি লাভ করে। এই শ্রেণীর নাটকের প্রধান অবলম্বন সংগীত অর্থাৎ নৃত্য, গীতি ও বাদ্য। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্যে যেমন নৃত্য রহিয়াছে তেমনি কণ্ঠ সংগীতের ও প্রাধান্য রহিয়াছে। পাত্র-পাত্রীর উক্তি ও গীতিময় হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটককে গীতি-নৃত্য-নাট্য বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে। পল্লী বাংলার পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ঘটনা লইয়া খাঁটি নৃত্য নাট্য প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাতে গান নাই। নৃত্য ও বাদ্য ইহার অবলম্বন। নৃত্যাচার্য উদয় শংকর শহরাঞ্চলে খাঁটি নৃত্য-নাট্য বিশেষ রূপে প্রবর্তন করেন।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক (১৯৪৪ খ্রীঃ)

হইতে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক দিয়া বাংলা নাটকে যেমন নূতনত্ব আনিল তেমনি প্রয়োগের দিক হইতে সংগীত যোজনায় ও পরিবর্তন দেখা দিল। পূর্বের নাটকে যে পদ্য সংলাপ সংযোজিত হইত এই সময়ের নাটক হইতে বাস্তবতার বিচারে তাহা উঠিয়া গেল। বিভিন্ন নাটকে নৃত্যের ব্যবহার ও প্রায় বন্ধ হইল। গানের প্রয়োগ যাহা থাকিল তাহাও উল্লেখ যোগ্য নহে। নাট্য প্রয়োগে আবহ সংগীত ও আবেগ সংগীতের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইহার সঙ্গে শব্দক্ষেপণের প্রতিও খুব জোর দিবার ব্যবস্থা হইতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যাত্রা-নাট্যে ও গীতির সংখ্যা কমিতে আরম্ভ করে। পূর্বে এক একটি নাটকে পঁচিশ-পঞ্চাশ খানি গান থাকিত, বর্তমানের নাটকে গানের সংখ্যা দশের অধিক থাকে না। ইহাতে আবার সুষ্ঠু শব্দ প্রয়োগের জন্য যান্ত্রিকতারও কিছু কিছু সাহায্য লওয়া হইতেছে।

নাট্যকার, প্রয়োগবিদ ও অভিনেতা—এই ত্রয়ীর ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য সকল দেশের নাটকে সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত। ভাবপ্রকাশে ভাষার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সংগীতের ক্ষমতা অসীম। সুরহীন কথা মনকে যতখানি প্রভাবিত করে—সুরে গীত সেই একই ভাবাত্মক কথা আবেগের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য মনের উপর অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। নাটকে যে একসময় পদ্য-সংলাপের বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল তাহারও অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ভাবাবেগ সৃষ্টির সুবিধা। ছন্দোময় সংলাপ তো অংশত সংগীত। তাই অভিনেতা ও দর্শকের মনোগত ব্যবধান দ্রুত ঘুচাইয়া দিবার পক্ষে সংগীতাত্মক ছন্দোময় সংলাপ বিশেষ উপযোগী বলিয়া নাটকে ইহাই গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি স্মরণযোগ্য,--

> "মানবের জীর্ণবাক্যে মোরছন্দ দিবে নব নব সুর,
> অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে যাবে তারে কিছু দূর
> ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ-সম
> উদ্দাম —সুন্দর গতি"

মনের উপর সংগীতের ক্রিয়া খুব বেশি বলিয়াই নাটকের সূচনায় যেমন সংগীত ছিল তেমনি পরিণতির বিভিন্ন স্তরেও সংগীত বজায় রহিল।

জীবনকে দর্শনীয় করিয়া তুলিবার জন্য নাটকের সৃষ্টি—

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখ সমন্বিতঃ
সোঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥ (নাট্যশাস্ত্র)

লোকবৃত্তানুকরণ সাহিত্যের যে শাখাটির উদ্দেশ্য তাহাকে শুধু পঠন পাঠন দ্বারা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। জীবনকে বুঝিবার জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজনীয় ঔপন্যাসিকের মত নাট্যকার নাটকে ইহার সমস্তই উপস্থাপিত কবেন না। নাটকে অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপাদানের সহযোগিতায় সংলাপের মাধ্যমে জীবনকে রূপায়িত করা হয়। কাজেই সংহত ও সংক্ষিপ্ত এই শ্রেণীর সাহিত্য হৃদয় দিয়া পূর্ণরূপে অনুভব করিতে হইলে একজন নাট্যরসিকের পক্ষেও প্রয়োগ বিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। প্রয়োগবিজ্ঞানের যে কয়টি অংশ আছে সংগীত তাহাদের অন্যতম। এই সংগীতকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) নৃত্য, (খ) গীতি, (গ) সংগত ও সহযোগী সংগীত, (ঘ) আবহসংগীত (চ) ভাবাবেগ মূলক সংগীত। সংগত ও সহযোগী সংগীত, আবহ ও আবেগ সংগীত নেপথ্য সংগীতের অন্তর্গত। নৃত্য এবং গীতিকে শ্রবণ-প্রেক্ষণ সংগীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর সংগীত সাধারণত থিয়েটারী নাটকে উপস্থাপিত হয়। কণ্ঠ-সংগীত প্রয়োজনবোধে নেপথ্যেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। থিয়েটারী নাটক অপেক্ষা যাত্রানাট্যে সংগীতের প্রাধান্য রহিয়াছে। যত সুকৌশলে এই সংগীত সংস্থাপনা করা যায় ততই নাটকের রস পরিবেশন সার্থক হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে।

যাত্রানাটক ও থিয়েটারী নাটক

কথায় বলে—'যাত্রাগান শুনতে যাই'। বাস্তবিক যাত্রার সঙ্গে গানের নিবিড় সম্পর্ক। পূর্বে যাত্রায় অভিনয় অপেক্ষা গানেরই প্রাধান্য ছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জুড়িও বালক গায়কদের জন্য উক্তি-গীতি সন্নিবেশ যাত্রার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। যাত্রায় নানা প্রকারের গানের জন্য বিভিন্ন ধরণের চরিত্র সংযোজিত হইতে থাকে। আসর বন্দী গানের জন্য বালক চরিত্র,—যাত্রা-ডুয়েটের জন্য মেথর-মেথরানী, ঘেবড়া-ঘেবড়ানী, মালি-মালিনী, ভিস্তিওয়ালা ও তৎপত্নী চরিত্র,—যাত্রা ব্যালের জন্য বাঈজী, বনবালা, তরঙ্গবালা ও সখী চরিত্র,—গণের গানের জন্য বন্দী, সৈনিক, ভিখারিণী, চারণী চরিত্র,—একানে গানের জন্য একানে বালক চরিত্র,—বিধি-নিষেধ ও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখাইবার জন্য চরিত্র, পুরুষকারও দৈবের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য নিয়তি

চরিত্র,—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ঈর্ষা, কুমতি, সুমতি প্রভৃতি রূপক চরিত্র,—প্রধান চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ দেখাইবার জন্য বিবেক জাতীয় রূপক চরিত্র, চক্রান্তের প্রকাশ, ভবিষ্যদ্বাণী ও বিশেষ মনোভাব গানের মধ্য দিয়া গভীর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য চরিত্র,—টেম্পো অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবাবেগের গতি বাড়াইবার জন্য নাটকের বিভিন্ন স্থানে গীতি পরিবেশনকারী বিশিষ্ট চরিত্র যাত্রায় বিশেষ স্থান অধিকার করে। বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত গানের দিক হইতে যাত্রা নাটক দ্বারা থিয়েটারী নাটক প্রভাবিত হয়। সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে 'মুক্তধারা', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'অচলায়তন' প্রভৃতি রবীন্দ্র নাট্যের গীতি যোজনায়ও Form-এর দিক হইতে যাত্রার প্রভাব রহিয়াছে। তথাপি থিয়েটারী নাটকে পাত্র-পাত্রীর গান, বন্দীদেরগান, বাঈজী সখীদেরনৃত্য-গীতি স্থানবিশেষে সংযোজিত হইলেও যাত্রার মত ইহাতে সাধারণত উল্লিখিত বিভিন্ন চরিত্র যোজনা করিয়া দর্শকদেরগান শুনাইবার ব্যবস্থা করা হয় না। গান থাকিলেও থিয়েটারী নাটক অভিনয় প্রধান এবং অভিনয় থাকিলেও যাত্রা নাটক গীতিপ্রধান। উনবিংশ শতকের শেষে থিয়েটারের প্রভাবে ক্রমে যাত্রায় অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়িতে থাকে। ফলে যাত্রা নাটকেও অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন ভাবের বড় বড় সংলাপ সংযোজিত হইতে আরম্ভ করে। পালা রচনার ধারাও পরিবর্তিত হয়। ইহাতে গানের সংখ্যা কমিয়া গেলেও ত্রিশ লইতে পঞ্চাশখানা পর্যন্ত গান থাকিত। অভিনয় চলিত প্রায় আট ঘণ্টা ধরিয়া।

উপস্থাপনার দিক হইতেও থিয়েটারী নাটকের সঙ্গে যাত্রানাট্যের পার্থক্য রহিয়াছে। থিয়েটারে দৃশ্য পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। তাই এই সকল বিষয়ে নাট্যকার দৃশ্যারম্ভের পূর্বে বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। অনেক সময় দৃশ্যের প্রথমে কেবল স্থানকালের সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র থাকে। এই রকম স্থলে মঞ্চ নির্দেশক কল্পনাবলে দৃশ্যাদি রচনা করেন এবং আলোক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সময় জ্ঞাপন করেন। কিন্তু যাত্রা নাটক উজ্জ্বল আলোকে মুক্ত রঙ্গস্থলে পরিবেশিত হয়। ইহাতে দৃশ্য রচনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে না। তাই বর্ণনামূলক সংলাপের সাহায্যে বিভিন্ন চরিত্র দৃশ্যের স্থানকাল দর্শকদের মানসপটে ফুটাইয়া তোলে। ইহার জন্য কখনো কখনো যাত্রায় সূত্রধার চরিত্রের অবতারণা করা হয়। এই চরিত্র অংকের বা দৃশ্যের প্রথমে প্রবেশ করিয়া কেবল যে নাট্যঘটনার স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয় দেয় তাহাই নহে

এই চরিত্র বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশাদিও প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে মতিলাল ঘোষের 'বুদ্ধলীলা' পালাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। থিয়েটারী নাটকে বর্ণনামূলক সংলাপ সংযোজনার অথবা ইহার জন্য নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিবার সাধারণত প্রয়োজন হয় না। পূর্বের যাত্রানাট্যে যে নানা বিষয়ে বর্ণনামূলক সংলাপ সংযোজিত হইত সুকণ্ঠের অধিকারী অভিনেতারা তাহার সাহায্যেও বিভিন্ন প্রকারের রস সৃষ্টি করিতেন। 'সপ্তর্ষিসৃজন', 'দক্ষিণা', 'কর্ণবধ', প্রভৃতি পালায় ইহার পরিচয় রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক নাটকের সঙ্গে এই দিক হইতে যাত্রার সামান্য কিছু মিল রহিয়াছে। গ্রীক নাটকেও বর্ণনামূলক সংলাপ থাকিত। এই প্রসঙ্গে ইস্কাইলাসের নাটকের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে।

থিয়েটারে পূর্বে ঐকতান বাদনের রীতি প্রচলিত ছিল। এক সময় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ গিরিশচন্দ্রের 'ষ্টার থিয়েটারে' ঐকতানে অংশগ্রহণ করিতেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের 'সীতা' (যোগেশচন্দ্র রচিত) নাট্য প্রয়োগের সময় হইতে মঞ্চের ঐকতান বাদন রীতি অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। থিয়েটারে ঐকতান বাদিত হইলেও প্রতি অংকের পরেই ইহার অবশ্য প্রযোজনা হইত না বা প্রতি অংকের পরে ঐকতান বাদনের নির্দেশ দিয়া নাটক রচিত হইত না। কিন্তু পূর্বে যাত্রায় প্রতি অংকের পরেই ঐকতান বাদিত হইত এবং পালায় ইহার নির্দেশ থাকিত। শ্রোতৃমণ্ডলীকে পালা আরম্ভের জানান দেওয়া, আসরের গোলমাল থামানো এবং অভিনয় পরিবেশ রচনা করিবার জন্য উন্মুক্ত আসরে যাত্রানাট্য প্রয়োগে ঐকতান একান্ত প্রয়োজনীয়। যাত্রায় নৃত্য-গীত চাই; কিন্তু থিয়েটারে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। পূর্বের মত নাচগানের জন্য বহুবিধ চরিত্র বর্তমানের যাত্রাগানে সংযোজিত হয় না। এখন যাত্রার নাচগানের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে,—কিন্তু একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই। যাত্রা নাট্যোপস্থাপনায় এখন ঐকতানের পরেই নৃত্য প্রয়োগ করা হয়। এই নৃত্য 'ড্রামা-ড্যান্স' নামে যাত্রায় প্রচলিত। অভিনয় প্রসঙ্গে ভাবদ্যোতক ও আবেগাত্মক উক্তি-গীতি সন্নিবেশ যাত্রানাট্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যাত্রায় গান না থাকিলে ইহার স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। বিশেষ সেন্টিমেন্টেও ইমোশন প্রকাশের জন্য যাত্রায় গান সংযোজিত হয়। অভিনয়-শিল্পীদের সকল কথা বড় বড় আসরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চার, পাঁচ হাজার দর্শককর্ণে যথাযথ আবেগের সংগে পৌঁছাইয়া দেওয়া সহজ নহে। গায়কের

উদাত্ত কণ্ঠের সুর-মাধ্যমে এই কাজটি সহজ হইয়া উঠে। উদাত্ত সুর পরিবেশনের জন্য অনেক সময় যাত্রার সুর-রচনায় উত্তরাঙ্গ রাগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অভিনয়ের সঙ্গে গান থাকায় একটানা সংলাপের মধ্যেও আবার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা সংগীত পিপাসু সাধারণ দর্শকমন আকৃষ্ট করিবার দিক হইতেও এই বৈচিত্র্য প্রযোজনীয় হইয়া উঠে। এই সকল কারণেই সহস্র সহস্র দর্শক বেষ্টিত মুক্ত মঞ্চে যাত্রানাট্যের বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগের সাংগীতিক উপস্থাপনা আবশ্যক হইয়া উঠে।

যাত্রা লোকশিক্ষার বাহন। তাই ইহাতে শিক্ষামূলক উপাদান সংযোজিত হয়। লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাতে চরিত্রের পরিণতি দেখাইতে হয়। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, সৎ-অসৎ প্রভৃতি সম্পর্কে লৌকিক ধারণা অনুযায়ী যাত্রার ঘটনা সন্নিবেশিত হয়। পৌরাণিক ঘটনা, ঐতিহাসিক ঘটনা, কাল্পনিক ঘটনা এমন কি সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে পালা রচিত হইলেও এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরা হয়। যাত্রা নাটকে রস পরিবেশনের জন্য বহু ভাব সন্নিবেশিত করা হয়। পূর্বের নাটকে ভক্তিরস প্রাধান্য পাইত; ইহার সঙ্গে থাকিত করুণ, বীর, রৌদ্র, শৃঙ্গার এবং হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থা। কোন কোন নাটকে নবরস পরিবেশিত হইত। অভিনয় সময়ও ছিল আট ঘণ্টা। 'সপ্তর্ষিস্‌জন', 'পৃথিবী' 'অনন্ত মাহাত্ম্য' প্রভৃতি নাটকে সকলপ্রকার রসই পরিবেশিত হইয়াছে। বর্তমানে জনচাহিদা অনুযায়ী ভক্তিভাব আর যাত্রায় বিশেষভাবে গৃহীত হয় না। যুগরীতি প্রভাবে অভিনয়ের সময় সাড়ে তিনঘণ্টায় দাঁড়াইয়াছে। নাটকেও ভাব সন্নিবেশের দিক হইতে ইহার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানের নাটকে অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাব—রতি, শোক, উৎসাহ, ক্রোধ, হাস। কখনো কখনো ইহাদের সঙ্গে অন্যান্য ভাব না থাকে এমন নহে। যাত্রা নাটকে হাস্যরসের জন্য বিশেষভাবে চরিত্র সৃষ্টির প্রথা বহু প্রাচীন। পূর্বে বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা চরিত্রের মাধ্যমে এই হাস্যরস পরিবেশিত হইত। যাত্রার পূর্বরূপ নাটগীতির মধ্যেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। থিয়েটারী নাটক রচনায় এই প্রকারের বাঁধা-ধরা নিয়ম অনুসৃত হয় না। যাত্রানাট্যের দৃশ্য রচনারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার প্রতিদৃশ্যে বিশেষ বিশেষ অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ দিবার, লোকরঞ্জনের জন্য show piece রূপে কোন কোন দৃশ্য পৃথকভাবে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার এবং যখন যে

নাট্যক্রিয়া ও ভাবাবেগ (emotion) দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত হয় তাহাকেই গভীর করিবার প্রতি নাট্যকার অধিক দৃষ্টি দিয়া থাকেন। অভিনেতারাও নিজেদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়া ভাবের উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া হাততালি না পাওয়া পর্যন্ত রঙ্গস্থল হইতে প্রস্থান করিতে অনিচ্ছুক। ইহার ফলে পূর্বের বা পরের দৃশ্যের সঙ্গে অনেক সময় উপস্থাপিত দৃশ্যের কার্যকারণ সংযোগ রক্ষিত হয় না। এই দিক হইতে প্রতিটি দৃশ্য পৃথক পৃথকভাবে আকর্ষণীয় হইয়া উঠিলেও ইহাতে সামগ্রিকভাবে নাট্যসংহতি যে ব্যাহত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নাটক হইতে কোন কোন জমাট দৃশ্য বর্জন করিলেও সামগ্রিকভাবে নাটকের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। নাটকীয় যুক্তি (dramatic logic) ও যাত্রানাট্যে সব সময় মানা হয় না। ফলত নাট্যসাহিত্য রূপে ইহার মূল্যমান রক্ষকরা কঠিন হইয়া উঠে। যাত্রা নাটকের সঙ্গে এইদিক হইতে থিয়েটারী নাটকের অমিল রহিয়াছে। এই বিষয়ে যাত্রানাট্যের সঙ্গে জাপানি 'কাবুকি' নাটকের বরং মিল লক্ষিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধিত জনপ্রিয় 'কাবুকি' নাটকে সাধারণত গঠন প্রণালী সম্বন্ধীয় সংহতি (organic compactness) থাকে না। ইহাতে প্রায়-অসংলগ্ন দৃশ্যাবলীর অবতারণা করা হয়। নাটকের ঘটনাও চরিত্রের পূর্বাপর সম্পর্কের কথা বিবেচনা না করিয়া অভিনেতারা দৃশ্যে দৃশ্যে যাহাতে ব্যক্তিগত অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাবুকি নাটক রচিত হয়। ইহার ফলে নাটক হইতে কোন কোন দৃশ্য বা উপকাহিনী অপসৃত হইলেও সমগ্র নাটক বুঝিবার পক্ষে ও ইহার রসোপলব্ধিতে কোনপ্রকার অসুবিধা হয় না,—

[1]"Perhaps because of this, many of these dramas seem to exist rather as a series of only slightly related scenes than as artistic wholes. They are written mainly for the purpose of providing opportunities for the actors, and, as the actor depends upon the scene rather than on the whole play for the demonstration of his traditional points, quite naturally emphasis is laid upon the action immediately before us at any moment instead of upon the relationship between this action and situations following or preceding. Thus it is entirely possible to extract one episode from Takeda, Izumo's

1. World Drama, P. 649, A. Nicoll, London (1964)

lengthy 'Sugawara denju tenarai kagami' (Sugawara's Instructions in Calligraphy), to call it the 'Village School', and treat it as a separate work."

যাত্রা নাটকে যুদ্ধের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। যাত্রার যুদ্ধ অতীব আকর্ষণীয়। সামাজিক পালায় যেখানে তলোয়ার যুদ্ধের উপস্থাপনা সম্ভব হয় না সেখানেও অন্তত ছোরা বা পিস্তল-বন্দুকের গোলাগুলির ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। থিয়েটারী নাটকে যুদ্ধ অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে।

এক একটি যাত্রা নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে কয়েকটি উপকাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই সকল উপকাহিনী মূলকাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া উঠেনা; নাটক অত্যন্ত ঘটনা প্রধান (episodic) হইয়া উঠে মাত্র। যাত্রা নাটকের সঙ্গে মেলোড্রামার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মেলোড্রামার অর্থ (melos+drama) গীতিযুক্ত একশ্রেণীর নাটক বা গীতাভিনয় (গীতি+অভিনয়)। ইহাতে ঘটনার উপর অস্বাভাবিক জোর দেওয়া হয়। ইহার ঘটনা, চরিত্র এবং চরিত্রের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে নানাপ্রকার অস্বাভাবিকতা থাকে। কৌতূহল উদ্দীপনা ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রতি ইহাতে অধিক লক্ষ্য থাকে। ইহার ঘটনা মিলনান্ত হউক বা বিয়োগান্ত হউক ইহাতে নাটকীয় গভীরতা ও গুরুত্ব বিশেষ থাকে না। মেলোড্রামার গঠন শিথিল; ইহার দৃশ্যাবলীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ইহা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ('disproportionate'), অতিরঞ্জিত ('exaggerated') ইহাতে একটির পর একটি রোমাঞ্চ ('series of thrill') ও উত্তেজনাপূর্ণ ভাবের ('sensetional effect') সমাবেশ করা হয়। ইহাতে গভীর উদ্দেশ্য ('depth of purpose') ও সাহিত্যিক মাধুর্য ('literary grace') কম থাকে। মেলোড্রামা সম্পর্কে অধ্যাপক নিকলের উক্তি স্মরণযোগ্য—[1] "Originally the word 'melodrame' was introduced to France from Italy as a synonym for 'opera', but by the beginning of the nineteenth century it had acquird its later specialized significance—signifying a popular play, with sensationally serious plot broken by comic scenes, and accompanied throughtout by incidental music." মেলোড্রামার চরিত্রগুলি যেমন ছকে বাঁধা তেমনি ইহাতে সংলাপ অপেক্ষা ক্রিয়ার প্রাধান্য—

1. World Drama—P. 486, A. Nicoll, London (1964)

[1] "In this kind of production no attempt is made at securing depth of purpose or literary grace; hence the melodramatic characters tend to become a series of stock types, presented in simple terms of white and black, while the author frankly allows action to preponderate over dialogue." মেলোড্রামার এই ক্রিয়া সর্বত্র সু-নাটকের মত কার্যকারণ সম্পর্কান্বিত হয় না। অথচ নাট্যক্রিয়ায় ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নাটকের কার্যকারণ যুক্ত পূর্বক্রিয়া পরবর্তী ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। ইহার ফলে চরিত্রের মানসিক ভারসাম্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। এইরূপ সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যদিয়া নাটক সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে লসন সাহেবের উক্তি স্মরণযোগ্য,—[2] "Action must be in process of becoming; therefore it must rise out of another action, and must lead to another, and different action. Eech change of equilibrium involves prior and forthcoming changes of equilibrium............Dramatic action is activity combining physical movement and speech; it includes the expectation, preparation and accomplishument of achange of equilibrium which is a part of a series of such changes." মেলোড্রামার সংগে ট্রাজেডিরও পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সম্পর্কে Boulton-এর একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যাইতে পারে—[3] "It is distinguished from true tragedy by a portrayal of characters who are all more violently and improbably good or evil than realistic; by a lack of real psychological insight; by a more far-fetched plot whose horrors and sensations may easily tumble over into the ludicrous; and by a continual pandering to the public desire for strong sensations and great excitement." এই সম্পর্কে The Harvest of Tragedy-তে বলা হইয়াছে—[4] "Melodrama is

1. World Drama—P. 486, A. Nicoll (Lond. 1964)
2. Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting—pp. 171—173, J. H. Lowson (Newyork—1949)
3. The Anatomy of Drama—P. 148, M. Boulton, London (1960)
4. The Harvest of tragedy—P. 278, T. R. Henn (1966)

that type of play which attempts to produce the emotions appropriate to tragedy on insufficient emotional pretexts : through inorganic conceptions of character and plot." মেলোড্রামার চরিত্রে যথাযথ [1]transition থাকে না। চরিত্র পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ক্রমিক স্তর নাটকে না থাকিলে চরিত্র সম্পর্কে বাস্তব বোধ জাগ্রত করা সম্ভব হয় না।

মেলোড্রামায় দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব অনেক সময় কৃত্রিম হইয়া উঠে। কারণ ইহাতে চরিত্র ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর না হইয়া যেন বিদ্যুৎ-গতিতে লাফাইয়া চলিতে থাকে ('omitting the intervening steps')। সুগঠিত চরিত্রে 'slowly rising conflict' থাকে। এই জাতীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য নাট্যকারের চরিত্র সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ঘটনার ক্রম, চরিত্র পরিণামের ক্রম, ও দ্বন্দ্বের ক্রমের প্রতি যেমন জাগ্রত-দৃষ্টি রাখা দরকার, তেমন মূল সম্পাদ্য বিষয় (clearcut premise) সম্পর্কেও পূর্বাহ্নে সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। মেলোড্রামার দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে এগ্‌রির মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে—[2]"In a melodrama the transition is faulty or entirely lacking. Conflict is over emphasized. The characters move with lightning speed from one emotional peak to another--the result of their one-dimensionality." Thomas Morton-এর 'Columbus' (1795), Guilbert de Pixerecourt-এর 'The Spanish Moors (1804), 'Robinson Crusoe' (1805) প্রভৃতি মেলোড্রামার উদাহরণ রূপে গৃহীত হইতে পারে। থিয়েটারে মেলোড্রামা কখনো কখনো অভিনীত হয়; তাই বলিয়া থিয়েটারী নাটকের সঙ্গে মেলোড্রামার সম্পর্ক থাকেই একথা বলা যায় না। যাত্রার-নাটকের সঙ্গে কিন্তু মেলোড্রামার সম্পর্ক নিবিড়। ভবিষ্যতে হয়ত ইহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে; কিন্তু বর্তমানকাল পর্যন্ত রচিত যাত্রা-নাটক সম্পর্কে সাধারণভাবে ইহা বলা চলে।

---

1. Melodramas and stock characters have no transition which is the life blood of real drama. P. 205—The Art of Dramatic Writing—L. Egri (Lond. 1950)

2. The Art of Dramatic writi ; P. 249, Lajos Egri, London (1950)

থিয়েটারী নাটক ও যাত্রানাট্যের মানের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। লোক-নাট্য সাধারণত যাহাদের মধ্যে পরিবেশিত হয় তাহাদের কথা স্মরণ রাখিয়াই এই শ্রেণীর নাটক রচনা করা হয়। লোকনাট্যের বিশেষ দর্শক নাট্যঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া লইতে চাহে; তাহার ধ্যান-ধারণা, সাধারণ ন্যায়-নীতি বোধ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার প্রতিরূপ সে ইহার মধ্যে দেখিতে ইচ্ছা করে; নাটক দেখিয়া তাহার স্বভাবগত আবেগ-উচ্ছ্বাস ও হাসিকান্নার দোলায় দুলিতে চাহে। উল্লিখিত বিষয়গুলির পরিবেশন ও আস্বাদন সম্পর্কে নাগরিক ও গ্রামীণ লোকের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। তাই নাগর-নাট্য ও লোকনাট্য সম মানের হইবে ইহা আশা করা যায় না। লোকনাট্যে নাগরনাট্যের সূক্ষ্মত্বের সন্ধান ও স্বাভাবিক নহে। তাই বলিয়া ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টিতে কার্যকারণ সম্পর্কের অভাব থাকিবে হইাও বাঞ্ছনীয় নহে। চরিত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঘটনার সৃষ্টি করে। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যেমন জ্ঞান ও অনুভূতির সংযোগ থাকে তেমনি ইহার প্রকাশ ও কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু বর্তমানের বহু লোকনাট্যে ইহার অভাব লক্ষিত হইতেছে। বাংলাদেশে শিক্ষিতগণ কর্তৃক লোকনাট্য রচিত হইতেছে। তাই রচয়িতাদের এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন হওয়া আবশ্যক। কার্যকারণ সম্পর্কহীন আবেগাত্মক কতগুলি পরিস্থিতির উপস্থাপনাতে লোকনাট্য সীমাবদ্ধ এই ধারণা যথাযথ নহে।

নগর ও শহরের প্রভাবে লোকজীবনের ধ্যান-ধারণা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিতেছে—ইহা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। লোকনাট্যও যে ইহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিবে তাহাই কাম্য। বর্তমান লোকনাট্যে থিয়েটারে ব্যবহৃত আলোকনিয়ন্ত্রণ, যান্ত্রিকতা ও ছায়াচিত্রের প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু লোকনাট্য-রচনার মার্জনের প্রতি তেমন দৃষ্টি পড়িতেছেনা। ইহারও পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যবসা বুদ্ধি। পল্লীর শিক্ষিতকল্প ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে যাত্রা অধিক পরিবেশিত হয়। কলকারখানা মিল-খনি অঞ্চলে এবং শহরের কোন কোন অংশে যাত্রার আসরে কিছু কিছু শিক্ষিত লোক যে উপস্থিত না থাকেন তাহা নহে। কিন্তু তাহারাও দর্শনীয় বিনিময়ে সাময়িক উত্তেজনার আগুন পোহান ছাড়া যাত্রানাট্য সম্পর্কে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেন না। অথবা মথা ঘামাইলেও মুষ্টিমেয় দর্শকের কথা কে শুনিবে? কাজেই যেন তেন প্রকারেণ কতগুলি ভাবাবেগের খেলা দেখাইয়া, যান্ত্রিকতার

সাহায্যে কিছু চমক সৃষ্টি করিয়া সাধারণ-দর্শকমনে সাময়িক উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিয়া ব্যবসা বজায় রাখিবার প্রতি অধিকাংশ যাত্রাভিনেতা, যাত্রানাট্যকার ও যাত্রাস্বত্বাধিকারীর প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে যাত্রানাট্যের মার্জন ও দর্শক প্রস্তুতকরণের প্রতিও এই সম্প্রদায় ত্রয়ী যথেষ্ট পরাঙ্মুখ। এই জন্যই যাত্রায় মহৎ-নাটকের কথাতো উঠিতেই পারে না, সু-নাটকও একান্ত দুর্লভ। থিয়েটারী নাটকে এই দুইটি যথেষ্ট সংখ্যক পাওয়া যায়।

মহৎ-নাটক (great drama) ও সু-নাটকের (good drama) মধ্যে পার্থক্য অনেক। সুগঠিত বৃত্ত, চরিত্রের সূক্ষ্মত্ব-দুরূহত্ব ও উদ্দেশ্য, ঘটনার মধ্য দিয়া মূল ভাবের (theme) স্পষ্ট প্রমাণ, ঘটনা-বর্ণনা ও চরিত্রের আচরণ পদ্ধতিতে স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা, যুগ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশকরা এবং চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বুদ্ধিদীপ্ত চোখা চোখা সংলাপ সংযোজনা করা মোটামুটি সু-নাটকের লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে—([1]'Cleverly constructed story', 'subtlety of characterization and motivation,' 'fully explained theme, which is neatly exposed and finally solved', 'to hold mirror up to nature and portray the manners and manerisms of the age in finely observed sketches', 'witty repartee and pointed diologue')। সংলাপ, চরিত্র রূপায়ণ, ঘটনাও বৃত্তগঠন (speech, characterization, episode, construction), এবং কার্যকারণ সম্পর্ক ও যুক্তির সমানুপাত (relation of cause and effect and maintenance of logical proportion) রক্ষা করিয়া নাটক সুগঠিত হইলে তাহাকে good drama বলা চলে। বাড়াবাড়ি পরিত্যাগপূর্বক চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ইহার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতি দান ও নাটকের সার্থক উপসংহার রচনা সু-নাটকের বৈশিষ্ট্য। ইহার উপসংহার রচনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে—[2]"The dramatist's task, in effect, is to give as much free play as possible to the various characters and yet guide them all home to a successful conclusion." ইব্‌সেন-এর 'Ghosts' একখানি সু-নাটক।

---

1. 'Introduction'—The Theatre of the Absurd, Martin Esslin, London, (1968)

2. World Drama—P. 746, A Nicoll, London (1964)

মহৎ নাটক যেমন সুগঠিত তেমন ইহা বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, জটিলতা, গভীরতা ও মহত্ত্ব লইয়া সত্য শিবের ধারণাসহ মানবিক মূল্যের মহিমাবোধ জাগরিত করে। গভীর ভাবাবেগ (depth of emotion), ভালমন্দের দ্বন্দ্ব, দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় (war of good and evil and philosophical note), জীবনের আদর্শ মূল্যবোধের পরিচয় (ideal values of life), শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক দিক লইয়া ত্রৈমাণিক চরিত্র সৃষ্টি (tri-dimensional character), চিন্তা, হৃদয়ানুভূতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বহির্দ্বন্দ্ব (thought, feeling, inner and outer conflict), চেতন-অচেতন মনের কামনা-বাসনা সহ জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার (knowledge, volition, action) সম্যক প্রকাশের মধ্য দিয়া জটিল চরিত্রের কালাতীত মৌলিক মানবিক গুণের (timeless basic human qualities) পরিচয়, দ্বন্দ্ব সংঘাতময় বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ([1] orchestration of characters), মিলনের অসম্ভাব্যতা বজায় রাখিয়া গভীর বৈপরীত্যপূর্ণ মনোভাবের চরিত্রের উপস্থাপনা ([2]unity of opposites) এবং বিশেষের সাধারণীকরণ করিয়া সার্বজনীন আবেদন (universal appeal) সৃষ্টি প্রভৃতি মহৎ নাটকের লক্ষণ রূপে ধরা যাইতে পারে। *Shakespeare*-এর 'Hamlet', 'Macbeth', 'King Lear' মহৎ নাটক। Shakespeare-এর পূর্বে ও পরেও মহৎ নাটক রচিত হইয়াছে। Sophocles-এর 'King Oedipus', Euripides-এর 'Medea', Moliere-এর 'Le Misanthrope', কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' প্রভৃতি মহৎ নাটকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

বর্তমানে কলিকাতার মত নগরীতেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে যাত্রা সমাদৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন যাত্রা নানাভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হইতেছে। ফলে যাত্রার মূল বৈশিষ্ট্য ও আসল উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া ইহার রচনামার্জন সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই ভবিষ্যতে থিয়েটারের মত যাত্রায়ও সু-নাটক পাইবার সম্ভাবনা আছে।

1. Orchestration demands well-defined and uncompromising characters in opposition, moving from one pole toward another through conflict. P. 111, The Art of Dramatic Writing—L. Egri, London (1950)

2. The real unity of opposites is one in which compromise is impossible. P. 115, Ibid

রবীন্দ্রনাট্য ও যাত্রা

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পল্লীবাংলায় বহু যাত্রাসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরাঞ্চলেও যাত্রার দল গড়িয়া উঠে। নবদ্বীপ, হাওড়া-শালকিয়া, ফরাসডাঙ্গা ও কলিকাতা ছিল যাত্রার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র। কলিকাতার চোরবাগান, নিমতলা, জোড়াবাগান, আহিরীটোলা ও শোভাবাজারে প্রধান প্রধান যাত্রাসংস্থার কার্যালয় অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয় আদর্শে এদেশে সাধারণ রঙ্গালয় গড়িয়া উঠিবার পূর্বে যাত্রা-ই জনগণের নাট্যরসপিপাসা চরিতার্থ করিবার প্রধান উপায় ছিল। সুতরাং জনচাহিদা অনুযায়ী পেশাদারী যাত্রাসংস্থার পার্শ্বে বহু সৌখিন যাত্রাসংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর দল, গোবিন্দ অধিকারীর দল, মদন মাষ্টারের দল, মতিলাল রায়ের দল, ব্রজমোহন রায়ের দল, রাজা রামমোহন রায়ের প্রপৌত্র হরিমোহন রায়ের দল, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দল, রসিকলাল চক্রবর্তীর দল, রামধন মিস্ত্রীর দল, প্যারীমোহনের দল, গোপালদাস উড়ের দল, মহেশ চক্রবর্তীর দল, দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের দল, ঠাকুরদাস দত্তের দল, লোকনাথ ধোপার দল ও ঝড়ুদাস অধিকারীর দলের মধ্যে কোন কোনটি কৃষ্ণযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা, আবার কোন কোনটি চণ্ডীযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা এবং রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ভক্তিমূলক পৌরাণিক যাত্রা কলিকাতা ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহিলাযাত্রা সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়; এই প্রসঙ্গে 'বৌমাষ্টার' ও 'বৌকুণ্ডু' পেশাদার সংস্থা দুইটির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাত্রার প্রতি দেশবাসীর অশেষ আকর্ষণ ছিল বলিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ধনী ও জমিদারগণ অনেকগুলি সৌখিন যাত্রাসংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতায়ও এইরূপ বহু সংস্থা গড়িয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে কতগুলি সংস্থা খ্যাতির অধিকারী হয়। বিশেষ মার্জিত রীতির পরিবেশন পদ্ধতির জন্য বিশিষ্টদের নিকট সৌখিন যাত্রা অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। কলিকাতার সৌখিন দলগুলির মধ্যে বরাহনগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের দল, দক্ষিণ
1. নগরের দল, ভবানীপুর-বেলতলার শিবঠাকুরের দল, বৌবাজারের
2. দত্তের দল, বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবুর দেওয়ান জোড়াশাঁকোর রামচাঁদ
াধ্যায়ের দল, বাগবাজারের দল ও জোড়াশাঁকোর মল্লিক পাড়ার দলের

বিশেষ পরিচিতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যম খুল্লতাত গিরীন্দ্রনাথের ও একটি সখের যাত্রাদল ছিল।

কলিকাতার এই শ্রেণীর সংস্থার কয়েকটি আবার পালা পরিবেশনে নূতনত্ব সৃষ্টি করেন। প্রচলিত রীতির পালা ছাড়াও অক্রুর দত্তের দল মাইকেল মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের গীতাভিনয় এবং মল্লিক পাড়ার দল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের গীতাভিনয়-যাত্রা আসরে উপস্থাপিত করেন। বাগবাজারের যাত্রাদলেও 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় হইত। নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষও এই দলেরই একজন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত এই ছিল দেশের যাত্রা-পটভূমিকা।

যাত্রাসংস্থা হইতে থিয়েটারে নাট্যকার আসিয়াছেন, অভিনেতা আসিয়াছেন, দেশবাসী সাধারণভাবে যাত্রা শুনিতেই অভ্যস্ত। তৎকালে দেশের সর্বত্রই যাত্রার সমাদর ছিল। যাত্রায় অভ্যস্ত এই সকল শ্রোতাই রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শক হইতেন। পেশাদার থিয়েটারের নাট্যকারদের এই সংগীতপিপাসু দর্শকদের কথা ভাবিতে হইত, ইহার ফলে থিয়েটারী নাটকে বহুসংখ্যক গান যোজনা করিতে হইয়াছে। এমত অবস্থায় রঙ্গালয়ের যাত্রাজ্ঞানসম্পন্ন নাট্যকারদের উপর যে যাত্রার প্রভাব পড়িবে ইহাতো স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে রঙ্গালয়ের বাহিরে থাকিয়া যাহারা নাট্য রচনা করিবেন তাহাদের উপরও যাত্রার প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নহে। রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রভাব এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই। বরং বলা যায়, যাত্রার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। বিলাতের অনুকরণে আমাদের দেশে যে থিয়েটারের উদ্ভব হইয়াছে তাহা দৃশ্যপটাদি দ্বারা ভারাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। নাট্যোপস্থাপনায় তিনি অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্য এবং দর্শকের কল্পনা শক্তির উপরে অধিক নির্ভর করিতে চাহিয়াছেন। [১]"ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল; কোন কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।" আধুনিক কালে অভিনয়ে দৃশ্যপটহীনতার বিষয়ে যে পাশ্চাত্ত্যে ভাবা হয় নাই তাহা নহে। এই

১। বিচিত্র প্রবন্ধ (রঙ্গমঞ্চ) পৃঃ ৭৩, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬০),

প্রসঙ্গে Antonin Artaud-এর [1]'The Evolution of Scenery' (1928) প্রবন্ধেরকথা উল্লেখ করা যায়। তথাপি নাট্যপ্রয়োগে দৃশ্যহীনতার পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের উপরে যাত্রার প্রভাবই রহিয়াছে একথা বলা চলে। কারণ সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে আহার্য অংশে চামড়া, চাটাই, মাদুর প্রভৃতির সাহায্যে মঞ্চে পাহাড়, গুহা, প্রাসাদ, রথ ইত্যাদির অবতারণা করা হইত ([২]'পুস্তকর্ম') এবং প্রয়োজনীয় প্রাণীদেরও ('সজীব') মঞ্চে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইত। কেবল যাত্রায় ইহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে।

যাত্রার কতগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দৃশ্যপট হীনতা, সঙ্গীতে গুরুত্ব প্রদান এবং দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সংরক্ষণ যাত্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যও রবীন্দ্রনাথ যাত্রা পছন্দ করিতেন— [৩]"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটাই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।"

যাত্রার বাকি বৈশিষ্ট্য অন্যতম হইতেছে ইহার গীতি-যোজনারীতি। পূর্বের যাত্রার গঠনে দেখা যাইত যে ঘটনার সূত্র ধরাইয়া দিবার জন্য দুই একটি ছোট ছোট গদ্য-সংলাপ বা পয়ার-সংলাপ—তাহারপরই গান; আবার এমনও দেখা যাইত যে পরপর কতগুলি গানের মধ্য দিয়া পাত্র-পাত্রী মনোভাব ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। এইসব গান কিন্তু সংলাপের অন্তর্ভুক্ত; ইহাদের গীতি-সংলাপ বলা যায়। উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত যাত্রায় গীতি-সংলাপের প্রাধান্য ছিল। বস্তুত গানই যাত্রার প্রাণরস বহন করিত। কৃষ্ণকমল গোস্বামী বা গোবিন্দ অধিকারীর মত প্রখ্যাত যাত্রারচয়িতাদের বিভিন্ন পালা ইহার সাক্ষ্য বহন করে। পদ্য সংলাপ পয়ার ছন্দে রচিত হইত। পরবর্তীকালে অমিত্রাক্ষর কখনো বা গৈরিশছন্দ যাত্রার সংলাপে আরোপিত হইতে থাকে। মতিলাল রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন, কেশবচন্দ্র

1. "Stage sets, theatre must be ignored. All the great playwrights thought outside the theatre. Look at Aeschylus, Sophocles, Shakespeare." Artaud

২। পুস্ত - 'কিলিঞ্জ চর্মবস্ত্রাদ্যৈ…চর্মবর্মধ্বজানগাঃ'—শ্লোক-৯, অধ্যায়-২১, নাট্যশাস্ত্র

৩। বিচিত্র প্রবন্ধ (রঙ্গমঞ্চ)—পৃ: ৭৩—৭৪, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬২)

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ প্রমুখের নাটকাবলি হইতে ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

পাত্র-পাত্রীর মনোভাব গভীর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য সংলাপের শেষে সংলাপের সূত্র ধরিয়া গান যোজনা করা যাত্রার বিশেষ রীতি। এই শ্রেণীর গান 'উক্তি-গীতি' নামে খ্যাত। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রযোজিত যাত্রায় ইহার উপযোগিতা রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাত্রার জুড়ির গানের প্রচলন ছিল। জুড়িগায়কগণ এই উক্তি-গীতি পরিবেশন করিতেন। এই জন্য জুড়িদের গান উক্তি-গীতি নামে অভিহিত হইত। বিংশ শতকের প্রথম দশক হইতেই জুড়িগান অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। জুড়িপ্রথা উঠিয়া যাইতে থাকিলেও যাত্রায় উক্তি-গীতি থাকিল। যে সকল দলের জুড়ি উঠিয়া গেল সেই সব দলের পালায় চরিত্র-অভিনেতারাই এই গীতি পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

যাত্রার আর একটি বিশেষত্ব—চরিত্রের একটি বক্তব্যের এক অংশ সংলাপে এবং আর এক অংশ গানে পরিবেশন করা। সাধারণত বাউল, পাগল বা ফকির-দরবেশ চরিত্রের সংলাপে এই রীতি গৃহীত হইত। কখনো কখনো বিবেক-জাতীয় চরিত্রেও এই পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাইত।

বিংশ শতকের প্রথমে যাত্রায় রূপকচরিত্র 'বিবেকের' প্রবর্তন হয়। 'বিবেক' মূলত গায়ক। যাত্রাপালায় বিবেক উক্তিগীতিও পরিবেশন করে। এই চরিত্রে কিছু কিছু সংলাপও থাকে। পালার প্রধান প্রধান চরিত্রের মনে ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় বিবেকের গানের সাহায্যে তাহার প্রকাশ ঘটে। 'বিবেক' নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের ভাষ্যকার, কৃতকর্মজনিত ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারক ও বিপদে ন্যায়পরায়ণ চরিত্রের আশ্বাস দাতা। বিবেকের গান অভিনয়ের tempo তুলিতেও সাহায্য করে।

বিবেকের গান ছাড়াও যাত্রায় 'গণের গান', 'একানে বালকের গান' 'যাত্রাডুয়েটগান', যাত্রাব্যালে গান' প্রভৃতি সংযোজিত হয়। এই সকল গানের জন্য পালায় বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র সৃষ্টি করা হইত। বিভিন্ন সুযোগে পালায় নানা প্রকার নাচগানের উপস্থাপনা করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যাত্রার অধিকারীরা সংগীতপিপাসু শ্রোতার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাত্রার নাচ-গান অনেক সময় যে নাট্যপ্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। নাচ-গান মুখ্য হওয়ায় নাটক গৌণ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি এই সংগীত প্রাধান্যই যাত্রার বৈশিষ্ট্য ছিল। পূর্বের থিয়েটারী নাটকে যে অনেক গীতির সন্নিবেশ করা হইত তাহার মূলেও এই যাত্রারীতির প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাট্যও এই প্রভাব বর্জিত নহে। রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতি-কবি। গানের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব প্রত্যাশিত। ইহা যেমন সত্য, তেমন নাট্যরচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রমানসে যে গীতি বহুল যাত্রার প্রভাব সক্রিয় ছিল তাহাও মিথ্যা নহে। বিভিন্ন রবীন্দ্রনাট্য ইহার পরিচয় দেয়। যাত্রার যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল আঙ্গিকের দিক হইতে চরিত্র সন্নিবেশও গীতি যোজনায় রবীন্দ্র-নাট্যেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

থিয়েটারী নাটকে যে নাচ-গান থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। বিশেষ নাট্যপ্রয়োজনে ইহার উপস্থাপনা চলিতে পারে। সাধারণত মঞ্চনাট্যে যাহা সংলাপে প্রকাশ করা সম্ভব তাহার জন্য গীতির ব্যবহার করা হয় না। অথবা মনোভাবকে আরো গভীর ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য যাত্রার মত থিয়েটারী নাটকে সংলাপের শেষে সংলাপানুরূপ ভাবযুক্ত একটি গান জুড়িয়া দেওয়া হয় না। অধিকাংশ স্থলেই সংলাপে চরিত্রের মনোভাব ব্যক্ত করা হয়; কদাচিৎ বা গীতের সাহায্যে অর্থাৎ গীতি-সংলাপে মনোভাব প্রকাশ করা হয়। সেই জন্যই সংস্কৃত নাটক বা পাশ্চাত্ত্য নাটকে গানের সংখ্যা খুবই কম। প্রাচীন গ্রীক নাটক অবশ্য এবিষয়ে ব্যতিক্রম। গ্রীক ক্লাসিকাল নাটকের এক একটিতে অনেকগুলি কোরাস গানের সন্নিবেশ করা হইত। রবীন্দ্রনাথ গীতি-বর্জিত নাটক রচনা করিয়াছেন। একাদশ দৃশ্যে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৯), চারটি দৃশ্যে সমাপ্ত 'মালিনী' (১৩০৩) এবং তিনটি অংশে বিভক্ত 'ডাকঘর' (১৩১৮) নাটকে তিনি গান যোজনা করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে গান যে নাটকে না থাকিলেও চলে ইহা তাঁহার জানা ছিল। তথাপি তাঁহার অন্যান্য নাটকে তিনি অনেক গান যোজনা করিয়াছেন। নাটকে গান থাকিবে কিনা তাহা নাট্যকারের রচনা রীতির উপর নিভর করে।

রবীন্দ্রনাথ যাত্রার আসরের জন্য নাটক রচনা করেন নাই। দৃশ্যপটের আড়ম্বর সহ্য করিতে না পারিলেও তাঁহার নাটকও মঞ্চে উপস্থাপিত হইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম দিকের ট্রাজেডি-নাটক 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'-এ এলিজাবেথীয় মঞ্চ-নাট্যের প্রভাবও লক্ষিত হয়। থিয়েটারের

অনুরূপ মঞ্চেই তিনি তাঁহার নাটকাবলীর উপস্থাপনাও করিয়াছেন। তথাপি সামগ্রিক ভাবে তাঁহার নাটকে গীতির উপযোগিতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রূপক সাংকেতিক নাটকে 'ঠাকুরদা', 'দাদাঠাকুর', 'বাউল' ও 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' চরিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐশী শক্তির মর্মকথা, অতীন্দ্রিয় শক্তির রহস্য-জ্ঞান ও ন্যায়-অন্যায় বোধ সম্পন্ন এই সকল চরিত্র সৃষ্টিতে যাত্রার রূপক-চরিত্র 'বিবেকের' প্রভাব পড়িয়াছে। বিবেকের মত দাদাঠাকুরও মনের মানুষ—[১]"এই আমাদের কোণের মানুষ

দাদাঠাকুর।

এই আমাদের মনের মানুষ

দাদাঠাকুর।"

—শোনপাংশুর গান

বিবেক চরিত্রে সামান্য সংলাপ থাকিলেও প্রধানত এই চরিত্রের বাক্তব্য পরিবেশিত হয় গানে গানে। কিন্তু 'ঠাকুদা' প্রভৃতি চরিত্র কখনো গানে কখনো বা সংলাপে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। আবার 'ঠাকুরদা' প্রভৃতি চরিত্র নাট্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যাত্রার বিবেক চরিত্র নাট্যঘটনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত। এইখানে 'বিবেক' ও 'ঠাকুরদা' জাতীয় চরিত্রের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাট্যে 'ঠাকুরদা' চরিত্রের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দুইটি দৃশ্যে রচিত 'শারদোৎসব' (১৩১৫) নাটকে। এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বেতসিনীর তীরস্থ বনে বালকদের নৌকা বাইচ প্রসঙ্গে 'ঠাকুরদাদার' গান যাত্রার উক্তি-গীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়,—

তৃতীয় বালক—কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ঠাকুরদাদা—(গান) আনন্দেরই সাগর থেকে

এসেছে আজ বান।

দাঁড় ধরে আজ বস্‌রে সবাই

টান্‌রে সবাই টান্।

—পৃঃ ২৪ (১৩৬৮)

১ অচলায়তন—পৃঃ ৫৮—রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৭)

তৃতীয় বালকের উক্তি 'নৌকো বাচ' প্রসঙ্গে 'ঠাকুরদাদা' চরিত্র গান সুরু করিয়াছে। ছয়টি দৃশ্যে রচিত 'অচলায়তন' (১৩১৮) নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে পঞ্চকের কথার পৃষ্ঠে নাট্যকার 'দাদাঠাকুর' চরিত্রে উক্তিগীতি প্রয়োগ করিয়াছেন,—

পঞ্চক—ঠাকুর, আমিতো বর্ষণের জন্য তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এই বারতো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।

দাদাঠাকুর—(গান) বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ।
এবার ধর দেখি তোর গান।
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে,
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

—পৃঃ ৫৬ (১৩৬৭)

কুড়িটি দৃশ্যে রচিত 'রাজা' (১৩১৭) নাটকে 'বাউল' ও 'পাগল' চরিত্রের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। যাত্রা নাট্যেও এই চরিত্র সংযোজিত হয়। ইহারা সাধারণত গানের মধ্য দিয়া বক্তব্য পরিবেশন করে। এই শ্রেণীর চরিত্র প্রাণের মানুষের খবর রাখে। রাজার রাজারও সন্ধান জানে। আপন ভোলা এই সব চরিত্র ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে। ইহারা মানবমনে এই মহিমা জাগ্রত করিতে সাহায্য করে। 'রাজা' নাটকের 'বাউল' এবং 'পাগল' চরিত্রেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই চরিত্রে উক্তি-গীতিও সংযোজিত হইয়াছে। রাজাকে দেখা না-দেখার প্রশ্নের উত্তরে ভবদত্তের কথার রেশ ধরিয়া গীত—'বাউলের' গানটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য,—

কৌণ্ডিল্য— · · · রাজাকে দেখেছ, কি দেখনি ?

ভবদত্ত—রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিল্য। ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এদেশী হয়ে উঠ্‌ছে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে

কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মত পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে। (প্রস্থান)

বাউলের দল—(গান) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

তাই হেরি তায় সকল খানে।

আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায়, তাই না হারায়,

ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়

তাকাই আমি যেদিক পানে।

২য় দৃশ্য --পৃঃ ৩১—৩২ (১৩১৩)

'ঠাকুরদাব' কথা প্রসঙ্গে 'পাগলের' গানটিও উদ্ধার করা যাইতে পারে, —

কুম্ভ—লোকে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা—বেরিয়েছে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই, আলো নেই, কিছু না।

কুম্ভ - কেউ বুঝি ধরতেই পারেনা।

ঠাকুরদা—হয়ত কেউ পারে।

কুম্ভ—যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদা—সে যে কিছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা……

পাগল -(গান) তোরা যে যা বলিস ভাই

আমার সোনার হরিণ চাই।

* * * *

আমারা যা ছিল তা দিলেম কোথা

যা নেই তারি ঝোঁকে,

আমার ফুরোয় পুঁজি ভাবিস বুঝি

মরি তাহার শোকে!

ওরে আছি সুখে, হাস্যমুখে

দুঃখ আমার নাই।

আমি আপনমনে মাঠে বনে

উধাও হয়ে যাই।

—২য় দৃশ্য, পৃঃ ৩৯ (১৩১৩)

এই নাটকের 'বিবেক' প্রভাবিত 'ঠাকুরদা' চরিত্রের গানে যাত্রারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সংলাপে যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে

আরো গভীর করিবার জন্য সংলাপের সঙ্গে সংলাপ-ভাবাত্মক গানেরও অবতারণা করা হইয়াছে,—

তৃতীয়া—ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি।

ঠাকুরদা—হাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন-কেমন করছে।

(গান)

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তারি লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়। —৫ম দৃশ্য, পৃঃ ৬৫

এই গীতিটি আবার 'বিবেকের' গানের মত সংলাপদ্বারা খণ্ডিত হইয়া দুই ভাগে পরিবেশিত হইয়াছে।

চারটি দৃশ্যে সমাপ্ত 'ফাল্গুনী' নাটকের (১৯১৬) 'অন্ধবাউল' চরিত্রটি যাত্রাপ্রভাবিত। অন্ধবাউল যাত্রার বিবেকের কথা স্মরণ করাইয়াছে। বিবেক যে কেবল কৃতকর্মের সমালোচনা করে এবং জীবনে বল, ভরসা ও আশার সঞ্চার করে তাহাই নহে। সে অনুসরণীয় পথেরও সন্ধান দেয়। বিবেক জীবন রহস্যের সন্ধান জানে। ফাল্গুনীর অন্ধবাউল জীবন-স্বরূপ-সন্ধানীদের পথের দিশারী ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। জীবন রহস্যভেদের জন্য যে দিব্যানুভূতির প্রয়োজন অন্ধবাউল তাহারই প্রতীক। অন্ধবাউল জীবন সন্ধানীদের আশার বাণী শুনাইয়াছে,—

বাউল—(গান) হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওরে বীর, হে নির্ভয়।

** ** ** **

ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক
হোক অভ্যুদয় রে। ৪র্থ দৃশ্য, পৃঃ ৯৬ (১৩৫৪)

দিব্যানুভূতিসম্পন্ন এই বাউলই জীবন-রহস্যের সন্ধান দিয়াছে। তাই অন্ধ হইলেও সে পথ দেখাইতে পারে,—

"ওই যে বাউল আসছে।
কী হে, তুমি পথ দেখাতে পার?

বাউল ॥ পারি।" --৪র্থ দৃশ্য, পৃঃ ৯৩ (১৩৫৪)

একটি দৃশ্যে সমাপ্ত 'মুক্তধারা' নাটকে (১৩২৯) যাত্রাপ্রভাবিত 'বাউল' চরিত্র রহিয়াছে। এই চরিত্র সংগীতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে,—

বিজয় পাল—…যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়—আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয় পাল—মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়—তবে আমি এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পালের প্রস্থান]

বাউল—(গান) ওতো আর ফিরবে নারে, ফিরবে না আর, ফিরবে নারে।

ঝড়ের মুখে ভাসল তরী, কূলে আর ভিড়বে নারে।

—পৃঃ ৩৪ (১৩৫৯)

অভিজিৎও আর ঘরে ফিরিতে পারে নাই। মুক্তধারার স্রোত তাহাকে লইয়া গেল। এই নাটকের ধনঞ্জয় চরিত্রে আত্মিক শক্তির প্রভাবে ন্যায় ও মনুষ্যত্ব বোধের জাগরণ-প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। ধনঞ্জয় নির্যাতিত আত্মার প্রতীক। কর্তব্য-অকর্তব্য এবং ন্যায়-অন্যায় বোধের ধারক ও প্রধানতঃ গীতি পরিবেশনকারী যাত্রার রূপক চরিত্রের সঙ্গে এই চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। ধনঞ্জয়ের চরিত্রে উক্তি-গীতি সংযোজিত হইয়াছে। মনোভাব প্রকাশের জন্য এই চরিত্রে সংলাপ ও গানের মিশ্র প্রয়োগ করা হইয়াছে। আবার ধনঞ্জয়ের গান যাত্রার বিবেক চরিত্রের গানের মত অন্যের এবং নিজের সংলাপ দ্বারা খণ্ডিত হইয়া ভাগে ভাগে পরিবেশিত হইয়াছে,—

রণজিৎ—(প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি তোরা শিব তরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী তুমি এই খানেই রইলে।

সকলে—আমদের প্রাণ থাকতে সে হবেনা।

ধনঞ্জয়—(গান) রইল বলে রাখলে কারে?

হুকুম তোমার ফলবে কবে?

টানাটানি টিঁকবে না ভাই,

রবার যেটা সেটাই রবে।

রাজা টেনে কিছুই রাখতে পারবেনা। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

রণজিৎ—মানে কি হল?

ধনঞ্জয় --যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিঁকবে না।

(পূর্বগীতাংশ)

যা-খুশি তাই করতে পার
গায়ের জোরে রাখ মার,
যার গায়ে তার ব্যথা বাজে
তিনিই যা সন সেটাই সবে।

রাজা, ভুল করছ---এই যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।

(পূর্বগীতাংশ)

ভাবছ হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয়না যেটা সেটাও হবে।

---পৃঃ ৪৯ -৫০ (১৩২৯)

ধনঞ্জয়ের--'আরো প্রভু আরো আরো', 'ভুলে যাই থেকে থেকে', 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপাসে' গানগুলিও form-এর দিক হইতে যাত্রাপ্রভাবিত। গীতি-যোজনায় রবীন্দ্র-নাট্যে যে মাঝে মাঝে যাত্রার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে অন্যান্য নাটক হইতে তাহার আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতে পারে। 'রাজা ও রাণী' (১২৯৬) পঞ্চাঙ্ক নাটকের কুমার সেন সম্পর্কে ভালবাসা অবলম্বনে ইলার মনোভাব সংলাপেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে থিয়েটারী নাটকে আর গানের তেমন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ইলার মনোভাব গভীর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই হয়ত সংলাপের শেষে গানের অবতারণা করা হইয়াছে। এই গানটি যাত্রার উক্তি-গীতি প্রভাবিত,—

ইলা······ ভুলে যদি
সুখী হয় সেই ভাল ভাল বেসে যদি
সুখী হয় সেও ভালো। তোরা সখী, মিছে
বকিসনে আর। একটু চুপ কর।

(গান)

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও।

** ** **

তুমি চিরদিন মধু-পবনে
চির-বিকশিত বন ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ সুখ স্রোতে ভাসিয়ো। (৪র্থ দৃশ্য, ৫ম অংক)

'রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত রূপ চার অংশে বিভক্ত 'তপতী' (১৩৩৬) নাটকের বিপাশার গানেও উক্তিগীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় (মহারাণী কাশ্মীরের পথে একলা চলিয়া যাইবার পরে),---

নরেশ---তিনি গেছেন একলা ঘোড়ায় চড়ে কাশ্মীরের পথে।

বিপাশা ---বলো বলো, সব কথাটা বল।

নরেশ -পত্র পাঠিয়েছেন তিনি আর ফিরবেন না।..... ..

বিপাশা ---আহা, কী আনন্দ! মুক্তি এতদিন পরে!

নরেশ- -বিপাশা তাঁকে তো বাঁধতে কেউ পারেনি!

বিপাশা---শিকল পরাতে পারেনি, খাঁচায় রেখেছিল।.....

নরেশ- -আমরা যাব তাঁকে ফেরাতে। এতক্ষণে তিনি গেছেন নন্দীগড়ের মাঠের কাছে।

বিপাশা---যেয়োনা যেয়োনা, তিনি তোমার নন; তাঁকে পাওনি, পাবেও না। আজ ভাঙার উৎসবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন পাষাণের বুক-ফাটা নির্ঝরের মতো।

(গান)

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্ত ধারায় উন্মাদিনী দিশা হারায়,

* * * * *

আপনস্রোতে আপনি মাতে সাথি হল আপন সাথে—
সবহারা সে সব পেল তার কূলে কূলে।

—২য় অংশ, পৃঃ ৭৩—৭৪ (১৩৫৬)

পঞ্চাঙ্ক 'বিসর্জন' (১২৯৭) নাটকের অর্পণার গানেও উক্তি-গীতির আভাস পাওয়া যায়,—

অপর্ণা—জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা তরে—প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চির রাত্রি দিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত! ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধদ্বারে আছ বসে?

(গান)

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী। (২য় দৃশ্য, ২য় অংক)

জয়সিংহের গানেও ইহা লক্ষিত হয়,—

জয়সিংহ—...... এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দ সুখে নৃত্য করে
নারীদল, মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিদিকে, তট-প্লাবী
তরঙ্গিনী-সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারিদিক হতে—উঠে গীত গান,
বহে হাস্যপরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে। আমিও চলিনু।

(গান)

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই
আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে। (৩য় দৃশ্য, ২য় অংক)

'অচলায়তন' নাটকে পঞ্চক চরিত্রের কয়েকটি গানে উক্তি-গীতি রহিয়াছে,—এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গানগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

(ক) 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্ গুনিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে (২য় দৃশ্য)

(খ) আমি কারে ডাকিগো
আমার বাঁধন দাওগো টুটে। (২য় দৃশ্য)

(গ) সকল জনম ভবে ও মোর দরদিয়া।
কাঁদি কাঁদাই তোবে ও মোর দবদিযা। (৪র্থ দৃশ্য)

'রাজা' নাটকে রাজাব -'আমি রূপে তোমায ভোলাবোনা ভালবাসায ভোলাব' (৮ম দৃশ্য), সুদর্শনাব 'এ অন্ধকাব ডুবাও তোমাব অতল অন্ধকারে' (১৪শ দৃশ্য), এবং সুবঙ্গমাব 'ভোব হল বিভাবরী, পথ হল অবসান' (১৯শ দৃশ্য) উক্তি-গীতিব অন্তর্গত। 'ফাল্গুনী' নাটকেও ববীন্দ্রনাথ উক্তি-গীতিব সন্নিবেশ কবিয়াছেন। 'চোখেব আলোয দেখেছিলেম চোখের বাহিরে' গানটিকে ইহার দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ কবা যাইতে পারে।

দৃশ্য বিভাগহীন চাব অংকে বচিত 'নটীব পূজা'য (১৩৩৩) শ্রীমতীর 'আব লোখোনা আঁধারে আমায দেখতে দাও'। ২য অংক) এব দুইটি দৃশ্যে সমাপ্ত 'চণ্ডালিকা' (১৩৪০) নাটিকাব 'প্রকৃতি'র বলে দাও জল, দাও জল' (১ম দৃশ্য) ও 'পথের শেষ কোথায, শেষ কোথায -কী আছে শেষে' (২য দৃশ্য) উক্তি-গীতিব চমৎকাব দৃষ্টান্ত রূপে গৃহীত হইতে পারে। চাবটি দৃশ্যে বচিত 'তাসের দেশ'-এ (১৩৪০)রাজপুত্রেব -'যাবই আমি যাবই ওগো' (১ম দৃশ্য), 'স্বপনে দাও ধবা' (১ম দৃশ্য), ছক্কার -'চলো নিযম মতে' (২য় দৃশ্য), এবং টেক্কানীব 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায জলে' (৪র্থ দৃশ্য) form-এর দিক হইতে যাত্রাব উক্তি গীতি প্রভাবিত বলিযা ধরা যাইতে পারে।

পাঁচটি অংকে সমাপ্ত 'চিব কুমাব সভা' (১৩১১) প্রহসনে অক্ষয় এবং নীরবালা চরিত্রে মাঝে মাঝে উক্তি-গীতি সংযোজিত হইয়াছে। নীরবালার -জয় যাত্রায় যাও গো' (১ম অংক) এবং অক্ষয়েব—'বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ' (১ম দৃশ্য—৫ম অংক) প্রভৃতি গান এই পর্যায় ভুক্ত হইতে পারে। যাত্রার উক্তি-গীতি চরিত্রের উক্তি ধরিযা সংযোজিত হইলেও ইহা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করা হইত না। কিন্তু এই নাটকেব উল্লিখিত গানের সঙ্গে হাস্যরসের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই দিক হইতে যাত্রাব উক্তিগীতি ও এই উক্তি-গীতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

একটি সংলাপেব একাংশ কথায় এবং অপবাংশ গানে প্রকাশ করিবার যে রীতিব বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে যাত্রার সেই রীতির পরিচয় রবীন্দ্রনাট্যেও

পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'রাজা' নাটকের 'ঠাকুরদা'-চরিত্রের সংলাপ উদ্ধারযোগ্য,—

ঠাকুরদা—বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল?

বাউল—খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে —সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা—বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড় ভাল মানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তাহলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ওযে আজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে।

(গান)

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড় উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?

* * *

তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়। (৫ম দৃশ্য, পৃঃ ৬৩-৬৪, ১৩৫৩)

'অচলায়তন' নাটকে 'পঞ্চক'—চরিত্রে এই রীতির পরিচয় রহিয়াছে,—

পঞ্চক—ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলছি আমার মন ক্ষেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছিনে— তাই দাদাঠাকুর, মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়—তুমি জোর দাও—তুমি জোর দাও—তুমি আর দাঁড়াতে দিও না।

(গান)

আমি কারে ডাকিগো,
আমার বাঁধন দাওগো টুটে।

* * *

ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,

কেবল ভাষা হারা অশ্রু ধারায়
পরাণ কেঁদে ওঠে।

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না? তুমি যার কথা বলো তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েছেন?

দাদাঠাকুর—তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

২য় দৃশ্য, পৃঃ ৫৪-৫৫, (১৩৬৭)

যাত্রার ফকির, বাউল, পাগল প্রভৃতি চরিত্রের মত একই সংলাপে কথা ও গীতের ব্যবহার-রীতিটি 'চির কুমার সভা'র অক্ষয় চরিত্রেও দেখা যায়। অক্ষয় অবশ্য ফকির, বাউল বা পাগল নহে, দস্তুর মত সংসারী, রসিক ও সংগীত রসিক। এই দিক হইতে যাত্রার উক্ত চরিত্রগুলির সঙ্গে অক্ষয়ের কোন সাদৃশ্য নাই। এখানে শুধু সংলাপ উপস্থাপনার ভঙ্গিটি উল্লেখের বিষয়—,

স্বরবালা তোমাকে তো বেশি খোঁজা খুঁজি করতে হবে না।

অক্ষয়—তা হবে না—

(গান)

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ
তাই ভাবতে বেলা অবসান।
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি

বিরহ যামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদ তাপে যখন তাপিবে
এপাশ ও পাশ বিছানা মাপিবে,
মকর কেতনে কেবলি শাপিবে—

১ম দৃশ্য, পৃঃ ৩২, (১৩৬৭)

যাত্রায় এক সময় 'গণের গানের' খুব প্রচলন ছিল। বন্দিগণ, সৈনিকগণ ভিখারী ও ভিখারিণীগণ, পুরবাসিগণ প্রভৃতি চরিত্র এই গীতি পরিবেশন করিত। ইহার জন্য প্রত্যেক যাত্রা সংস্থায় একদল কবিয়া বালক রাখা হইত। তাহাদের 'যাত্রাদলের ছোকরা' বলা হইত। ছোকরাদের এই জাতীয় গানের মধ্য দিয়া যাত্রায় বিশেষ বিশেষ পরিবেশ রচনা করা হইত। বন্দীরা রাজকীয় পরিবেশ, সৈনিকরা যুদ্ধের পরিবেশ, ভিখারীরা দুর্ভিক্ষের

পরিবেশ, সখীগণ আনন্দের পরিবেশ এবং পুরবাসীরা তাহাদের গানের মধ্যদিয়া দেশাত্মবোধক পরিবেশ প্রভৃতির সৃষ্টি করিত। রবীন্দ্রনাট্যেও এই রীতি গৃহীত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে 'শারদোৎসব' নাটকে বেতসিনীর তীরের বনে রাজা আসায় বন্দীদের 'রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে' (২য় দৃশ্য) এবং 'রাজা' নাটকে বসন্ত উৎসব সম্পর্কীয় বালকদলের 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—(১৮শ দৃশ্য) গান দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুইটি 'গণের গান'-ই বিশেষ পরিবেশ রচনায় সাহায্য করিয়াছে---একটিতে রাজকীয় পরিবেশ অপরটি বসন্ত-উৎসব পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। 'অচলায়তন' নাটকেও শোণপাংশুগণ ও দর্ভকদলের জন্য 'গণের গান' সংযোজিত হইয়াছে। 'রাজা' নাটকে 'বিরহ মধুর হল আজি মধু রাতে' (৪র্থ দৃশ্য) এবং 'যা ছিল কালো ধলো' (৫ম দৃশ্য) গান দুইখানিও 'গণের গানের' অন্তর্ভুক্ত। এই নাটকে পঁচিশ-ছাব্বিশখানি গান রহিয়াছে। অথচ ইহা গীতিনাট্য নহে। এই নাটক হইতে কিছু গান বাদ দিলেও নাটক বুঝিবার পক্ষে এবং উপস্থাপনার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। তথাপি গানগুলি নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। গদ্য অথবা পদ্য সংলাপ প্রাধান্য পাইতে থাকিবার পরেও এক একটি পূর্ণাঙ্গ যাত্রা পালায় পঁচিশ হইতে পঞ্চাশখানা পর্যন্ত গান সংযুক্ত হইত। ইহা যাত্রারই বিশেষত্ব। যাত্রা রচয়িতারা সংগীত পিপাসু বাঙ্গালী দর্শকের কথা ভাবিয়াই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। রবীন্দ্রনাট্যে অধিক গীত-প্রীতির মূলে তাঁহার গীতি-কবি সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও তাঁহার উপরে যে গীতি প্রধান যাত্রার প্রভাব পড়িয়াছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'রাজা' নাটকের অত্যধিক গীতিসংখ্যা ইহারই প্রমাণ দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ক নাই। সঞ্জীবচন্দ্র 'যাত্রা সমালোচনায়' উল্লেখ করিয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রায় প্রত্যেক চরিত্র নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত; তথাপি নৃত্যনাট্যের সঙ্গে এই প্রকারের যাত্রার কোন সাদৃশ্য নাই। নৃত্যনাট্যে সব চরিত্রই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে বটে; কিন্তু ইহার সঙ্গে গীতি পরিবেশিত হয় রঙ্গস্থলের পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট শিল্পী দ্বারা। যাত্রায় এই রীতির দৃষ্টান্ত মিলে না।

গীতিনাট্য প্রসঙ্গে অবশ্য যাত্রার কথা উঠিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১২৮৭)। এই নাট্যে গদ্য বা পদ্য সংলাপ

সংযোজিত হয় নাই। ইহার সবই গীতি-সংলাপ, অর্থাৎ গান অবলম্বনেই চরিত্র বক্তব্য পরিবেশন করিয়াছে। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রায় এই রীতি অবলম্বন করা হইত। এই প্রসঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নাটগীতের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণযাত্রা দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। গীতি-নাট্যে যে গানের অতিরিক্ত অভিনয়-নাট্যগুণ রহিয়াছে। কৃষ্ণযাত্রায় কদাপি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই দিক হইতে কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের পার্থক্যও রহিয়াছে। কৃষ্ণযাত্রায় ভক্তিভাব মিশ্রিত রাধাকৃষ্ণের কথা শুনানো হইলেও রাগ-তাল আশ্রয়ী গীতিই ইহাতে মুখ্য স্থান লাভ করিত। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাস্রোত অপেক্ষা ইহাতে গানের রসই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে—[১]"মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।"

কিন্তু 'বাল্মীকি প্রতিভা'—[২]"সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে"। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রায় হৃদয়াবেগপূর্ণ সংগীতের মাধুর্যই প্রাধান্য পাইত। [৩]জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে তিনি সংগীতে নাট্যরচনার ইংগিত পাইয়াছেন Herbert Spencer-এর "The Origin and Function of Music" প্রবন্ধ হইতে। কিন্তু কৃষ্ণযাত্রায় গীতিনাট্যের পূর্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার উন্নত রূপ বলিয়া মনে করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

যাত্রাবিবর্তনে আলো ও যান্ত্রিকতা

পূর্বে যাত্রা প্রধানত নৃত্য ও গীতি নির্ভর ছিল। চৈতন্যদেব যে ষোড়শ—শতকে আসর নাট্য অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে ছোট ছোট সংলাপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গোবিন্দ

১। **জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১০৮ (১৩৭০) রবীন্দ্রনাথ।**

২। ঐ —পৃঃ ১০৭

৩। ঐ —পৃঃ ১০৭

অধিকারীর যাত্রায় অনেক জায়গায় ঘটনার সূত্র ধরাইয়া দিবার জন্য ছোট ছোট সংলাপ ব্যবহার করা হইয়াছে। ঐ শতকের শেষে, থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রার সংলাপ বড় হইতে আরম্ভ করে। মতিলাল রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন প্রমুখের পালায় ইহার পরিচয় রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে যাত্রায় গৈরিশ-ছন্দে সংলাপ সংযোজন একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। অনেক পালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দেও সংলাপ রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যাত্রা-সংলাপে এই দুই ছন্দোরীতি বিশেষরূপে প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর-কালে যাত্রানাট্যে দীর্ঘ-সংলাপ ও পদ্য-সংলাপ সংযোজন রীতির পরিবর্তন ঘটে।

একসময় যাত্রায় মার্গ সংগীতের সুর সংযোজিত হইত। বাংলাদেশে কীর্তন গানের বিস্তার লাভ ঘটায়, যাত্রায় কীর্তনের সুর আরোপিত হইতে আরম্ভ করে। ঊনবিংশ শতকের যাত্রায় ক্লাসিক্যাল রাগ-রাগিণীর সুর, কীর্তনাঙ্গ সুর ও মনোহরশাহী সুর বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাত্রায় জুড়ির গানের প্রবর্তন হয়। আদি-রসাত্মক যাত্রা-ডুয়েট, খেমটা নাচ ও ইহার উপযোগী চটুল সুর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাত্রায় প্রচলিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রা নাট্যে সংলাপ দীর্ঘ হইতে আরম্ভ করায় গানের সংখ্যা কমিতে থাকে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে যাত্রায় বিবেক চরিত্র প্রবর্তিত হওয়ায়, জুড়ির গান অপ্রচলিত হইতে সুরু করে। মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি হইতে যাত্রাব্যালের প্রবর্তন হয় বিংশ শতকের প্রথম পাদে। এই সময় যাত্রা গানের সুর আরোপেও পরিবর্তন ঘটে। টপ্পা-ভাঙা তানযুক্ত থিয়েটারী সুর যাত্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

যাত্রায় একসময় পৌরাণিক কাহিনী, মঙ্গলকাব্যের কাহিনী ও চৈতন্য কাহিনী বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে যাত্রায় ঐতিহাসিক কাহিনী ও স্বদেশী ভাবমূলক সামাজিক কাহিনী পরিবেশিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আসর-নাট্যে কাল্পনিক কাহিনী, রাজনৈতিক নেতৃ-কাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীদের কাহিনী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখন পুঁজিপতিদের শোষণের বীভৎসতা, চোরাকারবারী, মজুদদারী ও মুনাফা-খুরীর ক্লেদাক্ত চিত্র, শোষিত মুটে-মজদুর ও নির্যাতিত জনসাধারণের দৈন্য-দুর্দশা, ভোট-প্রার্থীর ভণ্ডামি প্রভৃতি যেমন যাত্রার আসরে উপস্থাপিত হইতেছে,

তেমনি চৈনিক যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত কাহিনী, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ-মূলক কাহিনী, দেশত্যাগী ছিন্ন-মূলদের কাহিনী. পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক কাহিনীও যাত্রানাট্যে স্থানলাভ করিয়াছে। বর্তমানের যাত্রায় পদ্য-সংলাপ নাই ; যাত্রা-ব্যালে, যাত্রা-ডুয়েট ও জুড়ির গান উঠিয়া গিয়াছে এবং গানের সুরের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের যাত্রার এক একটি পালায় যেখানে পঁচিশ হইতে পঞ্চাশটি পর্যন্ত গান সংযোজিত হইত, এখন সেখানে দশটিরও কম গান সংযোজিত হইতেছে। এখন যাত্রা অভিনয়-প্রধান। এই অভিনয় রীতিও পরিবর্তিত হইতেছে।

যুগ ও রুচির প্রভাবে বহু পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করিয়া যাত্রা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সঙ্গীত-প্রয়োগ-পদ্ধতির রূপান্তর ঘটিয়াছে, পালা রচনার ধারা ও পরিবর্তিত হইয়াছে। বিষয়-বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ হওয়ায় পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালার পরিবর্তে এখন ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি পালা রচিত হইতেছে। ভাবের দিক হইতে ঘটিয়াছে বিপ্লব। তাই অবতারবাদ, অদৃষ্টবাদ, অহেতুকী-ভক্তিভাব যাত্রার প্রধান অবলম্বন হইয়া রহিল না। স্বদেশীয়ানা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং নানা ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও সামাজিক ঘটনার সঙ্গে মানবিকতার ভাব স্বাভাবিক কারণেই ক্রমে যাত্রানাট্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এত পরিবর্তনেও কিন্তু যাত্রা ঠিক যাত্রাই আছে। নাটক দেখিয়া মোটেই বুঝিতে কষ্ট হয় না কোনটি যাত্রা আর কোনটি থিয়েটার। এমন কি একটি যাত্রানাট্য যদি মঞ্চের সমস্ত সুবিধা গ্রহণ করিয়া প্রয়োগ করা হয়। তাহা হইলেও ইহা যাত্রাই হইয়া উঠিবে, থিয়েটার হইবে না। প্রসিদ্ধ অভিনেতার এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যাহার ফলে মেক আপ পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন চরিত্রে যথাযথ বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় করিলেও, রূপের অন্তরালে যে মানুষটি থাকে, তাহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। মঞ্চে প্রযুক্ত যাত্রাও তেমনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুণে দর্শকদের কাছে আত্মপরিচয় গোপন করিয়া রাখিতে পারেনা। যাত্রার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে দৃশ্যপট হীন নাট্যোপস্থাপনা রীতি, সঙ্গীত প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য, ভাবাবেগ-মূলক অভিনয় ও লোকশিক্ষার উপাদানের মধ্যে। সুতরাং মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া যাত্রার যুগোচিত পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। পরিবর্তনের মধ্যদিয়াই সব কিছু বাঁচিয়া থাকে। নূতনকে গ্রহণ করিবার

মধ্যেই প্রকৃত শক্তির পরিচয়। এ কথা ঠিক যে, সকল প্রকার পরিবর্তন অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রা পালা যদি কালিয়-দমন যাত্রার স্তর আঁকড়াইয়া থাকিত তাহা হইলে ইহার বিলুপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

কোন কোন যাত্রা-সংস্থা থিয়েটারী প্রয়োগ-রীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া যাত্রানাট্য প্রয়োগ করিতে উদ্যোগী হইতেছেন। পালার কোন বিশেষ অংশ গীতি বা সংলাপাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনা না করিয়া কোনো কোনো পেশাদার যাত্রা-সংস্থা থিয়েটারের অনুকরণে পর্দা ও নানা প্রকারের রঙিন আলোর ব্যবহার দ্বারা ঐ বিশেষ অংশের উপস্থাপনা করিবার কথা ভাবিতেছেন। এই পর্দা ও আলোর ব্যবহার যে দৃশ্যপটের সমগোত্র, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। দৃশ্যপটহীন যাত্রায় এইভাবে ইহাদের ব্যবহার যে একান্ত প্রয়োজনীয় একথা বলা যায় না। আসলে থিয়েটারের প্রভাবে এই সকলের সাহায্যে পল্লীর সাধারণ যাত্রা দর্শকদের হঠাৎ তাক লাগাইয়া দিবার বাসনা ইহার পিছনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে মাত্র।

দৃশ্যপটহীনতা যাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য। যাত্রা পালায় দুষ্মন্ত যে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সঙ্গে শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতে থাকে আসরে দৃশ্যপটাদির উপস্থিতি না থাকিলেও তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। স্থান-কাল-পরিবেশ সম্পর্কে এই সৃজনী শক্তির সহায়ক যাত্রার বর্ণনা মূলক সংলাপ। যাত্রাপালার সংলাপ রচনায় এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। দৃশ্য পটহীন যাত্রা-পালার বিভিন্ন রস সংলাপ ও গীতি-বৈশিষ্ট্য যোগে [১]"অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।" কাজেই দৃশ্যপটের ব্যবহার দ্বারা যাত্রাকে Theatre-এর অনুকরণে পর্যবসিত করা বাঞ্ছনীয় নহে।

যাত্রার উপর থিয়েটারের প্রভাব প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর একটি মন্তব্য মনে পড়ে—[২] "যাত্রার দুর্ভাগ্য বাঙলা থিয়েটার আজকালকার যাত্রাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছে। এই জন্যই আজ ত্রিশ বৎসর থেকে যাত্রার দল হয়ে দাঁড়িয়েছে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি'।"—কিন্তু বাঙালীর নিজস্ব নাট্যরীতি যাত্রাকে থিয়েটারের প্রভাবে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা সমীচীন নহে।

১। রঙ্গমঞ্চ—বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ।

২। নাট্যশালা প্রসঙ্গে—শিশির কুমার ভাদুড়ী।

যাত্রার রঙ্গস্থলে একখানি দীর্ঘ আসন অথবা দুইখানি ছোট আসন (সাধারণত চেয়ার) ব্যবহারের পরিবর্তে "ভারতী-অপেরা" ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি কাঠের ছোট ছোট ব্লক উপস্থাপিত করিয়াছে। "সূর্য সেন" পালার বিভিন্ন দৃশ্যে এই ব্লকগুলি বিভিন্নভাবে সাজাইয়া অভিনয় করা হয়। তরুণ অপেরা ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত রীতির আসন ব্যবহারের পরিবর্তে "লেনিন" পালায় কয়েকটি লম্বা কাঠের ব্লক ও একটি কাঠের গোল বেদি রঙ্গস্থলের মাঝখানে রাখিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। এই দুই সম্প্রদায়ই অভিনয় কালে কাঠের ব্লকের উপর উঠিয়া, নামিয়া, দাঁড়াইয়া, বসিয়া অভিনয় করে। আবার কখনো কখনো ঐগুলির ব্যবহার ছাড়াও অভিনয় চলে। এফেক্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইগুলি ব্যবহার করা হইলেও অভিনয় দেখিয়া মনে হয় যে আসরে এই সব ছাড়াও পালা দুইটি অভিনীত হইতে পারে। 'লেনিন' নাটকের অভিনয় শেষে কাঠের লম্বা ব্লক ও বড় বেদির আড়ালে শিল্পীরা সকলে লুকাইয়া থাকেন। তাহাদের নাম ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে এক একজন উঠিয়া অভিবাদন করিয়া রঙ্গস্থল হইতে প্রস্থান করেন। ইহার মূল উদ্দেশ্য শিল্পীদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। শিল্পীদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া নূতন কিছু নহে। বহুপূর্বে নাট্য ভারতী থিয়েটারে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি ডব্লু-ডি' নাটকে পরিচালক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পীদের নাম ধরিয়া ডাকিয়া দর্শকদের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিতেন।

বর্তমানযুগ বিজ্ঞানের যুগ। মানব জীবনে প্রতিদিনই বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। গ্রামীণ লোকও ইহা হইতে মুক্ত নহে। এখন বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার শহর ও নগর হইতে গ্রামের দিকে বিস্তৃত হইতেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ-সরবরাহ হইতেছে। লোকজীবনের সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায়, লোকনাট্যেও যে ইহার প্রভাব পড়িবে ইহাতে আর আশ্চর্যের কিছু নাই। যাত্রার পালা-রচনা, সংগীত-প্রয়োগ ও অভিনয়-পদ্ধতি সবই বিশিষ্টতা পূর্ণ। আবার অভিনেতৃ নির্বাচন আলো ও আসর-প্রস্তুতি, বেশবিন্যাস এবং শব্দক্ষেপণ বিধিরও বৈশিষ্ট্য আছে। নানাভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সব পরিবর্তনের মধ্যে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনেতার পরিবর্তে অভিনেত্রী-নির্বাচন, রঙ্গস্থলে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দক্ষেপণ রীতি

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেখানে উপায় নাই সেখানে অবশ্য অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু উপায় থাকিলে, অভিনেতার সঙ্গে দর্শকদের দ্রুততর সংযোগ ঘটাইয়া রসোপলব্ধির সহায়ক হিসাবে যাত্রায় যান্ত্রিকতার ব্যবহার অসমীচীন নহে। বরং যান্ত্রিকতা ক্ষেত্র-বিশেষে অসার্থক প্রয়োগ হইতে যাত্রাকে মুক্ত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর তৃপ্তি বিধান সহজ করিয়া তুলিবে।

যাত্রায় যান্ত্রিকতার ব্যবহার করা যায় স্থান বিশেষে আলোক নিয়ন্ত্রণে ও শব্দক্ষেপণে। সাম্প্রতিক কালে যাত্রায় নামে মাত্র আলোক নিয়ন্ত্রণ সুরু হইলেও ইহাতে জোর দেওয়া হয় সংলাপ, গান, ঐকতান ও অভিনয়ের উপর। রঙিন আলোর খেলা, আলো-আঁধারী ভাব, ভাবদ্যোতক আলো প্রভৃতি এখনো যাত্রায় অপ্রচলিত। যান্ত্রিকতার সাহায্যে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চাঁদিনী-রাত, নদী বা ঝড়ের দৃশ্যের অবতারণা যাত্রার রঙ্গস্থলে এখনো অনুপস্থিত। যেখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে, সেখানেও বহুদূর বিস্তৃত দর্শকদের দেখিবার সুবিধার জন্য অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকে (high light) যাত্রার অভিনয় সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রার নৃত্যে ও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন দেবতার আবির্ভাব প্রভৃতি (বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ), ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দৈবমূর্তির আবির্ভাবে ('পাগল ঠাকুর'—নিউ প্রভাস অপেরা) ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে ('হিটলার'—তরুণ অপেরা), ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূতপ্রেতের আবির্ভাবে ('ন্যায়দণ্ড'—নবরঞ্জন অপেরা) যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহৃত হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যান্ত্রিকতার সাহায্যে যাত্রায় শব্দক্ষেপণের ('হিটলার'—তরুণ অপেরা) ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সত্যম্বর অপেরা, ভারতী অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা, তরুণ অপেরা ও নিউ আর্য অপেরায় কিছু কিছু যান্ত্রিক শব্দক্ষেপণ রীতি চলিতে থাকে। কিন্তু এখনো যাত্রায় ইহার ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই।

বিংশ শতকের ত্রিশের দশক হইতে অভিনেতা ও শ্রোতার অনুমান-কল্পনার সুবিধার্থে পরিবেশ ও ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত পাখীর ডাক, প্রতিধ্বনি, আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ প্রভৃতি শব্দক্ষেপণ যাত্রায় সুরু হইয়া যায়। ইহাতে যাত্রার আসল প্রকৃতির কোনও বিপর্যয় ঘটে নাই। বেহালা, বাঁশি, কাঠ ও করতালির সাহায্যে সৃষ্ট এই সকল ধ্বনি যে অসার্থক হইয়া উঠিত, তাহা

সহজেই অনুমান করা যায়। এই অসার্থক শব্দক্ষেপণ বিধিকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিলে যাত্রার অন্তর্মহলের বিপ্লব ঘটিবার আশংকা নাই।

কিন্তু এই যন্ত্রিকতার ব্যবহারে বিশেষ মাত্রাবোধের প্রয়োজন। যান্ত্রিকতার ব্যবহার করিতে যাইয়া যাত্রাকে থিয়েটারের ব্যর্থ অনুকরণে পরিণত করা কোন প্রকারেই সমীচীন নহে। আবার যন্ত্রসৃষ্ট ভেল্কি যাত্রানাটককে ছাপাইয়া উঠিলেও যান্ত্রিকতা যাত্রার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিবে। সুতরাং যাত্রার আন্তর প্রকৃতি বজায় রাখিয়া বহির্ভাগের দিক হইতে যান্ত্রিকতার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু শব্দক্ষেপণ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ চলিতে পারে। কিন্তু ইহার সফলতা নির্ভর করিবে মাত্রাবোধের উপর।

নাট্য আন্দোলনে যাত্রা

নাট্যোন্দোলন পুরাতন হইলেও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে থিয়েটারী নাটক লইয়া বিশেষভাবে আন্দোলন চলিতে সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নাট্য-প্রযোজনার মধ্যদিয়া নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়। পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরের কৃত্রিম খাদ্যাভাব ও জোতদার-চোরাকারবারীদের চক্রান্তের পট ভূমিকায় গ্রামীণদের জীবন-জ্বালার মর্মান্তিক অবস্থা লইয়া রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকের প্রযোজনা ইহার সার্থকও সুষ্ঠু পদক্ষেপ। ইহার পরে মতাদর্শের পার্থক্য অথবা স্বনামপরিচিতি ও অর্থ অর্জনের বাসনা লইয়া অনেকে ভারতীয় গণনাট্যসংঘ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজ নিজ পরিচালনাধীনে এক একটি মঞ্চহীন পেশাদার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ছাড়াও এই সময় হইতে বহু নাট্যসংস্থা গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই সকল সংস্থাই নবনাট্য আন্দোলনের অংশীদার। সাধারণ রঙ্গালয়ের দিক হইতে 'শ্রীরঙ্গম' থিয়েটারে যুগপ্রবর্তক নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নীতি-সংস্কার বিবর্জিত ধন-লোভি-সৃষ্ট আকালের সময় সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার জীবন্ত চিত্র অবলম্বনে রচিত তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৭), বিশ্বরূপা থিয়েটারে প্রযোজিত ও বেকারী-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের সংগ্রাম অবলম্বনে রচিত বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' (১৯৫৭) এবং থিয়েটারস্কোপের নূতন আঙ্গিকে রাসবিহারী সরকার প্রযোজিত 'লগ্ন' নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নাট্য আন্দোলনের অংশীদার সংস্থা অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অন্তরাল' (১৯৪৫), 'তরঙ্গ' (১৯৪৬), 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), 'বহুরূপী' (১৯৪৮) প্রযোজিত ও শম্ভুমিত্র পরিচালিত তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া-তার', 'পথিক', রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'চার অধ্যায়', ইবসেনের 'পুতুল খেলা', 'দশচক্র', সোফোক্লিসের 'রাজা অয়েদিপাউস', 'পাগলা ঘোড়া', তৃপ্তি মিত্র অভিনীত (একক) 'অপরাজিতা',—দেশ-বিভাগের ফলে বাস্তুহারাদের জীবনবেদনা অবলম্বনে রচিত সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' (১৯৫৩), 'মৌ চোর' (১৯৫৭), 'প্রান্তিক' প্রযোজিত ও বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত 'সংক্রান্তি' (১৯৫৯), 'বিশে জুন',—লিটিল থিয়েটার গ্রুপের কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবন সমস্যা লইয়া রচিত উৎপল দত্তের 'অঙ্গার (১৯৫৯), ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নৌবিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'কল্লোল', বাংলার বিপ্লবীদের সংগ্রামী কার্যাবলী অবলম্বনে রচিত 'ফেরারী ফৌজ', 'অজেয় ভিয়েৎনাম', 'মানুষের অধিকারে' (১৯৬৮), 'নীচের মহল' 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন', 'ওথেলো', 'জুলিয়াস সিজার',—দুই বাংলার আকাঙ্ক্ষা লইয়া রচিত ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল',—'ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রযোজিত ও বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'মরাচাঁদ', 'জীয়নকন্যা', 'দেবী-গর্জন' 'গোত্রান্তর' (১৯৬০), 'গর্ভবতী জননী',—'থিয়েটার সেণ্টার' প্রযোজিত ও তরুণ রায় রচিত 'রূপোলী চাঁদ' (১৯৫৮), 'রজনী গন্ধা' (১৯৬০), চৈনিক যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত 'সৈনিক', 'লেবেডেফ', 'নিশাচর',—মধ্যবিত্তের অর্থ নৈতিক পেষণের প্রতিফলন লইয়া ছবি বন্দোপাধ্যায় রচিত ও মিনার্ভা থিয়েটার প্রযোজিত 'কেরাণীর জীবন',—'বঙ্গীয় নাট্যসংসদ' প্রযোজিত ও সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী রচিত 'গণ্ডার', 'জনক', 'সমান্তরাল' (১৯৬০), 'ছারপোকা' (১৯৬১),—'শৌভনিক' প্রযোজিত 'মা', 'গোষ্টস্', 'ওথেলো', 'আন্তিগোন', 'দ্বিতীয় মহীপাল', 'মৃচ্ছকটিক', রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ,' 'গোরা', বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'—'অনুশীলন সম্প্রদায়ের' 'শেষ সংবাদ', 'ইস্পাত', 'কাবুলীওয়ালা',—'রূপান্তরী' প্রযোজিত জোছন দস্তিদারের 'দুইমহল' (১৯৫৮), রাজমিস্ত্রীর জীবন-সমস্যা লইয়া রচিত 'কর্ণিক', দর্জির জীবন সমস্যার পরিচায়ক 'স্বর্ণগ্রন্থি',—'ইণ্ডিয়ান থিয়েটার এসোসিয়েশনে'র 'কালো চিতা', 'মা', 'লেনিন'—চতুরঙ্গ প্রযোজিত 'বাবু' ও সলিল সেন রচিত 'ডাউনট্রেন' (১৯৫৯),—'চতুর্মুখ' প্রযোজিত 'জনৈকের মৃত্যু', 'থানা থেকে আসছি',—'অভ্যুদয়'

প্রযোজিত কিরণমৈত্রের 'বারঘণ্টা' (১৯৫৮), অর্থাভাবে মধ্যবিত্তের হীনবৃত্তি গ্রহণের নিরুপায় অবস্থা অবলম্বনে রচিত 'চোরাবালি',—'মাস থিয়েটার' প্রযোজিত 'ব্যাধ', 'শকুন্তলা রায়',—শিক্ষকদের জীবন সমস্যা লইয়া রচিত সুনীল দত্তের 'হরিপদ মাষ্টার',—'রূপভাস্বর' প্রযোজিত 'অন্ধপৃথিবী', 'চেনামুখ', 'আর কান্নানয়',—'নান্দীকার' প্রযোজিত 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'শের-আফগান', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'তিন পয়সার পালা'—'লোকমঞ্চ' প্রযোজিত ও গিরিশংকর রচিত 'শিখা' (১৯৫৩), 'একচিলতে' (১৯৫৬), 'আশ্বাস' (১৯৫৬), 'রোশনাই' (১৯৫৭), 'চেরাগ বিবির হাট' (১৯৫৯),—'পাবলব ইনষ্টিটিউট' প্রযোজিত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মরুঝঞ্ঝা' (১৯৬১), 'সম্রাট', 'কল্মাষ পাদ',—'থিয়েটার ইউনিট' প্রযোজিত 'চার দেওয়াল', 'মৃচ্ছকটিক',—'দশরূপক' প্রযোজিত 'ডানাভাঙা পাখী',—'গন্ধর্ব' প্রযোজিত 'অমৃত অতীত', 'অঙ্কুর',—'রূপকার' প্রযোজিত 'ব্যাপিকা বিদায়', 'তিলতর্পণ', 'শাস্তি', 'আলো দেখাও', 'অচলায়তন',—'চলোর্মি' প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৬৮), রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' (১৯৫৩), 'গোরা', 'অন্তরা' প্রভৃতি,—'নক্ষত্র' প্রযোজিত 'ক্যাপটেন হুররা', 'থিয়েটার ওঅর্কশপের' 'চাক-ভাঙ্গা মধু' 'গিরিশ নাট্যসংসদ' প্রযোজিত 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'বিসর্জন',—'অচলায়তনের' সুধী চন্দ্র প্রধান প্রযোজিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব',—'সর্বোদয় শিল্পি সংঘ'প্রযোজিত শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'হাবাহলধর' (১৯৬৩),—'শ্রীমঞ্চের' 'বিয়েপাগলাবুড়ো, 'মুক্তধারা',—'শিল্পীমহলের' 'নটী',—'শিল্পিমন' প্রযোজিত উৎপল দত্তের 'ঘুমনেই',—'পিপলস্ থিয়েটারের' 'কোন দিন যদি'.—'নব দরবারী' প্রযোজিত নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেহাগ',—'বৈশাখী' প্রযোজিত 'ডুইমহল', 'লবণাক্ত',—'চলাচল' প্রযোজিত 'ঠগ',—প্রতিবিম্ব প্রযোজিত 'ঝিঝিপোকার কান্না'—'লোকসংস্কৃতি সংঘের 'দ্বান্দ্বিক',—'কুশীলবের' 'বরনীয়া বরনারী',—'ছদ্মবেশী'র 'পুতুলনাচের ইতিকথা',—'বৈজয়ন্তিকের' 'নচিকেতা',—'রঙবেরঙের' 'সমুদ্র থামে না',—'শুভময়ের' 'বহুরূপী' প্রভৃতি নাটক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নাট্য আন্দোলনের সাধারণ পরিচয় প্রসঙ্গে 'নান্দনিক', 'বহুমুখী', 'ওঙ্কার', 'সাজঘর', 'ইংগিত', 'মিতালী সম্মিলনী' প্রভৃতি সংস্থা প্রযোজিত নাট্যাবলী, চিত্তরঞ্জন, কুলটি, মাইথন, পাঞ্চেৎ প্রভৃতি অঞ্চল, বিভিন্ন আপিস ও থিয়েটার আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতির কথাও বলিতে হয়। নাট্য আন্দোলনে

বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের (১৯৫৬) বিশেষ স্থান রহিয়াছে। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা, যাত্রা নাট্য প্রতিযোগিতা, থিয়েটারী নাট্যোৎসব, নাট্যসম্মেলন প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই সংস্থা কাজ চালাইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন নাট্যসংস্থার সদস্যগণ নানাদিক হইতে নাটক সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়া বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নূতনত্বের স্বাদ পরিবেশন করিতেছেন। ইহার ফলে বাংলা নাটকের বিবর্তন ঘটিতেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালের বিভিন্ন নাট্যসংস্থা কর্তৃক বিদেশী নাটকের অনুবাদ, ইহার অনুসরণ, ইহার প্রভাবপুষ্ট রচনা ও গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপের সঙ্গে কিছু কিছু মৌলিক নাটকও পরিবেশিত হইতেছে।

বিদেশী নাটকের অনুবাদের দিক হইতে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আকাশ বিহংগী' (The Seagull—A. P. Chekhov), 'থানা থেকে আসছি' (An Inspector Calls—J. B. Priestley), 'শকুন্তলা রায়' (Hadda Gabler—Ibsen), সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর 'ছায়াবিহীন' (Men Without Shadows—J. P. Sartre), 'জনক' (The Father -A. Strindberg), 'বিচিত্র রাগিনী' (Strange Interlude -Eugene O'neill), 'গণ্ডার' (Rhinoceros—Eugene Ionesco), উমানাথ ভট্টাচার্যের 'নীচের মহল' (The Lower Depth -Maxim Gorki), 'ঘূর্ণী' (Strife -J. Galsworthy), বহুরূপী অভিনীত শম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা' (A Doll's House -H. Ibsen), 'অয়দিপাউস' (Oedipus Tyrannus - Sophocles), 'দশচক্র' (An Enemy of the People—H. Ibsen). শৌভনিক অভিনীত নিবেদিতা দাসের 'গোষ্টস্' (Ghosts—H. Ibsen), লিটল্ থিয়েটার অভিনীত 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' (A Midsummer Night's Dreams) ও 'ওথেলো' (Othello - Shakespeare), উৎপল দত্তের 'মধুচক্র' (Mrs. Warren's Profession - G. B. Shaw), রুদ্রপ্রসাদ সেনের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' (Six Characters in Search of an Author -L. Pirandello), শিবেশ মুখোপাধ্যায়ের 'তিন চম্পা' (Three Sisters—A. P. Chekhov), থিয়েটার ইউনিট অভিনীত 'জুলিয়াস সীজার' (Julius Caeser -Shakespeare), আই. টি. এ. অভিনীত 'কালো চিতা' (Old Lady's visit -F. D. Mart) প্রভৃতির অনুবাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। Lady Gregory-র The

Rising of the Moon, J. H. Synge-এর Riders to the Sea, A. Miller -এর All My Sons, Death of a Sales man, Tennessee Williams-এর The Glass Menagerie. Pirandello-র Henry IV ('শের আফগান') ও Anouilh-এর Antigone ('আন্তিগোন'—শৌভনিক), Brechet-এর The Twopence-halfpenny Opera ('তিন পয়সার পালা'—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়). The Life of Galileo, The Measures Taken, Joe Corrie-র Hewers of Coal, Backett-এর Waiting for Godot ('ঈশ্বরবাবু আসছেন'—অশোক সেন) প্রভৃতি নাটকের বঙ্গানুবাদ বা অনুসরণে রচিত বাংলা নাটক বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে পাশ্চাত্যে নূতন রীতির অ্যাবসার্ড (absurd) নাটক প্রচলিত হইয়াছে। অবস্থাও জীবনসংঘাতের ফলে মানুষের ধর্ম বোধ, অলৌকিক শক্তিতে আস্থা, দার্শনিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ফলত জীবনের ক্রিয়াকলাপ অর্থহীন ও অবান্তর বলিয়া মনে হইতেছে। সমস্ত প্রচলিত প্রথা (conventions) হাস্যকর বলিয়া মনে হইতেছে। মানুষকে বাহির হইতে যেমন দেখা যায় মানুষ ঠিক তেমন নহে। জীবনের বাস্তবতায় অসুখী হওয়ায় জীবনের নূতন অর্থসন্ধান প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মতাদর্শ লইয়া প্রচলিত নাট্যরীতিকে অস্বীকার করিয়া নূতন আঙ্গিকে অ্যাবসার্ড নাটক রচিত হইতেছে। তাই আপাত দৃষ্টিতে ঘটনা ও পরিস্থিতির দিক হইতে জীবনে যাহা অসম্ভব তাহা এই শ্রেণীর নাটকে স্থান পায়। ভয়, অবচেতন মনের কার্যাবলী, আধুনিক মনের কামনা-বাসনা, উৎকল্পনা, রূপক-ভাব, [1]স্বপ্নীল চিন্তাধারা প্রভৃতি লইয়া এই শ্রেণীর নাটক মানসিকতার বাস্তব চিত্র (Psychological realities) তুলিয়া ধরে। অ্যাবসার্ড নাটকে অনেক সময় সুমিত বাক্য প্রয়োগও থাকেনা। সংলাপ রচনায় ভাষার দিক হইতে প্রচলিত [2]রীতি ভঙ্গ করিয়া

1. Fashioning his plays in the shape of a dream, a fantasy, or a night mare, the absurdist dramatist tries to evoke the metaphysical side of experience, with terror as his recurring motiff. P. 377, The Theatre of Revolt, Robert Brustein (Lond. 1970)

2. Most nonsense verse and prose achieve their liberating effect by expanding the limits of sense and opening up vistas of freedom from logic and cramping convention. There is, however another kind of nonsense, which relies on a contraction rather than an expansion of the scope of language. This procedure, much used in the Theatre of the Absured, rests on the satirical and destructive use of cliche—the fossilized debris of dead language. P. 338, The Theatre of the Absured, M. Esslin (Lond. 1968)

নূতন ধরণের বৈচিত্র্য ([1]'new, exceptional, and unaccustomed fashion') সৃষ্টির প্রকাশ ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে অনেক সময় দুর্বোধ্যতাও সৃষ্ট হয়। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত Samuel Backett-এর 'Waiting for Godot' (1952), 'Endgame' (1957), Eugene Ionesco-র 'How to Get Rid of It' (1954), 'Rhinoceros' (1958), Jean Genet-এর 'The Blacks' (1960) Edward Albee-র 'The American Dream' (1961) প্রভৃতি এই শ্রেণীর নাটক। এই শ্রেণীর নাটকও বাংলায় অনূদিত হইয়া অভিনীত হইতেছে।

গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপও সৌখিন এবং পেশাদার নাট্যসংস্থা দ্বারা পরিবেশিত হইয়া থাকে। শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বিপ্রদাস' (নাট্যরূপ—বিধায়ক ভট্টাচার্য), 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'শ্রীকান্ত' (নাট্যরূপ—দেবনারায়ণ গুপ্ত), তারাশংকরের 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন', 'মঞ্জরী অপেরা', বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম' (নাট্যরূপ—শচীন সেনগুপ্ত), ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'একমুঠো আকাশ', মনোজ বসুর 'বৃষ্টি বৃষ্টি' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেঘের উপর প্রাসাদ' প্রভৃতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। শৌভনিকের 'গোরা' (রবীন্দ্রনাথ), প্রান্তিকের 'নৌকাডুবী' (রবীন্দ্রনাথ), অনুশীলন সম্প্রদায়ের 'কাবুলিওয়ালা' (রবীন্দ্রনাথ), সান্ডে ক্লাবের 'যোগাযোগ' ও 'নষ্ট নীড়' (রবীন্দ্রনাথ) জনসমাদর লাভ করে। চলোর্মি কর্তৃক অভিনীত হয় শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৪৮-৪৯) এবং রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' (১৯৫৩-৫৪) ও 'গোরা' (১৯৬০)। উপন্যাস তিনটির নাট্যরূপ দান করেন বর্তমান গ্রন্থের লেখক। 'শেষ প্রশ্ন' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসদ্বয়ের নাট্যরূপদান এই প্রথম। বিভিন্ন সময়ে চলোর্মির নাট্যরূপত্রয়ের অভিনয়গুলি বিদ্বজ্জন, সাংবাদিক ও নাট্য-রসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। যুদ্ধোত্তরকালে অধ্যাপকগণও বিশেষভাবে অভিনয়ে মনোনিবেশ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অধ্যাপক কর্তৃক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অভিনীত 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং বর্তমান গ্রন্থের লেখকের পরিচালনায় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা অভিনীত 'ঘরে-বাইরে' সবিশেষ অভিনন্দিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি থিয়েটার দ্বারা

1. A Theatre of Language, Jean Vannier (Tulane Drama Review, Spring—1968)

অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' (নাট্যরূপ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও সম্পাদনা তরুণ রায়) ও 'শেষ কথা' (নাট্যরূপ বিজয় চট্টোপাধ্যায়) উল্লেখের দাবি রাখে।

থিয়েটারের মত যাত্রা-আন্দোলনও পুরাতন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ইহা বিশেষরূপে সূচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কবি, আলকাপ, সঙ্ প্রভৃতি ও যুগরুচির প্রভাবে যাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নগামী হইয়া যায়। তাই নব্যশিক্ষিত ও রুচিশীল ব্যক্তিবর্গ যাত্রার উপর বিরূপ হইয়া উঠেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে তাহারা থিয়েটারের প্রতি মনোযোগী হইলেন। সমাচারদর্পণ, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তৎকালীন যাত্রার কথা প্রকাশিত হইত। হরিমোহন রায় (কর্মকার), মনোমোহন বসু, মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় যাত্রা কিছুটা উন্নত হইলেও ক্রম-বর্ধমান থিয়েটারের প্রভাবে শহর-কলিকাতায় যাত্রা জনপ্রিয়তা হারাইতে আরম্ভ করে। পল্লীগ্রাম ও মফস্বল শহরেই যাত্রা বিশেষভাবে পরিবেশিত হইতে থাকে। কিন্তু প্রধান প্রধান পেশাদার দলের কার্যালয় থাকে ফরাসডাঙ্গা, শোভাবাজার, আহিরিটোলা, ঠনঠনিয়া, কলেজষ্ট্রিট, পাথুরিয়াঘাটা, নাথের বাগান, চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলে।

বিংশ শতাব্দীতে কদাচিৎ কলিকাতার ধনীর প্রাঙ্গণে যাত্রানুষ্ঠান হইলেও মোটের উপর নাট্যরসিকবৃন্দ নাট্যরসপিপাসা চরিতার্থ করিতেন মঞ্চাভিনয় হইতে। কিন্তু নিমতলা কাঠগোলা, কলেজষ্ট্রিট বাজার, হাতিবাগান বাজার, মানিকতলা বাজার, শোভাবাজার, কোলেবাজার, এলেন বাজার, নতুন বাজার, কাটা পুকুর ও বড় বাজার প্রভৃতি স্থানে সাধারণ দর্শকদের জন্য মাঝে মাঝে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা হইত। এই সব অভিনয় রুচিশীল দর্শকদের আকৃষ্ট করিতে পারিত না। পত্র-পত্রিকায়ও যাত্রার সমালোচনা ও সংবাদ প্রচার বন্ধ থাকে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রাপার্টির সামাজিক পালাগুলি দেশে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তৎকালে মুকুন্দদাস যাত্রার ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রম ছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি। যাত্রানাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এই সংস্থায় নানাদিক হইতে যাত্রার কিছু কিছু

সংস্কার করা হয়। তথাপি কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্যরসিকদের যাত্রা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সাময়িক পত্রে যাত্রার সমালোচনা অথবা প্রচারের কোন ব্যবস্থা ও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া নিম্ন মানের জন্য যাত্রা সম্পর্কে যে উন্নাসিকতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও দূর করা সম্ভব হয় নাই। এই ভাবে বিশ শতকের প্রায় দুই দশক কাটিয়া যায়।

তৎকালে গণেশ অপেরা খুব সুনাম অর্জন করে। এই সংস্থার নাট্যকার ছিলেন ভোলানাথ রায় (নস্কর)। তিনি যাত্রানাটকের মান কিছুটা উন্নত করেন। ভোলানাথ কলিকাতার নাট্যরসিকদের যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য সাময়িকপত্রে যাত্রার প্রচারকল্পে সচেষ্ট হইয়া উঠেন। গণেশ অপেরার নূতন পালা ভোলানাথের 'পৃথিবী'র উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হয় মনোমোহন থিয়েটারে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই অনুষ্ঠানে ভোলানাথ কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্যরসিক ও সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানাইবার ব্যবস্থা করেন। এই সকল রুচিশীল দর্শকের সম্মুখে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের যাত্রা পরিবেশন করিয়া গণেশ অপেরা সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়। অভিনয়ের পরে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই অভিনয় সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়—(Tuesday, 18 Octo., 1917)। ইহার পর হইতে ভোলানাথের প্রভাবে অন্যান্য সংস্থার অনেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নূতন পালার উদ্বোধনের ব্যবস্থা করিয়া যাত্রার প্রতি বিশিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ইহার ফলে নূতন নাটকের বায়না সংগ্রহের সুবিধা হইতে থাকে। এইভাবে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যাত্রা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

থিয়েটারী নাটকের ক্ষেত্রে যেমন প্রবল আন্দোলন সুরু হয় দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে তেমনি যাত্রার আন্দোলনও এই সময় হইতেই জোরদার হইয়া উঠিয়া ইহার বিশেষ বিবর্তন ঘটাইতেছে। পেশাদার যাত্রা সংস্থাগুলি ব্যবসায়ে লোকসানের ভয়ে একটু রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নাটক প্রযোজনা করেন। তাই যাত্রা-আন্দোলন অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে চলিতেছে। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে যুদ্ধ-পূর্বযুগের ভক্তি রসাত্মক পৌরাণিক পালার ক্রমবিলোপ এবং কাল্পনিক পালার বিস্তার ঘটিয়াছে যুদ্ধোত্তর কালে। সামাজিক পালা রচনার প্রতিও যাত্রানাট্যকারদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কানাইলাল শীল ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'দেশের দাবী' নামে একখানি সামাজিক যাত্রানাট্য রচনা করেন। পুরাতন 'রঞ্জন অপেরা'য় নাটকটি অভিনীত

হয়। ধনীর শোষণ, পীড়ন এবং মুনাফা খোর, মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় গণ আন্দোলনের সূচনা নাটকের মূল বক্তব্য। এই সময় হইতে নাটকে নূতন বিষয়বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য নাট্যকারগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। স্বাধীনতা লাভের পরে বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতাদের কাহিনী যাত্রা নাট্যে গৃহীত হয়। ইহার মূলে রহিয়াছে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ও স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ধরার দেবতা', 'মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন', 'মায়ের ডাক', পূর্ণচন্দ্র দাসের 'স্বপ্ন-সাধনা', জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'বিদ্রোহী বাঙ্গালী', নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর 'বিপ্লবী কানাইলাল', 'ক্ষুদিরাম', শান্তিরঞ্জন দের 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র,' নরেশ চক্রবর্তীর 'বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রভৃতি নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জালিয়ানওয়ালাবাগের সৈনিক বিদ্রোহ লইয়া রচিত উৎপলদত্তের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' (১৯৬৯), ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ অবলম্বনে নরেশ চক্রবর্তীর 'সিপাহী বিদ্রোহ' (১৯৭০) দেবেন নাথ রচিত 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম,' (১৯৭০), শম্ভুবাগ রচিত 'রক্তাক্ত আফ্রিকা' (১৯৭১), বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘা যতীন' (১৯৭১) প্রভৃতি নাটকে বিদ্রোহ-কাহিনী যাত্রার বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হইয়াছে। বংকিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরানী', শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' তারাশংকরের 'সপ্তপদী' প্রভৃতি বাংলা কথাসাহিত্যের যাত্রারূপ আসরে আসরে পরিবেশিত হইতেছে। হিট্‌লার, লেনিন প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতীয় নেতাদের কাহিনী লইয়া রচিত ঐতিহাসিক লোকনাট্য যাত্রায় অভিনীত হইতেছে। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সাধক কমলাকান্ত প্রমুখের জীবনী-নাট্য যাত্রার জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে সমসাময়িক ঘটনা বা ইহার প্রভাবপুষ্ট ঘটনা লইয়াও যাত্রা-নাট্য রচিত হইতে আরম্ভ করে। ১৩৫০ সালের কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের প্রভাবে রচিত ব্রজেন্দ্রকুমারের 'আকালের দেশ', দেশবিভাগের পটভূমিকায় রচিত জিতেন বসাকের 'রক্তের লেখা', হিন্দুস্থান পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ ও সৈনিক আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত যথাক্রমে জিতেন বসাকের 'ডাকিনীর চর', ও ব্রজেন্দ্রকুমারের 'রক্তের নেশা' নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা

যাইতে পারে। সমসাময়িক জীবন সমস্যা লইয়া সত্যম্বর অপেরায় ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করিয়াছেন 'একটি পয়সা', 'পদধ্বনি', খনি অঞ্চলের মজদুর লইয়া সত্যপ্রকাশ লিখিয়াছেন 'অঙ্গার', তরুণ অপেরায় শম্ভুনাথ বাগ সামরিক জীবন লইয়া লিখিয়াছেন 'ঘুম ভাঙার গান'। শাওঁতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় একটি কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নিউ গণেশ অপেরায় 'মরেও যারা মরে না' নাটকে।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন 'আর্য অপেরা' হইতে যাত্রা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রবোধবন্ধু অধিকারী আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দলোকে' তাহা প্রকাশ করেন। এই সময় সত্যম্বর অপেরার 'সোনাই দীঘি' পালা খুব যশের সঙ্গে অভিনীত হইতে থাকে। শৈলেন মোহান্তর প্রচেষ্টায় জ্যোতির্ময় বসুরায় আনন্দবাজার পত্রিকার 'সিনেমাপাতায়' এই সোনাই-দীঘি' পালা সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার পরে শৈলেন মোহান্ত 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'সোনাইদীঘির' একটি বিজ্ঞাপন দিলেন। সাময়িকপত্রে যাত্রাপালার বিজ্ঞাপন এই প্রথম। এই বিজ্ঞাপনের পরে আরো কোন কোন সম্প্রদায় দৈনিক পত্রে চলতি পালার বিজ্ঞাপন দিতে সুরু করেন। কিন্তু এই সব বিজ্ঞাপন কালেভদ্রে প্রচারিত হইতে থাকে। তৎকালীন স্বাধীনতা পত্রিকায় কমল দাশগুপ্ত কয়েক জন প্রখ্যাত যাত্রা শিল্পীর বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করেন। প্রবোধবন্ধু অধিকারী, শৈলেন মোহান্ত, সৌরেন কুণ্ডু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আবার শোভাবাজারে একটি যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেন ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। দৈনিক পত্রে এই উৎসবের কিছু কিছু প্রচার ও হয়। সাম্প্রতিক কালের যাত্রা-উৎসব নামক অনুষ্ঠানে সাধারণত দেখা যায় যে কয়েকটি খ্যাত নামা যাত্রা-সংস্থা এক স্থানে কয়েক দিন ধরিয়া প্রদর্শনীর বিনিময়ে অভিনয় দেখায়।* অনেক স্থলে সুঅভিনেতাকে পুরস্কৃতও করা হয়। এই সব অনুষ্ঠানে যাত্রা সংস্থার অর্থপ্রাপ্তি ঘটে এবং উদ্যোক্তারাও কিছু লাভ করিয়া থাকেন। এক ঢিলে দুই পাখীই নিহত হয়। অবশ্য ইহারও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই জাতীয় অনুষ্ঠান আদৌ নূতন নহে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও এই ধরনের অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু ইহা উৎসব নামে সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইত না। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান রাজবাড়ি, উত্তরবঙ্গে পুঁটিয়া-রাজবাড়ি ও কোচবিহার-রাজবাড়ি, পূর্ববঙ্গে ভাওয়াল-রাজবাড়ি প্রভৃতি স্থানে বিশেষ ভাবে ঝুলন ও রাসের সময় কয়েকটি প্রখ্যাত পেশাদার দলের একত্র ব্যাপিয়া যাত্রা

নাট্যানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইত। অভিনয়ে যাহারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন তাহাদের পুরস্কৃতও করা হইত। ইহার সঙ্গে বর্তমানের অনেকগুলি যাত্রা উৎসবের সাধারণ পার্থক্য এই যে তখন প্রদর্শনী গৃহীত হইত না এবং উদ্যোক্তাদেরও অর্থ লাভের প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

[১]'বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ' যাত্রার উন্নতি কল্পে বিভিন্ন কর্ম সূচীর বাস্তব রূপায়ণে সক্ষম হয়। এই সংস্থা ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে রবীন্দ্র কাননে এক বিরাট যাত্রা উৎসব উদ্‌যাপন করেন। উৎসবের প্রতিটি অভিনয়ে কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্যরসিকবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। উৎসবের বিশেষত্ব হইতেছে—(ক) যাত্রা এবং অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা সভা, (খ) বিশিষ্ট যাত্রা শিল্পীদের মানপত্র দান ও শ্রেষ্ঠ যাত্রা প্রযোজককে পুরস্কার প্রদান, (গ) যাত্রার প্রয়োগে যান্ত্রিকতার সাহায্যে আলোক নিয়ন্ত্রণ, (ঘ) যাত্রার প্রচার। আলোচনা সভায় যাত্রা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়, অশোক সেন ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক। যাত্রাশিল্পী ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও ফণিভূষণ মতিলালকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী রূপে মানপত্র এবং শ্রেষ্ঠ যাত্রা প্রযোজক রূপে সত্যম্বর অপেরার মালিক গৌর চন্দ্র দাসকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। যান্ত্রিকতার সাহায্যে আলোক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বহন করেন তাপস সেন, যাত্রায় আলোক নিয়ন্ত্রণ এই প্রথম। অভিনয়ে মাইক্রোফোনের ব্যবহার করা হয়। পরিষদের পক্ষ হইতে যাত্রার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। সাংবাদিকগণ ও এই প্রচারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যাত্রা সম্পর্কে ইহার পূর্বে পত্র-পত্রিকায় এত ব্যাপক প্রচার আর কখনো হয় নাই। এই পরিষৎ হইতে কেবল যাত্রা উৎসব করা হয় নাই, যাত্রার উন্নতি কল্পে সৌখিন যাত্রা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতারও প্রচলন করা হয়। বিশিষ্ট পেশাদার যাত্রা সংস্থাগুলিকে যেমন 'বিশ্বরূপা' নাট্য মঞ্চে কয়েকটি অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয় তেমনি বাৎসরিক নাট্যসম্মেলনেও যাত্রা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব আলোচনায় যোগদান করেন বর্তমান গ্রন্থের লেখক, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, যাত্রা শিল্পি সংঘের সম্পাদক শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু ও ব্রজেন্দ্র কুমার দে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ যাত্রা আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক

১। গ্রন্থের লেখক এই পরিষদের তৎকালীন কার্যকরী সমিতির সদস্য

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অনুরূপ সভায় অভিনয় ও ...
ফলিত উদাহরণ সহ যাত্রা সম্পর্কে ভাষণ দেন আকাদামী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবীণ যাত্রাশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই ভাবে বিশিষ্টদের যাত্রার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় কয়েকটি পেশাদার যাত্রা দলের স্বত্বাধিকারী যাত্রা সম্পর্কে নূতন ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন ও তাহাদের নূতন পালার উদ্বোধনে বক্তৃতার আয়োজন করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সব উদ্বোধনী বক্তৃতায় বর্তমান গ্রন্থের লেখক যাত্রার সংস্কার মার্জন ও উন্নতি কল্পে নানাবিধ আলোচনা করেন। ইহার কোন কোনটিতে আবার নাট্যকার মন্মথ রায়, ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুধী প্রধান যাত্রার উন্নতিকল্পে আলোচনা করেন। পালার উদ্বোধনে ঐ ধরণের বক্তৃতার প্রথম ব্যবস্থা করা হয় 'তরুণ অপেরা'র পক্ষ হইতে; এই বিষয়ে তরুণ অপেরার পরেই 'সত্যম্বর অপেরা'র স্থান। বর্তমান গ্রন্থের লেখকের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় এবং শিবচন্দ্র ভট্টাচার্যের কর্ম প্রচেষ্টায় যাত্রার উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'যাত্রা শিল্পি সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। যাত্রা জগতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রথম স্থাপিত হইল।

ইতোমধ্যে দৈনিক পত্রে যাত্রাপালার কিছু কিছু বিজ্ঞাপন ও অভিনয়-মন্তব্য প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পটভূমিকায় অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ, এই পত্রিকার নাট্যসম্পাদক নির্মল কুমার ঘোষ, যুগান্তরের নাট্যসম্পাদক মহেন্দ্র সরকার, এই পত্রিকার রবি বসু মল্লিক প্রমুখ সাংবাদিকদের সংগে কলিকাতার পেশাদার যাত্রা সংস্থাগুলির একটি মন্ত্রণা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পরেই ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যুগান্তর, আনন্দবাজার ও দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় যাত্রা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। এই সকল বিশেষ সংখ্যায় যেমন থাকে গবেষক, যাত্রা নাট্যকার ও যাত্রা-রসিকদের যাত্রা সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ তেমনি আর একদিকে থাকে বিভিন্ন যাত্রা সম্প্রদায়ের বড় বড় বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন দিক হইতে যাত্রার আলোচনার জন্য বর্ধমানে শম্ভু নাথ বাগ [১]'যাত্রাজগৎ' এবং কলিকাতায় নির্মল শীল [২]'নাট্যলোক' নামে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

১। যাত্রাজগৎ—প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৭৩

২। নাট্যলোক—প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৭৩

বাংলার যাত্রা আসাম, বিহার, বারাণসী, উড়িষ্যা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও পরিবেশিত হয়। দিল্লী কালী বাড়ী যাত্রা পরিবেশনের সময় কিষাণ দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'নাট্য ভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টির 'রাজকুমার' পালার অংশ বিশেষ দিল্লীতে টেলিভিশনে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায়ও গবেষক এবং চিত্র পরিচালকদের যাত্রা-আলোচনা ও যাত্রার বিজ্ঞাপন প্রচার বিশেষ স্থান লাভ করে।

বিশ্বরূপা মঞ্চ, কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ ও মহাজাতিসদনে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'যাত্রাশিল্পি সংঘ' কর্তৃক লোকনাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুঃস্থ যাত্রা শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য করা। সাময়িকপত্র বিশেষত 'যুগান্তর' প্রচারের মধ্য দিয়া এই লোকনাট্য উৎসবের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে [1] রবীন্দ্র সদন উৎসব উপসমিতি ষোড়শ দিবস ব্যাপিয়া একটি যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে কলিকাতার বিশিষ্ট পেশাদার যাত্রাসংস্থাগুলি যোগদান করে। সংস্থা ও অভিনীত নাটকের নাম---তরুণ অপেরা (হিটলার), জনতা অপেরা (ফাঁসির মঞ্চে), শ্রীরাধা নাট্যকোম্পানী (পথের ছেলে), নবরঞ্জন অপেরা (মাইকেল মধুসূদন), নিউ প্রভাস অপেরা (বারুদ), সত্যম্বর অপেরা (দিগ্বিজয়), অম্বিকা নাট্য কোম্পানী (চণ্ডীতলার মন্দির), নিউ আর্য অপেরা (রাইফেল), ভারতী অপেরা (মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন), মাধবী নাট্য কোম্পানী (আগুন নিয়ে খেলা), সুশীল নাট্য কোম্পানী (রক্তে রাঙা হাঁসুলী ভাঙা), নিউ গণেশ অপেরা (মরেও যারা মরে না), বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ (পতিঘাতিনী সতী), নিউরয়েল বীণাপাণি অপেরা (এক টুকরো রুটি), নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি (আন্দোলন) ও নট্টকোম্পানী যাত্রা পার্টি (শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি)। এই উৎসবের মধ্য দিয়া ও দেশের বিশিষ্ট নাট্যরসিকদের যাত্রার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দর্শকদের অনুরোধে সত্যম্বর, নট্ট কোম্পানী, তরুণ অপেরা, বৈকুণ্ঠ নাট্যসমাজ-এর চারটি অভিনয় অবলম্বনে এই উৎসব আরো চারদিন সম্প্রসারিত করা হয়।

১৩৭০ বঙ্গাব্দ হইতে 'সমকালীন,' 'যাত্রাজগৎ', 'আসর পত্রিকা',

১। গ্রন্থকার এই সমিতির তৎকালীন আমন্ত্রিত সদস্য

'নাট্যলোক', 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার', 'দৈনিকবসুমতী,' 'যুগান্তর পূজাসংখ্যা' 'দীপান্বিতা,' 'অমৃত' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে অধ্যাপক, গবেষক, চিত্র-পরিচালক, যাত্রানাট্যকার, যাত্রাভিনেতা ও যাত্রারসিকদের যাত্রা সম্পর্কীয় রচনাবলী বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতেছে। পঞ্চানন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ও সত্যচরণ ঘোষ সম্পাদিত 'আসর পত্রিকার' বিভিন্ন সংখ্যায় সত্যম্বর অপেরা, আর্য অপেরা, রঞ্জন অপেরা, প্রভাস অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, নট্ট কোম্পানী প্রভৃতি দল সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে যাত্রা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের ধারণা ও মতামত ১৩৫৫ সাল হইতেই মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতেছে।

কতিপয় ব্যক্তি ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় প্রবন্ধ-রচনা, বক্তৃতা-আলোচনা, প্রচার ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা সাময়িককালে বিভিন্নস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ও রুচিশীল নাট্য রসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে। বাংলার অন্যতম প্রাচীন নাট্যশিল্প যাত্রা যে অবহেলার বস্তু নহে একথা আজ আর কাহারো অবিদিত নাই। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে দিল্লীর 'সংগীত-নাটক আকাদামী' হইতে যাত্রাশিল্পী রূপে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সংগীত-নাটক-নৃত্য আকাদামী হইতে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে যাত্রাশিল্পীরূপে পুরস্কৃত করা হয়। ইহা শিল্পিদ্বয়ের পক্ষে যেমন সম্মানের তেমনি সমগ্র যাত্রাশিল্পেরও গৌরবের। ১৯৬৯খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জিকে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'অর্ধ-শতকের অভিনয়' (বিংশ শতাব্দী) সম্পর্কে বক্তৃতা (extension lecture) করিতে আহ্বান জানানো হয়। যাত্রা সংগীত ও অভিনয়ের ফলিত উদাহরণসহ এই বক্তৃতা তাঁহাকে ও যাত্রাকে সম্মানিত করিয়াছে। প্রবীণ যাত্রা অভিনেতা রূপে সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জির সঙ্গে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের পক্ষ হইতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের একটি সাক্ষাৎকার হয়। এই অনুষ্ঠান ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর রাত ৮-৪৫ মিঃ কলিকাতা-'ক' তে প্রচারিত হয়।

আজ যাত্রার মোড ঘুরিয়াছে। যাত্রার ক্ষেত্রে নূতন নূতন নাট্যকার দেখাদিতেছেন। যাত্রাপালার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। থিয়েটারী নাট্যকারদের মধ্যেও অনেকেই এখন যাত্রানাট্য রচনা করিতেছেন। কোন কোন চিত্রনাট্যকার এবং কথাসাহিত্যিকও এই পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন।

শিক্ষিত ও বিশিষ্ট নাট্যরসিকদের সঙ্গে যাত্রার যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায়

বর্তমানে যাত্রার প্রয়োগ পদ্ধতির কিছুকিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য এই সম্পর্কে যাত্রার স্বত্বাধিকারীদের একটু সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে যাত্রা থিয়েটারের ব্যর্থ অনুকরণ না হয়। যাত্রাকে যাত্রা রাখিয়াই নানাদিক হইতে ইহার সংস্কারও যুগোচিত পরিবর্তন করিতে হইবে। প্রয়োগের দিক হইতে পালার ভাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া নূতন পালানুগ ঐকতান এবং সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে নূতন লোকনৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা হয় সত্যম্বর অপেরায়। ঐকতান রচনা করেন তরুণ গাঙ্গুলী (রবীন্দ্র-ভারতী) এবং নৃত্য পরিকল্পনা করেন রামকৃষ্ণ লাহিড়ী (রবীন্দ্র-ভারতী)। তরুণ অপেরার তিমির নাটকে যান্ত্রিকতার সাহায্যে শব্দক্ষেপণ (যাত্রায় এই প্রথম) ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। এই নাটকের পরিচালনা ও নির্দেশনা দান করেন লেফ্‌টেন্যান্ট অঘর ঘোষ (রবীন্দ্র-ভারতী)। বর্তমান গ্রন্থের লেখকের পরামর্শে 'সত্যম্বর অপেরা' ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রার প্রপ্‌ ম্যান এবং অর্কেষ্ট্রার যন্ত্রীদের জন্য বিশেষ ধরণের পোশাক প্রচলন ও একটি যাত্রা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়া যাত্রাজগতে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পূর্বে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-মঞ্চশিল্পী ও অভিনয় শিক্ষক নরেশচন্দ্র মিত্র কয়েকটি যাত্রাভিনয় করিয়া যাত্রার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন তেমনি ইহার গৌরব বৃদ্ধি করেন। সাম্প্রতিক কালের যাত্রাভিনয় প্রসঙ্গে মহেন্দ্র গুপ্ত, কমলমিত্র, মিহির ভট্টাচার্য, দীপক মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত কয়েকবারই যাত্রায় নারী দ্বারা স্ত্রী ভূমিকা অভিনয় করাইবার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। ইদানিংকালে 'সত্যম্বর অপেরা' এইদিক হইতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। এই সংস্থায় অভিনেত্রী গ্রহণের রীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পাষাণের মেয়ে' ও 'মহম্মদ তোঘলক' পালায় একটি বালিকা নিযুক্ত করা হয়। ইহার পরে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্থায় 'সোনাইদীঘি' পালার স্ত্রী ভূমিকায় নারী শিল্পী গ্রহণ করিবার বিশেষ রীতি প্রচলিত হয়। ইহার পর হইতে অন্যান্য পেশাদার যাত্রা সংস্থায়ও নারী-ভূমিকায় মহিলা শিল্পী গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৩৭৭ সাল পর্যন্ত একমাত্র নট্ট কোম্পানী ইহার ব্যতিক্রম। এই সকল মহিলা শিল্পীদের অধিকাংশই বাঙালী পরিবার হইতে

যাত্রায় যোগদান করিতেছেন। বিভিন্ন দিক হইতে যাত্রার সংগে শিক্ষিতদের সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় ইহা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ নং ডুমতলায় লেবেডেফ-এর 'Bengalie theatre'-এ M. Joddrell-এর 'The Disguise' নাটকের লেবেডেফ কৃত [1]বঙ্গানুবাদ অভিনয়ে বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলার থিয়েটারে এই রীতি প্রচলিত হইতে পঁচাত্তর বৎসরের অধিক সময় লাগে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে যাত্রায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নারীর অংশ গ্রহণের সূচনা হয়। কিন্তু যাত্রায়ও এই রীতি বিশেষভাবে প্রচলিত হইতে একশত বৎসরের অধিক সময় লাগিয়াছে।

বর্তমান যাত্রায় অভিনয়ের দিক হইতে স্বাভাবিকতার প্রতি দৃষ্টি যেমন ক্রমবর্ধমান তেমনি ঐতিহাসিক নাটকে যুগোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্পর্কে কোন কোন সংস্থা বিশেষ যত্নশীল হইয়া উঠিতেছে।

১৩৭৫ সালে মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরার একটি স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও শিল্পীদের প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠান দ্বারা তরুণ অপেরা যাত্রা জগতে আর একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। পূর্বে যাত্রায় ইহার প্রচলন ছিল না।

যাত্রা একটি লোকশিল্প এই শিল্পটির উন্নতিকল্পে সরকারের সহযোগিতা কাম্য। এই দিক হইতে অবশ্য পেশাদার সংস্থার জন্য সরকার রেল কন্‌সেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভ্রমণ সীমা খুবই কম; এই সীমা আরো বাড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের নিকট হইতে রেল কন্‌সেশন্‌ বাহির করিবার পিছনে শৈলেন মোহনান্ত ও শিব চন্দ্র ভট্টাচার্যের সক্রিয় প্রচেষ্টার কথাও উল্লিখিত হইতে পারে। আসাম ও বাংলাদেশে প্রতি বৎসর যাত্রা কয়েক কোটি লোকের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করে। এই শিল্পদ্বারা কয়েক সহস্র লোক জীবিকা অর্জন করিতেছে। কাজেই এমন একটি লোক শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যাত্রাভিনয়কে প্রমোদকর মুক্ত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন যাত্রা সংস্থাও 'যাত্রা শিল্পি সংঘের' এইদিক হইতে সক্রিয় হওয়া উচিত।

1. This (play) farce translated by me with the help of the best pundits, and performed twice on my own Theatre by Native Actors & Actresses of Bengal······(Ref. Istoricheskiy Archiv, No. I. 1956) কাল্পনিক সংবদল পৃঃ ৫, মদন মোহন গোস্বামী সম্পাদিত কলিকাতা—১৯৬৩

যাত্রার অভিনয় চলে বৎসরে আট মাস। কাজেই বৎসরের চার মাস শিল্পীদের কোন প্রকার আয়ের পথ খোলা থাকে না। কলিকাতায় যাত্রার জন্য একটি মঞ্চ থাকিলে এই চার মাস অভিনয় করিয়া শিল্পীরা কিছু কিছু আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই মঞ্চে যাত্রা সম্পর্কে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও সম্ভব হইতে পারে। এই সকল দিক হইতে চিন্তা করিয়া বলা যায় যে কলিকাতার একটি উপযুক্ত স্থানে যাত্রার জন্য একটি মুক্তমঞ্চ স্থাপন করিবার একান্তই প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমানে যাত্রার মান উন্নয়নের যে চেতনা দেখাদিয়াছে মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা সফল হইয়া উঠাও সহজ হইবে।

পরিশিষ্ট

(ক) বিশ শতকের প্রখ্যাত বঙ্গ-দল

পূর্বে লোকনাট্যের অভিনয় হইত ধনীর গৃহ-প্রাঙ্গণে, মন্দির-সম্মুখে, বারোয়ারী তলায় অথবা ব্যবসায়ীদের সমবেত চাঁদায় তাহাদের নির্দ্ধারিত স্থানে। তখন প্রত্যেক শ্রোতাকে অর্থের বিনিময়ে আসরে অভিনয় উপভোগ করিতে হইত না। এখনো যে ধনীর প্রাঙ্গণে অভিনয় হয় না তাহা নহে; তবে জমিদারী-তালুকদারী প্রথাবিলুপ্তির পরে ইহার সংখ্যা এতই নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে ইহা আর তেমন ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। ব্যবসায়ীরাও আর পূর্বের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া যাত্রাগানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন না। এখন টিকিট বিক্রয় করিয়া পেশাদারী সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনয় করাইবার রীতি বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। অর্থের বিনিময়ে শ্রোতৃবর্গের আসরে উপস্থিত হইতে হয় বলিয়া পেশাদারী দলের বাৎসরিক অভিনয়ের সংখ্যা কমিয়া যায় নাই। জনগণের চাহিদাবৃদ্ধি এবং যাতায়াতের অধিকতর সুবিধার জন্য বর্তমানকালে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অভিনয় সংখ্যা বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান। ইহা শ্রোতৃসাধারণের লোকনাট্য প্রীতিরই পরিচায়ক। পূর্বে যাত্রাভিনয়ে টিগিট বিক্রয় করা হইত না। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে গান করিতে গিয়া 'নট্ট কোম্পানী' বৃষ্টির জন্য ব্যবসার দিক থেকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। দলের পরিচালক সূর্যকুমার দত্ত এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য এক নূতন পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন আনা, চার আনা ও আট আনা দর্শনীর বিনিময়ে খুলনা করোনেশন হলে এবং বাগেরহাট দশ-আনির স্কুলে তিনি যাত্রাভিনয় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। তখন হইতেই প্রবেশিকার বিনিময়ে লোকনাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয়। ইহার পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষাকালে গাওনা বন্ধ হইবার পরে 'গণেশ অপেরা' কর্তৃক পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে মঞ্চ ভাড়া করিয়া প্রবেশিকার বিনিময়ে কয়েকটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পরে 'ভাণ্ডারী অপেরা' বাগেরহাট বাসাবাটীর মাঠে টিগিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করে। ভাণ্ডারী অপেরার ঐসব অভিনয়ে ভূপতি পালিত, বিনোদচন্দ্র ধাড়া, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হরিপদবানী প্রমুখ শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতি অভিনয়ে টিগিটের মূল্য নির্ধারিত হয় চার আনা, আট আনা ও এক টাকা। টিগিট

বিক্রয় করিয়া লোকনাট্যাভিনয় চালু হইবার পূর্বে যেমন বহু সম্প্রদায় ছিল, তেমনি পরেও বহু দল লোকনাট্য প্রযোজনায় ব্রতী হয়। ইহাদের মধ্যে বিংশ শতকে যে সকল ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খ্যাতির অধিকারী হয় তাহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এই সব দল বর্তমানে আর প্রচলিত নাই।

নবদ্বীপ বঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায়

এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত যাত্রাকার মতিলাল রায়। ইহা 'মতিরায়ের দল' নামে খ্যাত ছিল। মতিলাল স্বরচিত পালা অভিনয় করিতেন। কলিকাতার ২৭নং আহিরী টোলা ষ্ট্রীটে ইহার কার্যালয় ছিল। মতিলালের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাহার পুত্র ধর্মদাস রায় দলের পরিচালক হইলেন। তিনিও এই দলে অভিনয় করিতেন। ধর্মদাসের মৃত্যুর পরে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্র রায় দল চালনার ভার গ্রহণ করেন। অভিনয়ের সময় জুড়ির গান আরম্ভ হইলে মতিলাল পরচুলা খুলিয়া আসরে বসিতেন এবং গান শেষ হইলে আবার ইহা পরিয়া অভিনয় শুরু করিতেন। ধর্মদাসও এই রীতি অনুসরণ করিতেন। উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত (১৮৮০ সাল) এই দলের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মতিলালের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রদ্বয় ধর্মদাস রায় ও পরে ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৩৪০ সালের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত দলটি চালু রাখেন।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দল

বিংশ শতকের ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দলটি চালু ছিল। কৃষ্ণ-যাত্রায় এই দলটির খ্যাতির কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত এই দলে 'গোবিন্দ' ও 'গদা' নামে দুই জন বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন।

সাঁতরা কোম্পানী

হুগলী-জলাপাড়ার মহেন্দ্র সাঁতরা দলের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের কার্যালয় ছিল চন্দননগর ফরাসডাঙ্গায়। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'ধর্মলীলা', 'তুলসী লীলা' 'সুরথ উদ্ধার' প্রভৃতি পালা অভিনয় করিয়া ইহার খুব খ্যাতি লাভ হয়। অঘোর কাব্যতীর্থের 'যাজ্ঞসেনী' সংস্থার অন্যতম অভিনীত পালা। সংস্থার বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ঘটকও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সুরথউদ্ধারের বিজ্ঞাপন ১৩১০ সাল)। জ্যোতিষ প্রামাণিক

ইহার বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। উনিশ শতকের শেষভাগে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ শতকের প্রায় তৃতীয় দশক পর্যন্ত দলের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজ

নবদ্বীপবাসী সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৬—১৯৪৭ খ্রী) ১৩০১ সালে এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অভিনেতা ছিলেন। কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সপ্তর্ষিস্থজন', 'সগর যজ্ঞ', 'জড়ভরত' প্রভৃতি পালায় এই দলের খুব খ্যাতি হয়। সম্প্রদায়ের প্রধান অভিনেতা ছিলেন নীলমণি বিশ্বাস (নদীয়া)। তিনি মতিরায়ের দল, মথুর সাহার দল, শশি অধিকারীর দল, ষষ্ঠী অপেরা প্রভৃতি সংস্থায় অভিনয় করিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। রাবণ, শঙ্কাসুর, হরিশ্চন্দ্র, পরশুরাম প্রভৃতি চরিত্রাভিনেতা নীলমণি তৎকালীন যাত্রার প্রধান অভিনেতা রূপে খ্যাত ছিলেন। নীলকণ্ঠ মাইতি (মেদিনীপুর) ও দলের পরিচিত অভিনেতা ছিলেন। এই সংস্থা লোকমুখে 'সত্যম্বর চাটুয্যের যাত্রাদল' নামে খ্যাতিলাভ করে। ইহার পরে [১] ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দলের নাম পরিবর্তন করিয়া ইহার নামকরণ করা হয় 'সত্যম্বর অপেরা'। ইহার পরে রামদুর্লভ কাব্যবিশারদের 'মহারণে রামানুজ', 'বাচস্পতি', অঘোর চন্দ্র কাব্যতীর্থের 'অনন্তমাহাত্ম্য', নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'অজ্ঞাদেবী', 'শৈশব সাধনা', 'সপ্তমাবতার', পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'নটীর অভিশাপ' প্রভৃতি পালা এই দল কর্তৃক অভিনীত হয়। সম্প্রদায়ের বলাইচন্দ্র অধিকারী—বাঁশিওয়ালার খ্যাতি ছিল। কিছুকালের জন্য দলের প্রধান অভিনেতা ও শিক্ষক ছিলেন সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুরেশ মাষ্টার)। কলিকাতার আহিরীটোলায় এই সংস্থার কার্যালয় ছিল।

স্বদেশী যাত্রাপার্টি

এই দলের অধিকারী ছিলেন বারিশাল নিবাসী মুকুন্দদাস। তিনি স্বরচিত সামাজিক-স্বদেশী পালার গাওনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে জন-জাগরণ আনিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দলটি চালু ছিল। মুকুন্দদাস আবার স্বদেশী যাত্রা প্রচারের জন্য পাবনাজিলার সিরাজগঞ্জে একটি এবং মেদিনীপুর জিলায় আর একটি দল গঠন করাইয়াছিলেন। তিনি বরিশালের কালীকৃষ্ণ নট্টকেও (১৩০১—১৩৬১) একটি দল

১। গৌরচন্দ্র দাস, সত্যম্বর অপেরা দ্রষ্টব্য

গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত পেশাদারী সংস্থা ১৩৬১ সাল পর্যন্ত মুকুন্দদাসের যাত্রা পরিবেশন করিয়াছে। হুগলীজিলার কালিয়াগড়ে (জিরাট) মুকুন্দদাসের নামে একটি আশ্রম ও 'স্বদেশী যাত্রা সংস্থা' আছে। এই সংস্থার সম্পাদক মনোরঞ্জন নট্ট 'ব্রহ্মচারিণী', 'জয়পরাজয়', 'পথ' ('মিলন' নামে), ও 'দাদা' ('শ্মশানে মিলন' নামে) পালা মাঝে মাঝে পরিবেশন করিয়া থাকেন।

পানেদের দল

বর্ধমান-আঁতকোড়ের অধিবাসী ত্রৈলোক্য নাথ পাইন, পীতাম্বর পাইন, বঙ্কেশ্বর পাইন, ভ্রাতৃত্রয় কলিকাতার সীমলা অঞ্চলে তিনটি দল গঠন করেন। এই দল তিনটি 'পানেদের দল' নামে খ্যাত হয়। এই সম্প্রদায়গুলিতে ধনকৃষ্ণ সেনের এবং অহিভূষণ ভট্টাচার্যের নাটকাদি অভিনীত হইত। পিতাম্বর পাইনের দলে খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন উন্মাদ-অভিনয়ে নিপুণ চন্দ্রনাথ দত্ত (চন্দ্রেদত্ত)। যশের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই দল তিনটি ভাঙ্গিয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরে পানেদের দল গঠিত হয়।

মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি

[১]"১৩০৬ সালে ৮২, কলেজ ষ্ট্রীটে অভয় চরণ দাস একটি লোকনাট্য সংস্থা গঠন করেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার জামাতা অধর দাস এই দল (অভয়চরণ দাসের দল) পরিচালনা করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে কালীঘাট-সাপুরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীলকান্ত দাস মথুরানাথ সাহার সঙ্গে যুক্ত কর্তৃত্বাধীনে দল চালনার ভার লইয়া ইহাকে 'সৌদাস থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা কোম্পানীতে রূপান্তরিত করেন। কিছুকাল পরে মথুরানাথের (কলিকাতার টালিগঞ্জ নিবাসী, পূর্ব নিবাস বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলা) কর্তৃত্বে দলটি 'মথুরানাথ সাহাব থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টিতে পরিণত হয়। এই সংস্থায় হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রা নাট্য অধিক অভিনীত হইত। মথুরানাথ সাহার সঙ্গে নীলকান্ত দাসেরও সংযোগ ছিল। কাজেই কিছুকাল পর্যন্ত এই দলটি 'মথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের দল' নামেও অভিহিত হইত।" এই দলে হরিপদর 'ভৃগুচরিত' ও 'পদ্মিনী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। মথুরানাথ সাহার দলের সুরকার ছিলেন 'বেঙ্গল থিয়েটারের' সুরশিল্পী ভূতনাথ দাস। এই

১। নারায়ণচন্দ্র দত্ত—বাঁশি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

সংস্থায় নারায়ণ চন্দ্র দত্ত যাত্রায় ক্ল্যারিওনেট বাজনার স্থায়ী ব্যবস্থার চালু করেন। এই থিয়েট্রিক্যাল যাত্রায় 'পদ্মিনী' পালা হইতে জুড়ি ও বালকদের গান উঠিয়া যায় এবং 'যাত্রাব্যালে' প্রবর্তিত হয়। মথুরানাথের মৃত্যুর পরে তাহার পোষ্যপুত্র সুরেন্দ্র নাথ সাহা কিছুকাল দল পরিচালনা করেন। এই সময় সংস্থায় পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য নাট্যকারের পালা অভিনীত হয়। মথুরানাথ সাহার দলের প্রধান গায়ক ছিলেন হেমচন্দ্র পাণ্ডা (বাঁকুড়া) ও জ্যোতিষ প্রামাণিক (পান্তাপাড়া, যশোহর)। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, মন্মথ গাঙ্গুলী ও অহীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর, কলিকাতা)। বর্ধমান জিলার ক্ষুদপুরী শাঁখারী গ্রামের নলিনীরানী (নলিনী পাল) এবং বিনোদরানী (বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী) নারী চরিত্রাভিনয়ে খুব সুনাম অর্জন করেন।[১] ১৩৩০ সাল পর্যন্ত সংস্থা কর্তৃক লোকনাট্য পরবেশিত হয়। নিমতলা ষ্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মোড়ে সংস্থার কার্যালয় ছিল।

শশিভূষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপেরা পার্টি

বর্ধমান-কালনার অধিবাসী প্রখ্যাত বেহালা বাদক শশিভূষণ অধিকারী দলটির প্রতিষ্ঠাতা। উনিশ শতকের শেষের দিকে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ শতকের প্রথম হইতে ইহার সুনাম অর্জিত হয়। সংস্থার কার্যালয় ছিল পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জুড়ির গানের সময় মাঝে মাঝে গীতবন্ধ করিয়া দিয়া শশিভূষণ বেহালায় আসর জমাইতেন; কিছুক্ষণ বাজনার পরে আবার জুড়িরগান শুরু হইত। শশিভূষণের বেহালা তৎকালে যাত্রার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই সম্প্রদায়ে শশিভূষণ অভিনয়ের আনুসঙ্গিক সুর পরিবেশণের বিশেষ প্রচলন করেন। বড়িষা নিবাসী সূর্য ওস্তাদের (সূর্যকুমার কাহার) প্রধান বেহালা-শিষ্য ছিলেন শশিভূষণ। ভারতের বড়লাট দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় (১৯১০—১৯১৬) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জের ভারত আগমণ উপলক্ষে [২]"আয়োজিত উৎসবে পদকপ্রাপ্ত শিল্পীদের মধ্যে সূর্য ওস্তাদ অন্যতম।" শশিভূষণ প্রথমে যাত্রার দলের নাচিয়ে ছিলেন। পরে নাচ ছাড়িয়া তিনি কেবল বেহালাই বাজাইতেন। শশিভূষণের সংস্থায় রাইচরণ সরকারের

১। সাধনচন্দ্র ভাণ্ডারী, ভাণ্ডারী অপেরা দ্রষ্টব্য

২। ফণিভূষণ মতিলাল, অভিনেতা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

'গন্ধেশ্বরী', 'পাষণ্ডদলন', অঘোর চন্দ্রের 'কুরুপরিণাম', ভোলানাথের 'কুবলাশ্ব', ধনকৃষ্ণ সেনের 'উমাতারা', মতিলাল ঘোষের 'দ্বারাবতী', প্রভৃতি পালা অভিনীত হয়।

বৌকুণ্ডের দল

নবদ্বীপের নীলমণি কুণ্ডের স্ত্রী যাত্রার দল পরিচালনা করিয়া বৌ-কুণ্ড নামে পরিচিতি লাভ করেন। নীলমণির মৃত্যুর পরে তাহার দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন বৌ-কুণ্ড। পূর্বেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দলে 'কৃষ্ণ-যাত্রা' এবং অঘোর চন্দ্রের 'কল্‌কী অবতার', 'নহুষ উদ্ধার' প্রভৃতি পালাও অভিনীত হইত।

কটাগোলাপীর দল

এই দলেও স্ত্রী ভূমিকাগুলি নারী দ্বারা অভিনীত হইত। এই সম্প্রদায়ে কৃষ্ণ-যাত্রার পালা অধিক অভিনীত হইত। চিৎপুর অঞ্চলে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভবতারিণীর দল

কলিকাতার জোড়াবাগান অঞ্চলে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'হরিশ্চন্দ্র', 'রাবণবধ', প্রভৃতি পালা দল কর্তক অভিনীত হইত। এই সম্প্রদায়ে স্ত্রী ভূমিকায় নারীরা অভিনয় করিতেন।

ত্রৈলোক্যতারিণীর দল

কলিকাতা শোভাবাজারে ত্রৈলোক্যতারিণীর দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রদায়ে স্ত্রীচরিত্রে নারী অংশ গ্রহণ করিতেন। তৎকালে ত্রৈলোক্যতারিণীর দলের খুব পরিচিতি হইয়াছিল। 'বভ্রুবাহন', 'নলদময়ন্তী', 'অভিমন্যুবধ', অঘোরচন্দ্রের 'চিত্রাঙ্গদা', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণা' ইত্যাদি পালা দলে অভিনীত হইত। শ্যাম বাগদী (শ্যামের বাঁশী) এই দলের খ্যাতনামা গায়ক ছিলেন।

রাধাবিনোদিনীর দল

দলটি নিমতলা ফুলবাগানে অবস্থিত ছিল। এই সংস্থায়ও স্ত্রী চরিত্রে নারী অংশ গ্রহণ করিত। 'কল্যাণী', 'শ্মশান', প্রভৃতি পালা দলে অভিনীত হইত।

মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল

'পানেদের দল' ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ইহাদের দ্রব্যাদি সস্তায় ক্রয় করিয়া লইয়া

দুইটি দল গঠিত হয়। যাদবচন্দ্র ইহাদের একটির কর্তৃত্ব লইয়া অধিকারী হইলেন। এই দলে বিভিন্ন পালার মধ্যে ধনকৃষ্ণ সেনের 'হংসধ্বজের মহামুক্তি ও 'কর্ণবধ'-এর খুব জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়। উনিশ শতকের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত দলটি চলে।

প্রসন্ন নিয়োগীর দল

'বৌ-মাস্টারের দলের' পরিচালক রামলাল চট্টোপাধ্যায় এক সময় সংস্থার অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই উনিশ শতকের শেষভাগে প্রসন্নবাবু রামলালের নিকট হইতে দলটি ক্রয় করিয়া ফরাস ডাঙ্গায় প্রসন্ন নিয়োগীর দল গঠন করেন। পরবর্তীকালে এই সংস্থা ফরাসডাঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বেনিয়াটোলায় উঠিয়া আসে। প্রসন্নবাবুর মৃত্যুর পরে তাহার ভ্রাতা শ্যাম নিয়োগী দলের মালিক হইলেন। দুই বৎসর দল চালাইবার পরে তিনি ইহা গণেশ চন্দ্র ঘোষের নিকট বিক্রয় করেন। প্রসন্ন নিয়োগীর দলের প্রধান অভিনেতা ও শিক্ষক ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'নলদময়ন্তী', 'মায়াবতী' ও হারাধন রায়ের 'মহাশ্বেতা', 'যোগমায়া', 'সীতা উদ্ধার', 'সুরথউদ্ধার' নাটকাদি এই দলে অভিনীত হইত। সংস্থার অন্যতম প্রধান অভিনেতা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ পাণ্ডা (মেদিনীপুর)। এই সম্প্রদায়ের যতীন বাঁশিওয়ালার (কালিঘাট, কলিকাতা) খ্যাতি ছিল।

ভূষণচন্দ্র দাসের সঙ্গীত সমাজ

'পানেদের দল' ভাঙ্গিবার পরে গঠিত দ্বিতীয় দলটি এই নামে পরিচিত হয়। বর্ধমান জিলার কালনা আমুখালের অধিবাসী সুগায়ক ভূষণচন্দ্র দাস দলের অধিকারী ছিলেন। নাথের বাগানে (কলিকাতা) এই সংস্থার কার্যালয় ছিল। 'পরশুরাম', 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ', মতিলাল ঘোষের 'ধ্রুব', 'অভিমন্যু বধ', 'বুদ্ধলীলা', অঘোর চন্দ্রের 'প্রতিজ্ঞা পালন', কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তরণীসেন' প্রভৃতি পালা সম্প্রদায় কর্তৃক আসরস্থ হয়। এই সংস্থার কুঞ্জবিহারীর 'মাতৃপূজা তৎকালে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এই পৌরাণিক পালায় সরকার বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হওয়ায় ইহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ইহার প্রধান অভিনেতা ছিলেন বিজয় কুমার চক্রবর্তী।[১] "ভূষণদাসের দল হইতে যাত্রায় কর্ণেট বাঁশির স্থায়ী প্রচলন হয়; প্রচলনকারী তদানীন্তন

১। নারায়ণ চন্দ্র বসু, বাঁশি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

বিশিষ্ট কর্ণেট বাদক কালীচরণ মিত্র।" সম্প্রদায়ের ভূষণ বাঁশিওয়ালার খুব নাম ছিল। ১৩২১ সালের পরে দল বন্ধ হইয়া যায়।

ভাণ্ডারী অপেরা

যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল বন্ধ হইলে ইহার সব দ্রব্য সস্তায় ক্রয় করিয়া হুগলী জিলার সেওয়া-আমডোবা নিবাসী শ্রীচরণ ভাণ্ডারী 'সীমুলিয়া নাট্য সমাজ' নামে একটি দল গঠন করেন। 'সমুদ্র মন্থন', 'কর্ণবধ', 'অতিকায়' প্রভৃতি পালা দলে অভিনীত হয়। ১৩২৮ সালে সংস্থার নামকরণ করা হয় 'ভাণ্ডারী অপেরা'। শ্রীচরণবাবুর পুত্র সাধনচন্দ্র ভাণ্ডারীকে ইহার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শ্রীচরণভাণ্ডরীর পরে সাধনচন্দ্র দলের অধিকারী হইলেন। 'ভাণ্ডারী অপেরার' প্রধান নাটক অঘোরচন্দ্রের 'সপ্তরথী'। ইহার পরে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাসুদেব', 'রামানুজ', 'মায়াচক্র' প্রভৃতি পালা এই সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। এক সময় এই দলের প্রধান অভিনেতা ও শিক্ষক ছিলেন ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (সংস্থার অন্যান্য পরিচিত নটের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর) ও হৃষীকেশ চক্রবর্তী (দাশপুর—গোকুলনগর, মেদিনীপুর)। জনপ্রিয় সুকণ্ঠ নট সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক সময় এই দলের প্রধান অভিনেতা ছিলেন। নারী চরিত্রাভিনেতাদের মধ্যে বিভূতিরানী (মকড়াদার—বিভূতি গাঙ্গুলি) ও হরিপদ রানীর (হরিপদ বায়েন, গড়বেতা মেদিনীপুর) খুব পরিচিতি ছিল। সংস্থার প্রধান গায়ক ছিলেন বিনোদচন্দ্র ধাড়া। হুগলী-বলাগড় নিবাসী 'পঞ্চুনাগা' নামে খ্যাত জনৈক শিল্পী এবং ক্ষুদিরাম অধিকারী (নদীয়া) দলের পরিচিত গায়ক ছিলেন। ১৩৪১ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা লোকনাট্য পরিবেশন করে। ১১৮, চিৎপুর রোডে সংস্থার কার্যালয় ছিল।

যামিনী ভাণ্ডারীর দল

হুগলী জিলার বেঙ্গাই নিবাসী যামিনী ভাণ্ডারী এই দলের অধিকারী ছিলেন। 'হরিশ্চন্দ্র পালা' ও রামদুর্লভের 'ভীষ্ম বিজয়', 'সহস্রস্কন্ধরাবণ' প্রভৃতি এই দলে অভিনীত হয়।

গদাধর ভট্টাচার্যের দল

রসিক চক্রবর্তীর 'বালকসঙ্গীত সম্প্রদায়' নামে যে দলটি ছিল রসিকবাবুর মৃত্যুর কিছুকাল পরে গদাধর ভট্টাচার্য তাহার জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া স্বনামে

একটি যাত্রার দল গঠন করেন। গদাধর বাবু এই সংস্থার অভিনেতা ছিলেন। অন্যান্য পালার সঙ্গে সংস্থা কর্তৃক নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীবৎস-চিন্তা' ও 'বিক্রমাদিত্য' পালা অভিনীত হয়। এই দুইটি নাটকে সংস্থার খুব খ্যাতি লাভ হয়। নাথের বাগান অঞ্চলে এই সংস্থার কার্যালয় ছিল।

গিরিশ চট্টোপাধ্যায়ের দল

গিরিশচন্দ্র ফরাস ডাঙ্গয় এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন পালা অভিনয় করিলেও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়' অভিনয় করিয়া সংস্থাটি প্রভূত যশের অধিকারী হয় এবং ইহার পর হইতে এই সম্প্রদায় 'কালাপাহাড়ের দল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

গণেশ অপেরা পার্টি

বর্ধমান-কালনার ব্যবসায়ী গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রসন্ন নিয়োগীর দল ক্রয় করিয়া 'প্রসন্ন নিয়োগীর নামীয় যাত্রা সম্প্রদায়' নামে সংস্থাটি চালাইতে থাকেন। দলের অধিকারী গণেশচন্দ্র হইলেও ইহার পরিচালনা-দায়িত্ব গ্রহণ করেন সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে গণেশচন্দ্রের জামাতা হরিপদ কুমার (কালনা-ডেরেটোন) দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া শ্বশুরের নামে ইহার নামকরণ করেন 'গণেশ অপেরা পার্টি'। সম্প্রদায়ের প্রধান অভিনেতা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীকিংকর গুহ (হুগলী বলাগড়), আশুতোষ ঘোষ (ট্যারা আশু) ও জ্ঞানময় মিত্র (নবস্তা বর্ধমান)। 'নরকাসুরের' নরক, 'জগদ্ধাত্রীর' করিন্দ্র, 'কালাপাহাড়ের' সুলেমান, 'রাখিবন্ধনের' নন্দলাল খ্যাত প্রভাত রঞ্জন বসু (জন্ম ১৯০০ খ্রীঃ, হাওড়া শিবপুর নিবাসী) এক সময় সংস্থার প্রধান অভিনেতা ছিলেন। ২৪ পরগণার অধিবাসী উপেন্দ্রনাথ অধিকারী (উপেন রানী) ও বর্ধমান-কাটোয়ার রমারঞ্জন দাস (রঞ্জন রানী) দলের সুপরিচিত নারী চারিত্রাভিনেতা ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক ছিলেন মেদিনীপুর-ঘাটালের যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কানা যতীন) ও হিতেন্দ্র গোস্বামী (বর্ধমান-গোরাবাজার)। যতীন্দ্রনাথ যাত্রার অন্যতম সুরকারও ছিলেন। রামদুর্লভের 'ভীষ্মবিজয়' ভোলানাথের 'পৃথিবী', 'আদিশূর', 'পঞ্চনদ', 'দাক্ষিণাত্য', 'কৈকেয়ী', ব্রজেন্দ্র কুমারের 'লীলাবসান' 'বঙ্গবীর' প্রভৃতি এবং বিনয়কৃষ্ণের 'রক্ত কমল' ইত্যাদি পালা সংস্থা কর্তৃক

অভিনীত হয়। [১]"১৩৫১ সাল পর্যন্ত দলটি চালু ছিল।" নাথের বাগানে (কলিকাতা) ইহার কার্যালয় ছিল।

রামলাল চাটুয্যের দল

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি একটি যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামী অভিনেতা ছিলেন। দলে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পালাদি অভিনীত হইত। আহিরীটোলায় সংস্থার কার্যালয় ছিল।

রামকৃষ্ণ নাট্য সমিতি

হরিপদ কুমার 'গণেশ অপেরা পার্টির' কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার পরে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ দল পরিত্যাগ করিয়া হরঢোল লেনে (আহিরীটোলা, কলিকাতা) 'রামকৃষ্ণ নাট্য সমিতি' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। এই সংস্থায় 'শ্মশান' পালার খুব খ্যাতি হয়। 'রানাকুম্ভ', 'শিবিরাজা', 'দেবযানী', হারাধন রায়ের 'তাম্রধ্বজ' ও অন্যান্য পালা, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'ভাগ্যদেবী' প্রভৃতি নাটক এই দলে অভিনীত হয়। সতীশচন্দ্র অভিনেতা ও নাট্য শিক্ষক ছিলেন। নারী চরিত্রাভিনেতাদের মধ্যে দলের কমলরানীর খুব সুনাম ছিল। ১৩৩৬ সালে দলটি বন্ধ হইয়া যায়।

শশিভূষণ হাজরার শান্তিনাট্য সম্প্রদায়

ভূষণচন্দ্র দাসের দল উঠিয়া যাইবার পরে বর্ধমান জেলার কালাপাহাড়ী-সন্তোষপুরের শশিভূষণ হাজরা ১৩২১ সালে ঐ দলের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ে অঘোর চন্দ্রের 'শতাশ্বমেধ', 'চন্দ্রকেতু', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদ সদাগর', 'ফুল্লরা', কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিজ্ঞা পালন' প্রভৃতি লোকনাট্য অভিনীত হয়। দলের প্রধান অভিনেতা ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু (নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা)। ১৩৩৭ সালে শশিভূষণের দল উঠিয়া যায়। আহিরীটোলা ও চিৎপুরের মোড়ে দলের কার্যালয় ছিল।

আর্য অপেরা

শশিভূষণ হাজরার দল বন্ধ হইলে হাওড়া-কল্যাণপুরের অধিবাসী অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক ইহা ক্রয় করিয়া আর্য অপেরা সংস্থাটি গঠন করেন। এই সংস্থা

১। রজনীকান্ত মণ্ডল, পালা সম্পাদনা দ্রষ্টব্য

কর্তৃক কানাইলাল শীলের 'বীরপূজা', 'ব্রহ্মতেজ', ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রহাস', 'চণ্ডীদাস', 'সাধু তুকারাম', ব্রজেন্দ্র কুমার দের 'বঙ্গালী,' কানাইলাল নাথের 'কবরের কান্না' প্রভৃতি লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। এই সংস্থার প্রধান গায়ক ছিলেন ২৪ পরগণা জিলার বিবিরহাট-নিবাসী সুধীরচন্দ্র দাস (জন্ম ১৩০৭ সাল)। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে সৌরীন্দ্রনাথ কুণ্ডু এই সংস্থার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া নাম পরিবর্তন করেন। সংস্থার কার্যালয় ছিল চিৎপুর রোডের উপর।

নবদ্বীপ ব্রজবাসীর দল

ফরিদপুর জিলার বাকপালং নিবাসী ব্রজবাসী কীর্তনিয়া এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। 'মানভঞ্জন', 'নৌকাবিলাস' প্রভৃতি কৃষ্ণ-যাত্রায় এই সংস্থার খুব খ্যাতি ছিল।

ঘোষালের দল

কুমিল্লার চালতাতলি নিবাসী উমানাথ ঘোষাল এই দলের অধিকারী ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছাড়িয়া তিনি যাত্রার দল করেন। দলটির প্রকৃত নাম 'মহাশক্তি অপেরা'; কিন্তু 'ঘোষালের দল' নামেই ইহা পরিচিত ছিল। উমানাথ ঘোষাল জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন। তাহার নাম অনুসারেই সংস্থাটি লোকমুখে 'ঘোষালের দল' নামে খ্যাতি লাভ করে। 'অন্নপূর্ণা', 'মহালক্ষ্মী', 'দাতাকর্ণ,' 'চন্দ্রধর', 'কার্তবীর্য সংহার' প্রভৃতি লোকনাট্য এই সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হয়। এই সংস্থার প্রধান গায়ক ছিলেন হরকুমার শীল (নোয়াখালী)।

নাগ কোম্পানী

বরিশাল জিলার কৃষ্ণকাঠি গ্রামনিবাসী রজনী নাগ ইহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। অঘোর চন্দ্রের 'অনন্তমাহাত্ম্য', ভোলানাথের 'কুবলাশ্ব', রামদুর্লভের 'ঘোরাসুর' প্রভৃতি পালা এই সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হয়। ইহার প্রধান অভিনেতা ছিলেন চুনীলাল গোস্বামী (নদীয়া-শান্তিপুর) ও দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (যশোহর)। সংস্থার অন্যান্য অভিনেতার সঙ্গে ক্ষিতীশ চন্দ্র নাগ যুবরাজ শ্রেণীর চরিত্রাভিনয়ে সুনাম অর্জন করেন। সংস্থার বলরাম নন্দী (রামসিদ্ধি, বরিশাল) পরিচিত ক্লারিওনেট বাদক ছিলেন।

নাগ-দত্ত-সিংহ-রায় কোম্পানী

অধিকারীদের পদবী অনুযায়ী দলটির নামকরণ করা হয়। বরিশাল জিলার ঝালকাঠিতে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অদৃষ্ট', 'ঘোরাসুর', 'পরশুরামের মাতৃহত্যা', অহিভূষণের 'সুরথ উদ্ধার', ভোলানাথের 'কুবলাশ্ব', প্রভৃতি লোকনাট্য সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। এই দলটি অল্পকাল পরে ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইহা হইতে 'গুহরায় কোম্পানী', মহেন্দ্রসিংহের (বাদলকাঠি-বরিশাল) 'সিংহ কোম্পানী', পরে মহেন্দ্রসিংহও রজনী নাগের 'নাগসিংহ কোম্পানী' ও 'লেডি কোম্পানীর' উদ্ভব হয়। লেডিকোম্পানীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহাতে স্ত্রী ভূমিকায় নারী অংশ গ্রহণ করিতেন। পূর্ববঙ্গে লেডিকোম্পানীতেই প্রথম মহিলা শিল্পী নারী চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন। এই সংস্থার মালিক ছিলেন শ্রীমতী বোঁচা। সংস্থাটি ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অক্ষয়বাবুর দল ও কেষ্টসাহার দল

ঢাকা জিলার রাজখাড়া নিবাসী অক্ষয়বাবু প্রতিষ্ঠিত যাত্রা সংস্থা এবং নোয়াখালি জিলার কৃষ্ণচন্দ্র সাহার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত যাত্রাসংস্থা দুইটি এই নামে পরিচিত হয়। বিশ শতকের প্রথম পাদে ইহারা পরিচিতি অর্জন করে। ইহারা পৌরাণিক পালা পরিবেশনে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

নবদ্বীপ সাহার দল

ফরিদপুর জিলার কেদারবাড়ি নিবাসী নবদ্বীপ সাহা 'কেদারবাড়ি থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি' নামে একটি দল গঠন করেন। এই সংস্থার কার্যালয় ছিল নারায়ণগঞ্জ। ইহা 'নবদ্বীপ সাহার দল' নামে খ্যাতি লাভ করে। 'রাখি বন্ধন', 'ধ্রুব', 'মান্ধাতা', অঘোরচন্দ্রের 'অনন্তমাহাত্ম্য' প্রভৃতি পালা সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত হয়। এই সংস্থার দুর্গারানী (পালংনিবাসী দুর্গামোহন দাস) স্ত্রী চরিত্রে খুব জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন। কলিকাতায় সংস্থার কার্যালয় ছিল শোভাবাজার।

ঠাকুর কোম্পানী

বরিশাল জিলার নলচিঠি গ্রাম নিবাসী রজনীকান্ত চক্রবর্তী এই দলের অধিকারী ছিলেন। ১৩০৯ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]"তানপুরা

১। সুধকুমার দত্ত, নট্টকোম্পানী ও হাস্যরসাভিনেতা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

পরিত্যক্ত হয়ে এই দলে ১৩১০ সালে প্রথম হারমোনিয়াম বাজনার প্রচলন হয়। যশোহর জিলার ঝিকোরগাছা নিবাসী ভূষণ দাস হারমোনিয়ম বাদক ছিলেন; তিনি চমৎকার যাত্রা গায়কও ছিলেন।" ঠাকুর কোম্পানীর অভিনীত পালা ছিল 'বাণপরাজয়', 'প্রহ্লাদ', 'ধ্রুব', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'তারা', 'রুক্মাঙ্গদেবের হরিবাসর' প্রভৃতি। যদুরানী (বারিশালের ব্রাহ্মণ-তিতনারঅধিবাসী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়) খ্যাতি সম্পন্ন নারীচরিত্রাভিনেতা ছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের দলটি বন্ধ হইয়া যায়।

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের দল

১৩১৭ সালে যশোহর জিলার কোদলাপাড়া নিবাসী নীলমাধব মুখ্যোপাধ্যায় এই দল গঠন করেন। তৎকালে এই দলের খুব খ্যাতি ছিল। পঞ্চানন চক্রবর্তী (লাউজলি, যশোহর) ও কালিদাস দত্ত (কোদলাপাড়া, যশোহর) সংস্থার খ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন। যশোহরের উনসিয়া গ্রাম নিবাসী সতীশ কান দলের নাম করা বেহালাবাদক ছিলেন। সংস্থার প্রধান গায়ক ছিলেন টেনা জোলা (যশোহর), এই গায়ক সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। 'মেঘনাদবধ', 'প্রবীরপতন', 'সুরথ উদ্ধার', 'রাবণবধ', 'কংসবধ' প্রভৃতি পালা সংস্থা কর্তৃক খুব যশের সঙ্গে পরিবেশিত হইত। ১৩৩০ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকনাট্য পরিবেশন করে।

পাষাণময়ী অপেরা

বরিশাল জিলার নথুল্লাবাদের স্বর্ণকুমার রায়, ঐ গ্রামেরই রমনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং বাদলকাঠি গ্রামের রমনীকান্ত গুহ এই সংস্থার অধিকারী ছিলেন। নথুল্লাবাদে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনয়ের দিক হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা পরিবেশন করিয়া সংস্থাটি সুনামের অধিকারী হয়। সুরেশচন্দ্র মুখ্যোপাধ্যায় (সুরেশমাষ্টার) ও ফণিভূষণ মতিলাল (ছোটফণী), রমেশ মুন্সী (বরিশাল) ইহার প্রধান অভিনেতা ছিলেন। অঘোর চন্দ্রের 'লক্ষবলি', 'চিত্রাঙ্গদা', ভোলানাথের 'বিন্ধ্যাবলি', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্ষণাদেবী' পালাভিনয়ে সংস্থা প্রভূত যশ অর্জন করে।

ভোলানাথ অপেরা

ফরিদপুর জিলার নোরিয়ানিবাসী মহেন্দ্রকুমার সেন ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতা ভোলানাথের স্মরণে সংস্থার নামকরণ হয়।

'ভোলানাথ অপেরার' খুব প্রসিদ্ধি ছিল। 'ধ্রুব চরিত্র', 'দক্ষযজ্ঞ', অঘোরচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'অনুধ্বজের 'হরিসাধনা', পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়', সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মাটির মা' প্রভৃতি নাটক সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত এই সংস্থা সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে লোকনাট্য পরিবেশন করে। সংস্থার চিন্তাহরণ কাওয়ালীর ক্লারিওনেটের খ্যাতি ছিল। প্রখ্যাত অভিনেতারা এই দলে অভিনয় করিয়াছেন। শৈলেশ মজুমদার (কালিয়া-যশোর) ও নির্মলচন্দ্র বসু (কলিকাতা) সংস্থার বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন। কলিকাতা-অন্নপূর্ণা-ঘাটে দলটির কার্যালয় ছিল

মহাকালী সংগীত সম্প্রদায়

ইহা কৃষ্ণচন্দ্র আদকের দল। অন্যান্য পালার সঙ্গে নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্মশানে মিলন' নাটকে ইহার যথেষ্ট সুনাম অর্জিত হয়।

গৌরমোহন অধিকারীর দল

মৈমনসিংহে এই সংস্থার খ্যাতি ছিল। 'নরমেধযজ্ঞ', 'ধ্রুবচরিত্র' প্রভৃতি পালা সংস্থাকর্তৃক পরিবেশিত হইত।

নিউ শংকর অপেরা

এই সংস্থায় নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় ও রাম দুর্লভ কাব্য বিশারদের পালাদি অভিনীত হয়। রামদুর্লভের 'ভুবনেশ্বরী' পালায় ইহার সুনাম হয়। জোড়াবাগানে সংস্থার কার্যালয় ছিল।

ষষ্ঠী অপেরা

এই সংস্থার অভিনীত পালাগুলির মধ্যে রাইচরণ সরকারের 'কর্মফল', নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের "পাঞ্চালী" অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থের 'মেবার কুমারী' ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয়-বসন্ত' উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় হাওড়া জিলার শালকিয়ায়। কিন্তু ইহার কার্যালয় ছিল বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে (কলিকাতা)।

শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা

সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'শম্বরাসুর' পালায় ইহার জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়। দলের মালিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া-আন্দুল)। নতুনবাজারে সংস্থার কার্যালয় ছিল।

চণ্ডী অপেরা

এই সংস্থার মালিক ছিলেন বিপিন বিহারী শাস্ত্রী। কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) ইহার কার্যালয় ছিল। অঘোরচন্দ্রের 'শ্রীবৎস', ব্রজেন্দ্রকুমারের 'প্রতিশোধ', জিতেন্দ্রনাথের 'মানুষ' প্রভৃতি পালা এই দলে অভিনীত হইত।

গৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সংঘ

নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নিমতলা ষ্ট্রীট ও রবীন্দ্রসরণীর সংযোগস্থলে ইহার কার্যালয় ছিল। হরিপদর পরে নাট্যকার পশুপতি চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল এই দল পরিচালনা করেন। হরিপদর 'পঞ্চরাত্র' ও পশুপতির 'তাপসকুমারী', 'সতী', 'লায়লা-মজনু' প্রভৃতি পালা এই দলকর্তৃক অভিনীত হয়।

বীণাপাণি নাট্য সমাজ

হুগলী নাটাগড়ের জমিদার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অধিকারী। পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) সংস্থার কার্যালয় ছিল। 'রাখিবন্ধন' 'রঙ্গাবতী', 'দক্ষিণা' প্রভৃতি লোকনাট্য এই সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হয়। প্রধান প্রধান পুরুষ চরিত্রাভিনেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মিত্র (কুমারটুলী, কলিকাতা) ও ভূপতি পালিত। স্ত্রী ভূমিকায় প্রধান ছিলেন কানাই রানী (বর্ধমান-শক্তিগড় অঞ্চলের অধিবাসী)। দলের প্রধান গায়ক ছিলেন পূর্ণ গাইয়ে (পাত্রসায়র, বাঁকুড়া)।

রণজিৎ অপেরা

বরিশাল জিলার বানারিপাড়ায় ১৩৩৫ সালে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের স্বত্বাধিকারী ছিলেন কালিয়দমন গুহঠাকুরতা (১৩০৫-১৩৭০)। 'প্রবীরার্জুন', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'বাজিরাও', 'পরশুরাম' প্রভৃতি পালা দলে অভিনীত হয়। কালিয়দমন গুহঠাকুরতা ও পঞ্চু সেন সংস্থার নামী অভিনেতা ছিলেন। ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত দলটি চলে। কালিয়দমন অম্বিকানাট্য কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কালিয়দমন যাত্রার দলে যোগদান করেন হরলাল গাঙ্গুলীর অনুপ্রেরণায়। নট্টকোম্পানী, ভোলানাথ অপেরা আর্যঅপেরা, অম্বিকা নাট্য কোম্পানী প্রভৃতি প্রখ্যাত দলে তিনি অভিনয় করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাহার অভিনীত চরিত্রের মধ্যে অনন্ত রায় (রক্ততিলক), শাম্ব-(লীলা অবসান), পরমেশ্বর (বাংলার বধূ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রয়েল বীণাপাণি অপেরা

এই সম্প্রদায়ের অধিকারী ছিলেন বেনেটোলা (কলিকাতা) নিবাসী গোষ্ঠবিহারী পাল। তিনি অভিনেতা ছিলেন। সম্প্রদায়ের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বীরভূম)। পঙ্কজভূষণ রায়ের 'দেবাসুর', 'মহামানব', 'শান্তনু' প্রভৃতি ও অন্যান্য পালা সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। সংস্থার কার্যালয় ছিল বেনিয়াটোলা, কলিকাতা।

রঞ্জন অপেরা

হেতমপুরের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর একটি সৌখিন দল ছিল। পরবর্তী কালে জলধিরায়কে পুরোভাগে রাখিয়া কুমার বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী ইহাকে পেশাদারী যাত্রাদলে রূপান্তরিত করেন। কানাইলাল শীলের 'দলমাদল', 'দেশেরদাবী', সৌরীন্দ্রমোহনের 'ব্যথারপূজা','রক্তবীজ', 'চক্রছায়া','আত্মাহুতি' 'পলাশীর পরে', পূর্ণচন্দ্রদাসের 'স্বপ্নসাধনা', জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'রক্তের লেখা' প্রভৃতি পালা সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত হয়। প্রখ্যাত অভিনেতারা ইহাতে অভিনয় করিতেন। সংস্থার প্রধান গায়ক ছিলেন সত্যচরণ অধিকারী (হাওড়া-আমতা)। এই সংস্থার কার্যালয় ছিল চিৎপুর রোড-এ।

বিল্বগ্রাম নট্টকোম্পানী

বরিশাল জিলার বিল্বগ্রামে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার মালিক ছিলেন কালীচরণ নট্ট। গ্রামের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয়। এই দলে অঘোরচন্দ্রের 'মহালক্ষ্মী', পঙ্কজভূষণের 'মহামানব', নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'সপ্তমাবতার', কানাইলাল শীলের 'নিয়তি', বিনয়কৃষ্ণের 'পণমুক্তি', ভোলানাথের 'ধর্মযজ্ঞ', জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'কাজলগড়' ইত্যাদি পালা অভিনীত হয়। সংস্থার প্রধান প্রধান অভিনেতা ছিলেন ভোলানাথ ভট্টাচার্য (নৌহাটা, যশোহর), অমূল্য গাঙ্গুলী (ঢাকা)। দলের বিরাজমোহন সেন (বরিশাল) ও শচীন মুখোপাধ্যায় (জয়পুর-যশোহর) পরিচিত অভিনেতা ছিলেন। সংস্থার নৃত্যশিল্পী বিভোর বসুর খুব খ্যাতি ছিল। স্ত্রী ভূমিকায় রাখালরাণী (রাখালচন্দ্র দাস—বরিশাল) জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন।

(খ) বর্তমানে প্রচলিত দল

বর্তমানে প্রচলিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক হইতে প্রথমেই নাম করিতে হয় 'সত্যম্বর অপেরা'র, ইহার পরেই 'নট্টকোম্পানীর' কথা আসে।

বর্তমান কালে পেশাদারী লোকনাট্য সংস্থাগুলির কেন্দ্রস্থল কলিকাতার চিৎপুর ও শোভাবাজার অঞ্চল।

সত্যাম্বর অপেরা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা সত্যাম্বর চট্টোপাধ্যায় সংস্থার নাম পরিবর্তন করিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে স্বনামে চিহ্নিত করেন। ১৪, ভগবান ব্যানার্জিলেনের (কলিকাতা-৫) অধিবাসী গৌরচন্দ্র দাস (জন্ম ১৩০০ সাল) ইহার অধিকারী ছিলেন। বর্ধমান জিলার অন্তর্গত বৈদ্যপুর-তালা গ্রামে তাহার পৈতৃক নিবাস। দশ বৎসর বয়সে ১৩১০ সালে তিনি মতিলাল রায়ের যাত্রাদলে বালকগাইয়ে রূপে যোগদান করেন। ১৩১৫ সালে মতিলালের পরলোক গমনের পরে গৌরচন্দ্র 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজে' যোগ দেন। এই সংস্থায় তিনি প্রথমে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করিতেন। 'সত্যাম্বর অপেরা' নামকরণের পর হইতে তিনি নারীচরিত্রাভিনেতা-রূপে আসরে অবতরণ করিতে থাকেন। ইহার পরে কিছুকাল পুরুষচরিত্রাভিনেতা-রূপে কাজ করিয়া গৌরচন্দ্র এই সম্প্রদায়ের কর্মাধ্যক্ষ ও পরে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেনার দায়ে সত্যাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দল চালনা করা আর সম্ভব হইল না। গৌরচন্দ্র দাস তখন সত্যাম্বরকে নামে-অধিকারী রাখিয়া নিজের অর্থব্যয়ে সত্যাম্বর অপেরা চালনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সত্যাম্বর নামে-অধিকারী থাকিতে চাহিলেন না। কাজেই অল্পকাল মধ্যেই সত্যাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে গৌরচন্দ্র প্রচার পত্রে স্বত্বাধিকারী রূপে নিজের নাম ঘোষণা করেন।

১৩০০ সাল হইতে অদ্যাবধি কাল পর্যন্ত এই সংস্থা লোকনাট্য পরিবেশন করিতেছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নাম পরিবর্তিত হইলেও 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজ' ও 'সত্যাম্বর অপেরা' একই দল এবং ইহার মালিকও ছিলেন অভিন্ন। 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজ' 'সত্যাম্বর চাটুযোর দল' রূপেই খ্যাত ছিল; সম্ভবত সত্যাম্বর বাবুর অভিনয় নৈপুণ্য ইহার মূলে ছিল। তিনি সুঅভিনেতা ছিলেন বলিয়া তাহার দল লোক মুখে তাহার নামেই পরিচিতি লাভ করে। তিনিও তাই বায়নার সুবিধার জন্য পরিচিত নামে দলকে চিহ্নিত করেন। সংস্থার হীরক জয়ন্তীবর্ষ ১৩৭৫ সালে গৌরচন্দ্রদাস পরলোকগমন করেন।

তাহার একমাত্র জামাতা শৈলেন্দ্রনাথ মোহান্ত (বি. কম.) এখন সম্প্রদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সুবলচন্দ্র অধিকারী সংস্থার পরিচালক। সত্যম্বর অপেরায় বাংলা দেশের খ্যাতিমান অভিনেতারা অভিনয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সংস্থা কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ধূলার স্বর্গ', 'সোনাইদীঘি', সৌরীন্দ্রমোহনের 'মাটির মানুষ', নন্দগোপালের 'আলোর ডাক', জিতেন্দ্রনাথের 'দ্বিতীয় পানিপথ', কানাইলাল নাথের 'কে কাঁদে', দেবেন্দ্র নাথের 'যাত্রা হল সুরু', ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অশ্রুদিয়ে লেখা', 'একটি পয়সা', 'পদধ্বনি', 'শাহানশা আকবর', 'মাতঙ্গিনী হাজরা', আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'দিগ্বিজয়', প্রগতিশীল নাট্যকার উৎপল দত্তের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' প্রভৃতি পালা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে পরিবেশিত হইতেছে। এই সংস্থার কার্যালয় ৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) অবস্থিত। সত্যম্বর অপেরা নানাদিক হইতে যাত্রার সংস্কার-মার্জন ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে শৈলেন মোহান্ত রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে প্রায়ই সংযোগ স্থাপন করিতেছেন। বর্তমান গ্রন্থকারকে তিনি নাট্য-উপদেষ্টারূপে বৃত করায় গ্রন্থকারের পরামর্শে সংস্থার হীরকজয়ন্তী বর্ষে শ্রীমোহান্ত (১৩৭৫ সাল) একটি যাত্রা লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। যাত্রাজগতে ইহা অভিনব ও প্রথম প্রচেষ্টার পরিচয়। লোকসংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারী গৌরচন্দ্র দাসের স্মৃতির উদ্দেশে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে 'গৌরচন্দ্র যাত্রা লাইব্রেরী',। বর্তমান গ্রন্থকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ লোকনাট্যকার ও প্রখ্যাত লোকনাট্যাভিনেতাদের আলোকচিত্র এই লাইব্রেরীতে স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সংস্থার পালানুসারে নূতন ধরণের ঐকতান রচনা করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নূতন লোকনৃত্য পরিকল্পনা করেন রবীন্দ্রভারতীর অংশকালীন লেকচারার রামকৃষ্ণ লাহিড়ী এম. এ.।

যাত্রার রঙ্গস্থল সহায়ক (propman) অভিনয়কালে রঙ্গস্থলে আসিয়া অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেওয়া-নেওয়া করে। এই আসর সহায়কের কোন নির্দিষ্ট পোষাক নাই। সে বুঝিতেই পারে না যে নাট্যপ্রয়োগে তাহারও একটু স্থান আছে। সে কখনো সোজা হইয়া কখনো গুঁড়িসুড়ি মারিয়া রঙ্গস্থলে দ্রব্যাদি দিয়া অভিনেতাদের সাহায্য করে। তাহার অগমন-নির্গমন অনেক সময় হাস্যকর হইয়া উঠে। জাপানের কাবুকি

নাটকের প্রয়োগ কর্তা propman সম্পর্কে সচেতন। ইহাতে propman-এর জন্য নির্দিষ্ট পোষাকের ('clad in black') ব্যবস্থা করা হয়। সে প্রবেশ পথ দিয়া সহজভাবেই মঞ্চে আসাযাওয়া করে। মঞ্চে তাহার স্থান সম্পর্কে সে নিজে ও সচেতন। যাত্রার propman সম্পর্কে মালিক ও নাট্য-পরিচালকের সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান গ্রন্থকারের পরামর্শে সত্যাম্বর অপেরার মালিক শৈলেন মোহান্ত propman-এর জন্য নির্দিষ্ট পোষাকের ব্যবস্থা করিয়া পার্ক সার্কাস ময়দানে 'একটি পয়সা' পালায় ১৩৭৫ সালে সংস্থার হীরক জয়ন্তী বর্ষে যাত্রায় নূতন রীতির প্রবর্তন করেন। ইহাতে propman-এর শিল্পিজনোচিত দায়িত্ববোধ বাড়িয়া উঠিবার সুবিধা হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থকারের পরামর্শে শ্রীমোহান্ত অর্কেষ্ট্রা পার্টির যন্ত্রীদের জন্যও ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ ধরণের পোষাকের প্রবর্তন করেন। যাত্রায় ইহা নূতন।

নট্টকোম্পানী যাত্রা পার্টি

বরিশাল জিলার মাচরং গ্রামনিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ নট্ট ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মাচরং বৈকুণ্ঠ নাট্য সমাজ' নামে একটি লোকনাট্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরিচালক ছিলেন শশিভূষণ নট্ট। বৈকুণ্ঠ নট্ট (বেহালাবাদক), হারান নট্ট (গায়ক) এবং পরে বৈকুণ্ঠ নট্টের জামাতা যোগেন্দ্রনাল নট্ট (ঢোলকতবলা বাদক) সংস্থায় যোগদান করেন।

দলের অধিকারী, পরিচালক ও অনেক সংগীত শিল্পী নট্ট বলিয়া লোকমুখে ইহা 'নট্টকোম্পানী' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই পরিচিতি অনুযায়ী দলের আর একটি নাম হয় 'নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টি'। এই নামেই দলের বিশেষ পরিচয়। প্রাচীনত্বের দিক হইতে চালু দলগুলির মধ্যে ইহার স্থান দ্বিতীয়। আটান্ন বৎসরের পুরাতন সংস্থার বর্তমান স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রলাল নট্টের পুত্র মাখনলাল নট্ট। বিভিন্ন দল হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যকুমার দত্ত এই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন নৃত্য-শিক্ষক, সুরশিক্ষক ও হাস্যরসের অভিনেতারূপে। অল্পকালের মধ্যেই তিনি দলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এই দল পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। অশীতিপরবৃদ্ধ সূর্যকুমার এখনো দল পরিচালনা করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই সংস্থা কর্তৃক টিকিট বিক্রয় করিয়া লোকনাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত করা হয়। বিখ্যাত

নট সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুরেশ মাষ্টার), ফণিভূষণ মল্লিক (ছোট ফণী) ও সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সম্প্রদায়ে প্রধান অভিনেতা রূপে কাজ করেন। ইহার অন্যতম খ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন হরলাল গঙ্গোপাধ্যায় (টিম্বল)। সংস্থার সুদর্শন নট জনার্দন চক্রবর্তী (নাকপাড়া, বরিশাল) সুঅভিনেতা ছিলেন। নট্টকোম্পানীর দক্ষ নট ছিলেন সুনীল মুখার্জি (রানু) এবং ঈশা খাঁ ও প্রবীর খ্যাত পঙ্কু সেন। নারী চরিত্রাভিনেতাদের মধ্যে বিনোদরানী দ্বিতীয় (বিনোদচন্দ্র দাস—মাহিলাড়া, বরিশাল) ও রেবতীরানী (রেবতী মোহন দে, ফরিদপুর) খুব যশের অধিকারী ছিলেন। এই সংস্থায় প্রসিদ্ধ নটগণ অভিনয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন কালীপদ দাস মজুমদার (কালীগাইয়ে)। সংস্থার অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক শ্যামচাঁদ সাঁতরা (চৌগাছা, নদীয়া)। কণ্ঠ বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহাকে 'শ্যামের বাঁশি' বলা হইত। অঘোরচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র', ভোলানাথের 'দাক্ষিণাত্য', 'আদিশূর', ফণিভূষণের 'মেদিনী', 'রামানুজ' (লক্ষ্মণবর্জন নামে), পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'মা', মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটক অবলম্বনে 'রাজা কংশ', প্রভৃতি বহু নাটক সংস্থা কর্তৃক যশের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমারের 'দেবতার গ্রাস', 'দেবীদাস', 'সম্রাট জাহানদার', 'আকালের দেশ', 'চাঁদবিবি' 'কৃষ্ণ-শকুনী', বিনয়কৃষ্ণের 'সংগ্রাম', জিতেন্দ্রনাথের 'ডাকিনীর চর', 'জয়যাত্রা' প্রভৃতি পালা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে পরিবেশিত হইতেছে। সংস্থার কার্যালয় ১৭, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীটে (শোভাবাজার, কলিকাতা-৫) অবস্থিত। পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া এই সংস্থা শোভাবাজারে অবস্থান করিতেছে।

নবরঞ্জন অপেরা

পূর্বোল্লিখিত রঞ্জন অপেরা বন্ধ হইলে জীবনকৃষ্ণ দাস (উত্তর কলিকাতা) ঐ দলের দ্রব্য-সম্ভার ক্রয় করিয়া ১১৭, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) 'নবরঞ্জন অপেরা' প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্প্রদায়ের পরিচালক শম্ভুনাথ ঘোষ। এই সংস্থা কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমারের 'বিচারক', 'যাদের দেখে না কেউ', নন্দগোপালের 'ভুলের মাশুল', জিতেন্দ্রনাথের 'জীবন্ত পাপ' বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাইকেল মধুসূদন', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'রক্তলেখা', শম্ভুবাগের 'রক্তাক্ত আফ্রিকা', সত্যপ্রকাশের 'লক্ষণ বর্জন' প্রভৃতি লোকনাট্য পরিবেশিত হইতেছে।

নিউগণেশ অপেরা

গণেশ অপেরা উঠিয়া গেলে গোষ্ঠবিহারী ঘোষ (নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা) ইহাকে 'নিউ গণেশ অপেরায়' রূপান্তরিত করেন। ৩৫৬।১, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) এই দলের কার্যালয়। ব্রজেন্দ্র কুমারের 'ধরার দেবতা', নন্দগোপালের 'আগুন', আনন্দময়ের 'পৃথ্বীরাজ', 'পরিচয়', 'সৈনিক', 'ভুলিনাই', কানাইলাল নাথের 'ঝড়ের পরে', অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'মসনদ' প্রভৃতি লোকনাট্য এই সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হইতেছে।

নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (উত্তর কলিকাতা) ও কালীপদ সরকার (উল্টোডাঙ্গা, কলিকাতা) সংস্থার অধিকারী। ১১৭, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) ইহার কার্যালয় অবস্থিত। এই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ভাগ্যের বলি', 'কবিচন্দ্রাবতী', 'দেশের ডাক', 'কলঙ্কিনীরাই', অনিলাভের 'রঘুডাকাত', নন্দগোপালের 'সাধকরামপ্রসাদ' সত্যসন্ধের 'একটুকরো রুটি, নরেশ চক্রবর্তীর 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতি পালা পরিবেশিত হইতেছে।

তরুণ অপেরা

প্রথমে কলিকাতার চোরবাগান অঞ্চলে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মুর্শিদাবাদ জিলার পলাশী নিবাসী সুধীর কুমার মণ্ডল ১১৩, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) ইহার কার্যালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে ইহার লেসী কলিকাতা-বাগবাজার নিবাসী বীরেন্দ্র নারায়ণ পাল। ব্রজেন্দ্রকুমারের 'রক্তের নেশা', 'মেঘে ঢাকা রবি', সৌরীন্দ্রমোহনের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রাজা রামমোহন' নন্দগোপালের 'সোনার সংসার', সত্যপ্রকাশ দত্তের 'পঞ্চনদীর তীরে', শম্ভুবাগের 'ঘুমভাঙার গান', 'হিটলার', 'লেনিন' প্রভৃতি পালা এই দল কর্তৃক অভিনীত হইতেছে। শম্ভুবাগ রচিত 'হিট্‌লার' পালা বন্দুকের ব্যবহার, শব্দ ও আলোকনিয়ন্ত্রণের জন্য যান্ত্রিকতার সাহায্য লইয়া আসরে প্রযোজিত হয়। বর্তমান গ্রন্থকারের পরামর্শের লোকনাট্যকার শম্ভুনাথের হিট্‌লার নাটক প্রয়োগে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লেকচারার অমর ঘোষের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। শ্রী ঘোষ এই পালাটি পরিচালনারও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ' আয়োজিত রবীন্দ্রকাননের যাত্রা উৎসবে

আলোক নিয়ন্ত্রণে যাত্রায় প্রথম যান্ত্রিকতার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। আলোক নিয়ন্ত্রণ করেন তাপস সেন। এই উৎসব অনুষ্ঠানে অভিনয়ে মাইক্রোফোন-ও ব্যবহার করা হয়। হিটলার নাটকের ১৫০ তম অভিনয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর রমা চৌধুরীর সভাপতিত্বে তরুণ অপেরা একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে নাট্যকার, পরিচালক ও শিল্পীদের প্রীতিমূলক পরিতোষিক বিতরণ করা হয়। পারিতোষিক বিতরণ করেন প্রবীন নাট্যকার মন্মথ রায়। এই জাতীয় পারিতোষিক বিতরণের মধ্য দিয়া তরুণ অপেরার অধিকারী বীরেন্দ্রনাথ পাল ১৩৭৫ সালে যাত্রায় একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

নাট্যভারতী থিয়েট্রিকাল যাত্রাপার্টি

সংস্থার স্বত্বাধিকারী পি. দাশগুপ্ত। ইহার কার্যালয় ১০৭, শোভাবাজার ষ্ট্রীটে (কলিকাতা-৫) অবস্থিত। জগন্নাথ কোলে (ভূতপূর্ব মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ) ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ব্রজেন্দ্রকুমারের 'উপেক্ষিতা', 'হে অতীত কথা কও', কানাই নাথের 'মা ও ছেলে' সত্যপ্রকাশ দত্তের 'আনারকলি', বিজয়কুমার ঘোষের 'রাজকুমার' নরেশ চক্রবর্তীর 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' শান্তিরঞ্জন দে-র 'রামী চণ্ডীদাস' প্রভৃতি লোকনাট্য এই সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজিত হইতেছে।

জনতা অপেরা

১১৭, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত। লালমোহন দাস (উত্তর কলিকাতা) ইহার অধিকারী। ইহার ব্যবস্থাপক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। এই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমারের 'দোষী-কে', 'মাটিরকান্না' আনন্দময়ের 'যুগের দাবী', 'ফাঁসির মঞ্চে' কানাই নাথের 'সৈনিক ধর হাতিয়ার', সত্যপ্রকাশ দত্তের 'তামসী', 'অঙ্গার', প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'অশান্ত ঘূর্ণি' প্রভৃতি পালা পরিবেশিত হইতেছে।

অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

১১৭।১, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) সংস্থার কার্যালয় অবস্থিত। অমিয় বসু, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল লাহিড়ী এবং কালিয়দমন গুহঠাকুরতা তাহাদের নামের আদ্যক্ষর লইয়া সংস্থার নামকরণ করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ইহার স্বত্বাধিকারী অমিয় বসু (কলিকাতা) ও কার্তিক

চন্দ্র দে (খিদিরপুর, কলিকাতা)। এই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ঝান্সির রানী,' 'রামী চণ্ডীদাস', গৌরচন্দ্র ভড়ের 'গরীবের মেয়ে', নন্দগোপালের 'সাঁঝের প্রদীপ', অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষের ধোঁয়া' সৌরীন্দ্র মোহনের 'সম্রাট আলাউদ্দিন', দেবেন নাথের 'মৃত্যুর চোখে জল, কানাই নাথের 'চণ্ডীতলার মন্দির', প্রভৃতি লোকনাট্য পরিবেশিত হইতেছে।

ভারতী অপেরা

হুগলী জিলার আরামবাগ-ভাদুড় নিবাসী উমাশঙ্কর ঘোষ ইহার মালিক। ১১৩, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) সংস্থার কার্যালয়। এই সম্পদায়ের অধিনায়ক কালীপদ দোষ। সংস্থা কর্তৃক ব্রজেন্দ্র কুমারের 'ভৈরবের ডাক', 'মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন', কানাইলাল নাথের 'রক্ত দিয়ে লেখা', আনন্দময়ের 'বিসর্জন' নন্দগোপালের 'অশ্রুবাদল' ও 'সতীবেহুলা', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘা যতীন' প্রভৃতি পালা অভিনীত হইতেছে।

মাধবী নাট্য কোম্পানী

৩৩৫বি, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত। ইহার স্বত্বাধিকারী বেলা ঘোষ। এই সংস্থা কর্তৃক 'রিক্সাওয়ালা', প্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'রক্ত দিয়ে কিনলাম', কানাই নাথের 'আগুন নিয়ে খেলা' প্রভৃতি নাটক পরিবেশিত হয়।

শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী

এই সংসদের কার্যালয় ১১৭।১ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬। ইহার স্বত্বাধিকারী অমিয় বসু। এই সংস্থা পরিবেশিত নাটকগুলির নাম—'প্রবোধ সরকারের 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ', নির্মল মুখার্জির 'পথের ছেলে', জিতেন বসাকের 'ফরিয়াদ' প্রভৃতি।

নিউ আর্য অপেরা

১১৯, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) ইহার কার্যালয় অবস্থিত। এই সংস্থার স্বত্বাধিকারী গোপাল চট্টোপাধ্যায়। সংস্থা কর্তৃক সত্যপ্রকাশ দত্তের 'বিষপাথর', ব্রজেন্দ্রকুমারের 'বাঙালী', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র,' উৎপল দত্তের 'রাইফেল', শান্তিরঞ্জন দের 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' প্রভৃতি পালা পরিবেশিত হইতেছে।

নিউ প্রভাস অপেরা

এই সংস্থার মালিক দীনবন্ধু গুছাইত এবং পৃষ্ঠপোষক তিনকড়ি গুছাইত। সংস্থার কার্যালয় ৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬। ইহার পরিচালক রমেন বসুমল্লিক। এই দলে দেবেন নাথের 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম' প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'নাগরদোলা', নন্দগোপাল রায় চৌধুরীর 'পাগল ঠাকুর,' ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জ্বলন্ত বারুদ', রমেন লাহিড়ীর 'রাহুমুক্ত রাশিয়া', হারু রায়ের 'বাঁচতে চাই' প্রভৃতি পালা পরিবেশিত হইতেছে। 'পাগল ঠাকুর' নাটকের শততম অভিনয় রজনীতে নিউপ্রভাস অপেরা ১৩৭৫ সালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বর্তমান গ্রন্থকারের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে সংস্থার প্রত্যেক শিল্পী ও সহযোগীকে মানপত্র ও প্রীতিউপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী (সূত্রধাব— আনন্দলোক)। শিল্পী ও কর্মীদের স্বীকৃতিদানের উদ্দেশ্যে যাত্রায় ইহা দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন দীনবন্ধু গুছাইত ও তিনকড়ি গুছাইত। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনদপ্তর আয়োজিত প্রথম কলিকাতা মেলায় (১৯৬৯) এই সংস্থার 'পাগলঠাকুর' পালা অভিনীত হয়।

বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ

মাখনলাল নট্ট এই সংস্থার স্বত্বাধিকারী। ১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৭৬ সালে। আশুতোষ সাহা, বি. এল. এই সংস্থার পরিচালক ছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমার দের 'পতি ঘাতিনী সতী' (১৯৬৯), 'করুণা সিন্ধু বিদ্যাসাগর', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি পালা সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

শ্রীমা নাট্য কোম্পানী

ইহার স্বত্বাধিকারী নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়। ৩৩৩এ, রবীন্দ্রসরণীতে (কলিকাতা-৬) এই সংস্থার কার্যালয় অবস্থিত। ইহার পরিচালক কালীপদ বিশ্বাস। দেবেন্দ্র নাথের 'বাপ্পাদিত্য', শান্তিরঞ্জন দের 'রাক্ষসীপদ্মা', মহেন্দ্র গুপ্তের 'রক্তস্নাত দিল্লী' প্রভৃতি পালা সংস্থাকর্তৃক পরিবেশিত হয়।

মীনা ভ্যারাইটিজ অপেরা

ইহার স্বত্বাধিকারী নন্দদুলাল দে। সংস্থার কার্যালয় ৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৬। ইহা বাংলা ও হিন্দী যাত্রা পরিবেশন করে। সত্যপ্রকাশের

'আমি কে', কমলেশ ব্যানার্জির 'সমাজ', 'সোনে কি জঞ্জির' (হিন্দী) ও 'পৃথ্বীরাজ চৌহান' (হিন্দী) প্রভৃতি নাটক সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হইতেছে।

লোকনাট্য

ইহার স্বত্বাধিকারী নীলমণি দে। ৩৩৩বি, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) ইহার কার্যালয় অবস্থিত। এই দলে উৎপলদত্তের 'জয় বাংলা' ও 'সন্ন্যাসীর তরবারি', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি পালা অভিনীত হইতেছে।

শিল্পীতীর্থ

ইহার স্বত্বাধিকারী বৈদ্যনাথ শীল। ৩৩৩বি, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) ইহার কার্যালয়। তারাশংকরের 'কবি'র যাত্রারূপ (নির্মল মুখার্জি), 'মমতাময়ী মা' প্রভৃতি পালা সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হইতেছে।

সুশীল নাট্যকোম্পানী

পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়ও সিদ্ধিনাথ বন্দোপাধ্যায় ইহার মালিক। সংস্থার কার্যালয় ১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬। এই দলে 'সরলা', 'গোপাল ভাঁড়', 'অভিশপ্ত মসনদ' প্রভৃতি পালা অভিনীত হইতেছে।

স্বপন অপেরা

সংস্থার স্বত্বাধিকারী স্বপনকুমার ব্যানার্জি। ২৯২।৫, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৫) ইহার কার্যালয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা কর্তৃক তারাশংকরের 'সপ্তপদী'র যাত্রারূপ (বীরু মুখোপাধ্যায়) পরিবেশিত হইতেছে ও গৌর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) প্রস্তুত করা হইতেছে।

অন্যান্য পেশাদার সংস্থা

উল্লিখিত সংস্থা ছাড়াও কলিকাতার আরো কতগুলি পেশাদার সম্প্রদায় কর্তৃক যাত্রানাট্য পরিবেশিত হয়। ইহাদের মধ্যে ঘোষ কোম্পানী যাত্রাপার্টি (১২২, লক্ষ্মীনারায়ণ রোড, কলিকাতা-২৮), ক্যালকাটা অপেরা (৩৩১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), অশোক ভট্টাচার্যের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাট্য কোম্পনী (২২।এইচা১, রাজা মনীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭), রত্না চট্টোপাধ্যায়ের ক্যালকাটা নাট্যবীথি অপেরা (৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), অলকেশ চক্রবর্তী ও সতীশ চক্রবর্তীর চিত্তরঞ্জন অপেরা (৭০।২।এ, মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬), মাধব চন্দ্র মালাকার ও সুরেশ রঞ্জন সরকারের রূপশ্রী নাট্যকোম্পানী (৩১১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), প্রদীপকুমার পালের

ক্যালকাটা মিলন বীথি অপেরা (১১৭।১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), শংকরী ভাণ্ডারীর কালিকানাট্য কোম্পানী (১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), বিবেকরঞ্জন চক্রবর্তীর ধৃতিশ্রী নাট্যশিল্পম্ (বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা), অনিক কুমার বসুর নবযুগ অপেরা (বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা), অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভারতীয় রূপনাট্যম্ (রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), ভূতনাথ মজুমদারের শতরূপা (৩৫৬।১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), রবীন্দ্র দাসের নিউ ক্যালকাটা অপেরা (রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), প্রবোধ কুমার হালদারের দি ভাণ্ডারী অপেরা (রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), পটলচন্দ্র ঘোষ দিগরের কুণ্ডুনাট্য কোম্পানী (৩৩১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫), বিপিন বিহারী ঘোড়ই-র শ্রীদুর্গা অপেরা (৫২।১ পি. সি. ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-৫৭), কনকলতা নায়েকের কনক অপেরা (৩৩৩।এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), সুব্রত রাহার পরিচালনায় শ্রীশঙ্কর নাট্যম (১১, পাইকপাড়া রো, কলিকাতা-৩৭), শিখা দাসের কমলা অপেরা (১৭১।১, রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা-৬), ডি. এন. মাইতি ও কে. এল. মণ্ডলের আরাধনা নাট্য কোম্পানী (৩৫৬।২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), প্রফুল্ল কুমার সরকারের অগ্রদূত নাট্যসংসদ (১০৭, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা), সন্ন্যাসী মাহাতো ও অমূল্য সরকারের অন্নপূর্ণা অপেরা (৩৩৩।বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), কানাইলাল মাজীর নিউ নীতলা নাট্য কোম্পানী (১৬৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭,) শম্ভুনাথ সিংহের ভোলানাথ অপেরা (১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(গ) কলিকাতার সৌখিন যাত্রাসম্প্রদায়

বর্তমানে কলিকাতায় সৌখিন যাত্রা সম্প্রদায়ও রহিয়াছে। এই সকল সংস্থার মধ্যে 'রামকৃষ্ণ নাট্যবীথি' (প্রামাণিকঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬), 'সান্ধ্য নাট্য সংঘ' (নিমতলা, কলিকাতা-৬), 'অনামী শিল্পী চক্র' (দমদম, কলিকাতা-২৮) 'জয়কালী সৌখিন নাট্য সমাজ' (ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১), 'সুর ও বাণী' (দমদম, কলিকাতা-২৮), 'বিজয়া নাট্য সমাজ' (মানিকতলা, কলিকাতা-৬), 'চেনা-অচেনা' (শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪), 'ক্যালকাটা ইনষ্টিটিউট' (বড়বাজার, কলিকাতা), 'নান্দনিক' (বেলগাছিয়া, কলিকাতা -৩৭), 'তারানাট্যম্' (বড়বাজার, কলিকাতা-৭), 'রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম

সমিতি' (কলিকাতা-৩), 'নারিকেল ডাঙ্গা সংঘ' (কলিকাতা-১১) 'বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ' কর্তৃক আয়োজিত (১৯৬৪) যাত্রা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। উল্লিখিত সম্প্রদায়সমূহ ছাড়াও সৌখিন সংস্থা রূপে 'শ্রীমা সারদামণি মহিলা বিদ্যাপীঠ' (শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী, বেহালা, কলিকাতা—৩৪), 'সর্বমঙ্গলা যাত্রাপার্টি' (সর্বমঙ্গলা পল্লী, কলিকাতা-৩৪), 'সিঁথি পল্লী উন্নয়ন সমিতি' (বরানগর, কলিকাতা—৫০), 'নপাড়া মিত্র সংঘ' (বরানগর, কলিকাতা-৫০). 'অগ্রণী পল্লীমঙ্গল সমিতি' (দমদম-খানপাড়া, কলিকাতা-২৮) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

এই সংস্থা পাঁচটি সরকারের নিকট হইতে ১৯৬৪—১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক কালীন বার্ষিক আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়াছে।

(ঘ) লোকনাট্য-শিল্পী প্রসঙ্গ

লোকনাট্য শিল্পীদের কথা বলিতে গেলে বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কারণ নানা শ্রেণীর শিল্পীর সাধনা-সমন্বয়ে যৌথশিল্প নাটকের সার্থক অভিনয় সম্পন্ন হয়। সুতরাং ইহাতে কাহারও দান অস্বীকার করিবার মত নহে। বিংশ শতকের বিশিষ্ট গুণী শিল্পীদের (অভিনেতা, পালা সম্পাদক, গায়ক, বাদক, সুরকার) পরিচয় নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

(১) বিশিষ্ট অভিনেতা

সস্তা কৌশল অবলম্বন করিয়া করতলবাদন ও 'কেয়াবাত্-বহুত-আচ্ছা' লাভের উদ্দেশ্য বর্জন পূর্বক বিংশ শতকের লোকনাট্যাভিনয়ে যাহারা চরিত্র-রচনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ছয়জন শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। এই শিল্পীদের মধ্যে—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও ফণিভূষণ মাতিলালের কথা প্রথমে উল্লিখিত হইল।

সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪—১৯৩৬)

ফরিদপুর জিলার লোনসিংহ গ্রামের অধিবাসী সুরেশচন্দ্র আই. এ. পাঠরত অবস্থায় মোক্তারী পাশ করেন। কিন্তু কোর্টে কাজ না করিয়া তিনি উপসী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে (ফরিদপুর) সহকারী শিক্ষকের কর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি সৌখিন থিয়েটারে অভিনয় করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে বিদ্যালয়ের কার্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি 'ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ ষ্টীম্ নেভিগেশন্'-এর চাকুরী লইয়া রেঙ্গুন চলিয়া যান। জাহাজ কোম্পানীর

এই চাকুরী ছাড়িয়া সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় 'রাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্টেটে' কাজ করিতে আরম্ভ করেন। ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল ছিল বলিয়া সুরেশচন্দ্র কোথাও দীর্ঘকাল চাকুরী করিতে পারেন নাই। ইহা যেমন সত্য তেমনি শিল্পি-জীবনের প্রতিও যে তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল তাহাও তেমনি সত্য। কাজেই এই চাকুরীও তিনি ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পরে 'ক্রাউন্‌থিয়েটারের' ডাইরেক্টর্ ও প্রধান অভিনেতা হইয়া তিনি ঢাকায় চলিয়া গেলেন। থিয়েটারে তাহার খুব সুনাম হয়। ইহার পরে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্র স্থায়ীভাবে পেশাদারী যাত্রায় যোগদান করেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়লক্ষ্মীপালার' 'বলাদিত্য' পেশাদারী যাত্রায় তাহার প্রথম অভিনীত ভূমিকা। 'নবদ্বীপ সাহার দলে' এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত অভিনয়-নৈপুণ্য ও অভিনয় শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্যের জন্য যাত্রাজগতে তিনি 'সুরেশ মাষ্টার' নামে খ্যাতি লাভ করেন। মতিলাল রায় ও মুকুন্দদাস যাত্রার বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। এই দুই বক্তার পরে সুরেশচন্দ্র ছাড়া বিশ শতকের যাত্রা-শিল্পীদের কাহারো মধ্যে এই গুণের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কেবল বাংলা নয়, ইংরেজি ভাষারও তিনি বক্তৃতা করিতে পারিতেন। অনেক লোকনাট্যের আসরে সুরেশচন্দ্র তাহার বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছেন। 'নবদ্বীপ সাহার দল', 'ঘোষালের দল', 'পাষাণময়ী অপেরা', 'নট্টকোম্পানী যাত্রা পার্টি', 'সত্যম্বর অপেরা', 'ভোলানাথ অপেরা' প্রভৃতি সংস্থায় শিক্ষকতা ও প্রধান প্রধান চরিত্রাভিনয় করিবার পরে 'জাতীয় আনন্দ প্রতিষ্ঠান' নামে তিনি একটি যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ময়মনসিংহে গাওনা করিবার সময় তৎকালীন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট আপত্তি করায় তিনি 'জাতীয়' শব্দটি বর্জন করিতে বাধ্য হইলেন। তাই 'আনন্দপ্রতিষ্ঠান' নামে সংস্থাটি লোকনাট্য পরিবেশন করিতে থাকে। এই দলের পরিচালক ছিলেন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় (ফরিদপুর)। 'বিন্ধ্যাবলির' অনুহ্রাদ, 'লক্ষ বলির' বিরথ, 'আদিশূরের' আদিশূর, 'দাক্ষিণাত্যের' মহম্মদ তোঘলক, 'তর্পণ'-এর কর্ণ, 'বঙ্গে বর্গীর' ভাস্কর, 'রাখি বন্ধনের' ছগনলাল, 'ধ্রুব'-এর গৌতমব্যাধ, 'নরকাসুরের' বিশ্বকর্মা, 'ধনুর্যজ্ঞের' কংস, 'সপ্তমাবতারের' রাবণ প্রভৃতি নানাপ্রকার চরিত্রের সার্থক রূপদান করিয়া সুরেশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কার্বাঙ্কেল্-এ আক্রান্ত হওয়ায় ঢাকা মিড্‌ফোর্ট্ হাসপাতালে সুদর্শন-সুকণ্ঠ নটের জীবনাবসান ঘটে।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৩০০—১৩৭৫)

হাওড়া জিলার সাঁতরাগাছি নিবাসী ফণিভূষণ নট ও নাট্যকার। নাট্যালোচনা প্রসঙ্গে তাহার কথা কিছু বলা হইয়াছে। অভিনয়ে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। তিনি সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু ইহাকে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি কেবল অভিনেতা নহেন, সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষকতা করাও তাহার অন্যতম কার্য ছিল। যাত্রাজগতে তিনি 'বড়ফণি' নামে খ্যাত। ফণিভূষণের পিতা রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-শিষ্য ছিলেন। তিনি সৌখিন অভিনয় করিতেন। তাহার নিকটেই ফণিভূষণ অভিনয় শিক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে ফণিভূষণের একটি উক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে,—[১]"আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় ৺গিরিশবাবুর শিষ্য—তখন নাট্যকলার বিশেষরূপ আলোচনা করেন এবং বহু বহু অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। আমি তাহা দেখিতাম, শিখিয়া আনন্দলাভ করিতাম'। হাওড়া একটি থিয়েটার পার্টিতে 'রাণী-দুর্গাবতী' নাটকে জগন্নাথ-এর ভূমিকার তাহার প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হয়। ইহার পরে সৌখিন যাত্রায় 'মরুত্ত যজ্ঞ' পালার নারায়ণ, 'ধ্রুবের' উত্তানপাদ, 'হরিশ্চন্দ্রের' হরিশ্চন্দ্র এবং এবং 'বাসবদমন' পালার বিজয়কেতন চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। কিছুকাল সৌখিন অভিনয় করিয়া ১৩৩০ সালে ফণিভূষণ পেশাদারী যাত্রায় যোগদান করেন। তাহার জ্যেষ্ঠতাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রামকৃষ্ণ নাট্যসমিতি' নামে একটি দল ছিল। এই দলেই তাহার পেশাদারী যাত্রাভিনয়ের সূত্রপাত হয় স্বরচিত 'ভাগ্যদেবী' (ক্ষণা) পালায় 'বরাহপণ্ডিতের' ভূমিকায়। ইহার কিছুকাল পরে প্রধান অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক রূপে তিনি 'ভাণ্ডারী অপেরায়' যোগ দেন। এই সময় হইতেই দেশে তাহার খ্যাতি ছড়াইতে আরম্ভ করে। 'ভাণ্ডারী অপেরা', আর্যঅপেরা', 'নট্টকোম্পানী যাত্রা পার্টি', 'রঞ্জন অপেরা', 'গণেশ অপেরা', 'তরুণ অপেরা', 'নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি', 'সত্যম্বর অপেরা' প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রধান অভিনেতা ও নাট্য শিক্ষকরূপে তিনি কাজ করেন। 'বাসুদেব' পালার শ্রীকৃষ্ণ, 'রামানুজের' লক্ষ্মণ, 'চন্দ্রহাসের' দধিমুখ রাজা, 'সৈরিন্ধ্রীর' বৃহন্নলা, 'চন্দ্রধরের' চন্দ্রধর, 'বাঙ্গালীর' দায়ুদ খাঁ, 'বিচারকের'

১। ক্ষত্রিয়গৌরব, ভূমিকা—ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১৩৩২, ১১ই আশ্বিন

বিক্রমাদিত্য, 'বীর অভিমন্যুর' শকুনি প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি প্রভূত কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন।

'মনোমোহন থিয়েটারে' 'কণ্ঠহার', 'জাহাঙ্গীর', 'সমুদ্রগুপ্ত' নাটকে এবং 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'পরপারে' নাটকে তিনি অভিনয় করিয়াছেন। 'জয়দেব', 'বিদুষীভার্যা', 'সমাপিকা', 'বৈকুণ্ঠের উইল' ছায়াচিত্রে অভিনয়ে ফণিভূষণ অংশগ্রহণ করিয়াছেন। 'হাওড়া জিলা কংগ্রেস' (১৯৫৮) এবং 'বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ' কর্তৃক অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য তাঁহাকে মানপত্র (১৯৬২) প্রদান করা হয়। ১৯৬৮ খ্রীঃ ফণিভূষণকে সংগীতনাটক আকাদামি হইতে যাত্রাশিল্পী রূপে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফণিভূষণ সত্যম্বর অপেরায় নাট্যশিক্ষক রূপে যোগদান করেন। সত্যম্বর অপেরার সৌজন্যে নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টিতে নারিকেল ডাঙ্গা-মোগল বাগানে (কলিকাতা) 'বাঁশের কেল্লা' পালায় অভিনয়রত অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় অল্প পরেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সুদর্শন নটের জীবনাবসান ঘটে (১৩৭৫)।

ফণিভূষণ মতিলাল (১৩১১—১৩৭৮ খ্রীঃ)

বড়িষা মতিলাল পরিবারে (আদি বাসস্থান মজিলপুর—২৪ পরগণা) ফণিভূষণ ১৩১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রারম্ভে পিতৃবিয়োগ হইলে মাতৃভক্ত ফণিভূষণ মাত্র নয় বৎসর বয়সে ১৩২০ সালে 'ভূষণচন্দ্র দাসের দলে' বালকরূপে যোগদান করেন। ইহার পূর্বে তিনি প্রাইমারী স্কুলের বৃত্তিপরীক্ষা পাশ করেন। পরবর্তীকালে ফণিভূষণ বাংলা লেখাপড়া করেন। অনেক পরে প্রৌঢ় বয়সে তিনি কিছু ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। ভূষণ দাসের দলের পরিচালক ও তৎকালীন সুখ্যাত বাদক হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাহাকে অভিনয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই পর্যায়ে উক্ত দলে তাহার প্রথম অভিনয় মতিলাল ঘোষের 'ধ্রুব' পালার 'ধ্রুবচরিত্রে'। কলিকাতা-নিমতলা অঞ্চলে সুকণ্ঠ বালক ফণিভূষণ সঙ্গীতসহ ধ্রুবচরিত্র রূপায়ণে একটি আসরেই তেরখানি রৌপ্যপদকের একখানি মাল্যদ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছেন। বালকচরিত্রাভিনয়ের বয়স উত্তীর্ণ হইলে তিনি স্ত্রী-ভূমিকায় অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রাভিনয় হইতেছে 'নাগদণ্ড কোম্পানীর' 'ঘোরাসুর' পালার 'মহামায়া' এবং 'পাষাণময়ী

অপেরার' 'ক্ষণাদেবী' পালার 'ক্ষণা'। ইহার কিছুকাল পরেই ফণিভূষণ পুরুষ চরিত্রচিত্রণে মনোনিবেশ করেন। অভিনয়ের স্বাভাবিক শক্তি, সুকণ্ঠ এবং আন্তরিক অনুশীলনের ফলে যৌবনকাল হইতেই তিনি সুনাম অর্জন করিতে থাকেন। ফণিভূষণের একাগ্র সাধনাই তাহাকে ক্রমে ক্রমে যাত্রা জগতে অভিনয়ের দিক হইতে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জনে সক্ষম করিয়া দেয়। তাহার অভিনয় রীতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। পূর্বে যাত্রার আসরে দৈত্যরাজ, রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতিচরিত্র প্রাধান্য পাইত; দর্শকদেরও এই চরিত্রাভিনয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু ফণিভূষণ প্রবর্তিত প্রাণ-চাঞ্চল্যময় সজীব অভিনয়ের মধ্য দিয়া প্রথম 'যুবরাজ শ্রেণীর' চরিত্রের প্রতি দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফণিভূষণের অভিনয় সম্পর্কে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বয়োজ্যেষ্ঠ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বড়ফণী) যাত্রায় যোগদান করিবার পরে বয়ঃকনিষ্ঠ ফণিভূষণ মতিলাল 'ছোট ফণী' নামে খ্যাত হইলেন। 'পাষাণময়ী অপেরা', 'নট্টকোম্পানী যাত্রাপার্টি', 'গণেশ অপেরা', 'রঞ্জন অপেরা', 'ভাণ্ডারী অপেরা', 'আর্য অপেরা' 'নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি' প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থায় প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করিয়া 'ছোট ফণী' বিশেষ যশ ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হইয়াছেন।

ফণিভূষণের সার্থক চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে 'জয়লক্ষ্মী' পালার 'গজারুচাষী', 'ক্ষণা'র মিহির, 'শ্রীবৎসের' সুকণ্ঠ, 'রামানুজের' লক্ষ্মণ, 'কৈকেয়ীর' ভরত, 'লীলাবসানের' শাম্ব, 'শাপমুক্তির' শ্রীকৃষ্ণ, 'মহিষাসুরের' রক্তাসুর, 'প্রবীরার্জুনের' প্রবীর, 'দাসীপুত্রের' নন্দ প্রভৃতি বহু চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম', 'রঙ্-বেরঙ্', 'অভিমান' প্রভৃতি ছায়াচিত্রে তিনি অভিনয় করিয়াছেন। 'বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ' কর্তৃক আয়োজিত যাত্রা-উৎসবে (১৯৬২) ফণিভূষণকে শ্রেষ্ঠ যাত্রাভিনেতারূপে মানপত্র প্রদান করা হয়।

যাত্রাভিনয় প্রসঙ্গে বাকি তিনজন শিল্পীর কথা এখন বলা হইতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্য দুইজন হইতেছেন সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং হরলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৭০—১৩৫১ সাল)

সতীশচন্দ্রের নিবাস ছিল বর্ধমান-বাগনাপাড়া। প্রসন্ন নিয়োগীর দল ও

গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনেতা ও নাট্য শিক্ষক রূপে কাজ করিবার পরে তিনি 'রামকৃষ্ণ নাট্যসমিতি' নামে একটি যাত্রা সম্প্রদায় গঠন করেন। [১]"প্রথম বয়সে সতীশচন্দ্র নারী-চরিত্রে অভিনয় করতেন, পরবর্তীকালে পুরুষ চরিত্র রূপায়ণে তিনি মনোনিবেশ করেন।" তাহার অভিনয়রীতি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি যে সকল চরিত্রে রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'দেবযানী' পালার কচ, 'শিবি রাজা'র শিবি' 'শ্মশান'-এর তেজচন্দ্র, 'কল্যাণী'র চন্দ্রকেতু প্রভৃতি। ১৩৫১ সালে সতীশচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১২৯৬—)

সুরেন্দ্রনাথের পিতৃভূমি ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ি মহকুমান্তর্গত নলিয়াগ্রামে। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষারত অবস্থায় কুস্তি শিক্ষা ও সৌখিন থিয়েটার করিবার প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল অধিক। তাহার কুস্তি শিক্ষার সঙ্গী ছিলেন অভিনেতা জীবন গাঙ্গুলী। কুস্তি ও থিয়েটার উভয় ক্ষেত্রেই সুরেন্দ্রনাথ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুব চরিত্র' নাটকে ধ্রুবের চরিত্রে তাহার প্রথম মঞ্চাবতরণ। তিনি রসরাজ অমৃতলাল বসুর নিকট অভিনয় শিক্ষা করেন।

সুরেন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেন। এই বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম ও অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী তাহার সঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধের শেষে বসোরা হইতে ফিরিবার পরে তিনি থিয়েটারী অভিনয়ে মনোনিবেশ করেন। ক্লাসিক থিয়েটার, তাজমহল থিয়েটার, অরোরা থিয়েটার, বেঙ্গলী থিয়েটার, আঁকুবাবুর থিয়েটার প্রভৃতি সংস্থায় তিনি বহু নাটক অভিনয় করেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার 'সীতা' নাটক অভিনয় করিবার সময় জীবন গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথকে সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। কিছুকাল মহলা চলিবার পরে স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ও সুকণ্ঠের অধিকারী সুরেন্দ্রনাথ অধিক বেতন পাওয়ায় বীণাপাণি নাট্য সমাজ সংস্থায় যোগদান করেন। ইহার পরে মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি, ভাণ্ডারী অপেরা, গণেশ অপেরা,

১। রজনীকান্ত মণ্ডল—পালা সম্পাদনা দ্রষ্টব্য।

আর্য অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, নট্টকোম্পানী প্রভৃতি যাত্রা সংস্থায় সুরেন্দ্রনাথ একক্রমে দীর্ঘ বাহান্ন বৎসর যাত্রাভিনয় করেন,—[১]"পনের বছর থিয়েটারে অভিনয় করার পরে একাদিক্রমে ৫২ বছর যাত্রাভিনয় করি।" তাহার অভিনীয় রীতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 'দক্ষিণার' একলব্য, 'তর্পণের' ভীম, 'খনার' বরাহ পণ্ডিত, 'বাসুদেবের' ঘণ্টাকর্ণ, 'প্রহ্লাদ চরিত্রের' হিরণ্যকশিপু, 'সরমার' রাবণ, 'চাষার ছেলের' একমানায়ক, 'স্বামীর ঘরের' চরণ চাকর, 'সমাজের বলির' বংশীধোপা, 'পূজনীয়ার' সাতুয়া চণ্ডাল, 'বাগদত্তা'র তুব্রিল খাঁ, 'মেঘনাদ বধের' মেঘনাদ, 'সীমান্ত অভিযানের' সুলতান মামুদ, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের চরিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছেন।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যা ডক্টর রমাচৌধুরীর সভাপতিত্বে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি extension lecture দেন। এই বক্তৃতা সভায় রবীন্দ্র-ভারতীর নাট্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক, পণ্ডিত, ছাত্রছাত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্য সুধাংশু মোহন বন্দোপাধ্যায়, যাত্রা সংস্থার মালিক ও বহু নাট্য রসিক উপস্থিত ছিলেন। এই সম্পর্কে [২]সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়—

"যাত্রাভিনেতা সম্মানিত—

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যা ডক্টর রমা চৌধুরীর আমন্ত্রণে জোড়া সাঁকোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষা গৃহে গত ১২ই জুলাই অশীতি বর্ষের প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় 'অর্ধ শতকের অভিনয়' সম্পর্কে অতিথি বক্তারূপে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শিল্পীর পক্ষে এ জাতীয় বক্তৃতা প্রদানের সম্মান তিনিই প্রথম অর্জন করলেন। বক্তা যাত্রা গান ও যাত্রাভিনয়ের নানা প্রকার উদাহরণ যোগে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতায় যাত্রার অভিনয় ধারা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনি এই প্রসঙ্গে নাট্যাভিনয়ের ও নানা কথা উত্থাপিত হয়…"

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে যাত্রায় যুদ্ধের একটি বিশেষ স্থান আছে।

১। অর্ধশতকের অভিনয় প্রসঙ্গে, মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৭৭। ২। যুগান্তর, ২১শে জুলাই, ১৯৬৯।

পূর্বে যাত্রার তলোয়ার-যুদ্ধ আকর্ষণীয় হইয়া উঠিত। ইহার জন্য কোন কোন অভিনেতা তলোয়ার-যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ তলোয়ার শেখেন তুরস্ক দেশের মারতুজা সাহেবের কাছে। বীণাপাণি নাট্যসমাজের 'দক্ষিণা' পালায় পঞ্চকোট রাজবাড়িতে সেনাপতি 'শাম্বলিনের' ভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথ 'বাণবিদের' সঙ্গে (সতীশ বসু) তৃতীয় অঙ্কে তলোয়ার যুদ্ধ দেখাইয়া বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই প্রবীন নট ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকাদামী পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার লাভের পরে যাত্রাশিল্পিসংঘ প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থা কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা আকাশবানীর 'শ্রবণী' অনুষ্ঠানে সুরেন্দ্রনাথ যাত্রা সম্পর্কে অভিনয় ও গানের ফলিত উদাহরণ সহ আলোচনা করেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নাট্যসম্মেলনীতে সুরেন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত ভাষণ (প্রধান অতিথিরূপে সংক্ষিপ্ত আকারে আসর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

হরলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১২৯৪—১৩৭২)

হরলাল বরিশাল জিলান্তর্গত কাশীপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে তিনি পটুয়াখালি (বরিশাল) সিভিল কোর্টে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি সৌখিন থিয়েটারে অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জন করিতে থাকেন। এই সুনাম শেষ পর্যন্ত তাহাকে যাত্রা জগতে টানিয়া আনে। তিনি প্রথমে নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টিতে' যোগদান করেন। যাত্রায় তিনি 'টিম্বল' নামে পরিচিত ছিলেন। টিম্বল বিভিন্ন নাট্য সংস্থায় প্রধান প্রধান চরিত্রাভিনয় ও নাট্য শিক্ষকতা করেন। তাহারও অভিনয়রীতি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'আদিশূরের' তক্ষশীল, 'শৈশব সাধনা'র উত্তানপাদ, 'সংস্কার' জয়সেন, 'সপ্তমাবতারের' বিভীষণ, 'পণমুক্তি'র কশ্যপ প্রভৃতি চরিত্র চিত্রণে সংযত অভিনয় দ্বারা রস-সৃষ্টি করিয়া তিনি খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বর্তমানের জনপ্রিয় অভিনেতা

বর্তমানে বিভিন্ন যাত্রা সংস্থায় যাহারা পুরুষ-চরিত্রে নিয়মিত অভিনয় করিয়া জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহাদের

১। আসর পত্রিকা—বৈশাখ, ১৩৭৭

নাম উল্লেখ করা হইতেছে। এই সকল অভিনেতাদের মধ্যে রহিয়াছেন—দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোবর ডাঙ্গা, ২৪ পরগণা—কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার পরে তিনি যাত্রায় আসিয়াছেন), পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (নিমতলা, কলিকাতা), সুজিৎ কুমার পাঠক (তসরালা, ২৪ পরগণা), স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পান্নালাল চক্রবর্ত্তী (আঁটপুর, হুগলী), দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় (চকবাজার, হুগলী), গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা), ভোলানাথ পাল (বেনেটোলা, কলিকাতা), অমিয় ভূষণ বসু, (নাগের বাজার, কলিকাতা), ২৪ পরগণা-আরবেলিয়া নিবাসী সনৎ কুমার বসু (মেণ্টু বসু), হুগলী-তারকেশ্বর নিবাসী ভোলা পাল (ছোট ভোলা), বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় (বাগবাজার, কলিকাতা), বর্তমানে কলিকাতাবাসী অরুণ কুমার দাসগুপ্ত (তাহার পূর্ব নিবাস ছিল যশোহর—কালিয়া), শান্তিগোপাল পাল (বাগ-বাজার), অধুনা কলিকাতাবাসী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় (তপন কুমার—তাহার পূর্বনিবাস ছিল বরিশাল), কলিকাতাবাসী ননীগোপাল ভট্টাচার্য (ননীভট্ট), বিমলেন্দু লাহিড়ী (হালিসহর, ২৪ পরগণা), মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), দ্বিজু ভাওয়াল (কলিকাতা), ফণী গাঙ্গুলী, গুরুদাস মিত্র, শেখর গাঙ্গুলী, দ্বিপেন চ্যাটার্জি, (চেতলা, কলিকাতা), মোহিত কুমার বিশ্বাস (কলিকাতা), শিবদাস মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), মোহন চট্টোপাধ্যায় (২৪ পরগণা), অমর ভট্টাচার্য, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (২৪ পরগণা), অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি ভট্টাচার্য (কলিকাতা) প্রমুখ শিল্পিগণ।

হাস্যরসাভিনেতা

লোকনাট্যে হাস্যরস পরিবেশন একান্ত আবশ্যক। ইহার জন্য নাট্যকারকে চরিত্র সৃষ্টি করিতেই হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই হাস্যরস অতিমাত্রায় স্থূল ভাঁড়ামি পর্যায়ের। রুচিশীল অভিনেতারা এই স্থূলত্বের মাত্রা কমাইয়া রসপরিবেশনের চেষ্টা করেন। যাত্রায় এই শ্রেণীর শিল্পীর স্বল্পতা রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে হাস্যরস পরিবেশনের দিক হইতে বিভূতি ভূষণ ঘোষের এক সময় খ্যাতি ছিল। তিনি 'মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টিতে' অভিনয় করিতেন। ইহার পরেই নাম করিতে হয় বর্ধমনে-নাদান ঘাটের অধিবাসী উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের (হাঁদুবাবু)। 'ভাণ্ডারী

অপেরা', 'আর্য অপেরা' প্রভৃতি সংস্থায় অভিনয় করিয়া তিনি যশের অধিকারী হইয়াছিলেন।

হাস্যরসের চরিত্রে অভিনয় করিয়া সূর্য কুমার দত্ত (১২৯৪ —) বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেন। পূর্বে নানা প্রসঙ্গে তাহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব নিবাস ছিল বরিশাল জিলার পাঁজি-পুথিপাড়া গ্রামে। বর্তমানে তিনি ২৪ পরগণা-কয়াভাঙ্গার অধিবাসী। ১৩০৪ সালে দশ বৎসর বয়সে সূর্যকুমার যাত্রারদলে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি সমবেত নাচ-গানে অংশ গ্রহণ করিতেন। পরে বালক চরিত্রে অভিনয় করিতে থাকেন। ইহার পরে বয়সনিবন্ধন কণ্ঠ ধরিয়া যাওয়ায় তিনি পুরুষ চরিত্রাভিনয়ে মনোনিবেশ করেন। 'নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টি' গঠিত হইবার পরে ১৩২১ সালে তিনি ঐ দলে যোগদান করিয়া হাস্য- রসাভিনেতারূপে কাজ করিতে থাকেন। নাচ-গান জানিতেন বলিয়া সংস্থার নৃত্য ও সুর শিক্ষার দায়িত্বও তিনি বহন করিতেন। লোক-নাট্যের জন্য তিনি কিছু কিছু গানও রচনা করিয়া বিভিন্ন পালায় যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পালা-সম্পাদনার সময় তিনি এই কাজ করিতেন।

হাস্যরসাভিনয়ে মাত্রাতিরিক্ত স্থূলতাও ভাড়ামির পক্ষপাতী নহেন বলিয়া হুগলী জিলার কলাছড়া গ্রাম নিবাসী শিবচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম (১৯১৬—) এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইতে পারে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে শ্রীভট্টাচার্য অভিনয় করিতে শুরু করেন। 'মিনার্ভা,' 'নাট্যনিকেতন' ও 'রঙমহল' থিয়েটারে কয়েক বৎসর অভিনয় করিবার পরে তিনি যাত্রায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি যাত্রার অগ্রগতি-প্রয়াসী। ইহার জন্য তিনি এই গ্রন্থকারের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় এই প্রথম যাত্রাশিল্পীদের লইয়া 'যাত্রা শিল্পিসংঘ' (১৯৬৬) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংঘটি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ধারা (প. বঙ্গ) আইন অনুযায়ী সমিতিবদ্ধ। ১১৩, রবীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) ইহার কার্যালয়। সংঘের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে,-

"নানাদিক হইতে লোকনাট্যাভিনয়ের ও লোকনাট্য রচনার উন্নতি, লোকনাট্য সম্পর্কে আলোচনা সভা, শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণ, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা, লোকনাট্য-লাইব্রেরী স্থাপন, লোকনাট্যাভিনয় ও সংগীত শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন, লোকনাট্য-প্রয়োগের জন্য আসর-মঞ্চ প্রতিষ্ঠা, দুঃস্থ যাত্রাশিল্পীদের সাহায্য কল্পে অভিনয়াদির আয়োজন, সংঘের মুখ-পত্র রূপে পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি

যাত্রাশিল্পি-সংঘের মুখ্য উদ্দেশ্য" (সংঘের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য)। হাস্যরসের নিয়মিত অভিনেতাদের মধ্যে মাখনলাল সমাদ্দার (১৯০৪—, পূর্বনিবাস ফরিদপুর, অধুনা কলিকাতাবাসী) খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। এই বিষয়ে রাধারমণ পালেরও (হুগলী-চুঁচুড়া) খ্যাতি রহিয়াছে। শ্রীপাল পূর্বে কলিকাতার বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয় করিতেন।

নারীচরিত্রাভিনেতা

পূর্বে কখনো কখনো মহিলা কর্তৃক স্ত্রী-ভূমিকা অভিনীত হইলেও লোকনাট্যে নারী-চরিত্রে পুরুষদের অংশ গ্রহণ করাই সাধারণ রীতি; পূর্বেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর অভিনয়ের জন্য পুরুষ অভিনেতা বাছাই করিবার সময় কণ্ঠস্বর, দৈহিক গঠন, কমনীয়তা এবং বেশবিন্যাসের পরে চলনে-বলনে নারী জনোচিত ভাবভঙ্গির শিল্পোচিত অনুকরণ-ক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হয়। এই দিক হইতে লোকনাট্যাভিনয়ে বিংশ শতকের শিল্পীদের মধ্যে বিনোদ রানীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। হুগলী জিলার অধিবাসী বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করিয়া নিজের পদবীটি হারাইয়া 'রানী' উপাধির অধিকারী হইয়াছিলেন। 'মথুরনাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি', 'ভাণ্ডারী অপেরা' প্রভৃতি সংস্থায় তিনি অভিনয় করিয়াছেন। পূর্বে যাত্রায় রানী ছাড়া কাহিনী ছিল না; তাই পালায় রানী চরিত্রের প্রাধান্য ছিল এবং যাহারা এই চরিত্রের সার্থক রূপদান করিতেন পরিচিতিতে তাহাদের নামের সঙ্গে 'রানী' শব্দটি যুক্ত করা হইত। পরবর্তী-কালে রাজকুমারী বা যুবতী প্রেমিকা চরিত্রের প্রাধান্য বাড়িবার পরেও পূর্বরীতি অনুসারে এই সব ভূমিকাভিনেতাদের নামের সঙ্গে 'রানী' শব্দ যুক্ত হইতে থাকে। বিনোদরানীর পরে বিভিন্ন যাত্রা সংস্থায় অভিনয়কারী নিতাইরানী (হাওড়া-মাকড়দা নিবাসী নিতাই পদ গঙ্গোপাধ্যায়) প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। নারী চরিত্রাভিনয় প্রসঙ্গে রাখালরানীর (রাখালচন্দ্র দাস—বাইশারি, বরিশাল) নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ, নারীজনোচিত বেশবিন্যাস এবং অভিনয় সৌষ্ঠবে সহজেই তিনি রস-সৃষ্টি করিতে পারিতেন। পুরুষ-চরিত্রাভিনেতাদের মত নারী-চরিত্রাভি-নেতাদের পক্ষে সাধারণত দীর্ঘকাল স্ত্রীসুলভ সুষ্ঠু অভিনয় পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। ইহার প্রধান কারণ বয়সোচিত দৈহিক অন্তরায়। শ্রীদাস

এই সত্য বুঝিতে পারিয়া সুনাম রক্ষা পূর্বক বয়োবৃদ্ধির জন্য যথা সময়ে অভিনয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্তমানকালে বিভিন্ন সংস্থার পালাভিনয়ে নারী চরিত্র রূপায়ণকারীদের মধ্যে সুনাম অর্জন করিয়াছেন ছবিরানী (শ্যামাপদ রায়)। তাহার পূর্ব নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে, অধুনা তিনি হাওড়া-বেলুড়ের অধিবাসী হইয়াছেন। নারী-চরিত্রে বাবলিরানী (প্রকৃতি ভট্টাচার্য—সিঁথি, কলিকাতা), চপল রানী (চপলকুমার ভাদুড়ী—কলিকাতা), পুতুলরানী (শম্ভু নায়েক—কলাইকুণ্ডা, মেদিনীপুর), শতদলরানী (সুনীলচন্দ্র রায়—হাওড়া বাগনান) এবং হরিগোপালরানীর (হরি গোপাল দাস—পূর্বনিবাস বরিশাল, বর্তমান নিবাস বনমালীপুর—বারাসত, ২৪ পরগণা) জনপ্রিয়তা ছিল। লোকনাট্যাভিনয়ে এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে স্ত্রী-চরিত্রে মহিলাদের যোগদান করিবার সাধারণ রীতি প্রচলিত হইয়াছে। উল্লিখিত রানীরাও কোন কোন দলে এখনো অভিনয় করিয়া স্ত্রী-ভূমিকায় রসসৃষ্টি করিতেছেন।

(২) পালা সম্পাদক

নূতন পালা অভিনয়ের পূর্বে যে রূপ লইয়া অধিকারীর হাতে আসে অপরিবর্তিত ভাবে সেই রূপটি আসরে উপস্থাপিত হয় না। মহলার সময় নানা দিক হইতে চিন্তা করিয়া ইহার কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কেবল যাত্রা নহে, সকল প্রকার নাট্যাভিনয়ে এই রীতি অনুসৃত হয়। 'নট্ট কোম্পানীর' পালা-সম্পাদনার দায়িত্ব সূর্যকুমার দীর্ঘকাল বহন করিয়া আসিতেছেন। যাত্রা পালা সম্পাদনা প্রসঙ্গে রজনীকান্ত মণ্ডলের (১৩০০-১৩৭৮) নাম উল্লেখ করিতে হয়। রজনীবাবু বর্দ্ধমান জিলার গলসী থানার অন্তর্গত কালনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ম্যাকমিলন কোম্পানীর জুনিয়র ক্লার্কের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৩২৩ সালে যাত্রা দলে যোগ দেন। ১৩২৬ সালে তিনি 'গণেশ অপেরার' ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি নাট্য সম্পাদনায় মনোযোগী হইয়া উঠেন। ক্রমে তিনি বহু যাত্রা পালা সম্পাদনা করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাহার কলমে বহু নূতন পালা সম্পাদিত হইয়া সফলতার সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে। ১৩৫১ সালে তিনি দল হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহার পরেও তিনি যাত্রা নাট্যকারদরে বহুপালা সম্পাদনা করিয়াছেন।

(৩) যাত্রা-গায়ক

বিনোদ ধাড়া

বর্তমানে লোকনাট্যে যেমন অভিনয় প্রাধান্য পাইতেছে পূর্বে তেমনি ইহাতে গান প্রাধান্য পাইত। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কীর্তনাঙ্গও ভক্তি-মূলক গান এবং মুকুন্দদাসের উদ্দীপনাময় স্বদেশী গীতি লোকনাট্যের আসরে পরিবেশিত হইয়া জনচিত্তে সাড়া জাগাইয়াছে। তাঁহাদের কোন কোন গান লোকের মুখে মুখে গীত হইয়াছে। তথাপি এই দুই বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পীর প্রতি মর্যাদা বজায় রাখিয়াও একথা বলা যায় যে, যে কোন রীতির গীতি পরিবেশনের দিক হইতে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ যাত্রাগায়ক ছিলেন বিনোদ-বিহারী ধাড়া (বিনোদ ওস্তাদ)। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর জিলার বগড়ী কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ওস্তাদ দৌলতরামের পদ্ধতিতে ধ্রুপদ ও টপ্পা শিখিয়া নৈপুণ্য অর্জন করেন। ইহার পর তিনি ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর নিকট রাগ সংগীত শিক্ষা করেন। কীর্তনাঙ্গ গানেও বিনোদ বিহারীর পটুত্ব ছিল। যাত্রার আসরে তাহার মত ওস্তাদ গায়ক বিংশ শতকে আর দেখা যায় নাই। 'মুদারা'ও 'তারা' গ্রামে তাহার কণ্ঠ ভাল খেলিত। লোকনাট্যের আসরে গাহিবার পক্ষে এই রকম কণ্ঠ অত্যন্ত উপযোগী। নানা প্রকার সুর বৈশিষ্ট্য, লয়ের কাজ ও গায়ন ঢঙ্-এর জোরে বিনোদ বিহারী শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

কালীপদ দাস মজুমদার (কালী গাইয়ে)

তিনি ফরিদপুর জিলান্তর্গত কোটালিপাড়ায় ১৩০২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পালা গানের ব্যবহৃত সকল প্রকার সুরে তাহার অদ্ভুত দখল ছিল। উদারা, মুদারা, তারা তিনটি গ্রামেই তাহার কণ্ঠের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ছিল। কালী গাইয়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; তিনি চড়া গলায় সাজঘর হইতে সুর ধরিয়া আসরে প্রবেশ করিতেন। রঙ্গস্থলে আসিবার পরে কালী গাইয়ের ভাবাভিব্যক্তি, ফোয়ারার মত উদ্গত সুরধারা ও বিদ্যুদ্গতিযুক্ত তান চতুষ্পার্শ্বস্থ সহস্র সহস্র শ্রোতাকে মুহূর্তের মধ্যে বশীভূত করিয়া ফেলিত। লোকনাট্যের আসরে বিবেক জাতীয় চরিত্রের গানের সঙ্গে ভাবাভিনয় একান্ত প্রয়োজনীয়। এই দুইয়ের যুগপৎ পরিবেশনে কালীপদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের

স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। লোকনাট্যের আসরে যাহারা 'বিনোদ ওস্তাদ' ও 'কালী গাইয়ের' গান শুনিয়াছেন শিল্পীদ্বয়ের গান তাহাদের অন্তরে বাসা বাঁধিয়াছে। কালী গাইয়ে ১৩৫০ সালে ইহ লোক ত্যাগ করিয়াছেন।

উচ্চারণস্পষ্টতা, ভাবাভিনয় ও সুর বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে উল্লিখিত শিল্পীদ্বয়ের পরেই উমেশচন্দ্র দাসের (১৩১৬—১৩৭৩ সাল) নাম করিতে হয়। যাত্রা গানে বিনোদ ওস্তাদ ও কালী গাইয়ের পরেই রাগ সঙ্গীতে নিপুণ উমেশচন্দ্রের প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি যথেষ্ট অনুশীলন করিয়া কণ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ রকম আবেগময় মাধুর্য পূর্ণ মাজা ঘষা উচ্চকণ্ঠে গান কদাচিৎ শুনা যায়। উমেশচন্দ্রের পূর্ব নিবাস ছিল ত্রিপুরা জিলার বড়দিয়া গ্রামে। দেশ বিভাগের পরে তিনি জলপাইগুড়ি জিলার আলিপুরদুয়ারে বসতি স্থাপন করেন। উমেশচন্দ্র বিভিন্ন পেশাদারী যাত্রা সংস্থায় সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছেন। আসামে গান করিতে গিয়া হৃদ রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

আসরে প্রযোজিত পালার একটি গানে দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় না। অল্প সময়ের মধ্যে জোরালো কণ্ঠ বিদ্যুতের চমকের মত খেলাইতে না পারিলে গানের প্রতি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হয় না। ইহার জন্য বিস্তর সাধনা প্রয়োজন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক বর্তমান যাত্রা গায়কদের মধ্যে অনুশীলনের যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। যাত্রা গান তাহার পূর্ব বৈশিষ্ট্য হারাইতেছে। লোকনাট্যে লোকগীতির প্রভাব স্বাভাবিক; কিন্তু বর্তমান যাত্রায় লোকগীতির সুর-প্রভাব কম। রেডিও এবং সিনেমা প্রচারিত আধুনিক গানের প্রভাব যাত্রায় ক্রমবিস্তার লাভ করিতেছে। আধুনিক গানকে মধুর করিয়া তুলিবার জন্য যে ধরণের যন্ত্র ও যন্ত্রীর সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় যাত্রায় সে সহযোগিতা লাভ সম্ভব নহে। আবার ইহাতে কণ্ঠের যে কোমলভাব (softness) প্রয়োজনীয় তাহা বজায় রাখিয়া মাইকের সাহায্য ছাড়া জোর গলায় আসরে গীতি পরিবেশন একেবারেই অসম্ভব। কোমল কণ্ঠে যাত্রা গান পরিবেশন করা যায় না; শ্রোতাদের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য লোকনাট্যে জোরালো চড়া গলা একান্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক গান কথা প্রধান; এই কথায় লিরিক মাধুর্য থাকা চাই। বর্তমান যাত্রা গানের কথা-অংশে এই গুণটির বিশেষ অভাব অনুভূত হয়। চিত্রনাট্যকারগণ এ বিষয়ে গীতিকারদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু

যাত্রা নাট্যকারগণ গানের এই দিক সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নহেন। যে সব অঞ্চলে লোকনাট্য পরিবেশিত হয় সে সব অঞ্চলবাসীদের রেডিও-সিনেমার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে গানের কথা ও সুর সম্পর্কে কান তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে। এই সকল কারণেই বর্তমান যাত্রা গানের কথা ও সুর আর শ্রোতার মনোরঞ্জনে তেমন সক্ষম হইতেছে না। অনেক সময়ই আসরে দেখা যায় যে পূর্বের মত রুদ্ধ নিশ্বাসে গীত-সুধা পানে বঞ্চিত হওয়ায় গানের সময় শ্রোতারা গান অপেক্ষা ধূম পানাদিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়া উঠেন। যাত্রা গান বলিতে যে এক বিশেষ রীতির গীতি বুঝায় আসরে এখন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন ইহা নূতন ধারায় প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। হয়ত ইহার মধ্য দিয়াই যাত্রা-গীতির ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত হইতেছে।

বর্তমান যাত্রা-গায়কদের মধ্যে কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্য ও গায়ন রীতির দিক হইতে ক্ষিতীশচন্দ্র রায় খুব সুনামের অধিকারী। তাহার পূর্বনিবাস ছিল বরিশাল; এখন তিনি বনগাঁ-হেলেঞ্চার (২৪ পরগণা) অধিবাসী। তিনকড়ি ভট্টাচার্য (হাওড়া) ও বগড়ী কৃষ্ণনগরের (মেদিনীপুর) সুধীরচন্দ্র ধাড়া (ভজা) সুপরিচিত যাত্রা গায়ক। তারাপদ ভট্টাচার্য (সিঁথি, কলিকাতা), বলাইচন্দ্র হালদার (শান্তিপুর, নদীয়া), গুরুদাস ধাড়া (বগড়ী কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর), খোকন বিশ্বাস সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে পরিচিতি অর্জন করিয়াছেন।

(৪) যন্ত্র-বাদক প্রসঙ্গ

বেহালা

একসময় লোকনাট্যে বেহালার প্রাধান্য ছিল। বেহালাদারগণ মোটের উপর দক্ষ হইতেন। তাহাদের মধ্যে শশিভূষণ অধিকারী সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।[১] "আসরে মাঝে মাঝে শশিভূষণ অধিকারীর একক বেহালা বাজনায় সকলেই যেন মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে পড়তেন; কেবল যাত্রা নয়, তখনকার দিনে এ রকম বড় বাজিয়ে খুব একটা দেখা যেত না"। এই শশিভূষণ পূর্বোল্লিখিত 'শশিভূষণ গ্র্যাণ্ড অপেরা পার্টির' স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

বাঁশি

বেহালার পরেই লোকনাট্যে বাঁশির স্থান। বাঁশি প্রচলিত হইতেই বেহালার আধিপত্য কমিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে পেশাদারী যাত্রা সংস্থায়

১। নারায়ণচন্দ্র দত্ত—বাঁশি প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

কদাচিৎ বেহালা দেখা যায়। বাঁশি ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। বাঁশি প্রসঙ্গে প্রথমেই নারায়ণচন্দ্র দত্তের নাম করিতে হয়। ১৩১০ সালে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভৃগু চরিত' পালা হইতে নারায়ণচন্দ্র যাত্রায় স্থায়ীভাবে ক্লারিওনেট বাঁশি প্রবর্তন করেন; পূর্বেই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীদত্ত ১২৯০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হুগলী জিলার খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলের চক্রপুর গ্রামের অধিবাসী। নারায়ণচন্দ্র 'মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রি-ক্যাল যাত্রা পার্টি', 'নবদ্বীপ বঙ্গনাট্যসমাজ' 'ভবতারিণীর দল', 'প্রসন্ন নিয়োগীর দল' প্রভৃতি সংস্থায় দীর্ঘকাল বাঁশি বাজাইয়াছেন। নারায়ণচন্দ্র আর একটি বিষয়ে কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি-ই যাত্রায় নূতন-গৎ প্রচলনকারী। পূর্বে যাত্রার আসরে তবলা বা ঢোলের সঙ্গে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী মাঝে মাঝে বাজানো হইত। কিন্তু বাঁশির সঙ্গে খোলা আসরে ঐকতান যেমন জমে শুধু বেহালায় ঠিক তেমনটি জমেনা। তাই বাঁশি প্রবর্তিত হইবার পরে নূতন চঙ্-এর 'যাত্রা-গৎ' রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। শ্রীদত্ত এই গৎ রচনা করিতে থাকেন। অধিকারীরা তাহার নিকট হইতে এই সকল গৎ সযত্নে গ্রহণ করেন। বর্তমানেও যাত্রায় নারায়ণন্দ্রের অনেক গৎ ঐকতানে বাদিত হয়। তিনি বিভিন্ন দলে এক সময় গৎ শিক্ষা দিতেন। ইহার জন্য নারায়ণ চন্দ্র যাত্রা জগতে 'নারায়ণ মাষ্টার' নামে খ্যাত হইয়াছেন। যাত্রার গৎ ও তালের আলোচনা অবলম্বনে 'তাল ও সুর শিক্ষা'নামে তাহার একখানি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৬৭ খ্রীঃ তিনি পরলোক গমন করেন। যাত্রায় ক্লারিওনেট বাদকদের মধ্যে বর্তমানে পঞ্চানন পালের (হাওড়া—আমতা) নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্ল্যারিওনেটের পরেই কালীচরণ মিত্র কর্তৃক লোকনাট্যে কর্ণেট বাঁশি স্থায়ীভাবে প্রচলিত হয়। কালীচরণ কেবল প্রচলনকারীই ছিলেন না, তিনি তৎকালের সুবাদকও ছিলেন। এপর্যন্ত যাত্রায় ক্ল্যারিওনেটেরই প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্তমানে কর্ণেট বাঁশিও কিছু কিছু প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই বাঁশির সাহায্যে নানাপ্রকার effect music সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইতেছে। একালের কর্ণেট বাদকদের মধ্যে বর্ধমান ভোরপুর নিবাসী এইচ. মল্লিক-এর (খোকা মল্লিক) নাম যাত্রায় উল্লেখযোগ্য। এবিষয়ে তিনি পরিচিতি অর্জন করিয়াছেন।

তবলা-ঢোলকাদি

বিংশ শতকে লোকনাট্যের আসরে ঢোলক ও তবলা বাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রসিকচন্দ্র বায়েন (সুবিতখালি, বরিশাল)। বাদ্যযন্ত্রে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তাহার ঢোলক বাজনা ছিল পাখোয়াজী ঢঙের। কলিকাতার প্রখ্যাত তবলাবাদক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ঢোলক বাজনা যাহারা শুনিয়াছেন তাহারা এ বিষয়ে অনুমান করিতে পারিবেন। ইহার পরে অক্ষয়কুমার বটের (সরকার) নাম করিতে হয়। নদীয়াবাসী এই শিল্পীও ওস্তাদ বাজিয়ে ছিলেন। লোকনাট্যের আসরে রসিকচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের বাজনা একসময় বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। কলিকাতা-বৌবাজার নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ আচার্য যাত্রার একজন ওস্তাদ বাজিয়ে ছিলেন। তৎকালে যাত্রায় সংগীতের প্রাধান্য ছিল বলিয়া গুণী বাদকদের প্রয়োজন হইত। সংস্থার সংখ্যা যেমন অনেক ছিল তেমনি বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইত বহু সুবাদক সংগ্রহ করা হইত। ইন্দুভূষণ দাস (হয়বৎপুর, বরিশাল), হৃদয় বায়েন (গঙ্গাটিয়া, ময়মনসিংহ), পুলিনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান), শশিভূষণ নট্ট (বরিশাল), ভীমচন্দ্র প্রমাণিক (বাঁকুড়া), যোগেন্দ্রলাল নট্ট (বরিশাল), আশুতোষ সাঁতরা (অন্ধ আশু, হুগলী) যাত্রার প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন। বর্তমানে লোকনাট্যের গীত-রীতি পরিবর্তিত হইতেছে,—গানের সুর পূর্বাপেক্ষা হালকা হইয়া পড়িয়াছে। আবার পূর্বের মত এক একটি পালায় বহু ঐকতান বাদনের রীতিও বর্জিত হইয়াছে। সুতরাং পালা উপস্থাপনায় পূর্বের ন্যায় এখন আর তেমন দক্ষ বাদকের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সাধারণ বাদক হইলেই এখন যাত্রার কাজ চলে।

(৫) যাত্রা-সুরকার

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও মুকুন্দ দাস নিজেদের রচিত গানে নিজেরাই সুরারোপ করিয়া আসরে পরিবেশন করিতেন। তাহাদের গানের সুর একদা খুব জনপ্রিয় ছিল। অন্যান্য অধিকারীরা সুরকারদের সাহায্যে পালার গানে সুর সংযোজনার ব্যবস্থা করিতেন। সুরকারদের মধ্যে ভূতনাথ দাসের (কলিকাতা) শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। তিনিই যাত্রায় 'থিয়েটারী সুরের' প্রবর্তক। ভূতনাথ সংগীতে ওস্তাদ ছিলেন। তাহার পরেই দেবকণ্ঠ বাগচীর (নবদ্বীপ) কথা আসে। সংগীত নৈপুণ্যের জন্য তিনি 'সুর-সরস্বতী' উপাধি লাভ

করিয়াছিলেন। লোকনাট্যের আর একজন প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী ছিলেন সতীশচন্দ্র ঘোষ (বরাহনগর, কলিকাতা)। তিনি ওস্তাদ দৌলতরামের শিষ্য ছিলেন। যাত্রা সুরসংযোজনায় তাহার কৃতিত্বের কথা সুবিদিত। বর্তমান যাত্রা সুরকারদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয়কুমার ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। মহেন্দ্রনাথ ১৩১১ সালে বর্ধমান জিলার মহাতো গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওস্তাদ দৌলতরাম ও উল্লিখিত সতীশচন্দ্র ঘোষের সংগীতশিষ্য। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া যাত্রাগানে সুরারোপ করিতেছেন। অমিয়কুমার ভট্টাচার্য ১৩১৪ সালে যশোহর জিলার মল্লিকাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোকনাট্যকার অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থের ভ্রাতুষ্পুত্র। বাংলার বিখ্যাত সংগীতশিল্পী গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর নিকট অমিয়কুমার খেয়াল ও টপ্পা শিক্ষা করেন। একদা তিনি ঢাকা ও কলিকাতার নিয়মিত বেতার-শিল্পী ছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ যাত্রাগানে সুর-সংযোজনা করিয়া তিনি খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অজিত বসু, পঞ্চানন মিত্র ও রাজেশ্বর নন্দী যাত্রাসুরশিল্পী রূপে পরিচিতি অর্জন করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাহারা সুরকাররূপে কাজ করিতেছেন। গায়ক-অভিনেতা সবিতাব্রত দত্ত, চলচ্চিত্রের সুরকারত্রয় দুর্গা সেন, অনিল বাগচী এবং কালীপদ সেন ও মাঝে মাঝে যাত্রাগানে সুর দিয়া থাকেন।

(ঙ) লোকনাট্য সম্প্রদায়ের পরিভাষা

অধিকারী, মালিক, বাবু, স্বত্বাধিকারী—এই শব্দ কয়টি দ্বারা দলের অধিপতিকে বুঝানো হইয়া থাকে। পূর্বে অধিকারী শব্দটি বিশেষ প্রচলিত ছিল। দলাধিপতিকে কখনো কখনো মালিক বা বাবুও বলা হইত। বর্তমানে দলাধিপতিকে স্বত্বাধিকারী বলা হয়। পূর্বে সংস্থার অধিকারীরাই সাধারণত পালা রচনা করিতেন এবং সঙ্গীত-অভিনয়াদিতে অংশগ্রহণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ অধিকারী, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মুকুন্দ দাস প্রমুখের নাম করা যাইতে পারে। উনিশ শতকে কখনো কখনো পেশাদারী অধিকারীরা ও অন্যের লেখা পালা আসরস্থ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা বরাহনগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের পালা কোন কোন অধিকারী আসরে প্রযোজনা করিতেন। তথাপি অধিকারী শব্দের সঙ্গে পালারচনারও সম্পর্ক জড়িত ছিল। বিশ

শতকে অভিনয়ের প্রাধান্য বাড়িতে আরম্ভ করায় অধিকারী কর্তৃক পালারচনার রীতি উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করে। দলাধিপতিও ক্রমে স্বত্বাধিকারী নামে পরিচিত হইতে থাকেন।

পরিচালক—থিয়েটারী অভিনয় ও চিত্রাভিনয়ে যিনি নাট্য পরিচালনা করেন তাহাকেই পরিচালক বলা হয়। কিন্তু লোকনাট্য সংস্থায় পরিচালকদের দায়িত্ব অন্যরকম। তাহারা নাট্য পরিচালনা করেন না। সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাকিয়া যাতায়াত, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা, যেখানে দল থাকিবে সাময়িকভাবে সেখানকার স্থানীয় দায়িত্ববহন এবং প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে বাহির হইতে সংযোগ রক্ষণ তাহাদের কাজ।

আসামী—অভিনেতা সংগ্রহকারীরা নূতন অভিনেতাকে আসামী বলেন। পূর্বে নানাস্থানে ঘুরিয়া যাত্রার জন্য আসামী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। এখন নূতন অভিনেতারা কর্মের প্রয়োজনে দলপতির নিকট আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

বয়সা—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বালক অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হওয়াকে বয়সা বলে। বয়সার জন্য অনেক বালক গাইয়েকে গান ছাড়িয়া কেবল অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। যাহাদের কণ্ঠ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও গানের উপযোগী থাকে তাহাদের সংগীত ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন হয় না।

জলপানি—লোকনাট্য সংস্থায় সাধারণত দিনের বেলা ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রিকালে রান্না হয় না বলিয়া আহারের বিনিময়ে দল কর্তৃক বিভিন্ন শিল্পীকে বিভিন্ন হারে টাকা-পয়সা দেওয়া হয়। ইহাই জলপানি।

চুক্তি—বেতন, দাদন, আহার জলপানি, যাতায়াত ইত্যাদির ব্যবস্থা সম্পর্কে বাৎসরিক কার্যের সর্তাবলী সহ মালিক ও শিল্পী দ্বারা রচিত স্বীকৃতিপত্রকে চুক্তি বলে। অনেক সময় শিল্পী ও মালিক দ্বারা লিখিত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। আবার কখনো কখনো অলিখিত নন্ জুডিসিয়াল্ ষ্ট্যাম্পড্ পেপারে শিল্পী সই করিয়া দেন। চুক্তির সর্তাবলী মৌখিক থাকিয়া যায়। মালিকপক্ষ ইহার বিশ্বস্ততা বজায় রাখেন। যাত্রায় চুক্তির এই দুই রীতিই প্রচলিত।

দাদন—প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আট মাসের জন্য শিল্পীদের সঙ্গে লোকনাট্য সংস্থার চুক্তি হয়। এই চুক্তির সময়

শিল্পীরা মালিকের নিকট হইতে যে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেন তাহাই দাদন ; এই অর্থ মাসিক বেতন হইতে কিছু কিছু করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। এইভাবেই দাদনের টাকা পরিশোধ করা হইয়া থাকে।

ছাড়পুছ—বৎসরের শেষে দলছুটির সময় শিল্পীর সঙ্গে পূর্বচুক্তি অনুসারে দেনাপাওনা মিটাইবার সময় বিশেষ কারণবশত মালিক কর্তৃক আপোষে কিছু কম অর্থ দেওয়া।

মাইনের দল---যে সংস্থা কর্তৃক শিল্পীরা মাসিক বেতনে নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং বৎসরে আটমাস যথারীতি লোকনাট্য পরিবেশন করা হয় তাহাকে মাইনের দল বলে। মাইনের দলে দাদনের রীতি প্রচলিত।

ঠিকার দল—এই শ্রেণীর সংস্থার মালিক পেশাদারী রীতিতে মাঝে মাঝে লোকনাট্য পরিবেশন করেন। ইহাতে প্রতি অভিনয়ের ভিত্তিতে শিল্পীদের অর্থ দেওয়া হয়। অভিনয় না হইলে শিল্পীদের কিছুই দিতে হয় না। ঠিকার দলের মালিককেও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় এবং পূর্ব হইতে শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া রাখিতে হয়।

নায়েকপক্ষ— যিনি বা যাহারা গাওনার টাকা দেন এবং যাহার বা যাহাদের নির্দেশিত স্থানে পালা অভিনীত হয় তিনি বা তাহারা নায়েকপক্ষ।

বারোয়ারী কর্তা—বহুর নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করিয়া গাওনার ব্যবস্থা করা হইলে চাঁদা দানকারীদের তরফ হইতে যিনি দলপতির সঙ্গে অর্থের চুক্তি ও চুক্তি পূরণের দায়িত্ব বহন করেন তাহাকে বারোয়ারী কর্তা বলে।

দালাল—যাতায়াত ও যোগাযোগের অসুবিধার জন্য দলপতির পক্ষে নানাস্থানে ঘুরিয়া বায়না সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং বায়না সংগ্রহের জন্য কর্মীর প্রয়োজন। এই শ্রেণীর কর্মীরাই দালাল। দল যাতায়াতের সাহায্য, গাওনাস্থলে থাকিবার ব্যবস্থা ও গান শেষে টাকা আদায়ের ভার দালালের উপর ন্যস্ত থাকে। দালালেরা বায়নার টাকার উপর শতকরা হারে দস্তুরি গ্রহণ করেন। পূর্বে কেবল ব্যক্তিগত দালালি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে যৌথ পদ্ধতিতেও যাত্রার দালালি ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'প্রমোদ প্রতিষ্ঠানের' নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৩৭১ সালে কলিকাতায় এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর-গরবেতা নিবাসী হরিপদ বায়েন (যাত্রাভিনেতা হরিপদরানী) ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ৩১১ নং রবীন্দ্র সরণী, (কলিকাতা-৬) ইহার কার্যালয়।

পরন—চলতি পথে দলের ক্রম অগ্রগতি ও ফিরতি পথে ক্রম পশ্চাদ্‌গতি অনুযায়ী বিভিন্নস্থানে গানের বায়না করাকে 'পরন' বলে।

আসর—শব্দটি প্রাচীন। মধ্যযুগেও ইহার ব্যবহার ছিল। যজ্ঞস্থল বা পূজাস্থানকে আসর বলা হইত। চণ্ডীর অষ্টমঙ্গলা উৎসব উপলক্ষে মুকুন্দরাম ষোড়শ শতক বলিয়াছেন,---

[1] ঘট সংস্থাপন করি, মহামায়া মহেশ্বরী,
স্থিতিঙ্কর এ অষ্টবাসর।
লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত সহচরী,
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর ॥
তুমি আদ্যা মহামায়া, আর যে তোমার কায়া,
আসরে করহ অধিষ্ঠান।

পূজাস্থানে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হইত। ইহা হইতে পরে দেব-উৎসব ছাড়াও নৃত্যগীতের স্থান আসর নামেই অভিহিত হইতে থাকে। কোন বিষয়ে আলোচনাদির জন্য সামাজিকগণের সমাবেশকেও আসর বলে, যেমন সভা। চতুর্দিকে দর্শকবেষ্টিত রঙ্গস্থলকে (বড় পেশাদার দলের জন্য সাধারণত ১৮ ফুট × ১৫ ফুট অথবা ২০ ফুট × ১৮ ফুট) যাত্রার আসর বলা হয়। যাত্রার এক একটি আসরে তিন হইতে পাঁচ হাজার পর্যন্ত জনসমাগম হইয়া থাকে। যান্ত্রিকতার সাহায্য ছাড়া শিল্পীদের আসর-নাট্য (যাত্রা) পরিবেশন করিতে হয়।

যন্ত্র দেওয়া—পালা আরম্ভের পূর্বে রঙ্গস্থলে বিপরীতমুখী দুই পার্শ্বে যন্ত্রাদি সাজাইয়া দেওয়া। যন্ত্র দিলেই সুর বাঁধিয়া ঐকতান বাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

ধুমল—আসরে গাওনা সুরু হইবার পূর্বে যে সমবেত বাজনা হয় তাহাকে ধুমল বলা হয়। ইহাতে আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে ঢোলক বাজনার প্রাধান্য প্রচলিত।

গুরুবাইজ—আসরের ঐকতানকে গুরুবাইজ বলা হয়। এই শব্দটি কুচবিহার অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত।

মহান—পল্লী অঞ্চলের প্রধানকে মহান বলে। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত পালাটিয়া লোকনাট্যে মহান চরিত্র উপস্থাপিত হয়। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এই শব্দটি বিশেষ প্রচলিত।

১। কবিকঙ্কন চণ্ডী—'মঙ্গলবারের গান আরম্ভ'

দেউনিয়া—ঝাড়-ফুঁক ও তুক-তাক করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন সাধু বা ফকির চরিত্রকে দেউলিয়া বলে। এই চরিত্রও পালাটিয়া লোকনাট্যে সংযোজিত হয়। উল্লিখিত অর্থে জলপাইগুড়ি অঞ্চলে শব্দটি প্রচলিত।

ছোকরা—যে বালক নর বা নারীর রূপসজ্জা লইয়া নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করে তাহাকে ছোকরা বলে। ছোকরারা সাধারণত যাত্রা-ব্যালে প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে।

(চ) দলের নিয়মাবলী

যাত্রার দলে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও সুস্থ পরিবেশ রক্ষা করিবার জন্য পূর্বে চুক্তি পত্রের সঙ্গে কোনপ্রকার লিখিত বিধিনিষেধের উল্লেখ থাকিত না। ইহাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নাট্য ভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি' কর্তৃক চুক্তি পত্রের সঙ্গে প্রত্যেক শিল্পীকে মুদ্রিত নিয়মাবলী সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রায় ইহা নূতন বলিয়া নিয়মপত্রটি উদ্ধার করা হইতেছে—

সংস্থার শর্ত ও নিয়মাবলীর নমুনা :—

"নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি ১০৭ শোভাবাজার ষ্ট্রীট,
স্বত্বাধিকারী—পি. দাশগুপ্ত কলিকাতা-৫

শর্ত ও নিয়মাবলী

১। ৺শারদীয়া পূজা হইতে চলতি মরশুম সুরু হইবে এবং ৺শারদীয়া পূজার প্রথম অভিনয় রজনী হইতে চুক্তি অনুযায়ী মাসিক মাহিনা গণ্য হইবে।

২। কোম্পানী দল ছুটি দিলে ছুটির সময়ের কোন মাহিনা, জলপানি বা খোরাকী দেওয়া হইবে না।

৩। বৈশাখ মাস হইতে শুধু 'কাজের দিনের বেতন' বা no work no pay প্রথা চালু হইবে।

৪। আষাঢ় মাস হইতে মরশুম সুরু হওয়ার পূর্বের প্রতি অভিনয়ে পূর্ব বছরের বেতনের ½ অংশ বাদ দিয়া দৈনিক বেতন গণ্য হইবে।

৫। শিল্পী বা কর্মচারীদের যে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইবে কার্তিক মাস হইতে পাঁচ মাসের মধ্যে বা প্রয়োজন বোধে কোম্পানী আরও কম সময়ে সেই টাকা আংশিকভাবে প্রতিমাসে কাটিয়া লইবে।

৬। কোম্পানী একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার যে ব্যবস্থা করিবে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। লরী, বাস বা রেলগাড়ী, এমন কি খেয়া, নৌকা, গরুর গাড়ী, সম্ভবমত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পদব্রজে কিছু অংশ যাইবার নিয়মও মানিতে হইবে।

৭। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার সময় ট্রেনে নিজ নিজ বিছনা পত্রের উপর নজর রাখিতে হইবে। এবং ট্রেন হইতে অবতরণের সময় নিজ নিজ বিছানাপত্র নামাইবার জন্য ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

৮। কোন শিল্পী বা দলের কর্মচারী কখনও দল হইতে চলিয়া আসিতে পারিবে না। পশ্চিমবঙ্গের অভিনয়ে কখনও দৈনিক বাড়ী যাতায়াত করা চলিবে না। সর্বদাই দলে থাকিতে হইবে।

৯। অভিনয়ের জায়গায় সম্ভবমত আয়োজিত বাসা বাড়ীতেই থাকিতে হইবে। থাকিবার জায়গা লইয়া কোন রকম আপত্তি করা চলিবে না। দলের ম্যানেজার বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত বাসায় থাকিতে হইবে।

১০। রান্নাবাসার জায়গা হইতে বাসস্থানের জায়গা নিকটবর্তী না হইলে রান্নাবাসায় আসিবার জন্য কোম্পানীর কাছে কোন অনুযোগ বা অন্য কোন প্রকার দাবী করা চলিবে না।

১১। রান্নাবাসায় কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী খাবার খাইতে হইবে এবং স্থান, কাল ও অবস্থানুযায়ী আয়োজিত খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। যে কোন নাটকে কোম্পানীর নির্বাচিত চরিত্রে অভিনয় করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধে অন্য চরিত্রেও অভিনয় করিতে হইবে। কোন অভিনেতার অনুপস্থিতিতে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করিতে হইলে তাহাও করিতে হইবে।

১৩। অভিনয়ের পূর্বে সাজঘরে আসিবার জন্য কোম্পানীর লোক খবর দিবার আর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সাজঘরে আসিয়া নিজের জায়গায় make up-এ বসিতে হইবে। সাজঘরে কোন রকম চীৎকার বা হল্লা করা চলিবে না।

১৪। অভিনয় দিনে সাজঘরে উপস্থিত না থাকিলে সে দিনের রোজ কাটাযাইবে।

১৫। কোন শিল্পী কোম্পানীকে পূর্বে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ অনুপস্থিত হইলে, অথবা ছুটি লইয়া সময়মত কাজে যোগদান না করিয়া কোম্পানীর

বিনানুমতিতে ছুটির সময় বর্ধিত করিয়া কোম্পানীর কোন অসুবিধা বা বিপত্তি সৃষ্টি করিলে তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। রীতিমত রিহার্সালে যোগ দিতে হইবে এবং মরশুম চলাকালীন যে কোন সময়ও রিহার্সাল দিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭। দলের মেয়েরা পৃথক বাসা বাড়ীতে থাকিবে এবং তাঁহাদের পৃথক সাজঘরের ব্যবস্থা থাকিবে। মেয়েদের বাসায় কোন পুরুষ থাকিতে পারিবে না এবং কোন পুরুষ সেখানে গিয়া অকারণে আড্ডা বা গল্প করিতে পারিবে না। প্রয়োজন বোধে কোম্পানী মেয়েদের বাসায় চাকর বা কোম্পানীর কোন প্রতিনিধি রাখিতে পারিবে।

১৮। কোন মেয়ে দলের কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বাইরে কোথাও যাইতে পারিবে না। সিনেমা বা কোন স্থানে যাইতে হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া যাওয়া চলিবে না।

১৯। দলে কোন রকম পানাসক্ত জীবন-যাপন করা চলিবে না। যদি কোন রকম উচ্ছৃংখল জীবন যাপনের পরিচয় পাওয়া যায় তবে কোম্পানী বিনা নোটিশে সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পী বা কর্মচারীকে জবাব দিতে পারিবে।

২০। দলে কোন রকম জুয়া খেলা চলিবে না।

২১। মাসিক বেতন চলাকালীন কোন জায়গায় একই দিনে একাধিক অভিনয়ের ব্যবস্থা হইলে শিল্পীরা ইহার জন্য শুধু পৃথক জলপানি পাইবে, কোনরকম অতিরিক্ত বেতন পাইবে না।

২২। পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে no work no pay মানিতে হইবে।

উপরোক্ত শর্ত ও নিয়ম মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া 'নাট্য ভারতী'তে যোগদান করিলাম।

ইতি............"

(ছ) বিভিন্ন জিলার যাত্রাসংস্থা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিলায় বর্তমানে যাত্রাভিনয়ের জন্য বহু সংস্থা গঠিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেক সংস্থা যাত্রাভিনয়ের জন্য সরকারের তরফ হইতে এককালীন বাৎসরিক সাহায্য পাইয়া থাকে। বিভিন্ন লেখকের মুদ্রিত যাত্রাপালা এই সকল সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। পূর্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে যে এই সকল সংস্থা কর্তৃক কলিকাতার পেশাদারী সম্প্রদায়ের অভিনয়রীতি আদর্শরূপে গৃহীত হয়। কয়েকটি জিলার এই জাতীয় সংস্থার উল্লেখ করা যাইতেছে।

কুচবিহার জিলা

বাণীতীর্থ (চকেহাকা), জোয়পাকড়ি রিক্রিয়েশন পার্টি (জোরপাকড়ি), মদনমোহন ক্লাব (ঘুঘুমারি), ব্রহ্মোত্তরছত্র প্রগতি সংঘ যাত্রাপার্টি (ব্রহ্মোত্তরছত্র), উত্তর আমবাড়ি ক্লাব (আমরাড়ি), আমবাড়ি নিউ জিতেন্দ্র অপেরা পার্টি (আমবাড়ি), তরুণ সংঘ যাত্রা পার্টি (কোরীবাড়ি), মরুগঞ্জ এমেচার পার্টি (মরাডাঙ্গা), কমলা অপেরা (সিদ্ধেশ্বরী), ধূমের খাতা যাত্রাপার্টি (ধূমের খাতা), কাত্যায়নী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি (বাবুরহাট) উদয়ন অপেরা (পোস্তারঝাড়), সঞ্জীবনী সংঘ যাত্রাপার্টি (আদাবাড়ি) শ্রীকৃষ্ণ অপেরা পার্টি (টালিগুড়ি), গোরাঙ্গ অপেরা পার্টি (খরিজা বত্রিগাছ), সিঙ্গিমারী অরবিন্দ ক্লাব (সিঙ্গিমারী), মহামিলন যাত্রাপার্টি (যোগের কুঠি), জাগৃতি সংঘ যাত্রাপার্টি (শিলতুয়ার), মহাকালহাট সোশ্যাল এডুকেশন সেণ্টার (হোকাদহ), শৌলমারি সোশ্যাল এডুকেশন সেণ্টার (শৌলমারি), সবুজপল্লী ক্লাব (বারাশকদল), মদনমোহন যাত্রাপার্টি (গোপালপুর), রাজারহাট সঙ্গীব সংঘ (রাজারহাট), সিদ্ধেশ্বরী কল্যাণী সংঘ গ্রন্থাগার (সিদ্ধেশ্বরী), গীতালদহ ক্লাব (গীতালদহ), পল্লী-শ্রী সমিতি (ছোটবোয়ালমারি), সুরেশস্মৃতি যাত্রাপার্টি (বানেশ্বর), ছদ্মবেশী সম্প্রদায় (কুচবিহার), খাপাইডাঙ্গা যাত্রাপার্টি (খাপাইডাঙ্গা), গ্রামীণ সংঘ (ধর্মবারেরকুঠি—পুণ্ডীবাড়ি), মিলন সংঘ (মরিচবাড়ি), উদয়ন সংস্কৃতি পরিষৎ (সেপাহিটারি শকুনিবালা, পুণ্ডীবাড়ি পোষ্ট), বোকালির মঠ নিউ অন্নদা অপেরা পার্টি (বোকালির মঠ)—সংস্থাগুলি প্রতিবৎসর যাত্রাভিনয় করিয়া থাকে এবং ইহার জন্য [1]সরকারী বার্ষিক সাহায্য পায়।

পশ্চিমদিনাজপুর জিলা

থালাহার এস. ই. সেণ্টার যাত্রাপার্টি (চেঁচড়া), মনোহালী যাত্রাপার্টি (মনোহালী), গোপীনাথপুর সেবাসংঘ যাত্রাপার্টি (গোপীনাথপুর), চকভবানী

1. Statement of parties receiving grant-in-aid from S. E. Fund 1963—1966, Coochbehar

জন্মাষ্টমী কমিটি (বালুরঘাট), শ্রীকৃষ্ণ রুরাল লাইব্রেরী যাত্রাপার্টি (তেওর), লক্ষ্মীপুর যাত্রাপার্টি (পাতিরাম), ফুলবরা মনসা অপেরা পার্টি (খসপুর), মনাইল পি. কে. অপেরাপার্টি (পাতিরাম), শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি (রামকৃষ্ণপুর) লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা পার্টি (ধদলপাড়া, গোপালগঞ্জ), কুলহরি যাত্রাপার্টি (চাঁদগঞ্জ), গোপালগঞ্জ যুব সংঘ যাত্রা পার্টি (গোপালগঞ্জ), ফরিদ আতরিপল্লী পাঠাগার যাত্রাপার্টি (বিদায়পুর), পিরোজপুর জগন্নাথ নাট্যসমিতি (গোবিন্দপুর), হরিপুর যাত্রাপার্টি (শুকদেবপুর), মথুরাপুর যাত্রাপার্টি (জনচি), অর্জুনপুর যাত্রাপার্টি (তিলান), জামালপুর যাত্রাপার্টি (করদঃ), সন্দীপন নাটক সমিতি (ছত্রভোগ, দনগ্রাম), হরিরামপুর উদয়ন যাত্রাপার্টি (হরিরাম পুর), চককাশী তরুণ অপেরা পার্টি (বালুরঘাট), চকরমানাথ সংগীত সমাজ (বালুরঘাট), উত্তমাশা সংঘ যাত্রাপার্টি (চকভবানী কলোনী, বালুরঘাট), অশোক অপেরা পার্টি (মহেন্দ্রগঞ্জ, কালীয়াগঞ্জ), চাঁদগঞ্জ রামবনবাস যাত্রাপার্টি (কুনোইর), পূর্বগোলগাঁও যাত্রাপার্টি (টমচারী মঠবাড়ি), মহামায়া অপেরা পার্টি (মহেশপুর, ডালিমগাঁও), মাধবপুর বীণাপাণি অপেরাপার্টি (গোলনদর), টিটিহি যাত্রাপার্টি (সশসপুর), পরহরিপুর বান্ধব অপেরা পার্টি (পরহরিপুর), নবারুণ নাট্যসমাজ (কুশমোন্দি), চুড়ামোন সোশ্যাল এডুকেশন সেণ্টার যাত্রাপার্টি (চুড়ামোন). মিলন যাত্রাপার্টি (কাঁটরাপাড়া, অরজিপানিশালা), আমিনপুর ইয়ং ক্লাব (আমিনপুর), চৌনতি যাত্রাপার্টি (যোগতাগাঁও), যোগতাগাঁও যাত্রাপার্টি (যোগতাগাঁও), পরবস্থ যাত্রাপার্টি (দাসপাড়া, কাটগাছ) তরুণ অপেরা সংঘ (খুনিয়া)— সংস্থা কর্তৃক যাত্রাভিনয় করা হয়। এই [1]দলগুলিও বার্ষিক সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে।

মালদহ জিলা

ফুলবেরিয়া মুক্ত বেণী অপেরা পার্টি (ফুলবেরিয়া), মানিকপুর যাত্রাপার্টি (মাদাপুর), বিবেকানন্দ মিলনসংঘ (অমৃতি), জয়হিন্দ ড্রাম্যাটিক ক্লাব (শোভানগর), নবযুবক অপেরা পার্টি (সত্তারি), দেবীপুর মিলনসংঘ (দেবীপুর), হরিপুর মৃত্যুঞ্জয় ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী (একবোরনা, পরানপুর),

1. Statement regarding folk recreational institutions for grant-in-aid 1965-66, West Dinajpur.

সাধারণসংঘ (পরানপুর), ভিঙ্গোল রাধারাণী অপেরা পার্টি (ভিঙ্গোল), বৈরাট শক্তি অপেরা পার্টি (ভিঙ্গোল), ছাতিয়ান মোড় বিনোদনগর অপেরা পার্টি (সাহাপুর), পল্লী-শ্রী ক্লাব (যাত্রাডাঙ্গা), কালীয়াচক তরুণনাট্য মন্দির (কালীয়াচক), রাজনগর লাইব্রেরী এণ্ড ক্লাব (রাজনগর), রানীগঞ্জ সমাজ কল্যাণ সংঘ (কমলডাঙ্গা), নালাগোলা ড্রামাটিক পার্টি (নালাগোলা), সরস্বতী যাত্রাপার্টি (ঘামনগোলা), গান্ধীবাদ সংগঠনীপার্টি (দেবীগঞ্জ), কাত্যায়নী অপেরা (দেবীগঞ্জ), ক্ষেমপুর সৎসঙ্গ অপেরা পার্টি (চোরোলমণি), কাশীপারা স্বর্যোদয় অপেরা পার্টি (মালতীপুর), আলাদিপুর বনফুল ক্লাব (করিয়ালি), কানপুর যোগেন্দ্র লাইব্রেরী ক্লাব (ধরমপুর), মুচিয়া নবারুণ নাট্যসংঘ (আইহো), লক্ষ্মীপুর নবীন সংঘ (আইহো), স্বজনী রুরাল লাইব্রেরী (আইহো), কগাছিয়া তরুণ অপেরা পার্টি (পুখুরিয়া), তরুণসংঘ যাত্রা পার্টি (খুটাডাহা), বাহাদুরপুর সেবাসমিতি (মনিকোরা), ভূতনী জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (ভূতনী), সরস্বতী পাঠাগার এণ্ড ক্লাব (ধরমপুর), শক্তি সংঘ অপেরা পার্টি (সলাইডাঙ্গা), পাঁচপাড়া কৃষকসংঘ ক্লাব (পাঁচপাড়া), গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মোথাবাড়ি), শ্বেতাঙ্গিনী অপেরা পার্টি (হরিশচন্দ্রপুর), ইদ্দম সংকল্প নাট্য সমিতি (ডোহিল)—সংস্থা যাত্রাপালা পরিবেশন করিয়া থাকে। উল্লিখিত [1]সংস্থাগুলি সরকারী সাহায্য পায়। মালদহে এই জাতীয় সংস্থা ক্রমেই বাড়িতেছে ১৯৬৩—৬৪ সালে মালদহে সাতাশটি সংস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৪—৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থার সংখ্যা পঁয়ত্রিশের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জিলা

বহরমপুর মহকুমার পঞ্চাননপুর রূপবান যাত্রা পার্টি (বহরমপুর সদর), দয়াময়ী অপেরা পার্টি (সৈদাবাদ), স্বর্গধাম নাট্যমন্দির (সৈদাবাদ), হিন্দ লাইব্রেরী নাট্যসমিতি (ভাবতা), নবতরুণ সংঘ (হাতিনগর), তরুণ নাট্যসংঘ (বহরমপুর), রূপালিনাট্য সংঘ (গকুণ্ডা), আনন্দলোক (কালীতলা দিয়ার),—লালবাগ অঞ্চলের নিউমহাদেব অপেরা পার্টি (রায়পুর), রাণীনগর ঝাউবেড়িয়া নাট্য সংঘ (রাণীনগর), স্বপ্না অপেরা পার্টি (ধরমপুর) শশিভূষণ অপেরা পার্টি (পশলা), গোপীনাথ অপেরা পার্টি (লালবাগ),

1. Statement regarding folk recreational institutions for distribution of grants during 1964-65, Malda.

রাসবিহারী অপেরা পার্টি (রামপুর),—কান্দিমহকুমান্তর্গত প্রগতি নাট্যসংঘ (তেনিয়া), খরজুনা অপেরা পার্টি (কান্দি), বহরা অপেরা পার্টি (কান্দি), ঘনশ্যামপুর মহাপ্রভু অপেরা পার্টি (ঘনশ্যামপুর), অগ্রগামী যাত্রা পার্টি (আমজুয়া), ভরতপুর তরুণ অপেরা (ভরতপুর), শরৎস্মৃতি নাট্য সমিতি (পুরন্দরপুর), রায়গ্রাম তরুণ অপেরা (রায়গ্রাম), পারুলিয়া নাট্যমন্দির (পারুলিয়া), নিউ অপেরা পার্টি (ব্রাহ্মণপাড়া),—জঙ্গীপুর মহকুমার ওসমানপুর মিলনীক্লাব (ওসমানপুর), কৃষ্ণা অপেরা পার্টি (জঙ্গীপুর), সর্বেশ্বর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (জঙ্গীপুর), সৈদপুর পল্লীমঙ্গল তরুণ ক্লাব (সৈদপুর), সাধারণ গ্রন্থাগার (মিথিপুর) সংস্থা কর্তৃক লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। এই সম্প্রদায়গুলিও বিভিন্ন বৎসরে বার্ষিক সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে।

বীরভূম জিলা

সিউরী শক্তি অপেরা পার্টি (সিউরী), বেনেপুকুর যাত্রা (সিউরী), কাশীপুর যুব সংঘ যাত্রাপার্টি (সিউরী),—লাবপুর অঞ্চলে বাবনা মিলন সংঘ যাত্রা পার্টি (আমেদপুর), নান্নুর অঞ্চলে বেলগ্রাম পল্লীমঙ্গল যাত্রাপার্টি (সাঁইথিয়া), মালিরাম অপেরা পার্টি (সাঁইথিয়া), বোলপুর অঞ্চলে বোলপুর মহামায়া অপেরা পার্টি (বোলপুর), ইলমবাজার রিক্রিয়েশনাল যাত্রাপার্টি (ইলমবাজার), খয়রাস্থল এলাকায় পরসুন্দী রাধিকা সুন্দরী যাত্রাপার্টি (পরসুন্দী), ময়ূরেশ্বর অঞ্চলে ঝলকামহেশ্বর অপেরা পার্টি (গাঙ্গুটিয়া), সনজ পল্লীমঙ্গল সমিতি যাত্রাপার্টি (সনজ), রামপুরহাটে জেন্দুর কোপামা অপেরা পার্টি (কবুবোনা), কালীপুর ট্রাইবাল্ যাত্রা (বসওয়া), নলহাটি অঞ্চলে দেবগ্রাম যুবসংঘ যাত্রাপার্টি (খিথা , সিমলান্দি স্বদেশী যাত্রাপার্টি (ভদ্রপুর), মুরারাই ব্লকক্লাব (মুরারাই), জগাই তরুণ সংঘ যাত্রাপার্টি (রুদ্রনগর—মুরারাই) সম্প্রদায় যাত্রাপালা পরিবেশন করিয়া থাকে। এই সংস্থাগুলি [1] ১৯৬৫—৬৬ আর্থিকবর্ষে সরকারী সাহায্য লাভ করিয়াছে।

পুরুলিয়া জিলা

আরশা অঞ্চলে হরগৌরী অপেরা পার্টি (পুয়ারা), শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি (বোরাম), বাগমুণ্ডী অঞ্চলে বীণাপাণি ক্লাব (দেবতোরাং), বরাবাজার

1. Statement regarding folk recreational grant, 1965-66, Birbhum

অঞ্চলে হরগৌরী অপেরা পার্টি (ভিখারী ছেলিয়া মা), বেরাদা সমাজশিক্ষা অপেরা পার্টি (বেরাদা), হুরা অঞ্চলে নডিহা নবকিশোর অপেরা পার্টি (লক্ষ্মণপুর), কুলগোরা বাণী অপেরা পার্টি (লক্ষ্মণপুর), জয়পুর অঞ্চলে বীণাপাণি অপেরা পার্টি (প্রতাপপুর), কারমাটার সৎসঙ্গ অপেরা পার্টি (সিনন্ত্রী), বারটান নিউ চণ্ডী অপেরা পার্টি (সিন্ত্রীচাষরোড), ঝালদায় বেগুয়াডি চণ্ডী পল্লীমঙ্গল যুবসমিতি (ইলু), নবতরুণ অপেরা পার্টি (চকিয়া), রামকৃষ্ণ অপেরা পার্টি (ততুয়ারা), সমাজশিক্ষা সংঘ (কলমা), গৌরাঙ্গ অপেরা পার্টি (উপরবতরি), সিংহবাহিনী অপেরা পার্টি (বেগুণকোতার) কাশীপুর এলাকায় কালাপাথর শ্যামসুন্দর নাট্যকলাভবন (সোনাথালি), নারায়ণপুর যাত্রাপার্টি (পঞ্চকোটরাজ), নেতুরিয়ায় বাণীসাহিত্য মন্দির (বোরা), শর্বাণী ভিলেজ যাত্রা সঙ্গীত কমিটি (নেতুরিয়া), ভামুরিয়া তরুণবীণাপাণি অপেরা (ভামুরিয়া) পারা এলাকায় জনতা লাইব্রেরী (ডুবরা), মিলন অপেরা (ঝাপুর), ঠাকুরদি রামেশ্বরদি নীলকণ্ঠ অপেরা পার্টি (কালুহার), পুঞ্চা অঞ্চলে জনকল্যাণ অপেরা পার্টি (কানোরা), হোয়াইট হাউজ ক্লাব (পুঞ্চা), জয়কালী অপেরা পার্টি (কানোরা), পুরুলিয়া অঞ্চলে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউ অপেরা পার্টি (সত্‌রো), শ্যামা অপেরা পার্টি (নয়িডারা), বাণী এমেচার ক্লাব (কৃষিপুরা), গোবিন্দপুর যাত্রা পার্টি (গোবিন্দপুর), হরগৌরী অপেরা পার্টি (কাকুর গোরিয়া), অন্নপূর্ণ অপেরা পার্টি (লাগদা), সত্য নারায়ণ অপেরা পার্টি (গোলকুণ্ডা), ছালারি সরতলী অপেরা পার্টি (চয়ণপুর), মহামায়া অপেরা পার্টি (চিপিদা), নডিয়ারা বীণাপাণি অপেরা পার্টি (নডিয়ারা), রাণীবাঁধ কিশোর সংঘ (গোরাফুসরা), চিত্তরঞ্জন নাট্য সংঘ (নমোবাজার), সোনাইজুড়ি বীণাপাণি অপেরা পার্টি (মঙ্গুরিয়া), রঘুনাথপুর অঞ্চলে চৌপাহাড়ি ড্রামাটিক ক্লাব (চৌপাহাড়ি), মহামায়া অপেরা পার্টি (গোবিন্দপুর), শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি (রঘুনাথপুর), বলরামপুরে হাঁসপুর মনসা যাত্রা পার্টি—বর্তমানে পুরুলিয়া জিলায় যাত্রাভিনয় করিতেছে। এই সব সংস্থাকে [1] ১৯৬৪—৬৫ আর্থিক বর্ষে ২৭৩০ টাকা সরকারী সাহায্য দান করা হইয়াছে।

1. Statement regarding folk recreational institutions for distribution of grants, 1964—65 (purulia)

মেদিনীপুর জিলা

মেদিনীপুর সদরের অন্তর্গত বিবেকানন্দ আশ্রম (কুইকোটা), নাট্যরূপা (কর্নেলগোলা), নাট্যশ্রী (কর্নেলগোলা), শিল্পীসংঘ (কর্নেলগোলা), বরমাণিকপুর নূতনদল (বরমাণিকপুর), তারানাট্য পীঠ (মিরাবাজার), ধদিকা বাণীনিকেতন (গড়বেতা), সনকা অপেরা পার্টি (গোয়ালতোড), রাসকুণ্ডু তরুণ সংঘ (রাসকুণ্ডু), বংকাকুল বাণীসংঘ (তালবান্দি), মাঙলিক যুব সংঘ (অমৃতপুর), সংপতি শীতলা অপেরা পার্টি (পিরাকাটা), জলহরি মৌপাল যাত্রাপার্টি (মৌপাল), শ্রীশ্রীশীতলা মিলনসংঘ (ওয়ারদা), গোপীনাথপুর রবীন্দ্রসংসদ (খুরসি), চড়াইগ্রাম নবারুণ সমিতি (পুরুলদা), তরুণ সংঘ নাট্য সংস্থা (সোনাকানিয়া), সিঙ্গাই সবুজসংঘ (মারকুণ্ডা), ব্রাহ্মণীপুর লোকশিক্ষা সংঘ (যশরাজপুর), রামভদ্রপুর জনকল্যাণ সংঘ (বরজগু), অগরার নায়ক তরুণ সংঘ (পারই), ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত কোটালপুর বাসন্তীময়ী বান্ধব অপেরা পার্টি (হরিনগর), শ্রীশ্রীশীতলা মাতা এমেচার ক্লাব (রাধাকান্তপুর), জোতঘনশ্যাম শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ অপেরা ক্লাব (জোত ঘনশ্যাম, দাশপুর), জয়কৃষ্ণপুর হেমন্ত সংঘ (সেকেন্দারী), বীরবানপুর কালিকা অপেরা (হেমন্তপুর), মিতালি নাট্য সমাজ (ছত্রগঞ্জ), কনটাই মহকুমার অন্তর্গত নটদীঘি আলোক সংঘ (ধানগাঁও), চণ্ডীবেতি বীরেন্দ্র স্মৃতিসংঘ (ভবানীচক), ধানঘড়া মিলন সংঘ (ধানঘড়া), বরচুনপাড়া তরুণ সংঘ (দেউলবাড়), মিলনসংঘ লোকরঞ্জন সংস্থা (ভগবানপুর), পশ্চিম দেউলবাড তরুণ সংঘ (আড়গোয়াল), সোন্দালপুর শীতলা নাট্য সমাজ (শুখাখোলা), রামচক মিলনি ক্লাব (রামচক), বিক্রম নগর কিশোর সংঘ (হরিয়া), মিরজাপুর মণ্ডল শংকানারায়ণ যুবক সংঘ (সাগরেশ্বর), কালিন্দী অঞ্চল সেবা সংঘ (কালিন্দী), চন্দনপুর অগ্রণী তরুণ সংঘ (মিরগোদা) সাহারা চক মুরারি পল্লীসেবাবাহিনী (সাহারা), উদয় সংঘ (দেবীদাসপুর), তমলুক মহকুমার অন্তর্গত রাতোয়ালী নটরাজ নাট্যসম্প্রদায় (রাধাবল্লভপুর), বরহাতগেছিয়া নিউ সত্যনারায়ণ এমেচার পার্টি (কাকগেছিয়া), বরমন্দগ্রাম কিশোর চক্র (উত্তরধলহরা), দোনাচক কালীমাতা ক্লাব (দোনাচক), রাজারামপুর কিশোর সংঘ যাত্রা পার্টি (শিবরামনগর), দড়িবেরিয়া মিতালি সংঘ (দড়িবেড়িয়া), হরশংকরপুর মৈত্রী সংঘ (হরশংকরপুর). উত্তরজিয়ান্দা ক্রীড়া ও শক্তিসিদ্ধা, কলাগেছিয়া পল্লীউন্নয়ন সমিতি

(দয়ালদাড়ি), মসলন্দপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি (গোপালপুর), নেতাজী সংঘ (রামপুর), আমড়াতলা দেশবন্ধু কিশোর সংঘ (আমড়াতলা), কুলাপাড়া শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী যাত্রা পার্টি (কোটবার), ঝাড়গ্রাম মহকুমান্তর্গত রাঙ্গরা-কোলা রামপ্রসাদ যাত্রাভিনয় (খালশিউলি), ঝাড়বনী তরুণ সংঙ (নেকড়া শেল), কুলডিহা জনকল্যাণ সমিতি (কানিমাহুলি), ছাতিনাশোল তরুণ সংঘ (ছাতিনাশোল), ধাদনগিরি শিবদুর্গা অপেরা পার্টি (চোরচিতা), হাতিপোতা বীণাপাণি অপেরা পার্টি (গোপীবল্লভপুর), চিরাকুটি মাধবচন্দ্র স্মৃতিসংঘ (কেশিয়াপোতা), লালগড় মিলনি সংঘ (লালগড়), ভাঙ্গাবাঁধ বীণাপাণি ক্লাব (শিলদা) যাত্রা সংস্থা এবং কেশপুর থানাব কোটাশীতলা অপেরা পার্টি (শিরসা), থাতাল থানার জামিরা আদ্যাশক্তি অপেরা পার্টি (চৌকা) ও নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত জামিরপাল শচীন্দ্র যাত্রা পার্টি (জামিরপালগড়) [1] ১৯৬৫—৬৬ আর্থিক বর্ষে মোট ২৬৪০ টাকা সরকারী সাহায্য পাইয়াছে।

বর্ধমান জিলা

জুনারা পল্লীমঙ্গল সমিতি (বাঘেন), বাঘেন এ. ই. সেণ্টার (বাঘেন), সোনাপলাশী বাউলদল (সোনাপালাশী), কারমাম উদয়ন বাউল দল (কারমাম), কোনা কৃষ্ণপুর নেতাজী তরুণ পাঠাগার, কিউনতা কিষাণ সংঘ (কিউনতা), রূপসা যুবক সমিতি (রূপসা), কিউল তরুণ সংঘ পাঠাগার (ছগ্রাম), গোপালবেরা অভিযাত্রীসংঘ (গোপালবেরা), সুলতানপুর তরুণ সংঘ (বেইন), পূর্বাঞ্চল হিন্দুমিলনমন্দির (নসীগ্রাম), হয়বৎপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি, বিল্বগ্রাম কিষাণ সংঘ, প্রতাপপুর পাঠচক্র, ভূয়েরা তরুণ সংঘ (ভূয়েরা), পরজ অগ্রদূত সংঘ (পরজ), মথুরাপুর অপেরা পার্টি (মথুরাপুর), জালিম গোড়িয়া নবতরুণ সংঘ, কলা নবগ্রাম শিক্ষানিকেতন (কলানবগ্রাম), রসুলপুর অনাথ সমিতি (রসুলপুর), বৈদ্যডাঙ্গা জয়যাত্রীসংঘ (রসুলপুর) রামনগর পল্লীউন্নয়ন সমিতি, ধাত্রীগ্রাম নেতাজী সংঘ, কালীতলা মিলন সমিতি (পাতুলি), দামুদরপাড়া নিউ বান্ধব অপেরা (রায়পুর), লক্ষ্মীনারায়ণপুর বীণাপাণি ক্লাব (পাতুলি), নারায়ণপুর নাট্য সংঘ (পাতুলি),

1. Folk recreational institutions awarded grants during the year 1965—66, Midnapur.

ক্ষুলগ্রাম ক্ষেত্রপাল অপেরা পার্টি; গোসুম্বা নেতাজী যুব সংঘ (আলমপুর), মাস্থালী ত্রিনয়নী অপেরা পার্টি, পলিতা যুবসংঘ, হাটরি বিধান সংঘ, আউশড়া গ্রামউন্নয়ন সমিতি (পলসোনা), মীরাপোনা নিউ মঙ্গল অপেরা (কাজোরা), সুহুর নেতাজী সংঘ (আমরুণ), জড়গ্রাম তরুণ কালী অপেরা, ভুরি যুগের যাত্রী ক্লাব, বড়পলাশন সুহৃদসংঘ, মদনটোরি সম্মেলনী নাট্যসংঘ, পাবড়া তরুণ সংঘ, তমলুকা কমল অপেরা পার্টি, নিরোল গাছি আদিবাড়ি অপেরা, ধীরগা পাড়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি, পিপলন ঈশ্বর বড়রাজ অপেরা, কুসুমগ্রাম গরবিয়া অপেরা পার্টি, হরিপুর হিতসাধনী সমিতি (খাজুরডিহি), গৌরডাঙ্গা প্রগতি সংঘ, নওদা পাড়া রামরঞ্জন মেমোরিয়াল (কালিকাপুর), ঝামতপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি, বাবলাডিহি মনসামঙ্গল এমেচার পার্টি, মহরত্তুবা তরুণ সংঘ অপেরা, আমগোড়িয়া বাগচীপাড়া যুব সংঘ—সংস্থা কর্তৃক যাত্রা পালা আসরস্থ হইয়া থাকে। বধমান জিলায় বিভিন্ন যাত্রা সংস্থাকে [1] ১৯৬৫—৬৬ আর্থিক বর্ষে ২৫০০ টাকা বার্ষিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

হাওড়া জিলা

নয়ীতালিম পাঠশালা (জয়পুরবিল), ব্রতীসংঘ (ঘোষপাড়া), উদংগ সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র (উদংগ), অন্তুলিয়া অগ্রণী সংঘ (অন্তুলিয়া), বালিচক শ্রীদুর্গা নাট্য সমাজ (খাসমহল), জগৎবল্লভপুর মহিলা সমিতি (জগৎবল্লভপুর), দীপমালিকা নৈশ বিদ্যালয় (বিরামপুর), পাতিনান সোশাল এডুকেশন সেনটার (বাগনান), শ্রীশ্রীশীতলামাতা নাট্য সমাজ (রূপসাগরী), হরিজন পল্লী মিলন সংঘ (হল্যান), কানুপাট পল্লীমঙ্গল নাট্যসমাজ (কানুপাট), বাণী নাট্যসমাজ (সাঁকরাইল), সোনাগাছি শিবদুর্গা নাট্যসমাজ (সোনাগাছি), ভানপাটিয়া সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র (গণেশপুর), জাহ্নবী এমেচার যাত্রা ক্লাব (শাসতি), বলতাবেড়িয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি (অনন্তপুর), আড়গোড়ী বাণীমন্দির (আন্দুলমৌরী), কান্দুয়া মহাকালী সমিতি (কান্দুয়া), সামন্তী রজকপাড়া নাট্যসমাজ (বনহরিশপুর), দক্ষিণবাঁধ মহাপ্রভু নাট্য সমাজ (বনহরিশপুর), রাধাগোবিন্দ যুবক সংঘ (কুলডাঙ্গা), প্রসাদপুর উত্তরপাড়া

1. Statement regarding folk recreational institutions for distribution of grants (1965—66]—Burdwan.

যুবক সংঘ (মহিষরেখা), বীরুপুর যুবক সংঘ সম্মিলনী (উলুবেড়িয়া), নওপাড়া কিশোর সংঘ (নওপাড়া), মহিষামুরী ভুবনেশ্বরী নাট্য সমাজ (নওপাড়া), নেতাজী তরুণ সংঘ (গাজিপুর), কামারগড়িয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি (নরিত), জোয়ারগোড়ি উত্তরপাড়া নাট্যসমাজ (জোয়ারগোড়ি), সুমদা তরুণসংঘ (সুমদা) প্রভৃতি সংস্থা যাত্রাভিনয় করিয়া থাকে। উল্লিখিত সংস্থাগুলি বার্ষিক সরকারী সাহায্য পায়।

২৪ পরগণা জিলা

আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত কাচবাগান মিলন মন্দির (বক্রাহাট), দৌলতপুর মিলন সংঘ (আমগাছিয়া), শিক্ষাসংস্কৃতিচক্র (বিদ্যানগর, চরশ্যামদাস), কুশীলব (দক্ষিণগৌরীপুর), সরোজবাসিনী নাট্য সমাজ (দক্ষিণগৌরীপুর), বখরাহাট যুব সংঘ যাত্রাপার্টি (বখরাহাট), কন্যা নগর মহিলা সমিতি (কন্যা নগর), বাওয়ালীসখ্য সংঘ যাত্রাপার্টি (বাওয়ালী), চকমাণিক বান্ধব সমিতি (বাওয়ালী), বন্ধু সংঘ (জয়নগর মজিলপুর), কুষ্টিয়া কালিকা নাট্যসমাজ (কুষ্টিরা), নিউ ত্রিনাথ অপেরা পার্টি (হরপুর, প্রতাপ নগর), হরিহরপুর জাগৃতিসংঘ (মল্লিকপুর), শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (নিমপিট), ডায়মণ্ডহারবার মকুমার অন্তর্গত হনরা যুব সংঘ যাত্রাপার্টি (দরিয়া), আমিরা ডায়মণ্ড ক্লাব (আমিরা), দয়ারামপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব (গাববেড়িয়া), অগ্রদূত সংঘ যাত্রাপার্টি (ঘটেশ্বর), গদাধর রাসও নাট্য-নিকেতন (ভুবননগর), লক্ষ্মীপুর প্রগতি সংসদ (শিবকালীনগর), বিবেকানন্দ স্মৃতিসংঘ গণনাট্য পরিষদ (ভুবননগর), নারায়ণপুর শ্রীদুর্গা যুবসংধ যাত্রা-পার্টি (নামখানা), ষোড়শ নাট্যসংসদ (কাকদ্বীপ), গঙ্গাধরপুর রবীন্দ্রস্মৃতি বিশালাক্ষী অপেরা (গঙ্গাধরগঞ্জ), মিত্রসংঘ কালচারল সেকৃশন (মিরজাপুর —মথুরাপুর), মথুরাপুর ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশন (মথুরাপুর), শিবপুর পঞ্চানন অপেরা পার্টি (গোচারণ), বিশালাক্ষী নাট্যসমিতি (খেলারামপুর —সিরাকোল), চাঁদপাল যুব নাট্য সমাজ (চাঁদপাল), মিতালি নাট্যসমাজ (কাকদ্বীপ), তসরালা দক্ষিণেশ্বর নাট্যসম্প্রদায় (সরবেরিয়া), দুর্গানগর সবুজসংঘ (কুলপি),—বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত রূপায়ণ (গোলা), নাট্য বিতান (বিজয়পুর—সোদপুর), বেলঘরিয়া নারী মঙ্গল সমিতি (উমেশ মুখার্জিরোড, বেলঘরিয়া), প্রফুল্লনগর ভারতীসংঘ (বেলঘরিয়া), বারাসত

মহকুমার অন্তর্গত মহেশপুর শিবদুর্গা সমিতি (বাদু), মেঘদূত নাট্য সমাজ (প্রণবপল্লী, চাঁদপুর), বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাহারহাটি রাখি সংঘ অপেরা পার্টি (খোলাপোতা), পল্লী উন্নয়ন সম্মিলনী (আঁধার মাণিক, রুদ্রপুর), বেলঘরিয়া তরুণ সংঘ (মডেল বেলঘরিয়া), নিউ উমাশংকর অপেরা পার্টি (গোপালপুর), বড় শেহারা তরুণসংঘ (ছোটশেহারা), সিমুলিয়া পল্লীশ্রী সংহতি যাত্রাপার্টি (হাসনাবাদ), মিলনসমিতি যাত্রাপার্টি (বরুণহাট), বড়াল অপেরা পার্টি (হাসনাবাদ), শ্রীরাধাগোবিন্দ অপেরা পার্টি (ঘোষপুর), কালীনগর হাট সংস্থা যাত্রানাট্য অভিনয় করিয়া থাকে। উল্লিখিত সংস্থাগুলিকে সরকার কর্তৃক [1]১৯৬৪—৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট ২৫৭৫ টাকা এককালীন বার্ষিক সাহায্য দেওয়া হয়।

নদীয়া জিলা

হাঁসখালি অঞ্চলের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা পার্টি (বগুলা), উন্নয়ন সংঘ অপেরা পার্টি (ভৈরবচন্দ্রপুর), লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা (বাপুজীনগর), কালীগঞ্জ অঞ্চলের কিশোর সংঘ অপেরা পার্টি (কালীগঞ্জ), নাকাশীপাড়া অঞ্চলের তারকদাস অপেরা পার্টি (চেচুড়িয়া), কৃষ্ণনগর অঞ্চলের সত্যনারায়ণ যাত্রা-পার্টি (রূপদহ), বহাদুরপুর এস্. ইউ. ক্লাব অপেরা পার্টি, বিষ্ণুপুর কোহিনুর অপেরা পার্টি (বাহাদুরপুর), শান্তিপুর অঞ্চলের ফুলিয়া দেবালয় অপেরা পার্টি (ফুলিয়াকলোনি), লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা পার্টি (বাবলা গোবিন্দপুর), তেহাটা অঞ্চলের পল্লীবান্ধব অপেরা পার্টি (কানাইনগর), নিউ বীণাপাণি অপেরা পার্টি (পলাশীপাড়া), মাতৃমঙ্গল অপেরা পার্টি (গোপীনাথপুর), ভবানীপুর প্রগতি সংঘ অপেরা পার্টি (বল্লীপাড়া), রাণাঘাট অঞ্চলের ষষ্ঠী অপেরা (বীরনগর), নবারুণ সংঘ যাত্রাপার্টি (হুমানি পোতা), জয়কালী অপেরা পার্টি (ডালুয়াবাড়ি), করিমপুর অঞ্চলের জামশের পুর অপেরা পার্টি (বাগচী জামশেরপুর) নদীয়া জিলায় লোকনাট্য পরিবেশন করিয়া থাকে।

---

1. Statement regarding distribution of grants to folk recreational institutions (1964—65), 24—Parganas.

(ভ) **বিশিষ্ট যাত্রাগানের স্বরলিপি**

[১]**পূর্বোল্লিখিত সুরকার ভূতনাথ দাসের যাত্রাগানের সুর—**

মিশ্র কামোদ যতিতাল।

[স্বরলিপির প্রত্যেকটি বিভাগ আটমাত্রায় গীত হইবে]

ওমা পরবাসে তোব সাধ মিটেছে আয়মা আপন নিবাসে।
পর ফেলে তোর আপন নেমা কাজ কি সুদূর প্রবাসে॥
সেথা সিন্ধু জলে জলে তুষানল, সেথা নরের প্রকৃতি পুরিত গরল।
সেথা দুঃখ প্রবল ঝরে অবিরল প্রাণ ভরা শুধু হুতাশে॥

(রামানুজ পালা—ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়)

গায়ক—কালীপদ দাসমজুমদার

পর্স র্স র্সর্স র্স | মপনর্সর´ র্স ণপ মপণপমজ্ঞ।
ওমা পব বাসে তোব সা-ধ মি টে— ছে—

জ্ঞম পণ মপর্স ণপ। জ্ঞম জ্ঞম রজ্ঞ স।
আয় মা — আপন। নি বা সে —।

র্স ণর্স র´ র´। ম মপ ণর্সর´জ্ঞ´ র্সর´র্মজ্ঞ´।
পর ফে লে তোব। আ প — —ন।

র্সর´ ণর্সণপ মপণপ মজ্ঞ। জ্ঞ জ্ঞমপণর্সর´ র´জ্ঞ´ র´র্স।
নে মা - —। কাজ কি — সু দূ র।

র্সর´ র্সর´র্মজ্ঞ´ র´র্স ণধ। র´র্সণধণর্স মপ, ণর্সজ্ঞ´র´ র´র্সণধপমজ্ঞরস॥
প্রবা | সে — —|। |-- --|, |-- ——|॥

পণ পণপ মপণপ জ্ঞম। পন ন র্সন র্স।
সেথা সি ন্ধু জলে। জলে তু যান ল।

র্সর্স নর্স র´র´ র´। র্সর´ র্সর´র্ম জ্ঞ´র´ র্স।
সেথা নরে র প্রকৃতি। পূ রি ত --।

র্সর´ ণর´র্স ণপ মপণপমজ্ঞ।
গ র — —ল।

পণ ণ ণ ণ। ণপ ণ পণর্সর´ ধণধপ।
সেথা দুঃখ প্রব ল। ঝ রে — অবিরল।

মপণর্স র´জ্ঞ´র্সর´ র্মজ্ঞ´ র´র্স। র্সর´ র্সর´র্মজ্ঞ´র´র্স ণধপম জ্ঞরস॥
প্রা— —ণ ভরা শুধু। হুতা শে-- -- —॥

১। পূর্বোল্লিখিত সুরশিল্পী অমিয়কুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত

[1]পূর্বোল্লিখিত সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচীর যাত্রাগানের সুর—

মিশ্রজৌনপুরী—যতি তাল

[স্বরলিপির প্রতিটি বিভাগ আট মাত্রায় গীত হইবে]

রাথরথ ব্রজনাথ বলে কেঁদেছিল ব্রজবাসী,
আমি দেখেছি নয়নে মুগধ পরাণে তার তপ্ত অশ্রুরাশি।
বক্ষ পাতিয়া কত যে গোপিনী পড়িল পথের ধুলাতে,
আরোহিত রথে কৃষ্ণচন্দ্র দেখিল আপন আঁখিতে।
কেহ চক্র ধরিল, রথগতি নিবারিল,
কত সারি সারি সারি গোপকুলনারী কান্তের প্রেমদাসী।

(বাসুদেব পালা—ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়*)

গায়ক—হেমচন্দ্র পাণ্ডা

স র ম প। মপ ণ ম প। মপ র্স ণ প।
রা থ রথ ব্রজ। না থ ব লে। কেঁ দে ছি ল।
প প রম পদমপ। মজ্ঞ সর ম —।
ব্র জ বা —। সী — — —।

ম পধণ ণ ণ। ধর্সণ ধ প —। পধ র্স র্রর্মজ্ঞ র্রর্স।
আ মি দে খেছি। ন য় নে —। মুগ ধ পরা ণে।
র্স ণ প প। রমপদ মপমজ্ঞ সর ম॥
তার ত প্ত অশ্রু। রা শি — —॥

মপ পপ পধপ মপধণ। ণণ ণ ধধণধ পধমপ। মপ পপ পধপ মপধণ।
বক্ষ পাতি য়া —। কত যে গোপি নী। পড়ি ল পথের ধুলাতে।
ণর্স র্স র্সর্স —। র্সর্র র্সর্রর্স ন —। ধণ ধপ মম —।
আরো হিত রথে —। কৃ ষ্ণ — —। চ ন্দ্র — —।
রম ম মম —। মপধ র্সণ ধপ —। র্সর্র র্মর্ম র্গ র্রর্গর্র র্স।
দেখি ল আপ ন। আঁ খি তে —। কেহ চক্র ধ রিল।
র্সর্স র্রর্ম র্ম র্গর্ম। মপধন ণণ ণণ ণণ। র্সর্র র্সর্রর্স ণণ ধপ।
রথ গতি নিবা রিল। কত সারি সারি সারি। গো প কুল নারী।
র্স ণপ প প। রমপদ মপ মজ্ঞ রম॥
কা ন্তের প্রে ম। দা সী —॥

১। পূর্বোল্লিখিত স্বরশিল্পী অমিয়কুমার ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত

পূর্বোল্লিখিত স্বরকার সতীশচন্দ্র ঘোষের যাত্রাগানের সুর—

সারঙ্ (দুইনি)—একতালা

বাজ পড়েছে শান্তির ঘরে জ্বলে শুধু হল ছাই।
চৌদিকে তার আগুনের বেড়া পথ নাই পথ নাই।

(আমি) সর্পের বিষ অগুেনের জ্বালা মরুভূমি খরতাপ
বজ্রের ঘা সিংহের থাবা দুর্বাসা-অভিশাপ।

(আমি) ললাট বহ্নি ধূর্জটির ধূমের পাহাড় কুজ্ঝটির
নন্দন বনে কুসুম বিতানে ঝটিকা বহায়ে যাই।

(নিয়তি পালা—কানাইলাল শীল)

গায়ক—উমেশচন্দ্র দাস

১ + ৩

মাপা নির্সা রের্সা | নি পা পা | মা – – | মা রে সা
বা— —জ —প | ড়ে ছে — শা ন্ তি র ঘ রে
সা রে মা | পা নি র্সা | মাপা নির্সার্রে র্সার্রে |
জ্ব লে শু ধু হ ল ছা— — — —
নির্সা পানি মামা
— — —ই

র্রে — — | — — — | র্রা র্মা র্রে | র্মা র্রে র্সা

চৌ — দি কে তা র আ গু নে র বে ড়া
র্সা র্রে র্সানি | নি পা মা | রে — রে | — সা — ॥—
প থ নাই — প থ না — — — ই —

(মামা) মা পা নিনি | পা নি — | র্সা — — | — — —
আমি স র পে র বি ষ আ গু নে র জ্বা লা
পা র্সা — | র্সা — — | র্নিসা র্রের্মার্সার্রে | নির্সা— —
ম রু ভূ মি খ র তা— — — — প —

। পূর্বোল্লিখিত স্বরশিল্পী মহেন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত

র্রা — র্মা | র্মা র্রে — | র্সা র্রে র্সা | নি পা —
ব জ্ রে র ঘা — সি ং হে র থা বা
সা রে মা | পা পা নি | পা পা — | পা — —
হু র বা সা অ ভি শা — — প — —
(সাসা) সা রে মা | মা — — | পা — — | পা — —
আমি ল লা ট ব ন্ হি ধূ র জ টি র
পা র্রে র্সা | র্সা নি — | পা — মা | রে — —
ধূ মে র পা হা ড় কু জ্ ঝ টি র —
রে রে — | র্রে — — | র্রে র্মা র্রে | র্সা নি পা
ন ন্ দ ন ব ন কু সু ম বি তা নে
পা র্রে র্সা | নি পা মা | মাপা নির্সারে র্সারে |
ঝ টি কা ব হা য়ে যা — —
নির্সা পানি মামা ॥—
— —ই — —

[১]পূর্বোল্লিখিত স্বরশিল্পী মহেন্দ্রনাথ দত্তের যাত্রাগানের সুর—

মিশ্র বাহার—ত্রিতাল

ওই জেগেছে কপালিনী
ঘোরা বদনা রক্তরসনা রক্ত বীজ নাশিনী।
হুঙ্কারে ওর কাঁপে চরাচর পদ ভারে মেরু কাঁপে থরথর,
মহাশ্মশানের মহাপূজায় তাথৈ তাথৈ নাচে সৃষ্টি স্থিতি নাশিনী।

(দেবী চৌধুরানী পালা—আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়
গায়ক—বিনোদবিহারী ধাড়া

০ ১ + ৩

র্র্সনপমপনর্সা রে র্সা নি | পা — — — | জ্ঞামা জ্ঞামা পা জ্ঞামা | জ্ঞা সা — —
ও ——— ই জে গে ছে — — — | ক— পা— — লি — নী — — —
সা রে রেমা মা | মা মা — — | রেমা রেমা পানি ধা | র্সা র্সা — —
ঘো — রা— ব দ না — — র— ক্ত — র স না — —
মা র্সা নি ধা | নি ধা—ধা | ধাধা ণিণি র্সার্সা নি | র্সা — — — ॥
র ক্ ত — বী জ—না | — — — শি নী — — —
সা র্সা রে রে | রেরে র্সার্সা নি র্সা | র্সারে র্সারের্মা র্মারে র্সা | নি—পা —
হু ং কা রে ও — — —র কাঁ—পে — — চ— রা | চ — র
মা নি — — | নি নি — — | মা র্সা র্সা র্সা | নি র্সা — —
প দ ভা রে মে রু — — কাঁ পে থ র থ র — —

পানি পানির্সারে র্সারে নির্সা | পানি মাপা রেমা রে | নি ধানিধানিপাধানিধা নি র্সা — —
ম — হা — — শ্ম — শা — নে — — — — — র ম হা — — পূ জা য় —
মা রে রে ধা | মা — নি ধা | ধানির্সারে র্গ র্গ র্সা | রে নি র্সারে র্সা
তা থৈ — তা থৈ — না চে সৃ — — ষ্ টি স্থি তি না — — শি
নির্সা রের্মা রের্সা নির্সা | রেরে র্সানি পানি ন্নিপা | মামা পাপা জ্ঞা — — |
নী — — — — — — — — — — — — — — —, — — — — — — — — —
মামা রে জ্ঞসা রন্নিসা ॥—

১। স্বরলিপি—গ্রন্থকার (যাত্রার এই রীতির স্বরলিপি চলে)

১পূর্বোল্লিখিত স্বরশিল্পী অমিয়কুমার ভট্টাচার্যের যাত্রাগানের সুর—

মিশ্র বেহাগ—একতালা

ওরে পাগলী মায়ের ছেলে
আগুন-তাতে আপনারে তুই কেন দিলি ঠেলে।
ওযে কেউটে সাপের ছানা
বিজাতিদের সবই ওদের ভাল বাসতে মানা।
তুইতো দিলি সুধার বড়ি পড়বে তোরই গলায় দড়ি
মদ্দ কত হদ্দ হল মিশল নারে তেলে জলে।

(কবি চন্দ্রাবতী পালা—ব্রজেন্দ্রকুমার দে)

গায়ক—ক্ষুদিরাম অধিকারী

+ ৩ ০ ১
(নির্সা) নি নি র্সা । ধা ণি — । পা ধা মা । পা — —
ওরে পা গ লী মা য়ে র ছে লে — — — —
পাধা পাধা ধা । মা গা রে । রে গা গামা । রে গা সা
আ— গু— ন তা তে — আ প না— রে — তুই
সা রে রেমাপাধা । র্সণ ধা নি । ধা ধা পা— । পা — — ॥
কে ন — — — দি লি ঠে — লে — — —
(র্সার্সা) র্সা র্রে র্রে । র্সা র্সার্রের্গা র্মা । র্মা র্গা — । র্সা — —
ও যে কে উ টে সা পে — র ছা না — — — —
র্সার্গা র্রে র্গা । র্সা নি নি । পা মা মা । গা — —
বি— জা — তি দে র সব ই ও দে র —
সা গা — । পা পা — । মগা মা গা । গা — —
ভা ল — বা — স তে মা — না — —
পা পা মগা । মা গা — । সা গা রে । মা গা —
তু ই তো দি লি — সু ধা র ব ড়ি —
গা মা পা । নি নি — । সার্গা র্গার্মা র্গার্মা । র্রে র্গা র্সা
প ড় বে তো রি — গ— লা— য় দ — ড়ি
র্সা র্গা র্গা । র্রে র্রের্গা র্পা । র্মা র্মা র্গর্রে । র্রের্গা র্গা র্সা
ম দ্ দ ক ত — হ দ্ দ হ— ল —
গা পা মা । গা গা সা । সা গা মা । পা — —
মি শ ল না রে — তে লে জ লে — —

১। স্বরলিপি—গ্রন্থকার

গ্রন্থপঞ্জী

—A—

The-Ancient Classical Drama—R. G. Moulton.
Actors on Acting—Cole & Chinoy
Ancient India—R. C. Mazumder
Annals and Antiquities of Rajasthan—C. J. Tod.
Annals of Mewar—C. H. Payne
Amrita Bazar Patrica—18 Octo, 1917.
Abul Fazal's Akbar Nama—Elliot & Dowson
Akbar the Great Mogul—V. A. Smith
Abdul Kadir's Tarikh-i-Badauni (vol. II)—Elliot & Dowson.
Abul Fazal Allamis 'Ain-i-Akbari'—Jerrett
The Anatomy of Drama—M. Boulton
The Art of Dramatic Writing—L. Egri

—B—

Bande Mataram & Indian Nationalism—H. Mukherjee & U. Mukherjee
Bengal District Gazetteers (W. Dinajpur)—J. C. Sengupta (1965)
„ (Birbhum)—1910
„ (Bankura)—1908
„ (Nadia)—Garrett (1910)
„ (24-Pargonas)—O'Malley (1914)
„ (Murshidabad)—1914
„ (Malda)—Lambourn (1918)
Bengal Hircarrah—1853
Bengali Literature in the Nineteenth Century—S. K. De

—C—

Culture And Anarchy—M. Arnold
Cassell's Encyclopaedia of Literature—S. H. Steinberg
Complete Stories of the Great Ballets—G. Balanchine

—D—

Dictionary of World Literature—J. T. Shipley
Dictionary of Mythology, Folk-Lore and Symbols (Part I) —Gertrude
The Development of Theatre—A. Nicoll

—E—

The Encyclopaedia Britannica (vol. IX)—Lond.
,, (vol. X)—Cambridge
Encyclopaedia of Social Sciences (vol. II)—E. R. A. Seligman
The Epic : An Essay—Abre Crombie
Epigraphia Indica (vols. II, IV, VI)
Eastern Bengal and Assam District Gazetteers (Jalpaiguri) —1911
The Economic History of India in the Victorian Aage (vol. II)—R. C. Dutt
The Englishman—1907
European Theories of the Drama—B. H. Clark
Everyman and Medieval Miracle Plays—A. C. Cawley

—F—

Folk Art of Bengal—A. R. Mukherjee

—G—

General Anthropology—F. Boas
Green Grow the Lilacs—L. Riggs

—H—

Human Nature and the Study of Society (vol. I) —R. Redfield
History of Bengal (vol. I)—R. C. Mazumder
History of Bcngal—C. Stewart
History of Bengal (vol. II)—J. N. Sarker
The Hindu Patriot—1853
Hindu Pioneer—1835
History of Congress—P. Sitaramayya
A History of English Literature—E. Albert
Herod the Great—Medievalplay
The Harvest of Tragedy—T. R. Henn

—I—

Ilusion and Reality—C. Caudwell
The Indian Autiquary (vol. IV)
Introduction to Chaitanya Chandroday—R. L. Mitra

India to-day and tomorrow—R. P. Dutta
Indian National Congress (vol. I)
India's Fight for Freedom—H. Mukherjee & U. Mukherjee
Iddian National Congress—P. C. Ghosh

—L—

Literature and Westernman—J. B. Priestley
The Living Stage—Macgowan & Melnitz

—M—

Masters of the Drama—J. Gassner
The Mughul Empire—A. L. Srivastab

—N—

A Nation in Making—S. N. Banerjee

—O—

The Origni of the Family Private Property and the State—
F. Engels
The Origins of Religion—R. Karsten
The Oxford Companion to the Theatre—P. Hartnoll
An Outline of the Racial Ethnology of India—B. S. Guha
The Origin and Development of Bengali Language—
S. K. Chatterjee
Opera Companion—G. Martin.

—P—

Primitive Culture—E. B. Tylor
Primitive Art—L. Adam
Political History of Ancient India—H. C. Ray Chaudhury
The Playwright's Art—R. M. Busfield
Playmaking—A Manual of Craftsmanship—W. Archer

R

Report of the Indian National Congress --1902

—S—

The Standard Dictionary of Folk-Lore (vol. I)—M. Leach
The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory &
Practice—A. B. Keith
Society—Maciver & Page

Sophocles the Theban Plays—Panguin Classics
Sensus West Bengal (1961)—B. Roy
Satish C. Mukherjee & the Dawn Magazine—H. Mukherjee
A Short History of Muslim Rules in India—I. Prasad
Shivaji—J. N. Sarkar
Shakespearean comedy--H. B. Charlton
Statement regarding folk recreational institutions—
Birbhum, Burdwan, Coochbehar, Malda, Midnapur, 24-Pargonas, Purulia, West Dinajpur

—T—

Tarikh-i-Badauni (vol. I)—Elliot & Dowson
Tarikh-i-Akbari (vol. v)—Elliot & Dowson
The Threshold of Religion—R. R. Marett
The Theatre and Dramatic Theory—A. Nicoll
The Theatre Through the Ages—J. Cleaver
Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting—
—J. H. Lowson
The Theatre of the Absurd—M. Esslin
The Theatre of Revolt—R. Brustein
Towards a General Theory of Action—Parsons & Shils
Tulane Drama Review—Spring, 1963

—V—

The Vaishnab Literature of Medieval Bengal—D. C. Sen

—W—

World Drama--A. Nicoll

—অ—

অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্য

অচলায়তন—রবীন্দ্রনাথ

অদ্ভুত রামায়ণ—বাল্মীকি

—আ—

আত্মজীবনী—কৃষ্ণকুমার মিত্র

আত্মজীবনচরিত—কার্তিকেয়চন্দ্র

আত্মজীবনচরিত—রাজনারায়ণ বসু

আলমগীর—ক্ষীরোদ প্রসাদ

আসর পত্রিকা—বৈশাখ, ১৩৭৭

—ঈ—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী
—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—উ—

উজ্জ্বল নীলমণি—রূপ গোস্বামী

—ক—

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম

কংগ্রেস—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কপালকুণ্ডলা—বংকিমচন্দ্র

কমলাকান্তের দপ্তর—বংকিমচন্দ্র

করুণানিধান বিলাস—জয়নারায়ণ ঘোষাল

কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়

কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ

কাশীরাম দাসের মহাভারত—(আদি, বন, অশ্বমেধ, দ্রোণ, মৌষল, শান্তি)

কাল্পনিক সংবদল—সঃ মদনমোহন গোস্বামী

কৃত্তিবাসের রামায়ণ—(আদি, অযোধ্যা, লংকা, উত্তরা)

কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য—নিত্যানন্দ গোস্বামী

ক্ষত্রিয় গৌরব—ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

—গ—

গাহা সত্তসঈ—সঃ রাধাগোবিন্দ বসাক

গীতগোবিন্দ—জয়দেব

গীতরত্ন গ্রন্থ—জয়গোপাল গুপ্ত

গৈরিক পতাকা—শচীন সেনগুপ্ত

গৌড়রাজমালা (১ম)—রমাপ্রসাদ চন্দ্র

গৌরকৃষ্ণ রসামৃত—নরহরি চক্রবর্তী

গৌরচরিতচিন্তামণি— ”

—চ—

চর্যাপদ—মণীন্দ্রমোহন বসু

চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল

চৈতন্য ভাগবত (আদি, মধ্য)
—বৃন্দাবন দাস

চৈতন্যমঙ্গল (মধ্য)—লোচন দাস

চৈতন্য চরিতামৃত (আদি, মধ্য)
—কৃষ্ণদাস কবিরাজ

—ছ—

ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ

—জ—

জগন্নাথবল্লভ নাটক—রায় রামানন্দ

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ

জীবনীকোষ (৩য়, ৪র্থ)—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

—ত—

তত্ত্ববোধিনী—১৭৭০ শক, ১৭৭২ শক

তপতী—রবীন্দ্রনাথ

—দ—

দানকেলিকৌমুদী—রূপ গোস্বামী

দাশরথি রায়ের পাঁচালি—দীননাথ সান্যাল

দাশু রায়ের পাঁচালি—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

—ন—

নট নাট্য নাটক—সুকুমার সেন

নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—সাধনকুমার ভট্টাচার্য

নাট্যশাস্ত্র (১ম, ৪র্থ, ৫ম, ১৩শ, ২১শ, ২২শ, ২৬শ, ৩১শ)—ভরত (বরোদা)

নাট্যশালা প্রসঙ্গে—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

নাট্যলোক—নির্মলশীল

—প—

পদ্মিনী উপাখ্যান —রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের সঞ্চয়—রবীন্দ্রনাথ

পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব —রাম সর্বস্ব বিদ্যাভূষণ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী (১ম)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত

প্রচার—১২৯১ মাঘ

প্রবাসী—১৩৩১ মাঘ

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক—কৃষ্ণ মিশ্র

প্রতিমা নাটক—ভাস

প্রতাপাদিত্য—ক্ষীরোদ প্রসাদ

প্রাকৃত পৈঙ্গল (১ম)—বারাণসী

প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী —সুকুমার সেন

—ব—

বঙ্গদর্শন—১৩০৯ পৌষ

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর

বন্দেমাতরম পত্রিকা—১৯০৭-মে, সেপ্টেম্বর

বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (৩য়)—কালিদাস রায়

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা —শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার লোক সাহিত্য—আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাঙালীর ইতিহাস (আদি) —নীহাররঞ্জন রায়

বাংলার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন

বাংলার পালপার্বণ—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাঙালীর পরিচয়—মীনেন্দ্রনাথ বসু

বাঁকুড়ার মন্দির—অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) —সুকুমার সেন

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস —আশুতোষ ভট্টাচার্য

বামকেশ্বর তন্ত্র
বাংলাসাহিত্যের কথা—সুকুমার সেন
বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী
বাল্মীকি রামায়ণ (বাল)
বাণীগ্রন্থ —রজনীকান্ত সেন
বাংলার পল্লীগীতি—চিত্তরঞ্জন দেব
বিবিধ প্রবন্ধ—বংকিমচন্দ্র
বিশ্ব কোষ (১৫শ)—১৩০৯
বিবিধার্থ সংগ্রহ—১৮৫৯ মাঘ
বিষ্ণুপুরাণ (২য়)
বিনয় সরকারের বৈঠকে (১ম)
বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ

—ভ—

ভারত কোষ (১ম)
ভারত সংস্কৃতি—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাবপ্রকাশ—শরদাতনয়
ভারতের জাতীয় আন্দোলন —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম —ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া —প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—ম—

মধ্যস্থ—১২৮০ পৌষ
মধুকানের ঢপকীর্তন—সঃ পাঁচকড়ি দে
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার—শরৎকুমার রায়
মহাভারত—ব্যাসদেব (সভা)
মালতীমাধব—কালিদাস
মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাস
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত —যোগীন্দ্রনাথ বসু
মাসিক বসুমতী—আষাঢ়, ১৩৭৭
মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল
মেদিনীপুরের ইতিহাস—ত্রৈলোক্যনাথ পাল
মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল

—য—

যজ্ঞভঙ্গ—প্রিয়নাথ গুহ
যাত্রাতত্ত্ব—রঘুনন্দন
যাত্রা সমালোচনা—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যাত্রা জগৎ—শম্ভু বাগ
যুগান্তর সাপ্তাহিক—২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ ; ৩০ মে, ১৯০৮
যুগান্তর দৈনিক—২১শে জুলাই, ১৯৬৯

—র—

রহস্য সন্দর্ভ—(৪৩ খণ্ড, ১৮৬৭)
রত্নাবলী—শ্রীহর্ষ
রঘুবংশ (৪র্থ)—কালিদাস
রাজকাহিনী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
রামেন্দ্র রচনাবলী—৩য় খণ্ড

—ল—

লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ
লোকরহস্য—বংকিমচন্দ্র

—শ—

শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে —শশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রীগীতচন্দ্রোদয়—নরহরি চক্রবর্তী

শ্রীমদ্ভাগবৎ (সং)

শ্রীমদ্ভাগবত (বাং)

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (২য়)

—স—

সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার

সংগীত দামোদর—শ্রীশুভঙ্কর

সংবাদ প্রভাকর—১৮৪৮ (জুন), ১৮৫৪ (সেপটেম্বর), ১৮৬৫ (জুলাই), ১৮৭৯

সমাচার দর্পণ (মার্শম্যান)—১৮২০ (অক্টো), ১৮২১ (জানুয়ারী), ১৮২২ (জুন, জুলাই)

সম্বাদ ভাস্কর—১৮৪৯ (মার্চ)

সমাচার চন্দ্রিকা—১৮৩২ (ডিসেম্বর)

সমাজ কুচিত্র—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সরল বাংলা অভিধান (৬ষ্ঠ) —সুবলচন্দ্র মিত্র

সংবাদপত্রে সেকালের কথা —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ —হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়

সঞ্জীবনী ১৯০৫ (জুলাই)—কৃষ্ণকুমার মিত্র

সরমা—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজঘর—ইন্দ্র মিত্র

সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল

সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক —উপেন্দ্রনাথ দাস

সোনার বাংলা—মহেন্দ্র গুপ্ত

স্কন্দ পুরাণ

—হ—

হরিবংশ

হরিশ্চন্দ্র নাটক—মনোমোহন বসু

হিন্দুবীর—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুতোম প্যাঁচার নক্সা—কালীপ্রসন্ন সিংহ

নির্দেশিকা

—অ—

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

বিশেষ মুদ্রাকর প্রমাদ

১ পৃষ্ঠায় পংক্তি ১০-এ Folk Spirit হইবে

২২৫ পৃষ্ঠায় রাই উন্মাদিনী ও দিব্যোন্মাদ একই পালা।